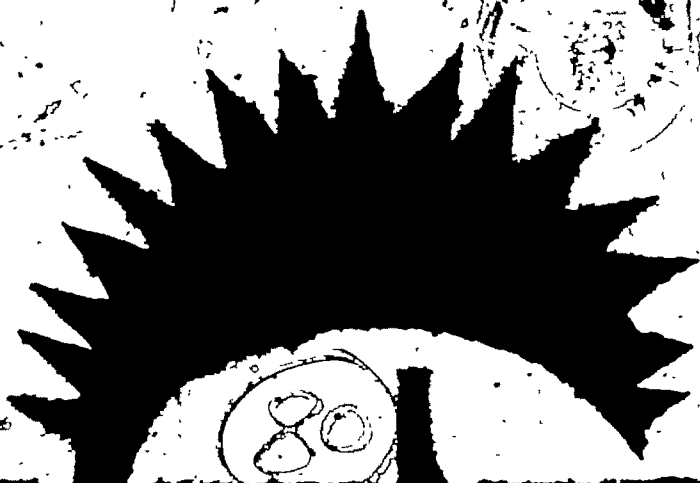
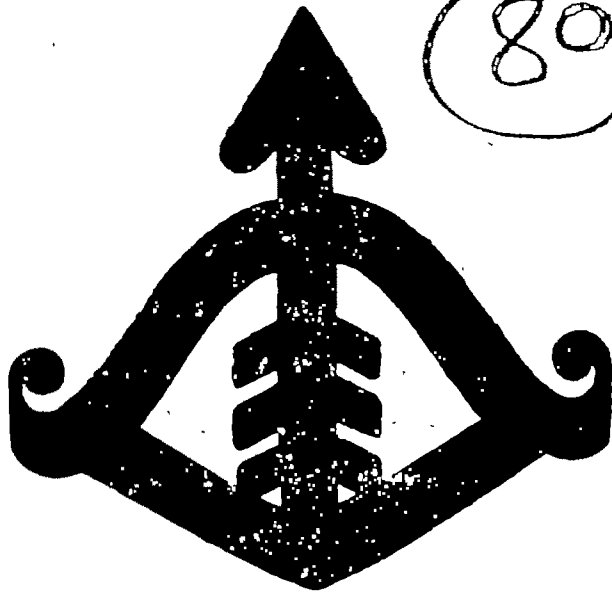


Col H6951-80-P5572

বিচয়



৪৭/৬
০২/৫



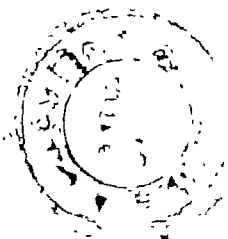
এই শরতে আকাশকে দেখে ঈর্ষা হয় আমাদের। সাদা
বেগের কোনোটা নৌকো, কোনোটা জাহাজ।
তরতরিয়ে ছুটে চলেছে নীল সমুদ্রে। কোথাও বাধা
নেই। বিশ্বশলা নেই। উন্মুক্ত, অব্যাহ। অথচ আমরা
যারা এই কলকাতা শহরের বাসী, তাদের চলার গতি
প্রতি যুক্তিতে বিপর্যস্ত। এই চরম সমস্যাটাকে বনে
রেখেই ভূগর্ভ রেল তার

লক্ষ্যভেদে স্থির।

যানবাহনের ভগতে ভূগর্ভ রেল পথে চলেছে এমন
এক সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ, যখন আমাদের চলার পথ
হবে শরতের বেগের বতই উন্মুক্ত, অব্যাহ আর বিঘ্নহীন।
ভূগর্ভ রেল মানেই গতির প্রগতি।



কলকাতার নতুন রাস্তার চতসার—ভূগর্ভ রেল
মেমোরিগিটিন ইন্সপেক্ট প্রজেক্ট (রেলওয়ের)



ক্যালেন্ডার ও উপহার দেওয়া হচ্ছে

সোভিয়েত পত্রিকার তিন বৎসরের গ্রাহকদের একটি রঙিন ক্যালেন্ডার ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ অথবা 'লেনিনের প্রতিকৃতি' সম্বলিত লকেটসহ চাবির কিং অথবা দশটি সোভিয়েত ডাকটিকিট উপহার দেওয়া হবে। যারা ডাকযোগে গ্রাহক হবেন তাদের রেজিস্ট্রি ডাকে উপরোক্ত জিনিস ছুটি পাঠানো হবে (তবে পথে তা কোন রকমে খারাপ হলে আমরা দায়ী থাকবো না)

যারা সরাসরি আমাদের কাছে অথবা আমাদের শাখা অফিসে গ্রাহক হবেন, একমাত্র তাঁরাই এই উপহার পাবেন

ইরোজী, হিন্দী ও উর্দুতে প্রকাশিত পত্রিকা ছাড়াও বাংলার প্রকাশিত হয় চিত্র ও প্রবন্ধ সমৃদ্ধ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ১ বৎসর ১০ টাকা ৩ বৎসর ২০ টাকা

সোভিয়েত নারী ১ ০ ৮ ০ ৩ ০ ১৬ ০

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ফোন : ৩ ৮ ৩৩৭

শাখা : মেদিনীপুর : শিলিগুড়ি : হালদহ : দুর্গাপুর : বালুরঘাট : ইসলামপুর
বড়গুপ্ত : বোলপুর (শান্তিনিকেতন)

এজেন্ট চাই

756.3

017/3

এজেন্ট চাই (পুরুষ / মহিলা)

প্রার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় কাজ করতে হবে
বেতন ৩০০ টাকা, কমিশন ও টি. এ. অন্তর্ভুক্ত।

যোগ্যতাবলি :—প্রার্থীকে অন্তত ম্যাট্রিকুলেশন বা উচ্চ
মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ হতে হবে।

বয়স—১৬ থেকে ৪৫ বছর।

কেবল হিন্দি বা ইংরাজী ভাষায় আবেদন পত্র পাঠান।
রেজিস্ট্রি ডাকঘোষে নিম্নলিখিত ঠিকানার আবেদনপত্র পাঠাতে
হবে।

GWALIOR TEXTILES

38-B, MAJLIS PARK,

DELHI-110033.

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত

নিবেদিত।

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক মূল্য ৫০ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তিকালে ৫ টাকা ও প্রতিখণ্ড সংগ্রহকালে ২ টাকা জমা দিতে হবে।

অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত

বিবেকানন্দ

আটখণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক মূল্য ৮০ টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রাহক তালিকাভুক্তি শুরু হয়েছে। গ্রাহক ব্যবধ ১০ টাকা। প্রতিখণ্ড সংগ্রহকালে ১০ টাকা দিতে হবে। ছয় খণ্ডে সমাপ্য। একত্রে জমা দিলে ৩০ টাকা।

কিশোর বিশ্বকোষ

চার খণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক মূল্য ৬০ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তিকালে ৮ টাকা ও প্রতি খণ্ড সংগ্রহকালে ১০ টাকা জমা দিতে হবে। একত্রে জমা দিলে মোট মূল্য ৫২ টাকা।

শ্রীক্রেমেন্স মিত্রের

ছয় দশকের কবিতা

প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য ১৫ টাকা।

সাংবাদিক বিলয় চট্টোপাধ্যায়-এর

অন্য আশি

এক অনন্তসাধারণ আত্মকথন। মূল্য ৫ টাকা।

West Bengal—A Decade

By Prafulla Roy Chowdhary

Price Rs 10/-

বইপত্র ৮।৩ চিন্তামণি বাস লেন, কলিকাতা-১

এখন ‘পরিচয়’-এর বড় জন্মকাল। জ্যোতির্দ্বন্দ্ব মৈত্র-র শোকসংখ্যার জন্য আমরা যখন তৈরি হচ্ছি, তখনই হিরণকুমার সান্তাল ও বিজন ভট্টাচার্য শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হাবলদা আর ‘পরিচয়’ প্রায় সমার্থক। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি ‘পরিচয়’-এর প্রায় প্রধান কর্মী। নানা বড়বাঁচায়, নানা মতান্তর, মনোভয়ের ভেতরেও হাবলদা ‘পরিচয়’কে তার যথার্থ ভূমিকার নিষিদ্ধ রেখেছেন। তিনি সেই মাচুষ ধীর ব্যক্তিত্বের নিজস্বতায় এসে মিশেছিল এই বাংলার গভ প্রায় অর্থশতকের স্থিতিশীল মননশীল ধারাবাহিক। ‘পরিচয়’কে হাবলদা করতে এই মাত্র বছর খানেক আগে ‘পরিচয়’-এর এই প্রতিষ্ঠাতা চাঁদা দিয়ে ‘পরিচয়’-এর গ্রাহক হয়েছিলেন।

বিজনদা বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জনকর লাভ করে গেছেন। বাংলার নাট্যসাহিত্যের ও নাট্যআন্দোলনের একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু তাঁকে নিয়ে। ইতিহাস তাঁকে গ্রহণ করেছে। জীবনে তিনি ছিলেন ‘পরিচয়’-এর একই একান্ত মাচুষ, যে, আমরা হয়তো ‘ইতিহাস’কে সবসময় মনে রাখতে পারি নি। আজ ইতিহাসের শ্রুততা জীবনের শ্রুততায় এসে মিশেছে।

পূর্ব পরিকল্পনা আমাদের একটু বদলাতে হল। ‘পরিচয়’-এর কেন্দ্রসারি-মার্চ সংখ্যা দুই সংখ্যা হিসেবে বড় আকারে বেরবে মার্চ মাসে—জ্যোতির্দ্বন্দ্ব মৈত্র-হিরণকুমার সান্তাল-বিজন ভট্টাচার্য মরণ সংখ্যা রূপে।

সম্পাদক, পরিচয়

পরিচয়

বর্ষ ৪৭

সংখ্যা ৬

আমুদারি ১২৭৮

পৌষ ১৩৮৪

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

চ্যাপলিন ও শিল্পভাবনা

আশীষ বর্মন ১

তরু দত্ত : আত্মজিজ্ঞাসার দর্পণে বাঙালি তরুণী

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ২

রামমোহনের বিলাত ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও ফল

প্রদীপ রায় ৪৭

গল্প

কজুরালি হেঁটে যায়

আবু বকর সিদ্দিক ১৭

অমির শেষ টুকরো

ইব্রাহিম শরীফ ৬২

নাটক

তবু যুদ্ধ

শৈবাল চট্টোপাধ্যায় ২০

অন্য

বুদাপেস্ট—ঝিরাগমনে

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ৭২

আদেশ্য

কাঁজের মেয়েরা

বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০

চিত্রকলা

বিষ্ণু দাস ১০৫

পুস্তক-পরিচয়

পার্বপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৮

বিবিধ প্রসঙ্গ

সিদ্ধার্থ উপাধ্যায় ১১৫ দেবেন্দ্র রায় ১১৮

কবিতাভাষ্য

গুণেন্দ্র পত্নী, যুগল বসুচৌধুরী, কাননকুমার ভৌমিক, অগ্নি সেনগুপ্ত,

অরুণ পল্লীপাধ্যায়, নন্দকুমার আচার্য, দেবেন্দ্রনাথ সিংহ,

সত্যসাবন চেল ১২১—১২৮

প্রচ্ছদ

গুণেন্দ্র পত্নী

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

P, 5572

উপসংস্করণ

পরিচালক ডক্টর। হিরণকুমার সান্যাল। সুরক্ষা সনদ

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে
চন্দ্রোদয় সেনগুপ্ত। অমৃত বন্দ্যোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

চ্যাপলিন ও শিল্পভাবনা

আশীষ বর্মন

চার্লি চ্যাপলিনের তিরোধান চলচ্চিত্র জগৎ-এ উদ্ভাপাত তুল্য, তথাপি যে তাঁর মৃত্যুতে সেন্সেশন এবং সাধারণ্যও মুহূর্তমান নয়, তার একমাত্র কারণ এ-হেন প্রতিভা ও বয়সের পরিণতিতে, ব্যক্তির অন্ত ঘটা বিরল সৌভাগ্য! এ-সৌভাগ্য অবশ্য নিয়তির নির্দেশ নয়, অর্থাৎ যাকে আটপোরে ভাষায় কপাল উচ্চারণে আমরা সচরাচর ক্যান্ড, কিংবা নিজেদের আলস্তের অত্যাচারে খুঁজি, তেমন অলৌকিক আশীর্বাদের এক্ষেত্রে সাক্ষ্য মেলে না। যেটা মেলে তা অনলস প্রয়াসে, নানান বিপত্তি পেরিয়ে, বাধা অতিক্রমে, এক অতি শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের নিজস্ব প্রতিভার অকীম সৃষ্টিময়তাকে প্রতিষ্ঠিত করার নীতি ইতিহাস।

চ্যাপলিনের অল্প ও প্রথম বৌবন দারিদ্র্যে অর্জিত, শিক্ষা নিজস্ব গুণে অর্জিত; যে অর্জন শুধু জীবনাতিপাতেই ঘটে না, নিছক দারিদ্র্য ও স্বল্প শিক্ষারই বা দান নয়—যে জন্মে তাঁর কৈশোর-বৌবনের সঙ্গীরা অসামর্থ্যতার নিঃশেষ—আদ্য-এ বা এক সচেতন, সংবেদ্য ও কর্মময় চৈতন্যের জীবন ও সমাজ থেকে অসীত জ্ঞান। এবং সে-অধ্যয়নে, তাঁর অকীম কচি ও আবেগানুভাবী, বই-পত্র-চিত্রার পরিমণ্ডলও বর্তমান। অর্থাৎ মাতৃগর্ভেই প্রতিভার তিলক তাঁর কপাল-চূষন করেছিল কি না, এ-তর্ক অলৌকিকে আত্মভাষনেরা করুন বা না করুন, প্রত্যেক প্রমাণে অন্তত এটুকু জানা যায় যে, তাঁর গুণের বিকাশ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রয়াসে সংযুক্ত।

স্বতন্ত্র্য ১৯১৪ সালে এক রিলের ছোট্ট ছবি, মেকিং এ সিভিল-এ বে কর্মপ্রেরণার সূচনা, তা সিটি লাইটস-মডার্ন টাইমস বেড দিয়ে ৩ গ্রোট ডিক্টেটর ও ভেজুর অন্তে, লাইম লাইটের মতো ব্যক্তির ট্রাজেডিতে পৌছয়। কাউন্টেন আমি দেখিনি।

চলচ্চিত্রে চ্যাপলিনের আরম্ভ এবং প্রায় পরিসমাপ্তিও দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা এবং হাঙ্গামাচ্ছলে, তার বিভিন্ন উদ্ভাসে নিহিত। এ-উদ্ভাসে সমষ্টির সমস্ত সরাসরি আসে না, আসে ইজিতে, বক্তৃত্বিতে; মূলতঃ ভবঘুরে ও তার সান্নিধ্যের পাজ-পাজীর মাধ্যমে। এবং অনেক সময়ই, কমেডির ছন্দাছুবাড়ী, হাত ও বিবাদের তোড়ে, তাঁর ছবিতে কিয়ৎকাল ইচ্ছাপূরণের ভয়ে ঘটনা ঘটে। যে-ইচ্ছাপূরণ, কল্পলোকে মাছুষ সত্যত সম্মুখীন হয়, এবং পরমুহুর্তে যে-কল্পনার ঘোর কার্টে। যেমন তাঁর ড ট্রান্স-এ; এখানে ডাকাতের হাত থেকে কুবক-কস্তুরকে ভবঘুরেই বাঁচায়, ছ-ছইবার এবং শেষে পায়ে গুলি খেয়ে, কুবক-কস্তুর সবার শুশ্রূষায় ও প্রীতিতে, যখন তার প্রেমায়ুক্তি আগে, তখনই সে-কস্তুর আসল প্রেমিক উপস্থিত। এবং এ উপস্থিতিতে ভবঘুরের স্বপ্নভঙ্গ হয় আর সে পুনর্বার একাকী, বেদনার্ত ও বিকল, নিঃসঙ্গ পথ হাঁটা দেয়। সমাপ্তির এই সময়ই, কর্মহীনের, দরিদ্রের, ভবঘুরের হুঃখের ভীনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু চ্যাপলিন আলোচ্য প্রতীকে পৌছন ইচ্ছাপূরণের, লম্বু হাত্মময়তার কিনারে-কিনারে, বা হবার ডাকাত দলের পরাজয়ে, কুবকের খামারে চাকরি পাওয়ার ও নারিকার সফলতায় পরিচর্য্য প্রকট। এ পর্ব্বত ছবিতে শুধু কৌতুক, হাত্মময়তা, ইচ্ছাপূরণমাত্র কল্পনাবর্গগন-বিহার। অতঃপর সত্যাসত্যের সাক্ষ্য, যমিচ সে-প্রতিবেশনও শেষাবধি বিবাদের হাসিতে মাথা।

কীড্‌ ছবিও অভিন্ন মেজাজে বাধা। সম্ভবত সিটি লাইটস পর্ব্বত, গোল্ড রাশ ব্যতিরেকে, তাঁর আধিক্যের আলোচ্য কেতা কম-বেশি অটুট। গোল্ড রাশ, আমার অন্তত মনে হয়, মেজাজের দিক থেকে ভেহুর পূর্ব্বসূরী। অর্থাৎ, সম্ভবত গোল্ড রাশেই প্রথম চ্যাপলিন যে সমাজে যে কোনো-প্রকারে অর্থোপার্জন অথবা সম্পদার্জন প্রেরের শিরোপা পায় তার কেন্দ্রস্থিত চরিত্রের অভিধানে নামেন। এ অভিধান গোল্ড রাশ-এ কৌতুকের আড়ালে, ব্যঙ্গ ও অতঃসারশূন্যতার ইজিতে বোধ; অর্থাৎ স্পষ্ট সমালোচনায়। তাই ইচ্ছাপূরণের আপাত-আবরণ একেজ্রে গোচে না, চ্যাপলিন সমুদ্র সোনার ধনির মালিকই থাকেন; তবু, অভ্যাস না যায় ম'লে, তাই আত্মজের ভেঁকে প'ড়ে থাকা পোড়া চুপট তিনি অনারাসে তুলে নেন, এবং আগের সজিনীকেও। আর ত্রাতদূর্শ প্রকরণগত প্রয়োগের পর অচিরে একথা খেয়াল হয় যে আসলে দারিদ্র্যের আচমকা হুর্ঘটনার কোটিপতি হওয়া আকাশকুহুমই, আদতে গোল্ড রাশ, লীলায়িত হাসির অন্তরালে দারিদ্র্য ও লোভের

অথবা হারিল্ড থেকে লোভের বৈপরীত্য চয়ন। এ বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠা-কল্পেই ইচ্ছাপূরণের সমাবেশ; কেননা সে সমাবেশ বিনা, অন্তত দ্ব্যাপটিক কমেডির আওতায়, শ্রেণী সমাজের আলোচ্য অসীমতা, অর্থাৎ অর্থকামনা সম্পদকামনা, সিনেমায় চ্যাপলিনের আয়ত্বাধীন নয়। ডন কুইকসোটও সম্ভবত অস্তিত্ব আঙ্গিকে গড়া চরিত্র।

অর্থাৎ শ্রেণী সমাজে মানুষের পরস্পর বিপরীত মনোভাব ও বাসনার উৎস থেকেই সাধারণত চার্লি তাঁর কৌতুক-অঙ্কিত মূল্যবোধ উদ্ভাসিত করতেন; সে উদ্ভাবনে সহানুিহিত থেকেছে এক মানবিক ভ্রাতৃত্বাত্মক বিচার। কিন্তু সে বিচারে, যে কোনো সার্থক শিল্পীর মতো, চার্লিও সরলীকরণে পথ সজ্ঞানে পরিত্যাগ করেছেন। তাই তাঁর ভবনুরেরও নিয়ত স্বপ্ন ও কামনা, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছন্দ জীবন এবং সে জীবন, প্রতিযোগিতামূলক, সাম্য-বিহীন সমাজ কাঠামোর আওতায়, আয়ত্বাধীন করার প্রয়াসে চ্যাপলিনের নায়ক ছোটোখাটো মিথ্যাচার ও কন্দী কলায় অনার্যাসে। সে সাধু নয়, রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ। কারণ চার্লির কোনো নির্দিষ্ট দর্শন থাকুক বা নাই থাকুক, তিনি বেকারী ও হারিল্ডের বয়সী ব্যক্তিগত জীবনে এবং শিল্পীর সংবেদ দৃষ্টিতে সামাজিকভাবেও অসম্ভব করেছিলেন। তাই তিনি অবহিত যে স্ক্রুভার্ডের কাছে ষাটাই ভগবান, তত্ত্ব-মন্ত্র বা বাণী নয়। বাণী অথবা আদর্শ, চ্যাপলিন হাড়ে হাড়ে টের পান যে সাধারণভাবে দুই স্তরে কার্যকর—প্রথমত জীবনধারণের এক নিরন্তর সভ্য পরিস্থিতিতে, যেখানে অন্তত ষাটরা পরা থাকার সংস্থান স্থিত, নয়তো কোনো সমরোপযোগী অবস্থার সমষ্টিগত উদ্ভোগে, যেমন সমাজবাবস্থার আমূল পরিবর্তনে, অধীনতা আন্দোলনে এবং অধীনতা রক্ষার্থে। সাময়িকভাবে এ-আত্মত্যাগ ও মহত্ব ছোটো ছোটো সমষ্টিগত প্রয়াসেও দেখা যায়, যেমন ধর্মঘটে, কৃষি আন্দোলনে অথবা লোকসভায় কিংবা রাজনৈতিক প্রত্যয়ে—তা সে প্রত্যয়ে, যেমন নবশালী আলোড়নে, আধেরে শ্রান্ত গড়তি প্রমাণিত হলেও।

কিন্তু চার্লি সমষ্টির উদ্ভোধনে, অন্তত ছবিতে, মাথা ঘামান নি। তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতায়, এবং যে দেশ ও কাল তাঁর কর্মমণ্ডল তার চৌহদ্ভিতে সঞ্চারিত এবং বিশাল প্রয়াস তিনি দেখেন নি; অন্তত তাঁর উপলব্ধি ও অভিজ্ঞান সে-ধরনের কোনো প্রয়াসে সংস্থিত নয়। অগত্যা তাঁর মডার্ন টাইমস-ও তাৎপর্ষ্যে প্রতীকী, একের অল্পবয়স্ক, অর্থাৎ ভবনুরের অভিজ্ঞানে, সমগ্র প্রযজীবী শ্রেণীর, সে প্রমিত-বুদ্ধিজীবী বা ম্যানেজার

বেই হোক, সবার অবস্থান অবলোকন। তাদের এবং বহুরের ও বহুরের মালিকের পারস্পরিক সম্পর্কের অল্পবল এ-চিহ্নে অবস্থিত; আর সে-অবস্থান অবশ্যই আনন্দের অঙ্গভূত মেশানো। অর্থাৎ আপাত কৌতুক ও হাসির অন্তরালে নিহিত সার সত্য; অল্প উচ্চারণে যাকে বলা হয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপন্ন বস্তু থেকে উৎপাদকের বিচ্ছিন্নতা, মার্কসের ভাবার এলিয়েনেশন।

তার মানে চ্যাপলিন মার্কসবাদী ছিলেন তা আরো নয়। আসলে মার্কসবাদ বেহেতু সাধু-সন্তের স্তম্ভবাসী নয়, সমাজ-সত্যের বিশ্লেষণ ও অন্বেষণ, তাই যে কোনো সার্বিক শিল্পীই, তাঁর নিজের মাধ্যমে ও মনস্তত্ত্ব-জীবন অবলম্বনে যখন কোনো সত্যে পৌঁছান, তখন তাঁর দর্শন বাই হোক না কেন, তাঁর শিল্প মার্কসীয় বিশ্লেষণ ও অন্বেষণ কোনো না কোনো সত্য স্পর্শ করে, কেননা তা মানবিক সত্যও বটে। সে-সত্য কোনো বৃহৎ সামাজিক ধারার বিবর্তন যেমন হতে পারে, তেমনি ব্যক্তির প্রাত্যহিকতার যে সব ছোটো-বড় অস্তিত্বের অথবা বাসনা চলিত সে-সম্পর্কীয়ও হওয়া সম্ভব। শিল্প-সাহিত্যে সাধারণত শেষেরটারই ছাঁপ পড়ে বেশি; কেননা সৌর বিবর্তনের মতো, সমাজ-ব্যবস্থার ওলট-পালটও, সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র পর্যন্ত স্থানীয়কাল ব্যাপে রাজ্য দু'রকমতেই এ-ধাবৎ ঘটেছে। অথচ হাজার বছরেরও অধিককাল ব্যাপী, অনেক অধিক সময় ব্যাপ্ত, মনস্তত্ত্ব-সমাজে প্রেক্ষিতে-প্রেক্ষিতে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে, সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য থেকেছে। অগত্যা, সাধারণত, শিল্প-সাহিত্যে সমাজে বা সামাজিক অবস্থা আখ্যায় পরিচিত তার আওতাতেই তৈরি, এক বা একাধিক ব্যক্তি মাহুরের সম্পর্কের ও বাসনারই আখ্যান। সে আখ্যানও কিন্তু, সার্বিক অবস্থার, সমষ্টির প্রতীক, তাই আবেদনে হয় বহুগ্রাহ্য; এমনকি বেটুকু থাকে নিছক মানবিক প্রবৃত্তি বা আবেগে সংশ্লিষ্ট, যেমন জীবন-মৃত্যুর প্রস্নে, নর-নারী সম্পর্কে, মাতৃস্নেহ, শিশুর প্রতি মনোযোগে ইত্যাদি, সে-সব অংশ হয়ে দাঁড়ায় সর্বজনীন ও সম্ভবত সর্বকালীন।

এবং চ্যাপলিনও বেহেতু, তথাকথিত সামাজিক পরিস্থিতির আওতাতে এবং ব্যক্তি চরিত্রের মাধ্যমেই মূলত সমাজের কোনো না কোনো পরিস্থিতিকে প্রাণ দিয়েছেন, তাই তাঁর অনেক ছবিই—অংশবিশেষে—সর্বজনীন হয়ে দাঁড়ায়। যেমন কীড্-এ, বতরুল বালককে রক্তাবেকণের দৃষ্ট ও ঘটনা ধাবিত; অথবা ড ট্রাম্পে, বতরুল ডাকাতের পরাজয় ঘটে, নারিকাত ওস্তা ও প্রীতি সমুজ্জল, যখন নাকি এ-সব ঘটনা পরস্পরায় নারকের প্রো

মনে হয় সার্বিকতার পরিশক্তি পাবে, ততক্ষণ। কেননা, ব্যক্তিগত নিষ্ঠুর ইচ্ছার স্তরে এমন-কি চূর্ণকালোবাজারী বা ক্যাপিটালিস্টও চান যে সবাই যেন সুখে-শান্তিতে থাকুক, সবাই ক্যাপিটালিস্ট বা কালোবাজারী হয়ে কিংবা না হয়ে, শুধু নিজের মুনাফার হার চক্রবৃদ্ধি তালাই যেন প্রসার। এ-বাসনা ও শ্রেণীসমাজ ব্যবস্থা যে দুটি বিপরীত অবস্থানে দৃশ্যমান, পরস্পরবিরোধী সে-জ্ঞানও মানুষের এই একান্ত মানবিক অতীশ্রান্তে গুহ্য করতে পারে না। অথচ এ-অতীশ্রান্তই একমাত্র শ্রমজীবী মানুষই, অবস্থা বিশেষে ও কালে, শ্রেণীসমাজ মোচনে অগ্রসর হয়, কেননা, তার দৈন্যদৈনিক জীবনযাত্রাও কালক্রমে অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রাত্যহিকতার সমৃদ্ধি ও ক্ষমতা, বনিক তার আশ্রয় অতীশ্রান্তেও, বনতর অঁকড়ে থাকে। বড়োয়ার গাছশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, মন্দির-মসজিদ গড়ে। এ-গড়ন সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনের অঙ্কুল নয়, বরং পরিপন্থী, তথাপি মানতেই হয় যে, এ-নির্মাণের উৎসে থাকে মানুষের মৌল অতীশ্রান্ত, এবং সে-অতীশ্রান্ত বিরোধী ক্রিয়াকলাপে অড়িত থাকার পাপ অথবা অস্ত্রায় বোধ।

এ-কারণেই, ব্যক্তি-মানুষের বাসনার পরিমণ্ডলেও, ভবনুয়ে চার্লির স্বপ্ন-বদলন হয়, অথবা কল্পনায় সার্বিকতার শৃঙ্খলার অভ্যে, মোহভঙ্গ, তা মেকিং-এ লিভিং-এ, ট্রান্সপে বা কীডে যাতেই হোক, তার অন্তর্লীন সত্য ও বেদনা সাধারণ্যে যে পতীর মর্মাহুত্ব আগায়, যে অভিজ্ঞতা বিভাজিত স্বপ্ননদী, তা সম্ভবত মালিকের শিরোপায় ধারা সমাদৃত, তাঁদের প্রভা। তাঁরা এ-সত্য - উদ্ঘাটনে, চ্যাপলিনের আঙ্গিকে, না চটলেও নিশ্চয়ই অবস্থি পান। যেমন আমরা মধ্যবিস্তে পাই পথে আশ্রিত দারিদ্র্যের শীতে, উপবাসে অথবা শিশুহত্যাত।

ড গ্রোট ডিক্টেটর ও সেক্টর মত ছবিতে অবশ্য, বিস্তবাসনের এক বড় অংশ আর কেবল অবস্থি বোধে নিঃশেষিত নয়, প্রতিবাদে মুখর। চার্লির আমেরিকা থেকে বিতাড়নই তার সাক্ষ্য, বদিও সে-বিতাড়নের পিছনে তাঁর অস্ত্র কিছু তৎকালীন কর্মও অড়িত ছিল, তবু ক্যান্সার ও বনতরকে, ভিতর থেকে ছবিতে এ-ধরনের উন্মোচিত না করলে, হয় তো তিনি ম্যাকার্থীবাদের শিকার হতেন না। অন্তত ইংলণ্ডের বনতর তাঁকে তখন নিশাস নেওয়ার সুযোগ দিয়ে ছিল, কেননা সেখানে তখনো ম্যাকার্থীর চামুত্তারা সরব নয়। অবশ্য সেখানেও শ্রেণী হিসেবে বিস্তবাসনেরা, এ-দৃষ্টি

হবিতে, চ্যাপলিনের শিল্প ক্ষমতা যে স্পষ্ট হয়েছে সে-কথা অব্যক্ত রাখেন নি।

কারণটা স্পষ্টই। কেননা একটিতে ছিল ক্যাসীবার নিয়ে তীক্ষ্ণ মধ্যম্য; বা আক্রমণাত্মক ব্যঞ্জে সুরধার, এবং অন্যটিতে, অর্থাৎ ভেতরুতে, প্রায় প্রিমিটিভ অ্যাকুমুলেশনের নেশাই শুধু নয়, শেবাধি সেই নেশাচ্ছন্ন চরিত্রের, আত্মসমর্পণ ক্ষেত্রে, ধনতন্ত্রের সামগ্রিক চেহারা ও মূল্যবোধ সম্বন্ধেই কটাক্ষ। এটা প্রায় গুপ্তচর তুল্য ঘটনা, অভ্যন্তর থেকে নিজেদেরই একজনের হাঁড়ির হাল উন্মোচন। তাই বতকণ চার্লি, আপাত কৌতুকময়তায়, হান্তময় পরিস্থিতি ও ভাবভঙ্গিসহ, বারংবার প্রৌঢ় মহিলা হননে সম্পদ বাড়ায়, বিস্তার সার্থকতায় পা-পা এগোয়, ততক্ষণ তাকে এক অবাঞ্ছিত, মজাদার খুন্সী হিসেবে মেনে নিয়ে সার্বজনীন আনন্দ-আহরণের প্রতিবন্ধকতা ঘটে কম। কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে সে শুধু হাবেভাবে-ও বিক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত সংলাপেই কেবল নয়, বিচারালয়ে সরাসরি ধনতন্ত্রের নিহিত সত্য উচ্চারিত করে, তখনই রব ওঠে যে ব্যাপারটা শিল্প বিপরীত, সিনেমা-আঙ্গিক বহির্ভূত ও সরলীকরণে বিদ্ধমিত। সরলীকরণ যে নেই তেমন কথা চার্লির কোনো ক্ষতই বলেন না, কেননা ধনতন্ত্রের সামগ্রিক, পুঙ্খানুপুঙ্খ, তরে-তরে অর্থস্বয় আকার, কোনো একক কিস্তি নাটকে বা উপভাসে দেওয়া অসম্ভব। আসতে কোনো মানবিক বা সামাজিক সত্যেরই সামগ্রিক স্বরূপ শিল্প-সাহিত্যে বিবৃত নয়, বা মূর্ত হয় তা শুধু সত্যের এক বা একাধিক অংশের সারাংশসার, তার প্রতীকী আভাস। আলোচ্য প্রতীকী আভাস আয়ত্তে আনার অধেবাদ্য, শিল্পক্ষেত্রেই সরলীকরণ বা কাব্যিক স্বাধীনতা। আবহমানকাল প্রযোজ্য। সে সরলীকরণ শুধু চরিত্র, সম্পর্ক ও ঘটনার মূল হয় অস্পষ্ট রাখে, বাড়ায় ও সঘন করে তোলে—নইলে প্রতীক প্রতিষ্ঠা পায় না—অন্ত কোনো সমাধ-তাত্ত্বিক নিয়ম বা প্রাত্যহিকতার বিদ্বৃত হৃদয় ও গতি সেখানে অচল। এবং শিল্পের এ-নিয়ম ভেতরুতে পর্বে-পর্বে গাঁথা।

আসলে চ্যাপলিন ছিলেন গুপ্তচর বৃত্তিতে বহুকাল ব্যাপৃত, অর্থাৎ প্রেমী সমাজের অন্যর মহল থেকেই তার উদ্ঘাটনে, দফায় দফায়, তিনি মনোবোণী। কিন্তু বেহেতু সে-উদ্ঘাটন প্রথমত ছিল কৌতুকের গুরু এবং দ্বিতীয়ত ব্যক্তির, অর্থাৎ ভবমুখের, প্রাত্যহিক জীবনের বগ্ন-আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তব অবস্থা কেন্দ্রিক—ছোটো ছোটো হান্তময় পরিস্থিতি অড়িয়ে অড়িয়ে, প্রবানত চাক্ষু্য, সংলাপহীন—সুতরাং বুর্জোয়াজিও বহুকাল প্রমোদে-

মুখ ছিল। অথচ ইং অহুধাবনেই এ-কথা পরিষ্কার যে পরিচ্ছন্ন হাসির অন্তরালে চ্যাপলিন সদৃশ বেকারী-হারিল্য-অগ্নভঙ্ক ও বিচ্ছিন্নতাবোধের চিত্র খনতলে ভিন্ন কোথাও মেলে না; সামন্ততন্ত্রের অস্ত চেহারা, আর সমাজতন্ত্রে অস্ত বেকারী, হারিল্য ও অগ্নভঙ্কের আলোচ্য প্রতিকৃতি অহুপস্থিত।

সম্ভবত গোষ্ঠ রাশেই বুর্জোয়াজিয় চ্যাপলিন সমাহরের দ্বাস প্রাপ্তির নুচনা ঘটত, যদি না সেখানে শেবাংশেও ভবনুরের কল্পলোক অটুট থাকত, অর্থাৎ, ঘটনা পরম্পরায় সে সতিাই সোনার ধনির মালিকে যদি না রূপান্তরিত হত। অনন্তাত ভবনুরের, এ-হুঘটনা প্রস্তুত রূপান্তরের মধ্যেও যে হাস্তোচ্ছল অগ্নময়তার ইকিত আছে, যে অগ্ন কহাচ সভ্য, কিঙ্ক বা নিরাপত্তাহীন জীবনে সতত ব্যক্তির নিম্নত কল্পনায় কল্পশোভের মতো বয়, তা পালের পৌদারা হয় বোঝেন নি, নয় বুঝলেও, বেহেতু উপসংহারের ইচ্ছাপূরণ আন্ত উপভোগকে আচমকা আহত করে না তাই, তাঁদেরও সন্দেহ অহুমোদন পেয়েছিল।

অবন্ত তুগুমাত্র এ-নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেই চ্যাপলিনের শেবের দিকের কিসের, প্রেট ডিক্টেটর ও তেহুর, জীকতা স্পষ্ট হয় না। সে ব্যাখ্যায় অন্তে প্রয়োজন আরো হুই বিচার মাত্রায় যোগাযোগ। প্রথমত টেকনিকগত বিবর্তনের সচেতনতা ও দ্বিতীয়ত ক্যাসীবাধের উত্থান ও প্রায় নুতোর অবহিতি। সবাক চিত্রের প্রাথমিক আবির্ভাবে চ্যাপলিন বিব্রত এবং চিন্তিতই হয়েছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন তাঁর অকীর আদিকের ম্যাপটিক কমেডি, বাতে হাবভাব ও অহুত ইকিত প্রদানত কার্যকর, তা সংলাপের স্পষ্টতায়, বা ধাবে। তাই দিটি লাইটস তিনি নির্বাক ছবি হিসেবেই তোলেন, এবং অন্তঃপর সঙ্গীতের প্রয়োগ ঘটান। তাই এ-ছবিতে আবহ সঙ্গীত আছে কিঙ্ক তা সংলাপ বর্জিত। মডর্ন টাইমস থেকে সম্ভবত চ্যাপলিনের সামাজিক বক্তব্য, বা বৃহৎ তাৎপর্ষের অবেবা, ব্যক্তিকে অড়িয়েই সমষ্টির দিকে আরো স্পষ্টাঙ্গটি বোঁকে, এবং তাই ভবনুরে চরিত্রেরও, সবাক কর্মকাণ্ডে এসে অনেকটা চেহারা পাট্টায়। সে আর তুগু অধরা ইকিত, তাবতজিয়া ও আচার-আচরণের মাধ্যমেই নিজের মনের ও চিন্তার কথা উক্ত করে না, অধিকন্তু বাধ্য হয়ে ওঠে। এবং আলোচ্য বাধ্যতাই, যা চলচ্চিত্রে তখন আর একটি মহত অভিব্যক্তির মাত্রা বাড়ায়, চ্যাপলিনের চিন্তার অগ্ন-এর আনালা অতীত হতে অপেকাকৃত আরো প্রাঞ্জল করে তোলে।

সবাক চিত্রের এই নতুন অভিব্যক্তির মাত্রাটি হুত হওয়ার আগে পর্যন্ত

চার্লি সাধারণত সাধারণ্যের প্রাত্যহিক জীবনের আশু অভিজ্ঞতার আওতার মধ্যেই তার মানবিকতা ও সমাজ সমালোচনা মূর্ত করতেন; সম্ভবত তাঁর আঙ্গিকে অস্ত্র উপায়ও ছিল না। কিন্তু সবাক মর্ডার টাইমস-এর থেকে তিনি সাধারণ মানুষের আশু অভিজ্ঞতা ও অহুতির সঙ্গে ক্রমে যুক্ত করলেন চিন্তা-অগণ-এর প্রসঙ্গও। অধ্যয়ন ও বর্নন। হিটলারের লঙ্কাকাণ্ডের হুচনার সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য মননের অংশ তাঁর চব্বিতে বুদ্ধি গেলে, আর তারই ভায় পরিচিত ভবঘুরের গ্রেট ডিক্টেটরে বিবর্তন।

অগত্যা না মেনে উপায় নেই যে একাধারে কল-কৌশলের নতুন মাজা যোগে ও যুগপৎ দেশি-বিদেশি ক্যাসীবাদ-বিরোধীর সমবেত উদ্ভোগে, চ্যাপলিনের চৈতন্তে ও আঙ্গিকে সৌর পরিক্রমা ঘটেছিল। তাই ক্যাসীবাদী যুদ্ধের অস্ত্রও চ্যাপলিন আর ভবঘুরের রূপ ঠিক নিলেন না, বা সিটি লাইটসেই প্রায় শেষ। উপরন্তু রূপান্তরিত হলেন মঁসিয়র স্তেচু'তে, যেখানে হারিল্ড ও বেকারীর অহুত্রে তিনি সরাসরি মনতন্ত্রের সমালোচনার অগ্রণী; এবং সে অগ্রণমনে অভিজ্ঞতার আশু পরিমণ্ডলের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত করলেন চিন্তা ও প্রেরণের মাজা। আলোচ্য মাজাই চ্যাপলিনের প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পরিণতির সাক্ষ্য।

আর এই পরিণতির উৎসে যে মৌল মানবিকতাবোধ অবস্থিত, সম্ভবত চ্যাপলিনের প্রতিভা তারই প্রেরণায় ব্যক্তি-মানুষকে ত্যাগ করতে অসমর্থ। কেননা এক ও একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমেই, তাদের নিষ্ঠুর ও সামাজিক প্রহাস ও স্বপ্নেই, শিল্প তার সত্য ধোঁজে, আর সরাসরি সমাজচিত্র আঁকে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব, তার নানান ধারায়। হুতরাং, দেশ ও বিদেশের জল-হাওয়া অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হলে, এবং যখন পর্বত কালের ছায়া চার্লির প্রতিভাকে আবৃত করেনি, সেই সময় তিনি তুললেন তাঁর শেষ মর্মস্পর্শী, গভীর, আত্মর বেচনার আর্জ, ব্যক্তি-প্রতিভার সজোপন জীবনের সহৎ আলোখ্য, ও লাইম লাইট।

তরু দত্ত : আত্মজিজ্ঞাসার ধনধে বাঙালি তরুণী

অনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইকতারতীয় কবিতার প্রতিষ্ঠাময়ী দিশারি তরু দত্তের অকালমৃত্যু (৩০ অগাস্ট ১৮৭৭) বর্তাবর্তই "inheritor of unfulfilled renown" হিসাবে মর্যাদা পায়। তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত কুমিকাবিহীন *A sheaf gleaned in French fields* (১৮৭৬) ভবানীপুরের সাপ্তাহিক প্রেস থেকে মলিন কাগজে অপরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রিত এবং প্রীমডী পোবিলচন্ড্র দত্তকে (তরু দত্তের প্রকৃত নাম কেড্রমনি) উৎসর্গিত। বিবরের আভাস স্পষ্টতর করার তাগিদে তিনি এই অহুবাদকর্মের শুরুতে ক্রিসটফ্‌ ক্রীডরিশ ফন্‌ শিল্যের "Das Maedchen aus der Fremde" (দূরদেশ থেকে এক কুশারীকে) নামীয় কবিতার চতুর্থ স্তবকের প্রথম দুটি শব্দের ("Sie brachtte") সামান্য পরিবর্তনের ("Ich bringe") মাধ্যমে চারটি সারবান পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করলেন স্বকৃত অচ্ছন্দ ইংরেজী তরুজমালমেতঃ : "Ich bringe Blumen mit und Fruechte,/Gereift auf einer andern flur,/In einem andern Sonnenlichte,/ In einer gluecklichern Natur;" I bring some flowers and fruits, / Gathered on another soil, / In another sunlight, / In a happier clime।" ফরাসী কবিতার এই আপাতদৃষ্টিতে প্রায় অপ্রত্যয়ী অহুবাদ-সংকলন কাঁধত পাঠকসমাজে আশাবিহীন আলোড়ন তুলতে অপারগ হয়। সর্বোপরি যবেশের পাঠককূল তো স্থিরনিশ্চয় ছিলেন যে জনৈক

ইউরোপীয় লেখকই তরু দস্ত ছদ্মনামে এই অমূল্যবোধে নিয়োজিত। স্বদেশ আশ্রয় নিজে সর্বত্র উৎসর্গনের পূর্বে তরু পরিচালনের প্রয়াস পেয়েছিলেন প্রতীচীমতানে। তাঁর *Ancient Ballads and legends of Hindusthan* (১৮৮২) নামীয় গ্রন্থে ব্যক্তি অনিবার্য কাব্যমাধ্যমেই প্রকৃতপ্রভাবে প্রথম ভারতাস্থার বাণী সংক্রমিত হয় প্রতীচীমতানে।

বাঙালী তথা ভারতীয়ের অকস্মাৎ ইংরেজী ভাষায় কাব্যচর্চনার প্রসঙ্গে প্রতীচীর প্রাথমিক প্রভাবই দায়ী। গ্রাম্যক সাম্রাজ্যের ওপর বিজয়ী হেল্লালের সাংস্কৃতিক আধিপত্য অথবা অ্যাংলো-স্রাক্ষন ইংল্যান্ডে নরমান-করাসীর প্রাধান্য কিংবা বলা বাহ, গ্রীকচর্চার পুনরুদ্বীপনে ইণ্ডোরোপে মধ্যযুগের অবসান এবং নব্যযুগের সূচনার প্রায় এক প্রতিবন্ধ এই ষেত-বীপের অধিবাসীদের সংস্পর্শে ভারতবর্ষে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রত্যক্ষতর। তৎসম্বন্ধে এক কুটাম্বাস মেলে, টমাস ব্যাংকিংটন ম্যাকলের প্রসিদ্ধ ‘মিনিট’ প্রণয়ন (২ ফেব্রুয়ারি ১৮০৫) তথা ভারতবাসীর রক্তে পাশ্চাত্যশিক্ষা সংক্রমিত হওয়ার পাঁচ বছর পূর্বেই, কানীপ্রসাদের ষোড়-বধন *The shair and other poems* (১৮৩০) উৎসর্গ করেন ভারতের বড়লাট উইলিয়াম হেনরি ক্যান্ডনডিশ বেকিংককে। বলা বাহুল্য, বাঙালী তথা ভারতীয়ের ইংরেজী কাব্যসাধনার পথিকৃৎ কানীপ্রসাদের *Shair* প্রকাশনাকালে রামমোহন রায় স্বদেশেই বিরাজমান এবং যিনি অ্যালিগ্-অ্যাডার ডাকের সঙ্গে সমকালীন ঘটনাবলীর আলোচনাগ্রন্থে নিজেই নাকি বলেছিলেন: “I began to think that something similar [to the European renaissance] might have taken place here in India.”

পাশ্চাত্যচিন্তার সঙ্গে ভারতীয় মননের প্রকৃত পরিচয় ঘটে হিন্দু বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান (অধুনা প্রেসিডেন্সি) কলেজ প্রতিষ্ঠার (২০ জানুয়ারি ১৮১৭, পর। উনিশ শতকের বাঙালী সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই কলেজের স্থান অবিস্মরণীয়। এই বিভাগীর্থে ‘স্রী কলার’ হিসাবে কানীপ্রসাদের ষোড়ধানের (৮ অক্টোবর ১৮২১) ছ বছর পরে, ১৮২৭-এর শেষার্ধেই একদা উক্ত কলেজের পরিদর্শক প্রখ্যাত ভারতবিদ্যাবিং হর্যাল হেম্যান উইলসন ‘desired the Students of the first class to try their hands at poetry’—লিখেছেন কানীপ্রসাদ তাঁর আত্মজীবনীমূলক পত্রে (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪)। বলা বাহুল্য, সত্যীর্থের মধ্যে একমাত্র

কালীপ্রসাদই এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাক্ষ্যলাভে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষকরূপে হেনরি লুইস ডিভিয়ান ডিরোজিও, যিনি প্রতীকী হয়ে ওঠেন আপন স্বতন্ত্র বিদ্রোহে ও নবজন্মে, বোম্বাই (১৮২৬) করেছেন পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানে। আর তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *Poems* প্রকাশিত হয় বংসরান্তে। পরের বছর বেঙ্গোর তাঁর দ্বিতীয় *The fakeer of Jungheera* (১৮২৮)। পঞ্চাশেরে ইংল্যান্ডের সাহিত্য-সমাজ সে সময় ঊচ্ছল্যে উদ্ভাসিত এবং ইংরেজ শিল্পজ্ঞান তখন ভারতপ্রবাসী। প্রাচ্যবিজ্ঞান হিসাবে উইলিয়ম জোনসের সমকক্ষ না হলেও কবিতা রচনায় তাঁর প্রসিদ্ধি সমধিক, শ্রবণ করা যেতে পারে, ওয়াশটন স্কটের হৃদয় ও সহযোগী সেই জন লেডনকে যিনি আস্তা এবং বিশেষত বাংলাদেশের বিখ্যাত ম্যালেরিয়ার মধ্যেও সীমাস্তের সীমার শিখা চৈতন্তে প্রজলিত রেখেছিলেন। কিংবা কলকাতার বিদ্রোহী রেজিনল্ড হীবারের কথায় ধরা যাক যিনি ধর্মসংস্কারকের কঠিন কর্মে নিরত হন প্রায় এক পূর্বদেশীয় প্রাক্তর-দৃষ্টিতে, একাধারে কবি ও উদ্ভাসী পর্যটক। এবং হেনরি মেরেডিথ পার্কীর *The draught of immortality* (১৮২৩) প্রকাশের অনেককাল পরেও পাঠককে পরিতুষ্ট করেছেন তাঁর চৌকস মননশীলতার, বহুমুখী প্রতিভার আশ্চর্য চমকে।

The shair কার্ভ কালীপ্রসাদের এক দীর্ঘ আখ্যানকাব্য এবং বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে গীতিকবিতার সংকলন। কৃতবিদ্য ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনকে প্রবল প্রশংসা সত্ত্বেও কালীপ্রসাদের কাব্যসাধনার ক্লাস্তিকর নীতিজ্ঞান, নিসর্গবর্ণনার গভীরপতিকতা বা প্রায়শই সংকুত, বাংলা অথবা আঠার শতকী ইংরেজী কবিতার প্রকটিত, পাঠককে পীড়িত করে; কচিং মেলে উপমা-উৎপ্রেক্ষার উজ্জল আভা। আপন কাব্যগ্রন্থগত প্রসঙ্গে এক দীর্ঘ প্রতিবেদনের শেষে কালীপ্রসাদ লিখেছেন : "In the month of September, 1830, I published my 'Shair and other Poems', which I now find ought not to have gone to press. They not only abound in repetitions, but also in a great many grammatical inaccuracies!" এবং সচেতনতা সত্ত্বেও কিছু কালীপ্রসাদের পক্ষে বাংলায় লেখা জুগায। কারণ তাঁর ভাষায় : "I have composed songs in Bengali, but the greatest portion of my writings

in verse is in English. *I have always found it easier to express my sentiments in that language than in Bengali*" (Italics বর্তমান লেখকের)। অগ্রসরের অসম্মতিই বটে।

কালীপ্রসাদের পর আমাদের রেনেসাঁসের শক্তিশ্বর, রিচার্ডসন সাহেবের সৌন্দর্য ও শুভাকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রমত্ত কবিত্রেরণাকে প্রাণিত করেছিল সেই “নিঃসঙ্গ গানে-পাওয়া মাহুবা” মাইকেল মধুসূদন দত্তের *The Captive Ladie* (১৮৪২) প্রণয়ন নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। মাইকেল রোমান্টিক আদর্শেরই অধিকতর অমুগ্ধতা হন। প্রকৃতিবর্ণনে প্রাধান্য উচ্চারণ আদৌ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। সর্বোপরি ছন্দপতনের দৌরাণ্ডে কদাচ কালীপ্রসাদের মতো তাঁকে ছন্দশাস্ত্রের সন্ধানে নাজেহাল হতে হয়নি। তৎসঙ্গেও এ সত্য তো সর্বজনবিদিত যে আজিক শৌর্য এবং স্বচ্ছন্দ মিলটন অমুকৃতি ব্যতিরেকে তাঁর রচিত ইংরেজি কবিতা কখনো উত্তরিত হয়েছে মধ্য-মাত্রার উদ্দেশে।

মধুসূদনের আংশিক সাক্ষ্য সম্ভবত রামবাগানের সেই বিস্ময়কর দত্ত পরিবারকে প্রাণনা বোঁগাব। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে গোবিন্দচন্দ্র দত্ত সপরিবারে ইওরোপে বান। দক্ষিণ ফ্রান্সে কয়েক মাস কাটিয়ে তাঁরা গেলেন “বিশ্বের রাজধানী” পারিতে। আর বেশ কিছুকাল পারিতে বসবাসের পর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তে বুলোঞ্জের পথে তাঁরা ইংল্যান্ডের দিকে পাড়ি জমান। ইওরোপের একাধিক বনামদত্ত ব্যক্তির সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের পরিবারের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। প্রমত্ত ভিক্টর মারি উগোর সূত্র, অ্যাফ্রিচস্‌র এবং উইলিয়ম শেকসপিয়ার অমুগ্ধাঙ্ক, শেভালিএ দ্‌ শাতল্যঁর সঙ্গে দত্ত পরিবারের পজবিনিময় তথা সৌহার্দের কথা স্মর্তব্য। *The Dutt family album* (১৮৭০)-এ সংকলিত প্রায় দু’শ কবিতার বেশীর ভাগই গোবিন্দচন্দ্রের প্রাতুসুদ্র, অর্মান ও করাসীস ভাবার ওয়াকিফ-হাল উমেশচন্দ্রের বাঁর “The Hindu wife to her husband” নামীয় কবিতাটি দ্‌ শাতল্যঁ কতৃক করাসীসে অনূদিত হয়; অপর তিনজন হলেন গোবিন্দচন্দ্র (কবিতার সংখ্যা ছেবটি), গিরিশচন্দ্র ও হরচন্দ্র। ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক কবিকল্পনার ওয়ালটর ডট এবং লর্ড বাইরনের প্রভাব প্রত্যক্ষতর হলেও বলা যায়, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, ছন্দের আচ্ছন্দ্য এবং ভাবাগত অবহিতিতে এই সংকলনের কিছু কবিতা আজও ঐশ্বর্য্যাক্য জাগায়। *The Bengal Magazine*-এর নিয়মিত লেখক হরচন্দ্র

Fugitive Pieces (১৮৮১) কবিতাশৃঙ্খলের অধিকাংশই বিশ বছর পরে নুতন কলেবরে *Lotus leaves* প্রকাশিত হয়। আর চিরায়ত সাহিত্যালুয়ারাষ্ট্র এক সংস্কৃতিবান সামাজিক যিনি সম্বীক ফরাসীচর্চা ব্যতিরেকে মূল জার্মান-শিল্পার পাঠ করেছিলেন সেই গিরিশচন্দ্রের *Cherry blossoms* (১৮৮৭)-এ নানান ভাবনা বিচিহ্নরীতিতে চিত্রিত হলেও সনিটের দার্ঢ্যময় আঙ্গিকে আপন স্বাতন্ত্র্য সমুদ্ভূত। প্রসঙ্গত দত্ত পরিবারের একজন পরিমিত পুরুষ যিনি আয়ত্ব্য বিভাচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন, শিশুচন্দ্রের *A vision of Sumeru and other poems* (১৮৭৮) প্রকাশনার বিষয়টিও উল্লেখ্য।

উপযুক্ত কবিকুল কতৃক প্রবর্তিত ঐতিহ্যের অবদান তথা নুতনতর চিন্তনে ইচ্ছাকৃতীয় কাব্যপ্রয়াসকে প্রাণিত করার গৌরবময় সূচনা ধীর অতি দ্রুত, বিবর জীবনে সম্ভাবিত হয়, কলকাতার সেই অনামধস্তা হিন্দু তরুণী, “বান্ এ সেলেব্‌র অ্যাঙ্ক্‌ ড কাল্‌কুত্‌রা” তরুর কবিকল্পনা কার্ণত মুক্তি পেয়েছিল সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসীস, জার্মান প্রভৃতি সাহিত্যের স্বাস্থ্যবান চিত্রকল্পেব আমদানিতে। তেরো বছর বয়সে তরু নিসের এক প্যাসিফিঁনাতে পাঠগ্রহণ করেন। প্রতিভার প্রকৃতি নির্ধারণ বর্ষার্থই অসাধ্যসাধন। ইওরোপে মাত্র চার বছর কাটিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় বিশ্বব্ধকর প্রবেশের পর ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে পোবিলচন্দ্রের পৌরবিত্ত কন্যা তরু স্বদেশে ফিরলেন। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে ফরাসীস কবিতার তিনি যে অল্পবাদ শুরু করেন, *The Bengal Magazine* (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ থেকে ১৮৭৭-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)-এ ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশিত হয়। তাঁর *Sheaf*-এ টীকাসমেত প্রায় ছুশ ফরাসীস কবিতার ইংরেজি তরজমা ঠাই পায়। এই অল্পবাদ-সংকলনটির একটি বৈশিষ্ট্য হল—তুধ্বাজ শক্তিধর স্রষ্টারাই তরুকে বিশ্বদ্বারিত করেননি, বহু মাটো কবিকেও তিনি সমান উৎসাহে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বোড়শ কোআর্ডা ছা বেয়ে এবং গিয়ান্‌ দ্‌ সালুজ্‌ ছা বার্তা, সতের শতকের পিয়ের কনেই এবং পোল্‌ কার্‌ এবং আঠার শতকের এভারিস্ত্‌-দেজিয়ে দ্‌ পার্নি, জঁ-পিয়ের ক্লারি দ্‌ ক্লোয়ির্‌ এবং আঁদ্রে শেনিয়ে ব্যতীত বৃহত্তর অর্ধে উনিশ শতকের ফরাসী রোম্যান্টিক কবিরাই কার্ণত তরুর মনোহরণ করেন। ভিক্তর উগোয় ত্রিশটি কবিতা *Sheaf*-এ মনোনীত হয় অভাবতই। স্খ্যাত কবিকুলের মধ্যে অন্তঃপর নাম করা যায়—

আল্ফ্রেস দ্য ল্যামার্তিন আল্ফ্রেস দ্য ভিফি, জেরার দ্য নেভাল, আলফ্রেস দ্য মুসে, তেওফিল গোটিয়ে, লেক্য দ্য লিল, শার্ল বোদল্যের প্রমুখের। প্রসঙ্গত বলা চলে যে মূল্যহীন অমূল্যবোধের তত্ত্বের তুলনায় তরুর নির্বাচনপ্রক্রিয়া বিক্ষিপ্ত। তাঁর এই অমূল্যবোধ-সংকলন বর্ধাৎই যুগপৎ শক্তিমত্তা ও দৌর্বল্যের এক আশ্চর্য সমন্বয়। সমগ্রভাবে অবশ্য তরুর তরুণ্যের মনশীলনাই স্পষ্টতর। তৎসত্ত্বেও তাঁর এই অমূল্যবোধকর্ম, পূর্বেই বলা হয়েছে, পাঠকসমাজে প্রত্যাশিত প্রশংসালোভে অসমর্থ হয়। ভাগ্যক্রমে Sheaf শেবাবিষি ছজন স্বদেশীয় ইংরাজীয়া কাব্যবিবেচকের হাতে গিয়ে পৌঁছয়। এড্‌ম্যান্ড্‌ গস্‌ এবং আঁজ্রে তারিয়ে (বাঁর তিনটি কবিতা এই অমূল্যবোধ-সংকলনে ঠাই পায়) বর্ধাক্রমে *The Examiner* (২৬ অগাস্ট ১৮৭৬) এবং *Revue des Deux Mondes* (১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭)-এ তরুর তরিক আনান।

সর্বোপরি প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ গার্সিয়া দ্য তাসি থেকে ভারতের বড়লাট কবি লর্ড লিটন পর্যন্ত সকলেই বেকালে ছিলেন তরুর প্রশংসার পক্ষমুখ তাই গোবিন্দচন্দ্র তাঁর গুণবতী কস্তার (অকালমৃত্যুর অব্যবহিত পরেই) পান্ডুলিপি-গুলি পরীক্ষণে যত্ববান হন। ফরাসীতে লেখা তরুর সম্পূর্ণ উপন্যাস *Le journal de Mademoiselle d'Arvers* (শ্রীমতী আরভার দিনপঞ্জী) নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ আবিষ্কার, কিন্তু অপ্রকাশিত পান্ডুলিপির মধ্যে মিলল কং দ্য গ্রাম্যর বেশ কিছুসংখ্যক সনিটের ইংরেজি অমূল্যবোধ বাতিরেকে মৌল এক অসম্পূর্ণ উপন্যাসের আটটি অধ্যায়।

তরুর শেষোক্ত ইংরেজি উপন্যাস *Bianca, or the young Spanish maiden* গোবিন্দচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত পাদটীকাসহিত *The Bengal Magazine* (আহুয়ারি-এপ্রিল ১৮৭৮)-এ প্রকাশিত হয়। সমকালীন পাঠকের কাছে *Bianca*-র আধ্যানবস্তু এবং আঙ্গিক অত্যন্ত সাদাসিধে ঠেকবে। আর তরুর এ-উপন্যাসেও মেলে অনেক অসঙ্গতি। তৎসত্ত্বেও তাঁর আপন জীবনের নৈসর্গ্য এবং পারিবারিক দুর্বিপাকের কিছু মর্মস্পর্শ ছবি এ-রচনাতেও বর্তমান।

তরুর *Le journal de Mademoiselle d'Arvers* ক্লারিস্‌ বাহ্যার মুখবন্ধসহ পাঁচ থেকে প্রকাশিত হয় (১৮৭৯)। তাঁর এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুও রোমান্টিক এবং কাব্যময়, কার্যত এক নিম্নাঙ্গ প্রেমের আবৃত্তিতে আত্মসিদ্ধ। প্রচুর করণ জীবনের কবিতুলভ আত্মচিহ্ন প্রায়শ পাঠকের

চেতনার প্রতিবিম্বিত হয়। এবং সেক্ষেত্রে লেখিকার জীবন ও অভিজ্ঞতার অগভীরতার অবেষণ অপেক্ষা সংবেদনশীল পাঠকের পক্ষে বেদনাতুর হওয়াই স্বাভাবিক।

তরুর *Ancient ballads and legends of Hindusthan* (১৮৮২)-এ ভারত মাহাত্ম্য কীর্তনই একমাত্র আকর্ষণ নহ, ব্যক্তিগত অহুসনের আক্রমণ পাঠকচৈতন্ত্রে অনিবার্হ। গ্রন্থটির প্রথমার্ধে সংবলিত নটি প্রাচীন গাথা স্কলত তরুর সংস্কৃতচর্চার ফসল। অবশ্য আপন অভিজ্ঞতা ও বিম্বতার সমন্বয়ে তিনি অতীতের আখ্যান বর্ণনায় যুক্ত করেন বিবয়গত বিশ্লেষণে কিঞ্চিৎ তির্যতর প্রেক্ষিত। এ বিষয়ে তাঁর প্রাথমিক প্রয়াস বিষ্ণু পুরাণ অবলম্বনে লেখা “The legend of Dhruva” এবং “The Royal ascetic and the hind” নামীয় গাথাষয়ে আভাবিত। অতঃপর মহাভারতের আখ্যান অঙ্কুরণে তরুর “Savitri” অধিকতর সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ এবং ব্যাখ্যানে কিঞ্চিৎ মৌলিকতার দাবিও স্বাভাবিক। শৈশবে মায়ের মুখে শোনা স্বদেশের অপর প্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্কলন স্মৃতি তরুর “Sita”-র অহুস্যত। তাঁর স্মখ্যাত “Jogadhya Uma”-র উৎসমুখ অবশ্য লোকস্রুতি। পুজারীর বাড়ি বোঝাতে ‘manse’ কথাটির ব্যবহারে বহিঃ শ্বেতশীপের আবহাই আবর্তিত, তৎসঙ্গেও কীরগ্রামের চমকপ্রদ চিত্রণে তরুর মুনশীমানা প্রশংসনীয়। আব এই গ্রন্থের শেষার্ধে সংকলিত সাতটি মৌল কবিতায় তরুর ঐর্ষ ও তাৎপর্য প্রত্যক্ষতর। বস্তুত “Baugmaree” কিংবা “Our casuarina tree”-য়ত তাঁর নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে পরিণত পর্যায়ের। প্রথমোক্তে বর্ণিত বাগানবাড়ির অকৃত্রিম ও অনবদ্য ছবি আজও আমাদের আকর্ষক।

“A sea of foliage girds our garden round,
But not a sea of dull unvaried green,
Sharp contrasts of all colours here are seen—
The light green graceful tamarinds abound,
Amid the mango-clumps profound
The palms arise like pillars grey between
And o’er the quiet pools the seemuls lean
Red,—red, and startling like a trumpet’s sound.
But nothing can be lovelier than the ranges

Of bamboos to the eastward, when the moon
 Looks through the gaps, and the white lotus changes-
 Into a cup of silver. One might swoon
 Drunken with beauty, then, or gaze and gaze
 On a primeval Eden, in amaze."

তরুকে এই সাপুষ্কো কিংবা এমিলি ব্রন্টির সমগোত্র ভাবান্ত আদৌ
 অর্থোক্তিক নয়। এইচ. এ. এল. কিশোর যথার্থই বলেছেন: "This child
 of the green valley of the Ganges has by sheer force of
 native genius earned for herself the right to be enrolled
 in the great fellowship of English poets."

কজরালি হেঁটে যায়

আবুবকর সিদ্দিক

এক

কজরালি হেঁটে যায় জাঁচ ঠুকে...ঠক ঠক...ঠক ঠক। পাহাড়ের গায়ে তার শব্দ হয়...ঠক ঠক...ঠক ঠক। কজরালি হেঁটে যায় ঈতরাতে পাহাড়ের এই ধারে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডে হিম নামে। কুয়াশা জড়িয়ে রাখে পথের ধা। ঢাড়া রোপা ঘিনের মত কজরালি প্রকৃতির অন্তে অন্তে চোখ কেলে একা একা হেঁটে যায় শেষ রাতে।

দুই

পাহাড়ের বিপরীতে ওই ধারে ডিঙ ডঙ ঘটা বাজে শ্রাওলাঘরা গির্জায়। সন্ধ্যার লাগলাগি। আমীরনের কচিকালো ছাইকালো কালিকালো ছাগলগুলো কান নাবিরে ঘরে ফেরে। ঐ ধারে জনপদ ও অটিলতা আছে। যুগ যুগ চর্চা ও সাধ। ক্রিয়াকান্ত কোলাহল পঞ্চমুখী নাগ। স্বত্বতে স্বত্বতে খোসা ছাড়ে। পাহাড়ের ওই ধারে গুলো ওড়াউড়ি পারম্পরিক খুঁড়ে। আর মেঘেরা শব্দ বরাবর মশলা টশলা বেঁটে পাঠা ধুয়ে মুছে ধাড়া করে রাখে। বিপরীত ধারে।

তিন

পাহাড়ের ওই ধাবে মলংগী মাস্টার, কীনা ছাতার নেশারে বাপ। কোলকাতার থেকে ব্যাঘিটাকে বাঘিয়ে আনল হায়, শিকারের খোঁজে সারারাত চুঁড়ে ফেরে গাঁওখান। শফি দুধআলার বউ, হাক কামারের বোন, কজরালির মা, কোড়লঠাকুরের মেয়ে...উধাও হয়ে বাঘ। মলংগীরদল অন্ধকারে রাইফেল

নিরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে অন্ধকার ঘুমঘুটি অন্ধকার জমে উঠে। মলংগী মাষ্টার কবে লড়াই করেছিল দেশের দুশমনদের বিরুদ্ধে। আজও তার পাওনা মেটে না। ডিলারশিপ, লাইসেন্স, চেয়ারম্যানগিরি, কনস্ট্রাক্টরি, এবং মলংগী মাষ্টার গরীবের মা-বাপ।

চার

ভোরের পূর্ব আগার আগে গ্রাম জেগে ওঠে হুশহাশ আহাদালি মুন্সির আত্মানে। তখন গোয়ালঘর থেকে ধানক্ষেতের নাবাল পর্বত সাড়া লাগে... হেই ছাট...চ্চুচ্চু ছাট... ছাট...। - করর গোলল সেয়ে এসে বউঝিরা আলোচালের আউ তুলে দেবার দিক করে। দক্ষিণভাঙা থেকে উকিলদি বুড়োর উৎকাল পীঅর ভেঙে ভেঙে উঠে আকাশের লিলে রঙা পাতের গায়ে গিয়ে ঘা লাগায় ঠনঠন। আন্তে আন্তে পূর্বের রাগ ধরে। ত এই সময়ে পশ্চিমের গাউকুল থেকে আগুয়ায় শোনা যায়...বুম বুম...জমির কানায় কানায় পানি, পানি ছাড়িয়ে আধহাত উঁচু আউশের শিখ, এইরকম একাকার, সবুজ জলার সন শুমরে শুমরে আগুয়ায়গুলো দেখে আসে, এসে কেটে পড়ে লম্বা ঘুমভাঙা আচার ব্যবহারের উপর। ওরা এবারে শুধু লুটতরাঙ্কের লোভে আসেনি। 'দুহুতকারী'কে শিকার দিতে এসেছে। মলংগী মাষ্টার গাঁয়ের উঠতি বয়সের ছেলেদের কুমড়র দিয়ে দেশের বাইরে পাঠায় ট্রেনিং নিতে। জোতদার মহাজনদের গলা কাটে। অন্নপাতি হাতিয়ে নেয়। বলে দেশ স্বাধীন করবে।

বেয়াদপটীকে শিকার দেবার অস্ত্রে রাত ভোরেই এস. এম. জি. বি নট বি জ্যাগার, লাঠিসোটা সব নেমে পড়েছে। পুরো দলটার মধ্যে মেশাল চুকে গেছে নানা রঙের। বালুচ পাঠান বিহারী বাঙালি শহরে গাঁওয়ালি আনছার শান্তিকমিটি। মরদেহরা পাথের জোরে ছুটে পালায় খালবিল ডিঙিয়ে। বউবিটরা ছানাপোন। বৃকে কাঁখে লুকিয়ে নিয়ে কামলা কিবানের পিছু পিছু পাহুয়ায়ের জোলাষ বাঁধা ডোঙা ডিঙিতে গিয়ে উঠে। বুড়ো বুড়িরা মটকা মেয়ে সিঁটকি দিয়ে পোতা আগলে মরে পড়ে থাকে।

ফজরালিরা কিরে আসে বেলাবেলি। আধমরা গ্রামের ভাঙাচোরা পোড়া ছাড়া শুপ পেরিয়ে। গেরতের পোবা হাঁসের খ্যাংলানো লাল শাখা পালক মাড়িয়ে। আর্জানেরা তিন বাপবাটা কাছারি ঘরের সামনে লাইন দিয়ে শুয়ে আছে। আর্জানের মাথার খাপরি তিন হাত দূরে কলাগাছের বাড়ে।

রঙা বিলু ছিটকে ছিটিয়ে কচুপাতার মুখো ঘাসে। মাছি মিশে গেছে চটচটে পিণ্ডলোতে। গ্যাবার বউ পগারের পাড়ে হাণ্ডাবনের মধ্যে। বোনি কাড়া। মলংগী মাস্টারের টিনের ঘর পুড়িয়ে গুড়িয়ে দিয়ে গেছে। সৈয়দ ভাকুরার মটর সাইকেল জুড়ে পড়ে আছে তেমাধার বটতলায়। অপরাধ, তালি আটকানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। চাবিটা মেলেনি লুটের মাধায়। মালিক ট্যাকে গুঁজে নিয়ে ভেগেছে।

কৃষ্ণপক রাতের এত চমৎকার নিরাপদ অন্ধকার। সারা গ্রাম আরো কালো অন্ধকারের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। শব্দ করে শোক তুলবে, সে জোর বা সাহসটুকু নেই। শেষরাতে কাজরালি বেড়ার পায়ে এসে ডাক দেয়, মা। মা ত জেপে বসে। আঁধা বাছা। না—না—দোর খুলো না, শোনো। আমি বাই। কোথা—কোথারে বাপ ফকু? মলংগী মাস্টার সায়েবের সাথে। কখন কিরে আসবি ঘন? যখন বেশ আধীন করতে পারব। আনো মা, ছোমেদ আজ গ্যাবার বউয়ের ইচ্ছা মেরেছে। নিজের হাতে মাস্টার সায়েবের চালায় কেরোসিন টেলে বেশলাই জ্বলে দিয়েছে। তোমাকে নিয়ে ভয় মা। মা কথা বলতে বলতে দরোজা খুলে দেয়, আমার কি ভয় বাপ? গরিবের গরিব নাড় মাহুয। জুমুটো ছুটলো ত দিন পেল। তবু একটু হুঁশে থেকো মাগো। সাবাস মলিক পিস কমিটির মেম্বর। সেদিনও পাঁচায় মাকে পাঠালো তোমার জন্তে। তুই দেশের কাজে বা বাজান। সিথানে ষ্টি আছে আর মাধার পরে আত্মারহিম। মাগো দোয়া করো। কৃষ্ণোপকী ডাক পাড়ে। আত্মা কও বাপ। রহুলের নাম লও।

গাঁচ

মাছাতা আমলের গ্রাম। ঢেউ আগে না। ভিত নড়ে না। সেই কবে বগীরা টিলটি ছুঁড়েছিল। মজাপুকুরের কচুপাতায়ে তা মিইয়ে গেছে। মাঝে মাঝে যাওয়া টোল ধায় আবহমান কালের হেথা হোথা, তাও সবসময় অন্তে হেজে মজে ভরাট হয়ে আসে।

এতকাল পরে আবার গানবোট এল এম জি-র আওরাতে ভীষণ ধাক্কা

খায় ভাঙলা অম্বা সর। তলাকার পাক ঘুলিবে উঠে চারমিকের জনপদে
খুবড়ে পড়ে। কেঁপে যায় ছবিছুরতের মাপজোখ।

হয়

কল্লরালির বর্ষাকাল বুঝি ক্যাম্পেই পচে যায়। তিনমাসের শর্ট ট্রেনিং শেষ
হয়ে হার। একে একে সবাই চলে যায় ক্রস্টে। কল্লরালি কুমরত করঅন্দ
আছির বছির তিন তাই ও আরো আটজন আটকা পড়ে থাকে ক্যাম্পে।
কলার পাতা ভেদ করে কেঁচো বির বির করে উঠে আসে ঝোল মাথা ভাতে।
পায়ের ছ আঙুলের ফাঁকে শাদা হাজায় চীনে জেকে চুমটি বসিয়ে পিরীত
করে। হাতের মধ্যে রাইকেলের বাঁট ঘেমে ওঠে। তারো চেয়ে গরম হয়ে
ওঠে হিলহিলে ঢাড়া দেহটা। কত রকমের আগুনের ভাপে সেছ হতে
থাকে খড়ের বিছানার শুয়ে, নিজেই অস্ত্র পায় না। মা বলেছিল ছবেদ
খটককে, ব্যাটার মাথা ঘরের চৌকাঠ ছোঁয়। কনে দেখো। আরেস
কাপ্তানে বে দেবো। মা আমার কত দুঃখিনী! আমি মরল ত আর বিয়েই
বল না। আহা অমন আলো করা রূপ। উপোসে অভাবেও ঘর ভরে জলে।
মা তোর মুখখান বেন ঠিক ঠিক মনে আসে না আর। সেই মাদারতলার
ডুইটার কথা মনে পড়ে বড়। তুই উবু হয়ে শাক তুলে তুলে কৌচড়
ভরতিস। কি আমাদের গাঁওখানরে। পাছাপানি খাই। ছিলে যুড়ি
ওড়াই। খোর বাটে ইট কাটি। রাত্তিরে গাজীর গীত গাই। চেয়ারম্যানে
লোক্যাল বোর্ডের রাত্তা মেদারতের টাকা নারলে সাইকেল থেকে ধরে
নামিরে ওঁতোই। এ দেশ কি ছনিয়া তাহানে আর ছটো মেলে? আহা!
কি তার মাঠপাড়ি বেয়া লীলুয়া বাও! কি তার গাছ গাছালির ছায়া!
কি তার পাখ পাখালির বোল!...কত আর অল্প দেখা যায়। অল্প ত
মিছেরিছি ভোগার পোড়ায় শুধু। আশ মেটায় না। অল্পবর কল্লরালি
বেপরোয়া হয়ে মলংগী মাষ্টারকে ধোঁজ করতে থাকে। কোথায় বে
থাকে লোকটা। নাগাল পাওয়া যায়। দেশের কাজে দিনরাত ব্যস্ত।
আজ শহরে, কাল ক্রস্টে। এই আছে, এই নেই। এ্যাতোও বাটতে পারে
মাছুবটা। পাঁচদিন ঘুরে ঘুরে শেষে একদিন না বলেকরে চুকেই পড়ল
গেটের মধ্যে ঘিয়ে। ঠিক যে অশময় তা নয়। ছপরের খাওয়া যাওয়ার পাট
চুকে গেছে। একটুখানি কচি আভায় নেদাপতি ডুড়ি পজিয়েছে এখানে
এসে। সেটাকে আলগোছে বেতের চেয়ারে নাবিরে দিবে মলংগী মাষ্টার

ভাতঘুসের আয়োজন করছিল। দেশের পান্নার পড়ে অনিয়মে অবস্থে বাবরি আর দাড়িও পান্না দিয়ে গজিয়েছে। একটা ঘাড়খাটো চুল এলানো মেয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে বাবরির ভেতর আলতো করে চিকনি চালিয়ে দিচ্ছে। একে বলে খেছাসেবিকা।

মাশ্‌সারেব! মাশ্‌সারেব!

পর পর দুই ডাকে চোখ খুলে গেল মলংগীর। আরে আমাদের কজু মিয়া বে। বোলো। বসে পড়ো ঐ চৌকীর উপরে। থবর বলো।

আমাকে কাইটিগে বাবার পারমিট দেন সার। না হয়ত রাইকেল আইকেল জমা নিয়া লেন। সব শুনে টুনে মলংগীর ধারণা হল, ছেলেটা নেহাত হোম সিকনেসে ভুগছে। বুকে বাবার অঙ্কুরাতে বাড়ি বেতে চায়। পরিবেশটাকে হালকা করার জন্তে বলল, দেশের মাটি টানছে বুঝি?

তাই সার। রোজ রাতে মাকে অন্ন দেখছি। বেচে নেই মনে হয়। ও হয় কিছুদিন নতুন নতুন। সব্ব করো। তারপর মলংগী মাষ্টার খাড়া হয়ে বসে একটা মেঠো ভাষণ বেড়ে দিল। এমনি অভ্যাস। রাইকের ডাঙা শামিয়ানা গোপান করতালি সব্ব কিছু অদৃষ্টে এসে যায় আর পজিশন করে নিল। কখনো বিদ্রোহী কখনো কাঁদুনে গলা। চণ্ডা ভাষণটা এক-সময় কুরিয়ে এল। অয় বাঙলা।

দীর্ঘনিশ্বাসে ফাকা গলা থেকে উচ্চারণ বেকল মোহিত কজরালির, জয়বাঙলা।

এক নিশ্বাসে গড় গড় করে মলংগী বলে গেল, এখন ক্যাম্পে কিরে সিরে রেস্ট নাও, কজু ভেরি বিজি আমি মালতীকে পাঠিয়ে দিয়োতো। কজু কাছে বুঝলে বর্ণা জয়বাঙলা।

চৌকাঠেব নিচের এসে মাথাটা আবার নোয়াতে হয় চাঙা কজরালিকে। মানিক কম্বাওয়ারের বাড়ি ওদের পাশের গাঁয়ে। কানের কাছে মুখ এনে শুভ শুভ করে বলল, মানিক মাষ্টার, বুঝলেহে? ক্রস্টে বাবে? কাইট করবে টাছ? কিফ্‌টি রুশীজ। হাক বাবে এম পি এ সাহেবের এ্যাকাউন্টে। হাকটা মাষ্টার সাহেবের। টাকা ফেলো। বর্ডার ক্রসের পারমিট কোনো।

P, 5572

আরুণ হয়ে গেল কজরালি। পরদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত মড়ার মত পড়ে রইল ক্যাম্পে। মালতী নামের খেছাসেবিকা মেয়েটি গর ক্লান্তি হরণ করতে এসে

সাদা না পেয়ে পেয়ে নিজেই ক্রান্ত হয়ে ফিরে চলে গেল। পঞ্চাশটা টাকা। কি সম্পত্তি আছে, বার বহলে পঞ্চাশ টাকার পারমিট জোটানো যায়? দেশে ত বেতেই হবে। আর কাছে না গেলে নয়। কুহরত করজম্ম আছির বছির তছির ওরা সব ভারি মত অভাগা। পারমিট মেলেনি। এখানে আটকে আছে। এইভাবে উদ্যম ও বিবিস্বের অভাবে ফজরাণি পংশই হয়ে বেত। মালতী নামে মেয়েটির শরীর থেকে একদিন তাপ নিতে হল তাকে। আপাতত বেঁচে গেল।

শরৎ কালের শুরুতে আবার একনাগাড়ে কদিন কড়া ট্রেনিং চলল। অন্ত্রানে রাইকেলের স্ট্র্যাপে ডানা গুলিয়ে ওরা গোটা প্লাটুন ফাইল আপে দাঁড়াল। বিনা ফি-তেই ছাড়পত্র দেয়া হল তাড়াহুড়ো করে। বর্ডারের ছুঁমাইল দূর থেকে শুরু হল অপারেশন।

শীতের রাতে অন্ধকার ঘমে উঠতে থাকে। এত অমার্ত ভারি, মনে হয় বেন পিঠ পেতে দাঁড়িয়ে। ফজরাণি বেয়নেটের কসা ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দেয়। দ্বিবে ক্রসের মতো টান মারে। সরাসরি মন্ত একটা ঢাঁডাকাটা হয়ে যায়। বুঝি ফালা হয়ে যায় কালো রাত। অলপাই পাতা থেকে টুপটাপ শিশির ঝরে পড়ে ওর কপালে তিলক এঁকে দেয়। বলে, অর বাঙলা! হাত্ভিয়ার বাগিয়ে অস্থপ পানে ক্রুকে বর্ডার লাইনের দিকে এসিয়ে যায় আধীনতায় বোকা। হাঁটু পর্বন্ত হাবড় কাদা ভেঙে ভেঙে।

সাত

পাহাড়ের এই ঘায়ে ফজরাণি হেঁটে যায়। মার্চ করে। বেয়নেট বাগিয়ে ছুচোখে হুনী জেলে। তরাই এলাকার ঘাস মরে যায়। কোথাও বাদামী। কোথাও বীভৎস পাণ্ডটে সবুজ। শাল বহুদা স্রাড়া হয়। ওরা পাতা মাড়িয়ে ঘোরকরম আশুহাজ'''মচামচ'''মচামচ। স্ট্র্যাপের টানে থাকি পার্ট ডান কাঁধেব নিচে কুলে কেসে গেছে। থাকি প্যান্টটা মাপে খাটো হয়ে গিয়েছে। ভেতর থেকে একটা মাত্র সিমেন্টরঙা ঠ্যাঙের নলটা বেরিয়ে আছে। অস্ত্র পায়ের প্যান্ট হাঁটু থেকে কুলছে স্রাত স্রাত করে কাঁকা কাঁপা। পাহাড়ি বরগার শরীরে অস্থির ব্যস্ততা। কখনো বা তার উচ্ছল পতন ছাপিয়ে ছোটো খাটো ধনি কোটে। ফজরাণির চোখ জেলে ওঠে। বেয়নেট পাতিয়ে পজিগন নেয়...হলুট। একটা কাঠঠোকরা উড়ে যায়। বা হুল্লর শেষাল ছুটে পালায়। পায়ের ঘায়ে পাথরের চুকরো পড়িয়ে পড়ে। ফজরাণির ছুচোখ আবার

সোজা হয়ে আসে। হাতের অঙ্গ আবার পুরনো ভারে ঝুঁকে পড়ে।
 কাচের শব্দ হয় ঠকঠক...ঠকঠক...ফজরালি বুক চিরে ডাক দেয়...
 মা...মাপো...। স্বরণীর জল ছড়ি বাজিয়ে নেমে যেতে যেতে বলে...দূরে
দূরে...আরো দূরে...।

আট

পাহাড়ের বিপরীতে ওই ধারে জীবনের ছেঁড়াকাটা চালচিহ্ন জোড়া লেগে
 আসে। জেল থেকে বেরিয়ে ছোমের রাজাকার কিছুদিন পা চাকা দিয়ে
 থাকার পর ওরাপথায় কনট্রাইটরি শুরু করে দেয়। মলংগী মাস্টার সি এণ্ড বি-
 তে নাম এনলিস্ট করায়। অপারেশন আয়ো চলে সমানে। আগে চালাত
 ছোমের রাজাকারের পাটি। এখন মলংগী মাস্টারের পাটি। ওরা খুঁজত
 'হুজুতকারী'। এরা ধোঁজে 'কোলাবরেটর'। মাস্টার ডেকে বলে, হয় দলে
 ভেড়ো না হয়ত অস্ত্র অমা দাও সরকারী মালখানায়। ফজরালি হুংকার
 ছেড়ে ধাওয়া করে। সেইরাতে ওরা অস্ত্রকারে এসে বাড়ি দিয়ে ফেলে।
 ফাহুর ফুহুর শুনে মা ওকে চৌকীঘরের পেছনদিক দিয়ে সরিয়ে দেয়। সেই
 থেকে ফজরালি রাতে আর বাড়ি শোয় না। এ বাড়ির ও বাড়ির মাচার নয়ত
 বাগানে বলে রাত কাটায়।

নয়

পাহাড়ের এই ধারে আধাঘুমের রাত তাও কাটে। কেটে অলস রক্তুর
 চোখ চায়। প্রাচীন শালগাছ নিচু পানে তাকিয়ে দেখে তার অটল শিকড়ে
 মাথা রেখে ফজরালি তখনো ঘুমিয়ে। বগডালের প্যাচাটাকে ভাল নেড়ে
 লজাগ করে দেয়। প্যাচার ভারি ডাকে ফজরালির হাত তড়িৎপড়ি আধখসা
 রাইক্কেলে চলে যায়...হলুই। আরো সব অলস্ট কথা। বিড়বিড় করে
 বকে যায়। কতকগুলো নাম। কিছু আধা উচ্চারিত সংলাপ।...মাস্টার...
 কতম...মানিক...তোয় বাপ...বাপকে চিনিসনে...মা তোয় এত রূপ কেন...
 হলুই...খোস...ল্যাংড়া হাঁটে লেঙচে লেঙচে...।

কি যে হয় ফজরালির। মাঝে মাঝে আচমকা খাপা ভালকুতার মতো
 লাঞ্ছিত ওঠে। কখনো ঘোলায় আটকে পড়া নৌকোর মত হটকট করে
 কাপতে থাকে। ছোটো ঘটনায়, পুরো নয় হেঁড়া হেঁড়া ছবি চেয়া চেয়া স্থিতি
 উত্তেজনা আক্রোশ ওকে মরীয়া করে তোলে :

(ক) এস এল আর বোবা। শুভী শেষ। পাশে আলীর লাল পড়ে। হাতের মুঠোর স্টেনপান। ওটা নিতে পারলে...আবার ত্রাণফায়ার চালাচ্ছে ব্যাটারী...এঃ জিচের মধ্যে পানি কাদা রক্ত সব শুলে গেছে।
 ...ব্যা...গ্যা...ও...বুম...বুম...আগুনের বিলিক...চাঙ চাঙ মাটি মাথা ধোঁয়া
 ...ওঃ...অলে গেল...জান হাঁটুর উপর এলাকার ঠাণ্ডা স্রোত ফাঁকা
 বহুশা।.....

(খ) এ্যাও মাগী চোপ। তোর পোলা কই...কছু ত ভাশে-আগে না বাপ, গল্পে না বন্দরে...চোপ্ হেনাল মিথোবাদী।...কি কেমন লগ্নে মজা, এখনো বল তোর ছাবাল কই...ওরে ধোঁহায়ে, মেয়ে ক্যাল...
 ছেলে কোথায় বল...জা নি না...তবেরে...এই, নে ওঠা...তুলে
 নিয়ে চল্ পাহাড়ের ওই ধারে। আজ সারারাত ওরি মাংসে কোথা
 খাবো।

তালি দেয়া বিবাহের অসম্পূর্ণতা উপরন্তু মাহবের প্রায়কে আধপথে বা
 মেয়ে খেপিয়ে তোলে। চটকা তম্বা খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তনহীন
 পাহাড়ের গারে গারে। চিহিহি বোড়ায় মত ক্ষয়রাশি জীবা বৈকিয়ে লাক দেয়।
 বাতাসে সুবি ছোঁড়ে। জ্বাচের বাৎসল্যচ্যুত হয়ে প্যাস্টচাকা ভোঁতা উক
 থির থির করে কাঁপতে থাকে। বেরনেটের ইম্পাত বলসে ওঠে বাতব
 জমিনে বার খেয়ে। চ্যাঙা পল্কা দেহট পড়াতে পড়াতে নিচে বরশার
 নাপালে চলে যায়। হাতের তালু নখের মাথা কেটে গিয়ে রক্ত ছোটে।
 বিভিড়ি বকুনি বাশের কুক হরে মিশে বার ক্যাকাশে কুয়াশায়।

৭৭

পাহাড়ের বিপরীতে ওই ধারে উত্তেজনা মাথা থেকে আবার ল্যাঞ্চে ঘুরে
 আসে। অকুসলের ছবি একে একে সকালে একে একে রক্তম। রক্তমের গলা
 আড়াআড়ি পৌচে কাটা। ফাঁক হয়ে পড়ে থাকে। মানিকের হাত
 মোচড়ানো। ছুটো চোখের মণি বেরনেটের খোঁচার গুপড়ানো। মহলীনের
 নাকের ফুটো ছুটো মিশে গিয়ে একটা রক্তনালী হয়ে আছে। আর মলংগী
 মাষ্টার তাদা খেয়ে জানের মায়ার বউবাচ্চ। কেলে পালিয়ে গেল পাহাড়ের
 স্রজধারে শালের অংগলে। পুরদিন বউটা শোকের মাথায় এনড্রিন খেয়ে
 বিনের হল।

পাহাড়ের ওই ধারে মিশনারিতে ডিষ্ট ডিষ্ট বকটা কেঁপে ওঠে। ওখানে মুচিরা থাকে। পলায়-প্রান্তিকের শাখা ক্রুশ ঝোলানো। ছোমেদের ছোরা থেকে তাই বেঁচে গেছে। ছোমেদ ইমানি কনট্রাক্টর। মুচিদের সমাজে ডাকাতের বস্ত্র বিতরণ করে। সরকারের বস্ত্র তহবিলে মোটা টাকা দেয়। আর ঘুমের ঘোরে প্রাণকাটা চিংকার দিয়ে পাড়া কাঁপায়; ওই ফজু খালা এলো। ওই—ওই জগি করল। ওরে আদ্যারে। আর আমীরপের কচি-কালো ছাইকালো কালিকালো ছাগল তিনটে একদিন ঘরে ফেরার পথ পায় না। জীবনের পথঘাট আবার সব এলোমেলো হয়ে যায় শিতের সন্ধ্যায়।

এগারো

পাহাড়ের এই ধারে খাঁতলানো বগলের তলায় উদ্ভাস্ত ক্রাচ হস্তে হয়ে কেবেরে। কাঁধের নিচেয় রাইফেল হুঁসে উঠে ঘবার ঘবার। ডগায় শাখা ইমানত লকলক করে রক্তের কৃষ্ণা আনায়। ঝরণার জল পাথরে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে নিচে নেমে যায়। কোথাও পা হড়কে জুড়ি ছিটকে ওঠে। টুপটাপ করে লাফিয়ে জলে পড়ে। এত বহু তলা যে, পাথরের ডুবে ডুবে ছুটে মিলিয়ে যাওয়া সবটা দেখা যায়। একটা কদাকার গোসাপ বড় পাথরের চাঙে পেট লেপটে শুয়ে ঘাড় বেকিয়ে কজরালিকে লক্ষ্য করে। চ্যাপ্তা দেড়পেয়ে অতি মাহুঘটাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগুতে দেখে সড় সড় করে নেমে যায়। তারপর রূপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন চকচকে রোদের বেলা। পলারী গাছের মাথায় জলের আলোছায়া জিলজিল করছে। কজরালি ঝরণার পাড়ে এগিয়ে দেখল প্রচণ্ড ক্ষত বেগে ছুটে চলেছে একটানা শ্রোত। ভয়ংকর কেঁপে গিয়ে আরো এগিয়ে এসে ঘাড় ঝুঁকিয়ে দেখে, বাবলা বা মহুচা বা পিহালের চামড়াছোলা মরা গুঁড়িতে বেধে একটা মেয়েছেলে, ই্যা ওটা তার মা-ই বটে। সেই পরীব রূপসী বিবধা প্রায় মেরেলোকটা। শরীরে শাড়ি নেই। জলেও আঁকু নেই। ফটিক জল। সারা শরীরের চামরাস ছোটছোট মাছে খুঁটে খাবলে নেয়। খোলা চুলের রাশি শ্রোতের অহুকুলে ফিরে কাঁপছে তরতর করে। কিছু তার গুহ মরা ডালে জড়িয়ে আটকে আছে। আর মাহুঘটার উপর দিয়ে বয়ে বাচ্ছে শাখা কাঁচপলার মত জলজলে জলশ্রোত।

মা...মাগো.....

পাহাড়ের রক্তগুলো কঁপে কঁপে ওঠে রনরন... রনরন। এবড়ো খেবড়ো ক্রাচ ঠোকর তীব্র আত্মনাশ মিলিয়ে বেতে থাকে গভীর পাহাড়গুলোর মাথায় মাথায়।

হুশমন কই? তোর রক্ত কাঁচা খাবো.....এরকম কিছু আদিম ধ্বনি কয়েক হাজার ঐতিহ্যবানি ও তার কয়েক লক্ষ অহুধ্বনি কাপতে কাপতে আকাশের কাছাকাছি চলে যায়।

বার

পাহাড়ের বিপরীতে ওই বারে খিড়িবে আসে জীবনের সব। ডিঙ ডিঙ ডিঙ ডিঙ বটা বাজে পক্ষিমেষ গীর্জায়। কুলকামিনরা...চৈ চৈ...ছবশায়া ইঁস ডেকে ঘরে তোলে। পাটকিলে মেঘের গারে ঘোঁরাশা ধুলোর ছোপ। বউদের বাটনা বাটা ফাট। ভেজাচাল কুলোষ ওয়ে রাঁধুনীর হাতনাড়া বেধে। কবরের গায়ে বহুল ফুল পড়ে পড়ে পচে ওঠে। কালচে সন্ধ্যা ঘন হয়ে কালো রাত নেমে আসে।

ভের

হাজার হাজার বছর, না লাখ লাখ বছর ধরে ফজরালির অঙ্ককার ফুঁড়ে ফুঁড়ে খুঁজে কিরছে মলংগীর স্বপ্নপিত্ত। সেই কবে কোন শতাব্দীতে এক আদি ফজরালি মাটির ইচ্ছিত বাঁচাতে গিয়ে একটা তোপের মুখে নজরানা দিয়েছিল, বদলে তার মা জননীর বোনি দীর্ঘ হয়েছিল মলংগী মাষ্টারের শিশ্নবাতে, তারপর ভেসে চলে গেছে যুগ যুগান্তর। এমনি ঘাঘ। কোটি বর্ষ গড়িয়ে যায়। মাহুদের হুশমনকে তবু সনাক্ত করা যায় না। ঐতিবার সে ভোল পাল্টে নেয়। ভাল মাহুদ জনবদরদীর মুখোশ পরে সমাজের প্রাতি স্তরে খাপ খাইয়ে নিবে চলে। তার ছুরানী দাড়ির ছায়া একে একে গ্রাস করে নেয় থানা আদালত—করণিকের চৌকাঠ কালিকা। কি করে ধরবে তাকে ফজরালি? কখনো কোরান-বাইবেলের মলাটে চেপে রাখা পচা কলমের কীট। কখনো গোপের ঝাড়ুনাচনে—কখনো নাকিরোমনে মাঠ মাতায়। মলংগী কথা বলে স্লোগানে। চলেফেরে নকল চালে। তবু যদি কখনো কোনো রগচটা বেয়ারপ ফজরালি তাকে খুঁজে বের করে, মুহুর্তের মাধ্যমে রঙ ভাঁড়িয়ে মিশে যায় জনগনের মধ্যে। কোন অপরা সময়ের ফেরে আচমকা হাতে নাড়ে ধরা পড়ে যাবার দশা পাড়ালে মলংগী

মাটার তখন ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক করে লাকিয়ে পাহাড়ের ও পিঠে শাল আকলের গহন বরগার খাড়িতে পোপন হুড়ঙে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। হুনিয়ার অভ্যস্ত হতে হতে ছাপোষা গেরশ্বেরা মলংগী শব্দটা তুলে বেতে বসে, তখন হঠাৎ একদিন হুলি ঝড়ে আকাশ ঢেকে যায়। রাতভোরে দেখা যায়, আমোরন পড়ে আছে বিলেব পাকে সতীচ্ছদদীর্ঘ। টেটরিলিকের কাণ্ড তছরপ হয়ে গেছে। ভিটেমাটি লীজ পড়েছে পড়শি মহাজনের কাছে। বুলডোজার দিয়ে মুচি বস্তি সমকুমি বানিয়ে শিল্প পার্কের শিলাস্তাস করা হয়েছে।

ভোট বাক্সের ব্যালটে কারচুপি ঘটে। কজরালির মাজননী লুট হয়ে যায়। লুটরাকে বেয়নেট নিয়ে ধাওয়া করে যায় কজরালি। কিন্তু এবারে কজরালিই মলংগীর ধোরাঙ্কো পালিয়ে আসে পাহাড়ের এইধারে। এ সমাজে কজরালিই ফেরারী। তাই মলংগীকে ধরা আর হয় না তার। শুধু খেলা চলে। ঘরাছাড়া খেলা যুগ যুগ। একটি ছলজ্য পাহাড়কে মধ্যখানে আড়াল খাড়া রেখে ছজনের কোটি বর্ষ ব্যাপী কালমুগরা এ। সাম্রাজ্যিকের কজরালি এখনো অঙ্ক প্রতিলিংসায় বেয়নেট বাগিয়ে পাহাড় পাক দিয়ে ফেরে সাম্রাজ্যিকের মলংগীর সন্ধানে। মাঝে মাঝে কৃষ্ণ পক্ষের অঙ্ককার বাবড়ে যায় প্রচণ্ড বাজখাঁই ধমকে.....হলুট।

চোদ্দ

পাহাড়ের এইধারে শীত রাতে যুতুয়া শরীর পায়। ঢাঙা কালো রোগা ছায়া কজরালি ক্রাচ ঠুকে হেঁটে যায়.....ঠক ঠক ঠক ঠক। জ্যোছনার শরীর ফিরে পেয়ে আবপোড়া জীবন উঠে বসে। প্রকৃতির চাতালে বসে খানিক বিলাপ করে। খানিক গর্জন তোলে। যুতুয়া শরীর ফিরে পায়। বন্ধবাস খুলে ফেলে প্রকৃতি তার শতাব্দীপুরনো সঙ্গর দেখিয়ে দেয়। ঢাঙা কালো রোগা ছায়া নেড়পায়ে হেঁটে যায় ক্যাকাশে চাঁদের আলোয়। বীভৎস উদ্যোমতায়। হস্তশাস্ত্র পায়ে ধোঁড়াতে ধোঁড়াতে চড়াই উতরাই পায় হয়ে আসে। হারানো বরনার ধারে এসে কান পাতে। না ত, জলের ছলনা প্রহার মর্মর নেই আর। পাথরের নিঃশব্দ ধাতব পাত্রে মুখ খুবড়ে মরে আছে। নিচু হয়ে আধখানা শরীর ঝুঁকিয়ে দেখে, খাড়ি আছে, বরনা নেই। গতি পাল্টে অথবা মরে গেছে কবে কোন্ শতকের উদ্বর্তন আদিপুরুষে। খাড়ির ভিতরে কংকালের জীবাস্ত্র জয়ে আছে গাছের শুড়ির পটে। মোটা শুড়ি ও তার অটল শাখাকাণ্ড সব কিছু

অগ্নীকৃত কালো কয়লার পাথর হয়ে আছে। আধপোড়া জীবন এই পাথর লক্ষ্য হত্যার কাছে ফিরে এসে।

পনের

কয়লালি একটা মস্তান বুনো পৌ। পাহাড়টা তুড়ে দেবার মতলব। পাথরের যুগ যুগ ব্যাপী সাবেকি ব্যবধান শুঁড়ে শুঁড়ে হয়ে উড়ে যায় বেয়নেটের কলার ঘায়ে। দুই জীবনের মাঝখানে দাঁড়ানো মানধাতার জাণ্ডাধরা নাক-উঁচু ঔষুত্যাগে ম্লিনাৎ করে দিচ্ছে তার ক্ষান্তি। কয়লালির বেয়নেট দিন-রাত মানবহর শতাব্দী কোটি বর্ষ ধোঁড়ে***অচলারতন পাহাড় খুঁড়ে চলে।

তবু যুদ্ধ !

শৈবাল চট্টোপাধ্যায়

বোগিন্দ্র সিং—একজন সৈনিক।

বাবা—বোগিন্দ্র সিংয়ের বাবা।

মা—বোগিন্দ্র সিংয়ের মা।

জিরায়া খান—একজন শত্রু সৈন্য।

প্রথম স্টেচার বহনকারী।

দ্বিতীয় স্টেচার বহনকারী।

[যুদ্ধক্ষেত্র। মন্ডের চারপাশে কাঁটা-তারের বেড়া। ধরে ধরে বালির বস্তা সাজানো। তুমুল যুদ্ধ চলছে। রাইফেল, মেশিনগান এবং বোমা ফাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোগিন্দ্র সিং একা। মাটির উপর বুক পেতে শুয়ে আছে। সে দারুন ভীত ও সজ্ঞত। যুদ্ধের শব্দ বন্ধ হয়ে আসবে। চারিদিক নিশব্দ। মিনিটখানেক বাহে বোগিন্দ্র উঠে দাঁড়াবে। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাবে। ব্যাগ থেকে একটা অসমাপ্ত পুল-ওস্তার, একটা উলের গুলি ও দুটি কাঁটা বের করে উল বুনতে শুরু করবে। এমন সময় তার পাশ থেকে টেলিফোন বেজে উঠবে।]

বোগিন্দ্র সিং—হ্যালো। হ্যালো।...হ্যা ক্যাপটেন। আমি সেকটর সাতচল্লিশ থেকে বলছি।...না-না এদিকে কোনো ক্ষতি হয় নি...না নতুন কিছু রিপোর্ট করার নেই...এ্যা ?...ও হ্যা ঠিক আছে ক্যাপটেন... হ্যালো হ্যালো বলতে পারেন আবার কখন যুদ্ধ শুরু হবে ?...কি বলছেন ?...আচ্ছা এই হাতবোমাগুলো দিয়ে কি করব ? মানে, কোন দিকে ছুড়ে মারব ?...না, না, না চটবেন না। আমি ঠিক

বুঝতে পারছি না। (দরদ নিয়ে) একটা কথা বলব ক্যাপটেন ?
আমার এখানে আর কাউকে পাঠানো যায় না ?... (অপর দিক
থেকে ক্যাপটেন খুব ধমকাচ্ছে) ...ঠিক আছে। ঠিক আছে।
আপনি যা ভাল বুঝছেন।...না...হ্যাঁ...একটা ছাপল হলেও চলে
যেত। বুঝতেই পারছেন, আমি এত একা...না, না। আপনাকে
অসম্মান করতে চাই নি...আমি ঠিক সোজাবে...হালো। হালো।
(অন্ত দিকে লাইন কেটে দিয়েছে। অগত্যা কোনটা বেঁধে দিল।)

[বোগিন্দর টেলিফোনটা বেঁধে উঠে দাঁড়াবে। তার কথা বধন প্রায় শেষ
করে আসছিল এমন সময় দুটো টিকিন—বাসকেট হাতে নিয়ে তার মা ও
বাবা এসে ঢুকেছেন। এটা সে বেঁধতে পায় নি। সে গভীর মুখে পিছন
দিকে ঘুরে তাকাতোই মুখোমুখি সাক্ষাৎ হল]

বোগিন্দর—(আনন্দে চিৎকার করে) আরে! বাবা!—মা!—তোমরা ?
এখানে এলে কি করে ? (নিজেকে সংযত করে। মুখ ঘুরিয়ে
নেয়) না, না। এ অসম্ভব। দিনরাত বোমার শব্দে আমার
মাথাটাই ধরাপ হয়ে গেছে।

বাবা—বোগিন্দর ! [বোগিন্দর তখনও বিশ্বাস করছে না]

মা—(এগিয়ে পিঠে হাত রেখে) কি রে মহুয়া ? কি হল ভোর ?

বোগিন্দর—(উল্লাসে ধেঁটে পড়বে। মাকে জড়িয়ে ধরে) মা! আমার
মা! (মাকে ছেড়ে দিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরবে) বাবা! কি
আশ্চর্য! তোমরা ?

বাবা—আরে ছাড়! ছাড়! পাপল কোথাকার! তুই তো বিশ্বাসই
করছিলি না। [তিনজনেই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়]

বোগিন্দর—আচ্ছা বাবা, তোমার কি বুদ্ধিভ্রম লোপ পেয়েছে ? মাকে
নিয়ে তুমি এই যুদ্ধের মধ্যে চলে এলে ? কাজটা মোটেই ভাল
কর নি। দেরী না করে, বস তাড়াতাড়ি পার চলে যাও।

বাবা—(ভারিকি মেজাজে) এতদিনে বাপের উপর কথা বলবার মত কিছু
একটা পেয়েছিল, যা হোক।—যুদ্ধের ভয় আমাকে দেখাস নে
বোগিন্দর। তুই কি বলে বাচ্চি, আমিও এক সময় যুদ্ধ করেছি।
এর চেয়ে অনেক বড় বড় যুদ্ধ। তখন তুই জন্মাইনি। আরে,
এসব যুদ্ধ তো আমার কাছে ছেলেখেলা।

মা—কদিন আগে, বোম্বের, গত বুধবার—(আমীকে) তাই না গো?
(বাবা মাথা নেড়ে সন্মতি জানান্যর)—তোর বাবা গরু ক্ষেতে কাজ
করছিল। হঠাৎ দেখতে পেল তুই পকায়েৎ সড়ক দিয়ে দ্রিগে
করে বাচ্ছিস। বাড়ি গিয়ে আমাকে বলল কথাটা। চুজনে
পরামর্শ করে কেলাম। তুই যখন বাড়ির এত কাছে রয়েছিস,
তোর সঙ্গে দেখা করতে বাব। এখন কি আর তোকে ছুটি
দেবে?

বাবা—তা আর বলতে। এখন হল অকরি অবস্থা। এখন কি আর ছুটি
চলে?

মা—(যোগিন্দরের পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে) ইস্। কতদিন বাড়ি-
ছাড়া হয়ে রয়েছিস। একা-একা নিশ্চয়ই তোর খুব মন খারাপ
লাগে। যুদ্ধটা বড় একঘেয়ে ব্যাপার। তাই নারে মছবা?

যোগিন্দর—না মা। তুমি যতটা ভাবছ ঠিক ততটা—

বাবা—রাখ। রাখ। যুদ্ধে কি হয়, আবার সব জানা আছে। প্রথমে
বেশ মজাই লাগে। চকচকে ছিমছাম পোষাক, মার্চ, প্যারেড,
হাত-বোমা, মেলিনগান ছোড়া, বেয়নেট চার্জ—সব কিছু মিলিয়ে
নিজেকে বড্ড চালাক-চতুর আর চটপটে মনে হয়।

মা—যুদ্ধের সবচেয়ে মজার ব্যাপারটাই তুমি বাদ দিয়ে গেলে। ঘোড়ার
পিঠে টগবগিয়ে ছুটে বাওয়া দেখলে রক্ত যেন গরম হবে ওঠে।

বাবা—(মাথা নেড়ে) না—না। আমি ভুবে বাব কেন? বুকবুকে একটা
ইউনিফর্ম পরে ঘোড়ার পিঠে চেপে বাওয়া—উফ্। আমি ভুলতে
পারি না সে সব দিনগুলোর কথা। নিজেকে মনে হত যত বড়
এক বীর বোদ্ধা।

মা—আবার বেশ মনে আছে। আবার দাছ ছিলেন একজন নামকরা কর্ণেল।
তখন ছিল ব্রিটিশ আমল। আমাদের ঘরে দাছর কি সুন্দর সুন্দর
সব ছবি ছিল।—মার কোলে বসে, দোতালার বারান্দা থেকে,
আমি দাছকে যুদ্ধ করতে দেখতাম।

বাবা—ও সব তো আর সত্যিকারের যুদ্ধ ছিল না। ওকে বলে যুদ্ধের মহড়া।
ও আমি অনেক করেছি।

মা—হোক গে। তবু ঐসব দেখতে দেখতে যুদ্ধটা খুব ভাল লেগে গেল।
একদিন যাকে বললাম, মা আমিও যুদ্ধ করব। মা শুনে তো

বেসে খুন। বললেন, দূর বোকা। যুদ্ধটা হচ্ছে ছেলেদের ব্যাপার। মেয়েরা ওসব করতে পারে না। শুনে আমার মনটা খুব দমে গেল।

যোগিন্দর—বাক পে। মা, তোমরা আর ঘেরি করো না। এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাও। সৈন্ত না হলে কেউ যুদ্ধের মধ্যে আসতে পারে না। এটাই নিয়ম।

বাবা—(চটে গিয়ে) ধ্যাং। আমি ওসব নিয়মের পরোয়া করি না। আমরা তোকে কিভাবে খুঁজে বের করেছি বল। সে কি এমনি? আজ একটা ছুটির দিন। এইখানে বলে একসঙ্গে বনভোজন করব। হাঃ হাঃ হাঃ। বনভোজন? এঁ্যা। হাঃ হাঃ হাঃ। বনভোজনই বটে।

মা—আমি তোর অল্প অনেক রকম খাবার করে এনেছি, মহুয়া। পিঠে খেতে ভালবাসিস বলে হু-তিন রকমের পিঠে বানিয়ে এনেছি। তুই দেখলো খাবি নে? (অতিমান)

যোগিন্দর—ক্যাপটেন যদি এদিকে চলে আসে। তোমাদের দেখতে পায়। তা হলে আর রন্ধ নেই। ভীষণ চটে বাবে।

মা—কেন? আমরা কি রাস্তার লোক?

যোগিন্দর—ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, মা। ক্যাপটেন সব সময় আমাদের উপদেশ দেয়, যুদ্ধ করতে হলে ছুটি মিনিট চাই। নিয়ম-শৃঙ্খলা আর ঠিক বস্তা অল্প চালানো।

বাবা—(বিক্রোধের মতো) তোর ক্যাপটেন এসে গেলে আমি তার সঙ্গে কথা বলব। তাকে আরও হু-একটা উপদেশ দিতে হবে দেখছি।

যোগিন্দর—(উদ্বেজিত) যে কোন মুহুর্তে এখানে যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। তা হলে?

বাবা—(চটে গিয়ে) রাগ্। রাগ্। আমাদের আর যুদ্ধ দেখাতে হবে না। সারাজীবনে কত দেখলাম। ছোঃ। নেহাৎ আজকালকার যুদ্ধগুলো বোড়ার পিঠে চেপে হয় না। নইলে দেখতিস একটা তেজী বোড়া নিয়ে আমিও যুদ্ধে নেমে পড়তাম। এই বুড়ো হাড়ে কম জোর আছে, ভেবেছিল?

মা—আমরা সকলেব মধ্য দিয়ে এলাম। কোন জোয়ানই আমাদের কিছু বলে নি।

যোগিন্দর—(হেসে ঠাট্টা করে) হঠাত ভেবেছে তোমরা ফুজনে যুদ্ধের
রেকারি।

মা—আসবার পথে একটা কামানের প্রায় মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম। বাপস।
কত গোলা ছুঁড়ছিল। ওই বে, বললি না—নিয়ম-শৃঙ্খলা আর অল্প-
চালানো, আসলে ঐ দুটোর দিকেই ওদের নজর ছিল। আমাদের
কেউ দেখতে পায় নি।

বাবা—যুদ্ধের সময় কোনো কিছু দেখেই অবাক হতে নেই। যুদ্ধে সব কিছুই
সম্ভব। সবাই এটা জানে। আমাদের সময়—

মা—তোমার বকবকানি থামাও। এখন ষাওয়া-দাওয়া শুরু করা যাক।

বাবা—ঠিক বলেছে। (চারদিকটা দেখতে দেখতে) এখানটার বড় বাকদের
গছ। কোথায় বসা যায় বল তো?

মা—আহা! যুদ্ধে বাকদের গছ থাকবে না, কি তোমার বাগানের রজনীগন্ধা
ফুলের গছ থাকবে? মহুয়ার ঐ বড় কফলটা পেতে নাও। ওরই
উপর বসে দিবি ষাওয়া বাবে। কি বল?

[বাবা কফলটা পেতে দিলেন। নিজে বেশ আরাম করে বসে
পড়লেন। যোগিন্দর রাইফেল হাতে বসতে ব্যস্ত ছিল অমনি মা ধমক
দিলেন।]

মা—আঃ! হক্ষেটা কি? বাইকেল কোলে নিয়ে কেউ খেতে বসে নাকি?
ওটা একপাশে রেখে দে। (ছেলেকে নজর দিবে দেখতে দেখতে)
তাকে বড় নোংরা লাগছে, মহুয়া। এত নোংরা হয়েছিল কি
করে? দেখি, দেখি তোর হাত দুটো।

যোগিন্দর—(সপ্রতিভ) তোমরা আসবার আগে মাটিতে হামাগুড়ি দিতে
হয়েছিল। তাই হাত দুটোতে নোংরা লেগেছে।

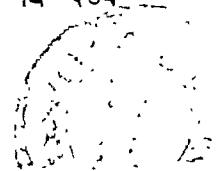
মা—দেখি তোর দাঁত। [যোগিন্দর দাঁত দেখায়। মা সন্তুষ্ট।]

বাহ্! দাঁতগুলো বেশ বকবকেই আছে দেখছি। যুদ্ধে দেখিয়ে
দাঁত নোংরা করে রাখিস নি এই আমার ভান্ডি। (হাসি)

[তিনজনে বসে পড়ে। মা ঝুড়ি খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

যোগিন্দরের কথা শুনে শুনে হঠাৎ থেমে যাবেন।]

বাবা—ছারে যোগিন্দর! এতদিন ধরে লড়াই করছিল, কটা শত্রু ধরত
করেছিল?



যোগিন্দর—(অবাক) কোথায় ?

বাবা—(অবাক) কেন ? এই যুদ্ধে ।

যোগিন্দর—একটা গরু-ছাগলও আমার গুলিতে মরেছে কিনা সম্ভব ।

বাবা—(চটে গিয়ে) কেন ?

যোগিন্দর—আমি তো আর কোনো নিশানা করে গুলি চালাই না ।
এলোপাথারি চালিয়ে বাই । আর মনে মনে ভগবানকে বলি—হে
ভগবান আমার গুলি যদি কারো গায়ে লেগেই থাকে, সে যেন
মরে না যায় ।

বাবা—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! তোর মন এত দুর্বল ? আর একটু সাহস থাকা—

মা—মহুয়া ! আমি তোর গ্রামোকোনটা নিয়ে এসেছি । যে গান ছোটো
তোর খুব পছন্দ সে ছোটো রেকর্ডও এনেছি । গান শুনবি না ?

[মা বড় বুদ্ধি থেকে একটা ছোট গ্রামোফোন বের করেন]

যোগিন্দর—(বিব্রত) উঃ মা ! তুমি দিন দিন বড় ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ ।
যুদ্ধে আবার কেউ গান শোনে নাকি ? (তার বিষন্ন মুখ দেখে
নিজেকে স্তব্ধে নিয়ে) ঠিক আছে । মন ধারাপ করো না । এনেছ
বখন, বাজাও । কত দিন ঐ গানগুলো শুনি না ।

[মা সোৎসাহে গান বাজাতে শুরু করেন । বলাবাহুল্য দেশ-প্রেমের
গান ।]

মা—ভারি সুন্দর গানটা ।

[তিনজনে চুপ করে বসে গান শুনছে । এমনি সময় শত্রুবাহিনীর
একজন সৈন্য জিয়ারা খান সবার অলক্ষ্যে প্রবেশ করে । সেও চুপ
করে গান শুনতে থাকে । রেকর্ড শেষ হতেই কি কাজে যোগিন্দর
উঠে দাঁড়ায় এবং জিয়ারার সঙ্গে মুখোমুখি । দুজনেই দুজনকে দেখে
চুহাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে । এই বেধে মা-বাবা অবাক
হয়ে যান ।]

মা—(ধমক দিয়ে) এই মহুয়া ! হচ্ছেটা কি ?

[বাঘের ধমক কানে বেতেই যোগিন্দরের সম্মিত ফিরে আসে ।
ইতস্তত করে অবশেষে রাইফেলটা জিয়ারার বুকের উপর তুলে ধরে]

যোগিন্দর—(যুদ্ধের হুমকি) হাত ওঠাও । (জিয়ারা আরও সতান হয় ।
আরও ভয় পায় । যোগিন্দর মুদ্রিলে পড়ে । এর পর কি করবে
জানে না । হঠাৎ সে জিয়ারার কাঁধে হাত রাখা) তুমি আমার

বন্দী। মানছো তো? (বাবাকে) বাবা, বাঁধা দেখো একজন
শত্রুকে বন্দী করে ফেলেছি।

বাবা—বাহ! চমৎকার। এখন একে নিয়ে কি করবি?

বোগিন্দর—(মাথা চুলকে) তা জানিনে। কিছু একটা করতে হবে। আচ্ছা

বাবা, এবার আমি নিশ্চয়ই কর্পোরাল হয়ে যাব।

বাবা—কিন্তু তার আগে তুই ওকে ভাল করে বেঁধে রাখ।

বোগিন্দর—বাঁধব? কেন?

বাবা—বন্দীদের সব সময় বেঁধে রাখতে হয়, তাও জানিস না?

মা—ঠিক বলেছ। হাত বাঁধা বন্দী সৈনিকদের অনেক ছবি আমি দেখেছি।

বোগিন্দর—(বোলা থেকে একটা সরু অথচ লম্বা দড়ি বের করে নিয়ে
জিয়ায়্যাকে বলে) কিছু মনে করো না। তোমার হাত দুটো
একসঙ্গে কর।

জিয়ায়্যার—বেশি জোরে বেঁধো না। লাগবে।

বোগিন্দর—না-না। আমি বেশি জোরে বাঁধব না।

জিয়ায়্যার—(যত্নপাশ) উফ্! বড্ড লাগছে!

বাবা—এই বোগিন্দর! বন্দীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে নেই।

মা—কি হচ্ছে মনুষ্য? এইভাবে কি আমি তোকে মানুষ করেছি? তোকে
না হাজার বার বলেছি, কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবি না?

বোগিন্দর—(চটে গিয়ে) আহঃ! এটা কি আমি ইচ্ছে করে কবছি নাকি?
(জিয়ায়্যাকে) এবার দেখো। অনেক চিলে করে দিয়েছি।

জিয়ায়্যার—ঠিক আছে। এভাবে হলে আমার আপত্তি নেই।

বাবা—এবারে ওর পা দুটো বেঁধে ফেল।

বোগিন্দর—পা দুটোও বাঁধতে হবে? (জিয়ায়্যাকে) হয় করে একটু
বসবে?

জিয়ায়্যার—তখনকার মত অত জোরে বেঁধ না আবাব।

বোগিন্দর—একবার তুল হয়েছি বলে কি আবাবও হবে নাকি?

[জিয়ায়্যার বসে পড়তেই বোগিন্দর পা দুটো বেঁধে নেয়]

জিয়ায়্যার—(তৃপ্তির সঙ্গে) ঠিক আছে এবারে।

বোগিন্দর—(গর্বের সঙ্গে) বাবা, তুমি একটা কাজ কর। আমার ব্যাগে
একটা ক্যামেরা আছে। আমি ওর পেটের উপর পা দিয়ে দাঁড়াব
তুমি একটা ছবি তুলে ফেল। পারবে?

বাবা—অনায়াসে। বেশ হবে ছবিটা।

জিয়াবাবা—না-না-না। দয়া করে এটা করবেন না।

মা—এতে আপত্তি কি আছে? তুমি অবাধ্য হচ্ছে কেন?

জিয়াবাবা—দয়া করে এ কাজটি করবেন না।

মা—তুমিও যেমন! ওর বাবা তুলবে ছবি। নেহাতই এলেবেলে হবে। আমাদের বাবার ঘরে চাঁদ্রিয়ারে রাখব। ওর বাবা একজনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল বলে একটা সার্টিফিকেট পেয়েছিল। আমি সেটা বাঁধিয়ে ঐ দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছি। ওর পাশে এই ছবিটা ঝোলানো থাকবে।

জিয়াবাবা—মাপ করুন। এ ব্যাপারে আমি কিছুতেই মত দিতে পারি না।

বোসিন্দর—কেন?

জিয়াবাবা—একটি মেয়ে আমাদের ভালবাসে। এই যুদ্ধের পরে আমাদের বিয়ে হবে। যদি এই ছবিটা কোনোক্রমে সে বেঁচে ফেলে তা হলে কি ভাববে বল?

বোসিন্দর—এই কথা? তুমি বলে যেবে, ওটা আসলে তুমিই নও। একই রকম দেখতে দুজন লোক থাকে না? তাছাড়া সৈন্য বাহিনীকে সব একরকম দেখতে। দু-চারটে বাড়ি-গোঁক বা হোক আলাদা। (পায়চারি করে কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ ফিরে এসে) তুমি বয়স বলে দিও, ওটা আসলে একটা চিতাবাঘ।

মা—এর পরে আর কোনো আপত্তি চলে না।

জিয়াবাবা—বেশ। (বোসিন্দরকে) যদি তুমি খুশি হও তবে ছবি নাও।

[জিয়াবাবা শুয়ে পড়ে। বোসিন্দর ঝোলা থেকে ক্যামেরা বের করে বাবার হাতে দেয়। নিজে ওর পেটে পা দিয়ে রাইফেল হাতে নিয়ে দাঁড়ায়।]

মা—বুকটা আর একটু চিত্রিয়ে রাখ। নিশাস বন্ধ কর। শুকি হচ্ছে? অমন ভালো মানুষের মত মুখ করে পুরো ছবির মেজাজটাই নষ্ট করে নিচ্ছিস যে। বীরের মত মুখটা গভীর করে তোল।

বোসিন্দর—বাবা, হয়েছে?

বাবা—(ক্যামেরার দিকে ফুঁকে) আহ! ঘন ঘন নিশাস নিচ্ছিস কেন? শাস বন্ধ কর। হ্যাঁ—এইবার। ওয়ান—টু—থ্রি।

বোসিন্দর—(আতাবিক হয়ে) মনে হয় ছবিটা ভালই হবে।

মা—তোকে একজন বীর যোদ্ধা বলেই মনে হচ্ছিল।

বোগিন্দর—বাবা, ওকে নিয়ে এখন কি করব?

মা—আমাদের সঙ্গে বেতে নিমন্ত্রণ করব।

বাবা—আমার কোন আপত্তি নেই।

বোগিন্দর—তুমি আমাদের সঙ্গে এক সাথে বসে থাকবে?

জিয়ারা—(কিছু ভাবছিল) ঐ! কাজটা কি ঠিক হবে।

বাবা—কিছু ভেব না। আমরা অনেক ধাবার নিয়ে এসেছি।

জিয়ারা—চলুন। এক সঙ্গে যাওয়া বাক। আমরাও খুব খিদে পেয়েছে।

বাবা—তোমার নাম কি?

জিয়ারা—(হেসে) একজন পরে আমার নামের প্রয়োজন হল? আমি

জিয়ারা—জিয়ারা খান।

বাবা—জিয়ারা। কদিন ধরেই তো যুদ্ধ করছ। কটা শত্রু সৈন্য হত্যা করলে?

জিয়ারা—(অবাক) কোথায়?

বাবা—কেন? এই যুদ্ধে।

জিয়ারা—(লজ্জা পেয়ে) তেমন কিছু নয়। ছ একটা গরু-ছাগলও আমার গুলিতে মরেছে কিনা সম্ভব।

বাবা—তুমি কি দেখ নি, তোমার গুলি লেগে কজন সৈন্য মাটিতে লুটিয়েছে?

জিয়ারা—আমি তো নিশানা করে গুলি চালাই না। এলোপাখাড়ি চালাতে থাকি। মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকি, হায় খোদা! যদি কাকর পায়ে আমার গুলি লেগেই থাকে সে বেন মরে না যায়।

বোগিন্দর—(উল্লাসে) ঠিক আমার মত।

বাবা—তোমার আরও একটু সাহসী হওয়া উচিত।

মা—তুমি যদি চাও তাহলে তোমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে পারি।

জিয়ারা—ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি ঠিক আছি।

বাবা—তুমি কি মনে মনে চাইছ না, আমরা তোমার সব বাঁধন খুলে দেই?

মা—আরাম করে বসতে না পারলে কি গম্বো করা যায়?

জিয়ারা—যদি তাই মনে করেন তবে আমার পা ছুঁচো খুলে দিন। ত মনে রাখবেন, এ সবই আপনাদের ইচ্ছেতেই হচ্ছে। হাজার হলেও

আমি একজন বন্দী। আমার কোনো স্বাধীন মতামত থাকার
উচিত নয়।

বাবা—যোগিন্দ্র, ওর পা ছুটো খুলে দে। [যোগিন্দ্র পায়ে বঁধন খুলে
দিল।]

মা—কি হে? এখন ভাল লাগছে না?

জিয়া—নিশ্চয়ই। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি বোধ হয় আপনাদের
অস্ববিধায় কেলছি। তাই না?

মা—সে কি কথা! তুমি আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক হতে পারছ না কেন?
তুমি যদি চাও, তোমার হাত ছুটোও খুলে দিতে পারি।

জিয়া—এ ব্যাপারে আমি আপনাদের বাধ্য করতে পারি না।

মা—তাহলে তো তোমার হাত ছুটোও খুলে দিতে হয়।

বাবা—যোগিন্দ্র ওর হাত ছুটো খুলে দে। [যোগিন্দ্র খুলে দেয়]

জিয়া—শুধু খাবারের সময়টুকুই খুলে দিলেই যথেষ্ট হবে। তারপর বেঁধে
দিও। হাজার হলেও, আমি তোমাদের বন্দী।

বাবা—শুধু বন্দী নয়। একজন মহান বন্দী। [আকাশে এরোপ্লেনের শব্দ]
যোগিন্দ্র—(চিৎকার করে) ঐ—ঐ আবার শত্রুপক্ষের প্লেন এসেছে।
এক্ষুনি বোমা ফেলতে শুরু করবে। হুঁশিয়ার সব।

[জিয়া এবং যোগিন্দ্র দু'দিকে ছিটকে পড়ে। মাটির উপর বুক পেতে
ভয়ে থাকে। যোগিন্দ্র বাড়ি কিরিয়ে মা-বাবাকে অবিচল দেখে চিৎকার
করে।] বাবা! মা! শিশুগণ লুকোও। তোমাদের পায়ে বোমার
টুকরো লাগবে।

[বাবা-মার কারো মনেই এতটুকু ভয়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না।
মুহুর্তে বুদ্ধবুদ্ধ মূগুর হয়ে ওঠে। বোমার শব্দ। এরোপ্লেনের আওয়াজ।
সেসিনপান ও কামানের অবিশ্রাম গুলির শব্দ। বাবা-মা আপনমনে কথা
বলে চলেছেন। ভয়ের লেশমাত্র নাই। ওদের ঘর-সংসারের কথা
হচ্ছে। ভাঙা ভাঙা ছুটো-চারটে কথা শোনা যায় বাজ। মা তার বুদ্ধি
থেকে একটা রত্নিন ছাতা বের করে আনেন। ছত্বে ছাতার নিচে
দাঁড়ান। একসঙ্গে পাশাপাশি পায়চারি করেন। দু'জনের এমনি ভাব
বেন বোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্য ছাতাই যথেষ্ট। একসময় এরোপ্লেনের
শব্দ বন্ধ হয়। বন্ধ হয় অস্ত্রাস্ত্র শব্দও। ধীরে ধীরে চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে

আসে। মা একসময় ছাতির বাইরে হাত দিয়ে পরীক্ষা করেন, ঠিক বেশনি ভাবে লোকে পরীক্ষা করেন বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে কিনা।]

বাবা—(চারদিক পরীক্ষা করে) এবার তোমার ছাতা বন্ধ করতে পার।

[মা ছাতা বন্ধ করলেন। ছুজনে বোগিন্দরের কাছে গেলেন]

মা—(গুটানো ছাতা নিয়ে আঙুলে ধাক্কা দিয়ে) এই মজুরা! উঠে আর।

[বোগিন্দর ও জিয়ারা লুকানো আয়না থেকে বেরিয়ে আসে।]

বোগিন্দর—বাবা! তোমার পায়ে কোনো চোট লাগে নি তো?

বাবা—তুই আমার কি ভাবিস? এসব ছোটখাট যুদ্ধ আমি প্রাঙ্গণেই করি না।

[রেড ক্রস ব্যাজ পরিহিত দুজন সৈনিক ঘরাঘরি করে একটা গোটানো স্ট্রেকার নিয়ে হ্র করে বলতে বলতে মঞ্চে ঢুকবে।]

প্রথম স্ট্রেকার বহনকারী—মরা আছে? মরা আছে? মরা আছে?

বোগিন্দর—না ভাই। এখানে কোন মরা নেই।

প্রথম—ভাল—করে—ধেখুন। মরা আছে? মরা আছে?

বোগিন্দর—(চারদিক দেখে নিয়ে) ভাল করেই দেখে নিয়েছি। এখানে নেই।

প্রথম—(আর্জনাঙ্গের মতো শোনাতে) এখানে একজনও মারা যায় নি?

বোগিন্দর—বললাম তো! শুনে পান নি? (পরিষ্কার ধীর উচ্চারণ) এখানে কেউ মারা যায় নি। অতএব, একটিও মরা নেই।

প্রথম—কোনো আহত ব্যক্তি আছে?

বোগিন্দর—(সগর্বে) না ভাই। আমরা কেউ আহত হই নি।

দ্বিতীয়—কি মুন্সি! এইমাত্র এত বড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল অথচ একজনও মারা যায় নি, (পুনরায় হ্র করে) মরা আছে? মরা আছে? মরা আছে?

প্রথম—কি আশ্চর্য! একজন আহত পর্যন্ত হয় নি?

দ্বিতীয়—গোলা-বারুদ সব বাজে কোথায়? দয়া করে—

প্রথম—(ধমক) তোমার বকবকানি ধামাও। ওঁরা তো জানিয়েই দিলেন মরা নেই।

দ্বিতীয়—ওঁরা হরত আমাদের সঙ্গে রসিকতা করেছেন। মরা আছে? ..

বোগিন্দর—হুঃখিত। কিছুতেই আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারছি না যে—

দ্বিতীয়—সবাই অমন বলে থাকে। সবাই ভেবে খুশি থাকতে চায়—কেউ মরে নি। কেউ মরে না। তবু মরে। মরা আছে? মরা আছে? মরা আছে।

বাবা—তোমাদের ছু'জনের সাহায্য করতে পারলে খুশিই হতাম। কিন্তু কি করি বল? এখানে কেউ মরে নি। (গর্ব) এখানে বারা আছেন, সবাই বীর।

দ্বিতীয়—এভাবে চলতে থাকলে ক্যাপটেনকে কি কৈকিয়েৎ দেব?

বাবা—কিসের কৈকিয়েৎ? এত চিন্তা করছ কেন?

দ্বিতীয়—সহজেই বুঝতে পারবেন। এই যুদ্ধেরই অন্ত এলাকা থেকে দলে দলে মরা আহতদের দেহ টেনে টেনে চাতে কড়া পড়ে পেল। কারো আবার হাত ফুলে গেছে। তাদেরই হয়ত হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। অথচ এদিকে কিছু পাচ্ছি না। আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন, আমরা এতটুকু কঁাকি দিচ্ছি না।

বাবা—সত্যি এরা ছু'জনে মহা ভাবনায় ফেললে দেখছি।—এই বোগিন্দর! ভাল ভাল করে দেখে নিয়েছিস? একজনও নেই?

বোগিন্দর—না বাবা। কেউ নেই।

বাবা—(রেগে) ধ্যাৎ! ওদের বিপদটা বুঝতে পেরেও ওদের সাহায্য করতে চাইছিস না।

প্রথম—আপনি চর্চবেন না। এখানে নেই, হয়ত অন্ত ট্রেকে পেয়ে যাব। মরা পাব। মরা পাব। মরা পাব।

বাবা—বেশ! বেশ! তাই হোক। তাহলে আমিও খুশি হব।

মা—হ্যাঁ বাবা। তোমাদের ব্যবহারে আমিও খুব খুশি হয়েছি। বারা মন দিয়ে কাজ করে তাদের দেখলে আমার খুব আনন্দ হয়। তোমাদের অনেক উন্নতি হবে।

বাবা—আচ্ছা তোরা কেউই এতটুকু আহত হোস নি?

বোগিন্দর—(লজ্জিত) না বাবা। সে সুযোগই পেলাম না।

জিয়ারা—আমায়ও সে সৌভাগ্য হয় নি।

মা—(খুশি মনে) একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আজ সকালে মছরার জন্ত বধন খাবার তৈরি করছি, পেরাজ কাটতে কাটতে, এই আড়ুলটা কেটে গিয়েছিল। এটা দেখালে তোমাদের চলবে?

প্রথম—না। ও দেখিয়ে তো আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো
যাবে না।

বাবা—(হতাশ) তা হলে, সমস্তা থেকেই গেল।

দ্বিতীয়—সেজন্য ভাববেন না। অন্য ট্রেকে পেয়ে যাব। মরা পাব।

[হুজনে স্টেচার হাতে নিয়ে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে]

মরা আছে? মরা আছে? মরা আছে?

বাবা—তোমরা মন ধারাপ কর না। যদি কোন মরা পাই তোমাদের জন্য
রেখে দেব। অন্য কাউকে দেব না।

দ্বিতীয়—ধন্যবাদ।

[হুজনে হ্রস্ব করে বলতে বলতে বিদায় নেয় মরা আছে? মরা আছে?]

মা—বাহ! আজ ছুটির দিনটা বেশ কাটছে। যুদ্ধে যারা আসে তাদের
মনগুলো এত সরল হয় এ ভাবাই যায় না। (একটু ধেমের) আচ্ছা
জিয়ারা, তুমি হঠাৎ শত্রু হতে গেলে কেন?

জিয়ারা—(মাথা চুলকোঁ) আমি ঠিক বলতে পারব না। বেশি লেখাপড়া
করি নি। কতটুকুই বা খবর রাখি?

মা—আচ্ছা তুমি কি শত্রু হয়েই জন্মেছ? না বড় হবে শত্রু হবেছ?

জিয়ারা—আমি যে আপনাদের শত্রু কেন, তাই জানি না। একদিন সকালে
আমাদের বাড়ির উঠানে বসে মার ইতিহাসটা মেরামত করছি, এমন
সময় জিপে করে হুজন ভক্তলোক এসে আমার নাম ধরে ডাকল।
কাছে যেতেই একটা বড় কাগজ হাতে দিয়ে বলল, তোমাকে যুদ্ধে
যেতে হবে।

বোগিন্দর—বাস্ হয়ে গেল?

জিয়ারা—আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের যুদ্ধ? কোথায়?' ওদেরই একজন
বলল, 'তুমি দেখছি একেবারেই মুখ্য। খবরের কাগজ পড়
না?' [চুপ করে যায়]

বোগিন্দর—ধামলে কেন? বল। তারপর কি হল?

জিয়ারা—আমি ওদের কত করে বুঝিয়ে বললাম, আমি নূরজাহান বলে একটা
মেয়েকে ভালবাসি। জুয়াবায়ে ওকে নিয়ে সিনেমায় যাব। কথা
মিছেছি। যদি সে কথা রাখতে না পারি, বেচারী খুব কষ্ট পাবে।
দারুণ কাঁদাকাটি করবে। ওরা আমার কথার কোনো আমলই দিল
না। আমার সব থেকে অল্পরি ব্যাপারটা নাকি কোনো অল্পরিই নয়।

বেশক শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে হবে সেটাই সবচেয়ে জরুরি
সেই প্রথম ‘শত্রু’ কথাটা কানে এল।

বোসিন্দর—যুদ্ধে আসবার আগে নূরজাহানের সঙ্গে তোমার দেখা
হয় নি ?

জিয়া—খবর পেয়ে সে ছুটে এল। খুব কাঁদল। আমি ওকে সঙ্গে নিতে
চাইলাম। নূরজাহান সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু ওর
অহুমতি দিল না। আম্মাজানকে নিয়ে যেতে চাইলাম। বললাম,
নইলে আমাকে রেঁধে দেবে কে ? আমি অস্ত্র কারো রান্না খেতে
পারি না। ওরা সে-কথাও শুনল না।

মা—আহা! দেখ মহুয়া, এই ছেলেটি কি মিষ্টি। ঠিক তোর মত। মাকে
কত ভালবাসে। থাক বাছা। তুমি ছাং কোরো না। যুদ্ধের পরে
বাড়ি কিরে গিয়ে সবাইকে পাবে। এখন তোমরা দুটি ভাইয়ের মত
এখানে বসে গল্প কর।

বোসিন্দর—মা, তুমি সব শুলিয়ে ফেলছ। জিয়া বা আমাদের শত্রু। ওকে
দেখলে ভয় পেতে হয়, যুদ্ধ করতে—

মা—পাংল কোধাকার! ওকে দেখে আবার ভয় পাবি কি ?

বোসিন্দর—মা, তুমি যদি শুনতে, এই সব শত্রু সযত্নে কম্যাণ্ডার কি বলেছেন,
তা হলে এসব কথা মুখে উচ্চারণ করতে সাহস পেতে না।

[মা খাবার পরিবেশন করতে শুরু করেন। সবাই বসে পড়ে]

মা—(কাজ করতে করতে) কি বলেছেন তিনি ?

বোসিন্দর—আমাদের শত্রুরা, যানে এই ওরা, বন্দীদের উপর নির্ভর অত্যাচার
করে। জার্মান গেস্টাপোদেরও হার মানায়। কি বীভৎস আচ-
র্য লে-সব কাহিনী।

বাবা—(জিয়াকে) তোমার লজ্জা করে না, এই রকম একটা অত্যাচারী
খুনের দলে থেকে যুদ্ধ করতে ? [সবাই খেতে শুরু করে]

জিয়া—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! শুধু, শুধু। আমাদের ক্যাপটেনও ঠিক ওই
সব কথাই আপনাদের সযত্নে বলেছেন। এমন করেই শত্রুকে
দুশা করতে শিখিয়েছেন।

বাবা—তাই নাকি ? এ ত ভাষা মিথ্যা কথা! তুমি তো এতক্ষণ আমাদের
দেখলে। বল, এই সব কথা সত্য বলে মনে হয়েছে ?

জিয়ারা—আশনিও তো আমাকে দেখেছেন। আমি কি কোন খায়াপ ব্যবহার করেছি আপনাদের সঙ্গে।

মা—আমার কি মনে হয় জান? আসলে ওদের কমাণ্ডার আর এদের কমাণ্ডার দুজনে বোধহয় একই লোক। [জিয়ারার খাওয়া শেষ হতেই] ও কি! তোমার খাওয়া শেষ হয়ে গেল? আর কিছু নিলে না?

জিয়ারা—(হেসে) না, না, অনেক হয়েছে। অনেক দিন পরে.....

মা—কি রে মছুরা? পেট ভরেছে? [বোঁগিন্দর খেতে খেতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়] (আমীকে) কই, তুমি কিছু বললে না?

বাবা—(হেসে) গত রবিবারের চেয়ে অবশি আজ ভালই খেলাম।

জিয়ারা—কেন? গত রবিবার কি খেয়েছিলেন?

বাবা—(হেসে) গত রবিবার এমনি করে আমরা দুজনে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম এক গাঁয়ে। গাছের নিচে খাবার রেখে, মুখ ঘুরিয়ে বসে আমরা গল্প করছিলাম। টের পাই নি, কখন একটা বোকা-পাঠা এসে পুরো খাবারটা খেয়ে নিয়েছে। [সবাই হেসে ওঠে]

মা—শুধু কি তাই? একটা ছোট কাপড়ে খাবারগুলো সাজিয়ে রেখেছিলাম। সেটা শুধু খেয়ে নিয়েছে।

বোঁগিন্দর—(হাসতে হাসতে) দারুণ পেটুক—পাঠা তো! কাপড় শুধু খেয়ে নিল?

বাবা—আমরাও কি কম পেটুক নাকি? রেগে গিয়ে রাস্তায় সবাই মিলে ঐ পাঠাটাকেই খেয়ে ফেললাম। [দারুণ হাসিতে সবাই ফেটে পড়ে]

[মা সব শুধিরে রাগতে থাকেন। বাবা একটা চুইট ধরিয়ে বলেন]

বাবা—(মাকে) আজকে ছুটির দিনে আমাদের বন-ভোজনটা বেশ সরেস হল। যুদ্ধক্ষেত্রে বসে বন-ভোজন। একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা হল। কি বল?

মা—সেই সঙ্গে তোমার কৌজি ছেলের সঙ্গেও দেখা হল।

বাবা—একজন বন্দী, যেমন-তেমন বন্দী নয়, একজন মহান-প্রাণ যুগবন্দীর সঙ্গে একত্রে বসে খেলাম। এটাও কি কম?

বোঁগিন্দর—(জিয়ারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে) এই জিয়ারা! টোকে তুমি

কি করে সময় কাটাও? আমার তো, ভাই, সময় কাটতেই চায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। উফ্! অসহ্য।

জিয়া—আমাদের যে সব কষ্টের দের, আমি তাই কেটে কেটে হৃদয় ছোট ছোট ফুল বানাই।

যোগিন্দর—বাহ্! চমৎকার! তারপর ঐ ফুলগুলো দিয়ে কি কর?

জিয়া—আগে ওগুলো বড় বড় প্যাকেটে ভর্তি করে নুরজাহানের কাছে পাঠালাম। শেষে একদিন ও লিখে পাঠাল, ওর ঘরে এত ফুল হয়ে গেছে যে, ঘরে আর স্থান নেই। নতুন কিছু বানিয়ে উপহার পাঠাতে লিখল। আমারও মজিল, 'অন্ত কিছু বানাতে পারি না।

মা—আর ফুল বানাও নি?

জিয়া—কিছুদিন ধেমো থাকবর পর আবার বানাতে শুরু করলাম। এবার আর নুরজাহানের কাছে পাঠালাম না। আমার যত সখী যুদ্ধে মারা যেতে লাগল তাদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যে একটি করে ফুল গুঁজে দিতে লাগলাম।

মা—বাহ্! বাহ্! ভারি লক্ষ্মী ছেলে তুমি।

জিয়া—এখন যতই বানাই না কেন, একটাও পড়ে থাকে না। এই তো যুদ্ধ! কিছু তুমি কি কর যোগিন্দর?

যোগিন্দর—আমি? আমি বসে বসে উল্লেব আঁমা বানাই। নিজের গল্প তো বটেই। বন্ধুদের মজি-মজিকও বানাই।

মা—তোমাদের দু' দলকেই কি এমনি একষেধেমির মধ্যে সময় কাটাতে হয়?

জিয়া—সবাই! সবাই! সকলেরই এক অবস্থা। কেউ ট্রেকে, কেউ টিলার উপর, কেউ বা পাহাড়ের গুহার। কখন যুদ্ধ হবে, তার জ্ঞান ওত পেতে বসে থাকতে হয়। শুধু বসে থাকা।

বাবা—(চিন্তায় অবস্থায় পায়চারি করেন) আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়? আমরা এই যুদ্ধটা বন্ধ করে দিতে পারি।

জিয়া ও যোগিন্দর—(একত্রে) সে কি! এই যুদ্ধ বন্ধ করে দেব—আমরা?

বাবা—খুব সোজা ব্যাপার। (যোগিন্দরকে) তুমি এক কাজ কর। তোর দলের সব বন্ধুদের ডেকে বুঝিয়ে বল, আমাদের বারী শত্রু তারা যুদ্ধ চায় না। (জিয়ারকে) তুমিও তোমার বন্ধুদের কাছে গিয়ে এমন

করে বল। তারপরে জুদলই ছুদিক থেকে যে বার ঘরে চলে যাও।
বাস্ যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে।

জিয়ারা ও বোগিন্দর—(একত্রে) চমৎকার! দারুন!

মা—(জিয়ারাকে) তুমি বাড়ি কিরে গিরে মায়ের ইতিরিটা ভাল করে,
মেরায়ত কর গে। নুরজাহানকে বিয়ে করে কেল।

বোগিন্দর—বাবা, তুমি সত্যি একটা নতুন বুদ্ধি বেয় করেছে। আমরা সবাই
যুদ্ধের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারি। মনে হয় এর আগে কেউ
এমন ভাবতেই পারে নি।

মা—তুই কি ভাবিস মহুয়া, তোর বাবা কি যে-সে লোক? তিনি অনেক কিছু
পড়েছেন, বড় বড় নেতাদের বক্তৃতা শুনেছেন, তাদের দেখেছেন।

জিয়ারা—কিন্তু এই পরিকল্পনার আর একটা দিক ভেবেছেন? যুদ্ধ থেমে গেলে
কিন্তু যারা সার্জেট, মেজর, কর্পোরাল, তাঁরা কি করবেন? তাঁরা
হুকুম করবেন কাকে? জিতবেনই বা কি?

বাবা—আমরা ওদের হাতে পিটার, বেহালা, সেতার এমনি সব যন্ত্র তুলে দেব।
এই সব বাজনা নিয়েরা শিববেন, অন্তকেও শেখাবেন।

জিয়ারা—বাহ্! চমৎকার! চমৎকার!

বাবা—দেখলে কত সহজে একটা মত বড় সমস্যা মিটে গেল। একুনি! এই
মুহুর্ত থেকে তোমরা কাজে নেমে পড়।

জিয়ারা—নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

বোগিন্দর—আমার বন্ধুরা সবাই দারুন খুশি হবে।

মা—মহুয়া, যুদ্ধ তো মিটে গেল। এইবার তোর পছন্দ করা একটা
গান বাজাই।

বোগিন্দর—(আনন্দে) নিশ্চয়ই।

জিয়ারা—বাঃ! তারি স্বন্দর হবে। এই বিরাট যুদ্ধের মধ্যে আনন্দে নেচে
উঠতে ইচ্ছে করছে।

[মা গ্রামোফোন বাজাতে শুরু করেন। গানের তালে তালে বোগিন্দর নাচতে
শুরু করে। জিয়ারা নাচ। জিয়ারার দিকে হাত বাড়ায়। সেও নাচতে
শুরু করে। মা-বাবা জুলে জুলে হাত তালি দিয়ে ওদের উৎসাহ দিতে থাকেন।

এমনি সময় টেলিফোন বেজে ওঠে। ওরা সবাই আনন্দে এত মশগুল যে
সে শব্দ শুনতে পায় না। টেলিফোন থেমে যায়। আবার বেজে ওঠে।
এবারেও কেউ শুনতে পায় না। আবার যুদ্ধ শুরু হয়। এরোগ্রেনের শব্দ।

বোমা, মেশিনগানের আগুয়াজ। হঠাৎ এক ঝাঁক গুলি এসে গুলির চারজনকেই
পায়ে লাগে। ওরা চারজনেই বহুশায় কাতরাতে কাতরাতে মাটিতে পড়ে
যায়। একটা গুলি এসে রেকর্ড চিগড়ে দেয়। ফলে গানের একটা লাইনই
বার বার বাজতে থাকে। ধীরে ধীরে যুদ্ধের সব শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু
গ্রামোফোনের রেকর্ডটা একইভাবে বাজতে থাকে। রেকর্ডের দুজন
স্বচ্ছাসেবী স্ট্রীচার হাতে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। এগিয়ে যেতে থাকে।
স্থির চিত্র।] পর্দা নেমে আসে।*

* কার্গিলে আরাবেল-এর শিকড়িক অম দি ব্যাটলফিল্ড অবলম্বনে। অভিনয়ের জন্য
মাটাকারের অনুমতি নিতে হবে।

রামমোহনের বিলাতগমনের উদ্দেশ্য ও ফল

প্রদীপ রায়

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর রামমোহন বিলাত যাত্রা করলেন। পর বৎসর ৮ এপ্রিল তিনি লিভারপুল বন্দরে পৌঁছন। রামমোহনের বিলাত যাত্রার কথা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিলাতযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা ভ্রম-কল্পনা ও মন্তব্যাদির স্রোতপাত হয়। শহর কলকাতার তৎকালীন বঙ্গসমাজে বঙ্গসভ্যতার পক্ষে কালাপানির পরপারে বিলাত যাত্রা এক অজিহব ব্যাপার, বিশ্বাসের বিষয়। সুতরাং বিশ্ববাসিষ্ট বঙ্গসভ্যতা অনেকেরই তাঁর বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্য নির্ধারণে উৎসুক। অশচ উক্ত উদ্দেশ্য নির্ধারণে অক্ষম হওয়ার বিভ্রান্ত। এ প্রসঙ্গে ১৫ নভেম্বর, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের গভর্নমেন্ট গেজেট মন্তব্য করে লিখেছে—

“Some of his country-men in Calcutta appear much puzzled to account for Rammohun Roy's motives in undertaking such an unusual thing as a voyage to Europe.”^১ উক্ত পত্রিকা রামমোহনের বিলাতযাত্রার উদ্দেশ্য নির্ণয় প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছে

“To a mind like Rammohun Roy's thirsting for knowledge, the wish of seeing other countries and other people, and of beholding personally the working of systems which he knew of only by history or report, arose a natural result of what has preceded. For several years therefore this idea has been entertained by Rammohun Roy and he

has at length carried it, to a certain extent, into effect. We should not have taken the liberty of making these remarks, but for the notoreity which the circumstance has already attained and the speculations to which it has given rise.”^২

ইতিপূর্বে অবশ্য ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২ মে তারিখে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত একটি সংবাদ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

‘আমরা শুনিয়াছি কিছু তাহার তথ্যাতথ্যতার বিষয়ে আমরা শপথ করিতে পারি না যে দিল্লীর বাদশাহকে কেহ ইহা শিক্ষা করাইয়াছে কোম্পানীর উপরে তাঁহার এক বাবতে চারি কোটি টাকার দাওয়া ছিল এবং সেই দাওয়ার শেষকরণার্থে তিনি একজন অতিশয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংলণ্ড দেশে প্রেরণ করিতেছেন।’^৩

কিছু উক্ত প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তি যে রামমোহন তা তখন সাধারণের বোধ করি, জানা ছিল না। রামমোহন স্বয়ং তাঁর বিলাতবাজার উদ্দেশ্যে বিলাতবাজার পূর্বে সাধারণে প্রকাশ করেছেন এমন তথ্য অল্পপরিচিত।

ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত একটি তথ্যের উল্লেখ করে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর সমাচার দর্পণ লেখে :

‘ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে বাবু রামমোহন রায় সতী বিষয়ক এক দরখাস্ত পার্লামেন্টে দেওনার্থ সমভিব্যাহারে লইয়া বিলাতে গিয়াছেন। উক্ত বাবু যে জাহাজে গমন করিয়াছেন তাহা এই ক্ষণে গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে।’^৪

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুন সমাচার দর্পণ লেখে :

‘এইক্ষণে যে তিনি (রামমোহন) মির্ষিমে ইংলণ্ডের তটে উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবেন এমত আমরা প্রত্যাশা করি এবং হৌস অফ কমন্সের কমিটির সাহেবদের সমক্ষে ভারতবর্ষীয় অবস্থার বিষয়ে স্মরণ্য তিনি সাক্ষ্য দিবেন অপর ভারতবর্ষের হিতার্থে যে নানা ষড়্ধ করিবেন তৎপ্রযুক্ত ভারতবর্ষের শুভফল অন্নিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।’^৫

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিলের লিভারপুল নগরের পক্ষে প্রকাশিত সংবাদ উল্লেখ করে সমাচার দর্পণ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট লেখে :

“১২ তারিখে নগরস্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া কমিটির কএকজন সাহেববাবু রামমোহন রায়ের আগমন জন্ত সন্তোষ আপনাব্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে কোম্পানীর বিরুদ্ধে আপনি আশায়-বিগের যে অনেক প্রকার সাহায্য করিবেন এমত আশাদের ভরসা। তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যে অভিপ্রেত তাহা বিরোধের দ্বারা নিশ্চিন্তি না হইয়া সলাস্বারা যে নিশ্চিন্তি হয় এমত বাহা। আদালত সম্পর্কীয় কোন, স্থনিয়ম করিতে এবং খীয় বাণিজ্য বহিত করিতে এবং দেশমধ্যে লবনাদির একচেটিয়া রূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইউরোপীয়দিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসবাসার্থ অস্বমতি দিতে এবং মোকদ্দমা ব্যক্তিরেকে তাঁহাদিগকে তদ্রূপে বহির্ভূত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা বহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে বস্তুপি কোম্পানী বাহাদুর স্বীকৃত হন তবে তাঁহারা যে পুনর্ব্যায় চাটায় পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।”

বলা বাহুল্য রামমোহনের বিলাতযাত্রার কালে বা বিলাতে পৌছনোর অব্যবহিত পরে বিস্তারিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রামমোহনের বিলাতযাত্রা সম্পর্কিত তথ্য থেকে রামমোহনের বিলাতযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা করা যায় না। পর্ব্বমেন্ট পেস্তেটের উদ্ধৃতি দিয়ে বরং বলা যায় :

‘We have all sorts of guesses on the subject—
which perhaps might have been as well spared.’

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রামমোহনের বিলাতযাত্রার পরে কোম্পানির সনদ পুনর্বহাল করার প্রস্তাব বিবেচনার জন্য ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয় এবং তাঁর বিলাতে পৌছনোর পরে জুন মাসে কমিটি পুনর্গঠিত হয়। অথচ রামমোহনের বিলাতে পৌছনোর সংবাদ পাওয়ার পূর্বেই ১৮ জুন সমাচার দর্পণ প্রকাশ্য করে যে রামমোহন হাউস অব কমন্সের কমিটির সমক্ষে ভারতবর্ষীয় অবস্থা বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। উপরন্তু লক্ষ্মীর লিভারপুলে পৌছনোর চারদিনের মধ্যে লিভারপুল বন্দরের ইস্ট কমিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে রামমোহনের সাক্ষাৎকার এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কমিটিকে সাহায্যের প্রস্তাব রামমোহনের বক্তব্য।

অন্তর্গিকে রায়মোহন তাঁর বিলাতবাজার উদ্দেশ্য বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দেশ করেছেন। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে বিলাতবাজার পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানির সরকারকে লেখা অনেকগুলি পত্রে তাঁর বিলাতবাজার একটিমাত্র উদ্দেশ্য স্থনির্দিষ্ট—তা হলো বুটেনের রাজ-দরবারে মোগল-বারাণসী দ্বিতীয় শাকবরের দৌত্যকার্য। কিন্তু সরকার বাহ্যিক রায়মোহনের এই দৌত্য এবং দ্বিতীয় শাকবর প্রদত্ত তাঁর রাজা উপাধি স্বীকার না করার তিনি সরকারকে জানান :

I have determined not to appear there as the envoy of his Majesty Akbar II but as a private individual.*

অবশ্য বিলাতে পৌঁছেই তিনি কোম্পানির Chairman এবং Deputy Chairman-কে জানানেন :

"I possess full and unlimited powers from His Majesty to negotiate and agree to a final settlement of what the king considers to be his fair and equitable claims on the Honorable East India Company."*

আবার ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ভারতের বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থা বিষয়ক পুস্তিকার Preliminary Remarks অংশে তাঁর বিলাতবাজার একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য নির্দেশ করে রায়মোহন লিখেছেন :

"I was continually making efforts for a series of years to visit the Western World with a view to satisfy myself on those subjects (Subjects and events peculiarly connected with Europe) by personal experience."*

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর রায়মোহনের যুক্তার আট দিন পরে Sandford Arnot রায়মোহনের লেখা একটি পত্র প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রটি রায়মোহনের 'antobiographical letter' বলে পরিচিত। উক্ত পত্রে তাঁর বিলাতবাজার একাধিক উদ্দেশ্য নির্দেশ করে রায়মোহন লিখেছেন :

"I embarked for England, as the discussion of the East India Company's Charter was expected to

come on, by which the treatment of the natives of India and its future government, would be determined for many years to come and an appeal to the king in council against the abolition of the practice of burning widow's was to be heard before the Privy Council, and his Majesty the Emperor of Delhi had likewise commissioned me to bring before the authorities in England certain encroachments on his rights by the East India Company. I accordingly arrived in England in April, 1831,"

কিন্তু এই পত্রটি রামমোহনের লেখা বলে অভিহিত হলেও রামমোহনের জীবনীকার Sophia Lobson Collet এই পত্রটিকে 'The spurious letter' বলে মন্তব্য করেছেন।

অপরদিকে রামমোহনের বিলাতযাত্রার প্রাকালে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর ব্যবসায়ী, বেহাশশিষ্ঠ ও রামমোহনের অগ্ররাস্তা ইয়ং সাহেব মৌরমী বেহাশের কাছে রামমোহনের যে পরিচয়পত্র লিখেছেন এ-প্রসঙ্গে তার অংশবিশেষ উল্লেখ্য :

"His (Rammohun's) grand object, besides the natural one of satisfying his own landable spirit of enquiry, has been to set a landable example to his benighted countrymen ; and every one of the slow and gradual moves that he has made preparatory to his actually quitting India has been marked by the same discretion of judgement."

লিটারগুণে রামমোহনের সঙ্গে আলোচনা শেষে রামমোহনের বিলাত-যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনামধ্যাত William Roscoe তাঁর দ্বারা ব্যক্ত করেছেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী সদস্য লর্ড Brougham-কে লেখা এক পত্রে। Roscoe সাহেব লিখেছেন :

"Amongst the many and important motives which have induced him to leave his country and connec-

tions and visit this island, I understand he is induced to hope he may be of some assistance in promoting the cause of the natives of India in the great debate which must ere long take place here, respecting the charter of the East India Company.”*

কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘বাল্যলার ইতিহাস’ (দ্বিতীয় খণ্ড) নামক গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রায়মোহনের ইংলণ্ড গমনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য নির্দেশ করেছেন। বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

“লর্ড আমহাষ্ট বাহাদুরের অবিকারকালে তৈমুরবংশীয়দিগের সাম্রাজ্য নিবন্ধন প্রাপ্ত রহিত হয়। সম্রাট অপহারিত মর্যাদার উচ্চর বাসনায়, ইংলণ্ডে আপীল করিবার নিশ্চয় করিয়া, রাজা রায়মোহন রায়কে উকীল স্থির করেন। পূর্বকালে, সমুদ্রযাত্রা স্বীকার, ভারতবর্ষীয়দিগের নিন্দা ও অবম্য হইত না; ইহানীন্তন সময়ে, কোনও ব্যক্তি আহাঙ্গে গমন করিলে, তাহাকে আতিশ্রুতি হইতে হয়, কিন্তু রাজা রায়মোহন রায় অসমুচিত্তি চিন্তে আহাঙ্গে আরোহণপূর্বক ইংলণ্ডে গমন করেন।”^{১৩} স্বতরাং লক্ষণীয় রায়মোহনের বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে রায়মোহনের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য এবং তাঁর সমসাময়িক বা প্রায় সমসাময়িককালের বশবী ব্যক্তিদের এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও বক্তব্য অতি বিচিত্র।

রায়মোহন রায় মোগল বাদশার দৌত্যকর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বেঙ্গল হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদক মণ্টগোমারি মার্টিন সাহেবকে বাদশার কার্যে তাঁর সহকারী হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখের ‘জনবুল’ পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় দৌত্য কার্যের উদ্দেশ্যে রায়মোহন ও মার্টিন সাহেব ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট/সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম বিলাত যাত্রার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন কটক, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর পথে। সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। তারপর মাগধানেক পরে তারা প্রথমে এলাহাবাদ পরে রঞ্জিং সিং-এর পাক্কাব অতিক্রম করে বিলাত বাওয়া স্থির করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাও ব্যর্থ হল।^{১৪} অবশেষে ১৯ নভেম্বর ১৮৩০ কলকাতা থেকে রায়মোহন বিলাত যাত্রার সক্ষম হন।

কালক্রমাক্রমে রায়মোহনের বাদশার দৌত্যকার্য গ্রহণ এবং বিলাত-

স্বাক্ষার সিদ্ধান্ত ও প্রস্ততি গ্রহণের অনেক পরে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর লর্ড বেকিঙ্ক সতীদাহ বিলোপ আইন জারি করেন। ধর্মসভাপন্থীরা দাবীকান্ত দেবের নেতৃত্বে এই আইন বাতিলের দাবিতে লর্ড বেকিঙ্কের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। লর্ড বেকিঙ্ক তাদের প্রদত্ত স্মারকলিপির বক্তব্য অগ্রাহ্য করেন। এমতাবস্থায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের আলুয়ারি মাসে ধর্মসভাপন্থীরা উক্ত আইন বাতিলের দাবিতে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করে। সুতরাং নিঃসন্দেহে এ-সিদ্ধান্ত করা যায় যে রামমোহনের বিলাত যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে এবং সে উদ্দেশ্য প্রাথমিক প্রস্তুতির পর্বে ধর্মসভাপন্থীদের প্রিভি কাউন্সিলে আবেদনের বিরুদ্ধে সতীদাহ বিলোপ আইনের পক্ষে প্রিভি কাউন্সিলে দরখাস্ত পেশ করার প্রয়োজন দেখা দেয় নি। অতএব প্রিভি কাউন্সিলে ধর্মসভাপন্থীদের আবেদনের বিরুদ্ধে সতীদাহ বিলোপ আইনের পক্ষে স্মারকলিপি পেশ করার প্রয়োজন রামমোহনের বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়; যদিচ প্রিভি কাউন্সিলে ধর্মসভার আবেদনের অন্যান্য সময় তিনি উক্ত কাউন্সিলের অধিবেশন কক্ষে নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন এবং সে-সময় সতীদাহ বিষয়ে সমালোচনাপূর্ণ পুস্তিকা ইংরাজীতে প্রকাশ করেন।

আবার ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কম্পানির সনদ পুনর্প্রদানের প্রশ্ন বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বিচার-রাজস্ব-ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিস্থিতি অস্থ-স্বত্বানের অন্ত ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হাউস অব কমন্স প্রথম সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ করে এবং জুন মাসে উক্ত কমিটি পুনরায় নিযুক্ত হয়। প্রথম সিলেক্ট কমিটি গঠনের সময় রামমোহন 'Albion' জাহাজে ছিলেন এবং দ্বিতীয় কমিটি গঠনের সময় তিনি লণ্ডন শহরে উপস্থিত। ভারতেও তাঁর বিলাত গমনের সিদ্ধান্ত ও প্রস্ততি শুরু হয়েছে হু বৎসর পূর্বে। সুতরাং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে ভারতের ভবিষ্যৎ সরকার গঠন এবং ভারতীয়দের প্রতি ভবিষ্যৎ সরকারের আচরণকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে রামমোহন বিলাতে গিয়েছিলেন এ-হেন যুক্তি ঘটনার কালক্রমবিচারে গ্রহণীয় নয়; যদিচ রামমোহন বিলাতে থাকাকালে সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার অন্ত ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে আহুত হয়েছিলেন এবং তিনি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে লিখিতভাবে তাঁর বক্তব্য উক্ত কমিটিতে পেশ করেন।

সুতরাং উপরিউক্ত তথ্য ও তৎসংক্রান্ত বিশ্লেষণ থেকে একথা অনস্বীকার্য যে রামমোহনের বিলাত যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে তাঁর বিলাত যাত্রার

একটি মাত্র উদ্দেশ্য স্থিতি। ‘বাল্লাশার ইতিহাস’-এ বোধকরি সে কারণেই ঈশ্বরচন্দ্র রায়মোহনের বিলাত যাত্রার একটি উদ্দেশ্যই নির্দিষ্ট করেছেন। সে উদ্দেশ্য হলো দিল্লীর বাদশা দ্বিতীয় আকবরের দৌত্য। অতএব জ্ঞানপিপাসু রায়মোহনের বিলাত-দর্শনের শুভ অভিলাসকে স্মরণে রেখেও একথা বলা অধৌক্তিক হবে না যে এতাবৎকাল রায়মোহনের বিলাত যাত্রার অন্ত্যস্ত উদ্দেশ্য বলে চিহ্নিত উদ্দেশ্যগুলি রায়মোহনের বিলাত যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরবর্তীকালে আরোপিত। অবশ্য বিলাতে রায়মোহনের সঙ্গে ভারত বিষয়ে আলাপ-আলোচনার সময় অনেকেরই মনে ধারণা হইবে থাকবে যে রায়মোহনের বিলাত যাত্রার অন্ত্যস্ত প্রধান উদ্দেশ্য কম্পানির সনন্দ বিষয়ে পার্লামেন্টে বিতর্কের কালে ভারতীয় জনসাধারণের উন্নয়নের প্রস্তুতি সহায়তা প্রদান। এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য বিষয়াত ঐতিহাসিক Roscoe সাহেবের পূর্বে উল্লিখিত বক্তব্য।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির সরকারের সঙ্গে মোগল বাদশার পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনসূচক ঘটনা এবং রায়মোহনের বিলাতযাত্রা পরস্পর কার্য-কারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত। মোগল বাদশার সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির সরকারের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা হয় লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে। কম্পানির সরকারের উপর মোগল বাদশার নামমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকারের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় হেষ্টিংস সরকারের আচরণে। বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানে মোগলবাদশাকে বৃটিশ সৈন্যধ্যক্ষের নকলানা প্রদানের প্রচলিত রীতি পরিত্যক্ত হয়। যে সব রীতি ও আচরণ কম্পানির রাজত্বের উপর মোগল বাদশার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীকরূপে গণ্য হতে পারে সে সব রীতি ও আচরণ পরিত্যাগের সুযোগ গ্রহণ করেন লর্ড হেষ্টিংস-এর সরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য মোগলবাদশার সঙ্গে কম্পানির সরকারের পক্ষ বিনিময়ের প্রচলিত রীতি। এ-প্রসঙ্গে কম্পানির সরকারের পারসিক ভাবাবিহীন সেক্রেটারির বক্তব্য উল্লেখ্য :

“Until about 1819/20 A. D. the Governor-General used a great seal on which the title “Fiduce Akber Shah” or “Vassal of king Akber” were inscribed, and addressed His Majesty by letter, in the humble form of an Arzee or petition. At that period it was determined, although no formal resolution was

recorded on the subject to discountinue the use of the seal bearing the above impression, and to substitute the one which had been long, previously prepared for the Governor-General's foreign correspondence...from the same date the Head of the British Government Ceased to address any written Communication whatever to His Majesty.””

অনুরূপ ভাষ্যের উল্লেখ রয়েছে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জুলাই কোর্ট অব ডিরেক্টরস-কে লেখা সপরিষদ পত্ৰের সেনারেলের একপত্র :—

“All intercourse by letter between the Governor-General king of Delhi had been dropped since 1819/20, chiefly in consequence of a resolution which was taken at that period by the Marquis of Hastings to discountinue in his correspondence with the native Princes of India the use of the seal having inscribed on it ‘Tidree Akbar Shah’ or ‘Vassal of king Akbar.’””

কম্পানির সরকারের এ-সব প্রচেষ্টাকে সম্ভাব্যতাই তৈমুরবংশীয়দের প্রতি ‘ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা’ প্রদর্শন বলে গণ্য করেছেন বাদশা দ্বিতীয় আকবর এবং সে-কারণে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে মোগলবাদশার সঙ্গে কম্পানির সরকারের পুনরায় পত্র-বিনিময় আরম্ভ হয় তার জে. ই. কোলকককে দিল্লীর রেসিডেন্ট পদে নিয়োগকে কেন্দ্র করে। এই পত্রে কম্পানির সরকারের উপর মোগল বাদশার সার্বভৌমত্ব প্রকাশ পায় এরূপ সব শিলমোহর পরিত্যক্ত হয়। উক্ত পত্রের বয়ান ও অনুল্লিখ এতাবৎকাল ব্যবহৃত বয়ান ও অনুল্লিখ থেকে সম্পূর্ণ বড়। সুতরাং বাদশা দ্বিতীয় আকবর ক্ষুব্ধ হয়ে দিল্লীর রেসিডেন্টকে এক পত্রে লেখেন :

“he (Amherst) had recourse to the novel procedure of setting aside the Ceremonials and forms of address (ad ab wo Alkab) observed by his prede-

cessors, thus lowering me even in respect of the style of correspondence adopted towards me, a thing that I could least have expected.”

উপরন্ত ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের যে মাসে তাঁর পিতা শাহ আলমের সঙ্গে গুয়েলেনলি সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুসারে যমুনা নদীর পশ্চিমে কয়েকটি নির্দিষ্ট মহালের রাজস্ব থেকে বাদশা পরিবারের স্তরণপোষণের জন্য যে পরিমাণ বৃত্তি বাদশা ও তাঁর পরিজনকে দেয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির সরকার সে পরিমাণ বৃত্তি না দেওয়ায় একদিকে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ হচ্ছে এবং অন্যদিকে অক্ষম বাদশার প্রতি অন্ত্রায় আচরণ করা হচ্ছে, এ অভিযোগ উত্থাপন করলেন মোগল বাদশা দ্বিতীয় আকবর। তার প্রতি কম্পানির সরকারের এসব অন্ত্রায় আচরণের প্রতিকারের জন্য তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে বারংবার আবেদন করলেন। কিন্তু সে-সব আবেদন ব্যর্থ হল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে এ-সব অন্ত্রায়ের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের রাজস্বদরবারে তাঁর অভিযোগ নিবেদন করার জন্য বাদশা দ্বিতীয় আকবর রামমোহন রায়কে দূত হিসাবে নিযুক্ত করেন।

রামমোহন মোগলবাদশার দৌত্য কার্যের দাবি গ্রহণ করে মোগলবাদশার প্রতি কম্পানির সরকারের অন্ত্রায় আচরণের নানাবিধ অভিযোগসহ মোগলবাদশার তরফে একটি আবেদনপত্র রচনা করেন এবং উক্ত আবেদনপত্র ইংলণ্ডের রাজস্বদরবারে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। উক্ত আবেদনপত্রের একটি প্রতিলিপি কম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করলেন এবং আর-একটি প্রতিলিপি সহ তাঁর ইংলণ্ডযাত্রার কথা কম্পানির সরকারকে জানালেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি চিফ সেক্রেটারিকে লেখা এক পত্রে। বাদশা দ্বিতীয় আকবরের উক্ত আবেদনপত্রটি তাঁর দূত হিসাবে রামমোহনের অবশ্যকরণীয় বিষয়গুলি নির্দেশ করে এবং সে-কারণে উক্ত আবেদনপত্র রামমোহনের দৌত্যকর্মের মূল দলিল হিসাবে বিবেচ্য। উপরন্তু এই আবেদনপত্রে উত্থাপিত নানাবিধ অভিযোগের প্রতিবিধানের উপর রামমোহনের দৌত্যকর্মের সাক্ষ্য একান্তভাবে নির্ভরশীল।

উক্ত আবেদনপত্রের বর্ট অস্থচ্ছেদে কম্পানির সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লেখা হল :

“The right and title of the Royal family to the entire revenue of the mahals (certain mahals

West of Jamuna) were thus for a length of time distinctly and unequivocally acknowledged by the concession of Royal mootsudies of the power of supervision and report, but when those revenues materially exceeded the minimum of the Royal stipends, then it was that it became inconvenient to carry the plan into effect; and the Royal mootsudies were in consequence directed to withdraw their attendance at the cutcherry. In like manner the practice of submitting by the Resident for my Royal decision the proceedings in cases where capital punishment was adjusted by the criminal, has also long since been discontinued in neglect of the provision contained in the 6th Article of agreement."^{১৮}

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বারবার প্রতি অসম্মানজনক আচরণের অভিযোগ উত্থাপন করে উক্ত আবেদনপত্রের সপ্তম অঙ্কচ্ছেদে লেখা হল :

"Even in the communication (Lord Amherst's Commons).....insult in point of form was added to injustice. All the Governor Generals who have presided Lord Amherst in the government of British territories in India have thought it no degradation to themselves to address me or my august father in the style that custom has accorded to Royalty: Lord Amherst however thought proper to reduce me in his form of communication to the footing of an equal and thereby to rob me even of the cheap gratification of the usual ceremonials of address so as to

humble me as far as possible in the eyes of all ranks of people.””

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উল্লিখিত মর্বাদাহানিকর ব্যবস্থারি অবলম্বনের পূর্বে যমুনা নদীর পশ্চিমে নির্দিষ্ট কয়েকটি মহালের রাজস্বের উপর বাদশা পরিবারের দাবি যে স্থানীয় সরকার কর্তৃক আইন ও বিধি মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছিল তার বিবিধ প্রমাণ উল্লেখ করে উক্ত আবেদনপত্রে লেখা হল :

I have now briefly explained to your Majesty the wrongs I have suffered and the rights which I demand.””

উক্ত আবেদনপত্রের উপরিউক্ত অঙ্কুরগুলি অনুসরণে নিঃসন্দেহে বলা যায় রামমোহনের দৌত্যকার্যের মূল দুটি লক্ষ্য নির্দিষ্ট : ‘ঐতিমুখবংশীয়-দিগের অপহৃত মর্বাদার উদ্ধার’ এবং যমুনা নদীর পশ্চিমে কয়েকটি নির্দিষ্ট মহালের অপহৃত রাজস্বের সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধার।

বিলাতে শৌহনর পর দু বৎসর ধরে দিল্লীর বাদশার দৌত্যসংক্রান্ত নানাবিধ কার্যে রামমোহনকে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। বিলাতের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনেকের কাছেই তিনি তাঁর বাদশার জন্য দরবার করেছেন : সম্রাট চতুর্থ জর্জের দরবারে দাখিল করার জন্য তিনি বাদশাব তরফে একটি স্মারকলিপি রচনা করেন। কিন্তু উক্ত স্মারকলিপি বখাছানে দাখিল করার পূর্বে রামমোহন দিল্লীর বাদশার দাবি সম্বলিত একটি পুস্তিকা কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর কাছে দাখিল করেন। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টরস মোগলবাদশার দাবি সংক্রান্ত বিষয়ে রামমোহনকে কিছুই জানানেন না। এদিকে কোর্ট অব ডিরেক্টরস বাদশার বার্ষিক বৃত্তি শর্তাধীনে ১২ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ লক্ষ টাকা করার জন্য বোর্ড অব কন্ট্রোলার কাছে সুপারিশ করে এবং উক্ত সুপারিশ সিদ্ধান্তে পরিণত হলে তা বাদশাকে জানানো হবে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির সরকারের মাধ্যমে; রামমোহনকে এ-বিষয়ে তারা কিছু জানানেন না বলে স্থির হয়। এভাবে কোর্ট অব ডিরেক্টরস বাদশার দূত হিসাবে রামমোহনের অতিথি অস্বীকার করার এবং তৎকালীন অবস্থায় রামমোহন সম্ভাব্যতাই ক্ষুব্ধ হলেন।

ইতিমধ্যে তিনি বোর্ড অব কন্ট্রোলার প্রেসিডেন্ট তার চার্লস গ্রাণ্টের সঙ্গে পরিচিত হন। সাধারণত শাসনকার্য বিষয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া

কম্পানির কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করা এবং ভারতের কম্পানির সরকারের কাছে কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর নির্দেশগুলি অহুমোদন করার দায়িত্ব বোর্ড অব কন্ট্রোলার উপর স্তব্ধ ছিল। হতবাক এরূপ সুপারিশ এবং তাঁর প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের জন্য কোড প্রকাশ করে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ অক্টোবর স্যার চার্লস গ্রান্টকে লিখলেন :

Any just man feels desirous to be informed whether the powers entrusted to his servants, particularly those in a remote country, have been properly exercised, and to prove that when any injustice has been done by them he is anxious to afford redress—a course which is calculated to discourage future injustice. But with regard to the Court of Directors I am sorry to find that in my humble opinion the case is quite the reverse. In the meantime I am here so situated as to be responsible not only to the king of Delhi but to the whole body of any countrymen for my exertions in his behalf and for their welfare.”^{২১}

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর রামমোহন তাঁর রচিত বাদশার দাবি সংক্রান্ত স্মারকলিপি স্যার চার্লস গ্রান্টের বিবেচনার জন্য পেশ করে তাঁকে আনালেন :

Finding the Court of Directors assuming so high a tone in defiance of justice, I feel bound to take my stand upon the full extent of the king's claims which I trust you will perceive does not arise from any inconsistency on the part.”^{২২}

কিন্তু রামমোহনের এ-সব বক্তব্যে কোনো ফললাভ হলো না। বাদশার দাবি বিষয়ে কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর উপরিউক্ত সুপারিশ বোর্ড অব কন্ট্রোলার অহুমোদনক্রমে স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হল। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারতে কম্পানির সরকারকে এক নির্দেশপত্র প্রেরণ করে।^{২৩} তদনুসারে

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর এ-সিদ্ধান্ত বিষয়ে কম্পানিৰ সরকার দিল্লীর মোগলবাদশাকে অবহিত করে।^{১৮}
 ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ অগাষ্ট তারিখের সভাচার দর্পণে একটি সংবাদ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য : মফঃস্বল আকবরের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে দিল্লীর শ্রীমুত রেসিডেন্ট সাহেব শ্রীশ্রীমুত রাজা মোহনলালের সমভিব্যাহারে সম্প্রতি দিল্লীর শ্রীমুত বাদশাহের নিকটে উপস্থানপূর্বক কহিলেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আপনার বৃত্তি বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বর্ধিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন পরে ঐ সম্বাদসূচক যে পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অঙ্কুরা করিয়া বাদশাহকে জ্ঞাপন করিলেন।^{১৯}

রামমোহনের পরামর্শক্রমে মোগলবাদশা কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না এবং তাঁর দূত রামমোহন অবিকতর দাবি আদায়ে সমর্থ হবেন, এই আশায় তিনি অপেক্ষা করলেন। রামমোহনের বক্তব্য যে দৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ-কথা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইছে বোড অব কন্ট্রোলার তৎকালীন সেক্রেটারি William Calcill-এর একটি মন্তব্যে। মন্তব্যটি হল :

“The court, also, seem to think too lightly of the consequences of an appeal to Parliament, fortified as Rammohun Roy would be by the words of the instructions of May 1805, which can not will be explained away (8 Nov. 1831)^{২০}

কিন্তু রামমোহনের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিলো ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর। মৃতরাং শেষ পর্যন্ত দিল্লীর বাদশা তাঁর দাবি সম্পর্কে বোড অব ডিরেক্টরস-এর উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হলেন। অন্তএব উপরিউক্ত তথ্য ও তৎসংক্রান্ত বিবরণ থেকে এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ‘তৈমুর-বংশীয়দিগের অপরূপত মর্যাদার উদ্ধার’ এবং যমুনা নদীর পশ্চিমে কয়েকটি নির্দিষ্ট মহালের অপরূপত রাজস্বের সম্পূর্ণ অংশের উদ্ধার—রামমোহনের দৌত্যকার্যের এই দুটি লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়েছে; যদিচ মোগল বাদশার বার্ষিক বৃত্তি ৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়।^{২১}

মিহেনিকা

১। The days of John Company, Compiled and edited by A. C. Dasgupta p 590

- ২। Ibid ; p 590
- ৩। সর্বোদগ্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড), ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৩০০-৩০১-
- ৪। Ibid, op. cit পৃ ৩০০
- ৫। Ibid, op. cit পৃ ৩০১
- ৬। Ibid, op. cit পৃ ৩০২
- ৭। Dasgupta, op. cit p 590
- ৮। Nag and Burman : The English works of Raja Ramm ohun Roy part IV p 117
- ৯। Ibid op. cit p 119
- ১০। Ibid op. cit part III p 8
- ১১। The life and letters of Raja Rammohun Roy : Collet/Edited by Biswas and Ganguly p 498
- ১২। The last Days of Rajah Rammohun Roy : Brojendranath Banerjee. (The Modern Review, October, 1829), p 381
- ১৩। বাঙ্গালার ইতিহাস : বিভাসার রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) পৃ ২১০
- ১৪। Collet, op. cit p 282-283, 291 F. n. 33
- ১৫। Raja Rammohun Roy and the last Mughals (Ed) J. K. Majumdar Introduction p XIVII
- ১৬। Ibid, p 189
- ১৭। Ibid, Introduction II
- ১৮। Ibid, p 198 para 6
- ১৯। Ibid, op. cit p 198 para 7
- ২০। Ibid, op. cit p 201 para 12
- ২১। Nag and Burman op. cit part IV p 122
- ২২। Ibid, op. cit p 123
- ২৩। Rammohun Roy's Political Mission to England II, B. N. Banerjee (The Modern Review, February, 1929) p 164
- ২৪। Ibid. op. cit p 164
- ২৫। সর্বোদগ্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড) ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৩০০
- ২৬। Rammohun Roy's Political Mission to England II, p 164
- ২৭। Ibid, p 164

জমির শেষ টুকরো

ইব্রাহিম শরীফ

ইব্রাহিম শরীফ হিন্দী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার। 'সমানান্তর লেখক' আন্দোলনের অগ্রদূতদের মধ্যে ইব্রাহিম শরীফ অন্যতম। দক্ষিণ ভারতের অহিন্দীভাষী এলাকাগুলিতে হিন্দী ভাষা প্রচারে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

ইব্রাহিম শরীফের গল্পগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় সহায়সম্মলহীন মানুষের বাস্তব জীবন, প্রতিফলিত হয় এই জীবন থেকে বেরিয়ে আসার জঙ্গ তাগের তীব্র ইচ্ছা। হিন্দী গল্পকে রীতিবদ্ধতার বাধন থেকে বার করে সংগ্রামের ভিত্তি-প্রস্তরের ওপরে স্থাপিত করেন ইব্রাহিম শরীফ। তাঁর 'যুগান্তর', 'দ্বিগুণমিত', 'জমীন কা আধিরী টুকড়া' [জমির শেষ টুকরো] ইত্যাদি গল্পগুলিতে বৈষম্য-মূলক সমাজের বস্তুগুলি প্রতিফলিত, এবং তার পাশাপাশি এই গল্পগুলি সেই মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ ব্যাঙ্গ পরিবর্তনশীল বাস্তবের গটভূমিকায় যুগ্মান। ইব্রাহিম শরীফ বলতেন যে শোষণ বিরোধী গল্পগুলিতে জীবন সাক্ষিয়ে শুধিয়ে তৈরি করা হবে না বরঞ্চ জীবনের ওপরে আশ্রিত হয়েই সৃষ্ট হতে হবে এই দেশীয় গল্পগুলিকে।

মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ২৭ এপ্রিল সন ১৯৭৭ তারিখে রাজি আটটায় ইব্রাহিম শরীফের মৃত্যু হয়। তাঁর গল্প সংকলন 'কই সুরজো কে বীচ' [কয়েকটি সূর্যের মাঝামাঝি] বহুপঠিত এবং উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে।

বসন্তকুমার

মা তখন উঠোনের একটা খাটে শুয়েছিল। আমার ডাকে উঠে বসল। এ্যাটাচিটা খাটের পাশে রাখলাম। মার গায়ে হাত দিলাম। আর মাঘের পাশেই বসে পড়লাম। মা আমার আরও কাছে সরে এল। হুহাত দিয়ে চিবুকস্বত্বে মুখটা তুলে ধরল।

বড়দা আর ছেলেমেয়েরা খেতে বসেছিল। আমার গলা শুনে সবাই বেরিয়ে এল। ছোড়দাও এসেছে দেখলাম। বড়দার ছেলেমেয়েরা এঁটো

হাতেই আমার জড়িয়ে ধরল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। মা বলল “হাত মুখ ধুয়ে ধোয়ে নে। এতদূর থেকে এসেছিল।”

এ্যাটাচিটা তুলে ঘরের ভেতর চলে গেলাম। বৌদি কুটি সেকছিল। কেমন আছি জানতে চাইল। আমার পোষাক পালটে নিলাম। হাত মুখ ধুলাম। এবং অবশেষে খেতে বসলাম। ছোড়দাকে প্রশ্ন করলাম, “ববে এসেছে?”

বড়দাই আগ বাড়িয়ে উত্তর দিল, “পরশু সকালে।”

“বৌদি, ছেলে-মেয়েদের আনলে না?”

“না।”

“ছেলেমেয়েরা কেমন আছে?”

“ভালই। তোমার কথা বলে সবসময়।” কুটির একটুকরো মুখে স্তরতে স্তরতে কথাটা শেষ করল ছোড়দা। ডালে হুনের মাত্রা কম ছিল। একটু স্কন মিশোলাম। বড়দা প্রশ্ন করল, “তার পেয়েছিলে?”

“হ্যাঁ।”

“আমি ভেবেছিলাম বোধহয় তার পেয়েই রওনা হবে তুমি।”

“ছুটিই পেলাম না।”

কুটি চিবোতে চিবোতে আমাকেই দেখছিল বড়দা, একটু বিষম অরে বলল, “তোমার এ কথাটা আজীবন শুনে আসছি।”

“কি করব বলুন। ক্যান্টরির নিয়মই এই। চাকরি তো করতে হবে।”

বড়দা অল খেল। ছেলেমেয়েদের খাওয়া হয়েছিল ইতিমধ্যেই। বড়দা বাইরে গিয়ে হাত ধুয়ে এল। দেওয়ালের খুঁটিতে টাঙান কামিজের পকেট থেকে বিড়ি বার করে দেওয়াল বেঁধে বসল। ছোড়দার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ও উঠল না।

বিড়িতে করেকটা টান দিয়ে বড়দা বলল, “তোমার মনে পড়ে গত দুবছর বাড়ি আসনি তুমি।”

“মা তো ভালই আছে দেখছি।” তবু আপনি তার পাঠালেন।”

“মা মারা যাবার খবরটা পেয়েই আসবে ঠিক করেছিলে বুঝি।”

“বড়দা! আপনি মিথ্যে রাগছেন। আমার বুঝি বাড়ি আসার ইচ্ছে হয় না।” পেলানের অবশিষ্ট অলে অভ্যাসবশত হাতটা ডুবিয়ে দিলাম।

“এও ত চাকরি করে বাইরে। কিন্তু বছরে একবার আসে ঠিকই। আর তোমার তো বৌ ছেলে কিছুই নেই।”

কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলাম। বোধহয় ছোড়দার ধারণা হল বড়দার কথাই আহত হয়েছি তাই তাড়াতাড়ি বলল, “আমার ত সরকারি চাকরি বড়লা—বখন খুসি ছুটি নেওয়া যায়। প্রাইভেট কোম্পানিতে ঠিক সে অবিধে পাওয়া যায় না।”

বড়লা বিড়িতে শেষ টান দিয়ে আগুনটা মেঝেতে নিক্ষেপে দিলেন। তারপর গভীর গলায় বললেন, “তুমি আয়নার নিজের মুখটা দেখ।”

প্রায়টা শুনে হেসে ফেললাম। ছোড়দা আর আশেপাশের ছেলেমেয়েরাও হেসে উঠল। বৌদি উত্তরের পাশে বসেই ধৈর্যে নিচ্ছিল। বোধহয় ভাল স্মৃতিয়ে বাওদার কটি আর কাঁচা পৈয়াজ চিবুচ্ছিল। বড়দা পা দুটো ছড়িয়ে বসেছিলেন। আমি একদৃষ্টে দেখছিলাম ঠকে। মাথায় টাক পড়ে গেছে। একটু দুঃখ হল, “বড়দা আপনার চেহারা ধারাপ হয়ে গেছে।”

উঠে সেই কামিজের পকেট থেকে আর একটা বিড়ি বার করল বড়দা, বলল, “তুমি নিজের চেহারাটা ত আগে দেখ আয়নার—কেমন হাড়গিলের বতো চেহারাটা করেছে।”

আমি তখন বড়দার কথাই ভাবছিলাম। বাবার কথা মনে পড়ে না আমার। বড়দাই অগত্যা মেহে মাহুব করেছেন আমাদের। পড়িয়েছেন, চাকরি না হওয়া পর্যন্ত সব দায়িত্বই মাথার বয়েতেন। বাবার মৃত্যুর সময় বড়দার বয়স ছিল সত্তের। তার বছরখানেক আগেই বিয়ে হয়েছিল ঠর। কিন্তু সংসার আলাদা পাতেন নি। সব দায়িত্ব মাথার নিয়েছিলেন। মাকাকীমা-ছজন নাবালক ভাই। কাকীমার মৃত্যুর পর তাঁর ক্রিয়া, ছোড়দার বিয়ে ইত্যাদি। মাথার চুলগুলো একে একে বরিয়েছেন, গাল বসিয়েছেন, কষ্ট সহ করেছেন অনেক নিঃশব্দে। অবশ্য এটা ঠিক আমাদের অমিহাদরি ধীরে ধীরে খুইয়েছে। ঋণের অঙ্ক বাড়তে লাগল। পাণ্ডনাদারদা বাড়িতে হানা দেওয়া আরম্ভ করল। তাগাদা তীব্র হয়ে উঠল। এমনকি বাজার হাটে তাঁর কলারও চেপে ধরতে লাগল লোকে। কিন্তু তবু তিনি নীরবে নিজের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। শুধু তাঁর কাঁধ দুটো একটু হ্রাস হয়ে পড়ল।

ঘর থেকে বেরিয়ে উঠেনে এলাম। পেছন পেছন ছোড়দাও। মা হাটে গিয়ে মালা গুনছিলেন। আমাকে বেধে একপাশে সরে গেলেন। ঠর পাশেই বসে পড়লাম আমি। ছোড়দা সামনের হাটে বসল, মা মালাটা বাজিশেক্স্তা তুলায় তুলে রাখলেন।

“থেকেছিল। খারিই বা কি। কোনো তরিতরকারি নেই।” আমি মায়ের কাছে হাত রাখলাম।

বৌদি তখন হেসে উঠেছিলেন। ছেলেমেয়েবা যুগ্মে যুগ্মে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বড়দা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মেজদার পাশে বসলেন। ঘরের ভেতর থেকে একটুকরো আলো এসে পড়ছিল উঠোনে। কিকে আলো। বোধহয় সেই কিকে অন্ধকারে আশাহের স্নান করায় অন্ধবিশেষে হচ্ছিল বড়দার। তারপর সেই খাটেই শুয়ে পড়লেন। ছোড়না প্রসন্ন করল, “তোদের ক্যান্ট্রিতে কত লোক কাজ করে।”

“তা প্রায় সাত ঘো।”

“সাতশো। তাহলে ত বেশ বড়ই ক্যান্ট্রিটা।”

“তা নয়ত কি।”

বড়দা প্রসন্ন করলেন, “তোমার মাইনেটাইনে কিছু বাড়ল।”

“বেড়েছে। আঠার টাকা।”

“ব্যাস। পাঁচ বছরে মাত্র আঠার টাকা।”

“আমার ত এই পাঁচরছর পর পার্মানেন্ট করল। মালিকটা গাজির পা রাখল।”

“মলেটা কি।” প্রসন্ন করল ছোড়না।

“হঁ। কি বলে……ওয়ার্কারদের সাথে দারুণ দুর্ব্যবহার করে। প্রতিবাদ করলে ইউনিয়নের নেতাদের টাকা দিয়ে কিনে কেলে কিংবা গুণ্ডা লাগিয়ে মাথা কাটায়।”

মাথা কাটায় কথাটা কানে যেতেই বড়দা চমকে উঠলেন। উঠে বসে সেই কীণ আলোর আমার তীক্ষ্ণ চোখে দেখবার চেষ্টা করলেন।

“ও সব বড়াটে থেকে না তুমি। ওসব থেকে দূরে থেকে কিছু।”

“কিবে বলেন বড়দা। সবাই যদি দূরেই থাকে তাহলে নিজেদের দাবি আদায় করবে কে।”

ছোড়না বাইরে কাছারিতে কাজ করে।

আমার সমর্থন করে বলে, “ইউনিয়নের ব্যাপারে দূরে থাকলে চলে না বড়দা।”

বড়দা নিঃশব্দে শুয়ে পড়লেন, একসময় বললেন, “তা-ত ঠিক। কিন্তু তবু বৃদ্ধি করে চলবে, ছটু তুই ওখানে একলা থাকিস ত।”

মার চোখে বোধহয় তন্দ্রা এসেছিল। তবু সেই তন্দ্রার ঘোরে উনিও

সচেতন করে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। বৌদি ঘরের ভেতর ছেলে মেয়েদের মাঝে শুয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ আমরা সবাই নীরব থাকলাম।

বড়দাই একসময় আরম্ভ করল, “হুঁ, আমাদের শেষ জমিটাও বেচতে হল।”

কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। তার পেয়ে বা সন্তোষ প্রকাশ করেছিলাম তা ঠিকই। ছোড়াটা বলল, “ভালই করেছেন...তা না হলে অবধা হয় বাড়ত...” শেষে আমি বিক্রি করেও ধার চুকান বেত না।”

“তোমাদের মত না নিয়েই আমি এ কাজটা করেছি”, বড়দার গলায় শব্দ উঠল।

“আমাকে প্রায় করলে আমিও এই বুঝিই দিতাম।”

এছাড়া আর কি বা করতাম। পাওনারারা আমার মাথায় চুল ছিঁড়ে নিচ্ছিল।”

“আরে ছাড়ুন। ওসব নিয়ে অত ভাববেন না।”

মা এপাশ দিয়ে গেল। ঠুঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, বললেন, “তোমাদের বাপের শেষ জমি ছিল এটুকুই।”

বড়দা উঠে চুপ করে বসে থাকল। আমি একটু জোর দিয়ে বললাম, “চিরু টুকু কিছু নয় বা, বাবা আমাদের প্রয়োজনের জন্যই জমি রেখেছিলেন।”

দাদা উঠে ভেতরে চলে গেলেন। ঘড়া থেকে জল গড়িয়ে খেলেন। বিড়ি ধরিয়ে আবার এলে বসলেন। ছোড়াকে জোর টান দিয়ে বললেন, “আমাদের জমিগুলো এত চটপট বিক্রি হত না...আসলে সব জুড়েই চলে গেল...ঐ এক শালা হবু-ছাড়া এ গাঁয়ে অন্তর কেউ নেই যে ধার দেয়...ঠুঁর জুয়ের দর আগনের মত চড়া...ছাই করে দেয়...ধার ধরকার সে বেচারী করবেই বা কি...এ রকম ধার নিতে থাকবে আর নিজেকে বেচতে থাকবে...ঐ হারামির বাচ্চা হবু-ছাড়া এ গাঁয়ে কাউকে বাচতে দেবে না।...সবাইকে মিলে ধাবে।”

ছোড়ার বুদ্ধি ঘুম পাচ্ছিল। বলল, “বড়দা যাও কাল ভোরবেলায় উঠতে হবে। প্রথম বাগটাই ধরব।”

“হুঁ। কাল সকালে রেজিষ্ট্রি অফিস যেতে হবে সবাইকে। আমি দিন চারেক আগেই কাগজপত্র তৈরি করিয়েছি, তোমার অপেক্ষায় ছিলাম, উকিলের মুহুরিকে বলা আছে, গাঁয়ের লোকদের বিশ্বাস নেই...যে কিনবে তাকেই কানভাটানি দিয়ে দেবে—শেষে অন্তরাও কিনবে না...কালই রেজিষ্ট্রি করে নিতে হবে। সকালের বাসে গেলে সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসা

বাবে আর তা না হলে রাত হয়ে যাবে...মাকেও বেতে হবে ত। বেশি রাত হলে ঊরু কষ্ট হবে...।" বড়দা বিড়ির শেষ অংশটুকু ছুঁড়ে কেলে দিলেন। তারপর উঠে ঘরের ভেতর চলে গেলেন শুতে।

মা পারের কাছে রাখা কবলটা টেনে নিলেন গারে। ছোড়দা ওপাশের খাটে শুয়ে পড়ল আর আমি মায়ের পাশে শুলাম।

মথার কামড়ে রাতে ঘুম এল না। ভোরের দিকে চোখ বন্ধ হতেই বৌদি তেকে তুলল। বড়দা বোধহয় মুহুরির বাড়ি গেছেন। মা গারে কবল অভিরে পাশের খাটটার বসে বিড়ি বিড়ি করে কি যেন বলছিলেন। ছোড়দা ঠাতন বসছিল।

উঠে বসে চোখ ছুটো রপকালাম। বাড়ির পাশে সেই নিমগাছটার আটমশটা নাম না আনা পাখি উড়ে এসে বসেছে দেখলাম। গাছের পাতলা ডালগুলো হাকা হাওয়ার ছিলছিল।

"বৌদি এককাপ চা হবে নাকি।"

ওপাশ থেকে কোনো সাড়া শেলাম না। বোধহয় শুনতে পারি নি। ঘরে ঢুকলাম। ছেলেমেয়েগুলো এখনও শুয়ে আছে এলোমেলো হয়ে। বৌদি একপাশে বসে আটা মাখছে। "চা হবে না বৌদি?" ইতিমধ্যে ছোড়দাও ঘরে ঢুকল। গরুও বোধহয় চায়ের তেটা পেয়েছিল।

"চা পাতা আর শুড় আছে কিন্তু এখনও আসে নি।" ছোড়দাকে বললাম, "বিনা ছুখের চা চলবে নাকি ছোড়দা।" বলে উঠানের পাশে নিজেই বসলাম চা বানাতে।"

বড়দাও ফিরে এসে বৌদিকে আটা মাখতে যেখে য়েগে উঠলেন। "এখনও হয় নি। মতলবটা কি? আমরা কি দশটা পর্যন্ত বাড়িতেই থাকব।" বড়দাকে একবাটি চা দিলাম।

বৌদি পরোটা ভাজা আরম্ভ করে দিল। বলল, "পবেটা আর আচার নিয়ে বাও। মা ত বাইরের খাবার খান না।"

মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। মা মোটে অর্ধেকটা পরোটা মুখে দিলেন। ঊকে মনমরা মনে হচ্ছিল। বোধহয় বাবার কথা মনে পড়ছিল। বাবার শেষ অমিটুকু বিক্রি হতে চলে।

একগোছা পরোটা পুরনো খবরের কাগজে মুড়ে থলেতে শুয়ে দিল বৌদি। একটা ঘটিও দিল। মা পারের চাদরটাও থলেতে শুয়ে নিলেন। থলেটা হাতে নিয়ে বড়দা বললেন, "পাঁচজনের মত খাবার দিয়েছ ত।"

একটু বিম্বিত হয়েই প্রশ্ন করলাম, “পাঁচ। আমরা ত মোটে চারজন।”
 “ওই মুহুরিটাও আল্লাহের সাথে বাচ্ছে, ওই ত হলিল দত্তাবেজ তৈরি করেছে,
 টাকাটাও ওই নিয়ে আসবে”, তারপর মাকে উদ্বেগ করে বললেন, “এবার
 আমরা বেরোই।” আমি কিন্তু মায়ের মুখের দিকে চাইতে পারছিলাম না।
 চারজনেই একসাথে বেরিয়ে পড়লাম। বড়মাই মার হাত ধবে এগচ্ছিলেন।
 পথে মাই প্রথম কথা আরম্ভ করলেন, “এ জমিতে মিছে আমার নাম
 বেওয়া হয়েছে” “তা না হলে আমার এই বারবার আলা দাওয়ার ব্যথা কুপতে
 হত না” “স্নায়ু এই নিয়ে কত কথা হয়।” “আরে আমিই কি আর জমি
 বাঁচাতে পারতাম।”

আমরা কেউই তাঁর কথার উত্তর দিলাম না। নিঃশব্দেই চলছিলাম।
 বছর তিনেক আগে মার একটা দিকে পক্ষাঘাত হয়েছিল। এখনও জের
 আছে। ডান হাতে জলের ঘটি আজও তুলতে পারেন না মা। আর চলার
 সময় ডান পাটাকে টেনে টেনে চলেন। মার চিকিৎসার জন্য একটুকরো
 জমি বেচতে হয়েছে আমাদের।

আনি না ছোড়মা এখন কি ভাবছে। কিন্তু আমার মনে এসব কথাগুলোই
 ঘুরপাক খাচ্ছিল।

আমরা বাস ছাড়ার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাসস্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছিলাম।
 উকিলের মুহুরিটা তখনও আসে নি। বড়মা চিন্তিত মুখে ওর আসার সেই
 পথটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ছোড়মাও ক্রমে উত্তির হয়ে পড়ল। মা
 মালা অপের ফাঁকে ফাঁকে লোকটার বিলম্বের কারণ জানতে চাইছিলেন।
 আমি পায়চারি আরম্ভ করে দিলাম। বড়মা ঘম ঘম বিড়ি টানছিল আর
 আমাদের সাধনা দেবার জন্যই বলছিল।

“কি জানি কি হল। সেই ভোর রাতে ওর সাথে দেখা করে এলাম।
 ও-ও কই এমন কিছুই বলেনি তখন। কি জানি কি হল। কেন এলনা কে
 জানে। হবু শালা তো কোনো বিপত্তি ঘটাল না।”

ছোড়মা ক্রমে বসিরে পড়তে লাগল। আমি এসে মায়ের পাশে
 বসলাম। বড়মা ওপাশে একটা বড় পাথরের উপর বসে মুহূর্হু বিড়ি টানতে
 লাগল। ছোড়মার চোখেই প্রথম পড়ল লোকটা। “বড়মা। আসছে। ঐ
 আসছে।

শোনামাই বড়মা বিড়িটা ছুঁড়ে কেলে উঠে দাঁড়ালেন। লোকটা তার

বিশাল পাছা হুলিয়ে হাতীর মত খপখপ করে এগিয়ে আসছিল। লোকটা কাছে আসতেই বড়মা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওয়ঃউপর।

“চাচা! এত দেরি। ওঃ! চোখ ব্যথা হয়ে গেল।”

লোকটা বোধহয় এতটা পথ হেঁটে আসার দরুন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি ওর আপাদমস্তক লক্ষ্য করছিলাম। একটা বিশাল পাঞ্জাবি পরেছে লোকটা। পকেটগুলো কাগজে ভর্তি। বুক পকেটে গোটা চারেক রংবেরং এর পেন। হাতে একটা থলো। থলেতেও কাগজ ভরা। একটু হুঁহু হয়ে বলল, “কি করবাবল। হবু টাকার দিতেই দেরি করে দিল। আমি ত সেই সকাল সাতটা থেকে ওর বাসায় বসে আছি।” টাকগুলো লোকের পেরোজি ত ভালই আন। ঠিক আছে। এর পরের বাসটাতেই যাব।”

বড়মা আর একটা বিড়ি ধরাল।

রেজিষ্ট্রি অফিসে এসে দেখলাম সাহেব লাঞ্চে বাসায় গেছেন। দুজন ক্লার্ক অফিসের টেবলে বসেই মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিচ্ছে আর ওপাশে বসে টাইপিষ্ট মেয়েটার দিকে চোরা চাউনি হানছে। চাপরাশিটা টুলে বসে বিড়ি টানছিল। আমাদের দলটাকে দেখেই লোকটা উঠে দাঁড়াল। মোটা মুহুরিকে একটা লম্বা সেলাম হুকল। আমাদের দিকেও পরিচিত ভঙ্গিতে দেখে বড় হাসল। গত দশ বছরে পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ বার এখানে এলাম আমরা। এরকম এক অজ পাড়াগাঁয়ে রেজিষ্ট্রি অফিস খোলার মুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার হাসি পাচ্ছিল।

হাঁটুহাঁটির দরুন মা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তেঁটা এবং বোধহয় ক্রিবেও পেয়েছিল। মাকে খাবার কথা বললাম। কথাটা শুনে পেয়ে মুহুরিটা পকেটের কোকর থেকে একতড়া নোট বার করে একটা দশটাকার নোট বড়মার দিকে বাড়িয়ে দিল। “তোমরা গিয়ে ওপাশের দোকানে খেয়ে নাও, আমি সাহেবের বাসাধ বাড়ি যাতে তাড়াতাড়ি কাজটা হয়ে যায়।” কথাটা শেষ করে একটা চোখ সামান্য ছোট করে হেসে, বুঝিয়ে দিল এই অজ গাঁয়েও সাহেব স্ববোধের স্বনন্দর পাবার জন্য একটা কিছু করতে হয়।

বড়মা টাকা নিলেন না। “আমরা সবে খাবার এনেছি।” ছোড়মাও ওর ঐ টাকা দিতে চাওয়ায় রেগে উঠল। “টাকাটা আমাদের হয়ে তুমিই রাখ চাচা।”

• লোকটা কেমন বোকায় মত ক্যালক্যাল করে রেখে শেষে হিঃ হিঃ করে মেয়েলি হাসি হাসল। ও চলে যাবার পর ছোড়মা তর্জন পর্জন জুড়ে দিল, “হায়মজাদা! বাবার জন্ত আমাদের নোট দিচ্ছিল। মুহুরিসিগরি করে ছপয়সা করে শালা ঘরাকে সরা জ্ঞান করছে।” তুলে গেছ। ছোটো কটির জন্ত তোর মা সারাদিন মজুরি খাটত আমাদের বাড়িতেই। শালা।”

ছোড়মার এই অকস্মাৎ রাগের কারণটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। সম্পত্তিটা বিক্রি হবার ছুঁখেই কি ছোড়মা এতটা রেগে উঠেছে। বড়মা বলল, “চল ঐ বাগানে চুকে আমরা খাওয়া দাওয়া সেয়ে নি। হব্বু শালার জন্তই এত ঘেরি হয়ে গেল, তা না হলে এতকণে কাজ-শেষ করে বাড়ি ফিরে যেতাম, ছোটোর বাসে।

মারের চলার কষ্ট হচ্ছিল। আজ সারাদিন বকল গেছে শরীরে। ছোটোমা ছোটোমা ঠুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা পথটা পার হয়ে বাগানে ঢুকলাম। বড়মা মালীকে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিল। কিছুক্ষণ পর মালীর সাড়া পাওয়া গেল।

“হুয়োটার পাশে বসে একটু খাওয়া দাওয়া সেয়ে নেব তাই।”

“আরে এস এস—এ আবার শুধোতে হয় নাকি।”

যাযীনতায় খাওয়া লোকটার পায়ে এখনও লাগেনি তাহলে। বড়মা একটু অস্ত গলায় বলে,—“তোমার ঐ কুকুরটা ত তরানক তাই।”

“ভয় পেয়ো না, ও কিছা করবে না, আমি যে তোমাদের সাথে আছি।”

মালী নিজেই এক বালুটি জল তুলে দিল। মা প্রথমই এক বাটি জল খেয়ে নিলেন। আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেল কিন্তু মা তখনও একটা কটি শেষ করতে পারেন নি। গ্রাসে গ্রাসে জল খাচ্ছিলেন। বড়মা অনেকক্ষণ ধরে কুলকুচি করলেন। একটা পাঁছের পোড়ার স্টেস দিয়ে বসে বিড়ি ধরালেন। বললেন, “ছুঁ। এবার তোর সব কিছু শুধরোতে হবে। এক বিষয় আমিও আর থাকল না।”

আমি নীরব থাকলাম। আমাকে নিরস্তর বেঁধে বাঁবালা ধরে বললেন, “বুঝলে।”

“হ্যাঁ।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ করলে চলবে না। আমাদের শৈতুক সম্পত্তি উদ্ধার করতে হবে।...এ পারবে শুধু তোমরা দুজনেই।”

“আপনি ঐ হব্বু হারামিটার কলজে ছিঁড়ে ফেলুন...আমি আমার ক্যান্ট্রি মালিককে -টুকরো টুকরো করে ফেলি...আর ছোড়রা নিজের সরকারের গলাটা কেটে ছ টুকরো করে দিক...ব্যাস এতেই একমাত্র আমরা পৈতৃক সম্পত্তি কিরে পাব...পারবেন হব্বুটাকে শেব করতে ?”

আমার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। আমি আঙে ওখান থেকে সরে কুরোটার গা ঘেসে দাঁড়ানাম। দেখলাম বড়দা ক্ষম হয়ে বসে আছেন।

ছোটদা একটু নম্র গলায় বলে, “বড়দা! ছোট্ট বলছে ঠিকই। এখন আর কেউ নিজের ধোয়া সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারে না।”

বড়দা নিরুত্তর, গভীর চিন্তা করছিলেন, ছোড়দা বাঘের হাত ধরে-তুলে বলল, “চলুন, সাহেব বোধহয় এসে গেছে।”

আমরা রেড্রিট্ট অফিসে কিরে এলাম। সাহেব আসেন নি। বাসায় আরাম করছেন। ওনার চেয়ারের দরজাটা ভেজান। কেমনো হুঁশ নিচ্ছেদের টেবলে বসেছে। একজন এক বিরাট খাতা খুলে কি লিখছে। অপরজন খোসমেজাজে পান চিবুতে চিবুতে একটা সরকারি চিঠি পড়ছে। আর আনন্দের পান্নে বসে টাইপিষ্ট মেয়েটি ধীরে অহুঁহে কি যেন টাইপ করছে। আর অফিসের বারান্দায় চাদর পেতে চিং হয়ে আমাদের মুহুরি বাবুটি শুয়েছিলেন, তাঁর পার্শ্বের কাছে বসে অফিসের চাপরাশিটি কি যেন বলছে। বারান্দার অস্ত্র কোণে গোটা ছব্বেক লোক গোল হয়ে বসে আছে। বোধহয় ওরাও অমি বিক্রি করতে এসেছে আজ।

আমাদের দেখেই মুহুরিটি উঠে বলল। চাপরাশিটি সোজা হয়ে দাঁড়াল। বোধহয় আমার আর ছোড়দার প্যাঁক সার্ট পরা চেহারাটা গুকে বিচলিত করছিল। “খেয়েছ তোমরা ?”

মাকে বারান্দার এক কোণে বসান হল। বড়দা মুহুরিকে সাহেবের কথা বলতেই ও বলল, “সাহেবের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, এলেন বলে, প্রথম আমাদের কাজটাই হবে।” বড়দা আর ছোড়দা ওর পাশেই বসে পড়ল।

সাহেব যখন এলেন তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সাড়ে তিনটে তখন। চাপরাশি তাড়াতাড়ি সাহেবের কামরা খুলে দিল। বাবা বসেছিল সবাই উঠে দাঁড়াল একমাত্র বা ছাড়া, মুহুরিটা প্রায়

আঁড়ি' সেলাম ঠুকল। সাহেবের মুখে একটুকরো প্রশ্ন হাসি কিছু পরমুহুর্তেই সাহেব হুলস্থল পড়ীরতা। কামরায় ঢুকেই বর্ষি বাজাবার সাঁথে সাঁথেই চাপরাশি ভেতরে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরই ফিরে এসে মুহুরিটাকে গোপনে কিছু বলল আর তারপর কেরানীবাবুদের ঘরে ঢুকল।

মুহুরিটা খলে থেকে কাগজপত্র বার করল, উন্টে পাণ্টে দেখে নিল। সেই পান মুখে দেওয়া কেরানীবাবুটির হাতে জমা দিল। অল্প বার বসেছিল তারিও ব্যস্ত হয়ে আসা বাঙরা আঁরতে করে দিল, আঁরি সাহেবের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। পরায় কাক দিয়ে মোটা-সোটা চেহারার খানিকটা অংশ চোখে পড়েছিল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর চাপরাশি আমাদের ভেতরে ডাকল। প্রথমে কেরানীদের কামরায়। চাপরাশি এক বিশালকার রেজিষ্টার মেলে ধরল সামনে। প্রথমে-মা সই করলেন তারপর একে একে আমরা। মা সই করতে পারেন না বলে টিপসই দিলেন। স্পষ্ট দেখলাম মার আঙুল কাঁপছে। পরপর তিনটে পাতায় টিপসই নিল চাপরাশিটা। মা ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আবার বারান্দায় বসলেন। মাকে বিষম মনে হচ্ছিল আর উনি তাঁর কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছছিলেন।

আমরা তিনভাই সই করলাম। বারান্দায় এসে দাঁড়লাম। বড়মাকেও মনমরা মনে হচ্ছিল। ছোড়মা মার পায়ের পাশে বসল। মুহুরিটা কেরানীদের সাঁথেই কথাবার্তা বলছিল। ইতিমধ্যে চাপরাশি অল্প দলের লোকদের ঘরের ভেতর ভেঁকে নিয়ে গেল।

প্রায় মিনিট পনের পর আমাদের ডাক পড়ল সাহেবের কামরায়। তাঁর টেবলের সামনে সায় দিয়ে দাঁড়লাম। সেই রেজিষ্টারটা সাহেবের টেবলের উপর ধোলা ছিল। সাহেব পাতাগুলো উন্টেপাণ্টে দেখে বেশ ভারি ক্রিচালে বললেন, “হুজুরা দেবী আপনিই।”

“হাঁ।”

“রামগোপাল?”

“আমি।”

“হরিশরণ?”

“এই যে।”

“রাধেশ্রাম।”

“আমি।”

“আপনারা স্ব-ইচ্ছেয় আমি বিক্রি করছেন।”

বড়দাই উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ।”

“কত টাকায়?”

“চার হাজার নশো পঞ্চাশ টাকায়।”

“আপনারা টাকা পেয়েছেন।”

“হ্যাঁ।”

“এবার আপনারা যেতে পারেন।” সাহেব চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

আমরা বেরিয়ে এলাম। মুহুরিটা কাগজে কী লিখছিল তখন। বড়দা পাশে গিয়ে বসলেন। আমি ছোড়দাকে বললাম, “এবার কেঁরা বাক।” ছোড়দা ইংরিজিতে বলল, “হ্যাঁ, আমার এ সব আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।” বললাম, “এই ত শেষবার...।” ছোড়দা হেসে ফেলল। আমি জানলাম দিয়ে সেই টাইপিট মেয়েটাকেই দেখছিলাম। মুহুরি বড়দাকে বোঝাচ্ছিল, “হব্বুর দেনা এক হাজার ছশ, দু বছরের স্ত্র—আট টাকা প্রতিমাসে তিন হাজার বাহাত্তর টাকা, আমার প্রাপ্য পঞ্চাশ টাকা, সাহেবের অস্ত্র বাট টাকা, কেরানীবাবুদের আট টাকা মোট চার হাজার আটশ দশ টাকা...কুঞ্জে একশ চল্লিশ টাকা তুমি পাবে” লোকটা তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোটের তাড়া বার করল আর দশ দশ টাকার চোদ্দটা নোট বড়দার হাতে নিল। লক্ষ্য করলাম টাকাটা হাতে নেবার সময় বড়দার মুখটা কালো হয়ে গেল। টাকাটা দেবার পর মুহুরি বলল “তোমরা যাও। ছটার বাস পাবে আমি কাল বিকেল নাগাদ গাঁয়ে পৌঁছাব।”

আমি মন্থর পায়ে বাস স্ট্যাণ্ডে এলাম। আমরা সবাই নীরব ছিলাম একমাত্র মা ছাড়া। মা বললেন, “আমার চোখের সামনেই তোমাদের বাবা মারা গেলেন, তাঁর শেষ অমিটুকুও বিক্রি হয়ে গেল।” আমরা নিরুত্তরই থাকলাম।

প্রায় সাতটা অবধি অপেক্ষা করার পরও বাস এল না। শুনলাম মার পথে বাস ধারাপ হয়ে পড়ে আছে। মা খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখন একমাত্র উপায় রাজি সাড়ে এগারটার ট্রেন ধরা। এদিকে একটু হিম পড়া আরম্ভ হয়েছে ইদানীং।

সাড় আটটা বাজল। বাসস্ট্যাণ্ড ক্রমেই ফাঁকা হয়ে গেল। অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হয়ে উঠল। স্টেশন লোকালয় থেকে দূরে। বড়দা এক বাঙালি

বিড়ি আর এক ডব্বন কলা কিনলেন। মা সেই ছপুয়ের পর মুখে যেন নি
কিছু। আমরা একটা একটা ভাড়া করে স্টেশনের পথে রওনা হলাম।

ছোট্ট একটা স্টেশন। জনশূন্য। স্টেশনমাস্টারের ঘর থেকে কেবাসিনের
বুহু আলো আসছিল শুধু। চারিপাশে নিকব অন্ধকার। গ্যাটকর্মটাও
ছোট আর অন্ধকার। সেখানে থাক্ থাক্ করে সাজান সবজির বোরা।
একটা পচা গছও আসছিল। বোবরর কাঁচা চামড়াও সেই বোরাতেই
রপ্তানি হচ্ছিল। ওখানে বসা সম্ভব ছিল না। আমরা একটু দূরে
সরে বসলাম। বড়দা দশটাকার নোট বার করে আমার হাতে দিল—
টিকিট কাটার জন্য। টিকিট ক্লার্কটি বুঝেছিল। অতএব স্টেশনমাস্টারকে
বললাম। উনি বেশ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, “ব্রাত এগারটার টিকিট
দেওয়া হবে।” আমি প্রায় করলাম, “এখানে ওয়েটিং রুম নেই।”
লোকটি আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করল। গ্যাট আর বুনসার্ট পরা
চেহারা। লোকটা কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকল।
তখন ইংরিজিতে প্রায় করলাম, “বাজীদেব অসুবিধে হয়।”

লোকটি আমার আমার আপাদমস্তক দেখল। ইংরিজিতেই উত্তর দিল,
“ইলেকশান লড়ে মন্ত্রী হোন তারপর এ নিয়ে মাথা বামাবেন।”

মা পায়ে শাল ঢেকে বসেছিলেন। ট্রেনের বেরি আছে। “মায়ের
স্তরে পড়া উচিত।”

বড়দা বললেন, “মার অন্য একটা ছোট বিছানা আনলে হত।” মা উত্তর
দিলেন, “ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোমরা ব্যস্ত হয়ে না।” আমরা
মায়ের পাশে মাটিতেই বসে পড়লাম।

একটু দূরে অন্ধকারে কয়েকজন বসে গল্প করছিল। অন্ধকারে লোক-
গুলোকে দেখা বাচ্ছিল না। একমাত্র কথা আর হাসির শব্দ আসছিল
কানে। আমি উঠে ওদের কাছে গেলাম। জনা সাতেক লোক।
কেউ স্তরে কেউ বসে গল্প করছিল। আমার পায়ের শবে ওরা চুপ
হয়ে গেল। অন্ধকারের ভেতর থেকেই প্রায় করলাম, “আপনারাও ট্রেন
যাবেন বুঝি।”

একজন উত্তর দিল, আমরা রেলের কুলি। সারাদিন লাইনে কাশ করে
রাখে এখানেই স্তরে থাকি।

আমি ওদের পাশেই উঠে বসে পড়লাম। “ট্রেন ক’টার আসে।”

“ঐ ব্রাত বারটা নাপাদ এসে পড়বে।”

“বারটা।”

বারা শুয়ে ছিল তারা উঠে বসল, “আপনারা যাবেন কোথায়।” এই চার-পাঁচটা স্টেশন পরে।”

ওরা নীরব হয়ে বসে থাকল। বাধ্য হয়ে আমিই বললাম, “আমার সাথে মা, আর দুই দাদা আছেন—বাস পেলাম না—মায়ের শরীরটাও ভাল নেই—বিছানালগ্নও কিছু আনি নি সঙ্গে।”

কথাটা শোনামাত্র একজন চট করে উঠে একটা স্ত্রীলোক আমার দিকে এসিয়ে দিল।” বড়বাবু দিয়ে স্ত্রীলোকটা নিয়ে গিয়ে পেতে দিলাম মায়ের পাশে। বড়দা কলা বার করে বাক দিলেন। মা সেগুলো খেয়ে স্ত্রীলোকের উপর শুয়ে পড়ল। আমরাও দু-একটা কলা খেলাম। স্ত্রীলোকটা আবার কথাবার্তা আরম্ভ করে দিয়েছিল। দূর থেকে কুহুরের ডাক ভেসে আসছিল। আকাশ ভর্তি তারার চুমকি।

বড়দা বিড়ি ধরালেন, আমি গলায় স্বর চড়িয়ে ওদের প্রেরণ করলাম, “আপনারা কেউ বিড়ি খাবেন।” কথাটা বলেই কেমন রাগ হল নিজের উপর। সূর্যের মত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চেয়েছি। ওরা কেউই বিড়ি চাইল না।

বড়দা প্রেরণ করলেন, “ছুটু, কদিনের ছুটি নিয়েছ?”

“কাল রাজ্যের পাড়িতে ফিরে যাব।”

“তুমি?”

“আমিও কাল পরশু চলে যাব।”

“তোমাদের ভাড়ার পরশা চাই না?”

আমরা দুজনে একসাথেই বলে উঠলাম “না, আমাদের কাছেই আছে। লাগবে না।”

উনি বললেন, “এই একশ চত্বিশ টাকা থেকে তোমরাও নিতে পার।”

সেই অঙ্ককারে বড়দায় মুগ্ধতা দেখার বুধা চেষ্টা করলাম। আমি আস্তে আস্তে বললাম, “বড়দা আপনি চিন্তা করবেন না। আমাদের ভাল দিন-আসবেই।”

উনি কোন উত্তর দিলেন না। হাতের বিড়িটা ফেলে দিলেন।

ভোর হওয়ার অনেক ঘেরি কিন্তু তবু একটা মৌরগ কর্কশস্বরে ডাক দিল বেল কোয়ার্টারে। এরকম ডুল করে ওরা তাকে মাঝে মাঝে ওদিকের সেই লোকগুলোর মাঝ থেকে একজন কটা বাজল আনতে চাইল।

যেশলাই-এর আলোর বড়ি জেবলাম। পোনে দশটা।

ওদের বোধহয় ঘুম আসছিল না। কথায় কথায় খিল খিল করে হেসে উঠছিল। কিন্তু ক্রমে ওরাও নীরব হয়ে পেল। অন্ধকারের ভেতর থেকে 'ঝিঁ ঝিঁ' পোকাক ডাক ভেসে আসছিল। এক সময় একজন বলল।

"যে আরম্ভ করে দে। গোটা রাত জালাতন করে, তার চেয়ে আরম্ভই কর। শালা।"

ওদের ভেতর একজন আমাদের উদ্দেশ্য করে বলল, "বাবুজী আপনারা লেখা পড়া জানা লোক—একটা গল্প শোনান—গাড়ি আসা পর্যন্ত সময় কেটে যাবে।"

উত্তর দিলাম, "আমি তাই গল্প টল্ল জানি না।"

"তুর্গা তুই আরম্ভ কর। শুনবেন বাবুজী?"

"নিশ্চয়ই।"

বোধহয় শুটা তুর্গারই গল, "এক গাঁয়ে একটা লোক থাকত। খুবই গরীব।"

একজন টল্লনি কাটল, "তোমার চেয়েও।" সবাই একসাথে হেসে উঠল। তুর্গা যেনে উঠল, "শালা মাঝপথে বাধা দিলে গল্প বলব না।"

অন্ত একজন ধমক দিল, "চুপ। চুপ করে শোন।"

তুর্গার গল্প আরম্ভ হল। "একদিন লোকটা তার ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। পথে ক্রমে পেয়েছিল খুবই কিছু সম্ভতি ছিল না। বারকয়েক জল খেয়েছিল ছুজনে, শেষে একটা জায়গায় সম্ভ্য হয়ে এল। কাছেই একটা গাঁ ছিল। সেদিন সে গাঁয়ের বাইরে একটা মেলা বসেছিল। নাকাড়া বাজছিল। নাকাড়ার শব্দ শুনে ছেলেটা বারনা ধরল মেলায় বাবার অন্ত। লোকটারও ইচ্ছে ছিল। তাই ছেলেকে সঙ্গে করে মেলায় ঢুকল। বেশ বড় মেলা। বিভিন্ন ধরনের জিনিসের পসরা বসেছে। নাগর দোলা। বাপ ছেলেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল সব। ছেলেটা বিস্ময়িত চোখে দেখছিল। সম্ভ্য হয়ে পেল। বাপ ব্যস্ত হয়ে ছেলের হাত ধরে হাঁটছিল। ওখানে একটা গাছের তলায় গোটা দশেক উট বাধা ছিল। ছেলেটা কোনোদিন এতগুলো উট একসাথে দেখার অযোগ্য পায় নি।

তুর্গা মুহূর্তের বিরতি দিয়ে একটা বিড়ি ধরাল। ছ চার টান দিয়ে অন্ত একজনের হাতে ধরিয়ে দিল।

“উটগুলো উট বিক্রি করছিল। উট! উট চাই! উট! বিকানীরে
উট। গাড়ি টানতে পারে। বেহুঁ ঘোরাই, আমি চাব করে, উট কেন।
উট। হু আনায় একটা উট। মাঝ হু আনা। হু আনা। উট। উট
চাই উট।”

ওদের ভেতর থেকে একজন ছোট ছোট করে হেসে উঠল, “শালার সব
পন্নই এরকম আদমুবি। হু আনার উট পাওয়া যায়।”

“চুপ। মাঝখানে টুকিল না। দেব তোর মাথা কাটিয়ে।” কয়েকজন
সম্মুখে ধমক দিল ওকে।

ছোড়ার বোধহয় ঘুম পাচ্ছিল। ও উশখুশু করছিল। বড়দা কিন্তু
আর একটা বিড়ি ধরালো। আর আমি এক পলক আকাশটাকে দেখে
নিলাম।

চুপার পন্ন আরম্ভ হয়ে গেল, “উটগুলো হাঁকছিল, হু আনায় একটা উট।

ছেলেটা উটের দাম শুনে অবাক হল। এত সস্তা। মনে মনে ও কল্পনা
করা আরম্ভ করল, একটা উট যদি ওর থাকত তাহলে সারাদিন উটের পিঠে
চেসে ঘুরে বেড়াত। বাবার কাছে বারনা আরম্ভ করল। বাবা একটা
উট কেন। আমি উটের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াব। বাবা বেচারাকে বারবার
বোঝাবার চেষ্টা করল, বেটা পরশা নেই। কিন্তু কাকত পরিবেশনা। বাবা
একটা উট কেন। শেষে বাপটা রেগে উঠল। ছেলের হাত ধরে টান দিল
চল এখান থেকে। উট কিনব। সারাদিন পেটে অন্নই জোটেনি।

অতএব বাধ্য হয়ে ছুতনে আবাব হাঁটা আরম্ভ করল। বাপের পেছন
পেছন ছেলেটা হাঁটছিল, ছেলেটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হাঁটার শক্তি
হারিয়ে কেলেছিল। ওর চোখের সামনে শুধু উটই ভাসছিল। হঠাৎ
ছেলেটার পারে একটা চকমকে জিনিস ঠেকল। সেটা তুলে কাপড় দিয়ে
মুহূর্তেই জল জল করে উঠল। ছেলে বাপকে সেটা দেখাল। বাবা অনেকক্ষণ
ধরে সেটা পরখ করে বলল, বেটা এটা তো হীরে মনে হচ্ছে। ছেলে হীরে
কি বস্তু জানত না। বাপই বলল, বেটা এটার দাম কম করেও পাঁচশ টাকা।
ছেলে মুহূর্তে বারনা ধরল বাবা তাহলে আমার একটা উট কিনে দেও।
বাপের একটু মায়া হল বলল, চল তোকে একটা উট কিনে দি। ওরা
তড়িৎতড়িৎ মেলায় গিয়ে এল। মেলা ভাঙার সময় তখন। লোকরা যে বার
বাড়ি ফিরছিল। একটা উট পছন্দ করে বিক্রেতার হাতে হীরেটা দিল
লোকটা। বলল তাই এই উটটা দেও আর বাকি টাকা। লোকটা হীরে

উণ্টেপার্টে বেধে বলল, আরে এত হীরে! আমার উণ্টের দায় মোটে ছু আনা। তাতে কি হয়েছে। ছু আনা কেটে বাকি দামটা দিয়ে দেও।

লোকটা বিরক্ত মুখে হীরেটা গুর হাতে কেবল দিয়ে বলল, “কি বা তা বলছ। এই ত মিনিটদশেক আগে রামপুরের রাজা একহাজার টাকা দিয়ে উট কিনলেন। এবার আমি হাজার টাকার কমে উট বিক্রি করব না।

ছেলেটার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। বাপটাও দ্বঃখিত হয়ে পড়ল। রাতও হুঙ্কিল। কিন্তু নিকপায়। ছেলের হাত ধরে নিঃশব্দে গুধান থেকে হাঁটা আরম্ভ করে দিল। মূর্তোর ভেতর হীরে ধরে পা টেনে টেনে হুঙ্কনে হাঁটছিল।

বাস এই হল গল্প।” জুর্গা তত্ব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথাই বলল না। অবশেষে গুহের ভেতর থেকে একজন বলল, “আচ্ছা জুর্গা! রাজা ছু আনার উট একহাজার টাকার কেন কিনলেন। একটা গরিবের ছেলেও উট কিনে ফেলবে এই ভয়েই কি?”

জুর্গা একটা বিড়ি ধরিয়েছিল। একটু চিন্তিত স্বরে বলল, “কি জানি বন্ধু। রাজা কেন যে ছু আনার উট এক হাজারে কিনল।”

হঠাৎ বড়দা বেন চিংকার করে উঠলেন। “আমি জানি। জানি।” উনি থর থর করে কাঁপছিলেন।

আমি তড়িৎগতিতে ঠুকে ধরে ফেললাম। আতে আতে বললাম, “বড়দা ধৈর্য ধরুন। এরা, এরা সবাই, আপনার মতই জেনে বাবে।” বড়দা থর থর করে কাঁপছিলেন। আমার চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছিল। অন্ধকারেই চোখটা মুছে নিলাম।

ট্রেন আসার ঘণ্টা পড়ল। মা উঠে দাঁড়ালেন। গাড়ি আসছে।

রেল কোয়ার্টারে মোরগটা একনাগাড়ে ডেকে চলেছে।

হিন্দু থেকে অমুসলমান: বহু ভট্টাচার্য

বুদাপেস্ট—দ্বিরাগমনে

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

হাঙ্গেরির ‘অটার’—বুদাপেস্টে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বাসিন্দারা হালকা শুভারকোর্ট গায়ে চড়িয়ে রাতায় বেরিয়েছে।

এতদিন ধরে এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে সে হালকা মেজাজের আমেজ ছিল তা স্তবোত্তে আরম্ভ করেছে। সামনে নভেম্বর। প্রচণ্ড শীতের দিন। তারই প্রমাণিত শুরু হয়েছে।

রাতা-ঘাট সন্ধ্যার পর ফাঁকা। কিছু বৃক্, রেস্তোরাঁ ও হোটেলের লোকে-লোকারণ্য। অন্ন-বন্ন খাবারের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পানীয় নিয়ে টেবিল ভর্তি করে ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়িরা বসে আছে। তবে বুড়ো-বুড়িরা বেশিকণের ধন্দের নন, যুবক-যুবতীরাই হল আজ্ঞার কেন্দ্রবিন্দু।

আজ বিকেলে হোটেলের কিয়ে সবে হাত ধুতে শুরু করেছি এমন সময় একটানা টেলিফোনের জিং জিং শব্দ সারা বাড়িটাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। হোটেলের অন্তস্ত বন্ধুরা বেড়াতে বেরিয়ে বাণ্ডার বাড়িটা ফাঁকা পড়েছিল। অগত্যা টেলিফোনটা তুলতেই হল, তোলামাজই বুঝতে পারলাম আমার টেলিফোন। মিহি, পরিচিত গলায় ‘চ্যাটার্জী’। সন্ধ্যা ৭টার মেট্রোর ‘গ্র্যান্ডোয়রিয়া’ স্টেশনে দেখা হবে বলে ছজনই টেলিফোন ছাড়লাম।

৭টা বাজার কিছু আগেই বেরিয়ে পড়লাম। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বইছে। হাত দুটা সত্যিই একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রাতা-ঘাটেও সেরকম মেজাজ নেই। দৌড়ে বাসে উঠলাম। মিনিট ১৫-র মধ্যেই বুদাপেস্টের অন্ততম কোয়ার মকো কোয়ার—এদের ভাষায় ‘মকোয়া তের-এ’

পৌছে ছুটে গিয়ে বুকেতে চুকেই এক পেগালা ককি হাত দিলাম। পরম ব্লাক ককি। একটা পিগারেট বরিয়ে ককিতে চুমুক দিয়ে বুকের অবস্থাটা নিরীক্ষণ করাব চেষ্টা করলাম। অবিকাংশের সকলেই ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার গুরুত্ব মদ। ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে। ককি শেষ করে বাইরে বেরিয়ে দেখি—ঠাণ্ডার মধ্যেও ছু-চারজন ছেলেমেয়ে অপেক্ষা করছে তাদের বন্ধু অথবা বান্ধবীদের জন্য।

বুকে থেকে বেরিয়ে মাটির তলায় মেট্রোর পৌছে গেলাম। এক মিনিটের মধ্যেই ট্রেন। চারটি স্টপের পর এ্যানডোরিয়া। বড়িতে তখন সাড়ে ছটা। আরও আধঘণ্টা বাকি। মেট্রোর মধ্যেই সময় কাটানোর ভ্রম ছবি দেখছি। কিছুক্ষণ পর বড়িতে তাকিয়ে দেখি পাঁচ মিনিট বাকি। আমার সঙ্গে বেধানে দেখা হওয়ার কথা সেখানে পৌছনোর আগেই দেখি সে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাকিয়ে আছে—আমি বেশিক থেকে আসবো সেদিকে। সাধারণ সাঙ্গে নিজেকে সান্নিধ্যে ৮-৯ মিনিটের ভুলনায় একটু বেশি,—চড়া নয়।

‘হ্যালো’ বলতেই প্রায় চমকে উঠে একগাল হেসে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করার সঙ্গে সঙ্গে বড়িটা আমার দেখাল। আমি না হেসে পারলাম না। বললাম, ‘হ্যা, আজ তোমার সময় ঠিক আছে।’

‘জ্বলনে বেরিয়ে রাস্তায় গড়তেই আবার সেই ঠাণ্ডা হাওয়া। আমার বললো, ‘চলো একটা স্থানীয় জায়গায় ব্রাজির খাবারটা সারতে-সারতে গল্প করা বাকি।’ তখান্ড বলে রাজি হয়ে গেলাম।

মাটির নীচে হোটেল। নিম্নস্তম্ভ আলোর প্রতিটি টেবিল ভর্তি। আর চড়া জ্বরে কোনো এক ইউরোপীয় বাজনা বাজছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জায়গা মিলল। বসার পর আমরা আছি কি খেতে পছন্দ করি জানতে চেয়ে বলল, ‘এখানে কণ খাবার বেশি পাওয়া যায়।’ হু একটা সাধারণ কথার পর খাবারের ব্যবস্থা হল।

খাবারটা সত্যিই ভাল। তার সঙ্গে আমরা কখন চায়ের অর্ডার দিয়েছে জানি না। ভাল চা পেয়ে আমাদের ধন্যবাদ দিলাম। সে বলল, ‘তুমি ভারতীয় চা খেতে ভালবাস—আমি জানি।’

হঠাৎ সে বলে বলল—‘জানো, আমি এখন খুব ক্লান্ত বোধ করি তখনও এখানে আসি।’

‘একলাই? বলাতে সে বললো হ্যাঁ।’ ‘কেন লম্বী পাও না?’ ‘ঠিক এই সময় পছন্দ করি না’, বলে সে হাসল।

কিছু বেন সে বলতে চায়, অথচ অনেককণ হয়ে গেছে। আমাদের উঠতে হল। রাত্তায় বেরিয়ে সে বলল, ‘চলো, চলো একটা বৃক্ষেতে বসা থাক। রাত বেশি হয় নি।’

রাত্তায় হালকা তামাসায় ছলনে খুব হাসলাম। বৃক্ষেতে আমি কফি, আর আমরা ‘লাল মধ’ নিয়ে বসলাম।

‘কেমন লাগছে’ জিজ্ঞেস করাতে সে বলল—‘খুব ভালো।’ বললই সে তাদের থিরেটারের দলের কথা বলতে আরম্ভ করল।

‘আনো, আমাদের নাটক ফিল্ম হচ্ছে।’ এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ঐচ্ছল্য বেন আরও বেড়ে গেল।

তুমি না বলেছিলে যে আমরা অ্যানাকিউস-এর দিকে ঝুঁকছি। তবে, হ্যাঁ, অতীতে আমরা কিছু কুল করে এখন ত্রুণে নিয়েছি। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পটভূমিতে আমাদের নাটক।’

‘আচ্ছা, আমরা—তোমাদের দলে তোমার প্রাক্তন স্বামী এখনও আছেন?’

আমার প্রশ্নের অবাব শেষ হতে না হতেই সে বলল, ‘তুমি দলে কেন আমি যেখানে থাকি, সেখানেই থাকে—তনে আলাদা। বাড়ি পেলে চলে যাবে—কিন্তু কবে পাবে জানি না।’

‘বিয়ে করেছিলে কেন?’ ‘জীবনে প্রথম প্রেম। তখন সব কৈশোর ছেড়ে বোবনে পা দিয়েছি—তাই প্রথম প্রেমিককে বিয়ে করতে হয় স্তবে কুল করেছিলাম। জানো, আমি জীবনকে ভালবাসি। আমি আমার জীবনে পার্টনার চাই—যে আমাকে বাধা দেবে না। আমি ছেলেবেলে চাই—তাদের সাহায্য করতে চাই। আর তার মাঝে আমি স্বাধীনভায়ে বলতে চাই। স্বাধীনতা মানে বিশ্বাস্য নয়। জানতে চাই, বুঝতে চাই আর কিছু করতে চাই। তাই এবার ভেবে-চিন্তে, দেখে-জেনে, পরস্পর পরিভার আলোচনা করে আমার পার্টনার নেব। তবে কবে তা জানি না।

কিছুকণ ধেমো বলল, ‘জানো, আমার বিবাহ-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তের কথা প্রথম আমার বাবাকে আমি বলি। কিন্তু কিছু বলার আগেই তুমি যখন আমি

ভয়ঙ্কর মানসিক অশান্তিতে ভুগছি' বলেছি তখনই বাবা বুঝতে পেরেছিলেন।

'তোমার প্রথম প্রেমের কথা তুমি ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারবে?'
হঠাৎ প্রশ্ন করে বললাম।

আমি একটু ছেলে আবার বলতে শুরু করল—'তুমি কি বলতে চাও, আমি আদৌ প্রেমে পড়েছিলাম? না, তা নয়-আসলে কৈশোর থেকে বৌবনের উদ্ভাবনার মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম। আমাদের দেশে অনেকের ক্ষেত্রেই এধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে।'

হৃদয়ী না বললেও আমাকে দেখতে হৃদয়। পঁচিশ থেকে সাতাশের মধ্যে বয়স। হৃদয় স্বাভাবিক। ইংরেজিতে কথা বলে যেতে পারে। বুঝতে অসুবিধা হয় না। হাঙ্কেরিতে গত ৭১ সালে সাংবাদিকতা পড়তে এসে এই ভক্ত-মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়।

হাঙ্কেরির অর্ধেক সাংবাদিক 'নিউ ইয়র্ক ইন্ডপেন্ডেন্ট' বিন গভীর রাজ্যে এক পাঠা ছেলে-মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর এই মেয়েটি আমার সঙ্গে বৌগাংগাং রাখে। বোম্বার ইংরেজিতে কথা বলতে পারে বলে।

আমি বলল, 'যেখো, এখন আমার বখেট Maturity হয়েছে। তাই এবার সহজে ভুল করতে চাই না। তবে আর পাঁচটা বেঘের মতো আমিও একটা মনের মতো আমি চাই। আর তা পেতেই হবে। আমি না, কবে পাব। তবে হ্যাঁ, পাণ্ডরামাই তোমাকে নিশ্চয়ই জানাব'—বলে এক পাল হাসল।

পেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, 'তোমার মেয়ে আর বউকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে। তোমরা হুঁপে আছ কি বল?'

'তোমরা কি অসুখী' বলে প্রশ্ন করতে বলল, 'অসুখী নই। কিন্তু তোমরা ভাব আমরা অসুখী। আমি বিবাহ বিচ্ছেদ করেছি—আবার বিয়ে করব—আমার প্রাক্তন স্বামীও বিয়ে করবে। আমার সম্ভান-সম্মতি হলে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা নিশ্চয়ই তাদের বলব। আর জানো তো, আমাদের দেশের সোভালিস্ট সরকারও এই সমস্যাটার কিভাবে সমাধান করা যায় তা নিয়ে ভাবছে। বিবাহবিচ্ছেদ আইনি বিষয়। এ নিয়ে কাউকে তেমন বিপদে পড়তে হয় না। অবশ্য দু-তিনটি ছেলে-মেয়ের পর এবারনের ঘটনা ঘটলে সমস্যা

অটল হয়—তবে তার সংখ্যা খুবই কম। আর তা হলোও বাচ্চাদের কোনো অস্থিবিধায় পড়তে হয় না। তারা তার বাবার কাছ থেকে খরচ পায় যতদিন না তারা সাবালক হচ্ছে। এছাড়া সরকারি সাহায্য তো আছেই। কিছুকাল ধেমে আমাকে প্রশ্ন করে বলল—‘তোমাদের বেশে এরকম ঘটনা ঘটে না?’

আমি বললাম, ‘স্বাক্ষর, কেননা রাত দশটা বাজে—কিরতে হবে। উত্তরটা দেশে ফেরার আগে দিয়ে যাব।’

হুজনে উঠে পড়লাম। মেট্রো পর্বত এগিয়ে দিয়ে বাওয়ার সময় কর্মসূচন করে শুভরাত্রি বলে বিদায় নেওয়ার আগে বলল, ‘জুজবার বিকেল ৪টার কোন করব। শুভরাত্রি।’

মেট্রোর টেনে বেতে বেতে শুভেছি—মেট্রো আজ ঘুমতে পারবে তো?

বিকেল চারটা পনেরো মিনিটে বাইরের টেলিফোনটা বেজে উঠল। অস্তিত্বের স্রোতে বাওয়াতে আমাকেই টেলিফোনটা ধরতে হল। তবে নিরাশ হলাম। জনৈক হাঙ্গেরীয় মহিলা প্রথমে নিজের ভাবার ও পরে ভাড়া ভাড়া ইংরেজিতে জনৈক কেলিভিন ছাত্রের সন্ধান করে যা বলল, তা হল—‘তুমি কেলিভিন ছাত্রটিকে বলো যে আমি আগামীকাল সকাল আটটার ফোন করবো।’

কোন ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছি—এমন সময় আমার নিজের ঘরের কোনটার কিরকির করে সাওয়াজ হলে লাগল। বুঝলাম একটা ফোন এসেছে—তুলতেই হল। ‘হ্যালো’ বললামাই, ‘শাডে পাঁচটার রাহা লুবা তের চলে এসো।’

আজ সারাদিন বুট পড়ছে। বিরবিরে বুট। রাত-ঘাট ভিজে গেছে। তাঁতার কনকনে ভাবটা বেড়েছে। মনে মনে ভাবলাম আজ আর বেশিক্ষণ আজ্ঞা হেওয়া যাবে না। এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে সামনের বৃক্ষেতে চুকে এক শেহালা গরম ব্রাক কফি পান করে বেরিয়ে এসেছি; এমন সময় মিঃ বোরিস-এর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, ‘তোমার ঘই এনেছি—নিয়ে বাও।’ হু এক কথা বলার পর পাঁচটা নাগাং তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে বাস ধার অস্ত রওনা হলাম। ‘রাহা লুবা’-তে পৌছতে আমার পাঁচ মিনিট

যেরি হয়েছে। আমরা পেছন থেকে এসে বলল—‘আজ তোমার ঘেরি : চল—তোমার সঙ্গে আমার বাবা-মার পরিচয় করিয়ে দেই।’

হুজনে রওনা হলাম। আমাকে আমাদের অনেক বেশি সাবলীল মনে হল। সাজ-পোছ একই ধরনের। বেতে বেতে আমি আমার আগের দিনের শেষ ভাবনাটাকে এখনই মিলিয়ে নেওয়া যায় কি-না মনে করেই প্রব্র কয়ে কেললাম।

আমরা একেবারে একগাল হেসে বলল, ‘ভালই সুখ হয়েছে। কেননা এটা কোনো সমস্যা নয়—যা সুখ কেড়ে নেবে। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের আগে কিছুদিন ভাল সুখ হয় নি। অনেক ভাবতে হয়েছে। আমার তোমায় বলছি—এখানে এটা কোনো সমস্যা নয়—যৌবনের প্রায়তে এ ধরনের ভুল হয়—পরে আমরা আমার বিয়ে করে তা শুধরে নেই। বাই হোক, তোমার বেশে এরূপের ঘটনা ঘটলে কি হয় তা তুমি বলতে বলছ। তবে আজ থাক অল্পদিন বলা।’

বাসে চড়ে হুজনে বেতে বেতে টুকরো টুকরো ছোটো একটা কথা হল। ‘মাম্ম তের’ পেরিয়ে পয়ের স্টপে আমরা নেমে হাঁটতে লাগলাম।

আমার বাবা ও মা এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। চমৎকার সাজানো বাড়ি। লাইব্রেরি দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না উঠে দাঁড়িয়ে বই দেখতে লাগলাম। আমার বাবা জানতে চাইলেন, ‘আমি সারতের কোন অকলের লোক।’

‘কলকাতা’ বলাতে তিনি ভাড়া ভাড়া ইংরেজি হলও পরিচয় উচ্চারণে বললেন, ‘রবীন্দ্রনাথ টেগোর’। বলেই সোভা লাইব্রেরির দিকে গিয়ে একখানা বই টেনে বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, ‘রবীন্দ্রনাথ টেগোরের বই—আর্য্যাম ভাষায় অনূদিত।’

বুকটা পর্বে ও আনন্দে ভরে উঠল। ইউরোপের সোভালিট দেশের একটা শহরে বসে ১৯১৫ সালে আর্য্যাম ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের বই দেখে সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়লাম। আর আমার বাবাকে দেখতে দেখতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তিনি আরও একটা বই বের করে বললেন—‘এটা তোমাদের দেশের রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের বই।’ হাতে নিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই।

এরই মধ্যে তাঁর অসুস্থতি দিয়ে সিগারেট ধরিয়েছি। আমার বা এলেন এবং আমার সঙ্গে নিজেকে ভাবার কিছু কথা সারলেন। কথাটা কি—তা একটু পরেই বুঝলাম যখন আমরা বললো,—‘চলো, চা খাওয়া বাক।’

চা খাওয়ার নাম করে রাজের স্নোভনটা এখানেই হল। চা প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক আলোচনা হল—কলে আমার ছ-কাপ চা খেতে হল এবং ছ-বারই আমরা করে খাওয়ালো।

আমার মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়ে আকু আর স্ত্রী গায়ত্রীর কথা ভিজেস করলেন। বিশেষ করে আকুর কথা।

আকুর ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে বলতে হল এই কারণে যে এদেশে সুবিধাভোগী শ্রেণী বলতে যদি কিছু থাকে তবে তারা হল শিল্প। শিল্পের জন্য এলাহি কাণ্ড। বাসে-ট্রায়ে যদি কোনো শিল্প উঠে তবে তার বসার স্থান প্রথম। রাস্তার যদি কোনো শিল্প কাঁধে—লোক জমে যায়। কেন কাঁধে আনবার জন্ত।

বাড়িতে ফিরে তাই বারবার আকুর কথাই আজ আমার মনে হচ্ছে।

বাইহোক, এই কাকে আকুর দেওয়া ‘রাখী’টা আমাকে দিয়ে বললাম—‘আমার মেয়ে এটা দিয়ে বলেছে—হাঙ্গেরির সঙ্গে ‘বন্ধুত্ব’ গাতিয়ে এস। তার অহরোধ আজ রাখলার।’

আমরা তার বাবা ও মা সকলে রাখীর চেয়ে আকুর বেশি প্রশংসা করলো।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ‘রাখী’টা পরে বারবার হাত দেখতে লাগল।

আয়না থেকে সরে এসে বললো—‘বেন—আজ তোমাকে নিয়ে আমরা সিনেমাতে যাব। চার্লি চ্যাপলিনের ‘মসিরে’ ভাড়া’ দেখতে। বাবা টিকিট কেটেছেন।’

সহলবলে বেয়িবে পড়লাম।

চার্লি চ্যাপলিনের কিম্বদন্তি। হল ভেঙে পড়েছে। সারাক্ষণ দর্শকরা হেসেছে। কিন্তু বাইরে বেকনোর পর সে হাসি তাদের মিলিয়ে গেছে। পুঁজিবাদ কিভাবে দ্বিতীয় যুদ্ধের জয় দিয়েছে তাই ভাবতে ভাবতে তাদের সম্মুখে কিয়তে হয়েছে। কেননা হাঙ্গেরিতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এক লক্ষ



লোক মারা গেছে। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম এদের মতো ভাল করে কি আমরা জানতে পেরেছি?

সিনেমা থেকে বেরনোর পর আমার বাবা ও মা আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। প্রত্যুত্তরে আমিও জানালাম। ছজন বুড়ো-বুড়ি হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চললো।

আমি আর আমা উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

সিনেমা থেকে শুরু করে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে মেট্রোয় এসে ছুতনে দাঁড়লাম। আমা করমর্দন করে বলল—‘চমৎকার কাটল।’ করমর্দন করতে গিয়ে হেঁপি আমার হাতে আকুর হেণ্ডা ‘রাখীটা’ রয়েছে। সাদা হাতে লাল ‘রাখী’ চমৎকার মানিয়েছে।

‘আমিও বললাম—‘চমৎকার।’ আমা বলল, ‘মঙ্গলবার চারটা থেকে সাড়ে চারটার ফোন করব।’ শুভ রাজি বলে বিদায় নিলাম।

সকাল থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি। নিজেই দেশের কথা মনে করিয়ে দিল। তবে এখানকার রাস্তা-ঘাটে জল দাঁড়ায় না। ট্রাফিক অ্যামও-হয় না।

সকালে প্রায় আটটা নাগাত আমাকে ফোন করতে হল। ফোন করলো মাত্রই কিসে গেলাম। আমা বলল, ‘নভেম্বর? তেরে’ দেখা হবে সাড়ে ছটার।’

আজ বিকেলে এখানকার ‘প্যাট্রিয়টিক পিপলস ফ্রন্ট’র নেতার সঙ্গে আলোচনা হওয়ার কর্মসূচী নির্ধারিত হয়েছে।

পিপলস ফ্রন্ট এখানকার সমস্ত নাগরিকের ফ্রন্ট—একটা ব্যাপক গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনে কমিউনিস্ট, অ-কমিউনিস্ট থেকে শুরু করে চার্চের পাদ্রিরা পর্যন্ত আছে। এছাড়া হাজারিতে বসবাসকারী সংখ্যালঘুগণও অর্থাৎ আর্মিয়ান, সাউথ-স্লাভ, স্লোভাক ও রুম্যানিয়ানরাও এই ফ্রন্টের কাজে অংশ গ্রহণ করে। জাতীয় এসেমবলি ও কাউন্সিল নির্বাচনে ফ্রন্টের প্রার্থীরা অংশ গ্রহণ করে। প্রার্থী মনোনীত হয় বিয়ার্ট বিয়ার্ট জনসভা থেকে। কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট নির্বিশেষে যে-কেউ ফ্রন্টের প্রার্থী হতে পারে। তবে ফ্রন্টের জনসভায় সেই নাম অস্বীকারিত হওয়া চাই। এছাড়া ফ্রন্ট জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

হুপুর আড়াইটার আনালিস্ট সেন্টারে নতুন কাজে বোগ দিয়েছে এমন একটি মেয়েকে সেন্টারের কতৃপক্ষ দোস্তাবী হিসাবে আমার সঙ্গে ছিলেন। মেয়েটির নাম শ্রীমতী এ্যাগনেজ ওয়ানোভিক।

মেয়েটি গতকাল থেকে এখানে কাজে বোগ দিয়েছে। বিবাহিতা তরুণী, বয়স প্রায় বাইশ বছর। ভাল ইংরেজি বলে। বেতে বেতে গল্প শুরু হল। ‘কোথায় ইংরাজি শিখেছেন?’ বলে প্রশ্ন করাতে সে বলল, ‘নিউইয়র্কে।’ চমকে উঠেই প্রশ্ন করলাম, ‘নিউইয়র্কে ছিলে কেন?’

‘বাবা রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিউইয়র্কে ছিলেন বলেই আমার থাকতে হয়েছিল’ বলে একপাল হাসল।

নিউইয়র্ক ভাল লাগে—না বুধাপেট’—প্রশ্ন করলাম।

‘বুধাপেট ভাল লাগে’ বলে ছোট উত্তর দিয়ে কাজ সারার চেষ্টা করল। আমিও নাছোড়বান্দা। ‘কেন ভাল লাগে’ বলে পাণ্টা প্রশ্ন করলাম। সে বললো, ‘নিজের দেশ বলে।’ এছাড়া এখন বিয়ে করেছি—অন্ত কিছু আর ভাবি না।’ বলে থামল।

প্রচণ্ড বৃষ্টি আর হুনার (হানিফ) ধারের হাওয়া প্রায় আমাদের শুষ্ক নর, প্রায় সকলকে উড়িয়ে নিয়ে বাণ্ডার উপক্রম করে ছাড়ল।

তাড়াতাড়ি গিয়ে প্যাট্রিয়টিক পিপলস ফ্রন্টের অফিসে হাজির হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই কমরেড রবার্ট লিডার আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে কর্মসূচী করলেন। কক্ষির সঙ্গে চলল আলোচনা। বেড়ে ঘণ্টা আলোচনার পর আমরা বিদায় নিলাম।

মেয়েটির সঙ্গে বেতে বেতে আলাপ হল। কাজের পর বাড়ি ফিরে সে কি করে জানতে চাইলে বলল—‘রাজির খাবার তৈরি করি। আমি-ছী হুজনে খাই—তারপর টেলিভিসন দেখি। কখনও কখনও গল্পের বই পড়ি। তবে কবিতা পড়তে ভালবাসি।’

‘ভিমিট্রিভ তে’রে এসে নামলাম। সে বিদায় নেওয়ার আগে বলল, কাল সেন্টারে বাবো না—বহি সময় করতে পারি তবে টেলিফোন করব।’

ধন্যবাদ দিয়ে দুজনে হু-পথে রওনা হলাম। আমি ‘মাস’ তে’রে এসে হেঁটে ‘নভেম্বর তে’র এবং সেখান থেকে মেট্রো ধরে হাভেরিয়ান আনালিস্ট এ্যাসোসিয়েশনে এসে এক পেদালা গরম কফি নিলাম।

প্যাট্রিস্টিক পিপলস ক্রস্ট অফিস থেকে পাওয়া কয়েকটি বই এবং কমরেড আলেনের বক্তৃতার রেকর্ডটা উন্টে-পার্টে দেখতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে ঘড়িতে ছ'টা পঁচিশ মিনিট হয়ে গেল। আবার মেট্রো হয়ে 'নভেম্বর তেরে' এসে নামলাম। আমরা যথারীতি দশ মিনিট ঘেরিতে এসেই বলল, 'অপরাধ নিও না—ট্রাফিকের অস্ত্র ঘেরি হল।' তবে আমাদের আজ তার হুম্বর শোবাক আরও হুম্বর করে তুলেছে। বললাম, 'কোথায় বাবি?'

'ব্যাংলে দেখতে বাব' বলে হাঁটতে শুরু করে দিল। অপেরায় এসে ঘেঁষি প্রচণ্ড ভিড়। আমরা কিস্তাবে ব্যবস্থা করে আমার নিয়ে ঢুকে পড়ল। প্রথম ব্যালোটা হল—মাছ শিকার। দ্বিতীয় ব্যালোটা হল : পুঁজিবাদী সমাজে একদল ছদ্মকায়ী মেয়েদের নিয়ে কিস্তাবে পরস্পর রোজগার করে।

এখান থেকে বেরিয়ে একটা হোটেলে ঢুকে কিছু খাবার ও ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে আবার গল্প শুরু হল।

আমরা আনতে চাইল—'ব্যাংলে কোন লাগল?' আমি দ্বিতীয় ব্যালোটা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং অভিনয় চমৎকার বলে মন্তব্য করলাম।

সে বলল, 'আমি জীবনে একবার রাজ তোমার দেশের নাচ বুদাপেস্টে বলে দেখেছি। ভাল লেগেছে। বিশেষ করে মুখের Expression সত্যিই হুম্বর। তোমাদের দেশের মিউজিকও ভাল। এছাড়া একবার একটা আমেরিকান ব্যালের এক নিগ্রো মহিলাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি ব্যাংলে দেখতে ভালবাসি, বলে হাসল।

খাওয়া ও পানীয় শেষ করে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। আবার বৃষ্টি। 'নভেম্বর তেরে' দাঁড়িয়ে বিদায় দেওয়ার আগে সে বলল, 'সোমবার রাজে কোন করবো। শুভরাজি।'

বাসে উঠে যাওয়ার সময় আমার দেখার চেষ্টা করল। কেননা এখানে বাস থেকে বিদায় জানানোর রেওয়াজ আছে।

মস্কো তের, নভেম্বর তের, মার্চ তের, ডিস্ট্রিক্ত তের প্রভৃতি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা ও ঘটনার নামে বুদাপেস্টের অসংখ্য আয়গা রয়েছে। বাল্যকাল থেকেই ছেলেমেয়েরা এই নামগুলির সঙ্গেই শুধু নয় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গেও পরিচয় লাভ করে।

আমাদের দেশের একজনের নামেও হাঙ্গেরির বালাতনে একটি রাস্তা আছে। আর সেই রাস্তাটির নাম হল—‘টেগোর সেজাকি (বেড়ানোর রাস্তা) অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে রাস্তা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬ সালে বালাতনের হাসপাতালে ছিলেন।

বাই হোক, প্রচণ্ড বড় মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। সোমবারের আলোর বসে লেখাটি লিখতে হল। কেননা বড় ইলেকট্রিক অচল হয়ে গেছে। আমরা বেখানে থাকি সেটা অচলে ঘেরা বৃষ্টির পাহাড়ি অঞ্চল। তাই বড় কলেই আলোর দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

কাজের মেয়েরা

বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজের লাইম লাইটের কাজে

কাজের মেয়েদের এই সিরিজে সাধারণভাবে যেকোনো মেয়েদের কথা প্রকাশিত হবার কথা নয়। প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী এদের সাধারণ 'working girl' পোজে বিবেচনা করা হয় না। তথাপি বর্তমান 'কাজের মেয়েরা' সিরিজে এদের কথাও লিখছি—কারণ আমরা জানি যে আমাদের মতো পরিবর্তনশীল এই দেশীয় নিযুক্ত মেয়েরাও 'কাজের মেয়েই' হতে চেয়েছিল। কাজ না পেয়ে তাদের হতে হয়েছে 'লাইনের মেয়ে'। কোন কল্পিত বোন-বিকৃতি নয়, নিরাকার দারিদ্র্য এবং সামাজিক বৈষম্যের চাপেই আজ এরা জীবনের এই কানাপলিতে পিষ্টরাবদ্ধ। দেহ ব্যর্থসারে নিযুক্ত বেশ কিছু সংখ্যক মেয়ের সঙ্গে কথা বলে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে অধিকসংখ্যক যেকোনো মেয়েই অল্প পেশায় অসফল ও অল্পপয়সায় বলাই নিত্যকাল নিরুপায় হয়ে, অর্থনৈতিক কারণে এই চূড়ান্ত মানবিক এবং পারিবারিক শোষণের শিকার। সেই কারণেই সামাজিক ও ঔপনিবেশিক পশ্চাৎপদতার ওপরে চাপান ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শোষিত মেয়েদের জীবন ও পেশায় বর্ণনায় এই মেয়েদের কথা অন্তত পেশায় নিযুক্ত মেয়েদের পাশে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে।

দক্ষিণ কলকাতার কোনো এক অঞ্চলের মেয়েদের নিয়ে লেখা এই কাহিনী। মোট পঁচিশটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের মধ্য থেকে দু-চায়জনকে বাছাই করেছি—যাদের এই পেশায় নিযুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিন তিন। এদের মধ্যে রয়েছে আমাদের চারীরা মেয়ে এবং

শহরের শিক্ষিত মেয়ে। আর আছে বাংলাদেশ ও উত্তরপ্রদেশের হিন্দী-ভাষী-একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান মেয়ে। আগামী কয়েকটি লেখায় এদের পরিচয় পাওয়া যাবে। এসব বিবরণই টেপব্লক কর্তা হয়েছে। প্রকাশের আগে সম্পাদনা, নির্বাচন ও পুনর্লিখন করতে হয়েছে।

সরস্বতীর বর্তমান বয়স ৪০ বছর। কুড়ি বছর বাবৎ বেস্তাবুস্তিতে নিযুক্ত আছে। সরস্বতী এককালে যে খুবই রূপসী ছিল তা ওর দিকে তাকালেই বোকা যায়। স্বাস্থ্য এখনও অটুট। বিধবা মা গাঁয়ের বড়-লোকদের বাড়িতে নানাবিধ কাজ করে সংসার চালাত। ভাই-বোনদের মধ্যে সরস্বতী সকলের বড়, দশ বছর বয়স থেকে লে মায়ের কাজে সাহায্য করত।

সরস্বতীর রূপ ছিল অচেন। তের বছর বয়স হতেই প্রতিবেশীদের সাহায্যে একটি ছোট চাষী পরিবারে বিয়ে হয়। ছ বছর শ্রমরস করার পর স্বামীর মৃত্যু হয় হঠাৎ। সরস্বতী তখন মায়ের কাছে কিয়ে আসে। দিনরাত্রি কঠোর পরিশ্রম করে সরস্বতীর মায়ের স্বাস্থ্য ক্ষেতে পড়ে। তখন সরস্বতীকে মায়ের সব কাজের দায়িত্ব বহন করতে হয়। পাঁচ-ছটি ছোট ছোট ভাইবোনসহ আটজনের জুনভাত জোপানো তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠে। এক প্রতিবেশীর বাড়ির অন্ন বয়সী একটি ছেলের কাছে সরস্বতী কলকাতা শহরের ধর জানতে পারে—কলকাতায় অচেন টাকা। তখন সরস্বতীরও কলকাতায় যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু একা কি করে যাবে—কোনোদিন তো গাঁয়ের বাইরে যায় নি। একজন চেনাজানা লোক হরকার।

চৌদ্দ বছরে পা দিয়েছে সরস্বতী। মেহে রূপের চল নেমেছে। কলকাতায় নিয়ে যাবার অল্প লোকের অভাব হয় না। জাতি সম্পর্কের একজন ভাইয়ের বন্ধুকে পাওয়া গেল। তার কাছে শহরের গল্প শুনে শুনে সরস্বতী ভাবে কলকাতা রূপকথায় বেশ। গাঁয়ের পাঁচ-ছটি বাড়িতে হাড়ভাঙা ঝাঁটুনি খেটে মাস সেলে পাওয়া যায় ত্রিশটা টাকা। আর কলকাতায় একজন বড়লোকের বাড়িতে ঝাণ্ডাপরা বাঁধে পাবে মাসে নগর একশ টাকা। ভাবতেই সরস্বতীর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আর হুঃখ থাকবে না।

মায়ের মনটা খচখচ করে। শহরের হালচাল কিছুই জানা নেই।

বার বার আতিথ্যইকে জিজ্ঞেস করে “হ্যাঁ গো ছেলে শহরে আমার মেয়ের কোনো অনিষ্ট হবে না তো?” মায়ের মন—আগে থেকেই কু-ভাক দেয়। একদিন সকল চোখে যা ও তাইবোনদের ছেড়ে সরস্বতী কলকাতার চলে আসে।

আধা ঘুমন্ত স্টেশনে অনেক রাতে ট্রেন পৌঁছয়। ছেলেটার হাত শক্ত মুষ্টিতে চেপে ধরে সরস্বতী রাত্তার এসে দাঁড়ায়। অঙ্ককার। বাহুবলন নেই বললেই চলে। একটা ঢাকা ঘোড়ার পাড়িতে বসা রাজা সেটা ছুটতে ছুটতে পাচতর অঙ্ককারের ভেতর সোঁধোতে থাকে। মাঝে মাঝে জুতুড়ে গ্যাসের আলো। সরস্বতীর গা ছমছম করে ওঠে। আতকে বিস্ময়ে নিজেকেই সে প্রশ্ন করে, এই কি তার সেই রূপকথার রাজ্য?

আসলে যে-ছেলেটির সঙ্গে সরস্বতী কলকাতায় এসেছে সে একজন দালাল। তার কাজ হচ্ছে বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ থেকে মেয়েদের সংগ্রহ করে নানা হোটেল, ব্যবসায়ার ও নিবিদ্ধ পল্লিতে চালান দেওয়া। মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের ওপরে এদের কমিশনের পরিমাণ নির্ভর করে। সরস্বতীকে তোলা হয়েছে বিদ্যাপুরে মুন্সিরগঞ্জের বেড়াপট্টিতে। একজন বাবুবরদী মোটাসোটা মহিলার হাতে সরস্বতীকে সঁপে দিয়ে ছেলেটি হাওয়া।

বাড়িটা অন্ধৃত ঘাঁচের। সরস্বতী ভাবে এরকমই বোধহয় শহরের বাড়ি। পুরনো একতলায় দালান। মাঝে বড় উঠোন—তার চারপাশে সারিবদ্ধ ঘর। সরস্বতী হাজির হওয়ার পরেই পিল পিল করে অন্নবরদী মেয়েরা ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে আসে। পাকানাদার মেয়েগুরু একজনও নেই। মহিলাটি ভিড় ঠেলে সরস্বতীকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বলে, “এটাই তোমার ঘর।” বাড়িটার মালিক বা ঠিকেনার এই মহিলা। ওখানকার সকলেরই সে মাসি। মাসি সরস্বতীকে দেখে বুঝতে পারে স্তম্ভ পেয়েছে। আশ্বাস দেয় “কোনো ভয় নেই। দু-চারদিন বিশ্রাম করো। নতুন এসেছ—কদিন আমার কাছেই ছুটি খেয়ে নেবে। তারপর আর পাঁচটি মেয়ের কাজ যেথেনে নিয়ে নিষেধ সংসার শুদ্ধিয়ে বসবে।” একটি হোকরা মতন ছেলেকে দেখিয়ে বলে, “এই ছেলেটা আমাদের সকলের ফাই-ফরমাস পাটে। তোমার কিছু দরকার হলে একেই বলবে।” এই বলে সরস্বতীর হাতে দশটা টাকা ঘরিয়ে দেয়।

সরস্বতী বুঝতেই পারে না তার কি কাজ। অত মেয়েগুলো তখন গিলে খাওয়ার মতো সরস্বতীকে দেখছে। কেউ কেউ মুখ টেপাটিপি করে হাসছেও। ওদের চলন বলন সরস্বতীর ভাল ঠেকে না। মাসি ওদের এক ধমক লাসিয়ে বলে—“কি দেখছিল না? মেয়েটার কি ল্যাংক বেরিয়েছে না কি পজিরেছে যে তামাসা দেখছিল? বা-বা, বার বার ঘরে চলে যা।” সকলেই হৌড়ে পালাল। মাসি একজন অপেক্ষাকৃত বরফা মেয়ে পান চিবুতে চিবুতে মাসির মুখের ওপরে বলে ওঠে “আ মল বা। দেখব আবার কি গো মাসি, রূপ দেখছি। প্রাণে যে তোমার সোহাগ ধরে না। এত সোহাগ কেন তা কি আর জানি না? হাতে আবার হল টাকা ভাঁজেও দেওয়া হয়েছে। পরে তো হুমে-আসলে হোল আনাই পুিয়ে নেবে।”

সব দেখে শুনে ভয়ে সরস্বতীর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে সরস্বতী ঠাকুরকে স্মরণ করে। ভয়ে হুখে সরস্বতী কুপিয়ে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে “আমি বার কাছে ফিরে যাব।” তখন ঐ মেয়েটিই মুখে চুক চুক আঙুরাজ করে বলে ওঠে “আহা-হা, আর কেঁদো না অম্বর। তোমার কাঁদতেও হবে না, তোমার বাড়ি ফিরে যাওয়াও হবে না। এইখানে একবার যে আসে সে চিরকাল এইখানেই থেকে যার। তোমারও বাছা ক্রমে ক্রমে সব লয়ে যাবে। তখন কত রস পাবে, নিজেই আর ফিরে যেতে চাইবে না।” মাসি তাকে আবার এক ধমক দিতেই মাসিকে জিব শুভ্রিয়ে মেয়েটি বিচ্ছিন্নভাবে কোমর দোলাতে দোলাতে চলে যায়। আশেপাশের ঘর থেকে খিল খিল করে হাসির আঙুরাজ ভেসে আসে।

মাসি সরস্বতীর পিঠে হাত বুলিয়ে সাধনা দেয় “মন ধারাপ করো না গো মেয়ে। সব ধরই আমি জানি। তোমার অনেকগুলো ভাইবোন, বাবা বেঁচে নেই, মার ব্যামো। সামান্য বি রাঁধুনীর কাজ করে কত আর পয়সা মেলে। এতগুলো মুখের আর কি তাতে যোগাড় হয়? এখানে একবার যখন এসে পড়েছ—দেখবে কত টাকা। রাজধানীর মতো স্বাধীনভাবে থাকবে, ইচ্ছে মতো বাড়িতে টাকা পাঠাবে। কত সোনা-দানা ভাল ভাল শাড়ি হবে। একবার কাজে মন বসে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।”

তখনও সরস্বতী জানে না তাকে কি কাজ করতে হবে। মাসির ঘরে

দুটি ধেরে নিয়ে মাসির গা ঘেসেই বসে থাকে সরস্বতী। এতগুলো মেয়ে এখানে থাকে—অথচ ওদের মা বাবা ভাইবোন নেই কেন বুঝতে পারে না। ভরে মাসিকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারে না।

সরস্বতী দেখতে পায় বিকেল চারটে থেকেই মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে সাজগোজ করছে। প্রত্যেকেই মুখের সামনে আয়না ধরে গালে টোটে নানা রকমের রং মাখাচ্ছে। সরস্বতী ভাবে “সকলেই কি কোনো বিয়ে বাড়ি বাচ্ছে নাকি?” সন্ধ্যা পড়িয়ে আসতে না আসতেই বাড়িটার চেহারা পাঁটে বায়। সাজগোজ করা পুরুষমাহুষ একে একে ঢুকতে থাকে। সরস্বতী ভাবে “বোধহয় আত্মীয়-স্বজনরা ওদের সঙ্গে করে নিয়ে বেতে এসেছে। ওমা, একজন করে পুরুষমাহুষ আর একজন করে মেয়ে বার বার ঘরে ঢুকে ঝাঁপ এঁটে দিচ্ছে।” মাসিকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পায় ওটাই মেয়েদের কাজ। মাসি বলল “এদের মতন বাবুদের কাছে তোমাকেও কাজ করতে হবে।”

সরস্বতীর দম হঠাৎ বন্ধ হয়ে এল। এই প্রথম সে ব্যাপার বুঝতে পারল আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে নিজের ভাড়া ঘর, কল মা, ছোট ছোট ভাইবোনগুলোর মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। কানে সে শাঁখের আওয়াজ শুনল। কেমন তার মনে হল এই বৈভ্যপূরী থেকে কোনোদিন সে আর, কোনোদিন, বেরোতে পারবে না।

মাসির কথা কানে আসে, “এসুনি তোমার কোনো কাজ করতে হবে না। ধীরে-স্থগে সব হবে। এক বছর তোমার লেখাপড়া গান বাজনা শেখানো হবে। তোমার কাজ তার পরে শুরু হবে।” সরস্বতী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল “তবু অন্ততঃ একটা বছর তো রেহাই পাওয়া গেল।”

করেকদিন বাধে সরস্বতীর ট্রেনিং আরম্ভ হল। সকালবেলার নাচ-গান ও সন্ধ্যাবেলার পড়াশুনা শেখানোর মাস্টার আসতে লাগল। এভাবে একবছরের ট্রেনিং শেষ হতেই মাসি একদিন সরস্বতীর ঘরে ঢুকে একগাছা চুমকি দেওয়া স্বকমকে শাড়ি আঁসা আর গয়না বিছানার ওপরে বপাং করে কেলে বলল “নাও বাছ, সেজেগুজে নাও। আজ থেকে তোমার কাজ শুরু কর। এই এক বছর ধরে তোমাকে লেখাপড়া আর নাচ-গান শেখাতে আমার অনেক খরচা হয়েছে। কাজ করে সেসব তুলে দিতে হবে। তারপরে তোমার টাকা দিয়ে তুনি যা ইচ্ছে কর আমার কিছু বলার নেই।” তখনও সরস্বতী জানে না তাকে

কতখানি করতে হবে। মাসি বলল “নাচগানের দল এখানে একটা আলাদা ঘর আছে—সেখানে মাঝে মাঝে আসব বসে। পরসাপালা অনেক বড় বড় লোক আসে। তুই যদি নাচ দেখিয়ে খুশি করতে পারিস, টাকা দিয়ে তারা তোকে ঢেকে দেবে। বুঝি নি, নাচগানের মধ্যেই চোখের ইশারায় বাবুদের মজাবি। দেখবি বাবুরা পকেট উপুড় করে তোর পায়ে সর্বস্ব ঢেলে দিচ্ছে।” একথা শুনে সরস্বতীর গলা থেকে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। নতুন করে কিছু তাববার সময়ও পায় না। মাসি ব্যস্ততার সঙ্গে সরস্বতীকে সাজাতে থাকে। সরস্বতী কিরকম পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে মাসি তার মুখের সামনে আয়না ধরে বলে “ভাখতো? নিজেই চিনতে পারিস কিনা?” সত্যিই সরস্বতী নিজেই চিনতে পারছিল না। তার যেহেতু যে এত রূপ সে তা জানতোই না। আয়নার চোখ রেখে নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ। হঠাৎ চমক ভাঙল মাসির কথায়। “বলি নিজের রূপে কি নিজেই মজে গেলি? বাবুরা এই রূপ দেখে তিরমি খাবে দেখিস। চল বাবি চল—বাবুরা সব বসে আছে।” সরস্বতীর ঘোর কেটে যায়। জিজ্ঞেস করে “আমাকে কি আজ থেকেই নাচতে হবে?” মাসি একগাল হেসে বলে “না গো মেয়ে, তোমাকে আজ থেকেই নাচতে হবে না। আজ তুই ঘোমটা টেনে চুপ করে বসে অল্প মেয়েদের নাচ, তাদের ঠমক, চাল-চলন দেখবি আর বাবুদের চিনে রাখবি। মুখের ওপরে ছোট্ট করে ঘোমটা টেনে রাখবি—সরাবি না।” একথা শুনে সরস্বতী আবার একটু আশঙ্কিত হয়। সন্ধ্যার পরে মাসির হাত ধরে নাচের ঘরে ঢোকে। ঘরটার চারদিকে বড় বড় আয়না টাঙানো—মাথায় ওপরে বাড় লঠন। মেঝেতে বিশাল করাসে সারি সারি তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে নানা রকমের চেহারা ও বয়সের পুরুষ মানুষেরা বসে আছে। প্রত্যেকের লামনেই কাচের গ্লাস ও মদের বোতল। বেল ফুল আর মদের গন্ধে বিশেষ ঘরে মধ্যোচী কেমন গাঁজিয়ে উঠেছে, সরস্বতীর গা জলোড়ে লাগল। মাসি সরস্বতীর হাত ধরে একটা কোণ ঘেঁসে বসল। একটা মেয়ের নাচ হচ্ছিল। পুরুষদের মধ্যে কয়েকজন চিৎকার করে বলে ওঠে, “কি গো মাসি, কি এমন রতন যোগাড় করলে যে লুকিয়ে রাখছ? খুলে একটাবার দেখাও না।” মাসি বলল, “দাঁড়াও বাপু, একটু সব্ব কর। নতুন এয়েছে—ওকে সকলে মিলে ভড়কে দিও না। আপে

একটু রক্ত হতে দাঁড়। পরে আপনিই ঘোমটা তুলবে।" সকলে বলে ওঠে "ঠিক কায় মাসি, বহুৎ আচ্ছা। সবুরে মেওয়া কলে, এ তো শাচ্ছেই বলেছে।" কথার পিঠে সকলে দমকে দমকে হাসতে থাকে। ওদিক থেকে একটি বাবু বলে ওঠে, "খুব জোর মাল পেয়েছে রে মাসি। তা মাসি আমাদের ঘেরে ক্যালো আগন্তি নেই, পলাটা মাইরি কেটে নিও না।

কয়েকদিন পর মাসির হুকুম হল—“আজ নাচতে হবে, হ্যাঁ আজই। সরস্বতীর মেজাজ বিগড়ে যায়, আসলে তার খুব ভয় করছিল। সে বিদ্রোহ করে বলে “না—আমি ওভাবে নাচতে পারব না।” তারপর মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে। ওদিকে বাবুরা তখন হৈ-চৈ শুরু করে দিয়েছে—“হ্যাঁ গো মাসি, আর কতদিন তাঁওতা দেবে এতগুলো ভক্তলোকের ছেলেকে?”

সরস্বতীর তখন প্রচণ্ড মাথার ব্যথা। বলল, “আমার মাথার খুব ব্যথা হচ্ছে—পারব না নাচতে।” মাসি তখন “ওখুশি দিচ্ছি এতখুশি সেবে বাবে” বলে কি একটা বড়ি হাতে বরিয়ে দিল। রক্তিন আরকের একটা রাস দিয়ে বলল “কমলালেবুর রস এটা, বড়িটা দিয়ে খেয়ে নে।” বলে একরকম জোর করেই খাইয়ে দিল। সরস্বতীর মাথা বিম্ব বিম্ব করতে থাকে—চোখে অন্ধকার দেখে। তারপর সে জানে না কি ঘটেছিল। শেষ রাতে ঘুম ভাঙতে দেখে শুয়ে আছে নিজের বিছানায়—পাশেই একজন ছন্দর মতন বয়স লোক অঘোরে ঘুমিয়ে। সরস্বতী বুঝতে পারে তার বা সর্বনাশ হবার ছিল হয়ে গেল। সরস্বতী বলতে বলতে অশ্রুমনস্ক হয়ে যায়। আমি একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাস করলাম—

“তারপর?”

“তারপর আর কি বলব আমারও সব কিছু অভ্যাস হয়ে গেল। তখন লাইনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম।”

“কি ধরনের মানুষ আপনার কাছে আসত—আপনার প্রতি তাদের ব্যবহার কি রকম ছিল একটু বলবেন?”

“সে হরেক রকমের মানুষ আসত ভাই। কত আর বলব।”

“আমি কয়েকটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। যদি আপত্তি না থাকে—তাহলে যেভাবে স্মরণে হয় উত্তর দেবেন?”

“হ্যা—বলুন কি জানতে চান?”

“আপনি যে সময়কার কথা বলছেন সে-সময়ে আপনাকে দিনে কতজন লোককে সন্মত করতে হত। তখন আপনার রেট কত ছিল—আর এখনই বা কত। ব্যাং আপনার কাছে আসত তাদের সন্মত করার জন্য আপনাকে কোনো খরচ বহন করতে হত কিনা একটু বলুন।”

“আমাকে তখন প্রতিদিন দু-তিন জনের বেশি লোককে ঘরে আসতে হত না। মাসি বাছাই করা লোকদেরই আমার কাছে পাঠাত। তাদের কাছ থেকে মোটা টাকা পাওয়া যেত। আমার রেট ছিল আর সকলের চেয়ে বেশি। সেজন্য অন্য সব মেয়েরা কত হিংসে করত আমার। আমার প্রতিদিন রেট ছিল ৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত।”

“সব টাকাই কি আপনার হাতে আসত?”

“পাপল, মাসির সঙ্গে টাকা-পয়সার লেনদেন চলত তাদের। কে কত টাকা দিচ্ছে—মাসি তা আমাকে জানতে দিত না। মিথ্যে করে কমিয়ে বলত। তবে বেটুকু পেতাম তা যথেষ্ট ছিল।”

“অন্ত টাকা নিয়ে আপনি কি করতেন?”

“বেশ কিছু টাকা আমাকে বেশের বাড়িতে পাঠাত হত। এখনও নিরমিত টাকা পাঠাই। তবে আগের মত পরিমাণ পাঠাতে পারি না। কিছু সোনার গয়না করিয়ে রেখেছিলাম। কোনো কোনো বাবু অন্য খরচাও করতে হতো তাদের খুশি করার জন্য। বাবুদের মধ্যেও অনেকেই খুশি হয়ে আমাকে সোনার হার আর নগদ টাকা দিত। মাসিকে গয়নাগুলো দেখাতাম—টাকাটার কথা আর বলতাম না।”

“আপনার কাছে ব্যাং আসত—আপনার প্রতি তাদের ব্যবহার কেমন ছিল? বিশেষ কারোর সঙ্গে আপনার প্রীতির সম্পর্ক হয়েছিল কিনা একটু বলবেন?”

“সকলের ব্যবহার সমান ছিল না। অবশ্য বেশির ভাগ বাবুই আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত। দু একজন বাঁহরামো করার চেষ্টা করত ঠিকই—তাদের আমি তাগিদে দিতাম।” একটু চুপ করে থেকে—“হ্যা একজনের সঙ্গেই আমার ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে ব্যাং বহুর ব্যয় করেছি।”

“সে সময়ে অন্য বাবুরা আসত না?”

“না বাবুর নিবেশ ছিল। মাসিকে ডেকে বলেছিল, “ভাখো মাসি, বীণা এখন আমার। (সরস্বতীকে বীণা বলে ডাকত)। ওকে নিয়ে টানাটানি করো না। তোমার বা পাওনা আমি দিবে বাব।”

“মাসি কি বললে?”

“মাসি কথাটা শুনে মোটেও খুশি হয়নি। তবে বাবুর কথা মেনে নিয়েছিল। আসলে মাসির ভাল ছিল আমাকে দিবে আরও বেশি যোজগায় কববে। তা না হওয়ায় আমার ওপর রাগই ছিল।”

“কেবলমাত্র একজনের সঙ্গে থেকে আপনার আর্থিক কতি হত না?”

“বাবুই সব পুবিষে দিত। মায় আমার দেশের বাড়িতেও পাঠাবার জন্য আমার আলাদা টাকা দিত। আর বলতে কি আমিও তো সত্যিই এই জীবনে আসতে চাইনি।”

“কতদিন সেই বাবুর সঙ্গে ছিলেন?” ঘুরে বসে থাকা ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল “ঐ যে দেখছেন বসে আছে ও আমার মেয়ে। ওর বয়স এখন দশ বছর। আমরা একসঙ্গে বায় বছর থেকেছি।

“মেয়েটির বাবা কি ঐ লোকটিই?”

সলজ্জ হেসে বললো, “হ্যাঁ।”

“কবে মুন্সীগঞ্জ ছাড়লেন—কেনই বা ছাড়লেন, এখানে কতদিন থেকে আছেন একটু বলুন।”

“সে আর এক কাহিনী দিদি। বাবুকে পেয়ে নাচগান তো ছেড়েই দিয়েছিলাম। নানা কারণে মাসির সঙ্গে বনিবনাও হচ্ছিল না। বাবুর অবস্থা বেশ ভাল ছিল। তখন কোনো একটা বড় কোম্পানির বড়বাবু। মাসি বাবুকে খাঁটাতে বেশি সাহস পেত না। তা সত্ত্বেও বাবু একদিন আমার বললে, “তোমাকে আমি এখানে রাখব না। অল্প জায়গায় থর ভাড়া করে নিয়ে বাব। আমিও সারাদিন থাকি না—কোনোদিন মাসি তোমার সর্বনাশ করে বসবে।” বাবুর যেই কথা সেই কাজ। বাবু আমার খুবই ভালবাসত। মাহুঘটা এমনিতে খুব আমুদে আর শান্তিপ্রিয় ছিল। অশান্তি একদম ভালবাসত না। সত্যিই একদিন মুন্সীগঞ্জ ছেড়ে বাবুর সঙ্গে পক্ষার ওপারে ভাড়া করা বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সেখানে বেশ কিছুদিন সুখেই ছিলাম। কেবল শেষের দু বছর বাবু যেন ক্রিয়াকর্ম একটু মনমরা হয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও প্রথম কিছুদিন আনতে পারি নি কেন। একদিন আমি রান্না করে বাবুর জন্য অপেক্ষা

করছি—বাবু একটু ঘেরি করে এল সেদিন। সেদিন প্রচুর মদ খেয়ে এসেছিল। এনেই আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে “মজু— আমার মজু” বলতে লাগল। আমি তখন তো পাখর। মজু আমার কে? তখনকার মত অনেক কষ্টে বাবুকে শান্ত করলাম। মাথায় মুখে জল দিয়ে পাখার হাওয়া করতে আবার কোলের মধ্যে মাথা রেখে ‘সুনিরে পড়ে।’”

“আচ্ছা আপনার বাবু বিবাহিত ছিল কি?”

“হ্যাঁ—সে আরেক কাহিনী। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম বাবুর বিয়ে হয়েছিল—বৌ মারা গেছে। আমি বিশ্বাসও করেছিলাম। সেইদিন আবার নতুন করে অস্ত্র ঘটনা জানলাম।”

“কি জানলেন?”

“বাবুর ঘুম ভাঙতেই ‘বীণা’ বলে ডেকে উঠল। আমার মুখের দিকে ডাকিয়ে বুঝতে পারল কোথাও একটা গোলমাল গেছে। খুব শুকনো মুখ করে জিজ্ঞেস করল, “তোমার কি হয়েছে বীণা? চুপ করে আছি কেন, কথার উত্তর দাও।”

“আপনি কি বললেন?”

“বাবুর অমন অবস্থা দেখে মনটা আমার নরম হয়ে গেল। দুহাতে তাকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম মজু বলে আমার ডাকছিলে কেন— মজু কে?”

“তারপর?”

“ঠিক জবাব না দিয়ে প্রায় চুপ করে নেবার চেষ্টা করল।”

“কিভাবে?”

বললে—“ও কিছু নয়। আগলে মজু নামটা আমার খুব পছন্দ। বীণা নামটা পুরনো হয়ে গেছে। তোমাকে আমি মজু বলেই ডাকব—কেমন?”

তখনই আমার কেমন রাগ চড়ে গেল। রেগে বললাম ‘ককনো না। মজু নামে ডাকলে সাড়া দেব না। কত সাধ করে বীণা নামটা দিয়েছিলে— বলেছিলে সরস্বতীর মতই তোমার রূপ শুণ। গলার স্বর বীণার তারের মতন। আমাকে তুমি বীণা বলেই ডাকবে। আর এখন বলছ মজু। আমার কাছে বিধে বলবে না। বতরুণ পর্যন্ত কে মজু না বলছ একটি দানাও দাঁতে কাটবে না। বাবুও জানত আমার যেই কথা সেই কাজ।”

“তারপর কি হল?”

“ওকথা বলতেই বাবু সব কথা বলল। পাকিস্তানে বাবুদের বাড়ি ছিল। সেখানেই মজুর সঙ্গে বিয়ে হয়। দাঙ্গার সময় বাবুর বৌকে ধরে নিয়ে যায়। বাবা মাকে মেয়ে কেলে। বাবু কোনোরকমে কলকাতায় পালিয়ে এসে প্রাণটা বাঁচায়।

প্রশ্ন করি—“তারপর ?”

তারপর এমিকেই বাবুর জীবন শুরু হয়। মা বাপ নেই, বৌ নেই—কেমন যেন বেপয়রা ত্যাব। অষ্ট মাসখটা আর সবার মতো নয়। আপিসে কার পাল্লার পড়ে আমাদের পড়িতে আসা শুরু করে। আমার সঙ্গে আলাপ হয়। বার বছর গিরিহি করলাম। আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার ছবছর আগে পাকিস্তানে থাকে এক জাতির কাছ থেকে খবর পায় বাবুর বৌ মুসলমানদের ধর্মর থেকে পালিয়ে এসে তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। বাবু তাকে গ্রহণ করবে কি না—না জেনে কলকাতায় আসতে পারছে না। তখন বাবুর মন ধারাপের কারণ আমি বুঝতে পারি। মজুকেও বাবু খুব ভালবাসত। এতদিন মুসলমানের ঘরে থেকে এখন পালিয়ে এসেছে—আমীকে কিরে পেতে চায় জেনে বাবু পড়েছিল উত্তর সঙ্কটে। এমিকে আমার ভাবনাও মাথায় আছে। তার কি কর্তব্য জানতে চায়।”

“আপনি কি বললেন ?”

“আমি বললাম—মজুকে তার গ্রহণ করা উচিত। সে তো কোনো অপরাধ করে নি। তার কপাল বন্দ। তুমি যখন জানতে পেরেছ সে কিরে আসতে চায়—তাকে তোমার নিশ্চয়ই গ্রহণ করা উচিত। আমি আরও বললাম মুসলমানের ঘরে এতদিন ছিল বলে তাকে নিয়ে ঘর করতে ঠেকছে ? তবে যদি সেটা দোষ হয় তাহলে তোমার দোষ তো আরও অনেক বেশি। সে ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইল তার কি দোষ। কেন তাকে অভিযোগ করছি।”

“আপনি কি উত্তর দিলেন ?”

“আমি বললাম সে তো মুসলমানদের ঘরে ইচ্ছে করে যায় নি—তাকে জোর করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তুমি তো চলে এলে এখানে। সেই বেচারী হয়ত তোমার খোঁজ করেও পায় নি। তার কি দোষ বল ?”

সে বললে, “বেশ তার তো দোষ নেই বুঝলাম। কিন্তু আমার দোষ কি—সেটা বলবে ?”

বললাম, “তোমার দোষ ? হায় কপাল তোমার দোষই তো আমার-

সৌভাগ্য এনে দিয়েছে। তুমি আমার রাজ্য। কিন্তু তুমি তোমার বৌয়ের কাছে ঘোবী। সে তোমার কাছে কিরে আসার ভক্ত কর্তাই না মাথা কুটেছে। তুমি তো পালিয়ে এসেছ নিরাপদ আশ্রয়। এখানে কত আনন্দে দিন কাটিয়েছ। তোমার বৌ-এর কথা তো একবার বিবেচনা করা উচিত।”

সে তখন খুব কাতর হয়ে বলল, “বীণা, তোমার ছেড়ে আমি কি করে থাকব? ছদ্মক আমি কেমন করে বজায় রাখব?”

আমি আবার তাকে শাস্ত করে বললাম, “সত্যিই যদি তুমি আমার ভালবাস তাহলে আসছে সাতদিনের মধ্যে বৌকে নিয়ে আসবে। তা না হলে আমিও শাস্তি পাব না।”

প্রশ্ন করলাম, “আপনি বলতে পারলেন? কষ্ট হল না?”

“হ্যাঁ মিদি, খুব কষ্ট হচ্ছিল। বুকটা কেটে বাচ্ছিল বলতে। কিন্তু একথা না বললে তো ধর্মের কাছে অপরাধ হত। তার আমীকে তো এককাল আমিই ভোগ করেছি। তার কাছ থেকে অটল ঐশ্বর্য পেয়েছি। সেই বেচারী বিনা অপরাধে খালি শাস্তিই পেয়ে যাবে এটা কি কোনো কথা হল? আমারও তো একটা কর্তব্য আছে মিদি। এককাল বার ছন খেলায় তার মজল তো আমাকেই চাইতে হবে। তাই না?”

আমি বললাম, “একশবার সত্যি।”

প্রশ্ন করলাম—“তারপর কি হল সৃষ্টিপে বলুন।

“বাবু একমাস আমার কাছে আর আসে নি। অন্তলোকের হাতে বাড়িভাড়া বাবদ তিনমাসের টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল। একমাস বাবে এখন এল তখন অনেকটা রোগা হয়ে গেছে—সুখ শুকনো। হাত পা ধোবার ব্যবস্থা করে বসলাম। খুব খিদে পেয়েছিল। কথানা লুচি করে দিলাম। কোনো কথা জিজ্ঞেস করলাম না।”

“নিজের থেকেই কিছু বলে নি?”

“হ্যাঁ—বললো বৌকে নিয়ে এসেছে—তাদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনাও হয়েছে। এমনকি আমার সম্বন্ধেও বাবু সবকথা মজুকে বলেছে।”

“মজু কিছু বলেছে সেসব কথা শুনে?”

“হ্যাঁ মজু অনেক করে আমার গুহের কোয়ার্টারে নিয়ে যেতে বলেছে। আমিও একবার বাবুর বৌকে দেখবার জন্য যেতে রাজি হলাম। মনের মধ্যে নানারকম ছদ্মক নিয়ে গেলাম। মজু বাবাকে হুহাত দিয়ে অফিরে নিল তার বুকের মধ্যে।”

“মুহু আপনাকে কি বলল?”

“বলল দিদি তোমার জন্য আমি আমার স্বামীকে এতদিন বাধে ফিরে পেয়েছি। তুমি আমার আসল মায়ের পেটের বোন। তোমাকে আমি ছাড়ব না দিদি। তুমি আমাদের সঙ্গে এখানেই থাকবে।”

“তুনে আমার বুকটা কেটে কাঁদা বেরিয়ে এল। আমাকে অনেক অহুয়োব করেছিল ওদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমি রাজি হইনি।”

“কেন রাজি হলেন না?”

“কেন জানেন? সে তখন আমার জন্য স্বামী ফিরে পেয়েছে ভেবে আমার সে স্বর্গের দেবী মনে করেছে। কিন্তু সময়ে যখন সব মোহ কেটে বাবে তখন আমি প্রথের কাঁটা হয়ে থাকব। তখন হয়ত বাবুও আমার হেয় চোখে দেখবে। আমি কি তা হতে দিতে পারি?”

“আপনার তাতে আর্থিক ক্ষতি হল না?”

“বাবু তো আমার অনেক কিছু দিয়েছিল। তা ভাঙিয়ে এখনও চলছে আমার। একটু খেমে হেসে বলল, “আর বেশিদিন অবস্থা চলবে না।”

“আপনি ফিরে এসে কি করলেন?”

“বাবুই আমার পৌছে দিল। এক বছরের ভাড়া হাতে শুধু দিতেই আমি আপত্তি জানালাম। বললাম ঘরটা ছেড়ে দেব। তা তুনে বাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। আমি কি করতে চাই জানতে চাইল। বললাম, “ঘরটার ভাড়া কেন মিছিমিছি গুনবো? আমি কোনো বস্তিতে কমভাড়ায় থাকতে পারবো। লাইনের লোকদের বললেই বুঝে দেবে। তুমি কিছু ভেব না।”

বাবু বলল—“তা হলে আমি তোমাকে কোথায় পাব?”

আমি বললাম, বলতে আমার বুকটা কেটে বাচ্ছিল, তাসম্বন্ধে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম “ওমা এতদিন বাধে হারান মানিক ঘরে ফিরে এল—তুমি এখানে থাকবে কি? বৌ কি একা থাকবে নাকি? না-না তোমাকে এখন আর আমার কাছে আসতে হবে না। খুব বড়ি ইচ্ছে হয় মাসে এক দিন দু এক বর্টার জন্য আসবে। পরে তাও আসবে না। বৌমাকে সুখী করো সে খোকার মা হোক।”

বলল, “তুমি আমার দূরে গেলে দিচ্ছ, তুমি কি আমার আর ভালোবাস না বীণা?”

আমি বললাম—“বাবু আরও ইলান লাইনের লোক। আমাদের কি

একজনকে ভাল লাগলে চলে? সকলকে ভালবাসতে হয়। বতরদিন ঘরে বৌ ছিল না—এখানে এসেছি। এখন ঘরে বৌ রয়েছে—আর এসো না। টাকাকলো তুলে নিয়ে রাগ করে বেরিয়ে গেল। আর আমি সারা রাত বসে কাঁদলাম।”

“সে কি আর এসেছিল?”

“আমি জানতাম সে না এসে পারবে না। তাই আগে থেকেই স্ত্রী আয়গার ঘর ঠিক করে রেখেছিলাম। বাবু চলে যাওয়ার পরের দিনই সেই ঘর ছেড়ে দিয়ে এই ঘরে উঠে আসি। এভাবে তাড়াহুড়ো করে চলে আসার আরও একটা কারণ হল আমার পেটে তখন ঐ মেয়েটা। সেই খবরটা জানতে পারলে ওকে ছাড়ানো আরও কষ্টের হত।

বললাম “তারপর?”

“তারপরে অনেকদিন বাহে পত এক বছর আগে হঠাৎ একদিন এসে হাজির। চেহারাটা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি তো তাকে এখানে দেখে অবাক। সুনলাম অনেকদিন ধরে লাইনের অনেকের কাছে কাজ নিয়ে তবে এখানকার ঠিকানা সংগ্রহ করেছে।”

“এসেই কি বললে?”

“এসেই ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখল ছোট্ট বিছানার দশমাসের শিশু ছিলে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ছেলেটার পায়ের ওপরে একশ টাকার একটা নোট কেলে দিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল। দুই বে নিম্নের মেয়ে পাড়িয়েছিল জানতেও পারল না।”

“আব কি বোগাবোগ হয়েছে?”

“না: সে আর আসে নি। তবে খবর পেয়েছি বাবুর একটি খোকা হয়েছে।”

“এখন আপনার কি করে সংসার চলে?”

“বাবুকে ছেড়ে আসার পর কিছুদিন লাইনের কাজ করেছি। বাবুর দেওয়া কিছু এখনও আছে। গত বছর থেকে একজন বৃদ্ধা মাহের ব্যাশারীর সঙ্গে থাকছি। সব মিলিয়ে চলে যায় আর কি। এখন আর লাইনের কাজ করি না।”

“ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ কি ভেবেছেন?”

“কি ভাবব দিদি। আমরা তো সমাজে অচ্ছুৎ। আমাদের ছেলেমেয়েদের কথা কে ভাববে? ছেলেটা বড় হলে চেষ্টা করব পড়াতে। মেয়েটার

বা রূপ শুকে অন্ত আরগায় পাঠাতেও ভয় হয়। এই লাইনের লোকজন-
দের কিছু বিশ্বাস নেই। এই বস্তি থেকেই কত ছোট ছোট মেয়ে চুরি হয়ে
গেছে। পুরনো মাসির ওখানে সামাজ্য বা লেখাপড়া শিখেছিলাম মেয়েটাকে
সেটুকু শিখিয়েছি।” (মেয়েটি তখন বসে বসে লেন্স বুনছিল)।

“মেয়ে তো বড় হচ্ছে ওর কথা তো ভেবেছেন কিছু? কি করতে
চান মেয়েকে?”

“ভগবান জানেন মেয়ের কপালে কি আছে। বাহুবাবুকে (বাহুবাবু
একজন সমাজসেবী) একটা ভাল ছেলের সন্ধান নিয়ে বিয়ের চেষ্টা করতে
বলেছি। আর তো বেশিদিন শুকে রাখা যাবে না। শেষ পর্যন্ত আমার
মেয়েকেও লাইনে দাঁড়াতে হবে তবে বুক কেঁপে ওঠে। কত বড় শরের
মেয়ে আমার। ওর কপালেও হয়ত আমারই মতন লিখন আছে।”

ছহাত কপালে ঠেকিয়ে সরস্বতী কান্নামাড়া গলায় বলল, “হে মাকালী
তোমার আশ্রয়ে আছি এখানে। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।”

তত্ব হয়ে আমি দেখলাম এক বেস্তা-মা তার কস্তার অন্ত প্রার্থনা জানাচ্ছে
সন্দিগ্ধের প্রতিমাকে।

লে মাহুবরা কই বাঘের কাছে সরস্বতী এই আবেদন জানাতে পারত।

শিশু শিল্পীর প্রকৃতি প্রেম ।

শান্তনুর বয়স দশ বছর পেরিয়েছে। দশ বছর গোটা জীবনের হিসেবে এক অতি ক্ষুদ্র অংশবিশেষ, কিন্তু বড় মূল্যবান—একে আরও মূল্যবান করার অল্প বধাব্যতাবে কাজে লাগিয়েছে শিশু শান্তনু মণ্ডল, প্রমাণ করেছে তার একক প্রদর্শনীর মাধ্যমে। মনোরাজ্যে বয়সের ভূমিকা যে অতি নগণ্য তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই শিশু শিল্পী।

তথ্যকেন্দ্রে তার একক প্রদর্শনীতে তিন বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে আঁকা চিত্রাবলি থেকে নির্বাচিত আটত্রিশটি চিত্র নিয়ে মেদিনীপুর থেকে এসেছিল দেখানোর তত্ত্ব, কিন্তু বখন দেখল সব ছবি লাগানোর পর একটা ছবির আরগা বেশি হয়েছে অর্থাৎ আরও একটা ছবির প্রয়োজন ঐ আরগাটা ভরানোর অল্প—সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে পড়ল তথ্যকেন্দ্রের প্রদর্শনী কক্ষে ঐটা তৈরি করতে। সঙ্গে আনা রং, তুলি, কাগজ বেছেতে পেতে আরম্ভ করে শেষও করে ফেলল। জিজ্ঞাসার উত্তরে বলল “আর একটা মাত্র দরকার তো, তাই করে ফেলছি”, কী অকণ্ঠ স্বীকারোক্তি, শিশুহুলভ সারল্য আব হুঃসাহসিকতাতেই সম্ভব।

দশ বছর থেকে আরম্ভ করে দশ বছর কয়েক মাস, এর মধ্যে আঁকা ছবিগুলিতে শান্তনুর বিভিন্ন মানসিকতা বরা পড়েছে। প্রথম যিকে পাতা না পারার ভয় এবং শিশু মানসিকতা প্রবল। আবার শিশুরা যেমন এক-পা এক-পা করে হাঁটতে শেখে মাঝে মাঝে ছব করে পড়ে বাঁধ আবার দেয়াল ধরে হাঁটার চেষ্টা করে, সেই ভাবেই এগিয়েছে এই শিল্পী তার চিত্রকে সাধী করে। এইরকম চেষ্টা করেছে বলেই বোধ হয় সে তার রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। প্রতিটি চিত্রে রং-এর ব্যবহারে সঙ্গতি এবং চিত্রার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পেয়েছে। প্রকৃতি পরিবেশ তাকে অধিক ভাবে প্রভাবিত করেছে তার প্রমাণ প্রায় চিত্রে লক্ষ্যীয়।

কিন্তু চুঃখ হয় আমাদের দেশে এই রকম অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠা আর অল্পেরই বিনয় হয়ে বাচ্ছে উপযুক্ত চর্চার এবং প্রকাশ মাধ্যমের অভাবে।

প্রখ্যাত বর্ষায়ান শিল্পী শ্রীমীরদ মজুমদার মহাশয় উদ্বোধনের প্রাক মুহূর্তে শাস্ত্রকে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত চাপড়ে আশীর্বাদ করলেন একে বাও হুঁকার গতিতে'।

শাস্ত্রকে এক কথায় প্রকৃতি প্রেমী শিল্পী বলা চলে, কারণ তার সমস্ত চিত্রই প্রকৃতি নির্ভর। ১নং চিত্র 'কুকচুড়ার ছায়ায়' একটি কুকচুড়া গাছের ছায়ায় ছোট্ট একটি ঝুঁড়েঘর, এখানে রং-এর ব্যবহার অতি সহজে করেছে। সিন্দুরে লাল কুকচুড়া ফুলগুলি সত্যিই প্রাণম্পর্শী হয়ে উঠেছিল দর্শকদের কাছে। "ওপখ গেছে কোনখানে" (২নং) অনেক অনেক দূর পথের সর্পিল গতি গ্রামবাংলার নিজস্ব পাভীর্ষ আর মাথুর্বে ভরিয়ে দিয়েছে। মূলতঃ শহরে বড় হওয়া শাস্ত্রের কল্পনাশক্তির গভীরতার কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু "সুর্ধাত" ছবিতে (৩নং) পারদমতার অভাব দেখা দিয়েছে—অর্থাৎ সুর্ধাতের যে রং তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং বেশ অন্তমনস্কতার সাথে এই ছবিটি এঁকেছে, অথচ সবই ভাল রং এর ছবি, এই মাধ্যমে আর একটু মনোনিবেশ সহকারে আঁকলে হয়ত এ ছবিটিও ভালোই হত।

শিল্পীর বাসস্থানের কাছাকাছি সত্তরবত মেহিনীগুয়ের "অজকোর্টের মাঠ" (১০ নং) এ ছবিতে তার আত্মিক বোনের স্পষ্ট ছাপ বরা পড়ে, এখানে শিল্পীর দৃষ্টির সাথে রং ও তুলির আভ্যন্তরিক মিলন খটেছে আর ছবিটি হয়েছে বেশ পরিণত। এমনি আরও বলা যেতে পারে "তালপুকুর" (১২নং) "পাহাড় বহি থাকে পথ জুড়ে, নদী হেসে যায় বৈকে চুরে" বথেষ্ট কুমতালত এবং পরিণত ছবি সব দিক দিয়ে।

ছবি আঁকা আরম্ভ করার এক বছরের পরের ছবি "মেলা" (১৬নং) দু বছর পরের ছবি "আমাদের ফুলবাড়ি" (২১নং) এ ছবিগুলিতে শিল্প-ফুলভ চাকল্য পরিলক্ষিত হয় এবং অপরিণত। চাকল্য এই অস্ত্র বলছি যে একটি ফুলবাড়িতে নিশ্চয়ই তিনটি শিল্প পড়ে না, সেখানে অনেক শিল্প দেখালে মনে হয় এ ছবিটিও নিশ্চিতভাবে পরিণত এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠত। নাম দিয়েছে "আমি সমুদ্র দেখিনি" (২২নং) কিন্তু না দেখা সমুদ্র এঁকেছে কল্পনার আবল্যে, প্রকাশ করতে পেরেছে সমুদ্রের উত্তালতা

আর তার বিপত্ত প্রসারী সৌন্দর্য। “সাঁওতাল পল্লী” (২৫নং) “একগলার
 বুট্টা শেবে” (২৬নং) এই দুটো ছবিই বর্ষাকালের মনোহরণ করতে পেরেছিল।
 “একসময় বসতি ছিল” (৩০নং) ছবিতে বসতির কোন চিহ্ন নাই কেবল
 খালে ভরা, হরত বা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখানকার লোকজন
 গৃহহারা। তাদের কোনো ঠিকানা নাই, তবু বসতির চিহ্ন কিছু কিছু
 দেখিয়েছে শিল্পী স্বকৌশলে। তারি ভাল লাগে আবার ভাবারও বটে।
 “রাধাচূড়ার তলায়” (৩২নং) “ল লাইক” (৩৭নং) অতীব উন্নত মানের
 ছবি। এই দুটো ছবিতেই শিল্পীর অকুণ্ণ হাতের সাক্ষ্য মেলে—
 অতুলনীয়। “দীঘার সমুদ্র” সম্ভবত কোনো ছবি থেকে নকল করার
 চেষ্টা করেছে—এখানে নিজের কল্পনাকে কাজে লাগালে বোধহয় ভালো
 হত। তবুও সামগ্রিক পরিবেশের প্রফুটনের জন্য রং ব্যবহারে শাস্ত্র-
 মূলীয়ানা দেখিয়েছে।

বিজু দাশ

কাব্যতত্ত্ব: আরিস্টটল, ভূমিকা-অম্বাবা-টিকা—শিশিরকুমার দাশ। আশা প্রকাশনী।
মোক্তন ১৪.০০। দ্বিতীয় ১০.০০।

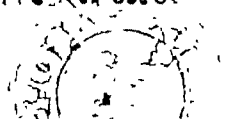
১৮৭১-এ মধুসূদন দত্ত “গ্রীক থেকে ইলিয়াদের কিছু অংশ অম্বাবা-
করেছিলেন বাংলায়”; বাংলাদেশে বোধকরি তিনিই প্রথম আনান
আরিস্টটল “উৎপাদনের অলঙ্কারশাস্ত্র”। তার একশ বছরেরও বেশি
পরে আরিস্টটল-এর কাব্যতত্ত্ব মূল গ্রীক থেকে, ইংরেজি অম্বাবা-
টিকা-টিকনীর সাহায্যে, বাংলায় প্রথম অনূদিত হল—সুখ অনূদিত হলেন
না, কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক পদার্থের আলোকে আরিস্টটল
আলোচিতও হলেন বাংলাভাষায় এই প্রথম। শিশিরকুমার দাশের
এ কাজ আমাদের কাছে, কীতি বলেই প্রতিভাত হয়েছে। বর্তমান
লেখকের মতে। গ্রীক-অম্বাবা সাধারণ পাঠকের কাছে শিশিরকুমার নতুন
দরজা খুলে দিলেন—বুচার, বাইওরাটার বা এসসের হাত ধরে আমরা
যারা ঘুরছিলাম, তারা মাতৃভাষাতেও কাব্যতত্ত্বের একটি নির্ভরযোগ্য
অম্বাবা প্রচেষ্টা পেলাম, যাতে এঁদের এবং আরও অনেক অম্বাবা-
টিকার কলঙ্কিত অলঙ্কার কবে নেওয়া হয়েছে, বহির্ভূত ভূমিকার শিশির-
কুমার স্পষ্ট করেই দিয়েছেন বাইওরাটারের গ্রীকপাঠই তিনি মূলত অবলম্বন
করেছেন। আরিস্টটল অম্বাবা, সকলেই জানেন, দুইই কাজ—এলস-এর
সাড়ে ছশো পৃষ্ঠার ওপর বিশাল গ্রন্থটি বিনীত পড়েছেন তিনিই জানেন
এ বিষয়ে তর্ক, বাদ-প্রতিবাদ অনেক, প্রতিটি শব্দ, শব্দাংশ, বাক্য,
বাক্যাংশ পড়ার অম্বাবাবনের বিষয়। শিশিরকুমারের অম্বাবাদের স্বচ্ছতা
ঐক্যীয়—কিন্তু স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতার অম্বাবা কবিতা হলেও মূল্যে তিনি
বোধহয় একটু মুচড়ে নিয়ে লিখেছেন। যেমন “অম্বাবাবনের বিষয়” শিরক
অংশের প্রথম বাক্যটি তাঁর অম্বাবাবে ঠাঁড়িয়েছে, “অম্বাবাবনের বিষয় হল
সাহস ও তার ক্রিয়াকলাপ।” শিশিরকুমার নিজের বলেছেন মূল গ্রীকের
ইংরেজি অম্বাবা বুচার করেছেন “মেন ইন অ্যাকশন”, কাইন্ত গিভি

পার্সনস" বাইওরাটার "অ্যাকশনস"। এলস-এর বইটিতে দেখছি And Since the imitators imitate men in actor...। মেন ইন অ্যাকশনের অল্পবাদ কিছু শিশিরকুমারের মাহুস ও তার ক্রিয়াকলাপ-এ আসে না : মূলের অর্থই পাটে যায়। "কর্মরত মাহুস" এই অংশ পৃষ্ঠা তাঁর অল্পবাদে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। সমগ্র অংশটিই একটি বাক্য না শিশিরকুমার পূর্ণচ্ছেদ, সেমিকোলন দিয়ে যেমন অনেকগুলি বাক্য করেছেন, সেও কয় ? এ প্রসঙ্গে আর একটি আপত্তি জানিয়ে রাখি : শিশিরকুমারের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী পাঁচটি ভাগে বিভক্ত—প্রথম দুটি—কাব্যতত্ত্ব : গ্রীকপাঠ ও কাব্যতত্ত্ব : ইংরেজি অল্পবাদ। এই বিভাগের অর্থ একটু স্পষ্ট হলে ভাল হত—বুচার ও বাইওরাটার দুটিতেই আছেন। অথচ এলস দ্বিতীয়টিতে শুধু কেন ? তাঁর ১২৬০-তে হর্ড্জ থেকে প্রকাশিত আরিস্টটল'স পোয়েটিকস : দি আর্গুমেন্ট-এ শুধু যে গ্রীকমূল বেওয়া আছে, তাই নয় শব্দ ধরে ধরে অল্পবাদ সংক্রান্ত বিশ্লেষণও আছে। অবশ্য শিশিরকুমার এলসের যে বইটির উল্লেখ করেছেন সেটির নাম দিয়েছেন শুধু আরিস্টটল'স পোয়েটিকস (যার প্রথম প্রকাশ ১২৬৭, পেপার ব্যাক ১২৭০)। এটি তির্য বই। এলস-এর ১২৬০-র বইটির উল্লেখ তো গ্রন্থপঞ্জী প্রথম অংশে অবশ্য করা উচিত ছিল। মজার বিষয়, এই বইটিরই উল্লেখ তিনি করেছেন কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি তালিকায়। অথচ বুচার-বাইওরাটার গ্রীকপাঠ, ইংরেজি অল্পবাদের সঙ্গে এই অংশেও ভাব্যভাবেই আছেন।

শিশিরকুমার দ্বারা তাঁর প্রায় চল্লিশ পৃষ্ঠার ভূমিকায় আরিস্টটল সম্পর্কে এমন অনেক কথাই বলেছেন, যা বাংলায় নতুন। আরিস্টটলের জীবনচিহ্ন-হাল তিনি সংক্ষেপে জানিয়েছেন এবং আরিস্টটলকে স্থাপন করেছেন—একদিকে প্লেটোর প্রতিপক্ষে অন্যদিকে চরমকার বলেছেন, ইয়োজেনিক্স বিভূত অগ্নি আরিস্টটলের সামনে ছিল। 'এঁদের নাটক থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত রচনা করেছেন।' (আর্গট কিশোর ঠিক এই কথা বলেছিলেন : Aristotle did not greed the works of Homer, Heriod, Aeschylus aid Sophocles : he derived his aesthetics theories from them.) 'কাব্যতত্ত্ব'র পটভূমি হিসেবে শিশিরকুমার এই দুটি দিককেই দেখিয়েছেন। আরিস্টটলের কাব্যজিজ্ঞাসাও প্রায় ধর্মনিরপেক্ষ বহুদ তাঁর ভূমিকায় স্পষ্ট করার প্রচেষ্টা, নিঃসন্দেহে বাংলাভাষায় অভিনবধর্মী—আর বিখ্যাত তিন এক্ষয় সম্বন্ধে বেশক কথা আরিস্টটলের

নামে চালু, বাংলাভাষায় শিশিরকুমার এই প্রথম নির্দিষ্ট আলোচনার আনালেন, এর কোনটাই আরিস্টটলের সিদ্ধান্ত নয়, পরবর্তী টীকাকার, ভাষ্যকারদের। শিশিরকুমারের অমুবাদ পড়লেই বোঝা যায়, তিনি এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাবলী অমুবাধন করেছেন—গ্রীক থেকে অমুবাদের আবলম্বনের সঙ্গে আরিস্টটল গবেষণায় ধারাটিও তাঁর অমুবাদকর্মে সংযোজিত। তবে তাঁর ভূমিকার আরিস্টটলকে, তাঁর কাব্যতত্ত্বকে সমকালীন সমাজ-ইতিহাস পটে স্থাপন করলে তাঁর ভূমিকা পূর্ণাঙ্গ হত। আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব কেবল প্লেটোর প্রতিক্রিয়া বা গ্রীক ট্রাজেডি পার্টের কল নয়। প্লেটো, গ্রীক ট্রাজেডির মূল দেশ-কালে নিহিত, আর সেই কারণেই দেশকাল ছড়িয়ে তার প্রসার। (“মিশরের পুরাকাহিনীর অর্ধের কখনও গ্রীকশিল্পের জন্ম হতে পারে না। গ্রীক শিল্পকৃতির পূর্ব সূত্র হল গ্রীক পুরাণের কাহিনী : প্রকৃতি ও সমাজ সেখানে মানুষের কল্পনার তার অজ্ঞাতেই শিল্পরূপায় স্থগতিত।”) খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের গ্রীস নিশ্চয়ই খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীস নয়। তবু এই কল্পনার শিল্পরূপায় ছাপ আরিস্টটলের ট্রাজেডির স্ট্রাকচার বা গঠনশৈলীর আলোচনার আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁর ক্যাথারসিস সম্পর্কিত ধারণাটির। ক্যাথারসিসের অমুধাবনে এ তথ্য খুবই জরুরি যে গ্রীক ধর্ম, আইনবিধি ও কবিতায় “the Concept of pollution for the killing of blood kin” জ্ঞানেকথানি ভূমিকা পালন করেছিল। এর মূল রবেছে “in the primitive solidarity of the family, the preoccupation, not to say of session, of archaic Greece with means of purification, especially for the Spilling of kindered blood.” যুগের পুনরুজ্জীবনের নবতর ধারণার সঙ্গে এসবই যুক্ত ছিল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেও হত্যার বিচারের ভাব নিহতব্যক্তির আত্মীয়দের হাতে ছিল। আরিস্টটলের “purification of tragic arts” এর, ক্যাথারসিসের পটভূমিকার অনেকটাই এখানে লভ্য। এ প্রসঙ্গে Elise-এর বইটি দ্রষ্টব্য। এছাড়া জর্জ টমসনের টেকাইলাস অ্যান্ড এথেন্স ও ই. আর. ডডস-এর দি গ্রীকস অ্যান্ড দি ইয়র্যাশনাল অবজ পাঠ্য গ্রন্থ। শেষ বইটি সম্পর্কে অমল ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছিলেন—an invaluable book for the study of Greek tragedy। চূষণের বিষয় বইটির উল্লেখ শিশিরকুমারের গ্রন্থপঞ্জীতে নেই। এভাবে ইতিহাস-সমাজের পটভূত করলেই আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব

অল্ফার্মনের পূর্ণস্থাপন ঘটে। তখনই জর্জ টমসনের মতামতটি মনোযোগ পেতে পারে। আরিস্টটলের অসাধারণ মনীষা, তাঁর রচনাবলীর মহৎ মূল্যের কথা বলেও, আরিস্টটলের গ্রীক ঐতিহ্যের সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন : বিষয়ের প্রতি মনোযোগ মনোভঙ্গির দরুনই, বিষয় ও কর্মের প্রতি নিজস্ব ধারণার অন্তর্গত আরিস্টটল শিল্পকে কেবল তার আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার বিকাশের ক্ষেত্রেই দেখেছেন, বৃহত্তর সমাজের ইতিহাস এ প্রসঙ্গে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে নি। অথচ গ্রীক ঐতিহ্যের আলোচনায় আমরা জানি একে একদম উপেক্ষা করা যায় না ; আরিস্টটলের সময় এ জানা বোধহয় আরও প্রত্যক্ষ ছিল। কারণ আধুনিক সভ্যতার সেই আদিপর্বে সমাজ-নাটক নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত ছিল। অথচ আরিস্টটল, ঐতিহ্যকে ভেঙে তার চূড়ান্তরূপে পৌঁছল, ঐতিহ্যের গঠন আলোচনায় সত্যে সেটিই দেখান, কিন্তু কখনই বলেন না কেন এই বিশেষ রূপবন্ধন এল, কেনই বা আর তার কোনো বিকাশ ঘটল না। আরিস্টটল-এর এই বৃহত্তর গঠন সম্পর্কে উদাসীনতার পিছনে কোনো সমকালীন সংকট কোনো ভূমিকা পালন করেছিল কি? যে দাস ব্যবস্থার ওপর গ্রীক সভ্যতা দাঁড়িয়েছিল, সেই ভিত্তিকূমিই কি আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয়ক সংকটে আক্রান্ত হয়েছিল—যারই অন্ততম বহিঃপ্রকাশ আরিস্টটলের ছাত্র আলেকজান্ডারের দ্বিবিজয়ে বের হওয়া? বাইরের বিশৃঙ্খলা কি আরিস্টটলকে করে তুলেছিল গঠনশৈলী-মুখী ঐতিহ্যের আভ্যন্তরীণ ছন্দ, সুবাস, সৌষ্ঠবের প্রতি মনোবোদ্ধি? শিশিরকুমার দাসের ভূমিকার এসব প্রশ্ন আলোচিত থাকলেও, যে সব প্রশ্ন আছে বাঙালি পাঠকের কাছে তাও গুরুত্বপূর্ণ। আর এ অভিযোগ এখানে অবাস্তব কেন তিনি নব্য আরিস্টটলীয় ভাবনা-চিন্তা নিয়ে আলোচনা করেন নি। যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে, তাঁর এই অল্ফার্মকর্ম আরিস্টটল সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসাকে যেমন করতে পারে গভীর ও মূল্যবান, তেমনি শিল্প-সাহিত্য, বিশেষতঃ নাটক-বিষেটায় সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসাকে আবলম্বী—নাটকের ক্ষেত্রে যেমন অভিযোজন পর্ব শেষ হতে পারে, তেমনি তন্ময় ক্ষেত্রে আহরণমুখীনতা দূর হয় দেশকাল-সম্মত আবলম্বন দেখা দিতে পারে। (এখানে, একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও মনে পড়ছে এরিক কেটলের একটি উক্তি : the modern Aristotle would not be a metaphysician by a historian.) জর্জ টমসন আরিস্টটলের যে সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন, স্থান-কাল বিশেষে তাই কিছু হয়ে উঠতে



পারে এগোবার পথ—শিল্প সাহিত্যকে আত্যন্তরীণভাবে, নিজ ইতিহাসের পটে দেখা মার্ক্সবাদীদের শিল্প-সাহিত্য জিজ্ঞাসাকে পুটেই করবে।

আরিস্টটল শিল্পসাহিত্যকে অহুকরণাত্মক বলেছেন—কিন্তু অহুকরণের বিষয় কর্মরত মানুষ—‘ট্রাজেডি হল একটি ক্রিয়ার অহুকরণ, ক্রিয়াটি গভীর, সম্পূর্ণ।’ এই কর্মরত মানুষ ও ক্রিয়ার অহুকরণ সম্ভাবলী তাৎপর্যপূর্ণ। শব্দগুলি দেখায়, প্রত্যক্ষভাবে বৃহত্তর সময়ে সংলগ্ন না করলেও আরিস্টটল তাঁর শিল্পতত্ত্বের ভিত্তি নির্মাণ করেন মূর্ত মানুষ থেকেই—কর্মিষ্ঠ মানুষ ও তার ক্রিয়া থেকে। সেই কারণেই বহু যুগান্তরের বড়রাপটা উপেক্ষা করে তার কাব্যতত্ত্ব আজও অগ্রান, কর্মিষ্ঠ মানুষের অভিযানের মতই। মার্কসীয় প্র্যাকসিস-এর ধারণার আলোকে আরিস্টটল-এর কর্মিষ্ঠ মানুষ ভিত্তিক কাব্যচিন্তাকে আমরা এ যুগের মত করে ব্যাখ্যা করতে পারি। আরি লেক্সেত্তর-এর লেখায় পাই, রিপটিটিভ, রাইসেটিক ও ক্রিয়েটিভ প্র্যাকসিসের কথা। আরিস্টটল অহুকরণের মধ্যে নানা পার্থক্য করেন—তবে তাঁর মূল লক্ষ্য মানুষের ক্রিয়া। একই ভঙ্গি, কাজের মাছিমায়া অহুকরণে বা কোন আদরাকে অহুকরণ করার শিল্প আগে না—শিল্প আসে স্ট্রীমলক অহুকরণে, মার্কসীয়ভাবেই বিদ্যবী প্র্যাকসিসে। আরিস্টটলের লেখায় যে বিপ্রতীপতা ও উদ্ঘাটনের ধারণা থাকে তাতে বিদ্যবী প্র্যাকসিসের গুণগত পরিবর্তন ও আন্বিকচেতনাই প্রচ্ছন্ন পাওয়া যায়—আরিস্টটলের সচেতন তত্ত্ব বা মেটাকিনিকস বাই হোক না কেন। তাঁর ট্রাজেডির ধারণায় যে সৌম্য নিবিড় গাঢ়বৈষ্ণব স্ট্রীকচারের কথা পাওয়া যায়, ক্রমবিকশিত অনিবার্যতার কথা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে বিপ্রতীপতা ও উদ্ঘাটন মেনালেই আরিস্টটলীয় তত্ত্বের সামগ্রিক তাৎপর্য বোঝা যায়। যেমন বলা হয় প্র্যাকসিসের আলোচনার প্রাথমিক ভিত্তি ‘needs of man as a living being’ তেমনি আরিস্টটলীয় ক্যাথারসিসের ধারণায় সে চিকিৎসাবিভাগত পটভূমির কথা বলা হয়, সেখানেও এই প্রয়োজনের প্রতি ইঙ্গিত থাকে : পরিভ্রমিত ব্যাপারটা শুধু দর্শকের দিক থেকেই দেখলে চলবে না, ট্রাজেডির সামগ্রিক গঠনশৈলীর দিক থেকেও দেখতে হবে।

তবে আরিস্টটলের ক্রিয়ার অহুকরণে মার্কসীয় প্র্যাকসিসের কর্মিষ্ঠতার সচেতন বিকাশ নেই—নেই বলেই আরিস্টটল গঠনশৈলীর বিচারে একটি ট্রাজেডির প্রতিই মনোযোগী হন, ইলকাইলাসের নাটকের তাৎপর্য এড়িয়ে যান, তাঁর টেট্রালজির উল্লেখ না করেই। ব্রেকটের আরিস্টটল

বিরোধিতার মূল এখানেই হয়তো নিহিত : নচেৎ হুজনের প্রায়তনুজ মূর্তি মাহুবই। কিন্তু আরিস্টটল মাহুবকে বাঁধতে চান অনিবার্ণতার হাছ গঠন শৈলীতে ব্রেথট সেখানে প্র্যাকসিসের সচেতন উদ্বেগ মুখীনতায় খুলে বেন মহাকাব্যের ধারাবাহিকতাকে, কাহিনী-উপকাহিনীর লাক ও আপাত বিচ্ছিন্নতার সিমফনীকে। সাধারণভাবে আরিস্টটল ও ব্রেথটের মধ্যে যে বৈত দেখান হয়, যেমন চল্লিশ বছরেরও বেশি আগে সের্গে ট্রেটিয়াকভের মতো লেখকেরা দেখান (আরিস্টটলে; কিলিং; ব্রেথটে : ইনটেলেক্ট) সেগুলি নিতান্তই ব্যাব্রিক বিভাজন। আরিস্টটলের মতে কাব্যের আনন্দ শুধু আবেগভিত্তিক নয়, জ্ঞান-ভিত্তিকও বটে। আর ব্রেথটের থিয়েটারে শুধু ইনটেলেক্ট, আবেগ নেই, এমন কথা ঘটনা করে লাভ কি? মানবিক আবেগই তাঁর নাটকের, তাঁর বিশ্ববীকার প্রথম কথা। আরিস্টটলের অনিবার্ণ গঠনশৈলী লাক ছাড়া নয়, ক্যাথারসিসের স্তম্ভগত পরিবর্তনেই সেটি রয়েছে। আর ব্রেথটের যে লাক বা অ্যালিয়ে-নেশন তাতে প্রতি দৃষ্টির স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিশ্চয়ই লভ্য, কিন্তু বৃহত্তর নাটকের অঙ্গীভূত না হলে তা অপ্রয়োজনীয় উপকাহিনীতে পরিণত হয়। তবে ইনভলভমেন্ট বা বিভাজিত হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য মূলগত—আরিস্টটল নাটকের মধ্যেই, চরিত্রের সঙ্গে ইনভলভমেন্টকে দেখেন, কারণ বৃহত্তর সমাজগত তাঁর দৃষ্টির বাইরে; আর ব্রেথট বৃহত্তর চেতনা ও সমাজ-ইতিহাসের সংগ্রামে বিভাজিত হওয়ার পথ হিসাবে থিয়েটারকে দেখেন। বৃহত্তর সমাজে বেহেতু আরিস্টটলের ছন্দ, স্ববমা, পাটবন্ধ গঠনশৈলী থাকে না, সেহেতু ব্রেথটের থিয়েটারও হয়ে ওঠে এপিক, মহাকাব্যিক : বাহী-সম্বাহী-বিবাহী নানা হয়ে বিরাট সজীত, বার গতি সম্মুখে, বিদ্রবী প্র্যাকসিসের চেতনায়। নচেৎ আরিস্টটলের মত ব্রেথটও ‘মঞ্চ প্রযোজনা’র ভিত্তিতেই নাটকে দেখেন, আরিস্টটলের মতই থিয়েটারকে তিনি জীবনের ঘটনা ভাবেন। ব্রেথট আরিস্টটলকে হুই মেক্সর বিরোধী বলেই আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি—মাসলে ইয়োরোপীয় (আবার অনেকখানি ইয়োরোপের বাইরেরও, বিরাট শিল্প ঐতিহ্যের আত্মীয়রূপেই ব্রেথট পৌছতে পেরেছিলেন তাঁর যুগান্তকারী নাট্য অভিবানে, এই আত্মীয়রূপে আরিস্টটল কিন্তু বাদ পড়েন নি। আর দি লিভিং। দি ইনিমিটেবল-এর প্রতি একনিষ্ঠতার ব্রেথট যে তাঁর তত্ত্বকেও পিছনে ফেলে যেতেন, তা তাঁর জীবনের শেষ কয়েক মাসের যে আলাপচারী,

তাতেই বোঝা যায়, আমাদের দেশের মহাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছিল। শিশিরকুমার দাশের কাব্যতত্ত্ব অমূল্য আলোচনার তাৎপর্যই এখানে যে বর্তমান লেখকের মতো সাধারণ পাঠককেও উত্তোষিত করে নানা ভাবনায়। বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে এই উত্তোষন হয় পতীর ও দূর প্রসারী। আশা করি শিশিরকুমারের কাব্যতত্ত্ব অমূল্য আমাদের শিল্পচিন্তাকে আবলম্বী হতে সাহায্য করবে। মার্কসীয় শিল্পচিন্তাকেও বাংলাদেশে নতুন মাত্রা দেবে।

পার্শ্বপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাস কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত

বছরের শেষে, ১৯৭৭-এর ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর, কুবেনেখরে, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশন, একাধিক কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্মের সম্মিলনের দেশ ভারতবর্ষে ইতিহাস-পাঠ, ইতিহাস-চর্চা ও ইতিহাস রচনা, রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের জীবনে একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। গত একদশক ধরে প্রবীণ ও নবীন প্রগতিবাদী ইতিহাসবিদেরা, বস্তুবাদী, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাসের উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শুধু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাই নয়, দেশের অপরিচিত কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, তথ্যনির্ভর সহজবোধ্য ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজেও তাঁরা হাত দিয়েছিলেন। আজকের মধ্যে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে রামশরণ শর্মা, রমোলা ধাপর, হরবন্স সুখীয়া, বিশান চন্দ্র, বরুণ দে, অমলেশ ত্রিপাঠী, অজুন দেব প্রভৃতি। ভারতের শিক্ষা মন্ত্রকের দ্বারা স্থাপিত শিক্ষা, গবেষণা ও শিক্ষণের জাতীয় পরিষদ বিনা মুনাকার, স্বয়ং দানে এঁদের লেখা প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক ভারতের এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ছাপা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছিলেন কয়েক বছর আগে।

১৯৭৮ এর মধ্যভাগে, দক্ষিণপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদী ও হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতিনিধিরা এই বইগুলি ও তার লেখকদের উপর এক প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। চুক্তাগ্যের কথা, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তার কাছে বহুলাংশে নতিস্বীকার করেন। দিল্লীতে ইতিহাসের

প্রগতিশীল অধ্যাপকদের বিতাড়নের দাবিও ওঠে। রাষ্ট্রীয় অয়ংসেবক সঙ্ঘের
 যেক্ষাসেবকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধানি তোলে “আর. এস. শর্মাকো হঠাও, হিন্দু
 ধর্মকো বাঁচাও।” শর্মাজীর অপরাধ তিনি ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ
 থেকে ভারতের প্রাগৈতহীন ইতিহাসকে বিচার করেছেন। আমাদের হুমহান
 গৌরবময় ঐতিহ্যকেও যেমন তিনি তুলে ধরেছেন, তেমনই সমাজের দুর্বল
 দিক ও অপ্রায়ত্তলিকেও তিনি নির্মমভাবে সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করেছেন।
 শ্রীমতী রমীলা ধাপরের অপরাধ তিনি মধ্যযুগের ইতিহাস-রচনার সময়,
 অকট্য তথ্যের সন্নিবেশ করে দেখিয়েছেন যে অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর মধ্যে
 মুসলমান ও হিন্দু উভয়েই ছিলেন, আবার শোষিত জনসাধারণের মধ্যেও
 ছিলেন হিন্দু-মুসলমান সকলেই। ঔরঙ্গজীব যেমন হিন্দু-মন্দির ভেঙেছেন
 তেমনই জমি ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন একাধিক হিন্দু-মন্দির ও
 জৈন ধর্মস্থানকে গড়ে উঠতে। আকবরের রাজত্বকালে বেখানে মোগল
 সাম্রাজ্যের প্রশাসন বঙ্গে উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা ছিল শতকরা ২২
 জন, সেখানে ঔরঙ্গজীবের আমলে তা বেড়ে হয়েছিল শতকরা ৩১ জন।
 হুতরাং এই সমগ্র যুগের ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নের জরুরি প্রয়োজন।
 তাই মুসলমান রাজ্যেই বাহের কাছে শক্ত, সেই উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির
 ও তাহের মতবাহের ধর্মপ্রাণীরা শ্রীমতী ধাপর ও তাঁর বইএর মুগ্ধগাত
 করতে চাইবে, এ আর আশ্চর্য কি?

তবে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদীদের এই আক্রমণ ও
 রাষ্ট্রনেতৃত্ব কর্তৃক তাকে প্রেরণ দান, ভারতের ইতিহাসবিদরা মাথা পেতে
 মেনে নেবেন না, এটাও একান্ত স্বাভাবিক। এবং তাই ঘটেছে তুবনেশ্বরে,
 ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৩৮তম অধিবেশন। ২৮ ডিসেম্বর, কংগ্রেসের
 একান্ত অধিবেশনে, বিদ্যারী কার্যকরী সমিতির তরফে অধ্যাপক ইরফান
 হাবীব যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং বোম্বাই-এর অধ্যাপিকা সৈয়দ,
 কলকাতার পৌতম চট্টোপাধ্যায় ও অমলেন্দু গুহ সহ বহু প্রতিনিধি যে প্রস্তাবকে
 দৃঢ় সমর্থন জানান, তা সমবেত প্রতিনিধিমণ্ডলী সর্বসম্মতভাবে, ধর্মনিরপেক্ষ
 মধ্যে গ্রহণ করেন। সেই প্রস্তাবে ইতিহাস-পাঠ, চর্চা ও রচনাতে
 সাম্প্রদায়িক ও তেদশহী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহারকে বিচার জানানো হয়েছে এবং
 ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস-চর্চার সপক্ষে ভারতীয়
 ইতিহাস কংগ্রেসের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবটির পূর্ণবহান-
 নিরূপণ :

“সুবোধে, তার ৬৮তম অধিবেশনে সমবেত ভারতের ইতিহাস কংগ্রেস পুনরায় ঘোষণা করছে, ইতিহাস-চর্চার প্রক্ষেপে বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে রক্ষা করতে ভারতের ইতিহাসবিদরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই কংগ্রেস মনে করে যে সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণভেদ ও জাতিবৈরী প্রচারে, ইতিহাসকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা এক অমার্জনীয় অপরাধ। এই কংগ্রেসের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ইতিহাসবিদদের কাজ হচ্ছে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক—মানবতার সর্বপ্রকার উত্তরের সঙ্গে যুক্ত তথ্যসমূহকে উন্মোচিত ও সুসম্বিত করা এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ সমালোচকের সজাগ দৃষ্টি রাখা।

ইতিহাসের করেকটি নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের উপর সাম্প্রতিক আক্রমণের সময়, এই সমস্ত মূলনীতি সম্বন্ধেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে এই বইগুলি আর পাঠ্যপুস্তক না থাকে, এবং এই আশঙ্কাও অমূলক নয় যে ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী চংএ পুনর্লিখনের চেষ্টায় সরকারি সমর্থন মিলবে। কংগ্রেসের এটাও চোখে পড়েছে যে, যে সমস্ত খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের অতীত ইতিহাসের চর্চা করেছেন, তাঁদের উপর আক্রমণের অল্প হিসাবে নানান ধরনের ব্যক্তিগত বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, যেমনটি করা হয়েছিল এর আগের সরকারের আমলে।

আমাদের অনগণের মহান অতীতের বিকৃত ও কৃতিকারক ব্যাখ্যা করার জন্য ভেদগমী শক্তির যে অপচেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে ভারতের ইতিহাস-বিদদের হাশিয়ায় থাকতে হবে। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস, ভারত সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে যে তাঁরা যেন স্বাধীন ঘোষণা করেন যে এই সব শক্তিকে তাঁরা কোনোরকম সরকারি সমর্থন জানাবেন না।”

মন্তব্য নিম্নয়োজন। শুধু একটি কথা ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে প্রগতিশীল ইতিহাসবিদদের এই বিপুল জয়লাভের প্রধান কারণটি সন্নিবেশ প্রদানযোগ্য। চণ্ডীগড় থেকে কালিকট, ইন্দুর থেকে বোম্বাই, ও কলকাতা থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও গবেষণাকেন্দ্রের ইতিহাসবিদরা—বিভিন্ন মতের মার্কসবাদী থেকে আরম্ভ করে, গণতন্ত্রবাদী ও উদারগামী অবধি—সকলেই এই প্রস্তাবের শিহনে একত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁদের বহুবিধ মতপার্থক্য সত্ত্বেও। সম্মেলনের আগামী বছরের কর্মকর্তা ও কার্যকরী সভা নির্বাচনেও

সেই প্রগতিশীল ঐক্য অটুট ছিল। সমাজবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে কিছু চিন্তা একরকম নয়, প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে ছোট করে দেখায় কোনো কারণ নেই। তবে, মতপার্থক্য সত্ত্বেও, হ্রাসতম কর্মশূচীর ভিত্তিতে প্রগতিশীল ঐক্য রচনার কালে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও ঘৈরাচারকে বেঠেকানো সম্ভব। এবারের ইতিহাস কংগ্রেস তারই একটি ক্ষুদ্র নিদর্শন।

সিদ্ধার্থ উপাধ্যায়

ঐক্যের মহৎ প্রয়াস

দক্ষিণ ভারতের সাইক্লোন দুর্গতদের সাহায্যের জন্য অর্ধসংগ্রহের প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের উদ্যোগের সচেতন সাহস বড় ভরসা ঘোষণা। কলকাতার নাট্যদলগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রবীন্দ্র সদন ও শিশির মঞ্চে (কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে) ১২ থেকে ২৬ আত্মঘাতী পক্ষকালব্যাপী নাট্যাছুটানটিতে কোনো আমন্ত্রণপত্র বিলি হয় নি, প্রতিটি আসনের জন্যই টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। সংগৃহীত অর্থ সবটাই উদ্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হবে। এই নাট্যাছুটানে অংশ নিরেছেন ৪৩টি নাট্যসংগঠন, সব মিলিয়ে অভিনীত হচ্ছে ৪৩টি নাটকের ভেতর বহুসংখ্যক নান্দীকার রূপকার ধিয়েটার ও আর্কশপ শৌভনিক সি-এল-টির মতো পুন্ডান হলার চার অধ্যায়—ফুটবল-ব্যাপিকা বিদায় বেমন আছে, তেমনই অপেক্ষাকৃত নবীন দলের একাধ নাটকও আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরকে অভিনন্দন— অর্ধসংগ্রহের জন্য তাঁরা ব্যবসায়ী মঞ্চের সাহায্য নিলে হয়তো আর একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতেন, সিনেমা তারকার সমাবেশও তো হতে পারত অর্ধসংগ্রহের আরো এক পদ্ধতি, এই একই উদ্দেশ্যে বোঝাইতে সেই ধরনের সমাবেশে উদ্দেশ্যই কি করে পরাস্ত হয় তা আমরা দেখেছিও। কিন্তু দুর্গতের প্রত্যক্ষ সাহায্যের নৈতিক দায় ও অবিকার থাকে তাঁদেরই দ্বারা নিজেদের জীবন জীবিকা শিল্পচর্চা দিয়ে কোনো মানসিক দুর্গতিকে লালন পালন করে বান

না, বরং সেখানেও তাঁরা লঙ্ঘন সেই মানসিক ভূগর্ভস্থই বিকছে। তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের এই প্রয়াস সেই নৈতিক শক্তিকেই সংগঠিত করেছে। ফলে সরকারের এই উদ্যোগ হয়ে ওঠে স্বেচ্ছা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পক্ষে আমাদের সামাজিক সম্মতিই একটি প্রকাশ। আমাদের সরকার টরকারের চলাকেরা যে-পথে সে পথে সাধারণত এই নৈতিক জনসম্মতি জোটে না। সরকারি উদ্যোগের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্যই এই প্রচেষ্টা এত বেশি প্রস্তুত।

ভূগর্ভস্থের অন্তর্ভুক্তিও যে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই অংশ, তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তার প্রমাণ আরো মেলে এই নাট্যাঙ্গঠান উপলক্ষে সংগঠিত প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীতে নাট্যাঙ্গঠানে অংশগ্রহণকারী ৪৩টি নাট্যদলের ইতিহাস, প্রযোজিত নাটকের তালিকা, নাট্যকার ও পরিচালকদের তালিকা, ভবিষ্যতের কর্মসূচি প্রদর্শিত হয়েছে—গোষ্ঠার, নাটকের ফোটে, আঁকা ছবি ও বিভিন্ন নাটকের মঞ্চের মডেল দিয়ে। ফলে ব্যবসায়ী মঞ্চ-মঞ্চের পাশাপাশি যে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন গত প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে প্রসারিত হয়েছে তার একটি তথ্য সমৃদ্ধ বিবরণ যে-কোনো দর্শকের কাছে ধরা পড়ে। ধরা পড়ে যে বাংলা নাটকের প্রকৃত চর্চা করে যাচ্ছে এই সব দল, যাদের কারোই প্রায় নিজস্ব কোনো মঞ্চ নেই, অনেকেরই নেই ঘনঘন মঞ্চ ভাড়ার টাকা। কিন্তু নাটকের তালিকার দিকে তাকালেই ধরা পড়ে যায় যে পৃথিবীর যে-কোনো ভাবার সাহিত্য থেকে নাটক নিতে এই সব দল যেমন তৈরি, তেমনি তৈরি মৌলিক বাঙলা নাটক অভিনয় করতে। একসঙ্গে এমন সামান্য বসেই, মনে হয়, এতগুলো দলের এত চেঁচায় সঙ্গে কতই না মাহুত জড়িত আর তাতে সামাজিক সৃষ্টিশীল শক্তির সঙ্গে নিজের সংগতি বোধ করে ফেলি। মঞ্চ বিজ্ঞাপন আর ব্যবসার অধোগে ব্যবসায়ী মঞ্চের রবরবা বতাই চোখ বলসাক, বাঙলা নাটকের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, বাঙলা নাটক বলতে যা বোঝায় সেই সমগ্রতা, নিহিত আছে এই অসংখ্য ছোট দলগুলির মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর ও বিভিন্ন নাট্যদলগুলিকে আমাদের কৃতজ্ঞ অভিনন্দন আবারো—বড় হুঃসময় তাঁরা বড় মহৎ এক ঐক্যের শক্তির সন্ধান ধিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি অহরোধ করতে চাই। এই প্রদর্শনীটি শুধুই মাত্র তথ্য

আশ্চর্য

পূর্ণেন্দু পত্নী

কোমরে লাল ঘুনসি বাঁধা

পোড়া বিড়ির টুকরোর মতো

আমরা চতুর্দিকে ছড়ানো।

কেউ মুখোমুখি তলপেটে

কেউ বুড়ো বটের গোড়ালি আঁড়ালে

কেউ নর্দমার এঁটো শালপাতায় ভিত্তিতে।

নেশাখোরের মতো হাওয়া

একবার ধৌড়ছে ডাইনে, একবার বায়ে।

এক আরগার জুটবো

মন-খোলা ছোঁয়ায় আঁচ্ছা জমবে সারারাত

হৈ হৈ গল্পের মানল বাঁজিয়ে

তালি খুলব ঘে-বার খুপির

পাটে পাটে ভাঁজ করা স্বতি, আমা-পাজমা

কোনোটায় বেনারসীর জরিব নক্সা

কোনোটায় রক্ত-পুঁজের ছিটে,

ভালোবাসা জাপথলিনের গন্ধের মতো

জড়িয়ে থাকবে আমাদের গুঁড়ি-পাঞ্জাবী-কমালে

তার উপায় নেই।

সময়টা ধারাপ।

আকাশের ময়লা মেঘে বাঘছালের ভোরা।

মেঘে একবার বাজে হুমুড়ি

আরেকবার তালি-পাটের কাকরা।

গাছপালাও ছয়ছাড়া।

বেধানে শিরদাঁড়া সোজা করার, সেখানে ঢুলছে।

বেধানে বজের আহুতি মন্ত্র, সেখানে ঢুলছে

যুমে।

বোধিসত্ত্বসে

ধরেছে হস্তবুদ্ধির ঘুন

মুখ চুন করে আকাশের বারান্দায় নক্ষত্রেরা দাঁড়িয়ে।

নাম ভাঁড়িয়ে

ছিচকে জোনাকীরাই মাতানী করে গেলো সারারাত।

শূর্য

নিজের আগুনে নিজে পুড়ছে।

এগবো তারই দিকে চোখ রেখে জলবার হচ্ছে

ঝিল-ঝাঁটা দয়াকর ধাক্কা দিচ্ছে

এইটেই আশ্চর্য।

আমি

স্বপ্নাল বসুচৌধুরী

বুড়ি ও বাতাস নিয়ে খেলা করে অলস নৌকারা

বার শেষ বার নারী

শ্মশানবন্ধুরা এসে শিশুটিও তুলে নিয়ে বার

আমি এতদিনে

লোভহীন চেয়ে থাকি আয়ত্তে এনেছি

পরিতৃপ্ত কুরুর ভলীয়া আর

নির্বোধ নগ্নতা নিয়ে খেলা করে

অরণ্য আকাশ

আমি

ধুলর ডানার ঝপে

নিঃশব্দচরণে একা

স্বতিস্রষ্ট ফিরে বাওয়া

আয়ত্তে এনেছি এতদিনে

অন্তর্জলি করো

কাননকুমার ভৌমিক

অন্তর্জলি করো হে মহান ভিক্ষু

বাজাপথে থেকে গেছে কিছু ঘানি

সময়ের খানিকটা হেরকেরে

পৃথিবীর কিছু বিবর্তন ঘটে যেতে পারে

উপবীতে প্রাচীন মন্ত্রণা বেঁধে নেবার সময়

মনেও পড়েনি কারা ছিল অতৃপ্ত

কার অস্ত্র কার কাছে হওয়া যায় নতজাহ

অন্তর্জলি করো দুর্বিনীত সময়ের কাছে

ছটি কবিতা

অপন সেনগুপ্ত

শব্দকে পরাস্ত করো

শব্দকে পরাস্ত করাই আমার খেলা, শব্দের ছঃধ থেকে

হাতের মুল্লার তুলে আনি মোরী—জিমে ফেলি, দাঁতে পিবে দেখি
কেমন আলোহ জাগে ; আগরণে কী ভাবে কেটেছে বিস্তারনী ।

শব্দকে পরাস্ত করাই আমার খেলা, শব্দের উৎসে গিয়ে

হৃৎ নেই, ত্রিষকোষের ভেতর নড়ে ওঠে কীটপতঙ্গ নক্ষত্র সমালো

লম্পট দরিদ্র ঘোষক শব্দগুচ্ছ মুখে প্রচারিছে অম্ল পরিচর

টিকুজির ভৌতিক গ্রাফে বাধা পড়ছে মুহূর্তের

মৎস্তকীড়া, বায়ুধানে আতঙ্কিত ভয় ।

শব্দকে পরাস্ত করাই আমার খেলা, শব্দের পোশাক খুলে

নৈঃশব্দের মুক্ত ছাদে পাইচারিরত পুরুষ প্রেমিক—

অ ও চোখের নীচে জমে থাকা চন্দ্রপীড়া, অগতোক্তিতে

তাকে চেনা যায় বড়ো। যে ভাবে শিরিশ কাগজে ঘষে

ওঠে যায় পলেক্তারা—শব্দকে সেভাবে মুক্ত ও

বিহীন অভাবে মেথতে ভালোবাসি ।

ভিখিরী মায়ের মেয়ে

ভিখিরী মায়ের মেয়ে সাতদিন অরে তার পথ্য নেই,
 বরাদ্দ নেই বালি ও সাপ্তানার।
 ঘোড়ে গরম হয় তামাটে অনের ওপর তাঁজ করা ত্যানা
 রাত্তিরে হিমের লাঙল এসে ফালা ক'রে বার,

মায়ের ভাঙা কলাইয়ের থালে
 বাবুদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে—অন্ন ছিল তার কুমারী হবার।
 সন্ধিক্ষণে বৃকের গর্ভ ঢেকে

উঠেছিল তারও ছুই গোলাকার অন,
 খিদে বাড়লে অন্ন খেয়ে উগ্লে রাখে রাতের জাবর
 ধারির ফোকর ছুঁয়ে চোখে তার বিঁধে বার
 সারি সারি ল্যাম্পপোস্ট, ঘুমন্ত শিতের শহর,
 কাঁপবন্ধ কুয়াশার মনিহারী চুড়ির দোকান।

মায়ের কপু হাত বুক থেকে সরিয়ে রাখে—
 ঘুম হয় না ; তার নৌকোর মত চোখে সমস্ত বস্তি কাঁপে,
 টাল যায় কুতুবমিনার।
 অরের বিকার বাড়ে, পুড়ে বার তামাটে শরীর
 হু-মুঠোর ধামচে ধরে জাওলা-ভারী কাঁথা : মা-কে ডাকে

কপিকলের মতো মায়ের লবন-ঠোটে আটকে বার
 শব্দের শব, পায়ের আঘাতে নড়ে ফুটো পেরছালি—
 ক্লান্তি ও বিবামে থিচে ওঠে মা : এখনও ঘুমোলে নি তুই—
 তুই মর পোড়োমুখি।

অল্প

অল্প গল্পোপাখ্যায়

একটি ঘোড়া বনের ঘোরে হারিয়ে গেছে আর কেহনি—
 একটি চাবী ধানের ক্ষেতে ঘুমিয়ে আছে আর আগনি,
 একটি তাল কড়ার কাঁকে ধরকে আছে কেউ খোলেনা।

কাকজ্যোৎস্নায় কবরখানায় মুখ ঘেবেছে একটি বালক,
ছুরার খুলে এক বালিকা ওড়ায় তুমুল ঝরা পালক,
হুঃখ তাদের বালির চরে গাছের পাতা মুখ তোলেন না।

তুলসীতলায় কালনাগিনীর ছোবল ধেতো এক সাপুড়ে,
একটি পাগল নালির জলে চান করত ঠিক ছুপুরে,
এক ভিখারী তেমন ক'রে ট্রেনের বাশি আর শোনে না।

একটি ছবি ইঞ্চেল গায়ে সারা সকাল লটকে আছে
এক চিলতে মেঘের দিকে চাতক পাখি ধমকে আছে,
এক জননী ঠোঁট রেখেছে শিশুর বুকে ঝড় গুঠে না।

নন্দহুলাল আচার্য

এখন আমি বাড়ি ফিরছি

বখন আমার সারা গায়ে হারিয়ে বাবার হুঃখ করে,
বন তুলসী গন্ধ মেখে কি ক'রে তুই মুঠোয় এলি ?

এখন আমি বাড়ি ফিরছি আজল-কাজল-রাজিবেলা
স্মৃতি থেকে জ্যোৎস্না হয়ে কি ক'রে তুই বেগে উঠলি ?

কেয়াপাতার নৌকোখানি কোন অনন্তে ভাসিয়ে ছিলাম—
বুকের ভেতর কেয়ার শব্দ খুনে নদী হে দায়োদর।

হৈসেল ঘরে যা কি আমার হেরিকেনের কম্প আলোর,
ভাত সাজিয়ে বসে আছেন বাচ্চা কখন ঘরে ফিরবে ?
এখন আমি বাড়ি ফিরছি আজল-কাজল-রাজিবেলা,
স্মৃতি থেকে জ্যোৎস্না হয়ে কি ক'রে তুই বেগে উঠলি ?

ছড়া

সাপ না রে বিষ না, হায
 দণ্ডী মারে বা
 ডান-বোগিনী অঙ্ককারে
 দিল না খালে পা

অলিতে গলিতে আগেন
 কাল নাগের ছা
 স্নাতবেয়াতে কোনখানে বাস
 করিমতীর মা ?

ছুঃ কালী মন্ডর বালী
 স্নাতা ধায় লং সুপারী
 আমি বাই কালের ছোবল
 বাছা খাবি কি ?

বাছার হাতে কান্তে
 বাছা চায় বাঁচতে
 ছুঃ মন্ডর বেনের পো
 মন্ডর সুঁকো আস্তে ।

কোথায় যে যাও

কোথায় যে যাও বাবলা কাঁটার বোপ পেরিয়ে
 বাঁ বাঁ ছপুয় প্রেতের মতন পাছ পাছালি
 হলুদ লতার অড়িয়ে থাকা পুকলিয়ার
 কোন গাঁয়ে হে স্তম্ভি না আসন বুন

কেন যে যাও ডান বোগিনী অঙ্ককারে
 জীর্ণ বুড়া ঐ মেয়েটির ঘরের কাছে
 সুখার মাধার কান্না হুয়ে অড়িয়ে আছে
 খরায় মরা হতভাগীর হৃদয়ের বাছা

যেও না হে, ফেরার পথে সঙ্গী হবে
নগর রাস্তার অ্যাসফাল্টে দাঁড়াতে চায়
ঐ মেয়েটি ; আমের ছাতায় লোক অশটে না
ধরার রৌদ্র সূর্য্য দাহে মাছুষ মরে

বাড়িটা পুরনো

দেবপ্রসাদ সিংহ

বাড়িটা পুরনো

অনেক কালের

নোনা ধরা ছাতা-পড়া

ধরুয়া দেয়ালে

এখানে প্রলেপ

ঐখানে ঘোড়াতালি

ফাটা বেরামতি

চারিদিকে টিকটিকি

আরশোলা পোকা

কড়ি বরগায়

সারা দিনরাত

ওঠা-নামা করে।

মালিক বহিষ্ঠ নব্য

তবু তাড়ায় না তাকে ॥

এরকম ঠিক নয়

সত্যসাধন চেল

তুমি কাকে রুদীন কুশাল নাড়ছ যুবক

এই মায়াময় স্টেশানে দাঁড়িয়ে,

তুমি তো ভাসিয়ে গেছো ভেলা তুমুল বর্ষায়,

এক কামকের কাছে আমি যেখেছি সে ভেলা ;

শৈশবের স্বপ্নে দেখা নহী স্বতি ও আকাশ
 খেলবার যুড়ি ও লাটাই প্রেম প্রেম খেলার প্রেমিকা
 সবাই পালিয়ে গেছে লুট করে নিজেই অমিন ;
 এরকম ঠিক নয় কুরোর ভিতরে নেবে প্রতিবিম্ব দেখা
 ঠিক নয়, শব্দর নিকটে ছুরি-চুরি জমা য়েবে

নিশ্চিন্তে সুমনো,

অন্ততঃ এরকম তুল কখনো করেনি কেউ

তবে তুমি কেন সব কলে এলে

অকলস ফুলের গাছ, বরবাড়ি

দু-দশ বিঘের মতো আমের বাগান

যা দিয়ে লাজানো ছিল রাড়ের অদেশ

এই সব কলে এসে ভালো আছে

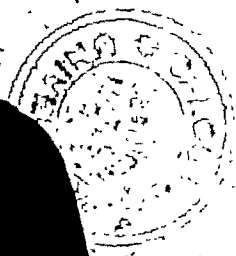
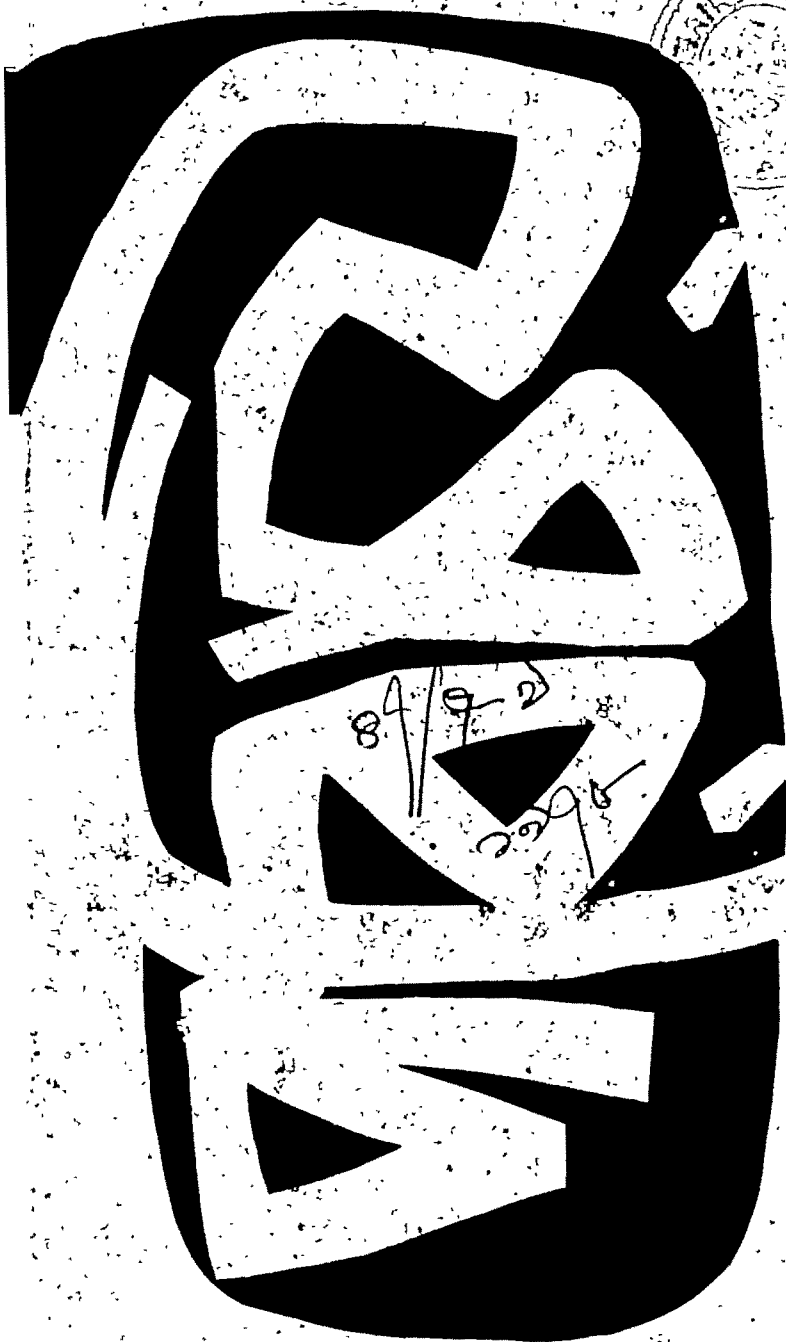
নিশ্চিন্তে সুমনোতে পারো ?

আনি আমি সব কিছু ছেড়ে বেতে হয়

স্বতি-স্বপ্ন জীবনের সমস্ত সম্পদ,

জুগুমাড় টেরাকোটা ভাস্কর্য হয়ে পড়ে থাকে

আমাদের নষ্ট স্বতি মায়ী ও মমতা ।



জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র স্বরণ সংখ্যা

হিরণকুমারি সান্যাল / বিজন ভট্টাচার্য /



বিভিন্ন ভট্টাচার্য-এর আঁকা স্কেচ



ভরী হতে তীর

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

২০ টাকা

ভারত সোভিয়েত মৈত্রীর তিন দশক

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১ টাকা

আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

১০ টাকা

বীপাস্তরের বন্দী

নলিনী দাস

১০ টাকা

মালুঘের পার্শ্বব সম্পদ

লিও ছবার ম্যান

১০ টাকা

ইতিহাসের দ্বারা

সুশোভন সরকার

৭'৫০ টাকা

কমিউনিজমে ঊৎপত্তি

সুশোভন সরকার

৪ টাকা

ধর্ম ও মার্কসবাদ

অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র

২'৫০ টাকা

ভারত সোভিয়েত অর্ধ মৈত্রিক সম্বোধনিতা

তপন দাস

৩ টাকা

ভারতের সংগ্রামে অগতিশীল জার্মানীর সহযোগিতা

ডাঃ পঞ্চানন সাহা

৩ টাকা

রাজমৈত্রিক আন্দের মূলসূত্র

৫ টাকা

নিবেদিতা ও ভারতের মুক্তিসংগ্রাম

জীবন মুখোপাধ্যায়

৩ টাকা

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশ বছর

তুবার চট্টোপাধ্যায়

৭'৫০ টাকা

রুশবিপ্লব ও প্রবালী ভারতীয় বিপ্লবী

চিন্মোহন সেহানবীশ

১৮ টাকা

অক্টোবর বিপ্লব এবং মজুম

ধরনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

নরহরি কবিরাজ

৩ টাকা

মনীষা গ্রন্থালয়

৪১৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

শাখা : মেহিনীপুর, খড়গপুর, শিলিগুড়ি, মালদহ, হুগাঁপুর
বালুরঘাট, ইসলামপুর, বোলপুর

২১শে ফেব্রুয়ারি যে বই আকস্মিক প্রকাশনা ঢাকা শহরকে আলোড়িত
ও সাময়িক শাসকচক্রকে সন্ত্রস্ত করেছিল—বাংলাদেশে নিবিষ্ণ

এ লাম আমরা রাখবো কোথায়

হার্ট প্রেস্ট সহ দামি কাগজে ছাপা। মূল্য ২ টাকা

বাংলা ভাষার অবশ্যই বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ সংকলন

সংস্কৃত সাহিত্য সংগ্রহ

প্রথম খণ্ডে থাকছে: মহাকবি ভাস রচিত বন্যবাসবদন্তা, প্রতিমা নাটক, চারদত্ত, উরু ভদ্র, মধ্যম ব্যাযোগঃ, পঞ্চরাত্রম ও কর্ণভারম নাটকের মূলসহ বঙ্গাঙ্কবাদ; পারিতোষিক শব্দেয় অট্টা; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত হৃদ্য প্রবন্ধ—সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রার্থাব ও ভ: রমা চৌধুরী লিখিত প্রথম খণ্ডের ভূমিকা।

আটখণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক মূল্য ১০ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তিকালে ও প্রতিখণ্ড সংগ্রহকালে ১০ টাকা দিতে হবে। একত্রে জমা দিলে মূল্য ৭৫ টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে

বিবেকানন্দ রচনাসংগ্রহ

ছয় খণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক মূল্য ৭০ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তি ও প্রতি খণ্ড সংগ্রহকালে ১০ টাকা জমা দিতে হবে। একত্রে জমা দিলে ৬০ টাকা। প্রথম সংস্করণের বকেয়া খণ্ডসমূহ সংগ্রহের শেষ দিন ২০শে মে।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত

নিবেদিতা

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক মূল্য ৫০ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তিকালে ৫ টাকা ও প্রতিখণ্ড সংগ্রহকালে ২ টাকা জমা দিতে হবে।

বইপত্র ৮।৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-১

প্রতিনিধি চাই

এজেন্ট চাই (পুরুষ / মহিলা)

প্রার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় কাজ করতে হবে
বেতন ৩০০ টাকা, কমিশন ৩ টি. এ. অতিরিক্ত।

যোগ্যতাবলি :—প্রার্থীকে অন্তত ম্যাট্রিকুলেশন বা উচ্চ
মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ হতে হবে।

বয়স—১৬ থেকে ৪৫ বছর।

কেবল হিন্দি বা ইংরাজী ভাষায় আবেদন পত্র পাঠান।
রেজেষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে
হবে।

GWALIOR TEXTILES

38-B, MAJLIS PARK,

DELHI-110033.

The Concise Oxford Dictionary of Current English

Edited by J. B. SYKES

The sixth edition (1976) of the Concise Oxford Dictionary is the most radical revision yet undertaken of a dictionary that for over sixty years has held its place as the most widely accepted authority on current English. It contains entries for nearly 40,000 head words, with a total of 74,000 vocabulary items altogether, including derivatives, compounds, and abbreviations.

The editor has had access to all the material assembled for the Supplement to the Oxford English Dictionary, now in course of publication, and has taken full account of the many hundreds of words and meanings that have entered the language as a result of scientific and technological change, increased international communication, and innovations in literature and the arts. American forms are given systematically, and the dictionary now includes a wider range of expressions from the rest of the English-speaking world outside the British Isles.

1368 pages

Rs 37.50



Oxford University Press

P 17 Mission Row Extension

Calcutta 700 013

DELHI BOMBAY MADRAS

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা : নরহরি কবিরাজ

২৫ টাকা

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্রোতধারা—কৃষক বিদ্রোহ, সেনা বিদ্রোহ, উনিশ শতকের বাংলার আগরণ, অহিংস কংগ্রেস আন্দোলন, সম্মানবাদী আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন সম্মিলিত হয়ে যে মহাসমুদ্র তৃষ্টি করেছিল—তার তথ্যনিষ্ঠ বিশদ বিবরণ এবং মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ আন্দোলনের তত্ত্বগত ভিত্তির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ—এই বইটিতে পাওয়া যাবে।

মানুষের গল্প : সুনীল আনা ও সৌরি ঘটক সম্পাদিত

১৫ টাকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ীর অধ্যাপক ডঃ সুনীল রায় বলেন,—“এই গল্প সমষ্টি যুগের ইতিহাসের সাক্ষর”
বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে যুদ্ধ, হুঙ্কার, দাঙ্গা, দেশবিভাগে বাংলাদেশে ভাগ্যবিবর্তনের মধ্যে এই দেশের সংগ্রামী সাহিত্যিকদের হাতে যে কল কলেছে তারই একটি দুর্লভ সংকলন। প্রগতিমুখী সমাজ জীবনের প্রয়োজন ও উন্নত সাহিত্যিকতার দাবী—এই দুইকে মিলিয়ে এই সংকলন।

ভারত রূপ কথ্য : বাঙালীর রূপ চর্চা : কেশব চক্রবর্তী ২০ টাকা

ভারত ও রাশিয়া দুই বিশাল প্রাচীন দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক যে পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকেই গড়ে উঠেছে তারই তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস। বইটি নতুন করে চিন্তার খোরাক যোগাবে। অন্তরে রূপক চক্রবর্তী ও অন্তরঙ্গ লিখছেন, “বাঙালী চিন্তের রূপ রামপ্রসাদ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, রূপরাজকোষীদের প্রতি সহায়কভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল।...বইটি পড়লে মনে হয়, ভারত-রূপ মৈত্রীর উজ্জ্বল অধ্যায় উনবিংশ শতাব্দী”।

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিমিটেড

৪/৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কালকাতা-৭৩

ফোন : ৩৩-৮৬৩৭

জনগণের প্রতি ক্রমবর্ধমান সেবা

অসম্পন্ন
প্রদানকারী ক্ষেত্রে গ্রাহক সন্তোষ
স্বীকৃতি



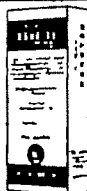
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBI/US 78

প্রত্যেকটি পরিবারে
সম্মোজনীয় এক আদর্শ ঊনিক

কিংডন
হোমোটোন

স্বত্বস্বত্বকারক:
কিং এন্ড কোম্পানী
(হোমিও কেমিস্ট)
প্রাঃ লিমিটেড
১৮৯৯ সাল থেকে আভির
সেবার বহু এক অঙ্গদণ্ডা
হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠান।



গ্রন্থাবলী কার্যালয়:
১০/৬৫, মহাশক্তি শাস্ত্রী রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০৭ ফোন: ৩৪-২০০১

GRACE/KING/1/77

দ্বিতীয় সংস্করণ

তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ
রাবণের সিঁড়ি

বেঙ্গলো

অন্ননি প্রকাশন

১২, মুখার্জিপাড়া লেন, ভাটপাড়া

২৪ পরগণা

কবিতার সমনন নির্মাণে
বিশ্বাস করেন শুভ বসু

তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ

রাত যায় পূবে প্রকাশিত হয়েছে

অনুজ্ঞা প্রকাশনী

২২, বনকিমল রোড, কলকাতা-১

প্রাপ্তিস্থান : মনীষা, সিগনেট ও অস্ত্রাঙ্গ বইয়ের দোকান

পরিচয়

বর্ষ ৪৭

সংখ্যা ৭—২ ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৭৮

ষাণ-চৈত্র ১৩৮৪

হিরণকুমার সান্দ্রাল : স্মৃতিচারণ

অশোকন সরকার ১

হিরণ সান্দ্রাল : যেমনটি মনে হয়েছিল

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ১২

আমাদের হাবল

সিরিজাপতি ভট্টাচার্য ১৬

হিরণ

ভামলকৃষ্ণ ঘোষ ১৯

বটুক ছিল সেই আপনজন

বিজয় ভট্টাচার্য ৩৯

জ্যোতিরিন্দ্র 'বটুকদা' আমার সেজদা আমার আবালা সহচর

রথীন মৈত্র ৪৫

গানের ভিতর দিয়ে বখন

মণীন্দ্র রায় ৫০

মধুবংশী-বিবেকের প্রস্থান

সাধন দাশগুপ্ত ৫৭

বটুকদার স্মৃতি

শ্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অরণে

তপতী মুখোপাধ্যায় ৭২

বাংলা নাটকের শ্রেণীচরিত্র বদলে বিজনের ভূমিকা

বিপিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১

বিজন

অরুণ মিত্র ৮৮

রাইত কত হইল ?

চিত্তরঞ্জন ঘোষ ৯২

আনন্দ স্মৃতি

কিষ্ঠীণ রায় ১০৪

ছইটি মৃত্যু, কিছু শিক্ষা

মৃণাল সেন ১২৫

“তবু মনে রেখো”

প্রণতি দে ১২৯

জ্যোতিরিন্দ্র অরবে

রাজেশ্বর মিত্র ১৫০

নবজীবনের মুখ চুমে

রঘুনাথ গোস্বামী ১৫৩

বিজন ভট্টাচার্য

রবেন দাশগুপ্ত ১৬১

নবজীবনের শিল্পী

দিলীপ বসু ১৬৭

বটুকদাকে যেমন দেখেছি

অলকানন্দা গুহ ১৭২

যে বটুকদা আমাদের খুবই পরিচিত ছিলেন

সরসিজ সেনগুপ্ত ১৭৫

হিরণ্যকুমার সান্মালের শেষ লেখা ১৭৮
 বিজয় ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত রচনা ১৮৬
 জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের অপ্রকাশিত রচনা ১২১
 হিরণ্যকুমার সান্মালের চিঠি ১২৭
 জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের চিঠি ১২২
 “বটুকদা” : স্মৃতি নয় শুধু, অপরাধের শিল্পী
 বোধায়ন চট্টোপাধ্যায় ২৩০

প্রচ্ছদ

সুশোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপদেষ্টকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র
 গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ
 সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

হিরণকুমার সান্যাল : স্মৃতিচারণ

শ্রীশোভন সরকার

আমার সঙ্গে হাবুলের প্রথম বন্ধুত্ব হয় ১৯১৮ কিংবা ১৯১৯ এ। সে আমার চেয়ে বয়সে এগার মাসের বড় ছিল। অন্য তার ১৮৯৯-এর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় অর্ধে। আমার জীবন সঙ্গে তার পরিচয় আরো বেশিদিনের। আমার ছোট ভখন ছিলেন ফুলের ছাত্রী। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই অবধি, একটানা বাট বছর, তার মৃত্যু পর্বত আমাদের গভীর সখ্যতা অটুট ছিল। বিশেষ করে তার জীবনের শেষ বছর চারেক সে যখন গড়িয়ায় এসে বসবাস আরম্ভ করল, তখন আমরা তার প্রায় প্রতিবেশী হয়ে পড়লাম।

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তিন-চারদিন সন্ধ্যাবেলাগুলি তখন সে আমাদের সঙ্গে কাটাত। কত গল্প আলোচনা ছোটখাটো বগড়া তর্কাতর্কি—এই সব স্মৃতিতে আমাদের মিলিত শেষকটি বছর যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তার দয়াদায় এসে বসে বাজানোর একটা বিশেষ রীতি ছিল। বেল-এ হাত রেখে সে একটানা অনেকক্ষণ ধরে বাজাত। এখানে মাঝে মাঝে সব ফুলে গিয়ে চমকে উঠে—মনে হয় আবার বৃষ্টি সেইভাবে বসে বেজে উঠবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন হাবুলের সঙ্গে প্রথম ভাব হয়, তখন আমরা সহপাঠী। কি জানি যে সেই দিনগুলি কেটেছিল—এখনো খুব মনে পড়ে। আমি থাকতাম প্রেসিডেন্সি কলেজের খুবই কাছে। প্রথমে মেসে, পরে হিন্দু-হোস্টেলে। হাবুলের বাড়ি তখন ছিল বাহড়বাগানে। কলেজের বাইরেও আমাদের দেখানো হত। প্রধান প্রধান জায়গা ছিল

কয়েকটি কাছাকাছি অবস্থিত পরিবারের বাস-ভবনে। যেমন মহলানবীশ পরিবারে, হেরব বৈয়ের বাড়ি, বোপীন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ি এবং স্ত্রীর নীলরতন সরকারের গৃহে। এছাড়াও আমরা গল্পগুজব কর্তার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রাঙ্গণে ও সংলগ্ন গলিতে।

তরুণ ব্রাহ্মেরা কতকগুলি ক্লাব-জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। প্রত্যেকটিরই নাম দেওয়া হয়েছিল ক্রেটার্ণিটি। সেগুলির অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন তাতারা, অর্থাৎ সুকুমার দাস, এবং তাঁর সহযোগী ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। আমি ও হাবুল এই সব বৈঠক নিয়ে খুব যেতে গিয়েছিলাম। হাবুল তখন হাইটম্যানের খুব ভক্ত। একদিন সে হাইটম্যান সম্বন্ধে একটা বক্তৃতাও দিয়েছিল। কিন্তু সেই বক্তৃতার ভেতরন সাড়া না পেয়ে সে ছেলেমানুষের মতো মর্মান্বিত হয়েছিল—মনে পড়ে। আবার কবি কামিনী দাসের একটি কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করে তার খুব স্বপ্ন হয়েছিল। আর সেজন্য সে আনন্দ পায় ছেলেমানুষের মতনই।* কলেজে পড়বার সময় কলেজ ম্যাগাজিনে সে রবীন্দ্রনাথের ‘দুঃসময়’ কবিতাটি অনুবাদ করে পাঠিয়েছিল। ১৯১৮-২০র ‘মহোৎসব’ প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে সে অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছিল। এখনো মনে পড়ে :

“...While below thee, the seething gulfs of death
In myriad eddies wildly frown—
Still, still dear bird,
Though sightless thou and wan I
Aloft spread thy trembling wings and fly”—

ব্রাহ্ম সমাজে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সমস্ত মনোনীত করার ব্যাপারে তরুণ ব্রাহ্মদের প্রভাবে প্রাচীনদের দিক থেকে প্রবল আপত্তির বড় উঠেছিল। তরুণরা মনে করতেন রবীন্দ্রনাথের Humanism ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শের মধ্যে গ্রহণ করার মত এসেছে। প্রশান্তচন্দ্রের ‘কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই’

* দুই বাণের কয়েকটি লাইন ছিল :

“জান তুমি কেনে চাও, অশ্বের ভাতি

আবিলন বিরহের অশ্বকার ভাতি

দীপ্তম কল্পক উজ্জল।”

আমরা তখন সবাই হিলাস রোমান্টিক।

পুস্তিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। অথচ রবীন্দ্রনাথ আমাদের আদৌ ব্রাহ্ম ছিলেন কিনা সে বিষয়ে প্রাচীনত্বের সন্দেহ ছিল। এমন কি তিনি ধার্মিক কিনা—জা-ও ছিল তাঁদের সংশয়ের বস্তু। দু-বছর প্রবল সংগ্রামের পর আমরাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিলাম।

চুঃখের বিষয় এই যে, ভাগ্যচক্রে শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই বিজয় একটা ফাঁকা মাগুরাজ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দুই তরুণ নেতার অন্ততম ভাতা হয়ে পড়েন মরণাপন্ন অসুস্থ তাঁর মৃত্যু হয় ১৯২৩-এ। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ১৯২১-এর পর থেকে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর যুগ্ম সচিব হিসেবে তাঁর সমস্ত সময় নিয়োগ করলেন। তখনকার দিনের একজন ডি. পি. আই. এই ঘটনার মন্তব্য করেছিলেন—We have lost a professor to a new-fangled institution. তরুণদের মধ্যে সামান্য আমি পর্যন্ত ‘বিশ্বভারতী সম্মেলনী’ নামে কলকাতার এক প্রতিষ্ঠানে দিনরাত পরিশ্রমে প্রযুক্ত হলাম। কিছুদিনের মতন হাবুলের সঙ্গে আমার খোঁজাখোঁজ কবে আসে এই সময়। আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রজীবনের মেয়াদও শেষ হয়ে গেল। আমি দু-বছরের দ্রুত বিবেশে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলাম। কিন্তু তখনো হাবুলের সঙ্গে আমার চিঠিপত্রে যোগ ছিল।

কলেজে আমাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল প্রভাগচন্দ্র বোষ। সে বহুকাল বিদ্যালয়পর কলেজে অধ্যাপনা করবার পর মাত্র কয়েক মাস আগে মারা গেছে। আরো অনেক সহপাঠী ছিলেন। যেমন দৌল্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দিনাক সাহা (তিনি ছিলেন সামান্য senior) এবং ভ্রাতাপ্রসাদ সুখোপাধ্যায়। হাবুল আমাদের কলেজ জীবনেই তার কৌতুকের দ্রুত বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। মনে পড়ে, একবার এক ছুটির পর যেখি সে কোথা থেকে একমুখ দাড়ি নিয়ে হাজির। আমাদের—কেন?—কেন? প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, “আমার স্বাভাবিক পাঞ্জীর্ষ এতে ফুট হচ্ছে।” আমাদের কাছে এই কথা শুনে রোগশয্যা থেকে ভাতাধা বলে পাঠিয়েছিলেন যে, “আমাকে না যেখিয়ে হাবুল কেন তার দাড়ি না কাষিয়ে কেলে।” দাড়ি অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাষানো হয়েছিল।

কলেজ জীবনে আমাদের প্রধান মিলনক্ষেত্র ছিল মধ্য কলকাতার রাতাঘাট, অলিগলি। রেক্টোরাটে খাওয়া-দাওয়ার তখন খুব রেওয়াজ হয় নি। সম্বন্ধিতেও ফুলোত না। সে অভাব পূর্ণ হত গল্পওজবে, কখনো কাব্য

আলোচনায়, কখনোবা শৈশবের স্মৃতিমহনে—ছেলেবেলার প্রথম প্রেমের গল্পে—এবং পরের সমালোচনায়। সেই সব বিকেল ও সন্ধ্যাগুলি জীবনে কখনো ভোলায় নয়। আর একটা ব্যাপার তখনই ঘটেছিল—আমাদের একত্রে শান্তিনিকেতন যাওয়া। কোনো একটা উপলক্ষের ছতোতে।

হাবুল রবীন্দ্রনাথকে বহুদিন ধরে জানত। আমি তাঁকে প্রথম দেখি কলকাতায় ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাড়িতে। তাঁর প্রথম পান ভূমি শান্তিনিকেতনের এক উৎসবে। পানটি ছিল—“আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।” আমাদের ফ্রেটানিটির এক বৈঠকে ছাদের ওপর ধোলা আকাশের তলায় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন—“আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে, বসন্তের বাতাসটুকুর মত।”

বিলেত থেকে ফিরে আমি শিক্ষকতা গ্রহণ করলাম। আমি পড়িয়েছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রেসিডেন্সি কলেজে, বাহুবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে—পরপর এই সব প্রতিষ্ঠানে।

শিক্ষকতা গ্রহণের পর আমি বিবাহ করি। মহলানবীশ পরিবারে। সমস্যাটা ছিল ১৯২৬। বলা বাহুল্য এই অস্থানে ও অস্থানের প্রস্তুতিতে হাবুলই ছিল একরকম প্রধান কর্মকর্তা। বেশির ভাগটাই কতাপক্ষের দিক থেকে। আমাদের নতুন সংসারে হাবুল নিয়মিত আসত, এবং সর্দারি করত। তারপর ১৯২৯-এ আমি যখন ঢাকায় চাকরি নিয়ে যাই তখন সে বিকার দিয়ে যে ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিল তার ভাবটা ছিল সংক্ষেপে এই রকম—ঢাকার লোতে হুগোভন ও রেবা ঢাকা চলে বাচ্ছে, আর এদিকে বৈকালিক চাদের অভাবে আমি বহি উপবাসে বসি, তাহলে লোকে কি বলবে ?

ঢাকাতে সে আমাদের কাছে একবার গিয়েছিল। কিন্তু তাকে ভাষ্য কারণেই থাকতে হয়েছিল অধ্যক্ষ হুগোভন মৈত্রের বাড়ি। তিনি ছিলেন তার পিতৃব্যস্থানীয়। ১৯৩৩-এর গোড়ার দিকে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিলাম। আমার মেয়ে কাজলা তখন ষেড় বছরের শিশু। সেই থেকে বতদিন হাবুল বেঁচেছিল সে কাজলাকে ভালোবেসে এসেছিল প্রায় নিজের প্রাণের মতন। কাজলাকে সে কত মজার মজার চিঠি লিখত আর কবিতা পাঠাত।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে স্বরাজ্যনাথ দত্ত, নীরেজনাথ রায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য মিলিত হয়ে 'পরিচয়' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। নীরেজনাথ রায় বয়সে কিছুটা বড় হলেও কলেজ জীবন থেকেই আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। পত্রিকা প্রকাশের বেশ কিছুদিন আগে থেকে স্বরাজ্যনাথের বাড়িতে ঘন ঘন বৈঠক বসত। এই পরামর্শ সভা থেকেই উদ্ভব হয় 'পরিচয়'-এর সুবিধায়ত্ত প্রকাশের আজ্ঞা। সে আজ্ঞা সম্বন্ধে হাবুলের প্রকাশিত লেখা সুপরিচিত।

'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যায় আমার লেখা প্রকাশিত হয়। সেটাই আমার প্রথম বাংলা লেখা। সাধু ভাবায় আড়ম্বরণে লিখিত। দ্বিতীয় সংখ্যায় হাবুলের লেখা প্রকাশিত হয়। সেই থেকে সে হয়ে দাঁড়ায় 'পরিচয়'-এর এক প্রধান সাহিত্য-শিল্প-বিষয়ক সমালোচক ও লেখক, এবং প্রকাশ্যের বৈঠকের এক নিয়মিত সভ্য। 'পরিচয়'-এর আজ্ঞায় তুমুল তর্কাতর্কিতে হাবুল বিশেষ যোগ দিতেন। কিন্তু থেকে থেকে তার মজার মন্তব্যে ঘরের উত্তেজনা প্রশমিত হত কৌতুকের প্রাবনে। 'পরিচয়'-এর আজ্ঞায় হাবুলের প্রধান অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন বার্ষিক বসন্তকুমার মল্লিক, যিনি মল্লিকদা নামে পরিচিত ছিলেন। আজ্ঞায় সবিশেষ বিবরণ ভ্রামলকৃষ্ণ ঘোষের দায়বাহিক ইংরেজী ভাষেব্রিতে লিপিবদ্ধ আছে।

বিলেত থেকে আমি কিরেছিলাম মার্কসবাধে বিশ্বাসী হয়ে। প্রথমটা হাবুলের পলিটিকস-এ বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে 'পরিচয়'-এর আজ্ঞায় তার মতাব্রত বাসমার্গের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর থানিকটা বোধহয় সন্দেহোব। ইতিমধ্যে বৈঠকে এসে জুটেছিলেন হীরেজনাথ সুধোপাধ্যায়, স্বরাজ্যনাথ পোখারী ইত্যাদি বামপন্থী।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে একটা চলতি বিশ্বাস—হাবুল সাহিত্য, শিল্প, গান, খাওয়াদাওয়া, কৌতুক ইত্যাদিতেই ছিল স্তরপুর। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মনে রাজনৈতিক বামপন্থী বিশ্বাসও স্থান পেয়েছিল। সেটা বাইরের আচরণে প্রকাশ পেনত না, কিন্তু তার প্রমাণ মেলে কয়েকটি ব্যাপারে। প্রথমে 'পরিচয়'-এর মুক্ত সম্পাদক হয়ে সে স্বরাজ্যনাথের কাজের লাভব করত। কারণ 'পরিচয়' তখন মাসিক পত্রিকা হওয়ার তার কাজ বেড়ে গিয়েছিল। তারপর 'পরিচয়' ক্রমশ হাত বদল হয়ে কমিউনিস্ট ভাবার্থের প্রতিষ্ঠানের হাতে আসে। তখনও কিন্তু সাহিত্যিক হিরণকুমার সেই পলিটিকস-মুখী কাগজের হাল ছাড়ে নি। সোশাল হালদারের সঙ্গে সে

হল মুক্ত সম্পাদক। ‘পরিচয়’-এর এবং পাটির ঘোর ছুঁতিনেও তারা হাবুলের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে নি। যদিও নীরেন রায়ের ‘ডগম্যাটিজম’ (তার মতে) তাকে অত্যন্ত স্কন্ধ করত।

অবশ্য চল্লিশের বছরগুলিতে হাবুলকে বেশি আকর্ষণ করত অসাব্যস্তই বামপন্থার সাংস্কৃতিক আন্দোলন। অ্যাটিক্যানিস্ট রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সে ছিল এক পাণ্ডা। (মনে পড়ে যুদ্ধের পরে যখন এর নাম পাটে আবার প্রগতি লেখক সংঘ করা হয়, তখন হাবুলের ঘোর আপত্তি ছিল অ্যাটিক্যানিস্ট কথাকাটা বার দেওয়ার অন্ত। তার মতে ‘প্রগতি’ একটা loose শব্দ। তার অনেক অর্থ হতে পারে এবং ঠগও। কিন্তু অ্যাটিক্যানিস্ট কথাকাটা অত্যন্ত direct এবং ক্যান্সারের বিপরীত সহজে কাটিয়ে কেলা যায় না।) এই কথাকগুলির মধ্যে একটা রাজনৈতিক বিশ্বাস কি খুব একট নয়?

৪৬নং ধর্মতলায় হাবুল তার মনের মতো কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিল। আমার চেয়ে তার ওখানে আনাগোনা অনেক বেশি ছিল। কারণ আমি তখন বার্কসডাউ বিপ্লব ও প্রচারে বেশি ব্যস্ত ছিলাম। গণনাট্য আন্দোলন, সন্ধ্যাভাট্টান ইত্যাদি ব্যাপারে হাবুলের ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। কিন্তু তার সাহিত্যের মানদণ্ড ছিল খুব উঁচু গুরুর। বামপন্থী শিল্প বলেই শিল্পের বধ্যবধ সমালোচনা থেকে সে কখনো বিরক্ত থাকে নি। বস্তুত ‘পরিচয়’-এ প্রকাশিত তার তীক্ষ্ণ সমালোচনাগুলি একত্র করে প্রকাশ করার তাই বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই সব লেখার মধ্যে অনেক অপ্রিয় কথা থাকত। কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের একটা উঁচু মানদণ্ড সে বরাবর তুলে ধরতে চেয়েছিল। স্বীকৃত মিথ্যে মিথ্যে বলে নি যে, “আজকালকার বাংলা লেখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাঁইল হল হাবুলের।”

উৎসাহবিশিষ্ট ‘ভক্ত’ এবং কথা বাংলা, দুই রীতিতেই হাবুল ছিল সিদ্ধহস্ত। আর বাংলা কথার মধ্যে অবধা ইংরাজি মেশানো ছিল তার কাছে অসহ্য। পরিচিত কোনো পরিবারে ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে ইংরাজি বলা সে অসহ্য মনে করত। কেবল তার প্রিয় ছিল, কিন্তু birthday cake-এ সে অত্যন্ত বিরক্ত হত। নিজের জন্মদিন সে বরাবর পালন করত বাংলা তারিখ (৬ই আশ্বিন) অনুসারে।

কালক্রমে হাবুল ‘পরিচয়’-এর সম্পাদনার ভার থেকে মুক্তিলাভ করল, কিন্তু প্রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হাবুল ‘পরিচয়’-এর কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

যোগ রেখে গিয়েছিল, যেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ‘পরিচয়’ অফিসের হোতলায় গিয়ে তার অভ্যাস ছিল নীচের হোকান থেকে চাঁ লিফাড়া চপ ইত্যাদি আনিয়ে সকলকে খাওয়াানো। আমি মনে করি দীপেন বা হাবুলের অস্তিত্ব একাধীন বসিষ্ট সঙ্গীর এ বিষয়ে সবিত্তারে কিছু লেখা দরকার। কারণ হাবুল ছাড়া আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি তরুণ লেখকদের তরুণ মনোব সঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্ক বন্ধায় রেখে চলা। সাথে কি সে সকলের হাবুলনা কিংবা হাবুলমামা হয়ে স্মৃতিতে বিরাজ করছে।

রবীন্দ্রনাথ সবেছে তার জ্ঞান ছিল অসীম। দেপের ছুতীয়া সে রবীন্দ্রনাথ সবেছে কোনো প্রামাণ্য বই লিখে গেল না আমাদের শত অমুরোব সম্বন্ধে। রবীন্দ্রনাথের সে ছিল পরম গুণগ্রাহী। কিন্তু তাবলে সে সমালোচনা করতেও কখনো পচ্ছাদপন হয় নি। তার মতে রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কবিতা, বা আজকালকার পাঠকেরা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, ভাবসম্পদে এবং মাঝে মাঝে সহজ সাহসে অতুলনীয় হলেও আগেকার লেখার মতো ঠিক পূর্ণাঙ্গ কবিতা হয়ে ওঠে নি। সে বলত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান দুর্বলতা হল একটা diffuseness যেটা বহুকবির পক্ষে একটা শূঁত তো বটেই। আমি তাকে প্রশ্ন করি তার প্রতি প্রিয় কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সবেছেও এই কথা প্রযোজ্য নয় কি? সে ঠিক উত্তর দিতে পারে নি। অবশ্য হাবুল বরাবরই কবিতায় রোমান্টিকতারই পক্ষপাতী। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলির সে ছিল বরাবরের ভক্ত। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রতি তার এই আকর্ষণ হয়তো বা তার দ্বাদশশতাব্দীর হেরবচন বৈজ্ঞের কাছ থেকে পাওয়া। তিনি যে, আজকাল ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রতি প্রকৃত ইংরেজী সাহিত্য-মহলেও আবার কিরে আসছে। এসব ব্যাপারে আমি অবশ্য কিছু বিশেষজ্ঞ নই।

আমার কথা হল, হাবুল ভালোবাসত প্রকৃতি আর বায়ুকে। সাধারণ বায়ুকে। প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ তার শৈশবের পর্বত চোখে পড়ে। হাবুলের প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা শুরু হয় শৈশবে তার ঠাকুরদাদার (রামকৃষ্ণ সান্ডালের) বাড়িতে। তিনি আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রথম ভারতীয় সুপারিনটেন্ডেন্ট। তার Hours with Nature বইখানি অনেককে মুগ্ধ করেছে। আলিপুর Zoo-র বাগানে শিশু হাবুল পাহালা জীবজন্তুর বসিষ্ট স্পর্শ প্রথম পেয়েছিল। শেষ পর্বত শিকার কাহিনীর প্রতি

তার আকর্ষণে প্রধান বস্তু নিশ্চয় ছিল ঠিক প্রাণীশিকার নয়, অরণ্যের স্পর্শ ও আদর্শ।

একভালিরা রোজের বাড়ি পল্লবের জঙ্গল হয়ে উঠছে যেখে হাবুল গড়িয়ার তার বিবিধ বাড়ি ভাড়াটে হিসেবে আশ্রয় নেয়। তখন গড়িয়ার চারপাশের আশাশুভর পল্লীতে, এবং গ্রামে, অবিহার ঘুরে বেড়ানোতে তার যে কি আনন্দ দেখেছি! অজানা পাড়ার গিরে গৃহস্থবাড়ির লোকের সঙ্গে আপনা থেকে আলাপ করা, খালি বাস পেলে গড়িয়া টেপনে চলে গিরে চা বাগড়া, বোড়ালগ্রাম ও তার আশেপাশের নানা আরণ্য ঘুরে বেড়িয়ে লোকের সঙ্গে পরিচয় করা, এত শক্তি আমার মতন লোকের প্রকৃতিতে নেই। তবে কাজলা সম্বৎ পেলেই তার সঙ্গে ছুটে পড়ত।

কলকাতার এবং বাইরের খাওয়ার দোকান সম্বন্ধে তার আগ্রহ এবং এসব বিষয় নিয়ে তার লেখা হবিখ্যাত। আমার নিজেই বিশ্বাস যে ভোজ্যভব্যের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের মেলায় বিশেষ বাওয়ার ব্যাপারটাও তাকে অবশ্যই আকর্ষিত করত। কারণ আশ্চর্যের কথা এই যে, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে এত বলা এবং লেখা সম্বন্ধে হাবুলের আহার ছিল অতি পরিমিত। আসলে হাবুল ছিল—করাসীতে বাক্যে বলে—gourmet, কিন্তু gourmand নয়। connoisseur in eating, কিন্তু glutton নয়।

সংসার জীবনে দীর্ঘকাল হাবুলের সঙ্গে ছিলেন একমাত্র তার মা। আর শৈল্পিক কিছু সময় তার ছিল। সেইসকল ঠিক দশটা-পাঁচটা অক্লিষ্ট করা তার খুব প্রয়োজন হয় নি। রোব্বনের পূর্ণ ব্যবহার সে এই সুযোগে করেছিল বেশভ্রমণ করে। আমাদের সকলের চাইতে বেশি করে নানা অকলে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ, হবিখা ও দৌড়াপা তার হয়েছিল। পরে অবশ্য শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ার দীর্ঘদিন বাইরে বেড়ানো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। শেষজীবনে তাই চবে বেড়িয়েছিল কলকাতা শহর ও তার সংলগ্ন পল্লীগুলিতে।

আমরা অনেকবার তাকে বলেছি, তার সমস্ত ভ্রমণ কাহিনী লিখে রাখার অভ্যাস। কিন্তু কোনো কিছুই সম্পূর্ণ করা তার সম্ভাবনিক ছিল। এটি প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সম্ভ্রুত 'আলোচ্য' পত্রিকার প্রকাশিত তার এক ভ্রমণ কাহিনী, ভারতের কয়েকটি অপরিচিত অঞ্চলের দৃশ্য ও তার সম্বন্ধে অল্পভূতি। বাংলার এমন ভ্রমণ কাহিনী আমার চোখে পড়ে নি।

আমাদের আর একটা আকস্মিক ব্যাপার রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে সত্যিকার বিশেষজ্ঞ হওয়া। সম্বন্ধে সে কোনো কিছু লিখে গেল না। একটা কারণ অবশ্য ছিল। সে নিজে হাতে লিখতে ভালোবাসত না। তার খানিকটা অক্ষমতাও ছিল। তাই সে সন্ধান করত একজন 'লেখাবাবু'। লেখাবাবু অর্থাৎ যে ওর কথাগুলো লিখে নিতে পারবে। এই কাজ অনেকদিন সম্পন্ন করেছিলেন সত্যজিৎ রায়, এখন ত্রাণনাথ লাইব্রেরির একজন উচ্চ কর্মচারী। ইদানীংকালে লেখাবাবু হয়েছিলেন সুবিশাল লাহিড়ী। মাঝে মাঝে আরো অনেকেই হয়তো, তাকে লিখতে সাহায্য করেছে। আসলে তার মনটা ছিল খানিকটা অশান্ত। কিছুতেই স্থির হয়ে বসত না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে হাবুল প্রাচীন ব্রহ্মসঙ্গীতের খুব ভক্ত ছিল। সে-গানের স্বর-পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত তার প্রাচীন ব্রহ্মসঙ্গীত খুব ভালো লাগত। কিন্তু আধুনিকতম গানেরও সে ছিল খুব সমর্থদার। আমার সঙ্গে এসব নিয়ে তার খুব তর্ক হত। হাবুল মনে করত প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা রবীন্দ্রনাথের মধ্য ও শেষ জীবনের গানের প্রধান উপজীব্য। কারণ হাবুলের মতো তিনিও এই মাটির পৃথিবী ও মাটির মাহুবেব প্রতি আগন্ত ছিলেন। সে বলত রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য : পৃথিবী আমাদের প্রিয়। (কথাটা বোধহয় হাবুলের পক্ষেও সমান প্রযোজ্য।)

আমি বলতাম রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গত গানে কিছু এরই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলে গেছে এক অতৃপ্ত প্রেমের বেগনা। তার কারণ কি আমি ঠিক বলতে পারি না। বৈষ্ণব কবিতার যেমন দেবতার প্রতি ভক্তি ও মাহুবেব প্রেম একাকার হয়ে গেছে দেখা যায়, আমার মনে হত রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং প্রেমের বেগনা (প্রেমের আনন্দ নয় কিন্তু) কিয়ৎকম বেনে অস্তিত্ব পেয়েছে। বিশেষ কোনো গানে কোন ধারাটা প্রধান এই নিয়ে আমার মধ্যে তর্কের বড় বইত। সে যাই হোক, এই পৃথিবী আর এই জীবন হাবুলেরও অতি প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও যেমন দেখা যায়।

সমালোচকেরা অনেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রায় একেবারে গোড়া থেকে মৃত্যু সম্বন্ধে একটা ভয় লক্ষ্য করেছেন। হাবুল আর আমি একমত ছিলাম যে, সেই ভয় আর কিছুই না শুধু পৃথিবী আর মাহুবেব ছেড়ে চলে যাওয়ার কষ্ট। তাই তার প্রাচীন-বাসর আমরা গান দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলাম। পৃথিবী ও মাহুবেব প্রতি ভালোবাসার গান।

আগেই বলেছি, যে, বিশেষ করে অনেক লোকের সামনে হাবুলের কৌতুকশ্রিয়তাই বেশি প্রকাশ পেত। সঙ্গে সঙ্গে দু-একটা ব্যাপারে দুর্বলতাও দেখা যেত। যেমন অতীতে কোনো আঘাত পেলে সে সেটাকে স্বাভাবিক ভেঙে ফেলতে পারত না। কিন্তু কৌতুকের আড়ালে যে পলিটিকাল আদর্শের বিশ্বাস তার মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার নিদর্শনও পেয়েছি। যেমন অ্যাক্টিভিসিস্ট যুদ্ধের সময় সে এগিয়ে এসে ‘রথের রশ্মি’তে পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল (অবশ্য স্টেজে উঠে পাট অনেকখানি ফুলে গিয়ে সে মঞ্চের উপরই নতুন নতুন কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেছিল।) তার রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসের আর একটি প্রমাণ যোরা হুর্শিনেও পাটি ও ‘পরিচয়’-এর পাশাপাশি থাকা। আর একটা নিদর্শন হল সোমেন চন্দর হত্যাকাণ্ডের পর তার ‘পরিচয়’-এর সম্পাদকীয়। যেটির সঙ্কেত বজ্রবর নীবেন্দ্রনাথ রায় বলেছিলেন এবার সত্যিই ‘পরিচয়’-এর মোড় ফিরল। কিংবা এই সেদিন চৌনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় যখন ‘দেশ’ পত্রিকা স্বাধীন সাহিত্য সমাজ-এর নামে লেখকের পর লেখককে প্রায় কোপঠাসা করে আক্রোশিত আদায় করে নিচ্ছিল যে তাঁরা কমিউনিজম-বিরোধী তখন হাবুল একদিন আমার মেঝের কাছে এসে স্ক্রাক্সের ‘ছাড়পত্র’ বইটির গিছনের মলাটের ভিতরের পাতায় স্ক্রাক্সের ‘যুগ নেই’ থেকে ‘বিক্ষোভ’ বলে একটি কবিতা লিখে দিয়ে গেল। তার ছুটি ছত্র এখানে উদ্ধার করি :

“ইতিহাস জানি নীরব সাক্ষী তুমি

আমরা চেয়েছি স্বাধীন বদেশভূমি।”

হাবুল দীর্ঘদিন অবিবাহিত ছিল। ওর মাঝের যুত্থার পরেও কিছুদিন সেই অবস্থায় কাটানোর পর তার বিয়ে হয় শিবনাথ শাস্ত্রীর দৌহিত্রী ও হেমলতা সরকারের কনিষ্ঠা কন্যা মীরার সঙ্গে। হাবুলের বাইরের আকর্ষণ ও নানাবিধ activities-এর সঙ্গে মীরার অপ্রত্যক্ষ যোগ ছিল। আমাদের পরিবারের সঙ্গে অবশ্য সে ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। মীরা হাবুলের পরিপূরক হিসেবে যেন থাকে বলে Foil হয়ে দাঁড়ায়। অত কোনো ছবি বলে হাবুলের শেষজীবন এত সুখের হতে পারত না।

হাবুল চিরকালই ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসত। প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত সে ছিল mobile। আমরা সববয়সীরা ভাবতাম এই ভাবেই বছরের পর বছর কাটবে। কিন্তু তাকে চলে যেতে হল। হঠাৎ। একমাত্র সাধনা যে সে

কয়েক ঘণ্টার বেশি মৃত্যুবরণা ভোগ করে নি। এবং অল্প অবস্থায় দিনের পর দিন বাড়িতে তাকে পড়ে থাকতে হল না। তার মতো লোকের পক্ষে সেটা হত অসহনীয়।

সকল মাহুষের মতো হাবুলেরও দোষগুণ ছিল। কিন্তু গুণের দিকটা এত ভারী বলেই আজ অসংখ্য মনে শোকের ছায়া কাটতে চায় না। আমাদের ছোট পরিবারের কথা কীইবা বলব—আমি বার্ষিক্যে নিত্যান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করছি। এই বেদনা অজস্র মনেও ছায়া কেলেছে। হাবুলই বলে গেছে—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর নিমতলা ঘাটের কাছে উদ্ভাস্ত হুশীহ্রনাথ হাবুলকে বলেছিল—“হাবুল, it is going to make a difference।” আজ আমাদের কাছেও তার সম্বন্ধে মনে হচ্ছে—it is going to make a difference.

অমূল্যধন : কবিতা সংকলন

হিরণ সান্তাল : যেমনটি মনে হয়েছিল

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

আজ থেকে প্রায় বাট বছর আগেকার কথা। হিরণ সান্তালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। একসঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তাম। একদিন প্রফুল্ল ঘোষের ক্লাসে হিরণ সান্তাল গুরুত্ব হাবুল কোলের উপর এক বাংলা উপন্যাস রেখে মাথা নিচু করে পড়ছেন। অধ্যাপকের চোখে পড়তেই বললেন—“ইউ-উ-উ।” হাবুল দাঁড়িয়ে উঠে বইটা দেখিয়ে বললেন—“এটা পড়ছি।” অধ্যাপক ঘোষ তিরস্কারের স্বরে বললেন—“Ar’nt you ashamed?” হাবুল উত্তর দিলেন—“No Sir, I am never ashamed of telling the truth।” প্রফুল্ল ঘোষ আর কি করেন, গর্জন করে উঠলেন—“But you should be ashamed of what you call the truth, the truth।” আমরা সবাই বুঝলাম, বাঘা অধ্যাপকের হার হয়ে গেল, হাবুলেরই জিত। আরো বুঝলাম, হাবুল সান্তাল অপর সকলের মতো নন, একটু অসাধারণ। সেই অল্প বয়সেই হাবুল আমার প্রতি আর্জন করলেন।

হাবুলের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম একালের বাগদাদী মানসিকতা ও সেকালের ব্রাহ্ম সত্যনিষ্ঠা আর তেজস্বিতা, এই দুয়ের এক সমন্বয়। বিশ শতকের সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একযোগে চলতেন বটে, কিন্তু তাঁর মূল্যবোধটা তিনি পেয়েছিলেন উনিশ শতকের ব্রাহ্ম আচার্যদের কাছ থেকে।

যুব আমলে কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন হাবুল সান্তাল। প্রসন্ন মেজাজ। হাসিখুশি ভাব। কত রকমের ছেলেমানুষি বে করতেন। কোনো বৈঠকে হাবুল এলেই মনে হত, যেন একটা আলো জলে উঠল। কিন্তু আর এক হাবুল সান্তাল ছিলেন। অটল, দৃঢ়চিত্ত; নীতিগত ব্যাপারে তিলাধি আপন

করতেন না; প্রয়োজনবোধে খুব কঠিন হতেও পারতেন; অপ্রিয় সত্যকথা বলতে আরও বিধাশ্রয় হতেন না। ছোটরা হয়ত এই বিত্তীয় হাবুল সান্তালকে দেখতে পান নি। আমি পেরেছিলাম। হাবুলের মজার গল্পের ভাণ্ডার ছিল অসুরভ। তাঁর ছড়ার ও গল্পের অল্প দৃষ্টান্ত চিহ্নবায়ু ও অমৃত্যুদের লেখার পাওয়া যাবে। হাবুলের একটা গল্প আমি অনেক আয়গায় করে বেড়িয়েছি। লি-ও-পা-র্ডের গল্প। তার আন্তত্বোত্তেবের বাড়িতে এক উল্লোলক গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ছাত্র জিজ্ঞাসা করলেন—“তার, এল-ই-ও-পি-এ-মার-ডি, উচ্চারণ কি হবে?” মাস্টারমশাই বললেন—“লি-ও-পা-র্ড।” আন্তত্বোত্তেবের কানে যেতেই তৎক্ষণাৎ মাইনে চুকিয়ে মাস্টারমশাইকে বিদায় করলেন। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলেন—“কি হল?” মাস্টারমশাই বললেন—“ওই লি-ও-পা-র্ডই আমার খেলে।”

হাবুলের একটা অভ্যাস ছিল নীরবে ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করা। এই ভাবেই তিনি কবিতা পড়তেন। কোনো লাইন মনে ধরলেই সেটা আবৃত্তি করতেন। মাথার টুপি, অনতিদীর্ঘ পদক্ষেপে রাস্তা দিয়ে চলেছেন ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করতে করতে। মুখে কোঁতকের আভাস। হাবুলের কথা ভাবলে সর্বাগ্রে এই ইমেজটাই আমার মনের মধ্যে ফুটে ওঠে।

হাবুল নানা ঐতিহাসিক আন্দোলনে পক্ষাবলম্বন করতেন বটে কিন্তু নিজে থেকে যেতেন নির্লিপ্ত ও নির্বৈয়। সম্ভবত এটাই ছিল হাবুল সান্তালের চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রসাহিত্যের ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমর্থনার হাবুল সান্তাল সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু বলবেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের খুব কাছাকাছি ছিলেন। তলে তলে রবীন্দ্রভক্তই ছিলেন বলে মনে করতাম। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে হাবুলের ধোলা মন। রবীন্দ্র জগতের রবীন্দ্র-সমালোচনায় তিনি বিচলিত হন নি। বলতেন রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা হওয়াই উচিত। শিবনারায়ণ দাসের লেখাটিকেও তিনি বন্ধুমহলে খাপসত আনিরেছিলেন। হাবুল আক্ষেপ করতেন, রবীন্দ্রনাথ প্ৰজ্জ্বলিত জ্বলন্ত না; পরা লিখতে লিখতে কবিতা করে গেলেন। এক দিন বললেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এস্কেপিষ্ট; নাইটহুড ছেড়ে ‘লিঙ্গিক’ লিখতে বসে গেলেন!

স্বয়ংচন্দ্রের লেখা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত নিয়ে অনেকেরই অনেক কথা বলেছেন। হাবুলের মুখে শুনেছিলাম, ‘চরিত্রহীন’ পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘চরিত্রহীন’ সত্যই চরিত্রহীন। লাখ কথার এক কথা। হাবুল সমস্ত সত্য দিয়ে এটিকে উপভোগ করেছিলেন।

হাবুল মার্কসবাদ সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছিলেন। মার্কসীয় ভাবাদর্শ নিঃসন্দেহেই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু তিনি নিজেকে কি মার্কসবাদী ছিলেন? না বোধ হয়। সে বাই হোক, মার্কসবাদ নিয়ে টানাহেঁচড়া হাবুল পছন্দ করতেন না। একদিন হাবুলের বাড়িতে চা খাচ্ছি। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—“আচ্ছা, কেক বুজোয়া ও পায়স স্কিউডাল, এ বিষয়ে তোমার মত কি?” বুঝলাম, ‘ব্যাপারটা’ নিয়ে তর্কাতর্কি হয়ে গেছে। কি একটা বোকার মতো উত্তর দিয়েছিলাম, ভুলে গেছি।

হাবুল অসাধারণ ভালো গদ্য লিখতে পারতেন। আমার বিশ্বাস, সমকালীন বাংলা সাহিত্যে তাঁর চেয়ে ভালো গদ্য আর কেউই লিখতে পারতেন না। তাঁর কলমে জাহ্ন ছিল। তাঁর সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও গবেষণা নিশ্চয়ই হবে। সময়ের বিচারে তাঁর লেখা কতটা টিকবে তা সময়ই জানে। কিন্তু এমন খদ্দু, চন্দ্র, সরল, সত্যবাদী, জ্ঞাননিষ্ঠ, আনন্দময় ও চিরতরুণ মাহুস আর কোনোদিন দেখতে পাওয়া বাবে না।

প্রথম পর্বারের ‘পরিচয়’ যখন টিমটিম করছে, তখন হাবুলের প্রাণেই আমি ‘পরিচয়’-এ টুকিটাকি লিখতে আরম্ভ করি। এইভাবেই আমি ‘পরিচয়’-এর লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হই। পরে তার সম্পাদকগোষ্ঠীর। হাবুলের লেখার উপর কলম চালানোর কথা কেউ কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। আমার একবার ওই দুঃসাহস হয়েছিল। হাবুলের একটা লেখার এক অংশকে ক্র্যাঙ্কেটের দ্বারা চিহ্নিত করে বললাম—“এই অংশটা বাহ্যিক দোষ তোমার লেখাটির কোনো অঙ্গহানি হয় না, পূর্বাগর সজ্ঞিত ও বজার থাকে।” ভয় করছিল এই বৃষ্টি লেখাটাকে কেবল চেয়ে বসেন। হাবুল গভীর হয়ে গেলেন। আপত্তি করলেন না। আমার ছবুড়িটা ছিল নির্বাচনী রাজনীতি প্রস্তুত। একজনের কর্তব্যবুদ্ধি বড়ই বিপথগামী হোক, তাকে হাবুল সম্মান করতেন।

হাবুলের বয়স কোনোদিন বাড়েনি, বয়স যিনে যিনে কমছিল। তরুণদের সঙ্গেই হাবুলের বনিবনাও হত বেশি। ছোটরা তো দেখতাম হাবুলনা বলতে অজান। আমি কোনোদিনই হাবুলের অন্তরঙ্গ ছিলাম না। আমি ছিলাম তাঁর বন্ধুত্বগতের ও ভক্তগতের প্রত্যক্ষবাসীও নয়, বহির্বাণী। তাঁর তরুণ ভক্তদের দলে ভিড়ে গিয়ে আমিও তাঁর সঙ্গে মানিকতলার পরম সন্দেশ ও মহাকাব্য গান্ধী রোডে তেলেভাজা খেয়েছি, কিন্তু তাও বহির্বাণী রূপেই। বাইরে থেকে বতচুঁকু দেখেছিলাম, শুনেছিলাম, বুঝেছিলাম, সেই পুঁজিগাটা সরল করেই ছুঁচার কথা লিখে কেতলাব। কোনো মূল্য নেই। কিন্তু হিরণ সাক্ষাৎের প্রতি আমার প্রত্যাশা একেবারে মূল্যহীন নাও হতে পারে।

আমাদের হাবল

প্রিয়জাপতি ভট্টাচার্য

পত ১০ আত্মস্মারি সকালবেলায় রেডিওর স্থানীয় সংবাদে হাবল সম্বন্ধে সেই
সমাস্তিক ধবর স্তনলাম—বা অবিস্মৃত অথচ নিদারুণ সত্য।

হাবল ছিলেন আমার বনিষ্ট বন্ধু ও নিকট প্রতিবেশী। ইদানীং তিনি তাঁর
বালিগঞ্জের বাড়ি বিক্রি করে পড়িয়াতে উঠে গেছেন। সে বছর চারেক
হবে। তার আগে যে রাত্তার উপর আমার বাড়ি—একতালিয়া রোড—
তারই চনং বাড়িতে উনি বাস করতেন। প্রত্যহ তাঁর সঙ্গে আমার
মোলাকাং হত। কোনোদিন ঘরে আগতে না পারিলে অন্তত রাত্তার
ওপরকার আনন্দের কাছে দাঁড়িয়ে টোকা মেয়ে আমার মনোবোগ আকর্ষণ
করতেন। কিছু কথাবার্তা হতই।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ হয় নীয়েন রায়ের মাধ্যমে—‘পরিচয়’
প্রকাশ কালে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু একদিন স্বধীন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গে
আমার পরিচয় করিয়ে দেন। প্রায় রাত্তারাত্তি আমার সঙ্গে স্বধীন্দ্রের
বন্ধুত্ব জমে ওঠে। স্বধীন বলেন—“আম্বন একটা জৈমালিক পত্রিকা বার
করা বাক।” সম্মতি জানিয়ে আমি পরের দিনই আমার বালাবন্ধু নীয়েন
রায়ের সঙ্গে স্বধীনের আলাপ করিয়ে দি। নীয়েনই দু-তিন দিনের ভেতর
হিরণকুমার সান্তাল বা হাবলকে এনে হাজির করলেন। হাবল ছিলেন
যেমনই প্রিয়বর্ধন, তেমনই নিষ্ঠাভাবী এবং কলকাতা শহরের একজন
সদালাপী সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি। আন্তে আন্তে আরো অনেকে এলেন।
১৩০৮ বঙ্গাব্দের প্রাৰ্ণে আমার অাকা প্রচ্ছদে শোভিত হয়ে ‘পরিচয়’
প্রকাশিত হল। সম্পাদক স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত। ‘পরিচয়’ নামটা নীয়েনেরই
দেওয়া। প্রথম সংখ্যার মুখবন্ধও সেই লিখেছিল। হাবলকেও এনে
দিয়েছিল। প্রথম সংখ্যায় হাবল কিছু লেখে নি সত্যি। কিন্তু ‘পরিচয়’—এক

সঙ্গে তার যোগ একবারে সর্বজনবিদিত। হাবলের শিশুহীন সুরলতার কথা অনেকেই বলেছেন। তাতে আর আমার নতুন কিছু যোগ করবার নেই। হাবল সাধারণভাবে সব তর্ককে অত্যন্ত লম্বা পরিশ্রুতিতে উত্তীর্ণ করতেন, কিন্তু তিনিও সময় সময় তাঁর নিজস্ব মতকে খুব বড় করে ধরতেন।

একদিন তিনি Chippendale furniture-এর কথা নিয়ে কাগজের চোড়া কাটিয়ে উপস্থিত সকলকে কি রগড়েই না মাতিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিই অপর সময়ে কোনো একটা কথার বিতর্কতা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করতেন। আগেই বলেছি আমার বাড়ি থেকে একরশি দূরেও ছিল না তাঁর বাড়ি। তাই অফিস বাবার সময় ঠেকে আমার গাড়িতে তুলে নিতুম, গাড়িতে নানা বিষয়ে আলোচনা হত। একদিন এই আলোচনাতে মতবৈধ হল। খুব জোর তর্ক হল ধানিকটা। তারপর আমরা বললেন গাড়ি ধামাতে ও গাড়ি থেকে সটান নেমে গেলেন। সেইদিনই সন্ধ্যায় আবার এসে মিটিয়ে নিলেন। এইসব সময়ে তাঁর মনের শিশুহীন সুরলতা উবে যেত আর দৃঢ় একটা ভাব এসে তাঁকে কঠিনমনা করে দিত। এসব সময়ে আমারও জিব চেপে যেত, কলে তর্ক একটা অনবদীয় ভাব ধারণ করত।

হাবল ছিলেন খাচরসিক। উনি খেতে ও খাওয়ারতে শরান ভালোবাসতেন। পূর্ব আর পশ্চিম বাংলার নানা জাতীয় খাবার পরব আহারের সঙ্গে ভোজন করতেন। সেই সব খাবার তৈরির কথাও বুঝতেন। কলকাতার নানা স্থানে ভালো ভালো খাবারের দোকান জানা ছিল তাঁর এবং সেখান থেকে মাঝে মাঝে কিনে আনতেন খাবার ও আমাদের বাড়িতে সকলকে বিতরণ করে আনন্দে বিভ্রল হতেন।

সরস্বতী পূজোর দিন আমাদের বাগবাগারের বাড়িতে (হরলাল মিত্র স্ট্রীট) তাঁর ছিল নিত্য আমন্ত্রণ—একডালিয়া রোন্ডের বাড়িতেও তাই। এছাড়া কিছু নতুন রকমের রান্না হলেই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হত। কচুর শাক, হুস্ত, ঘট, ডালনা, চচ্চড়ি থেকে কচুরি, শিখাড়া, চপ, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি বাড়িতে তৈরি দেশী-বিদেশী সব কিছুই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হত এবং সব কিছুতেই ছিল তাঁর সমান আসক্তি। আমাদের দেশী রান্না সব তিনি চেখে চেখে খেতেন ও তার গুণাগুণ বর্ণনা করতেন। সেইরকম রান্না ঠুন্দের মেখে (কুট্টিয়া অঞ্চলে) কিরকম ভাবে রান্না হত সে কথা খুঁটিয়ে বলতেন।

কিছুকাল আগে তিনি অনেক রান্নার কথা লিখে ও বলে গেছেন

‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র ও অন্তর্ভুক্ত। মোট কথা উনি রামায় একজন নিখুঁত সময়দার ছিলেন।

ছেলেভুলনো অনেকগুলি পূর্ববঙ্গীয় ছড়া তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল বা তিনি পূর্ববঙ্গীয় টোনে বলে ছোটদের বশীভূত করতেন। যেমন হেয়ালবনে ঢুকে বাঘের চূর্ণশার কাহিনী।

ছোটবড় সকলকার সঙ্গেই তিনি মিশতে পারতেন তাঁর সরস মন নিয়ে। আলোচনা-আলোচনার ক্রিকে ক্রিকে তিনি ছোট ছোট চুটকি বা মজার গল্প বলে যেতেন সাবলীলভাবে। একটি গল্প মনে পড়ছে। কোনো এক ছোট রেলওয়ে স্টেশনে তিনি টিকিট কাটতে গেছেন। টিকিটবাবু অথচ গম্ভীর মশগুল, কোনো অহুসেই কাজ হচ্ছে না। এদিকে ট্রেন সমাপ্ত। হাবল বললেন—“আমি আনতাম বাঙালির। একটু স্যর (Sir) বললেই গলে যায়। তাই তাকে বললাম : “স্যর, স্যর, টিকিটটা একটু দয়া করে দিন না, ট্রেন এসে গেছে।” তাতে কাজ হল। টিকিট ও পরশা ভালো করে শুনে নিয়ে বললাম—“আপনার মতো অন্তরলোক আমি জীবনে দেখি নি।” “কি। কি বললেন।” টিকিটবাবুর চোখ তো ছানাবড়া। তাল ঠুকে বললাম—“হ্যাঁ, ঠিকই বলছি—বাইরে আসুন না, জুতিয়ে লাল করে দেব।” আমি আনতাম তখন তার পকেট টিকিট ঘর ছেড়ে বাইরে আসা অসম্ভব। এদিকে ট্রেনও এসে গেছে। আমি আর সেখানে দাঁড়াই।”

তাঁর আর একটি পরিচয় হয়তো সকলের জানা নেই। তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর কটোপ্রাকার—ল্যাণ্ডস্কেপ ও পোর্ট্রেট উভয়ত।

হাবলের বহুব্যাংগ্য ছিল অতি উচ্চমানের। নীচের বিবরণ থেকে সেটি খুব প্রকট হবে।

আমি স্থির করেছিলাম ৭৫ বছরে পদার্পণ করলে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করব। হিরণ্যুমায় আমার বললেন অবসর গ্রহণের দিন তিনি আমার অফিসে এসে বলে থাকবেন—আমার বিদায় অভিশ্রাষণ শুনবেন এবং আমার সঙ্গে গাঙিতে বাড়ি আসবেন। বথাসময়ে তিনি আমার অফিসে এলেন ও আমার অফিসের কর্মীবৃন্দের বিদায় সংবর্ধনার উত্তরে আমার ভাষণ শুনলেন ও পরে একজুে আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরলেন। এই অফিসে একাদিক্রমে ৪০ বছর কাজ করে বিদায় নিচ্ছি, মনটা ভারাক্রান্ত হতে পারে—নিশ্চয়ই এই বিবেচনা তাঁর হৃদয় মনে স্থান পেয়েছিল। তাই তিনি আমার চলে আসার সময়ে সাহচর্য দিতে চেয়েছিলেন।

হাবল আমার এত কাছের লোক ছিলেন যে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে বসে কতদিনের কত কথাই না মনে আসছে।

আজ করেকটি স্মৃতিচ্ছিন্নই শুধু এখানে তুলে দিলাম। যদিও এই মুহূর্তে কিছু লেখা কতই না কঠিন।

হিরণ

শ্যামলকুমার ঘোষ

আমার বয়স একুশ। উড়িষ্যার জঙ্গল থেকে অর নিয়ে চিকিৎসার জন্ত কলকাতায় এসেছি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে একজন আত্মীয়ের বাড়িতে ছুটির বাকি কয়েকটা দিন কাটাচ্ছি। একদিন দিলীপকুমার রায় এলেন আমার আশ্রয়দাতার কন্ঠাকে সজ্জরচিত একটি গান শেখাতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হিরণ আর বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক নীরঞ্জননাথ রায়। সে-বাড়িতে আরও ঝাঁকের দেখতাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বোস, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, প্রাচীন মৃত্যোত্তরবিদ হারীতকুমার দেব ও অস্ত্র-চিকিৎসক শ্রবোধ দত্ত। এঁরা সকলেই ছিলেন আমার চেয়ে পাঁচ থেকে দশ-বারো বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ। ঘোবনে বয়সের অল্প ব্যবধানও মনে হয় অনেক। তাছাড়া এঁদের মত ওজস্বী বিদ্বৎ মানুষ আমি আগে কখনও দেখি নি। আড়াল থেকে দেখে ও কথা শুনে মুগ্ধ হুতাম।

কেমন করে জানি না হিরণ শুনলেন যে আমি পূর্বে আফ্রিকার সিংহ-সমূহ পর্বতাকুল থেকে এসেছি। নিজেই এগিয়ে এসে নাটকীয়ভাবে ব্যক্ত করেন যে তাঁরও শৈশব কেটেছে সিংহ, জেব্রা, জিরাক, উটপাখি, জলহতী ইত্যাদি আফ্রিকাবাসীদের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে।

আমি কৌতূহল প্রকাশ করতে বলেন সেই সকল বিচিত্র পশুপাখির তখন আলিপুর চিড়িয়াখানায় প্রবাস জীবন বাপন করছিল।

নীরেনবাবু বুঝিয়ে দেন যে হিরণ ভূমিষ্ঠ হবার মাস কয়েক আগে তাঁর পিতাকে হারান। প্রতিপালন করেন পিতামহ রামব্রহ্ম সান্যাল। তিনি ছিলেন কলকাতা পশুশালায় প্রথম ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক। পাণ্ডিত্য ও বাৎসল্যের জন্ত তাঁর খ্যাতি ছিল।

পরে বখন হিরণকে অন্তরঙ্গভাবে দেখি তখন জেনেছি যে পশু পাখি সঘর্ষে জ্ঞান অর্জন করা ছাড়াও চিড়িয়াখানার চৌহদ্দির মধ্যে বাস করার ফলে তিনি

প্রকৃতির সৌন্দর্য সযত্নে সচেতন হতে শেখেন। পল্লশালার ও তৎসংলগ্ন হাট-কালচার বাগানের বিচিত্র গাছশালার সমারোহ; বিলের ওপর বাঘাবর পাখির ষাওয়া আশা; ভালপালার কঁক দিয়ে বেধা জ্যোতিক মণ্ডল ও মেঘের বিচিত্র রূপ—সব অড়িয়ে শিশু মনকে আনন্দে আবহুল করে দিত। সেই থেকেই তিনি প্রকৃতির বর্ণনায় সমৃদ্ধ কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন।

প্রথমবার বখন পোরাই নদীর তীরে তাঁর মাতামহ হেমচন্দ্র মৈত্রের কুঠি-বাড়িতে বেড়াতে বাই তখন বেশি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্টের দরজার নিচের দিকে কঁচা হাতে খড়ি দিয়ে লেখা গুয়ার্ডস্‌ওয়ার্ধ-এর কবিতার স্তবক। হিরণ বলেন বারো বছর বয়সে লিখেছিলেন। ছােবের একটি নিষ্ঠুর অংশ দেখিয়ে বলেন লেখানে বসে আপন মনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতেন।

এককালে এই কুঠিবাড়ির মালিক ছিল কোনো দুর্ধর্ষ ইংরেজ নীল চাষী। কুঠির শিহনে নদীতীরে বিরাট বিরাট হৌজগুলি এখন বনবৃক্ষ ঝোপ ঝাড়ে ভরে গেছে। সামনের দিকে বিস্তীর্ণ মাঠ; দূরে ঝিল, চাবের জমি, খামার বাড়ি, গাছপালা ঘেরা বসতি। চক্রবালে উদ্ভিদের কালো রেখা—তার নিচে নদীর রূপালী পাড়। প্রাশস্ত বারান্দায় বসে হিরণ তার ছেলেবেলার গল্প বলেন।

ইসলামপুর অথবা আরও নিকটস্থ গ্রাম থেকে বৃদ্ধরা এসে নিচে তলার এক কোণায় একটি ছোট ঘর বেধিয়ে বসতেন, ওটা ছিল সেই লালমুখো শিশাচ-দের কয়েকখানা। প্রতিবেশী জমিদারদের লেঠেল সর্দাররা ধরা পড়লে ঐ ঘরের মধ্যে পুরে তােদের কতল করে দিত। ওদিকের ঐ অতি বৃদ্ধ বটগাছের ডালে বসে প্যাচারি আনিবে যেহেতু কাটা ফুডেরা কখন আসে।

তাঁরা আরও বলতেন যে, হৌজগুলোর পাশে নদীর ধারে কত লাল বে পুঁতে ফেলা হত তার কোন ঠিক ঠিকানা ছিল না। তােদের প্রোতাআরা মাঝে মাঝে বন বেড়াল, শেয়াল, বুনো শূকর, অজগর ইত্যাদি নানা ধরনের রূপ নিয়ে চরে বেড়ায়।

কিশোর হিরণ সে-সব আশঙ্কবী ভূত-প্রোতের গল্পে বিশ্বাস করত না কিন্তু তার কাছে নীল চাষী ও জমিদারের মধ্যে বিরোধ ও খুনোখুনি খণ্ড বৃদ্ধগুলো ছিল বাস্তব ঘটনা। সে গ্রামের পথে ঘাটে মাছুষ দেখলে ওদের পূর্বপুরুষদের কথা ভাবে।

আমার সঙ্গে বখন হিরণের প্রথম আলাপ হয় আমি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হই পূর্ব আফ্রিকার পর্যটকদের সযত্নে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে। নীল নদীর উৎস সন্ধানে তারা কোণায়, কোন পথে, কাদের কাছ থেকে

পথের নির্দেশ জেনে নিয়ে অনাবিকৃত হ্রদের তীরে পৌঁছে যায়। নিয়ন্ত্রণে তুবার মধ্যে অবাক হয় কে কখন এই সব বৃত্তান্ত আমারও জানা ছিল না। তাছাড়া তাঁর কাছে শুনি সাভোর মাছুষ-ধেকো সিংহদের কাহিনী। ভারতীয় রেলপথ নির্মাতাদের চূর্ণশার সব ধরই আমি জানতাম কিন্তু হিরণের বলবার ধরন দেখে মনে হয় যেন তিনি সবই প্রত্যক্ষ করেছেন।

তাঁর বাবা আর ঠাকুরদার সংগৃহীত অনেক বই ছেলেবেলাতেই পড়ে ফেলেন। রাইগর হাগার্ড-এর কাল্পনিক ছবিগুলোও গভীর দাগ রেখে যায় শিশু মনে।

হিরণের সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হয় শান্তিনিকেতনে আকস্মিক ভাবে। ১৯২৮ সালের কথা। আমি কলকাতার বদলি হয়ে আসবার কয়েকমাস পরে বিয়ে করে সন্ন্যাস বাই কবিকে দেখতে। ধর দিয়ে না গেলেও সৌভাগ্যবশত আশ্রয় পেয়ে বাই ‘শান্তিনিকেতন’ বাড়ির একতলার একটি ঘরে। সন্ধ্যার সময় পৌঁছে টাদের আলোতে পরিবেশ মনে হল অনির্বচনীয় সুন্দর। সন্নিবীকে ঘর শুঁড়িয়ে নিতে রেখে আমি উপরে উঠেই দেখি ছতলার কোণের ঘরে বসে লঠনের আলোতে হিরণ লিখছেন। টেবিলের ওপর অবিস্মৃতভাবে রাখা কাগজপত্র।

আমি প্রবেশ করতে চমক ভাঙল। বললেন, “বেশ, বেশ, কাজে লেগে যান। কবি তাঁর এই বাংলা রচনাগুলোকে ইংব্রীতে তরজমা করতে দিবেছেন। খানিকটা আপনি নিন।”

আমি বলি, “ইংব্রী হয়েতো লিখতে পাবি, কিন্তু বাংলা যে জানিনা—”

হিরণ বলেন, “ও হ্যাঁ, আপনি তো আফ্রিকা থেকে এসেছেন—”

তারপর নিজেই কাজে লেগে যান। একবার শুধু বলেন—“রবীন্দ্রনাথ বিদেশে যাবেন, অনেক কাজ চাপিয়েছেন—আমার নিখাস ফেলার সময় নাই।”

আমি কার সঙ্গে এসেছি। কোথায় উঠেছি—সে কথা জেনে নেবার সময় ছিল না তাঁর।

নেমে গিয়ে সন্নিবীকে নিয়ে কটক পার হয়ে সবে মাত্র বাঁদিকে মোড় নিয়েছি এমন সময় উদাত্ত নারী কণ্ঠে গান শুরু হল। সে-রকম প্রাণ যাতনো জোরালো গলার গান আগে কখনও শুনি নি। দাঁড়িয়ে গেলাম। মনে হল গায়িকা আছেন অতিখিশালার বিপরীত দিকে। প্রথম গানটি শেষ হওয়া মাত্র দ্বিতীয় গান শুরু হতে আমরা দ্রুত পড়ে ফিরে গেলাম। শালবীধিতে পড়ে দেহলীর দিকে চলেছিলাম। গাছের আড়াল থেকে

হিরণ বেরিয়ে এসে বললেন, “গান গাইছে খুব—অমিতা সেন—কাজ কেলে চলে এলাম।”

ভাল গানের প্রতি হিরণের দুর্নিবার আকর্ষণ তারপরে বহুবার বহুভাবে জেনেছি।

সেদিন গানের ধারা ফুরিয়ে গেলে কেরবার সময় আমি গৃহিণীর সঙ্গে হিরণের আলাপ করিয়ে দি।

সে-আলাপ সৌহার্দ্যে পরিণত হয় আরও বছর দুই পরে আমরা বাসা বদল করে দক্ষিণ কলকাতার বাওয়ার পরে।

সেই সময় যে তিন জন অবিবাহিত ও বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু আমাদের বাড়িতে নিয়মিত আসতেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অধ্যাপক নীরেন রায়। তিনি তখনও নাথের পরে চৌধুরী বর্জন করেন নি। আমরা তাঁর ডাক নাম নরীর সঙ্গে বাবু বোগ করে সম্বোধন করতাম। আর একজন ছিলেন জীবনময় রায়। ইনি ছিলেন সকলের জীবনদা। আর ছিলেন হিরণ। তাঁকে হাবল বাবু ডাকতে অভ্যস্ত হয়ে বাই।

এই তিনজনের সঙ্গেই বিশেষ প্রীতির সন্ধ গড়ে ওঠে। কিন্তু তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাতের অভাব ছিল না। মতানৈক্যের প্রকাশে মাঝে মাঝে তর্ক হতে হত। চরিত্রগত পার্থক্যের জন্তে আমাদের মনে প্রতিক্রিয়া বর্তাত ভিন্ন ভাবে।

নীরেনবাবু ছিলেন অধ্যাপক মাহুব। তাঁর গুণাকাজ্যের প্রকাশে থাকত শিক্ষা দেবার তাগিদ। তাছাড়া আমাদের মতো নিরপেক্ষ প্রোডা পেয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি মেলে বরতেন। শ্রীঅরবিন্দের ‘লাইফ ভিভাইন’ থেকে মার্কসবার পর্যন্ত নানা প্রেরে সমাকৌর্প সে সমস্যা ছিল আমাদের বোধের অঙ্গম। তিনি এলে খুশী হলেও ব্যক্তিবোধ করতাম না। অনেক সময় মনে হত আমরা ছিলাম উপলব্ধ মাত্র—আসলে তিনি নিজের মনকে তোলপাড় করে সংশয়শূন্য করার চেষ্টা করতেন এবং সমাধান না পেয়ে অতৃপ্ত থাকতেন। তাঁর অন্তরের প্রধান বিকোন্ডের কারণ হত ভালোবাসা ও প্রচার পাঠনের সঙ্গে মতানৈক্য। ভিন্ন মতামতের সঙ্গে আপোষ করা তাঁর ধাতে সহিত না।

জীবনময় রায় শিক্ষকতার বীতশ্রদ্ধ হয়ে চিকিৎসা ও গুরুবার কাজে বাহাল হয়ে যান। সেই সঙ্গে সাহিত্য চর্চাও চলে। আমরা দেখলাম তাঁর হোমিওপ্যাথি ও বাণ্যকৈমিক বড়ির চেয়ে রসেসিকিত কথা ও কোমল

স্পর্শেই অর্ধেক অস্থল সেয়ে যায়। বহু বাস্তবদের পরিবারে কারো কঠিন ব্যাধি হলে সেবা করার তাঁর কোনো ক্লাস্তি ছিল না। বয়স প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেলেও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন স্বয়ং কর্তে। তবু আমাদের মনে হত তাঁর অন্তঃকরণ ছিল বিধাদে ভরা। পানের মধ্যে দিয়েও এমন কোনো গভীর চুম্ববোধ প্রকাশ পেত বা আমাদের স্পর্শ করত।

হিরণ নিয়ে আপতেন নিছক আনন্দ। তিনি এলে বাড়ির ছেলে মেয়ে ও ভৃত্যরাও খুশি হয়ে উঠত। আমরা উপস্থিত না থাকলেও তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে হাত পা ছড়িয়ে এমনভাবে চক্ৰস্বাশ্রিত করতেন যেন সংসারটা তাঁরই। আমরা এলে অনেক ভনিতার পরে পাঞ্জাবির পকেট থেকে তুস্ত্রাপ্য কোনো খাদ্যবস্তু বেরিয়ে আসত। তারপর গুনতাম সেই বিশেষ মিষ্টান্ন বা ভাজা খাবার সংগ্রহ করতে তাঁকে শহরের কোন স্ক্রুয় প্রান্তে কোন গলি ঘূঁজির মধ্যে যেতে হয়েছিল। কোথায় কি ভালো খাবার পাওয়া যায় তিনি জানতেন। প্রিয়জনকে ভাগ না দিয়ে কিছু খেয়ে আনন্দ পেতেন না।

আকস্মিক খাবার ঠোঁড়া বার করার মতো মজার ঘটনার খবর দিতেন অনেক আড্ডার পর আচম্বিতে।

খাদ্যবস্তু ছাড়াও তাঁর আবিষ্কারের মধ্যে থাকত শহরতলীর ভাঙা মন্দির, কাঠের সঁকো, প্রাচীন বটগাছ, অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, পরিত্যক্ত পুকুরঘাট। বর্ণনা দিতেন ছবির মতো। পুরাতনের প্রতি তাঁর আসক্তি আটপাট। কিন্তু একদিন গুনলাম তিনি চোরখী পাড়ার নবনির্মিত থিয়েটারের শৌচাগারটি সকলের আগে ব্যবহার করবেন বলে বেরিয়ে গেছেন। দেখা হতে কবুল করেন যে পাড়ি চেপে গেলে সন্তোষ অসম্পূর্ণ থাকত বলে সারা পথ হেঁটে গিছিলেন।

হিরণের দরবারে কোনো অভিযোগ কখনও সময়ের অতিক্রমণে ডামাধি হত না। কবে কোন নিমন্ত্রণ বাড়িতে ভাল ফেলে দিয়ে মাছ খেয়েছি, বেগুন ভাজা খেয়েছি খোসা ছাড়িয়ে, কাউকে খাওয়ার অন্তে পীড়াপীড়ি করেছি—এই সব অপরাধের অন্ত ভৎসনার বিরাম ছিল না। কিন্তু তাতে তিক্ততার বদলে অভিমানের স্বর থাকত বলে আমরা বিরক্তির চেয়ে কৌতুক বোধ করতাম।

হিরণ ও আমি প্রায় একই সময় ‘পরিচয়’ পত্রিকার গোষ্ঠীভুক্ত হই। সুবীজনাথ দত্তর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন নীরেন দায়। ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে। হিরণ লিখতে শুরু

করেন দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে। শেলি ও এ-ই-র কবিতার বাংলা অম্বুবাদ আর বিশ্বপতি চৌধুরী রচিত 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ—গ্রন্থের সমালোচনা' লিখে তিনি প্রথম থেকেই পাকা সাহিত্যিকের সুনাম অর্জন করেন। ততদিনে আমি গুরুবারীর আসরের পাকা সভ্য হয়ে গেছি, কিন্তু লেখক হিসেবে নয়। নীরেনবাবু স্বধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় বলেন আমি আমার কর্মশক্তি খাটিয়ে গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিতে পারি। পত্রিকার বৈষয়িক দিকটি দেববার ব্যবস্থা হয়ে সিঁছিলো তখন, কিন্তু কেন জানি না, স্বধীন্দ্রর ভাল লেগে গেলো আমাকে। আমি বাংলা সাহিত্যের কিছুই জানি না শুনেও তিনি আমাকে আসরে ডাকলেন।

আমি রেখলাম অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ও দার্শনিক বসন্তকুমার মল্লিককে কেন্দ্র করে যে সকল গুরুগম্ভীর ও অটল প্রশ্ন আলোচিত হচ্ছে তার মধ্যে প্রবেশ করা আমার সাধ্যাতীত হলেও আনুভবিক টিকা টিপ্পনি ও বিভিন্ন প্রকৃতির সভ্যর উপস্থিতিতে আসর বেশ সরসরম হয়ে ওঠে। 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশের সেই প্রথম দিকে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর তরুণ লেখকরাও সদলবলে আসতেন। আর দেখতাম তুলসী গৌড়াই, প্রবোধ বাগচী, অপূর্ব চন্দ্র, সাহেদ হুয়াওয়াহির মতো রসজ্ঞ মজলিসী মানুষ।

নীরেন রায়, হিরণ, সিরিজাপতি, হারীতকুমার প্রভৃতি সভ্যরা পূর্ব পরিচিত বলে তাঁদের ভিন্ন শ্রেণীতে ফেলতাম। সুশোভনচন্দ্র সরকার, সত্যেন বোস ও বৃজটিপ্রসাদ বধন ঢাকা ও লখনৌ থেকে ছুটিতে আসতেন তখন তাঁদেরও এই শ্রেণীতে দলে ফেলতাম। তাছাড়া আরও অনেকে ছিলেন।

সকলে সমবেত হলে আলোচনা অনেক সময় মল্লিকদার আওতা থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ছড়িয়ে পড়ত। তখন হিরণ তাঁর প্রত্যাংগমতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পেতেন।

একবার কি কথায় সুশোভনবাবু বলেন অধ্যাপক ফিসার-এর মতে যারা বহু দেবতার বিশ্বাসী তারা স্বভাবত উদার হয়, আর যারা একেশ্বরবাদী তারা হয় গৌড়া এবং অসহিষ্ণু।

সেই কথায় মল্লিকদা জানতে চান শাক্ত বা বৈষ্ণবদের বহু দেবতার বিশ্বাসী বলা যায় কিনা। মল্লিকদার কথায় কেউ কান না দিলে তিনি আবার প্রিজালা করেন শাক্ত ও বৈষ্ণবে তর্কাৎ কী? হিরণ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "পাঁঠা আর লাউর মধ্যে বা তর্কাৎ।"

আর একদিন তিনি হঠাৎ একটা কাগজের ঠোঙা কাটিয়ে আসরের ঐক

অশ্রুতিকর বিতর্কের নিশ্চিন্তি করে দেন। সেদিন স্ববীজের প্রশস্ত বসবার করে দেশি বিদেশি পণ্ডিতদের উত্তেজনাপূর্ণ তর্কযুদ্ধের মাঝে এই বিস্ফোরণে সকলে হতবাক হয়ে যায়।

আসরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাঝে তাঁর এক একটি মজার মন্তব্যও অল্পরূপ বিস্ফোরণেরই মতো কাজ দিত। সে বিস্ফোরণ হত হালিগ— শব্দের নয়। উদাহরণ দিতে গেলে নিবন্ধটিকে ধারাবাহিক করতে হবে। বিতর্ক অনেক সময় উচ্চ ও পক্ষপাতভূত হয়ে উঠত, কিন্তু হিরণকে কখনও কোনো পক্ষে বোগ দিতে শুনি নি। তিনি নীরব থাকলেও মনে হত সব আলোচনার আগ্রহভরে অংশ নিচ্ছেন। তাঁর উপস্থিতিতে আসরের মেজাজ প্রসন্ন হয়ে উঠত বোধকরি ঐ একই কারণে।

স্ববীজ হারীতবাকে অপছন্দ করতেন তাঁর ষাট বাঁক্য প্রয়োগের প্রবণতার জন্যে, হিরণের অবাস্তব হাস্যকর উক্তিভেদে প্রচুর আনন্দ পেতেন।

একদিন এক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিতর্কের মধ্যে হিরণ বলে বসলেন তিনি কোথায় বেন পড়েছেন যে পরমাণু বিদীর্ণ হবার সময় ক্লোরোকর্ষ জাতীয় কোনো পদার্থ বিচ্ছুরিত হয়ে কাটার বেদনাকে সহনীয় করে দেয়।

আর একদিন শ্রীমানকৃষ্ণের কথায় নীরেন বলেন, আমি বুঝি না কেমন করে তির ভিন্ন ধর্মের মাধ্যমে একজন মানুষের সিদ্ধিলাভ হতে পারে। এ হচ্ছে অনেকটা এক ধর্ম থেকে রম নিয়ে হাউইর মতো আকাশে উঠে আবার নেমে আসা—তারপর অন্য ধর্মের বারুদ পুরে আবার পুনরুৎপাদিত গুঠা।

হিরণ বলেন, তা কেন? রমনের তিন দেশে কাচে ছড়িয়ে দেওয়া আলোর রশ্মির মতো সব রঙের ধর্ম একসঙ্গে মনের পর্দায় পড়তে পারে।

হিরণ 'দেশ' পত্রিকার বিশেষ সাহিত্য সংখ্যায় লেখেন নীরেনবাবু আমাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লেখকে পরিণত করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ পাই সম্বোধন নাই কিন্তু বাংলা ভাষার লেখা- শুক করার জন্যে আমি হিরণের কাছেই গুপ্তী। আমি প্রথম গ্রন্থ সমালোচনা করি ইংরিজী ভাষায়। 'পরিত্য' পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হবার পরে একদিন হিরণ আমাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যান। কবির নির্দেশে আমি বাংলায় লেখার চর্চা শুরু করি। আমার করা একটি পুস্তক-সমালোচনা প্রকাশ হয় বেশ কয়েকমাস পরে। সে গ্রন্থটি ছিল বাণীভ শরচিত 'অ্যাডভেঞ্চার অব এ ক্যাক গাল' ইন সাচ' কন পড'। আমার 'গুরুত্বপূর্ণ

রচনাভঙ্গীর সঙ্গে হিরণের সরস, প্রাঞ্জল বিজ্ঞপের কশাঘাতপূর্ণ উদাহরণে, সমৃদ্ধ সমালোচনা পদ্ধতির কোনো তুলনা হয় না, কিন্তু এইভাবেই আমার সামনে হিরণ বিরাট রবীন্দ্রসাহিত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করে দেন।

পত্রিকার সম্পাদকস্বরূপ রবীন্দ্র ও প্রবোধ বাগচী হিরণকে দিয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে সব গ্রন্থের সমালোচনা করিয়ে নিজেই এবং সেগুলো হতো আমার অতি মূল্যবান প্রণিধানের বস্তু।

রবীন্দ্র বলতেন হিরণের রচনাভঙ্গী হচ্ছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। সব ভালো জিনিসের কারণ বর্ণনায় তার না তবে আমার মনে হত হিরণের চরিত্রের ঠান্ডাধি ছিল তাঁর সাক্ষ্যের কারণ। রবীন্দ্র সাহিত্য অথবা রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো উক্তি শ্রান্ত বিবেচনা করল তিনি শাপিত ভাবায় বিজ্ঞপ বর্ষণ করতে ছাড়তেন না। কিন্তু সমালোচনার উদ্দেশ্যে ছিদ্রাঘেষণ করে অনর্থক বিষয় প্রকাশ করতেন না। প্রাণ পকাশ বহুয়ের সাহিত্যিক জীবনে হিরণের লেখার পরিমাণ খুব বেশি নয়। তবে ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদ থেকে শুরু করে তাঁর নানা ধরনের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। হিরণের মনীষায় পাশ্চাত্য শিল্পকলা, দর্শন ও সাহিত্যের অনেক দিকই যে প্রতিফলিত হয়েছে—একথাও সকলেই স্বীকার করবেন।

‘পরিচয়’ পৌত্তীয় বাহিরে হিরণের আরও যে কয়েকটি আড্ডা ছিল তার মধ্যে একমাত্র ‘পলিটিক্স ক্লাব’-এ আমার বাড়ায়াত ছিল না। পি ই এন ক্লাবের ভোজসভার আমরা একসঙ্গে যেতাম। সাংবাদিক, লেখক ও অধ্যাপকদের সে জনসমবাসে মহিলারা উপস্থিত থাকলেও হস্তপরিহাসে কিছুটা স্বাধীনতা নেওয়া চলত। একবার হিরণ সম্পাদক মণীন্দ্রলাল বহুকে সর্বসমক্ষে বললেন, “ভাণ্ডো মনি, খাবারের ব্যবস্থা যদি আরও ভালো না করতে পারো তাহলে তোমার বউকে নিয়ে পালান।”

আর একবার জুরেন মৈত্র আমার পাশে এসে বসতে কালিদাস নাগ এসে বলেন, ‘সব টাক মাথা এক ছোট হলে চলবে না’—

হিরণ তৎক্ষণাৎ বলেন, “ওদের ডেকরেটিভ ড্যান্স আছে—ধানার জন্তে টাকা লাগবে না।”

একবার পি. ই. এন. ক্লাবের এক অধিবেশনে খাওয়ার সময় নীরেনবাবু বললেন কয়েকটি ইংরিজী শব্দ যথা ‘কাইন’, ‘অককোস’ ইত্যাদি ইতিমধ্যে নিত্য ব্যবহার্য শব্দকোষে ঢুকে গেছে। বাঙালি মেয়েরা তো ‘লাইক মিসারেবল’ কথা দুটি না বলে পারে না—

হিরণ বললেন, “বুঝতে হবে যে-সব বাঙালি যেয়েবা নীরেনের আওতায় এসেছে তাদের তিনি নাঅহাল করে ছেড়েছেন।”

হিরণকে রাজ হুঁবার বিচলিত হতে দেখছি। একবার এক পূর্ণিমা-রাজে তাঁর উৎসাহে আমরা ছুঁজন আলিপুর চিড়িয়াখানার গেলাম সেখানকার নৈশ আবহের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে। হিরণ সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর স্বর্গত পিতামহের খাতিরে সহজেই প্রবেশাধিকার বিলে যায়। সব দিকে তাঁর সজর্ক দৃষ্টি প্রসারিত থাকে সঙ্গেও সেদিন বোধ করি শৈশবের স্মৃতি পেয়ে বসেছিল তাঁকে। পিঞ্জরের বাহিরের নিশাচরদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। মনের স্রোতেরে এয়ার ওয়ার যুগে বেড়াচ্ছেন এমন সময় একটি বড় সাপ আমাদের পাশ কাটিয়ে বিলের দিকে চলে গেল। সেই প্রথম দেখি হিরণ কোনো কৃত সঙ্কল্প থেকে পশ্চাদপসরণ করলেন। আমাদের ফিরে আসতে হল।

আর একবার হিরণ ও আমি ট্রামবোলে উত্তর কলকাতার সুবীজের বাড়িতে ‘পরিচয়’-এর আসরে যোগ দিতে চলেছিলাম। হিরণকে বড় অনমনস্ক মনে হয়। বয়সানের মাঝামাঝি পর্যন্ত এসে পাড়িয়ে উঠে বললেন, “এমন স্তম্ভের সন্ধ্যা নষ্ট করা যায় না—আমি একটু ঘুরে বেড়াব।” নেমে যেতে আমি হতবাক। সুবীজের প্রশস্ত বৈঠকখানার ঢোকা মাত্র কানে এল বুদ্ধদেব বহু হিরণকে অবধা রক্ত ভাবার গালিগালাজ করেছেন। অপরাধের মধ্যে হিরণ লিখেছিলেন যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের রচনার পুস্তক কবিতা রসোত্তীর্ণ হয়েছে—অনুকরণকারীরা সার্থক সৃষ্টিতে সমর্থ হচ্ছেন না। হিরণ ঠিক কি লিখেছিলেন স্মরণে নাই, কিন্তু উপস্থিত সভ্যদের সম্ভব্য শুনে মনে হয় বুদ্ধদেবের আক্রমণের রাজ্য তব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। হিরণ অবশ্য ব্যক্তিগত আক্রমণ গায় মাথাতেন না বড় একটা। নীতিগত সত্যটুক্য হলে গুরুজনদেরও ছেড়ে কথা বলতেন না।

তাঁর মা নিরুপমা দেবী বহুবিন অসুস্থ থেকে ১৯৩৮ সালের কেজুয়ারি মাসে মারা যান। হিরণের দুই অবিবাহিত মায়া ও বিধবা মাসী উষা চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর ননব) আমাদের ছজনকে নিকট আত্মীয়ের মতো স্নেহ করতেন। তাঁদের গিরিডি ও হিজলাবটের সংসারে একাধিকবার বাড়ির লোকের হাতেই থেকে এসেছি। গুরুজনদের সঙ্গে হিরণের চলন-বলনের ছুটি দিক চোখে পড়ত। মামাদের সঙ্গে ছিল হালকা রসিকতার সঙ্কট—মজার মজার কথা কাটাকাটি শুনে পেতাম।

বড় মামা এলাহাবাদে ডাক্তারি করতেন। আমি বলেছি মেজমামা
অল্প চিকিৎসক সত্যসথা মৈত্র ও তাঁর অল্প লোহারামবাবুর কথা।

মাসীমার প্রতি বিনয় ও শ্রদ্ধার ভাবটাই দেখতে পেতাম। সরোজিনী
নাইডু এলে হিরণের সলজ্জ সমীহ ভাব ফুটে উঠত। হিরণের পিতার
অকাল মৃত্যুর পরে ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত ‘তত্ত্ব কৌমুদী’ (১লা আধিন,
১৮৯১ শক)-তে লেখা হয়—“হেমন্তকুমার আশৈশব আদিপুর পঞ্চশালার
উদ্ভানে বর্জিত হইয়াছে। জনক-জননীৰ একমাত্র সন্তান হুতরাং এই সুরম্য
উদ্ভানে পিতামাতা ও উদ্ভানের প্রাণীসকল ভিন্ন তাঁহার আর কোনো
সঙ্গীই ছিল না। এরূপ অবস্থায় প্রতিপালিত হইলে মানব চরিত্রে যে-
ভাব প্রস্ফুটিত হয় হেমন্তকুমারেরও তাহাই হইয়াছিল। তাহার প্রাণ
কোমলতা এবং কবিত্ব পূর্ণ ছিল।

“হেমন্তকুমারের প্রকৃতি অধ্যয়ন করিলে, এক বিশেষরূপ দেখিয়া আমরা
বড় আশ্চর্য্যাম্বিত হই। তাহার প্রকৃতিতে কতকগুলি বিরোধী ভাবের বড়
আশ্চর্য্য সমাবেশ হইয়াছিল। একদিকে তাহার পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন
বহুবাহুবলিগের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা, অপর বাহিবে ভালবাসা প্রকাশের
চেষ্টার অভাব।

“হেমন্তকুমারের প্রকৃতিতে ভাবের গভীরতা অত্যন্ত অধিক ছিল। কিন্তু
জ্ঞানের দিকেও বেশ উৎসাহ ছিল। পুস্তক কিনিতে সে কতই না ভালবাসিত।
হেমন্ত যে কেবল জ্ঞান-পিপাসু ছিল তাহা নয়, তাহার ভিতর সৌন্দর্য্যবোধশক্তি
বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। শিল্প, সঙ্গীত ও বাস্তবে হেমন্ত বড়ই আকৃষ্ট
হইত।”

আমি হৃদীর্ঘ স্মৃতি তর্পণ থেকে কয়েকটি স্নাতক পত্রিকার অসংখ্য ভাবে তুলে
দিলাম পিতা ও পুত্রের মধ্যে মিল দেখাবার উদ্দেশ্যে।

হিরণ মাঝে মাঝে তাঁর ছেলেবেলার গল্প বলতেন। একদিন বললেন, খুব
শৈশবে তাঁর মারের পাশে বসে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর ধর্মোপদেশ শুনতে
শুনতে প্রসন্ন করেন, “সংসার মানে কি মা?”

আর একদিন তাঁর মনে পড়ে যায় স্মরেন মৈত্রের বিয়ের দিন সাতটা সন্দেশ
থেরেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের কথায় বলেন, তাঁর সবচেয়ে পুরাতন স্মৃতি হচ্ছে একজন
সিন্ধী ব্যবসায়ী তাঁর কন্ঠকে নিতে এসে বলেন যে তিনি আমেরিকায় পর্য্যটন
কাজের ব্যাডমিন্টন ব্যাট রপ্তানি করেছেন। আর একজন খেতাব বৃদ্ধ বঁকে

পড়ে আঙুল নেড়ে বলছেন, চটের ব্যবসায় অনেক টাকা করেন। তারপর একদিন হঠাৎ মনে হল এত ডলার জমিয়ে লাভ কি? সারা রাজি জেগে স্বামী স্ত্রী চেক কেটে কেটে সব টাকা বিলিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষে চলে এলেন। লোকটি এমন মৌড়া নিরামিষাশী ছিলেন যে বেগুন ভাজা খেতে খেতে বলতেন- “নাইস ম্যাডো”।

কলকাতার সংকীর্ণ আঁকা বাঁকা গলিগুলি হিরণের খুব বিষয়কর মনে হত। কিছুতেই বুঝতে পারতেন না শেষ পর্যন্ত সেগুলো কেমন করে বড় রাজস্ব হারিয়ে যায়।

আমি একদিন আমাদের বাড়ির মেয়ের ঘরে নতুন বই কিনতে দোকানে চুকেছিলাম। হিরণ সঙ্গে ছিলেন। কেনা বইগুলি হাতে নিয়ে তুকে বললেন, “ছেলেবেলায় নতুন বই বড় ভালোবাসতাম। সে-সব দিনের কথা কখনও ভুলব না।” অপরিহার্য যিঞ্জি দোকান, কিন্তু তাঁর মনে হত যেন স্বর্গ। নতুন ক্লাসে উঠেছেন। বই কেনার কি আনন্দ। সব কটা আলাদা করে তুকে দেখতেন।

শৈশবে দেখা শান্তিনিকেতনের স্থিতি তিনি ভুলতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কেমন করে সম্বোধে কাছে টেনে নেন সে কথা স্মরণ করতে তাঁর সব চেয়ে ভাল লাগত।

একদিন বললেন, “সেখানে ঘর বাড়ি আসবাব পত্র সকল কিছু নির্জীব পরার্থের মধ্যেও প্রাণের লাড়া অমুভব করতাম। একটি বাড়িতে বিশেষ কোনো ঘর ছিল যেটা মনে হত তাঁর নিজের আর অস্ত্রগুলো যেন কেউ কেলো রেখে গেছে দূর থেকে। সব কটা জড়াজড়ি করে থাকলেও একটাকে অন্ত্র বলে চেনা যেত।

আর একদিন বললেন, লম্বা হল ঘরে যেমন তেমন গোছের মক—কবি অভ্যাগতদের বললেন, “দৃষ্টপটগুলি হয়েছে সামান্য ও নিতান্তই অমুপযুক্ত। এমনকি আরককেও দেখা বাবে, কিন্তু রূপা ও সুর যে মারা রচনা করবে তাই হবে নাটকের পরিবেশ।”

তারপর ছুটি বালক ছদ্মিকের দড়ির দোলনায় তুলতে তুলতে গাইল—

“ওগো দখিন হাওয়া”.....

হিরণ পরে এই গান বহুবার বহুকণ্ঠে শোনেন কিন্তু সেদিনের মতো আনন্দ আর কখনও পান নি।

একমাত্র সরাসরি জাতীয় বিষয় ছাড়া অত্র কোনো প্রেত বা প্রাণী সম্বন্ধে

হিরণের কোনো ভয় ভব ছিল না। উনচল্লিশ বছর বয়সে বিবাহ করে তাঁর ঘুরে বেড়ানোর প্রবণতা কমে যায়। নতুবা তাঁর সঙ্গে প্রকৃতির শোভা দেখা অথবা ছবি তোলার অভিযানে ষাণ্ডয়া ছিল সৌভাগ্যের কথা। হিজলাবট, গিরিডি, ঘেরাছন-রাঙ্গপুর, ঘাটশিলা, ডায়মণ্ডহারবার, এলাহাবাদ, শান্তি-নিকেতন অথবা কলকাতারই উপকণ্ঠে যেখানেই টেনে নিয়ে গেছেন সেখানে আপাত সাধারণ দৃশ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এমন সব চমকপ্রদ সৌন্দর্য খুঁজে বার করতেন যে হতবাক হয়ে যেতাম। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটার ক্লাস্তি তুলে যেতাম।

হিরণের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে ষাণ্ডয়া হত সব চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ। তিনি আমাদের কবির খুব কাছে এনে দেন আর তাঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমি আশ্রম-বাসী ও প্রথম যুগের আশ্রমের পরিবেশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হই। সে পরিচয় সমৃদ্ধ হত হিরণের স্বত্বিকথায়।

একবার রবীন্দ্রনাথ গল্প গাড়ি করে কোথায় গিয়েছিলেন। ফিরে আসেন ক্লান্ত হয়ে। আমরা বথন প্রণাম করতে বাই তখন তিনি কোনো এক বাড়িতে রয়েছেন। টেবিলল্যাম্পে ধর আধ অন্ধকার করে বিজ্ঞান করছিলেন। তাঁর কাছে ছিলেন প্রতিমা দেবী। আমাকে কবি বললেন, “তুমি তো ‘পরিচয়’ গোষ্ঠীর লোক, সুধীন্দ্রকে বলো আমি তার ‘স্বগত’ বইখানার সমালোচনা করবো—জানো তো আজকাল নিশ্চিত হয়ে লেখবার ভেতন অবসর পাই না—বলতে পারবে তো?”

আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিই যে “আমাদের প্রতি শুক্রবার আসর বলে।

হিরণ বলেন, “আমল হচ্ছেন সবচেয়ে নিরমিত সভ্য।” তিনি কি কথায় আরও বলেন যে আমরা ছ’বার কালিম্পং-এর গৌরীপুর হাউসে মাসাবিককাল করে থেকে এসেছি। তখন কবি জানতে চান ব্রজেন কিশোরকে জানলাম কেমন করে।

হিরণ তখন টাউন ক্লাবের কথা বলেন।

কবির মনে পড়ে যায় সেদিন বাহিরের এক দলের সঙ্গে আশ্রমের ছেলেদের ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা ছিল। বনমালীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে সে গরুর দিল, “আমরা হু গোলে জিতেছি।”

কবি খুশি হলেন। জানতে চাইলেন আমি কি কি খেলি। উত্তর দিলেন হিরণ।

আর একবার জুলাই মাসে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে বাবার পরে তাঁদের আলোতে আমরা ধোয়াইর ওপর দিয়ে বেণ কিছু দূরে হেঁটে গিয়ে একটি দীঘির ধারে এসে বসিতি পেতে বসে বাই। ধোয়াইয়ের মধ্যে অসংখ্য জলের ধারা ও ছোট ছোট প্রপাতের কলোচ্ছ্বাসের শব্দের সঙ্গে অবিশ্রান্ত ব্যাঙের ডাক মিশে গিয়েছিল। আবিষ্ট হয়ে বসেছিলাম।

চমক তাগে হিরণ-এর কথা। তিনি বলেন, বসন্তকালে দেখবেন আর এক ধরনের সৌন্দর্য। তখন তাঁদের আলোতে আনন্দ বয়ে।

তারপর বলেন, অধ্যাপনার কাজ নিয়ে বধন আসেন তখন কবি তাঁকে বলেন, পিটি চাপড়ে প্রকাশ করতে না পারলেও ভালোবাসতে ও কৃতজ্ঞ বোধ করতে আনি। তুমি এই আয়পাকে ভালোবাসো। এখন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে একটা অন্তরঙ্গ সখ্য সৃষ্টি কবে নাও। ছোট ছোট সাহিত্য মণ্ডলী গঠন করো।”

হিরণ তাঁর মাকে হারান ১৯০৮ সালের ২৬শে কেজুয়ারি। সেদিন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। কবি অরেন মৈত্র গান করেন। প্রার্থনা করেন রজনী দাস।

সপ্তাহখানেক পরে আমি ধুবু—মমিতা সেনকে নিয়ে আসি। সে গান করার পরে হুস সাগর দীপার ভজন শোনা। শ্রীকৃষ্ণাসরে শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতা হেমলতা সরলায় স্মৃতি তর্পণ পাঠ করেন।

তারপর হিরণ হিজলাবট বাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে জীবনদা ও শঙ্কু সাহায্য সঙ্গে আমরাও বাই। ছোটমায়া ও মাসীমা বোধকরি আগেই চলে গিয়ে সংসার শুছিয়ে বসেন। সে বার হিরণ তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে ডুবেছিলেন।

আমরা হিজলাবট থেকে কিরে আসবার পরে হিরণ শান্তিনিকেতনে চলে যান। সে বছর অগাস্ট মাসের গোড়ার দিকে তিনি কিরে এসে বলেন, “বোলপুরে না গিয়ে ভুল করেছেন। কবি সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র সখ্যে আলোচনা করলেন আর তারপর দুবার বন্ধে মাতঙ্গম গান গেয়ে ছাত্র ছাত্রীকে বুঝিয়ে দিলেন যে তাদের সংস্কৃত উচ্চারণ ভুল।

কোনো কোনো লোক হয়তো ক্ষুব্ধ হবেন কারণ তিনি বলেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সাধনা করবার অচল সময় পেয়েছেন। তিনিও নিজেকে অনসাধারণের কোলাহল থেকে সরিয়ে নিতে পারতেন কিন্তু সে সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। অব্যবহৃত জনতা তাঁকে রেহাই দেয় নি।

কবি বঙ্কিমের প্রশংসায় শতবুধ হয়ে বলেন যে তিনিই প্রথম বাংলা পত্র সাহিত্যকে সংস্কৃত বচন পদ্ধতির বেড়ামুক্ত করেন।

তারপর কবি বলেন, বঙ্কিম তাঁর মতো তরুণের বৃষ্টিভার কিছুমাত্র বিরক্ত না হয়ে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধের মতো সাহিত্য আলোচনার মেতে যেতেন।

কবি আরও বলেন, “খামি দরজার কড়া নেড়ে কুছখাসে অপেক্ষা করতাম। কখনো কখনো উচ্চ কণ্ঠে হাসি কানে আসত। অগ্রজ সঙ্গীবচস্র ও বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময় এক সঙ্গে সম্ভাষণ করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাতেন। খালি গা—খুব সহজ সরল ছিল তাঁদের ব্যবহার।”

হিরণকে কথা দিতে হল বর্ষা মঙ্গল উৎসবে যোগ দিতে যাব। মধ্যে জুলাই মাসের গোড়াতে বর্ষার সময় বখন ঘুরে আসি তখন দেখি কবি আবার বাস পরিবর্তন করে ‘গুনচ’তে উঠে গেছেন। অনিল চন্দ্র তখন বিয়ে করে ‘কোনার্ক’তে রয়েছেন। পত্র বছর এই সময় কবিকে দেখেছিলাম মাটির বাড়ি ‘ভায়লা’তে বসে ছবি আঁকছেন।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরের ২রা—মীরাদি আর শঙ্খ সাহাও গেলেন আমাদের সঙ্গে এক গাড়িতে। সন্ধ্যার সময় বোলপুর স্টেশনে দেখলাম হিরণ নিতে এসেছেন। আগের মতো আমরা ‘বড়ন কুঠি’তে উঠলাম। পরদিন সকালে দেখলাম ঐনিকেন্তনের উৎসব। কবি সারাহিন ব্যস্ত থাকলেন। সন্ধ্যার সময় অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণানকে নিয়ে নাটক দেখতে এলেন। হিরণকে করেকটি নাচ ও গান যেন পাগল করে দিল। বতস্র মেগে থাকলেন শুন শুন করে গাইতে শুনলাম। পরদিন সকালে আমাদের নিয়ে গেলেন কবির কাছে। অচ্যুতানের পরিশ্রম সবেশ তাঁকে খুব প্রফুল্ল দেখলাম।

প্রথাম করে বসবার পরে কবি আমাদের প্রদর্শন করলেন ‘পরিশোধ’ নাটক কেন্দ্র লাগল। বললাম, ‘খুব ভালো, আগাগোড়া সবই ভালো লাগলো।’

হিরণ বললেন, এই নাটকের মধ্যে কথক নাচের প্রবর্তন অস্বস্তভাবে হয়েছে।

কবি বললেন, ‘দেখ প্রথম বখন কথক নাট্যেরটি এলো আমাদের এখানে তখন আমরা কেউ তার নাচ বরখাস্ত করতে পারি নি। উৎকর্ষ অভিনয়ী হাশোদীপক মনে হয়েছিল আমাদের। তারপর ও আমাদের মধ্যে থেকে ক্রমশ সঙ্গীতের অন্তরে প্রবেশ করতে শিখল। নিজেই বুঝতে পারল বাহ্যিক কোষায়। আশা ওয়া মেয়েটি নেচে এসেছে খুব ছেলেবেলা

থেকে লক্ষ্যের সাবেকি চলে। গালে আঙুল রেখে সে নাচ ঘেঁষে আমরা প্রথম প্রথম মজা পেতাম। ছোটরা তো খোলাখুলি ভাবেই হেসে ফেলত। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে গানের ছন্দে কোনো আড়ম্বর্তা নেই। শুধু শেখবার সুযোগ দেওয়া হল, আর শেষ পর্যন্ত সেও পরিবেশের প্রভাবে এসে গেল। আমার নাতনি হচ্ছে ‘জিনিয়াস’। কেমন করে সে নাটকটির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলে তাতো দেখলে। তবে সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে সত্যিকার কৃতিত্ব হচ্ছে বউমার। আমি যেমন করে ছবি আঁকি অনেকটা তেমনি করে আমরা চুপে ঘিলে গড়ে তুললাম। জানো তো, ছবি আঁকবার শিক্ষা আমি কোনোদিন পাই নি, বিশেষ করে রঙ প্রয়োগের। কিন্তু আমার ভেতরকার মন আমাকে বলে দেয় কোথায় ধামতে হবে আর কোথায় নিতে হবে মোড়। ঐ রকম করে আমি গানে অল্প সংযোগ করলাম আর বৌমা অল্প বিচ্ছেদের মধ্যে আভিষ্য ও দোষ জুটি সংশোধন করলেন। বেশভূষার পরিকল্পনাও হল তাঁরই। সাক্ষ্যের অন্তে মুখ্যত তিনিই দায়ী।

হিরণ বললেন, “তাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে কথার বজায়ের সঙ্গে নাচের ছন্দের সমতা রক্ষা করবার সাক্ষ্য, আলোচ্য নাটকে অনেক জায়গায় অল্প সংকলনের ছন্দোময় ইঙ্গিত গানের কথা ও সুরকে করেছে পরিপূর্ণভাবে আবিষ্ট, আবার অনেক জায়গায় সঙ্গীতের প্রভাব নৃত্যকে ছাড়িয়ে উঠেছে অনেক উৎসে।” কিন্তু আশ্চর্য এই যে এ দুয়ের মধ্যে বিসংবাদ কোথাও ঘটে নি। সমতাল বজায় থেকেছে অক্লান্ত ব্যাচক্ষুণ্ণ্যে।”

এই কথা বলে হিরণ প্রশ্ন করলেন, “গানে অল্প দেবার সময় আপনি বিশেষ কোনো নাচের ছন্দের কথা ভেবে নিয়েছিলেন?”

কবি হেসে বললেন, কেউ কেউ মনে করে তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রের সব রাগরাগিনী আয়ত্ত করেছেন। সে কথা ভুল। আসলে কোনোদিন তিনি সে রকম করে কিছুই শেখেন নি। কোনো কোনো গানকে সাবেকি শাস্ত্রমত সুরের অঙ্গুত বলে মনে হয় তার কারণ বোধহয় ছেলেবেলার কোনো শোনা গানের সুর তাঁর মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু কথা এসেছে অনেক বৎসর পরে।

কবি তাঁর ছেলেবেলার কতকগুলি অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করবার পরে বলেন ইউরোপে নিরানন্দময় কুয়াশা এসে বধন দিনকে রাত করে দিত, তখন তিনি গান দিয়ে দেশের আনন্দময় বলমলে রৌদ্রের পরিবেশ সৃষ্টি

করে নিয়ে তারই মধ্যে থাকতেন। সে সব দিনে সুর রচনায় তাঁকে সাহায্য করত ছেলেবেলার স্মৃতি।

বিলেতে থাকতে এক কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে পার্কের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলেন। ছদিকে গাছের শ্রেণী। মাঝখান দিয়ে কখন একফালি রোদ এসে পড়েছিল, তাই বেধে তাঁর মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার শোনা একটি গানের সুর বা এক পখিক গেয়ে যাচ্ছিল আবেদনাবাদের রোদস্তরা রাস্তা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কথা ও গান এসে যায়।

আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ তাঁর কাছে ছিল না সে সময়ে। তিনি পর পর দুটি গান গাইলেন। আমরা মুগ্ধ হলাম তাঁর কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে।

কবি বললেন, তাঁর কোনো গান একটি কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতার ফলে সৃষ্টি হয় নি। তিনি যখন “কেন বাজাও কাকন কন কন কত ছল ভরে” গানটি রচনা করেছিলেন তখন প্রত্যেক কোন মানুষকে দেখেন নি। দেখা সম্ভবও নয়, কেন না আমাদের দেশের যে মেয়েরা কলসী নিয়ে জল আনতে যায় তাদের সোনার কলসী বইবার মতো অবস্থা নয় আর অবস্থা থাকলেও হাত এমন অসুস্থ হয় যে কাছাকাছি এলে আবেগ অন্তর্ধান করে।” বললেন, আসল কথা তাঁর ভিতরকার মানুষটি সৌন্দর্যের এমন একটি মিল চাইছিল আর তার সেই দুর্নিবার চাওয়া থেকে গানের সৃষ্টি হল।

আমরা নিবিষ্ট হয়ে শুনছিলাম। কথা বলবার সময় হাত তুললে জোয়ার তটভাড়া আত্মনের মধ্য দিয়ে কবি ও পেশীর স্তম্ভ পঠন দেখে একবারও মনে হয়নি যে অবসর চিত্ত রোগজীর্ণ বৃদ্ধের সান্নিধ্য বসে আছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর হিরণ বললেন, “আমরা সব চেয়ে খুশি হয়েছি ‘পরিশোধ’ এর শেষের গানটিতে প্রথাগত করুণ সুর দেওয়া হয়নি বলে।”

কবি বললেন, আগেকার গীতি নাট্যগুলি বেশির ভাগ হতো কদম্বারসের জোড়াজোড়। ‘চণ্ডালিকা’ হচ্ছে প্রথম গীতিনাট্য যার মধ্যে সর্বান্বন পরিকল্পনাটিকে একটি অখণ্ডরূপ দেওয়া সার্থক হয়েছে। ‘চণ্ডালিকা’তে স্বর-মাধুর্য আর গতি একেবারে নির্দোষভাবে মিশেছে। এখানে তাঁর শ্রেষ্ঠ গীতিনাট্য।

এরপর কবি তাঁর ইওরোপ ভ্রমণ ও চিত্র প্রদর্শনীর কথা বলে বিদায় দেবার সময় মধুরভাবে হেসে বলেন, “আমি চলে যাবার পরে হয়তো একে একে সবাই যাবে—আমার উপভাস, ছোট গল্প, কবিতা কিছুই থাকবে না, কিন্তু কয়েকটা গান দিয়ে গেলাম বা কোনো দিনও যাবে না।”

সেই আশাদের ছুজনের রবীন্দ্রনাথকে শেব দেখা। বছর দুই পরে আমি স্টুটগল খেলতে গিয়ে হাঁটু ভেঙে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম। হিরণের কাছে খবর পাই কবি খুব অসুস্থ। সেবারেও তো তিনি কঠিন পীড়া থেকে আরোগ্য লাভ করে সবল কঠে গান শুনিয়েছিলেন। ভাবলাম এবারেও সেয়ে উঠবেন। হিরণ একদিন এলেন বিকেলের দিকে। উদ্ভাস্ত চেহারা। বললেন, রবীন্দ্রনাথ চলে গেছেন। তাঁর মৃত্যু ঘটেছে ছপুর বারোটার। তিনি নিমতলা থেকে সটান আমাদের বাড়ি চলে আসেন। তাঁর স্ত্রী তখন সারজিলিঙে। হুঃসহ শোকের সময় আর কোথাও না গিয়ে আমাদের কাছে এলেন কারণ তিনি জানতেন যে আমরা তাঁর বেদনার পতীরতা বুঝে নিয়ে কোনো সাহসী দেবার চেষ্টা করব না। তাঁর মাতের মৃত্যুর সময় আমাদের কাছে এসেছিলেন ঐ একই কারণে। তখন তিনি অবিবাহিত। কদিন স্থরেন মৈত্র ও অমিতা সেন (খুঁ)-এর রবীন্দ্র সঙ্গীত ও সুরমাগর-এর ডাকনের মধ্যে ডুবে থেকে হিজলবটে চলে যান। সেবার জীবনদা, শঙ্কু ও আমরা ছজন সঙ্গে থাকি। শঙ্কুবাবু আমাদেরই মতো নীরব থেকে সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারতেন। জীবনদা নিয়ে গেলেন গান। তারপর শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে তিনি তো খুব কবিকেই পেয়েছিলেন।

এখনও মনে পড়ে চার পাঁচ মাস পরে আমরা ছজন এক পমলা বৃষ্টির পরে ধোয়াই-র মধ্যে ছুটে গিয়ে ছোট ছেলের মতো মহানুভূতিতে ছাতার বাঁট দিয়ে কাকয়ের চাঙড় ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট জলের প্রপাতগুলোকে বড় করে দিছি।

হিরণ বিশ্বভারতীর শিক্ষকতা ছেড়ে কলকাতার চলে আসেন তাঁর বিবাহের পরে, কিন্তু শান্তিনিকেতনে যাওয়া অব্যাহত থাকে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে সেখানকার আকর্ষণ অনেক কমে যায়।

তাকে নিরমিতভাবে পেরে 'পরিচয়' আসরের শ্রীবৃদ্ধি হল। তাঁর কল্যাণে আমি রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণুর মতো দুর্বোধ কবিরের শক্তি ও সম্ভাবনা লক্ষ্যে লচেন্তন হলাম।

মতামত প্রকাশ করতেন সংক্ষেপে। একদিন যেমন বললেন, রবীন্দ্র তাঁর শেষের ব্যবহারে খুব স্বল্পশীল। ধূর্জটিবাবু অসাবধানী। আপনি এখনও গুরুত্বপূর্ণী কমাতে পারেন নি।

কিন্তু কোনো বিশেষ রচনার প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করতেন বেছে বেছে ভাল লাগা শব্দবোজনাগুলি আবৃত্তি করে। একদিন গুন গুন করতে করতে শব্দে ঢুকলেন—

আহা যদি আজ পুষ্পকে হানো অগ্নিবান
 মন্থিয়া নীল অগ্নচক্র ঘর্ষরে
 লুকাব না মোরা প্রাকার ছায়া বা গহ্বরে
 জানি জানি তুমি শতুনের গালে প্লক আনো—

হিরণ বলেন পুষ্পকে বানে পুষ্পক থেকে। এই নিয়ে সুধীশ্বর সঙ্গে কথা
 হয়। তিনি বলেন, এটা গুরুতর জট। পরে বিষ্ণু স্বয়ং শব্দব অর্থোদ্ধার
 করে তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন তাঁকে। অর্থ বাই হোক হিরণ-এর ভালো লেগেছিল
 শব্দের বংকার।

সরোজিনী নাইডু এসে আমাদের আসর জমাতেন মাঝে মাঝে। একবার
 সুধীশ্বর তাঁকে নিজের রচিত বাংলা কবিতা পড়ে শোনান। তিনি শব্দের
 অর্থ না জেনেই কেবলমাত্র শব্দের ছন্দ শুনেই মুগ্ধ হয়ে আমাদের সুধীশ্বর পিতা
 ও পিতৃব্যের কথা শ্রবণ করিয়ে দেন। একজন ছিলেন প্রখ্যাত বাঙ্গালী আব-
 একজন ছিলেন বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা।

সেমিন বাড়ি ফেরার পথে হিরণ বলেন, “পড়ার শুধে ‘অর্কেট্রা’ প্রাপবস্ত
 হয়ে উঠেছিল।” তারপর ট্রায়ের সারা পথ অজ্ঞানত্ব হয়ে থাকলেন।

বিলিভী ব্রহ্মসঙ্ঘাতের প্রতি আসক্তি বড় কম ছিল না হিরণের। ভালো
 কনসার্ট হলে হাজির হতেন। আরও ভালোবাসতেন ইউরোপের প্রাচীন
 গির্জার রঙিন ছবি অঙ্কিত কাঁচ, দুর্গ, প্রাসাদ (কাসল) ও সরাইখানার ছবি।
 আমরা বিলেতে গেলে লণ্ডনের চেয়ারিং ক্রস অকল থেকে তাঁর জন্তে
 কপায় প্লেটে ছাপা ছবি সংযুক্ত প্রাচীন দুর্গাপা বই সংগ্রহ করে আনতে
 হত। তাঁর ছোট পাঠাগারে বেথতাম ওরাইড ওয়াল্ড ও জিওগ্রাফিকাল
 পত্রিকার বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি ভারতবর্ষের বাহিরে না গিয়েও
 সেখানকার শিল্প ও স্থাপত্য সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের সকলের চেয়ে বেশি
 জানতেন। অবশ্য সুধীশ্বর ও সাহেদ সুরাওয়ারির কথা বাদ দিয়ে
 বলেছি।

এ আনা নীরব চৌধুরীর সংগ্রহর মতো বিতীর্ণ ছিল না কিন্তু বেঁটুকু
 জানবার ক্ষেত্রে আগ্রহ ছিল তার চরিতার্থে ভক্তের ধরদী মন নিয়ে নিতৃত্তে
 অধ্যয়ন করে গেছেন।

নীরব চৌধুরীর পাণ্ডিত্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁর বেলতলার
 আভ্যন্তরীণ দিলীপ সান্তাল ও আমাদের ধরে নিয়ে যেতেন।

পরে নীরববাবু যখন আকাশবাণীর কাজ নিয়ে দিল্লী চলে যান তখন

অবশ্য মহানবীশ (‘পরিচয়’পৌষীয় প্রাক্তন সভ্য) তাঁরই নির্দেশে আমাকে নীরদবাবুর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নতুন করে আলাপ করিয়ে দেন। তখন নীরদবাবুর ছেলেদের ইউরোপীয় ওয়াইন ও ব্রিটিশ চীনা মাটির থালাবাটি সম্বন্ধে জানের পরিচয় পেয়ে থ হয়ে পড়ি।

হিরণ পণ্ডিত ছিলেন না। তাকে মনে হতো উপাসক।

এক সময় ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ও স্থাপত্য সম্পদে সমৃদ্ধ স্থানগুলি তদন্ত করে দেখে বেড়িয়েছিলেন। সেইসব পর্যটনের স্বত্তি কোনোদিন রান হয় নি। অনেক সময় ঘেঁষেছি তাঁর প্রিয় মারেস পাইড ও টাইম টেবল খুলে বসে আছেন। জানতাম তখন কোথাও বাবার সভাবনা ছিল না—স্বরণ করেই আনন্দ পেতেন।

আমি জিণ দশকের এক সময় যখন পূর্বভারতের প্রাচীনতম খেলার সংস্থা টাউন ক্লাবের ক্রিকেট দলে ভরতি হই তখন দেখি হিরণ কর্তব্যাক্তি সকলের পরিচিত। তিনি নিজে খেলতেন না কিন্তু বহুদিন থেকে এই ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমি দেখলাম তিনি তাঁর শৈশব কাল থেকে সেদিন পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে-সব ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ও টেনিস খেলোয়াড় ঘেঁষে ঘিষে নাম করেছেন তাঁদের অনেককে দেখেছেন এবং বিশেষজ্ঞদের কথা শ্রবণে রেখেছেন।

সেদিন আমার লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ে তিনি বা লিখেছিলেন তার একটি অংশ তাঁর ভাবাতেই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—“টাউন ক্লাবের অঙ্গ বৃদ্ধান্ত বা গিয়েছেন তা আরো বিশদভাবে হিলে ভালো হত। সারদারঞ্জনরা কম তাই গোড়া থেকেই ছিলেন নাকি? আমার মনে পড়ে ১৯২৪ সালেও যখন আমি রোজই-মাঠে বেতাম বিকালে, প্রমদারঞ্জনও আসতেন ও আমাদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করতেন। চিত্তরঞ্জনের বাবা জুবনমোহন যে টাউন ক্লাবে আসতেন তা অবিস্মৃত মনে হয়। এসব ব্যাপার সম্বন্ধে তথ্য কোথায় পাওয়া যায়? ক্লাবের পুরনো নথিপত্র কি দেখা যেতে পারে? অধ্যাপক বিপিনবিহারী জুবন ছিলেন—কটকে ও ভাগলপুরে। বর্ধাবধ খবর সংগ্রহ করা অতি আবশ্যিক। ভেবে জানাবেন—ইতি হাবল।

সেদিন শান্তিনিকেতনের আলবোলা আসরে ডঃ মণি মৌলিক বললেন তিনি যখন ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন-এর কাজ ছেড়ে দিয়ে ভারত সরকারের কাজে বিদেশ যাচ্ছেন তখন হিরণকে তাঁর আরপার বহাল হতে দেখে বলেন, “মশাই আপনি সাহিত্যিক মানুষ—আপনি কি এই সব বৃত্ত

স্বার্থপর ব্যবসায়ীদের কাছে স্বত্তি পাবেন?" উক্তরে হিরণ বলেন, তাঁর চাকার ধরকার।

তারপরে আমি আর একটি বাণিজ্যিক সংস্থার সম্পাদনার কাজ তাঁর কাছে চাপিয়ে দি।

উক্তর ক্ষেত্রে দেখি তিনি বিভিন্ন চরিত্রের স্বার্থাধেয়ী সভ্যদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলেছেন। তাঁর কাছে বুরছর খনি মালিকদের মানবিক দিকটাই বড়।

রথীবাবুর আত্মান সঙ্কেত হিরণ বিশ্বভারতীর চৌহদ্দির মধ্যে বাড়ি করেন নি বেহেতু সেখানে আমাদের বাড়ি ছিল। উৎসবের সময় অথবা সভাসমিতির কাজে তিনি সেখানেই উঠতেন। আমরা তখন কাজের তাগিদে বড় একটা আসতে পারতাম না। রিক্সাচালক থেকে শুরু করে অনেকেরই জানত বাড়িটি হচ্ছে তাঁর। যাবার সময় আসবাব পঞ্জের ওপর নিজের নাম লিখে আমাদেরও সে কথা জানিয়ে দিতেন। এমন কি কড়া ভাষায় নির্দেশ লেখা থাকত কোনো জিনিস যেন স্থানচ্যুত না হয়।

পরে যখন অবসর নিয়ে এখানে থাকতে এসে বাড়ির ঘর বাড়িতে বাগানকে স্নানর করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালাম তখন আর এলেন না। স্বাস্থ্যের দোহাই দিলেন। কিন্তু আমরা জানতাম যে একটি অপ্রোপচারের পরে সম্পূর্ণ স্নান হয়ে বাসে ট্রামে কলকাতা শহর চলে বেড়াচ্ছেন।

বুঝলাম তিনি আত্মমের সজ্জিসম্পন্ন পরিবর্তিত রূপ দেখতে চাইছেন না।

আমরাই যেতাম তাঁর কাছে। দেখতাম শরীরে বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা গেলেও মন পূর্ণ মজ্জায় তাক্সা আছে। ভাবতাম হিরণ গড়িয়ার নতুন পরিবেশে সাধারণ মানুষের ছোটখাট অকিঞ্চিতকর সমস্তার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে কেলে বেঁচে থাকবার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। তাছাড়া দেখতে পেতাম নতুন যুগের তরুণ শিল্পী ও সাহিত্যিকরা তার কাছ থেকে অল্পপ্রেরণা সংগ্রহ করতে আসতেন। বোধ করি এঁদের দ্বারা পবিত্রত থাকার ফলে তাঁর বৈবরিক সমস্তা ভুলে থাকার সুবিধা হত।

আমাদের দিক দিয়ে বলতে পারি যে একে একে অনেকেই তো চলে গেলেন কিন্তু হিরণও যেতে পারেন সে কথা ভাবতেই পারি নি। মনে হত তিনি চিয়নবীন।

বটুক ছিল সেই আপনজন

বিজন ভট্টাচার্য

[বটুকবাবুর ওপরে এই লেখাটা বাবা শেষ করে যান নি এবং এটাই বাবার শেষ লেখা। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবার কাছে লেখাটা চেয়েছিলেন নভেম্বরের শেষ দিকে। বাবা বটুকবাবুর ওপরে কিছু লিখতে চান নি এত তাড়াহাড়া। কোথাও কোথাও বলেছিলেন—অসম্ভব কষ্ট হত বাবার। এবং সেই রাত থেকে সবকিছুই কিয়কম অস্তরকম হয়ে গিয়েছিল। সকলেরই একটা করে মরে যাওয়ার হিসেব থাকে। সেই হিসেবটা পাণ্টে গিয়েছিল। আমাদের এবং আমার ছৌ প্রণতিকে বাবা অনেকবার কথাটা ইতিমধ্যে বলেছিলেন। তবে এভাবে, ১৮ আশুয়াবি ‘মরাটাদ’ করার পরদিন সকালেই কিছু হতে পারে এ কেউ ভাবতে পারে নি। যেমন চলন্ত ট্রেনে বটুকবাবু ঐভাবে চলে যাবেন সেটা কেউ ভাবতে পারে নি। বাবা বা বটুকবাবু—কারোই মরে যাওয়ার ব্যাপারটাতে খুব আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ইচ্ছে না থাকলেও কোনো কোনো কাজ এড়ানো যায় না।

লেখাটি বদা-মাজার কথা ছিল পরে। ‘মরাটাদ’ হয়ে যাওয়ার পরে। নানা আয়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা। লেখার শুরু লেখা-চাওয়াব চিঠির হুপাশে। সব লেখা বোঝা যায় নি। পাঠোচ্চায়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন তপন বিশ্বাস। এবং ‘কবচকুণ্ডল’-এর অন্তান্ত সমস্তবৃন্দ। তাঁদের ধন্যবাদ।

—নবাক্ষ ভট্টাচার্য]

শিতলাই থেকে সাধার্ন এন্ড্রিয়া—কালিদহ থেকে কলকাতা—জয় হওয়ার পর আলো হাওয়া জল বাতাসের অনেক সংমিশ্রণ অনেক রং রূপ রেখার হাসি তন্দ্রাজল—সবটাই প্রাকৃতিক—বহুবিক্রিয় হয়ে বেড়ে ওঠার পক্ষে বা অসুস্থ—বটুককে তৈরি করেছিল—যে সৃষ্টি হয় একটা পাছের পাতা বা

একটা পাখী, তার নিজের হাঁদে। কিন্তু মাহুঘের সন্তান তো আর পাতা বা প্রাণী নয়—সংস্কার সে অস্বীকার করতে পারে না, তারপর চোখে দেখে আর কানে শুনে তার নিজস্ব বে বোধোদয় হয়—তারও ভাঙনা আছে—তাবপর প্রাণগত লালনপালন পর্বের পর মাহুঘের মাঝে সামাজিক সংবিধান অমুযায়ী তাকে বেঁচেবসতে থাকতে হয়—ব্যক্তিসত্তা আর সামাজিক সত্তার নিরন্তর জ্বলের মাঝখানে বিধিনিষেধের পরশ্রোতে তাকে পথ কেটে কেটে চলতে হয়—ব্যক্তিসত্তা অমোঘ হয়ে উঠলে সমাজ তার পথ ছেড়ে দেয়, অন্তর্ধারণ কুটোর মতই ভাসিয়ে নিয়ে চলে—যরা গরু, ভাসান ভেলা, পোড়া কাঠ বা কচুরিমানার মতই। সোঁত—সোঁতের টান। ছুটো সোঁত—ছুটো টান। একটা ওপরে ভাঙে, অন্যটা নীচে কাটে। প্রাকৃতিক দৈবছবিপাকের চাইতেও যেটা অলঙ্ঘ্য আরও ভয়াবহ, আরও নৃশংস। ছকমন্ডী জীবনে সাধারণ মাহুঘের সঙ্গে শিল্পীও ওপরের চেউ ধরে হাবডুব খায়। শুধু প্রভেদ এই যে সাধারণ মাহুঘ যখন সেই ধর চেউরে আচ্ছন্ন হয়, কষ্ট পায়, শিল্পী মাহুঘ তখন সংস্কৃত উপরতলের সর্বাঙ্গিক এই বিস্তাতি দেখে গহীনে নামে—স্রোত বেধানে ক্ষুরধার—an alienated involvement—যেটা তার শিল্পসৃষ্টির পক্ষে সহায়ক।

মহুঘের জীবন-বৈরাগী বটুক ছিল এই গহীন জলের মাহুঘ। অতিমাত্রিক সংবেদনশীল বিধায় আত্মাত্তীক শব্দের মত, কতকটা জীবনানন্দের যতাবী, ক্ষেত্রে কর্মে নও তৎপর, তুলো অভাবের আউল বাউল। মাহুঘের চাইতে পাছপালা পতঙ্গকার বটুক ছিল বেশী অন্তরঙ্গ। ব্যবধান জেনেও এদের অসহায় অবস্থা বটুককে পীড়া দিত। ভিতর কোতুহলের পরই তার আসত এক বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের অবস্থা—অপেক্ষে থাকতে তলিয়ে যেত—অতলাস্ত এক গহীনে।

সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যে বটুকের সুগভীর জ্ঞান ছিল। বৈজ্ঞানিক অমূল্যজ্ঞানী বন কুয়ের ব্যাঙ না, সাগরের ব্যাঙই সংসারের এই যন্ত্রস্তান মার্কসীয় দর্শনের বীক্ষণে পরে আরও ভাবের হয়ে উঠেছিল। তাই যেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বিবাহীন আত্মগত্য সম্বন্ধে সামগ্রিক এক বিশ্ববীক্ষা বটুককে জীবনে ও কর্মে দীক্ষিত করেছিল। যতপি পাখীদের কথা সে এক-দিনও ভুলে যায়নি। আমার বুলবুলি আর বৌ-কথা কও পাখীদের সঙ্গে একাকী আলাপনে আমি নিজে তা প্রত্যক্ষ করেছি।

আমাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে বটুককে হারিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক

পরিমণ্ডলে যে ক্ষতি হল তা আজ পরিমাপ করা যাবে না। বোম্ব ছিল না, তার বোম্বোদয় হবার প্রায় ওঠেনি। লোকসান দিয়ে বিজ্ঞ হবার আজ আর কোনো অবকাশ নেই। তবু শিল্পকলার উত্তরসূরীরা যদি এই অপচয় প্রতিরোধে দৃঢ়বদ্ধ হন, সার্বিক কল্যাণে সম্ভাপ-বদ্ধ মন যদি শিল্পজীবনের পরিসর কাঙ্ক্ষকর্মে বাধা-মুক্ত করেন, তবেই এই ক্ষতির আংশিক পরিপূরণ হতে পারে।

গোষ্ঠীর দায় আজ এই দুর্গত বেশ ব্যষ্টির কাঁখে বর্তেছে। নিরক্ষর, অসাক্ষর মুখ জনসাধারণের কিছু করার নেই, ভাববার নেই। বা কিছু করার আছে শিক্ষিত ভ্রমসমাজের; বিশেষ করে সেই অগ্রসরমান শ্রেণীর মানুষদের দ্বারা বিজ্ঞানী চেতনায় বোড়সওয়ার। তাঁদের প্রাগ্রসরমান পরিক্ষেপের সাথে সাথে শিল্পী তার তুরী ভেরী বাজাক, এ কি তাঁরা চান না? না কি তাঁদের কমিট-মেটের রকমকের অমুখ্যারী শিল্পীরা সব বরবার হয়ে যাবে? স্বরপ্রামের কোনো জাতপাত নেই। বিশেষ করে যে স্বরগ্রামে প্রবহমান জীবনের গতিছন্দ আছে। জীবনের গান।

এখানেই পরিপোষণার প্রয়োজন। ফুলের বাহারেই বাগানের সমৃদ্ধি। পেছনে তার পরিচর্যা আছে এক মালি, আর আছেন মা মাটি।

আর এখানে ফুলগাছটি মুড়িয়ে ধেতে আশেপাশে দ্বারা ঘুরে বেড়ান মালিটা এমন বোকা যে তাঁদের গলার কোনো তেকাটা পরিয়ে দেয় নি।

সমাজে শিল্পীর কবর ফুলবাগের কোনো রডোডেনড্রনের চাইতে হেলা-কলার নয়। 'হুর্জাগাবণত আমাদের' দেশে সাধারণ মানুষের অসাক্ষর হুবে শিল্পী সম্পর্কে এই সম্ভ্রমচ্চক মনোভাব তাঁকূরের মত স্বীকৃত হলেও শিক্ষিত সমাজের কন্ট্রোল টাওয়ারের হর্জাকর্জাবিধাতাদের দৃষ্টিতে এই সত্য আজও অপরিচ্ছন্ন। অবশ্যই শিল্পীরও জাতভেদ আছে। হুযোগদ্বানী শিল্পীর সর্জিতা সমাজের যে কোনো আর্ধপরকেই লক্ষ্য দেবে। কিন্তু এটা বৈপরীত্য। এই নিরিখে সব শিল্পীর জাতবিচার করা ভুল হবে। তাই সমাজের ছোটবড় যে কোনো শিল্পী সম্পর্কেই সচেতন পরিপোষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কেননা শিল্পীপ্রাণের এই অমুভবী সত্যের নিরীক্ষা করে বৃহত্তর কল্যাণে এই ইচ্চেই অনমানসকে ঢালাই করতে হবে। বিজ্ঞানী থেকে কবি—সমাজের সেবার সবাই শিল্পী, কারিগর। প্রতিমার চক্ষুদানের মনোজ্ঞামনায় যে শিল্পীই প্রবহমান জাতকুল নিবিশেষে তিনিই প্রব্ধ, তিনিই বরণ্য, তিনিই ব্রাহ্মণ।

স্বতন্ত্র্য প্রকৃত.....

বিশ্রুত করোটির রক্তপথে ফাটা আড়বাশিটি পঙ্কজুতই বাজাবে ভাল। জল

হাটি হাওয়া জ্যোতিরিন্দ্রকে কোনো বন্ধনা করবে না। অতীত একটি লাশকাটা ঘর। স্পন্দনহীন শবের ঘেঁষে নবজীবনের গান।

জানি, সবই নশ্বর। সবই তাৎক্ষণিক। তবু আপনজন চলে গেলে কষ্ট হয়।

বটুক ছিল সেই আপনজন। আমরা তাকে কতটুকু চেয়েছিলাম জানি না, সে কিন্তু আমাদের আপনার করে চেয়েছিল। তার কথা কাব্য গানে সেই আকৃতিই সোচ্চার। সেই প্রাণ, সেই আত্মা। আমাদের দৃষ্টি, আমাদের প্রতি—গোটাটাই অস্পষ্ট, ঝাপসা ছিল। তাই আমরা দেখতে পাইনি, শুনতে পাইনি। কি কতটা ক্ষয়ক্ষতি হল তাও আমাদের কাছে আশুও পরিষ্কার নয়। আজ শুধু আছে একটা রিক্ততা। কিন্তু বিস্তৃত যে তার রিক্ততাবোধও অর্থবহ নয়। শিল্পী ও শিল্পের স্বপক্ষে এখানেও কোনো অস্বীকার নেই।

.....

বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় গত বছর ৬ ডিসেম্বর, স্টুডেন্টস হল-এ। ‘পরিচয়’ ও কয়েকটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান সৈনিক মিলিতভাবে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের স্মরণসভা আহ্বান করে। বটুকদার “আম্মার সহোদর” ও চার দশকের কয়েকজন বিজ্ঞানদা ছিলেন সেই সভার প্রথম বক্তা।

হল-এর ছুধারে চেয়ার, মাঝখানে প্যাসেজ। অল্পক্ষণ আমি প্যাসেজের লাগোয়া একেবারে শেষ সারির চেয়ারটিতে বসেছিলাম। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করছেন। টলমল করতে করতে বিজ্ঞানদা ভাষাস থেকে নেমে এলেন। বিশেষ প্রয়োজনে এখনই চলে যাবেন।

পাখির ডানার মতো ডান হাত আর কাঁধের চাদর ঝাপটাতে ঝাপটাতে বাঁ হাতে সজীর বাহু শক্ত করে চেপে ধরে বিজনদা আসছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়ে বাওয়ার দ্রিষ্ট কোমল একমুখ হেসে ডান হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—‘কেমন আছ ?’

হাত ধরে বললাম—‘ভালো।’

করপল্লবে একটু চাপ দিয়ে বিজনদা রঙনা হওয়ার উদ্ভোগ করত্রে বললাম—‘সিখছেন তো ?’

কথা ছিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের স্মরণে ‘পরিচয়’-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। লেখা চেয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলাম।

হাসিমুখে বিজনদা বললেন—‘লেখা তো উচিত।’

সভা চলছে। বক্তৃতারও হীরেনবাবুর চোখ বুঝি আমাদেরই দিকে। শুধু বললাম—‘লিখবেন।’

কিছু নরম সেই হাসিতে মুখ স্তরিয়ে ঘাড় নেড়ে বিজ্ঞনদা চলে গেলেন।

লেখার জন্য তাগাদা বিজ্ঞনদাকে আগেও দিয়েছি। নানা সমস্যা নানা উত্তর পেতাম। কিন্তু “লেখা তো উচিত” এমন কথা তাঁকে একবারই বলতে সুনাম। আশুও ভাবি কেন সেদিন এমন বলেছিলেন।

নিঃসঙ্গ বিজ্ঞনদার পক্ষে বটুকদার বৃত্ত কতখানি তা আমরা জানতাম। এমনকি, বটুকদার সম্পর্কে বিজ্ঞনদা যে এখনই কিছু লিখে উঠতে পারবেন—তেরন ভয়সাও সকলের ছিল না। একটা চিঠি লেখার কথা ভাবছি কয়েকদিন, কিন্তু তার বরান কিছুতেই মনোমতো হচ্ছে না।

এই পরিস্থিতিতে, ফেব্রুয়ারির ৮।১০ তারিখ নাগাদ, শিল্পী রথীন মৈত্র জানালেন বিজ্ঞনদা বলেছেন তাঁর লেখা তো তৈরি, কিন্তু ‘পরিচয়’ কোথায়?

তখনও আমি স্থব্ব নই। তাই রাজেন্দ্র ঘোষের সেই বাড়ি দৌড়লেন বেলা বন্দোয়াপাখ্যায়, আমাদের বেলাদি। তোষকের তলা, টেবলের ওপর জুপ করে রাখা বইপত্র থেকে কয়েকটি টুকরো কাগজ বার করে বিজ্ঞনদা বললেন লেখা সত্যিই হয়ে গেছে, বাকি শুধু কপি করা।

সে-দায়িত্ব বেলাদি নিতে চাওয়ায় বিজ্ঞনদা হেসে কয়েকদিন সময় প্রার্থনা করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি ‘মরা চাঁদ’-এর শো আছে। ইতিমধ্যে কপি সেক্রেটারি ‘মুক্তাঙ্গন’ বাওয়ার পথে লেখা তিনি নিজেই বেলাদির বাড়ি পৌঁছে দেবেন।

শো-এর কিছু আগে থেকে বিজ্ঞনদা অল্প সাহস হয়ে যেতেন। তাই স্বেবে পাই না কেন তিনি ১৮ তারিখের মধ্যেই কপি সাক করতে পারবেন স্বেবেছিলেন, কেনইবা বলেছিলেন বটুকদা সম্পর্কে লেখাটি ‘মরা চাঁদ’ করার দিনই পৌঁছে দেবেন।

পরে অবশ্য জানতে পারি শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞনদা লেখাটির প্রতিলিপি করে বেতে পারেন নি। চোখের জল মুহুতে মুহুতে ‘কবচকুণ্ডল’-এর ছেলেরা সে-কাজ করলেন। তাঁদের ও নবাক্ষকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। লেখাটি যেমন পাওয়া গেছে তেমনই ছাপা হল।

‘নবজীবনের গান’ আর ‘নবায়’ হল চল্লিশের দশকের নতুন সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রতীক। আমাদের সৌভাগ্য—‘নবায়’র স্রষ্টিকর্তা বিজ্ঞন

ভট্টাচার্য 'পরিচয়'-এর অন্তর্লিখে গেলেন তাঁর শেষ রচনা, 'নবজীবনের গান' লেখা জ্যোতিষ্মিত্র মৈত্র সম্পর্কে নিজের অন্তিম অবদানবান্ধি।

বেশন জীবনে, তেমনই যরণে 'নবায়' আর 'নবজীবনের গান' এইভাবে হাত ধরাধরি করেছে থাকল।

১৯৭৭ সালের ১০ নভেম্বর 'মুক্তাঙ্গন'-এ জ্যোতিষ্মিত্র মৈত্রের একটি স্বল্প সভায অল্প শরীরে উঠে দাঁড়িয়ে বিজননা আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিলেন—'মৃত্যু ছোবল মেয়ে বটুককে ছিনিয়ে নিল। সে ভেবেছে কি?' মুষ্টিবাধা হাত আকাশে তুলে তারপর বিজননা বলে ওঠেন—'মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইতে হবে। আমাদের কাজই হবে আমাদের লড়াইয়ের তাতিয়া।'

'পরিচয়'-এর এই সংখ্যায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে চল্লিশের দুই মহান শিল্পী চিরতরে এক স্রজে বাঁধা রইলেন। —দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র 'বটুকদা' আমার সেজদা

আমার আবাল্য সহচর

রথীন মৈত্র

প্রাণচঞ্চল একটি হরিণ শিক্তর যতো জ্যোতিরিন্দ্রের শৈশবের দিনগুলো চোখে ভেসে ওঠে। তার ছেলেবেলা অমিদার বাড়ির বাধানিষেধের খাঁচার আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই নিষেধের বেড়াভাল থেকে প্রায়ই সে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসত।

কলকাতার পড়াশুনা করছি, সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে পাবনায় আমাদের বাড়িতে যাওয়া হয়েছে। বাড়ির সামনেই পদ্মা, কিছু দূরে বিরাট বালিচর। ঠিক হল নৌকাযোগে রাত বারটার সময় বেরনো হবে। 'শ্রীকান্ত'র অল্পপ্রেরণা। আমরা কয়েকজন জ্যোতিরিন্দ্রের নেতৃত্বে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে, এমন কি গ্রহরীষের 'চোখে ধুলো' দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মেঘহীন পূর্ণিমা রাত্রি। এখনও চোখের সামনে ভাসছে। চরে নৌকা ভেড়ানো গেল।

জ্যোৎস্না প্রাবিত বালির চর দিকচক্রবালে বিশেষ একাকার। জ্যোতিরিন্দ্র লাফ দিয়ে নেমে নাচতে নাচতে হঠাৎ দৌড় দিল, বলল—“যে বেশিকৈ পারো ছুটে চলে যাও।” সে যে কি অনাবিল আনন্দ বুঝিয়ে বলা মুশ্কিল। আমরা কিছুকণ ছুটোছুটি করে বালিতে পা ডুবিয়ে চূপচাপ বসে পড়লাম। আরম্ভ হল জ্যোতিরিন্দ্রের অপূর্ব কণ্ঠসঙ্গীত। এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেল জানি না। হঠাৎ ওপারে বাড়ির 'দেউড়ি' থেকে এক ছুই তিন করে বক্টা বাজার শব্দ ভেসে এল—তিনটে বাজল। আমাদের চমকও ভাঙল। এবার কেয়ার পালা। জ্যোতিরিন্দ্র বলে বসল মাহ ধরে নিয়ে যেতে হবে। জলের ধারে ধারে মাহ ধরার খাঁচা বানিবে রাখা আছে। জ্যোতিরিন্দ্র

তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বেশ কয়েকটা মাছ ধরে ফেলেছে। ইতিমধ্যে অনেক দূরে একটা জেলেভিড়ি ছপ ছপ করে আসছে মনে হল। অমনি মাছগুলো আমরা নৌকার পাটাতনের নিচে রেখেই নৌকা ছেড়ে দিলাম এবং খুব সতর্কপণে ঝাড় টানতে টানতে বাড়ির ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম। কিন্তু ওপারে পৌঁছতে যে স্বপ্নের স্পন্দন জেগেছিল সেটা ভোলবার নয়। তারপর গা ঢাকা দিয়ে চোরের মতো যে বার ধরে গিয়ে চুপি চুপি বধন বিছানার গা এলিয়ে দিয়েছি—চারটার ঘণ্টা বাজল। সে রাত্তিরে উত্তেজনার কারো সুখ হল না। পরদিন ভোরবেলার উঠে প্রথমেই আমাদের সন্ত-বিবাহিতা বড় বৌরিকে ডেকে পত রাত্তিরের দিক্‌বিজয়ের কাহিনীটা কলাও করে বলা হল এবং মাছগুলো বাড়ির প্রথম ছাতের এক কোণে রান্নার ব্যবস্থাও হল। বৌদির হাতের রান্নার খুব নামডাক ছিল। এইসব শুই ছেলেদের অল্পনয়-বিনয়ে বিগলিত হয়ে সেদিন বৌদি আমাদের কথা রেখেছিলেন—ফিস্টটাও বেশ জব্বর হয়েছিল। বলা বাহুল্য গোটা ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল। এইভাবে অনেক ছেলেবেলাকার ছোট ছোট কাহিনী মনে ভিড় করে আসে।

পুজোর সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আজ্ঞা। চলে যাওয়া হত মাঝে মাঝে গ্রামের পথ ধরে—পানামরা পুকুর, বাগঝাক, মাছরাভার মৎস শিকার। শানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নেশা ধরিয়ে দেওয়া শিউলি ফুলের গন্ধ উপভোগ করতে করতে বলা হত নিবিড় শিউর বৃক্ষছায়াতলে। সেখানেও জ্যোতির্ময়ীর গুনগুন করে গান পাওয়া ও অবাধ বিন্ময়ে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকা আমার মনের দিগন্তে এখনও রং লাগিয়ে দেয়।

ছেলেবেলা থেকেই সেজদার গান গাইবার ঝোঁক ছিল। অবশ্য ঝোঁক অনেক কিছুই ছিল—যেমন খেলাধুলোর বাবতীর বিভাগ। ভালো লাঠি খেলতে জানত। জানত ভালো সীতার দিতে। কিন্তু সঙ্গীতের মধ্যেই বেশ ধারাবাহিকতা ছিল। প্রথম অবশ্য স্বদেশী গান দিয়ে আরম্ভ। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের গান বালক বয়স থেকেই শাইত। তখন অনেক স্বদেশী সভায় তাকে নিয়ে যাওয়া হত উদ্বোধনী সীত গাইবার জন্য।

স্বদেশীমানার একটা আবহাওয়া ছিল আমাদের বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল, সত্যনাথ, বতীন্দ্রমোহন এসনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সরলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রমুখ

তদানীন্তন নেতা ও নেত্রীরাই আমাদের বাড়িতে আসতেন।

অহিংস আন্দোলনের ক্ষেত্রে দিয়ে দেশমাতৃকাকে বহনযুক্ত করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে জ্যোতিরিন্দ্রের মত পরিবর্তন হতে লাগল। সে কানাইলাল সুরিন্দ্রের জীবনী ও শরণচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ গোপনে পড়ে ফেলেছে। এর বেশ কিছুকাল পরে, ১৯২৭—৩১ তখন, জ্যোতিরিন্দ্র সেন্ট জেভিয়ার্সের বিজ্ঞানের ছাত্র। সমরটা চট্টগ্রাম অজ্ঞানাগার সূত্রের বর্ণ। জ্যোতিরিন্দ্রের চলাকোষের মধ্যে একটু গোপনীয়তা লক্ষ্য করেছি, বালিশের নিচে রিভলবারও আঁচকা করেছি। কিন্তু সেটা বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। ক্রমে জীবনের নানা অলিগলিতে চলাকোষ করে তার মধ্যে একটা বাস্তবমুখী ভাব দানা বাঁধল। পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে জ্যোতিরিন্দ্র এই সময় কবি বিষ্ণু বেক-কে সহপাঠী রূপে পায় এবং উক্তরের নিবিড় বন্ধু হন। কলে জ্যোতিরিন্দ্র সূত্রী দত্ত ও ‘পরিচয়’গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন।

এর আগে জ্যোতিরিন্দ্রকে মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে দেখা যেত। কিন্তু সে সব কবিতার ওপর পূর্বগামী কবি এবং রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’র ছাপ পড়েছিল। কবিতা ছিল অনেকটা ‘ওরাশ’-এ ঝাঁক। ছবির মতো ধোঁয়াটে ও মিষ্টিক। সে ক্রমে সেটা কাটিয়ে উঠে একটা বলিষ্ঠ বাস্তব-সুখিতার দিকে এসিয়ে যায়। আসে ১৯৪০ সাল। ইতিমধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত হয়েছে। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে মূল্যবোধটাও পালটিয়ে বাচ্ছে। এই পর্বে ‘পরিচয়’ পত্রিকা তার বেশ কিছু লেখা ও কবিতা বেরিয়েছে। এর পর সে ‘ক্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন’ এবং ‘ভারতীয় গণনাট্য সম্মেলন’ যোগ দেয়। জ্যোতিরিন্দ্রই হাত ধরে আমাকে এই আন্দোলনে নিয়ে গিয়েছিল। এই সময় বিশেষ করে তার খুব কাছের মাস্টার হিসাবে দেখতাম বিজ্ঞান স্টাডেন্ট, শঙ্কু মিত্র, বিনয় রায় ও চিত্রোৎসব সোহানবীশকে। এরা প্রায়ই আমাদের বাসায় আসতেন। এঁদের দেখে মনে হত যেন একই পরিবারের। সহকর্মী, সহস্রমী ও সহধর্মী।

জ্যোতিরিন্দ্রকে ধারা কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে জানেন তাঁরা তার পরবর্তী জীবনের পরিণতি বিষয়ে অবহিত। আমি শুধু তার জীবনের পশ্চাৎপট ও কয়েকটি বিশেষ দিক ধরে আনবার চেষ্টা করছি।

সঙ্গীতরাজ্যের নানা দরজায় জ্যোতিরিন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিল। সেতার, এসরাজ, তবলা, ঢাক (পুজোর সময়

চাকীদের চাক নিয়ে নেচে নেচে নানা ভঙ্গিতে চাক বাজানর স্বতি আনতে (তুলসায় নয়), ঢোল, ধোল...এসব স্বয়ং নিয়ে সে বেশ নাড়াচাড়া করেছে। অলতরঙ্গও মোটামুটি ভালোই বাজাতে পারত, কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতকেই শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিল।

সে সরলা দেবী ও পরে ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পার্ট-নেয়। দিনেদিনাথের গান শোনবার সৌভাগ্যও তার হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে ভীষ্মদেবের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয় এবং তাঁর কাছে মার্গসঙ্গীতের তালিম নেয়। পরে তাকে কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও ধোয়াল গানের রেওয়াজ করতে দেখেছি। কিন্তু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত রীতিমতো রেওয়াজ করলেও লোকসঙ্গীত-এমনকি পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্পর্কে তার অহুসন্ধিৎসা কম ছিল না। আমার বেশ মনে আছে সে বিষ্ণুদাস (কবি বিষ্ণু দাস) বাড়িতে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিকের রেকর্ড শোনে প্রথম। সেখানে তার স্বরস্বরূপ করে বেটোফেন, বাক, মোৎসার্ট। পরে চক্ৰল চট্টোপাধ্যায় এবং নীরদ চৌধুরী মশায়ের কাছে প্রচুর পাশ্চাত্যসঙ্গীত শোনবার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। কলে জ্যোতিরিন্দ্রের মনের মধ্যে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সুরধারার মিলন ঘটে। পরবর্তী জীবনে ‘নবজীবনের গান’ তাকে উত্তম ঐতিহ্য সম্বয় করতে উৎসাহ করেছিল। অবশ্য আগেই বলেছি, লোকসঙ্গীতের প্রতি তার বিশেষ একটা আকর্ষণ থাকায় জ্যোতিরিন্দ্র লোকসঙ্গীতকেও অসংবোধনার কাজে লাগিয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার অনেক পরিচয় আমি পেয়েছি। যেমন তার পক্ষীপ্রীতি। পাখিদের বংশতালিকা, সমস্ত ভারতবর্ষে কোন পাখি কোথায় পাওয়া যায়, কোন ঋতুতে কোন পাখির প্রাচুর্য্য হয়, কোন ঋতুতেই বা তাদের পাতা পাওয়া যায় না—এ সব কিছু সম্পর্কেই তার ধারণা ছিল স্পষ্ট। সে লক্ষ্য করেছিল এক-একটা পাখির বাসা বানানোর কায়দা এক-এক রকম। পাখির বাসা সংগ্রহ করতে সে ভালোবাসত। দূরবীক্ষণ দিয়ে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে পাখিদের নিরীক্ষণ করা তার স্বভাব ছিল। গায়ক পাখিদের ডাক টেপ রেকর্ডে সংগ্রহ করে তার থেকে স্বর রচনা—এক সময় এই অদ্ভুত ধোয়াল তাকে পেয়ে বসে।

ভারতবর্ষে এবং বহির্ভারতে নানা জায়গায় তাকে ঘুরতে হয়েছে। স্বরের সংগ্রহশালার সে নানাদরনের অসংখ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। কিন্তু,

জীবন-বাউল জ্যোতিরিন্দ্র কোনোদিনই তো আর পাঁচজনের মতো ঠিক গোছানো মানুষ ছিল না।

ব্যক্তিনির্বিশেষে যে গুর কাছাকাছি এসেছে সে-ই জানে সবাইকে নিবিড় করে নেবার কি অপূর্ব কমতা তার ছিল। সর্বজনের প্রীতিযত্ন হবার মতো যথেষ্ট গুণ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ব্যবসায়ী বুদ্ধি ও সাংসারিক চাতুর্যের অভাব এবং নিজের প্রতি অবিচল ঔদাসীন্দের দৃঢ় বা জ্যোতিরিন্দ্রের পাওয়া উচিত ছিল তা সে পায় নি। তবে, জীবন-রসের আনন্দধন অহুভুতিতে স্তরপুর প্রেমিক আত্মভোলা জ্যোতিরিন্দ্র আমার কাছে অমৃত হয়েই রইলেন।

সে সকলকে আপন করতেই চেয়েছিল। কিন্তু আমরা তাকে কতটুকু আপন করতে চেয়েছিলাম জানি না। সে যে-পৃথিবীর যন্ত্র দেখত, তাকে অর্জন করার জন্য সকলকে ডাক দিয়েছিল। তার সে প্রাণভরা আহ্বান আমরা শুনতে পাই নি।

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের উদাত্ত এই আহ্বানের মর্ম হয়তো বেশ একদিন বুঝবে ঠিকই।

গানের ভেতর দিয়ে যখন

মণীন্দ্র রায়

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের বিষয়ে বলতে গেলে অনেক কথাই বলা যায়। প্রায় বছর পঞ্চাশ ধরে তাঁকে চিনতাম। তিনি আমার আত্মীয়, একই গ্রামে পাশাপাশি বাড়ি আমাদের। তাই একেবারে সেই ছেলেবেলার কথা বলতে শেখা থেকেই তিনি আমার বটুককা, অর্থাৎ বটুককাকা। এবং অন্তরঙ্গ মুহুর্তে আমি তাঁর মণীন্দ্র, অর্থাৎ মণীন্দ্র। তাঁর কথা মনে হলে চোখের সামনে আমি এতদিনের এত বিভিন্ন ধরনের ছবি দেখতে পাই যে বেছে নেওয়াই শক্ত।

তাছাড়া তিনি শুধু আমার আত্মীয় নন। বরষে, আমার চেয়ে আট বছরের বড় হলেও তিনি ছিলেন আমার আটকশোরের বন্ধু এবং পরামর্শদাতা। জীবনের অনেকগুলো সংকট-মুহুর্তে তাঁকে পেয়েছি আমার কাছের মাহুব হিসেবে। তাঁর রোম্যান্টিক মন এবং এলোমেলো স্বভাব সবেও বনিষ্ট একটা সংযোগ তিনি আমার সঙ্গে বরাবরই অক্ষর রেখেছেন।

তাঁর এই স্নেহ ও প্রীতির আরো একটা কারণ ছদ্মনেরই স্বভাবে ছিল কবিতা লেখার দিকে ঝোঁক। তাঁর ভাই রথীন্দ্র মৈত্র শিল্পী। ধরনধারণও অনেকটা বটুককাকার মতোই। সেজন্তু তিনজনের এই ছোটো দলটির পদ আচ্ছা চলাকেরা সবই চলত একসঙ্গে। মধ্যমণি ছিলেন অবিভি বটুককাকা।

এর একটা বড় কারণ, বটুককাকা ছিলেন অসম্ভব রকম বাকপটু মাহুব। উইট আর হিউমার ছিল তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। তাছাড়া গানবাজনা খেলাধুলো সব দিকেরই উৎসাহ ছিল অবাধ করে দেবার মতো। পাবনার এমন ঘটনাও দেখেছি, হল ঘরের মতো বড় বৈঠকখানায় একা একা বসে তিনি বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা অবধি অক্লান্তভাবে অর্গান বাজিয়ে

গান করে চলেছেন। আবার কোনোদিন হয়তো খেরাল হল, বাড়ির সামনের ফুটবল মাঠে সঙ্গীসাথীরা আসায় আগে একাই বল নিয়ে প্র্যাকটিশ শুরু করে দিলেন। এমন একটি মাহুষ বে সকলের মধ্যে একজন না হয়ে একতম হয়ে উঠবেন তাতে আর আশ্বর্ষ কি।

তার এই জীবন্ত সম্ভাব এবং অন্তর্কে সচল করে তোলার কনজ্ঞতা থেকে আমি খুবই লাভবান হয়েছি। রবীন্দ্রাঙ্ক ছবি আঁকতেন বলে রঙ তুলি নিয়ে বলে পড়তেন অনেক সময়, দু-এক ঘণ্টার মধ্যে উঠতে চাইতেন না। আমি ও বটুককাকা বেকার হয়ে তাই মাঝে মাঝে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তাম।

পাবনার ঐ মস্ত বড় বাড়িটা ছিল শহরের এক প্রান্তে। তার দক্ষিণে শ-খানেক গজ দূরেই শুরু হয়েছে পল্লা। তারই পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে পুর্বদিক ঘুরে অনেক দূরে চলে যেতাম আমরা। ইটখোলা ছাড়িয়ে আমবাগান ছাড়িয়ে আরো কতো দূর। বেতে বেতে গ্রামের কোনো মাহুষের সঙ্গে দেখা হলে গল্প জুড়ে দিতেন বটুককাকা, দু-চার কলি পল্লীশ্রীতি গেয়ে শোনাতেন তাকে, তার কাছেও শুনতে চাইতেন। না বললে চলে তারা তা শোনাতে পারত না। কিন্তু দু-চারজন গুরই মধ্যে অচেনা কোনো গানের কথা হয়তো আবৃত্তি করে শোনাত। তখন বটুককাকা আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, রবীন্দ্রনাথ এভাবে অনেক গান পেরেছেন। মার্কেলাস সব কথা, তাই না? তারপর শুরু হত রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গল্প। পাবনার তাঁদের বাড়িতে এসে রবীন্দ্রনাথ দিন করেক ছিলেন, সেই সময়কার কথা বলতেন। তাছাড়া কয়েকদিন কবি তাঁদের বাড়ির ঘোটেও বাস করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলেই চোখ মুখ রীতিমতো উজ্জ্বল হয়ে উঠত বটুককাকার। কখনো কখনো গানও গাইতেন গুনগুন করে।

একদিন এইরকমই এক রবীন্দ্রালোকিত মুহূর্তে (সেদিন রবীন্দ্রাঙ্কও ছিলেন) বললেন—“চল, কবিকে দেখে আসিগে।”

কী করে? রবীন্দ্রনাথ তো শান্তিনিকেতনে? বটুককাকা বললেন—“তা হোক। আমরা শিলাইদহে গিয়ে কুঠিবাড়িটা বেধে আসি, তাহলেই দেখা হয়ে বাবে।”

আমি ও রবীন্দ্রাঙ্ক দুজনেই মেনে নিলাম, তা হবে বটে!

পল্লার এপারে পাবনা, ও পারে শিলাইদহ। আমাদের বাড়ি থেকে কুঠিবাড়ির ঝাউগাছের সারিকে ঘোঁরাটে নীল একটা পাহাড়ের সারির

মতো মনে হত। দূরত্ব দশ-বারো মাইলের কম নয়। তখন অবিস্মৃতি
নীতকাল, বাড়ির ঠিক সামনে থেকেই চড়া পড়ে যেত তখন নদীতে।
কিন্তু তাহলেও চরটা পেরোলে তো নদী আছে। আর সে নদী পদ্মা।
যদি কোনো নৌকো না পাওয়া যায় ?

বটুককাকাকে বাঁরা চিনতেন, তাঁরা আনেন, স্বেচ্ছাচিন্তে বেশ গুছিয়ে
কাজ করা তাঁর স্বভাবের মধ্যেই ছিল না। রথীকাকা নিজে মোটামুটি ঠাণ্ডা
প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু বটুককাকার পাশে থাকলে তিনিও সংক্রামিত হয়ে
পড়তেন। অতএব—

বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে দুপুরবেলা খাওয়ার পাট চুকিয়ে বেরিয়ে
পড়া গেল। অসমবয়সী তিন বছর সেই অভিবানকে নিঃসন্দেহেই বলা যায়,
শিলাইদহের উৎস সন্ধান। কারণ দিগন্ত-বিস্তৃত বালির চরে দূরে-দূরে
ছ-চারটে খড়ো ঘর এবং ছোলার খেত থাকলেও পথ প্রায় একেবারেই ছিল
না। বাগবা দু-একটা হাঁটা-রাস্তার দেখা দেখা বাড়িল তাও শেষ হচ্ছিল
গিয়ে ঐসব খড়ো চালার উঠানে। তাছাড়া মোটামুটি দক্ষিণ দিকে এগিয়ে
চরের শেষে নদীর দেখা যদিও-বা মেলে, খেয়া বাট (যদি থাকেও) ঠিক
সেইখানেই যে মিলবে তার নিশ্চয়তা কী ? কিন্তু রাস্তার নামার পর এসব
কথা তাঁই পায় না মনে, রাস্তাই তখন একমাত্র সত্যি হয়ে ওঠে।

হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত নদীর কাছে পৌঁছানো গেল একসময় এবং
কী আশ্চর্য খেয়াঘাটও ঠিক সেইখানেই। এখন ভাবি, খেয়াঘাট যদি ওখানে
না মিলত, আমরা হয়তো সেদিন অতো নাড়ানাবুধ হতাম না। অবিস্মৃতি
আনন্দ পাওয়াটাও মাঠে মারা যেত তা ঠিক।

কুঠিবাড়িতে পৌঁছতে বিকেল প্রায় শেষ-হয়ে এল। কাছারির ম্যানেজার-
বাবুর সঙ্গে দেখা করে বটুককাকা পিতৃপর্যটন দিয়ে- কঠোর সমলে আসার
উদ্দেশ্য কি তা জানালেন। মহাসমাদরে স্তম্ভলোক কুঠিবাড়ির ডালা খুলে
একতলা দোতলার ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখালেন। চেয়ার টেবিল এবং
বাট ছাড়া আর কোনো আসবাবের কথা মনে পড়ছে না এখন। ডেকচেয়ার
মিল একখানা। গুনলাম ঐ চেয়ারটি কবির খুবই প্রিয় ছিল। সময় পেলে
তিনি ওতে বসে দক্ষিণ দিকের মাঠের দিকে চেয়ে থাকতেন। বয়সটা
তখন কম ছিল বলে কল্পনার কোনো বন্ধা ছিল না। ঐ আসবাবেই শূন্য
বাড়িটাও তাই সেদিন রথীন্দ্রনাথের অস্থিষে পূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল।
আনন্দে বিষয়ে তিনজনেই আয়রা একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছিল।

ম্যানেজারবাবু নিজের ডেরার নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন খুব। বললেন, ভালো করে না খেয়ে নিলে অতোটা পথ হেঁটে আসার পর হেঁটে আবার ফিরে যাওয়া সম্ভবই হবে না।

খুবই বিচক্ষণ লোক সম্ভেহ নেই। কারণ রাত প্রায় সাতটা নাগাদ ফিরতি পথে নদী পেরিয়ে চরে নামতেই দেখা গেল চতুর্দিকে বহু অন্ধকার। পথ তো নেইই, কাছে। দূরে কোথাও কোনো আলোর রেখাটুকুও নেই। ম্যানেজারবাবু অবিশিষ্ট আশ্বাসের সঙ্গে লঠন আর লাঠি দিয়ে দারোওয়ান পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু চরের ওপরকার সেই রাস্তাহীন অন্ধকার এমন একটি বস্তু যে তার মোকাবেলার লাঠি লঠন বা লোকলম্বর কোনোটাই কোনো কাজে আসে না। বরং লঠন থাকার ফলে অন্ধকার বেশ আরো ভয়াবহ হয়ে উঠল। বটুকাকার বিজ্ঞান পড়া ছিল, আকাশে তাকিয়ে অবতারা খুঁজতে লাগলেন। আমি প্রাণপণে ছায়াপথটা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে হাঁটার কাজটা অবিশিষ্ট চলতেই লাগল।

পথ হারিয়ে সারারাত এইভাবে যুরপাক খেয়ে কোনো লাভ হবে না এটা সকলেই টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু বাড়িয়ে থেকেই বা কী হবে! বটুকাকা একবার লঠনটা নিভিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু দারোওয়ানজী জানাল, তা করলে বুনো শুয়োবের কবলে পড়তে হবে। তাছাড়া চরের ওপর বাঁধ না থাকলেও কুমির আসে মাঝে মাঝে। শুনে চমু স্থির। হালিচাটা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবার কথার পাটও চুকল। যন্ত্রচালিতের বতো শুধু হাঁটতেই লাগলাম আমরা। বহিও শিশিয়ে ডেঙ্গা পলিমাটির চাপড়া জুতোয় আটকে গিয়ে আমাদের পা হয়ে উঠেছিল ভল ভারি।

কতোক্ষণ পরে জানি না, সঙ্গে ঘড়ি ছিল না, হঠাৎ একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল। আহা, সে ডাক যে এত মধুর তা আগে কখনো আনতাম না। চরের ওপরকার সেই নিশিহ্ন নীরবতার আমাদের সমস্ত চেতনা বেশ সাঁড় হারিয়ে ফেলেছিল, কুকুরের ডাক শুনে জেগে উঠলাম।

একটু পরেই ডাঙার পৌছানো গেল। কিন্তু পরে উঠে টের পেলাম, সেটা পাবনা শহর নয়, শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে হিমাইতপুরের কাছাকাছি একটা আরণ্য। কোনো বাড়িতেই আলো নেই। লোকজনও জেগে নেই। কাজেই আবার হটন। বহিও এবার চেনা রাস্তা।

বাড়ি পৌছানোর রাত প্রায় একটার সময়। দেখলাম পোটা বাড়িটার

সবগুলো ঘরে (তিরিশ খানা তো হবেই) আলো জ্বলছে তখন। পদ্মার দিকে বোতালার কানিশে ছটা ছাঁজাকও বসানো রয়েছে। বাড়ির সমস্ত লোক জেলে, কিন্তু কারো মুখেই কোনো কথা নেই। সন্ধ্যা থেকে তিনটে বেপান্তর হেলের খোঁজে লঠন হাতে চরের ওপর অনেক ঘোরাঘুরি করেও কোনো খোঁজখবর না পেয়ে বিপদের আশঙ্কায় সকলে তখন স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

আমরা পৌছতেই বটুকাকার মা আনন্দের উদ্ভেজনায় একেবারে জরে পড়লেন বিছানায়, মুখ দিয়ে তাঁর একটা কথাও বেরালো না।

বটুকাকার কাছে তাঁর বাবা সব কথা শুনে বললেন—“জাট লাইক-ইউ।”

কিন্তু হেলের সত্যবাদিতায় খুশিও হয়েছিলেন তিনি, আর কিছু বললেন না। বটুকাকার মা অবিশ্রি কিছুকাল পরে সামলে উঠে কড়া ভাষাতেই তিরস্কার করেছিলেন।

সেইদিনের কষ্টভোগের কলে একটা তিনিল হল এই যে আমরা তিনজন আরো কাছাকাছি চলে এলাম। আমার কাছে তো বটুকাকা হয়ে উঠলেন একজন হিরো।

আরো একটা দিনের কথা মনে পড়ছে। আমি তখন আমাদের গ্রামের বাড়ি শীতলাইয়েই থাকি, সেখানেই পড়ি—ইশকুলের উঁচু ক্লাসে পড়ার জন্তে পাবনায় চলে আসি নি। বয়স বছর বারোয় বেশি নয়।

বটুকাকাদের বাড়ি শীতলাইয়ে হলেও পড়াশোনার জন্তে থাকতেন কলকাতায়, কিন্তু পুছোর সময় অতি অবসরই বেশে আসতেন। সেই দিনগুলো ছিল বটুকাকার মুক্তির দিন, অশ্রের দিন। ঝাঝা বটুকাকার কবিতা ভালো করে পড়েছেন তাঁরা জানেন, চাকের আওয়াজ আর প্রতিমার চালচিলের চিত্রকল্প তাঁর মনে বারোবারে ফিরে এসেছে। সেইসঙ্গে জ্বাছে গালবিল, ধানের মাঠ, পানকোড়ি ইত্যাদির কথা। এগুলো সবই প্রথম জীবনে সেই শীতলাই-কেন্দ্রিক চেতনার কলকলতি। তাঁর মনের ওপর শীতলাইয়ের আকাশ-বাতাস এত বেশি পরিমাণে দখল বিস্তার করেছিল যে বটুকাকার দিল্লী-প্রবাসের শেষের দিকে আমি একবার চিঠিতে শীতলাইয়ের উল্লেখ করে লক্ষ্যতেই পড়ে গিয়েছিলাম, আমার চিঠি পেয়ে বটুকাকা ফিরতি ভাকেই এক স্বদীর্ঘ জবাবে প্রায় আট পৃষ্ঠা ঘরে শীতলাইয়ের মাহুযুজ, বাড়িঘর, পাছপালা এবং দ্বিধির বিবরে (শীতলাইয়ের পুরো গ্রামটিই পড়ে উঠেছিল একশ বিঘা একটি দ্বিধির চারটি পাড় ঘিরে) নিখুঁত বর্ণনা

দিয়ে, শেষে লিখেছিলেন—“শিতলাইয়ের কথা বেহিন মনে পড়ে সেহিন আর আমি গান গাইতে পারি না, গলা ভেঙে যায়।”

বাই হোক, একবার এইরকম এক শিতলাই বাসের সময়ে ছপ্পুর বেলায় কাউকে কিছু না বলে বটুককাঁকা আমাকে এবং কুকেন বলে আরেকটি ছেলেকে নিয়ে ভিত্তি নৌকায় করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তরুণ বয়সী জ্যোতিরিন্দ্রের সে এক স্মরণীয় অ্যাডভেঞ্চার। অনেকটা ‘শ্রীকান্ত’র ইকনাথের মতো।

আমাদের ঐ পদ্মাপারের বেশে বর্ষাকালে নদীর জল মাঠে উঠে ধালবিল সব একাকার করে গ্রামগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে কেলে। এমনকি কোনো কোনো আরগাঘ এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতেও নৌকো লাগে। বটুককাঁকা মজুমদারবাড়ির ঘাট থেকে নৌকো জোগাড় করে আমাদের নিয়ে দিঘি পেরিয়ে নালা বেয়ে নদীর দিকে এগোতে থাকেন। সঘল শুধু একখানি বৈঠা।

তখন ছপ্পুরবেলা। লোকজন দিবানিত্রায় মর। কেউ দেখতে পারনি তাই আমাদের। কিন্তু গেলে ভালো হত।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমজগ্রামের কালীবাড়ির পাশ দিয়ে শ্মশানঘাটের কাছাকাছি নদীতে গিয়ে পড়লাম আমরা; এবং তৎক্ষণাৎ ছোটের টানে বৈঠাটি হাতছাড়া হয়ে গেল। নৌকা ছুটে চলল অজানা উদ্দেশ্যে।

সাঁতার অবিস্তি আমরা তিনজনই জানতাম। কিন্তু ভরাবধীর নদীতে সাঁতার দিয়ে কতটা পথ উন্মিয়ে আসা যাবে? তাছাড়া কচুরিপানা আছে, কুমির আছে। এবং সর্বোপরি আছে চোরাঘুর্ণির টান। পরিস্থিতি এত প্রকটরকম ভয়াবহ যে বটুককাঁকার মতো একজন অদম্য স্বভাবের যুবাশ্রমও রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলেন সেদিন।

কিন্তু নাটকটা তার নাট্য পরিপত্তিতে পৌছানোর আগেই নতুন দিকে মোড় নিয়েছিল। হঠাৎ একটা বাক ফিরতেই দেখা হয়ে গিয়েছিল বরষা মাঝি বলে একজন মাছধরা মাছবের সঙ্গে। সে আমাদের চিনত। রাতের ধরা মাছগুলো ব্যাপারীকে বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিল। সেই লোকটিই শেষে আমাদের নৌকোটা তার নৌকায় সঙ্গে বেঁধে ঘাটে পৌছে দিয়েছিল।

সেদিনের সেই পোপন অভিযানের বিষয়ে পরেও আমরা বলাবলি করেছি, আনন্দ পেয়েছি। বৃত্ত্যর মাস ছয়েক আগে একদিন আমাদের এই কলকাতার বাড়ি থেকে ছুজনে পাশ-পাশি মিনিবাসে বসে এসম্মানেণ্ডে গিয়েছিলাম।

পুরনো দিনের কথা আবার উঠেছিল। স্মৃতি খুঁড়ে খুঁড়ে পুরনো সব ঘটনা ও দুর্ঘটনার কথা বলাবলির আনন্দ আত্মর মুহুর্তে তিনি সেদিন নিজের বিষয়েও কথা বলেছিলেন, বা আর কখনো করেন নি। বটুককাকা বলেছিলেন—“এইভাবেই সারাজীবন ঐকান্তিক পারিবারিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভয়ভুলোকে ভাঙতে ভাঙতে আমি মাহুঘটা আমি হয়ে উঠেছি। একটা মাহুঘ তো হঠাৎ করে আলাদা হয়ে ওঠে না, এইভাবেই নানারকম ঘটনাকে ‘কেস’ করে এবং তাকে ব্যবহার করে অন্তরকম হয়ে ওঠে। ভেবে দেখিস তুই। ব্যাপারটার মধ্যে আর কোনো মিশ্রি নেই, আছে বুদ্ধি সাহস আর সত্যিকারের একটা লক্ষ্য নিয়ে চলা। এইটাই আসল। আমার ব্যাপারটা ভাবলে দেখবি—অনেক কিছু করেছি এবং চলে গেছে। কিন্তু গানটা সব সময় ছিল, তাই সেটাই বোধহয় থাকল। তাই না।”

অবশ্যই তাই। তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকেই হয়তো বটুককাকাকে ভুল বুঝেছেন অনেকসময়, ভুল ভাবে ভুল কাজ আশা করেছেন তাঁর কাছে। কিন্তু বটুককাকার বোধহয় কোনো ভুল হয়নি নিজেকে চিনতে। যতোবার আমি “এস মুক্ত করো” গানটি শুনি ততোবারই আমি এই কথা ভাবি।

মধুবংশী-বিবেকের প্রস্থান

সাধন দাশগুপ্ত

সপ্তরের দশকে দিল্লী প্রবাস থেকে ফিরে বটুকড়া পশ্চিমবঙ্গে ভেঙ্গে পড়া প্রাণের তুর্গ নতুন করে বানাবার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। হাতে অনেক কাঁদা লেগেছে। তবুও হাল ছাড়েন নি। কথার কথায় বলতেন— “বিনয়ের ফেলে যাওয়া কাজ শুরু করতে হবে। কমিউনিস্টরা বাধা-বিপত্তিতে ঘষে যায় না।” কলকাতাকে কেন্দ্র করে কত জায়গার ছুটে বেড়িয়েছেন উদ্দীপনার পান পেয়ে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে। অবেশে বিবেকে বেথানে বধন ডাক পড়েছে, এই বিবেকবান পুরুষটি পানের তুলি নিয়ে হাজির হয়েছেন। আমরা যেভাবে পল বোবসনকে চিনি, বিবেকে এই মাতৃহত্যার সেই পরিচিতি আছে কিনা জানি না। তবে যে তুর্গম্ভ মর্দ্যহার তিনি অধিকারী বটুকড়ার পরে এদেশে তার কোনও দ্বিতীয় অংশীদার নেই।

কিন্তাবে গণসঙ্কীর্ণের রাজ্যে প্রবেশ করলেন তার কথা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অনেক বলেছেন। কিন্তু আপন কর্মকৃতির আলোচনা বিশেষ করেন নি। সে দারিদ্র আশ্রয়ের শুধু জুসে বেন তা ঢাকা না পড়ে।

আশ্রয়ের পর্ব এই যে, তিনি কখনও কোনও প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। হুশেচিন্তা, সমাজবাদ ইত্যাদির ছাপ ঘেঁরে কত পান, নাটক, বাজার বাধনা নিয়ে লেখক, নাট্যকার, শিল্পীরা টাকার পিছনে নামের পিছনে ছুটেছে। আর বাজার নিকলুব বিবেকের মতো এই বিবেকবান পুরুষটি অস্তঃসারশূন্য সংস্কৃতির সেই চাকচিক্য মেখে কখনও বিজ্ঞপের অট্টহাসিতে কেটে পড়েছেন, কখনও হুঃখে বেদনার মুগ্ধমান হয়েছেন। কিন্তু প্রলোভনকে পদাঘাত করেছেন সর্বদা। না করলে, এই বয়সেও ছ হাতে আর্থিক ঐশ্বর্য লুণ্ঠতে পারতেন। তাই মৃত্যুর পর রাজ কীর

মহিমায় মুকুট রাহস্য তাঁরই মাধব পরিচয়ে দিয়েছে। অবশ্য তাঁর শিল্প-মনে কখনও আনন্দ না চারিদিকে তাঁর অস্তিত্ব কত প্রেম জমা হয়ে আছে। বটুকদার প্রথম ও শেষ যুগের দুটি অধ্যায়ে একটি অভূত একাক্ষতায় চিত্রিত।

১২৪৩ সালে নাগাঁও ঢাকা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ছাত্র কেডারেশনের কালচারাল কোর্সে যোগ দিতে আগাম সফরের জন্য। বৌবাজার স্ট্রীটে তিনতলায় রিহার্সাল চলত। থাকতাম মার্কার্স কোয়ার্টারের উন্টোদিকে (দক্ষিণে) স্টুডেন্টস সেন্টারে। বিনব রায় তখন বোম্বাইতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম কেন্দ্রীয় কোয়ার্ড নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের পানের দল তৈরির কাজে হাত লাগালেন বটুকদা। সে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম! কতগুলি অর্বাচীনকে নিয়ে তাঁর কারিগরী কোনও দিন ফুলতে পারব না। কখনো রাগ করেন নি। গান গাওয়ার ব্যাপারে আমার স্বরণশক্তি দুর্বলতা নিয়ে ঠাট্টা করতেন। কিন্তু নাকচ করে দেবার পাড় তিনি ছিলেন না। আরি পিছন ফিরতে চাইলেও সামনে ঠেলে দিতেন। আসামবাঙ্গী দলের নাচ গান কি হবে না হবে বটুকদাই ঠিক করলেন। নাটকের কি হবে? হুকাব্দার গুণর সুরমায় আরি করা হল। ইতিমধ্যে হুকাব্দা কিশোর বাহিনীর অস্ত্র ছুখানা নাটক লিখে নাট্যকারের তকমা বুকে এঁটে কেলেছে। এবার লিখল আমাদের জন্য। নামটা ঠিক মনে নেই। ‘প্রতিবিধান’ কিংবা ‘প্রতিরোধ’। নাটকের পাণ্ডুলিপি অবশ্যই হারিয়ে গিয়েছে। দ্রো-ভূমিকা-বর্ণিত নাটক। আমাদের আশেপাশে তখন তৃপ্তি ভাটুড়ী (মিজ) আর অহু বাশগুপ্তা ছাড়া কেউ ছিল না। তাদেরও এই সফরে বাওয়ার অহুবিধা ছিল। বিশেষ, যুদ্ধের বাজারে আসামের পরিস্থিতি তখন স্থির নয়। এবার নাটক পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন বিজন শুভাচাৰ্য। তাঁরও বটুকদার হাল। কিন্তু বিজনদাও সমান নাছোড়বান্দা। বিজনদার এই পর্বের নাট্যপ্রয়াস সম্পর্কে কয়েকটা কথা এই সুযোগে বলে রাখি। তাঁর প্রথম নাটক ‘আগুন’ (১২৪০), সম্ভবত তিনি নিজেই পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় ‘অবানবন্দী’ (১২৪৪), পরিচালনা করেন শঙ্কু মিজ। বিজনদা তখন ছাত্র কেডারেশনের দুটি নাটক পরিচালনা করে যেন। প্রথম—‘অচলায়তন’, দ্বিতীয় হুকাব্দার ‘প্রতিধ্বনি’ (বা ‘প্রতিরোধ’)। আসাম সফরে হুকাব্দার নাটকটি আমরাই অভিনয় করতাম।

বটুকদা ও বিজনদা দুজনে সেই সময়ে দুটো কাজে একসঙ্গে হাত লাগালেন। আসাম সফরের প্রস্তুতি ও ছাত্র কেডারেশনের উদ্বোধনে রবীন্দ্র অসমীয়া অস্থান। রবীন্দ্রসঙ্ঘ ও নাটক ‘অচলায়তন’। রবীন্দ্রসঙ্ঘের অস্থানে

অধী প্রাধানও উভোদী ছিলেন। রবীন্দ্র জয়ন্তী অঙ্কিত হল শ্রীরাম বকে-
আসাম সরকারের আগেই।

আসাম সরকারের প্রতীতিপূর্বে বটুকদা শেখাতে লাগলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, হিন্দী ও উর্দু গান। হরীন চট্টোপাধ্যায়, বোশ মলিহাবাদী, মধুসূদন ও বিনয় রায়ের লেখা। শঙ্কু শুভীচার্য নাচবে। নাচের সঙ্গে গান চাই। বটুকদা তখন লিখলেন—“মোরা আর দেব না আর দেব না আর দেব না ছেড়ে মোদের সোনার বশিপুর / কুববোই আজ রাখবো মোর, মোদের কলজে দিয়ে গড়া মোদের রক্ত দিয়ে গড়া সাধের বশিপুর।……” এই গানটি সেকালের ‘জনযুদ্ধ’-র প্রকাশিত হয়েছিল। কুববদের নিয়ে ব্যালে নাচ কি হবে তা নিয়ে বনন আমরা, অর্বাচীনরা, মাধা দামাছি—তখন একদিন বটুকদা সেই চিত্রাচারিত প্রেক্ষা পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে সংস্কোচে আনলেন তাঁর লেখাটি বড় কাঁচা হাতে লেখা। কাঁচা কি পাকা তা বলবার মতো ক্ষমতা আমার আজও হয় নি এবং ছাপার ক্ষমতা তা আজও প্রকাশিত হয় নি। আমরা নাচের জন্য আর একটি নতুন গান পেয়েছি এই আনন্দেরে আশ্বহারা।—“এসো গান কাটি কলস কাটি কান্তেতে দিই শান / কান্তে মোদের মিতারে ভাই কান্তে মোদের আন।”—এই গানটি সবাইকে গাইতে এবং সেই সঙ্গে নাচতে হবে। বটুকদার শুক্লগভীর নির্দেশ। দুটি নাচই বটুকদার পরিকল্পনার হল। এই রিহার্স্যাল চলাকালেই একদিন বঠাং এসে হাজির হলেন শঙ্কু মিজ, দেবব্রত বিশ্বাস এবং নৃত্যবিদ শান্তি বর্ধন। রিহার্স্যাল স্থগিত রাখা হল। ঠাণ্ডা আমাদের গান শুনলেন। এ ব্যাপারে অস্বপতি ও সঞ্জল রায়চৌধুরী বরাবরই বেপরোয়া, অসংস্কোচে আমাদের সামিল করিয়ে দিল। বটুকদার সম্রাতি আমাদের মুকবলের জড়তা, কাটিয়ে দিল। সেই সময়ে ‘নবজীবনের গান’ লেখা চলছিল এবং অরারোপও চলছিল সঙ্গে সঙ্গে। দেবব্রত বিশ্বাস তারই অংশবিশেষ পেয়ে শোনালেন। ‘মুগুবংশীর গান’ তখনও হরত শঙ্কুদার কর্তে আরোপিত হয় নি। সঠিক বলতে পারছি না। তবে নীহার, দাশগুপ্ত ও তৃপ্তি-ভাঙ্কড়ী বিভিন্ন অঙ্কিতানে কখনও একক, কখনও বা হৃদ্যভাবে আবৃত্তি করতেন। তারপর

১. বটুকদা দ্বিগি প্রকাশ থেকে বিত্তে এসে চিঠি এসে একবার গানটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। উক্তরে বটুকদা বলেছিলেন—“এই গানটি আমি ঠিক সবটা মনে রাখিনি। তবে তার সঙ্গে জড়িত স্মৃতি সবই আজও মনে আছে। একত-ভোবার চিঠি গড়ে বড় nostalgic feel করছি।”

একদিন বটুকদার নির্দেশে আমামবাজীদের অঙ্ক হরিপদ কুশারী একটি গান লিখে নিয়ে এলেন—“ঐ কোহিমা ঐ মণিপুর আমার দেশের সীমারে / ডিমাপুরের পাহাড়ী পথে আমার দেশের পথরে।” সজল তৈরি করল একটি ব্যক্তিমূলক গান ওয়াডেল, আমেরী ও চার্চিলকে নিয়ে। আমাদের তিনজনকে গান গেয়ে নাচতে হত। এতে শেষ প্রলেপ লাগাতে সাহায্য করলেন বটুকদা। দল তৈরি হল এবং নির্ধিমে সফরও শেষ হল। সফর অন্তে বটুকদার উজোগে আমাদের সন্ধান দেওয়া হল শ্রীরাম মন্ডে। আমাদের নাচ গান শেষে বড়দের নাটক ‘জবানবন্দী’ মঞ্চস্থ হল। সম্ভবত সেটাই ছিল ‘জবানবন্দী’র শেষ রজনী এবং নাট্যাচার্য শিলিরুন্নার তাড়ুদী এই প্রথম গণনাট্য দেখলেন ও বিস্মিত হলেন। সে অল্প প্রসঙ্গ। এই কবমাসের অতিথিতার পূজি আমাদের পরম সঙ্গী হয়ে রইল যা ভাঙিয়ে দীর্ঘকাল নাম কুড়িয়েছি, কোয়ার্ডি তৈরি করেছি। সবটাই বটুকদার কৃতিত্ব। এইভাবে বটুকদা আমাদের তৈরি করে দিলেন যাতে নিজের নিজের মেলায় ফিরে গিয়ে সপাটে এবং দাপটে কাজ করতে পারি। এদিক আমাদের গানের ঝুলিও তিনি ভরে দিয়েছিলেন। আর আঁগিয়েছিলেন গান লেখবার উৎসাহ। এইভাবে স্রষ্টা প্রেরণা আগালেন সৃষ্টির।

শেষের অব্যায় ১৯৭৪ সাল। মাঝখানে অনেক ইতিহাস। দিল্লি প্রবাসের। তারও আগে কলকাতার ৬ তার কথাও তিনি উল্লেখ করে গিয়েছেন। ১৯৪৬-এর পরই ১৯৭৪ বলছি এই কথা বোঝাতে যে, সময়ের প্রবাহ তাঁর মানসিকতাকে বরাবরই সমীহ করে চলেছে। আমাকে লেখা একখানি চিঠির খণ্ড খণ্ড করেকটি কথা দিয়েই তা বলছি। ঢাকা থেকে ফিরে ১৩।১১।৭৪ তারিখে তিনি লিখেছিলেন :

“...তারপর অক্টোবরের (১লা অক্টোবর) গোড়ায় আমার ঢাকা গিছলাম। শুধানকার সাহিত্যিক, শিল্পী, academic council ও বাংলাদেশ-ভারত বৈজ্ঞানিক সম্মেলন আমন্ত্রণে। আমিও বাংলাদেশের ছেলে। অনেকদিন বাদে ঢাকাকে নতুন চোখে দেখলাম।.....কিন্তু বাংলাদেশের ভিতরের অবস্থা অত্যন্ত গোলমেলে ও শোচনীয় দেখলাম। আমাদের চেয়েও। অনেক group ও young artistes.....ইত্যাদি সব ধরনের ছেলেদের সঙ্গে meet করলাম। তারা অনেক কিছু জানতে চাইলো, অনেক সমস্যার কথা আলোচিত হল।.....বললাম এক হয়ে জোট বেঁধে.....গানের squad-এর

কথা।—against famine, hoarders, black-marketeers, smugglers ইত্যাদি। ফলে নবজীবনের গান অনেক গাইতে হল, আবৃত্তি করতে হল। অমূল্য আবেদন ইত্যাদি অনেকেই আমাকে নানানভাবে সম্বাদন করেছেন—সাহায্য করেছেন.....কমরেড.....আমার কাছে এসেছিলেন। ২/১ দিন আমার কাছে ছিলেন।.....আমি আমার party-র সঙ্গে formally যুক্ত হয়ে কাজ করছি। এই প্রায় ৬৪/৬৫ বছর বয়সে বা সাধ্যমত তাই চেষ্টা করব।...যেখানে—creative artistরা কখনও মরে না, বুড়ো হয় না। We are the dreamers of dreams—!!.....”

কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উৎসবের সাক্ষ্য বটুকদার মনে যে পুরনো স্বপ্নের আনন্দে উদ্ভাসিত ছিল তারই প্রকাশ রোপিতে পাই তাঁর ১৭. ১. ৭৬-এ লেখা চিঠিতে। তিনি আমাকে লিখেছিলেন—“শঙ্কু, বিজ্ঞান ও আমি বহুদিন বাধে এক আশপায় হয়েছিলাম। আলোচনাচক্রেও অনেকে বোঝান করেছিলেন এবং খোলাখুলিভাবে অনেক কিছু discussed হয়েছিল। আমি ও সুভাষ গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতি অনেকেই বলেছিলাম।..... এই উপলক্ষে আমি একটা নতুন গান লিখেছিলাম।.....” অল্প কয়েকটি কথার কি স্বপ্নের প্রাণবন্ততার প্রকাশ। এর কিছুকাল পরে বিনয় দায়ের মৃত্যুবার্ষিকী পালন প্রসঙ্গে আমার এক চিঠির উত্তরে বটুকদা ১৫. ৫. ৭৬-এ লিখেছিলেন—“বিনয়ের মৃত্যুবার্ষিকী সম্পর্কে আমিও চিন্তা করছি।.....বর্তমান পরিস্থিতিতে খুব বৃহৎ আকারে কিছু করা সম্ভব হবে কিনা বুঝতে পারছি না। তবে response আশা করছি। শুধু তার গান গেয়েই কর্তব্য শেষ নয়। তার বিশিষ্ট পথিকৃতের আদর্শ role সম্বন্ধে আলোচনা, সেমিনার এবং এটা খুব জরুরী—বিনয় squad type এর active ও সবল গানের দল। বা শহরে, গ্রামে, শ্রমিক এলাকার, কিম্বা এলাকার ছড়িয়ে পড়বে—নাটক নিয়ে গান নিয়ে—ballet ইত্যাদি নিয়ে—with utmost dedication and commitment। তা না হলে কোনও enduring কল হবে না। আমাদের তো তো বেলা পুইয়ে এসেছে। নতুন তরঙ্গ squad তৈরী করা অত্যাৱশ্যক। এ বিষয়ে বিজ্ঞানকে নিয়ে কমরেড ব্যাসের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে চিহ্নর সামনে।.....একটা strong ও সুগঠিত training centre, সঙ্গে performance team.....।” এই বয়সেও কত স্বপ্ন, কত আশা নিয়ে বটুকদা প্রতীক্ষায় ছিলেন নবজীবনের সুখোদয়ের।

এই প্রচণ্ড আশাবাদের মধ্যেও বয়সের জীর্ণতা ও পরিবেশের বিরূপতায়

বটুকটা হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। হয়তো মনের ভেতর এক ধরনের ক্লান্ত হয়েছিল। তারই প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর ১০.১১.৭৬-এর চিঠিতে যাতে বটুকটা লিখেছিলেন—“তোমার দীর্ঘ বৈহলিপি পেরে আনন্দিত। জীবনের অনেক ঘাট পেরিয়ে পৌঁছেছি বর্তমানকালের ঘাটে। বড়বড় পেরোনো পাল ছেঁড়া মাস্তুলভাড়া নৌকা একটা বেরামতি আশ্রয় চায়। তুমি বা সব দীর্ঘ মন্তব্য করেছো.....এর ভিতর কালোপায়ী কিছু আত্মসমালোচনাও আছে। যা আমাকে হুঁহ করে তোলে। সংঘর্ষের dialectics-ই জীবন। অবক্ষয় ও অপচয়-এর অবশ্যস্বামী পরিণতি হলো নতুন বিপ্লব আনার, নতুন পাতা পড়ানোর স্বপ্ন অরণ্য দেখতে থাকে। আমার মানস অরণ্যকের অনেক মহীকূহ পড়ে গেছে, বরষাপাতার অরণ্যতল ভরে গেছে। কিন্তু এটাইতো সব নয়। আবার বসন্ত আসার প্রতীতি, আবার নতুন পাতা পড়ানোর আশ্বাসন।.....একটা শুণু কোড থেকে যায়। সামূহিকের সাধনা, বিপ্লবের সাধনা আত্মকেন্দ্রিকতার পৌছুল কি করে। লেনিনের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে এ বিষয়ে: পুরানো বাবুয়া চামড়ার নীচেই লুকিয়ে থাকে। সুবিধা পেলেই মাথা চাড়া দেয়—তাই eternal vigilance। আমার প্রায় মন বিপর্যত। কি করা যায় তাই ভাবছি।..... কিছু লেখার কাজ আছে, আত্মজীবনী, কবিতা, গান.....। পাহাড়, অরণ্য, সাধারণ কৃষিজীবীর সরল সারিধা...এই বর্তমান নিম্নলিখিত polemics এ জড়িয়ে না পড়ে সত্যিকারের creative কিছু। শুণু conference থেকে conferenceএ, সেমিনার থেকে শুণু সেমিনারে এই অলাভচক্রে চংক্রমণ।.....শুণু বড় বড় প্রেক্ষাগৃহে বক্তৃতা, হাততালি.....বাই হোক,.....তালো থাকো হুঁহ থাকো.....।”

হায়দ্রাবাদ বাঙার আগের দিন আমাকে শেষ বে চিঠি লেখেন তাতে বিনয় দ্বারের তৃতীয় বৃত্তাবধিকারী পালনের কথা, ঢাকার সত্যেন সেনের বাস্তুহীনতার কথা, বিনয়দ্বার দ্বী জয়বোধির কথা, চিহ্নদ্বার কথা জানিয়েছিলেন শ্রীতি ও সন্মমের সঙ্গে। বটুকটার চিঠিগুলো ধারাবাহিক পড়লে একটা প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ হুঁহপ্রাণ বিবেকবান মানুষকে পাই যিনি অনেক কিছু দেবার জন্য হুঁহাত বাড়িয়েছিলেন—এসো নাও, সব কিছু উন্মোচ করে দিচ্ছি। এই তো সেই মধুবংশী বিবেক যিনি জীবনের ঘাটে ঘাটে কিয়ি করে বেড়ালেন তাঁর গান, তাঁর বিপ্লবী সাধনার প্রীতিক্রমে। বেধানে বিদ্রোহী কবি নজরুল এসে আত্মসমর্পণ করলেন, সেখানে বিপ্লবী কবি

জ্যোতিষ্মিত বৈজ্ঞানিক আয়তন বিপ্লবের ধ্বজা তুলে ধরলেন, সংগ্রাম করলেন কঠোর এবং নির্মম। আঘাত, প্রত্যাঘাতে অবদমিত হয়নি মন। সংগ্রামে পড়ন ও মৃত্যু ঘটে। কিন্তু বিবেকের মৃত্যু হয় না।

জ্যোতিষ্মিত বৈজ্ঞানিক ছিলেন সত্যিকারের বিপ্লবী শ্রম ও রসরূপময়-শ্রম। এবং অসাধারণ এক সংগঠক। বিপ্লবের স্বপ্নে জীবনদর্শনের সঙ্গে একাত্ম করতে পেরেছিলেন বলেই বেধনা ও আনন্দ দুইই পেরেছিলেন।

চরিত্রের মাদুর্য ও বলিষ্ঠতা এবং সংহতির প্রতি একাগ্রতা নিয়েই তৈরি এই মাহুঘটি। তাই তিনি আমাদের “মধুবাংশী বিবেক”।

তার গান গেয়েই তার মনের কথা বলি—

“এই যে আমরা মিলছি হেথায়

নেই কো হানাহানি

(আহা) কোনও গরমিল হবে না হবে না তা জানি।

কেউ বা সাধা কেউ বা কালো

কেউ বা মন্দ কেউ বা ভালো

কেউ বা নরম কেউ বা গরম হরেক রকম প্রাণী।

কোনও গরমিল হবে না হবে না তা জানি।”

বটুকদার স্মৃতি

শ্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বোম্বাইয়ের প্রান্তবর্তী আন্ধ্রপ্রদেশে আমাদের সেন্ট্রাল ট্রুপ-এর আত্মনা। বাড়িটি বেশ বড়সড়—চারিদিক প্রচুর গাছপালা দিয়ে ঘেরা। ঘুরে ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। জনবসতি খুব একটা নেই। তখন আমাদের প্রতিবেশী বলতে ছিল কিছু জার্মান যুদ্ধবন্দী।

ভোরবেলা—মানে শেষ রাত। তারাকালি তখন রান হয় নি। চাঁদের আলোর পাঁছের পাতা ঝকঝক করছে। নাচের ছেলে-মেয়েরা তখনও ঘুমিয়ে। ওদের শরীর-চর্চা একটু ঘেরিতে শুরু হয়। এমনি একটা সময়ে উঠে তানপুরা নিয়ে রেওয়াজ করতে বসেছি। রবুদার (রবিশঙ্কর) কাছে শেখা একটি ভোরবেলাকার সুরে—“জাগো জাগো মুসাফির.....নয়া অরুণ হয় উদয়.....।” হঠাৎ পিঠের ওপর একখানি স্নেহমাখা হাতের স্পর্শ পেলাম। চেয়ে দেখি বটুকদা। আমার সঙ্গে তিনিও গলা মেলালেন। পেয়ে চললেন—ভৈরবী.....আশাবরী...ভৈরবী...। বটুকদা এইরকমই। নিঃশব্দে কাছে চলে আসতেন। বিনা জুমিকাতেই আপন করে নিচ্ছে পারতেন যে কাউকে।

বটুকদার সঙ্গে আমার পরিচয় গণনাট্যের গান গাইতে গিয়ে। তিনি গান বাঁধতেন, সুর দিতেন ও আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতেন। দৈনন্দিন নানান তুচ্ছ কথা—কালের মধ্যেও তাঁকে পেতাম অতি সহজ ভাবে। সহজাত কর্মতায় আশ্চর্য গম্ব বলতেন, নির্যল হাতে মাতাতেন সবাইকে। এই সঙ্গীতপ্রেমিক সহজ মাছুষটিকে আর সবাকার মতোই ভালোবেসে কেলেছিলাম—তাঁর প্রতিভার অসামান্ততার কথা জানতে বা বুঝতে পারার অনেক আগেই। তাঁর গানের মতো তাঁর ব্যক্তিত্বের আবেদনটিও ছিল গভীর অথচ সহজ। তখন ৫০-এর মধ্যভাগ। বাঙলা জুড়ে বাচ্চা-কোলে

বেয়েবের কণ্ঠে একটি মাত্র ছুর ভেসে বেড়াচ্ছে “আগো একটু ক্যান দাও।” আমি তখন ছাত্রী, রাজসাহীতে। কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে আমরা আমরা চুক্তিপত্রিত্বের অঙ্গ লক্ষ্যবানী খুলে বিদেশী শাসক হুই হারে এলেপ দিছি মাত্র। এমন একটা সময় হাতে এল বিনয় রায়ের লেখা একটি গান লিকলেটের আকারে। আমরা তাতে নিজেদেরই জানা প্রতীতি ছুর লাগিয়ে প্রত্যন্ত ফেরী করে পথে পাইতাম :

“আগো আগো ভারতবাসী

আর কত সুখাবি রে।

নিঃকণ্ঠে পরবাসী গোলাঘরী সর্জনশী

সৃষ্টি কতকাল হবে রে ॥”

আর মাঠে মাঠে গেয়েছি হরিণ কুশারীর লেখা গান—“সোনার বাংলা হল ক্ষয়ন এক সাথে সব চল”—। গান পাওয়াটা যে আশ্চর্যের, প্রতি-বাহের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে সেটা অসম্ভব হলেও মনে জাগতে শুরু করেছে। এই সময়কার সুখ-বিদীর্ণ বাঙলার বুক থেকেই সেদিন অল্প নিবেছিল কবি ও ছুরকার জ্যোতিরিন্দ্রের ‘নব-জীবনের গান’, এ হল সেই সময় যখন “গান ছিঁড়ে ছিঁড়ে উঠে আসে পথে ককাল-সার ফানি।” রাজসাহী থাকাকালীন ‘নব-জীবনের গান’ দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কারণ কলকাতার গানের জোয়ার পঙ্খার পাড়ে পৌছতে অনেক ঘেরি হত। তাই পিছিয়ে পড়া পূর্ব-বাঙলার নহর থেকে প্রথম যখন মহানগরীতে এলাম, তখনই সে সুযোগ হল। কখন কোন সময় মনে নেই। একদিন মহান আলি পার্কে এক সাংস্কৃতিক অঙ্কণে প্রথম শুনেলাম ‘মধু-বাণীর গান’ শ্রুতবার কণ্ঠে। এই প্রথম পরিচয়। সেলাম কবি জ্যোতিরিন্দ্রের। তারপর ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে একদিন দেখলাম ‘নব-জীবনের গান’-এর অপেরা। আমার জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন অঙ্কণ। গানের ভাবা ছুর শুধু নতুনই নব, তারের এমন অপূর্ব মিলন। যবীজসকীতে ছাড়া আর কোথাও পাই নি। প্রতিটি গান আমাদের উচ্চাঙ্গ নজীরের হুয়ে বীধা, নহতো বাঙলার পল্লীপীতি হুয়ে জড়ানো। “হরবারী কানাকড়কে রাজহরবার থেকে আমি এনেছি মাহুদের হরবারে, পথের হরবারে।” একথা বটুকদার বারবার বলেছেন। যে কল্প রাশিগীতে বিবহিনী কান্দে তার প্রিয়জনের ব্যথার, সেই হুয়েই বটুকদার জানিয়েছেন—ঘ্যানের মাহুকে আজ মিলে গেছে হাজার মাহু।” আবার বলিষ্ঠতার হুয়ে বলেছেন—

“মিথ্যা এ হাধাকার ধ্যান ভাঙো।” তাঁর বেলাকার প্রভাতী রাগে
মাহুঘের মুক্ত জীবন-প্রভাতের নির্দেশ দিয়েছেন—

“ঐ বুঝি প্রভাতের প্রথম আলোর চূড়া

দূরে দেখা যায়।”

মনে পড়ে স্বাধিক (ঘটক)-এর এই লাইন-কটির প্রতি একটা আকর্ষণ
দুর্বলতা ছিল। দেখা হলেই এই দুটো লাইন স্তন্যে চাইত। গুর ছবি-
কলোতেও তাই বটুকদার গানের এই কটি পংক্তি উচ্চারিত হয়েছে
বারবার।

ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সাল নাগাদ চলে গিয়েছিলাম বধেতে গণনাট্যের
কেন্দ্রীয় আন্দোলনের তাসিমে। আন্দোলনে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত
সাবাদিনই চলত আমাদের নাচ-গান ও ব্যালের প্রস্তুতি। বিনয়দা
লিখতেন বাঙলা গান, প্রেম ধওয়ান হিন্দীতে। আর শান্তিদা-শচীন ও
শর্মার চলত নানা রকমের নাচের প্রস্তুতি ও মহড়া। এরপর কিছুদিন
ববুদাও (ববিশকর) এসেছিলেন আমাদের মাঝে। আমাদেরই অহরোধে
তিনি কবি ইকবালের “সারে জঁহা সে অচ্ছা” গানটিতে সুর সংযোজন
করেছিলেন, যে গান আজ সারা ভারতে প্রায় জাতীয় সঙ্গীতের মতোই
পাওয়া হয়ে থাকে। এরই মাঝে সেই আন্দোলনে একদিন বটুকদা
এসে হাজির। বধেতে তিনি বেড়াতে আসেন নি। এই সৃষ্টিপাল
মাহুঘটি এসেছিলেন সঙ্গীতসৃষ্টির তাসিমে। পরে বৌদির কাছে (বটুকদার
জী) শুনেছিলাম যে তখন বটুকদার ছেলে খুবই অসুস্থ। হঠাৎ একদিন
বটুকদাকে আর দেখতে পাওয়া বাজে না। কোনো খবর নেই।
একদিকে অসুস্থ ছেলে, আর-একদিকে বটুকদার জন্ম চিন্তা। একমাস পর
হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি পেলেন—“আমি বধেতে এসেছি।” অসম্ভব
স্নেহমূল সংসারী মাহুঘ, অথচ সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে
পারতেন বটুকদা শুধুমাত্র সৃষ্টির প্রেরণাতেই। তা নইলে বোধহয় সৃষ্টি
করা যায় না।

আন্দোলনে সাবাদিনের কাজ শেষ করে আমরা সবাই স্তরে পড়তাম।
কিন্তু অনেকরাত পর্যন্ত দু-তিন জনের গলার আওয়াজ রোজই পাওয়া যেত।
শান্তিদা-বিনয়দা ও বটুকদার গলা। পরে বুঝতে পারি সে ছিল বটুকদার
নতুন রচনা নিয়ে অঙ্গনা-কলনা। ববুদা থাকতেন একটু দূরে ঐ একই
বাড়িতে, বৌদি অরপূর্ণা ও ছেলে সন্তোকে নিয়ে। এমনি ভাবে আমরা

একদিন দেখি আমাদের জন্ম নাচের একটি নতুন item প্রস্তুত, 'গাজন'।
শিবের গাজন—হর-পার্বতীর দলের বগড়া।

“(একদিকে) নন্দী নাচে ভূদী নাচে ভূতের দল।

(আবার) ভাকিনী বোগিনী নাচে শিবারা সকল।”

এই দুই দলের নাচের পরীক্ষাটা বটুকদা করেছিলেন বিভিন্ন রসের
পরিপ্রেক্ষিতে। যেমন হস্তরস, ভরাবহ রস, শূন্যরস ইত্যাদি। অল্প
অল্প ভূতুড়ে ছন্দ তৈরি করেছিলেন তাঁর ভাষা ও বোল দিয়ে। যেমন—

“থট থট থট থট ককাল বাজে

ক্রিম ক্রিম ক্রিম ক্রিম ধুপ—

খল খল খল খল অটহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—।”

তারপরই ধাবার ভরিয়ে তুলতেন শূন্যরসে, অপূর্ব মিষ্টি কীর্তনের স্বরে—

“নব ঠমকে নাচিছে রাই...

নব স্নলঘর শ্রাম সোহাগিনী

মবি বলিহারী বাই।”

এই সমস্ত অহুষ্ঠানটি পরিচালিত-হত শুধুমাত্র জিনটি বস্ত্র নিয়ে—বাঙালার
ঢাক, চোল ও কাঁসর। ঢাকের সমস্ত বোলই ছিল বটুকদার দেওয়া।
আর শিব, দুর্গা, নন্দী-ভূদী সবার পোশাক ছিল পুরো চটের। চটের
ওপর হুন্দর করে একেছিলেন চিত্র লা (চিত্রপ্রদান)। এই অহুষ্ঠানটি
‘অমর-ভারত’ বালের সঙ্গে বহুবার কলকাতায় দেখানো হয়েছে। বারা
সে জিনিষ দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে। সম্পূর্ণ হল ঘরটি ভরে
উঠত অল্প এক জমাটি অহুষ্ঠানে—ঢাক ও চোলের অপরাধ বোলে।

বিভিন্ন সময়ে করেকটি বদেশী গানেও বটুকদা স্বর সংযোজনা করেছিলেন।
আজাদ হিম্ব কৌজের গান “কদম কদম বচায়ে বা” আকাশবাণী কলকাতা থেকে
আমরা ১৫ই আগস্টের পর শ্রেয়েছিলাম বটুকদার স্বরে। শিবরত্ননীতে
গিয়েছিলেন তারানা, কবি ইকবালের লেখা “কলাতা হার তেরা
নজারা হার হিম্বোতা। ভুবকো”—দেশবাতায় এই কান্তির আবেদন—
“ন সমঝোগে তো মিট বাও পে।” আর স্বর দিলেন বিসমিলের গান—
“সরকরানী কি তমারা রুব হমারে ছিল মে হার”—প্রকৃত কাণ্ডহালীতে।
এই প্রতিটি গানই প্রচলিত গানগুলির চাইতে অনেক প্রাণশালী ও উচ্চাঙ্গের।
আর “এস মুক্ত কর” তো আছেই। অনেকে হয়তো জানেন না যে গণনাট্য
সংঘের আনুগত্য ছিল বটুকদারই লেখা আর একটি গান—

“আমরা সবাই মিলেছি হেথায়

মিলেছি বেহে ও মনে।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘে

(নব) বৃগ্ণ সঙ্কীর্ণণে।”

কিন্তু তাকে সরিয়ে দিয়ে “এস মুক্ত কর” তার আপন স্থান করে নিয়েছে।
বোধহয় তার তাক আরও বৃহত্তর শিল্পী-সমাজের কাছে পৌঁছয় বলে।

এর পরবর্তী একটা অধ্যায় বটুকদা কাটান দিল্লীতে। এখানেও তাঁর
শেষ-মন অলস হয়ে যেনে ছিল না। তিনি এবং বিনয়লা মিলে মাতিয়ে রাখতেন-
কম্বোজবাসের বজীর সংসদ। ‘কান্ডনী’ থেকে ‘লক্ষকর্ণ’ পালা সব কিছুই
তাঁর প্রবোজনায় অপরূপ রূপ নিত। কিন্তু এ সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য-
কাজ বোধহয় তুলসীদাসের ‘রামচরিতমানস’-এ জ্বর সংযোজন করে জটী
তাঁর ‘রামলীলা’। তখন তিনি ছিলেন ভারতীয় কলাক্ষেত্রে। আমার
সৌভাগ্য হয়েছিল সে সময় (১৯৫৯ সাল নাগাদ) প্রায় এক বছর নানান
জায়গায় বটুকদার সঙ্গে সব গান গেয়ে বেড়ানোর। বটুকদার এ রচনাটি
সম্পূর্ণ অস্ত্র ধরনের। তুলসীদাসের রামায়ণ হিন্দিভাষী সাধারণ মাহুদের
প্রাণের জিনিস। কত দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ লক্ষ সাধারণ প্রাণের মাহুদের
মধ্যে রস সিক্তন করে এসেছে এই কাব্য। বটুকদাতো বাঙলাদেশের মাহু।
কিন্তু কোনো এক আশ্চর্য ক্রমতার বলে তুলসীদাসের মূল জ্বরটাকে তিনি
তাঁর গানে ধরে কেলেছিলেন। রাস লক্ষণের জয়ের দৃষ্টের জ্বর শুনে মনে-
হয় যেহাতি মেয়েরাই গাইছে তাদের প্রাণের নব জাতককে দিয়ে। শুকের
ভক্তি, শবরীর ব্যথা কিংবা রামের বরণা—সবই তাঁর হয়ে এক অপরূপ অসম-
পেত। গান গেয়ে ছাড়া তা বোঝানো সম্ভব নয়।

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। উচ্চারণ ঠিক আছে কিনা দেখবার
জন্য বিখ্যাত এক হিন্দী কবির কাছে আমাদের বেতে হয়েছিল। সমস্ত
‘রামলীলা’টা শুনে তিনি অভিভূত হয়ে বললেন—“অপরূপ হয়েছে। ঠিক
যেখানে যেমনটি দরকার। ভারতবর্ষে আর কেউই এ জিনিস করতে
পারে নি।”

‘রামলীলা’র পুঙ্খ কণ্ঠের সমস্ত গানই বটুকদা নিজে গাইতেন।
বটুকদাকে এত বিতোয় হয়ে গাইতে আমি আর কখনও দেখি নি। আমিও
এই গানগুলি শুনে অভিভূত হয়ে পড়তাম। শুধু শোনা নয়, আমি নিজেও
কখন শবরীর গান গাইতাম—“হমারো রাম ন অজ হু আরো”—মনে হচ্-

আমিই শব্দী। শ্বরের এ আবেহন ববীজনাথ ছাড়া আর কারও গানে আমি পাই নি। কলকাতার রাজনীতি-সচেতন সংস্কৃতির জগতে সমাবৃত বটুকহাকে তো আমরা আগে থেকেই চিনতাম। কিন্তু 'রামলীলার প্রকাশ পেল তাঁর নতুন এক দিক। এখানে তাঁর গান এসে বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতির চিরায়ত খারাটির সঙ্গে। সম্ভবত এই কারণেই এই নৃত্যনাট্যটির আবেহন ছিল সর্বজনীন। বিহঙ্গ হিন্দী কবি থেকে শুরু করে ভামলীর চিনিকলেয় মজুর বা মীরট ক্যাপ্টেনমেটের জওয়ান—সবাইকেই অতিক্রান্ত হতে দেখেছি 'রামলীলা' জেনে। আজকাল বহন হিলি ফিল্ম ও নানা আয়নার দেশী-বিদেশী শ্বরের কৃত্রিম সংলগ্ন চলছে তখন বটুকহার গানের কথা আরও বেশি করে মনে পড়ে।

এরই পাশাপাশি একটা করুণ স্মৃতি আমার মনে এখনও বিধে আছে। 'ভারতীয় কলাক্ষেত্র'র যোগ দিয়ে বটুকহা 'রামলীলা' সৃষ্টি করেন। কলাক্ষেত্র পরিচালনা করতেন প্রধানত কয়েকজন বিল-মালিকের স্ত্রী। এইসব মাননীয়ারা শিল্পীদের খুব সামান্য মাহিনা দিতেন। বটুকহার মতো শ্রী ও পরিচালকের ক্ষেত্রেও কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। আমার এখনও মনে আছে অটোর পাট করত একটি খুঁই পরিব শ্বরের ছেলে। গ্রিহাসালের সময় বেকারদার পা পড়ায় গুর পায়ের হাড় ভেঙে যায়। কিন্তু কেন্দ্র তার চিকিৎসার সামান্যতম ব্যয়ভারও বহন করে নি। এ ছাড়াও দেখেছি শ্রীতিনাট্যটি পরিচালনার কতৃপক্ষকে মাঝে মাঝেই হস্তক্ষেপ করতে। এগুলি খুব অসহনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু এ সমস্ত সহ করেই বটুকহাকে কয়েক-বছর কাটাতে হয়েছে দিল্লীতে। অবশ্য জীবনে বহু জিনিসকে উপেক্ষা করে চলতে জানতেন তিনি। শ্বহ প্রাণশক্তির একটা অকুরন্ত উৎস ছিল তাঁর মধ্যে। মীরটে দেখেছি আগের দিন বহুদূরত অবধি 'রামলীলা' পরিচালনা করে পরদিনই সোরবেলা দলের ছেলেদের সঙ্গে চললেন ফুটবল খেলতে। আমার বিকেলে টেবিল টেনিসও খেলতেন। দিল্লীতে কয়েলবাগে বিনয়দার বাড়িতে একদিন রাত প্রায় ১১টার সময় আমরা সবাই জয়ে পড়েছি। হঠাৎ গুনলাব সিঁড়ি বেয়ে একটা গান গুপরে উঠে আসছে। "এমন চাঁদের আলো মরি বহি-সেও ভাল, সে-মরণ স্বরণ সমান—আজি এসেছি....." উঠে দেখি স্বঃ বটুকহা। ওপরে এসেই গানটির সঙ্গে নাচ জুড়ে গিলেন—প্রকৃত নাচই—বিনয়দা ও বটুকহা মিলে। সেদিন সত্যিই ছিল পুর্ণিমা। তাই বটুকহাকে আর ঘরে রাখা যায় নি।

বটুকদার কথা বলা সম্পূর্ণ হয় না। যদি আমি বৌদির কথা না বলি। বটুকদার যোগ্য জীবন-সঙ্গিনী ছিলেন উর্মিলাবৌদি। ব্যক্তিগত জীবনে খ্যাতি ও অর্থকে বটুকদা চিরদিনই উপেক্ষা করে চলেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে ভালোমাহুকের স্বযোগ নিয়ে তাঁর ওপব অসিচারও করা হয় নি। কিন্তু বটুকদা বা বৌদি কারও কাছ থেকেই ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনো খেদ বা অভিযোগ কখনও শুনি নি। বরঞ্চ দিল্লীতে ঐ স্নান সাহিনার বিরাট ব্যয়ভার বহন করার পরেও বৌদিকে বলতে শুনেছি—“তুমি, যদি আমার গাছতলাতেও ঝাঁড়াতে বলো, আমি তাই করব।” এমনি করেছে আমাদের নিষ্ঠাবতাব বৌদি বটুকদাকে তাঁর সমস্ত কাজেই আত্মত্যাগ ও সাহায্যকৃত্তি দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, সাহায্য করেছেন।

দিল্লী থেকে অবসর নিয়ে বটুকদা চলে এলেন কলকাতায়। বটুকদাকে আমাদের মধ্যে ফিরে পেয়ে আমরা খুঁই উৎসাহিত। কিন্তু অবকাশ তাঁর হয় নি। শেষের দিনগুলি তিনি বেশ আরও বেশি করে নিজেকে সবদিক-মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের “কচি কচি-বাঁশপাতার যতো হাত” তুলে ‘বটুকদা মিস’-এর সুরের খেলা শু-ছেলে হাতত। সাধারণ ছেলেদের, যারা তথাকথিত সংস্কৃতিবান পরিবার-ভুক্ত নয়, নিয়ে বঙ্গসঙ্গীতের দল ‘জগবন্দ’ গড়ে তুলেছিলেন। এই অভিনব অর্কেস্ট্রার বহু ছিল ঝাড়ি, কার্টের বা বাঁশের টুকরো, লোহার টুকরো, বাঁশি ইত্যাদি। কলকাতার মাঠ-ময়দান তো আছেই। তা ছাড়াও-২৪পয়গনা, বেহিনীপুর, হুগাঁপুর, পুর্নুলিয়া বেখানে যখন কেউ ডেকেছেন—সেখানেই বটুকদা গেছেন। বটুকদা খুব ভালো সংগঠক হয়েছেন। কিন্তু একজন স্রষ্টার কাছ থেকে সাংগঠনিক দক্ষতা আশা করা কি-টিক-সাধারণ সঙ্গীতশিল্পী হিসেবেই আমরা অনুভব করেছি যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে শিল্পী ও সংগঠক আলাদা থাকা প্রয়োজন। স্রষ্টার প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাটুকু বজায় রাখতেই হয়তো তিনি নিজেকে কখনও সাংগঠনিক জটিলতার মধ্যে জড়ান নি। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সন্ত হাতে ধরে রেখেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতীক। ১৭ চলার শাকার হাতের মুঠি শিথিল হয়ে যায় নি।

বাত্তলীয় বা তাঁর বাইরে বহুবারই বটুকদার পান পেয়েছি। বটুকদার প্রতিটি পানই গাইতে আমার খুব ভালো লাগে। কোথায় জানি না এর একটা অভ্যাসের আবেদন আছে। মাঠে, হাটে, ভারতবর্ষের

বিভিন্ন প্রান্তে গণনাট্যের গান গাইতে গিবে বারবার আমাদের চোখের
জলের সাড়া শ্রোতাদের সিক্ত চোখে পেয়েছি; আমাদের গলার সঙ্গে
অন্যতার সমবেত কণ্ঠ এসে মিলেছে। তাই আজ যখন দেখি নতুন
ছেলেমেয়েরা অনবরত আবেগের প্রকাশ খোঁজে পাশ্চাত্যের গণ গানে,
তখন বড় হুঃ হুঃ হয়; তাবি আমাদের সেই আন্দোলনের উৎসর্গী কোথায়
হারিয়ে গেল।

কিন্তু বটুকয়ার কথা অগ্রহণ বা হতাশার মাঝে শেষ হতে পারে না।
সমস্ত মানি সমস্ত তুচ্ছতাকে হারিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকে যে হুঃ তার নামই
তো বটুকরা।

একদিন বেশব্যাপী ছুড়িকের শব্দ আর স্বত্বকে অস্বীকার করে জয়
নিয়েছিল 'নব-জীবনের গান'। বিশ্বাস করি ভাবীকালে তরুণ-কণ্ঠে ধ্বনিত
হবে তা বার বার অস্বীকার করবে বটুকয়ার স্বত্বকেও। আর আমরা;
পুরনোরা, নতুন গলার আঁবাঁব কবে নতুন আমাদের ঘোবনে শেখা
স্বর্গীয় গান :

"না না না—মানব না মানব না

কোটা স্বত্বরে কিনে নেতো প্রাণপণে

জয়ের রাঙো থাকব না।

অস্তর পেয়েছি নতুন দিনের কাছে।

দিকে দিকে তাই আশার গভীরা নাচে,

পেশিতে পেশিতে রক্তের লাল আলো

বুয়ে দেবে অমাবস্তার বড় কালো

জয়ের রাঙো চুকবই মোরা ধামব না।"

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র স্মরণে

তপতী মুখোপাধ্যায়

কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে পরিচয় বলতে গেলে আমার কৈশোর থেকেই। তাঁর স্ত্রী উর্মিলাদি ছিলেন আমাদেরই পাড়ায় মেয়ে। উর্মিলাদি ও তাঁর ছোট বোন—আমায় বন্ধু—প্রমীলার সঙ্গে ম্যাডকস কোয়ারে কতই না খেলেছি আমরা। সে সব ১৯৩৫/৩৬ সালের কথা। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তারপর পাড়ায়ই আমাই হয়ে এলেন বোধহয় ১৯৩৮ সালে, আর চেনা জানা হয়ে গেল। তখন তো তাঁকে বুঝতে শেখবার মতো বয়স বা বিভাবৃদ্ধি কিছুই ছিল না। শুধু জানতাম পাবনার শীতলাই—এর বিখ্যাত জমিদারের ছেলে—আর কি? না খুব গান করেন... ঠাট্টা হাসি তারাসা...ভাগি আবুদে সরল লোক।

তারপর ১৯৪৫ সালে আমার বিয়ের বরকর্তা হয়ে এলেন তিনিই। তখন থেকে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র হলেন আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—আমাদের বটুক কাকা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সে আত্মীয়তার, সে স্নেহের বন্ধন অটুট ছিল; যদিও আমার ব্যক্তিগত জীবনে এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিন্তু তিলমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি বটুক-কাকার সঙ্গে আমার সম্পর্কে। আর একথা তো সকলেরই জানা—বটুক-কাকার ক্ষমতা ছিল মেলে সহজে, ছাড়া পাওয়া যায় না, আর তা ঘটে সকলেরই ক্ষেত্রে।

কিন্তু “এহ বাহ্য।”

আত্মীয় বলে নয়, তার চেয়েও বড় কথা তিনি আমার কাছে এক সত্যিকারের স্বয়ংবান, মহৎ, মননশীল, বড় মাপের মানুষ। এ রকম বিশেষত্বহীন, নির্মলস্বভাব, সযত্নে, আত্মভোলা, প্রচারবিমুখ, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লিঙ্গী আর কোথাও বেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। জীবনের আলা-

বন্ধু, যাকে বলে 'স্ট্রীল ফর একসিসটেন্ট'...সবই তো—প্রচুর পরিমাণে তাঁকে ঘিরে আছে, অথচ কিছুই বেন তাঁকে স্পর্শ করছেন, সর্বদাই প্রাণরসে ভরপুর। তিনি বেন বলে ভেসে থাকে রাজহংস—ভানার কখনোই জল বলে না।

প্রচুর বৈজ্ঞানিক, আভিজাত্য ও সম্মানের মধ্যেই তাঁর জন্ম। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে বা মনে তার চিকুমাঝ নেই। তাই শ্রীমতী—এর পৈতৃক ভবিষ্যৎ গৃহ, মাতুল-ভবন শ্রীমতীপুরের রাজা কিশোরী গোবিন্দীর প্রাসাদ বা কর্তৃ-জীবনের অন্ততম ডেরা দিল্লীর কয়েলবাগের সেই ছোট্ট ছ-কামরার ক্যান্টিন...সবই তাঁর কাছে সমান। মনে আছে কয়েলবাগে বটুকাকার বাড়িতে গেছি, কাকীয়ার হাতের রান্না, তাঁর ও আমার ছেলেমেয়েদের সানন্দ চোঁচাচোঁচ, শিশু আর বয়স্কের সমবেত হাসি, সবের ওপর বটুকাকার গানের গুনগুনানি আর 'স্বপ্নাঙ্কুর ভাবায়' নানা পরিকল্পনার কথা বলে বাঙরা.....। অথচ মনে মনে বুঝতে পারছি, আপন গৃহ ছেড়ে শুধু জীবনব্যয়নের জন্যই স্বপ্ন প্রবাসে কি কষ্টেই না বটুকাকা-ছোঁড়া চাষরের চারকোণ একজে বীষবার চেষ্টা করছেন। অথচ এই একান্ত মধ্যবিত্ত জীবন বাপনের রান্না তাঁর শিল্পীসত্তাকে স্ফীত করতে পারে নি। দিল্লী থেকে একটা চিঠিতে আমাকে লিখছেন, "তোমার পূর্ব পত্রের উত্তর দিতে দেরী হয়েছে সে অজ কুমারী। ইতিমধ্যে গত পুরো সপ্তাহ একটা নতুন ballet নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। ২৫শে সেক্সপিয়রী আমি ছাড়া পেয়েছি। এখনও strenuous খাটুনির ক্লাস্তি কাটেনি।"

অথচ এ ক্লাস্তি তাঁকে বিশ্রাম নেবার কথা মনে করিয়ে দেয় নি। কেননা, তিনি প্রতিক্ষপই নতুন করে দম নিচ্ছেন, তাঁর শিল্পীসত্তা স্বষ্টির প্রেরণার সর্বদা সজ্জনশীল। তিনি বধনই আমাদের কাছে আসতেন—জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত এসেছেন—তখনই মনে হয়েছে কথা, স্বপ্ন, প্রেরণার ভরা একটি বছর জলের পাহাড়ী স্বরণাই বেন হঠাৎ আমাদের ঘরের মধ্য দিয়ে বইতে শুরু করেছে। বটুকাকা সঘনো এই উপমাটাই আমার এত বেশি মনে হয়। তাঁর কথা ভাবতে বা লিখতে বসলে বারবার তাই উপমাটি ঘুরে ঘুরে আসে। সংস্কৃতির অসুরভ সম্পদে ঐশ্বর্যময় তাঁর সত্তা, প্রোভের জলের মতোই কত ঘরে ফুঁকা মিটিয়েছে, কত নিতে বাঙরা মনে সকার করেছে বিজ্ঞানপ্রবাহ—এসেছে আলো।

আমার ছেলেবেলা ও কৈশোর কেটেছে সাংস্কৃতিক পরিবেশে। মা

হিলেন কবি। আশ থেকে ৪০৪৫ বছর আগে তাঁর কবিতার বই ‘ফুলহার’ প্রকাশিত হয়েছে। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি অল্পস্পর্শ দেবী, সরলা দেবী। চৌধুরানীর সঙ্গে যাদের যোগাযোগ। বাড়িতে ‘কমল’, ‘প্রগতি’, ‘স্বপ্নগজ’, ‘প্রবাসী’ থেকে আরম্ভ করে ‘ভারতবর্ষ’, ‘বঙ্গবর্তী’, ‘মানসী ও মর্মবাণী’, ‘উত্তর’...কোনো পত্রিকাই বাকি নেই আসতে। সব বাধানো, পোনার জলে যাদের নাম লেখা। অমূল্য সেই সম্পদ তো যাদের সঙ্গে সঙ্গে আহারও। তখন থেকেই শিখেছি লেখক কবি—এঁদের জাতই আলাদা, শিল্পী-শিল্পী ও সাহিত্যিকের জগতই শ্রেষ্ঠ জগৎ।

বটুককারির সঙ্গে পরিচয় বড় বনিষ্ট হতে লাগল, ততই বুঝতে পারলাম তাঁর শিল্প-সাহিত্যের জাতই আলাদা। বেশ তখনো আধীন হয় নি। একালের এই অতি সহজ অতি খোলামেলা আধুনিক যুগ শুরু হতে তখনও কিছু ঘেরি আছে। ছেলেহুময়ে নির্বিশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এত শিল্পী তখন ছিল না। সেকেলে রীতি, সেকেলে আচরণ বধন অটুট ভাবেই টিকে আছে সমাজের বুকে তখন সেই আধা-মাস্তাতার যুগে আমরা বিয়ের বাসরে বরকর্তা বটুককারি নিয়ে গান গাইতে বসলেন। কী গান? না—‘নবজীবনের গান’। আহারও নবজীবনের গান। বার মধ্যে ছুঁতকের কথা, এমনকি “ম্যাকেরিয়ার বেশ হল উজাড়” এমন কথাও। কিছু যে, বামিনী রায়, বুদ্ধদেব বসু, কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, তারাও আছেন সে সভার, কিন্তু সকলেই তো চেনেন বটুককারিকে—সেই আশ্রমভোলা, সমাজনিরম সম্বন্ধে নিতান্ত উদাস সেই শিল্পীকে।

অনেকে হয়তো বিয়ের বাসরে এই ম্যাকেরিয়ার গানে অস্বস্তি বোধ করেছেন, বলেছেন অস্বাভাবিকতার কথাও। কিন্তু আহার তা মনে হয় নি। সেই আলো বলমলে সানাইয়ের স্বরে ভরা সন্ধ্যাতেও ছুঁতকের গান আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল, চৈতন্যকে আগ্রস্ত করেছিল। পরে তো আরও কত বনিষ্ট হলাম, আরও কত ভালোভাবে জানলাম তাঁকে। আমার সামনে এক বিরাট প্রাকশের বন্ধ দরজা খুলে গেল। অথচ ৪০ সালে ছুঁতকের ভয়ঙ্কর চেহারা তো নিজেরই দেখেছি। না দেখে উপায়ও ছিল না। “ক্যান হাও” কান্না জনতে জনতে কান ভাঙতে হয়ে গেছে। ব্যাডল কোয়ার পার্কের লগরথানার খিচুড়ি রান্নার শ্রম দিয়েছি—অক্লিষ্টকর সেই বাস্তব শত শত উপবাসীকে অসীম স্মৃতি থেকে রেখে ছুঁতীও কম পাই নি। বটুককারির গান জনতে জনতে বুঝলাম সে সবই ছিল ভাষা

ভাঙ্গা, কোনো কিছুই বেন-ভালো করে ভাবি নি, দেখি নি। তাদের হুঃখে কষ্ট অনুভব করেছি, বখালায় তা লাঘব করার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সেই কষ্টের প্রকৃত তাৎপর্য আমার নজর এড়িয়ে গেছে। স্বীকার করছি আমার সেই অপরিণত বোধবুদ্ধির দিনগুলিতে ঘেঁষের এই শোণিত হরিৎ-জনসাধারণের অবর্ণনীয় হুঃখের আসল চেহারা বটুকাকার গান ও বিজ্ঞানদার (বিজ্ঞান ভট্টাচার্যের) নাটক 'নবায়' দেখে যেমন বুঝেছি—তেমনটি আগে কোনোদিন বুঝতে পারি নি। আমার জীবনে তো এ এক মহান বিপ্লব। আগে মনে হয়েছে এ সব দৈব দুর্ঘটনার মতো, বিশেষ শাসকের শোষণের ফল। আমার নিজস্ব অক্ষল আনন্দময় জীবন থেকে নিষ্করই আলাদা, কিন্তু কি-ই-বা করবার। মনের এই রকম এক অবস্থায়ই বটুকাকার গান ও কবিতা তাঁর কঠিন সত্য নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। এতদিনের জ্ঞান বিশ্বাস মানসপ্রকৃতিতে ভূমিকম্প ঘটল। তত্বপূরি ছিল বটুকাকার সাম্রাট—তাঁর ব্যক্তিত্ব, কথা, প্রত্যয়। এবং তারপর বটুকাকারই হাত ধরে এলেন বিজ্ঞানদা। এই দুজনের কাছে আজও তাই আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই।

মনে পড়ে যুগের সময়ে কলকাতার তখন আর এক চেহারা। সে সময় বটুকাকা লিখছেন :

“ধাবমান মোটরের হর্ণ আর—

মেঘে মেঘে এরোপেনে শব্দের ধার

আকাশ হেঁড়ে.....বাকী টুপি

কোন আমেরিকান কাপ্তানের

লোলুপ শিখ, তরুণী রাজির পাশে

চাবুক মারে।”.....

তিনি নিজে বলেছেন এই ইমেজ তাঁকে এত নাড়া দিয়েছিল যে কবিতার লেখার ছ-বছর বাক্যে ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ ছবিতে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক হিসাবে যন্ত্রণার দৃষ্টে ককিয়ে ককিয়ে বেহালা না বাজিয়ে তিনি চাবুকের শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র যে জগতে জন্মেছিলেন, বা যে পরিবেশে বাহুব হুঃখছিলেন তার থেকে এ জগতের চিন্তা, বিশ্লেষণ তো একেবারেই আলাদা। মার্কসবাদে স্বীকা বটুকাকার দেশপ্রেম সমাজচেতনা ও শিল্পবোধকে নতুন মাত্রা দিল। তারই কলে বাড়লায় পঞ্চাশের মধ্যভরের পটভূমিকার রচনা

করলেন 'নবজীবনের গান'। বেথানে সাধারণ মানুষের যুগেভাবনা আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, সমস্যা ও জীবন যুদ্ধের বেধনা। হুরেও তেমনি ক্লাসিকাল গানের পাশাপাশি ভাটিয়ালী বা লোকসঙ্গীতের বিশ্লেষণ। সে এক অনবদ্য সৃষ্টি। তারই ওপর ভিত্তি করে শুরু হল বাঙালার সঙ্গীতক্ষেত্রে এক নতুন যুগ।

বটুকাকার প্রভাব সেই প্রথম দিনের মতোই আজও আমার সংস্কৃতি-চিন্তা ও স্বজনশীলতাকে নিরন্তরিত করছে।

সেইজন্তই যখন তিনি দিল্লী প্রবাসী, তাঁর 'নবজীবনের গান' 'মধুবংশীর গলি'র উজ্জল সৃষ্টি যখন বিলম্বমান—তখন, ১৯৭০ সালে, গণনাট্য সংঘের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হয়েও গণনাট্য আন্দোলনেরই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আমাদের 'সংস্কৃতি সংসদ' দিল্লী প্রবাসী বটুকাকার জনসংবর্ধনার ব্যবস্থা করল।

কর্মক্ষেত্রে 'স্ববীজসমন' প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকার আমাদের যুগসমাজের ব্রহ্মবংশের সাজাতিক রুচিবিকৃতি সম্পর্কে আমার মনে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। তাছাড়া কলকাতার আকাশে বাতাসে কুশী হুরের গান আর প্রেরণাহীন আধুনিকতার দাপট...সে তো আছেই। এই দ্বাদশেরী আব-হাওয়ার মধ্যেই বটুকাকার কথা বড় বেশি মনে পড়ত। কোথায় কত দূরে শুধু মাত্র জীবনধারণের জন্য এই অসাধারণ প্রতিভা যুগ করে যাচ্ছেন। অথচ বাঙালি যুবসমাজ তাঁকে জানে না, তাঁর নেতৃত্ব পাচ্ছে না।

কবি বিষ্ণু দে-র সভাপতিত্বে ১৯৭০ সালের ৮ এপ্রিল 'স্ববীজসমন' প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া করে কবি-হুরকার-গায়ক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সভা অনুষ্ঠিত হল। অনেক সংকোচ আর আপত্তির বেড়া ডিড়িয়ে বটুকাকা শেষ পর্যন্ত কলকাতার এলেন। কথা ছিল তিনি নিয়ে গান গাইবেন। কিন্তু চূর্ত্যাবশতঃ তাঁর গলা ধরে গেল, অল্প কয়েকটি কথা মাইকে প্রায় বিশ্লিষ্ট করে বলতে পারলেন। বটুকাকাকে ঘিরে সেদিন যে অস্থানটি হয়েছিল—কোনোদিন তা ভুলব না। শঙ্কু মিত্র 'মধুবংশীর গলি' আবৃত্তি করলেন। বিষ্ণু দে, বিজন ভট্টাচার্য, মৃণাল সেন বটুকাকা সযত্নে বললেন। গান গাইলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হুচিজি মিত্র। 'নবজীবনের গান' গেয়ে শোনালেন 'স্ববীজসমন' শিল্পীরা। ছোটো একটি ব্যালে হল 'ওরা কাজ

করে'। সম্মানপত্র পড়ে তাঁর হাতে প্রছার্য দিয়ে যখন আমি বসলাম, হেসে বটুককাকা কানে কানে বললেন—“বড় বেশি বলেছিল আমার সবছে।”

কিন্তু আমি তো আমি অনার্য সেই মাছটি সম্পর্কে কতটুকুই বা বলা গেল।

ষষ্ঠীয় মহাবুদ্ধে আমারে সমাজেই ভাঙন যখন অনিবার্য হয়ে উঠল, পারিবারিক উত্তরাধিকারকে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করে বটুককাকা গবেশে এসে ঝাঁকালেন। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, মননজীবী কবি। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে নতুন দিনের বার্তা পৌছে দেবার অল্প সংসীতকেই করে নিলেন আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম। ১৯৩৯ সালে বে-আইনী কবিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। অবশ্য কোনোদিনই তিনি পার্টির নেতা নন, চানও নি হতে। ক্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পুরোভাগে ছিলেন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অল্পতম প্রতিষ্ঠাতা। অল্প সেখানেও তিনি গোষ্ঠিপতি নন—শিল্পী, যার সমস্ত সম্পর্ক মাটি ও মানুষের সঙ্গে, কাজ শিল্পের ভাষায় সাম্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা, নবজীবনের অল্প সংগ্রাম। তাই তাঁর গান “এসো মুক্ত তরো অন্ধকারের এই দার” এই আন্দোলনের এবং এই যুগের প্রাণসংসীত। ‘মহাবুদ্ধির গান’ কবিতার মূর্ত হয়েছিল পরাবীন দেশের সম্মানিত জীবনের আহুতি বটুককাকা নিঃসন্দেহে ছিলেন প্রকৃত মার্কসবাদী, কবিউনিষ্ট। তাঁর কথাবার্তায়, তাঁর জীবন-আচরণে আপাত অলঙ্কারতার মধ্যেও কি আবীনতার আগে কি পরে বটুককাকার এই সাম্যবাদী সত্য নিজের প্রাণের প্রদীপটি আলিয়েই রাখতে পেরেছেন। তাই দ্বিতীয় ‘ভারতীয় কলাকেন্দ্র’র কর্মকালে তাঁর নতুন সৃষ্টি ‘রামলীলা’ অল্প রাজ্য পেয়ে যায়। এমন কি ‘লবর্ণ পালার’তেও একই ব্যাপার ঘটে।

জ্যোতিরিন্দ্র বৈজ্ঞানিক তর এইখানেই। উচ্চতরের বুদ্ধিজীবী ও অতি সাধারণ মানুষ সমভাবে তাঁর সৃষ্টিকে, তাঁকে, গ্রহণ করতে পেরেছিল। গণনাট্য সংঘে তাঁর সুরে গানে কবিতার স্বলম্বকে যেভাবে অল্পপ্রাণিত করেছিল তার তুলনা হয় না। আমার তো সবত অল্প তরে গিয়েছিল নরজীবনের গানে। কেননা আমি নিজে অল্পতম নবজীবনই পেরেছিলাম। ব্যতব কারণে আমার পক্ষে গণনাট্য সংঘে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু বটুককাকা জানতেন গণনাট্য আন্দোলন ও বটুককাকা এক হয়ে গিয়ে আমার ক্ষেত্রে কত বড় স্থান নিয়েছিল।

বটুককাঁকা কিছু দে-র কবিতা ‘স্বতি সত্তা ভবিষ্যৎ’-এর সাংস্পতিক রূপ দিয়েছেন। দ্বিতীতে প্রযোজনাও হয়েছিল। আমাদের একটা চিঠিতে লিখলেন—‘স্বতি সত্তা ভবিষ্যৎ’ প্রায় ৪০/৪২ জন ছেলে মেয়ে যোগদান করেছিল। সত্তা ও abstract subject, তৈরী করতে মাসখানেক লেগে যায়। এ একটা অভূত experiment, খানিকটা হিম্মত, অহুবাধ, original বাংলাও।... একটু complicated interesting. ঠিক না দেখলে বোঝাতে পারবো না। বিজ্ঞাবু বা প্রশস্তির সঙ্গে দেখা করে জানতে পারো। তাঁদের খুব ভাল লেগেছে।...অবশ্য এই technique-এ ‘মধুবাসী’র গলিটাও’ করা যায়। তুমি শীঘ্র উত্তর দিও।’

আমি উত্তরে জানিয়ে ছিলাম যে আমি এই experiment-এর সারিষ নিতে রাজী। তারপর তো উনি ফিরে এলেন কলকাতায়, নিকিত সেটা আর পরংমুহু তাবের অস্ত হল না।

এই তো সেদিন হায়দ্রাবাদ বাবার আগে কথা হল ফিরে এসে নতুন কিছু কাজ নিয়ে বসার বাবে। আমরা বলেছিলাম ক্যান্সিকাল গানে যেমন ভোরে উঠেই গলা সেধে রেওয়াজ করে, শিল্পের গলাও তেমনি তৈরী করতে হয় তাবের আপন নিয়মে, পাখিদের কলকাকলির মতো। ইচ্ছে ছিল বাড়িতেই শিল্পের সেই গানের ক্লাস বসাব, যেখানে বটুককাঁকা মনের সহজ আনন্দে তাবের গান শেখাবেন।

একদিন বলেছিলাম—‘বটুককাঁকা, অনেক সময় নষ্ট করেছি, আর নয়। এবার কিছু কাজের কাজ করতে চাই। কিন্তু শরীরের বা অসুস্থ। বাচব তো? দাঁত চেপে চেপে হেসে উঠে বটুককাঁকা বললেন—‘বলিস কিরে? এতসব কপাও তোর মনে আসে নাকি? আমি তো রোজ নতুন করে বাঁচি। কত কিছু করার আছে। বলসে আকার কোনো factor নাকি?’

আশ্চর্য সেই প্রশংসিত এইভাবেই আমাদের আগিরে দিত।

গত কয়েক মাস ধরে শিল্পের গান শেখানোর ব্যাপারে বটুককাঁকা আমাদের সঙ্গে বসে একটা পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। তাঁর মাধার প্রতিদিন কত নতুন স্বর নতুন পালা লেখার কথা স্মরণ। বলেছিলেন আন্তে আন্তে ছোট ছোট দল তৈরী করে নিয়ে তিনি কলকাতার বাইরে বেরিয়ে পড়বেন—অন্ত শহরে, গ্রামের দিকে। রীতিমত একটা আন্দোলনের

মতো শুরু করা যেতে পারে, বাতে বীয়ে বীয়ে অনেক সব নতুন স্বর-
কার নতুন গাইয়ে বেরিয়ে আসে নানান আয়গা থেকে।

কলকাতা থেকে মাঝে মাঝেই তিনি পালিয়ে যেতেন বাড়িগ্রামে,
সেখানে কিছু জরি কিনেছিলেন ‘কর্ধনী’ নাম দিয়ে একটি কার্য করে
জীবনের আর একটি দিককে পূর্ণ করবেন বলে। তাঁর ঘরে হুয়েকা ও
আমাই জ্যোতিরিন্দ্র ব্যানার্জিকে বসে থেকে আনিয়ে বলিয়েছিলেন সেখানে।
অনেকে তাঁর এই অসাংসারিক ব্যবস্থাতেও হরতো আবার বিম্বিত হয়েছেন।
একটা চিঠিতে তিনি মেয়ে-আমাইকে লিখছেন “...Tractor দেখা
হলো? টাকা সংগ্রহের সম্বন্ধে পরে detailed লিখবো। কিন্তু একটা
ব্যবস্থা করবই।...বাড়িগ্রাম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হলে মাথা ঠাণ্ডা করে
boldly উপযুক্ত ভাল সংবাদ with confidence দেবে।”

‘কর্ধনী’ তাঁর স্বপ্ন ছিল। তিনি পাখি ভালবাসতেন, প্রকৃতিকে
ভালবাসতেন। অনেক পরিকল্পনা ছিল তাঁর। এটিকে বেশ develop
ideal farming-এর ব্যবস্থা করবেন ভেবেছিলেন। তাও হল না।

বটুকাকাকার তাঁর অতিপ্রিয় ছোট মেয়ে মিতুকে (স্মৃতি) নিয়ে বড়
ছেলে শান্তনুর কাছে হারজাবাদে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে কেন্দ্রার পথেই
তো সব শেষ। একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগে, হারজাবাদ থেকে বড় মেয়েকে
লিখছেন একটা চিঠিতে—“বধাসময় চিঠি দেবো। আরও অন্ততঃ ৭/৮
দিন আছি।” সে চিঠির তারিখ ১৮/১০/৭৭।

সত্যিই আর ৭/৮ দিনই তিনি থাকলেন—হারজাবাদে নয়, এই পৃথিবীতেই
—যাকে তিনি বড় ভালবাসতেন। ৭/৮ দিনের একদিনও বেশি নয়, ২৫শে
অক্টোবরের একদিনও বেশি নয়।

বটুকাকাকার আর নেই কিন্তু কানে সব সময়ই বাজছে তাঁর আহ্বান :

“এসো সমিতির সাম্য ও ঐক্য

এসো জনতার মুখরিত মধ্যে

এসো হুঃখ তিমির ভেদি দুর্গম ধ্বংসের

নিষ্ঠুর ভয় করি চূর্ণ

প্রাণের স্ফবন কর পূর্ণ

এস মুক্ত কর, মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার।”

সেই অন্ধকারের দরজা পেরিয়ে বটুকাকা গেছেন চিরকালের আলোর
রাজ্যে, যেখানে সব সখ্য ও মিলিত বন্ধুসে এক নতুন জীবনের গান
তিনি গাইছেন।

এখানে এই “ধূলি মিলন রুদ্ধ বাটিতে” অমল্য স্বপ্নে রইল বটুকাকার
অল্প উপচে পড়া ভালবাসা, লক্ষ্য। রইল হাজার কণ্ঠে গর্জে ওঠা গান :

“এসো শিল্পী, এসো বিশ্বকর্মা

এসো লেখা।

রসরূপ বহন তৈরি।

হিন্ন কর, হিন্ন কর—বন্ধনের এ অন্ধকার।”

বাংলা নাটকের শ্রেণীচরিত্র বদলে বিজনের ভূমিকা

দ্বিগিস্ত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান ভট্টাচার্য—সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই প্রায় চার দশকের নানা
বৃত্তি এসে এক সঙ্গে স্তিড় করে। ত্রিশের দশকের শেষার্ধ্বে স্ত্রীমন্ডেহ
এক উজ্জ্বল যুবক ‘আনন্দবাজার পত্রিকার’ যোগ দিল, সহকারী সম্পাদক
রূপে। সুনাম তখনকার ‘আনন্দবাজার’ সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ বসুমহারের
সম্পর্কে সে ভায়ে। সত্যেন্দ্রকে কেন্দ্র করে ‘আনন্দবাজার’-এ আমাদের
যে যুগচক্রটি গড়ে উঠেছিল তাতে ছিলেন ববি অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল
ভট্টাচার্য, ময়ূখ সাত্তাল প্রভৃতি। পরে এসে যোগ দিল গঙ্গাগঙ্গ বসু ও
সুবোধ ঘোষ। বিজ্ঞান এসে সেই চক্রে স্তলজার বাড়াল। সবাই বলত
আমাদের—সুখী পরিবার।

‘আনন্দবাজার’-এ আসতেন তখন নবীন প্রবীণ প্রগতিশীল লেখকরা।
আড্ডা হত, মৌতাত জমত—বেরসিকদের স্থান ছিল না সেখানে। জ্যোতিরিন্দ্র
বৈদ্য, সরোজ দত্ত ও নন্দমোপাল সেন এলে হাসির বস্ত্র বয়ে যেত।
কৌতুকের অভাব ছিল না। কিন্তু সব কিছুতে ছিল সাহিত্যের একটা
আমোজ। গল্পের কীকে কীকে হত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা।

বিজ্ঞানের মাধ্যম নাটক লেখার চিন্তা তখনো আসেই নি। হালকা
ধরনের দু-একটা গল্প লিখত। সত্যেন্দ্র ‘আনন্দবাজার’ ছাড়ার পরে
আড্ডাটা চলে গেল প্রধানত ‘অরুণি’ অফিসে। বিজ্ঞান লিখতে লাগল
‘অরুণি’তে। ১৯৪৩-এর আগে নাটক লেখার কথা সে ভাবেই নি। বলত,
তার হাতে নাটক আসবেই না; কারণ নাটক কিভাবে লিখতে হয়

সে জানে না। বিজ্ঞান ভাবতেই পারে নি যে একদিন তার হাত থেকেই নাটক বেরিয়ে বাংলা নাট্যের ক্ষেত্রে একটা ল্যাণ্ডমার্ক সৃষ্টি করবে।

‘জবানবন্দী’ ও ‘নবান্ন’র মধ্য দিয়ে বখন তার সেই নাট্যসত্তার অভ্যুদয় ঘটল, বিজ্ঞান বেন তখন নিজেকে আবিষ্কার করতে পারল। বুঝল যে নাটকেই হবে তার বস্তুার্থ বিকাশ। গান শ্রবণ, গল্প লিখত। কিন্তু তার সেসব গুণ হয়ে গেল আত্মবল্লিক। নাটক লেখা, অভিনয় করা, অভিনয় শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতিই হল তার প্রধান অবলম্বন। এক কথায় তখন থেকে তার মঞ্চগত প্রাণ। এসব সে শেখেনি কারো কাছে—সবই সহজাত গুণ। বিজ্ঞান বলত, ছেলেবেলার বাবার কাছে তার শেকস্পীরর শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি বাঙলায় তর্জমা করে শেকস্পীররের নাটক থেকে কোনো কোনো অংশ তাকে বুঝিয়ে দিতেন। পরবর্তী জীবনে সেটা প্রেরণা হয়ে থাকলেও বিজ্ঞানের নাটকে শেকস্পীররের কোনো প্রভাবই নেই। কেবল শেকস্পীরর কেন, কোনো বিদেশী নাট্যকার বা এদেশের পূর্বসূরীদের কোনো রূপ প্রভাবও বিজ্ঞানের নাটকে দেখা যায় না। কাঁচা মাল নিয়ে কাঁচা হাতেই সে নিজের মতো করে নাটক লিখতে আরম্ভ করে। সে ভুলেই তার নাটকের উপাদান যেমন আনকোরা, তেমনি তার গঠনও অভিনব। নাট্য ব্যাকরণের সঙ্গে মেলে না, অথচ তার নাট্য-অবয়বের শিল্পসৌন্দর্যকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। বিজ্ঞান নাটকের কাঠামো ধরে জীবনের দিকে এগিয়ে নি, জীবন থেকে নাটকের দিকে এসিয়েছে। নাটক কতটা হল না হল সেদিকে বেশি নজর না রেখে সে চাইল জীবনকে বতটা সম্ভব নাটকে তুলে ধরতে। বিজ্ঞান যদি নাটকের কাঠামো ভেঙে থাকে তবে তা বরং সে হরত নিজের অজান্তসারে, যে জীবনকে সে আনতে চেয়েছে—মঞ্চে সেই জীবনই তাকে দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নিয়েছে—তার পুরনো কাঠামোতে আপতে চায়নি। অস্বাভাবিক হস্ত-ভাগ্য মাহুভুলি ধরাবাধা ফ্রেম ভেঙে দিয়ে নিজের মতো করে পটভূমি রচনা করেছে আর সেখানে দাঁড়িয়ে তারা হেসেছে, কেঁদেছে, নিজের অস্বাভাবিক কথার কথা বলেছে। মঞ্চের সত্য চলে গেছে জীবনের সত্যের কাছে; জীবনের সত্য মঞ্চে এসে সংকুচিত বা কুণ্ঠিত হয় নি। মঞ্চসত্য ও জীবন-সত্যের মধ্যে এই সেতুবন্ধ রচনায়ই বিজ্ঞানের কৃতিত্ব ও অনন্ততা। এই জীবননিষ্ঠা ছিল বলেই নাট্যপথে পরিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানের অসামান্য সাফল্য ও ভবিষ্যৎ করার মতো খ্যাতি।

কেন্দ্রমাঘি-মার্চ ১৯৭৮] বাংলা নাটকের প্রেক্ষাপট বদলে বিজনের ভূমিকা ৮৩

রাজার শুকতেই বিজন যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পায়, যে কোনো নাট্যকারের পক্ষেই সেটা সৌভাগ্যের বিষয়। যারা ভাগ্যবশতী ও অধলিঙ্গু তারা সেটাকেই পুঞ্জি করে শিল্পকে পণ্য হিসেবে বাজারে চালু করার অন্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তাদের আদর্শের প্রতি আহুগত্য বা প্রত্যয় বলতে বা বোঝায় তা থাকে না। অর্ধের বিনিময়ে কুকটিপূর্ণ বেসাতি ছাড়তেও তাদের আটকায় না। বিজন তা করে নি, বা করতে পারে নি। যে অধীকার ও বাদের প্রতি আহুগত্য নিয়ে সে নাট্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল সেই অধীকার ভঙ্গ করতে বা সেই আহুগত্য থেকে সরে যেতে তার বিবেকে আটকাত। তাই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অধীকারবদ্ধ থেকেই সে তার দায়িত্ব সন্ততার সঙ্গে পালন করে গেছে।

বিজন সর্বদাই নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করত। সে দায় কি? তা বুঝতে হলে তার জীবিতকালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাস ও ঘটনাপ্রবাহ অনুধাবন করা দরকার। ১৯১৭ সালে রূশ দেশে অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে মানবমুক্তির সংগ্রামের অংশীদার হবার যে দায় বিশ্বের প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীরা স্বীকার করে নেন এবং নিজেকেই কাঁধে খেঁছায় তুলে নেন সে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের ভার—বিজনের ছিল গেই দায়বোধ। সমকালীন ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাই সে তার সাধ্য মতো পালন করেছে।

সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব উপলব্ধি করতে হলে জিশ ও চল্লিশের দশকে যে প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা জানা দরকার। কারো বা কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ইচ্ছামুগারেই যে এত বড় একটা সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এমন নয়; ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই তা জন্ম নিয়েছিল। যারা তাকে রূপ দিয়েছিলেন তারা সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন বগেই উত্তরসূরীদের কাছে অবশ্যই।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব বিশ্বের দশকেই কিছু কিছু পড়তে থাকে যার ফলে শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ শ্রমজীবী এবং বুদ্ধিজীবী মহলে একটা নতুন জীবনবোধ ও জাতীয় চেতনার উদ্বেগ ঘটে। একদিকে যেমন বামপন্থী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে, তেমনি জাতীয়তাবাদী নেতাদেরও কেউ কেউ অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। ১৯২৭ সালে কংগ্রেস-এ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতা লীগের কংগ্রেসে অণুহরলাল নেহরুর যোগদান এবং সেখান থেকে আহবৃত

হয়ে তাঁর সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সোভিয়েত দেশ থেকে ফিরে নেহরু দেশের ভূরসী প্রশংসা করেন এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত হন যার ফলে অভিব্যক্তি দেখা যায় ১৯৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের লখনউ অধিবেশনে সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণে ও তাঁর আত্মজীবনীতে। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ ও সেই অভিজ্ঞতার লেখা তাঁর 'রানিয়ার চিঠি' এরশের বুদ্ধিবীষের ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। অক্টোবর বিপ্লবের সারমর্ম বোঝা ও সেই বিপ্লবের দেশটিকে জানার জন্যে ঔৎসুক্য বাড়ছে। বলা বাহুল্য, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে এর ফলে বঙ্গপত ও গুপপত পরিবর্তন হতে থাকে। জাতীয় মুক্তি চেতনার সঙ্গে এসে যুক্ত হয় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা।

ত্রিশের দশকে জাতীয় জীবনে এই বঙ্গপত পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্যীয়। ক্রৈত ইউনিয়ন আন্দোলন অবিকতর সংগঠিত হয়ে যেমন প্রমিত শ্রেণীকে সংগ্রামী করে তোলে, তেমনি গঠিত হয় এই দশকে সারা ভারত কিম্বা সভা, ছাত্র ফেডারেশন এবং প্রগতি লেখক সংঘ। সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব দেশীয় করণ রাজ্যগুলিতে শুরু হয় সামাজিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রজ্ঞা আন্দোলন। এক কথায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে যায়।

এই সময়েই ইউরোপে দেখা দেয় ক্যাসির্বাদের কালোমেঘ। মুসোলিনীর ক্যাসির্ব বাহিনী করে আবির্ভাব (বর্তমানে ইথিওপিয়া) আক্রমণ, আপানের ক্যাসির্ব শাসকদের দ্বারা আক্রান্ত হয় চীন, স্পেনে পপুলার ফ্রন্টের প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ করে গ্রহযুদ্ধ, বাধিয়ে দেয় ক্যাসির্ব জেনারেল ফ্রান্সো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধাবার আগে এগুলো ছিল ক্যাসির্ব শক্তিশালী মহড়া।

পর পর এই ঘটনাগুলি আন্তর্জাতিক বোধ সম্পন্ন বুদ্ধিবীষের আন্তাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন করে তোলে যাদের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। জাতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরুও এই অন্তত শক্তির অভ্যুত্থান ঘেঁষে বিচলিত হন এবং সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। অবশেষে হিটলারের ক্যাসির্ব বাহিনী যেদিন বিশ্বের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ ও জনিয়ার নিপীড়িত ও শোষিত রাষ্ট্রের একমাত্র

কেক্সদারি-মার্চ ১২৭৮] বাংলা নাটকের প্রেক্ষাগৃহে বদলে বিজনের ভূমিকা ৮৫

ভরসা সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে, সেদিন এদেশের প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীরা বিপ্লবের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ক্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের শিল্পকর্মকে হাতিয়ার করে নেন। আন্তর্জাতিকতাবোধ থেকেই তাঁরা উপলব্ধি করেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতন ও ক্যাসিন্ড শক্তির অবনতি নিজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামও দুর্বল হয়ে আধীনতা লাভের পথ আরো কষ্টকিত হবে। তাই প্রগতি লেখক সংঘকে রূপান্তরিত করা হল ক্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে—সঙ্গীতে, নাটকে, নৃত্যে, কাব্যে, গল্প-উপন্যাসে ক্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। এ রাজ্যে গণনাট্য সংঘের জন্ম সেই ক্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘেরই গর্ভে। তাঁরা নিলেন সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য ও আত্মজীবনিক শিল্পকলার ভাষা।

এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক গটভূমি দিতে হল বিজনের শিল্পকর্ম ও তার শিল্প সংগ্রামের বর্ষাৰ্থ তৎপৰ উপলব্ধি করার জন্যে। সেই আন্দোলন ও সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করলে বিজনের আলেমিক গুরুত্ব বোঝা বা বর্ষাৰ্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। সেদিন সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে সচেতনভাবে আর অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে যারা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও যারা পুরোষা ছিলেন—বিজ্ঞান তাঁদেরই একজন। বলা বাহুল্য, সেই আন্দোলনেই বিজ্ঞানকে সৃষ্টি করেছে, আবার বিজ্ঞান তার সৃষ্টি দিয়ে আন্দোলনকে পুষ্ট করেছে। আন্দোলন ও সংগঠনের প্রেরণা যুগিয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সার্বস্বামী চৈতন্য দিয়ে, বিজ্ঞান যেটিকে সার্বজীবন মনে রেখেছে ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছে।

জাতীয় আধীনতা আন্দোলনে অক্টোবর বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক সত্তার সাক্ষীকরণ ঘটলেও তার বহুগত দিকটা চল্লিশের দশকের আগে পর্যন্ত বাঙলা নাটকে প্রায় অদৃশ্যই ছিল। যুদ্ধের চাপ, কালোবাজার, নিগ্রহীপ, অবশেষে মঞ্চের বাঙলার ঘাড়ে এসে এমনভাবে চাপল যে এই বাস্তব ঘটনাগুলি এড়িয়ে অস্তিত্বকে তাকাবার বা অস্ত কথ্য ভাববার মতো মনের অবস্থা তখন সাধারণ মানুষের ছিল না। এগুলি যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনেরই ফল—এ বোঝা তীব্র থাকলেও এ থেকে মুক্তির পথ কোথায়, আর সে মুক্তি আনবে কারা...এসব নিয়ে সর্বসাধারণের চেতনা জিজ্ঞাসার তর পেরিয়ে তখনো কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রতিরোধের তরে উন্নীত হয় নি। সর্বত্র একটা বিবাহ ও হতাশার ভাব। গণনাট্য সংঘের রূপকাররা তখন অঙ্গীকারবদ্ধ

হলেন মাহুকের মনের এই হতাশা দূরে করে জীবনে প্রত্যয় এনে দিতে ।

গণনাট্য সংঘের মূল চেতনায় ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা । কিন্তু বঁারা এই সংঘকে গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা দেখলেন দেশপ্রেমের আবেগপূর্ণ যেসব বাংলা নাটক তাবৎ লেখা হয়েছে, এই অটল পরিস্থিতিতে সেসব নাটক আর মাহুকের মনে দাগ কাটছে না । স্বতরাং নাটকে নয়া উপাদান—অর্থাৎ নতুন জীবন—আসা দরকার । তাঁরা বুঝতে পারলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনচিন্তে সাড়া আগাতে হলে বাংলা নাটকে সমাজের যে দিকটি অবহেলিত হয়ে আছে—অর্থাৎ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সমাজতাত্ত্বিক সম্ভা অহিত হয়ে যে বস্তুগত পরিবর্তন হয়েছে—সেই দিকটিকেই তুলে ধরে নাটকের দিগন্ত প্রসারিত করতে হবে । শুধু জাতীয়তাবাদী অদেশপ্রেমের কথা বলে আর লোকের মন গুরানো যাবে না, তার সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক সম্ভাটিকেও আনতে হবে ; আর সে সম্ভার উপাদান রয়েছে সমাজের যেসব শ্রেণীতে ডারাই হবে গণনাট্য সংঘের নাটকের নায়ক-নায়িকা—তারাই উঠে আসবে মঞ্চে নিজেদের কথা বলতে । মঞ্চে শ্রেণী বদল থেকেই হবে বাংলা নাটকের পালা বদল ।

তাই বিজ্ঞান চুঃসাহসে শুরু করে তার 'নবান্ন' নাটকে নায়ক করে নিয়ে এলো গ্রামের ছুঁতকপীড়িত বুড়ু চাষীদের বঁারা সাম্রাজ্যবাদের একটি আঘাতে কৃতসর্পণ হয়ে কলকাতার বুকে এসে 'হা অন্ন হা অন্ন' করে মরছে । তারা ব্যক্তি হয়ে এলো না, এলো অন্নদাতা চাষীদের প্রতিকূ হয়ে । এ নাটক কেবল দর্শকদের টাটকা অভিজ্ঞতাকেই স্পর্শ করল না, তাঁদের চৈতন্যকেও নাড়া দিল ।

বাংলা নাটকের শ্রেণীচরিত্রের বদল হয়ে গেল । গণনাট্য সংঘের মঞ্চে এলো সংগ্রামী শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মধ্যবিত্ত ও খেটে খাওয়া মাহুয় । পটভূমিতে দেখা গেল কারখানা, মাঠ, মধ্যবিত্ত সংসার, দিনমজুরদের আত্মনা । গৌরির 'লোয়ার ডেপুশ' নাটক যেমন একদা মঞ্চে আঁট থিয়েটারের শ্রেণীবদল করে দিয়েছিল, বিজ্ঞানের 'নবান্ন'ও তেমনি বাঙালি নাটকের শ্রেণী-চরিত্র বদলে দিল । বিজ্ঞানের এই অনন্ততা ইতিহাস বঁাকার করে নিয়েছে ।

যে দায়বোধে ও যে অঙ্গীকার নিয়ে বিজ্ঞান নাট্যপথে বাজা শুরু করেছিল তা থেকে সে কোনোদিনই সরে বাধ নি । তাই তার কলম থেকে বেরিয়ে এসেছিল 'জীবনকল্যাণ', 'অবরোধ', 'কলক', 'মরাচাঁদ', 'গোজাশ্বর',

ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭৮] বাংলা নাটকের শ্রেষ্ঠচিত্রিত বহলে বিজনের ভূমিকা ৮৭

‘হেবীগর্জন’, ‘গর্ভবতী জননী’, ‘ছায়াপথ’, ‘কৃষ্ণপক্ষ’, ‘চলো সাগরে’, ‘হাসখালির হাঁস’ প্রভৃতি নাটক। সেগুলো নিয়ে সে সংগ্রাম করেছে; তার অস্ত্রে তাকে অনেক মূল্যও দিতে হয়েছে; কিন্তু হতাশ বা অবসন্ন হয়ে সে কখনো সংগ্রামবিমুখ হয় নি। আদর্শে দৃঢ় প্রত্যয় ও মাহুকের ভবিষ্যতে অটল বিশ্বাস ছিল বলেই নৈরাশ্র কখনো তাকে গ্রাস করতে পারে নি। নাটকে যে জীবনগুলির সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, তাদের সুখদুঃখ ও সংগ্রামের সঙ্গে তার ভাবগত ঐক্য হয়েছিল। সেই মাহুকের মধ্যেই সে বেঁচে থাকবে আর চিহ্নিত তারাই তাকে আপনজন ভেবে স্বরণ করবে।

বিজন

অরুণ মিত্র

গোষ্ঠ আমাদের বাড়িতে পৌছনোমাত্র ঘরোয়া আগর বসে বেত কথার আর গানের, আমরা তারপর তুড়ি মেয়ে সময়কে উড়িয়ে দিতাম। আগর বসত সকালে প্রায় যোজাই, ভাতত অনেক বেলায়। আমরা নাগুরা-পাণ্ডুরা ভুলে যেতে থাকতাম। এ অনেক কাল আগেকার কথা, তখন সে নবনাট্যের পথিকৃৎ বিখ্যাত বিজন ভট্টাচার্য হরনি, সে ছিল আমাদের গোষ্ঠ। সে গান গাইত আর কথা বলত তার নিজস্ব এক ভঙ্গিতে, বার ছাপ পরে মঞ্চে তার অভিনয়েও দেখেছি।

গোষ্ঠের মেজাজে জোরার তাঁটা খুব স্পষ্ট ছিল। বেশির ভাগ সময় গান তাকে পেয়ে বলত। কখনো রবীন্দ্রসঙ্গীত, কখনো শচীনদেব বর্মণের গান কি কোনো পল্লীপীতি, কখনো বা রাগসঙ্গীত তার গলা থেকে বইত অবিরল স্রোতে। গান বধন গাইত না তখন কথা। তার কথা আর কথার ধাঁচ চারপাশের মানুষদের ভিতরের চেহারাগুলো আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলত। খোঁচা-খোঁচা কোণ-বেত্র-করা সেই সব ব্যাখ্যানে কৌতুকের সঙ্গে অনেক সময় ঝল্কাতে বিদ্রোপ। বাচ্চাদের আগরে টেনে নাচগান নজাও আরম্ভ করে দিত বধন তখন। আবার এক একদিন সে কেমন ধেন মুষড়ে থাকত, নিজেকে খুলতে পারত না। এখন আমার মনে হয় এই সময় সে নিশ্চয় আমাদের জীবনের চারদিকের পতিষ্ঠা বেশি করে অচ্যুতব করত এবং ভেঙে বেরুতে পারছে না বলে বিষণ্ণ বোধ করত।

এইসব ক্ষমতা তার মতো আমার একটুও ছিল না, কিন্তু তাকে সমর্থন দিতে আমি শিহুপাও হতাম না। কিছু মুখে এবং কিছু কাজে। সেই কারণে আমিও খেয়ালখুশির সন্ধিতে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে যেতাম

প্রায়ই। এই যে একটা অন্তরঙ্গ বোঝাপাড়া তার সঙ্গে হত, বা ভিতরে ভিতরে স্বজনীয়তাকে খানিকটা আগিয়ে তুলত, তার স্বরূপ পরিহারভাবে বলা কঠিন। গোষ্ঠীর ও আমার মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছাড়াও ছিল স্বভাবের অমিল, যথেষ্ট অমিল; কিন্তু একটা বিশেষ মিল ছিল অল্পভবে ও আচরণে। চারদিকের মাথা ঠুকে-বাগওয়ার মেয়ালটা আমরা দু'জনেই বেশ টের পেতাম। আর আমরা দু'জনেই ছিলাম কলকাতার শিক্ষিত বিদ্বৎ মহল থেকে তফাতে, বৈবাহ্যের সূত্র হালচাল আমাদের মহা অবস্থিতে কৈলত। সে-অবস্থিবোধ আমার আজও ঘোচেনি। অর্থাৎ আমরা ছিলাম অনেকটা 'মেরঠো' লোক।

আমাদের এই আড্ডাটা হঠাৎ যেন বড় হয়ে গেল যখন ষয় একাকার হয়ে গেল বাইরের সঙ্গে। গোষ্ঠী লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে ভাবছিল কি করবে, ইতিমধ্যে সে কঠিন রোগে হাসপাতালে বেশ কিছুকাল শয্যাশায়ী থেকে আরোগ্যলাভের পর ফিরে এসেছিল। সে ঢুকল আনন্দবাজার পত্রিকার বাতী বিভাগে। আরম্ভ সেইখানে কাজ করতাম। অনেকের সঙ্গে পরিচয়, অনেকের সঙ্গে মতবিনিময়। এর পরই মহাযুদ্ধ। আমরা বে-চাপটা সর্ব সমর অল্পভব করতাম সেটা খুব তীক্ষ্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং আমরা দেখলাম অনেকেই আমাদের মতো তা অস্বিমজায় অল্পভব করছে। একসঙ্গে যদি না ঠাড়াই তাহলে বাচন নেই, বাচা তো আছেই কিন্তু তার চেয়েও বড় বাঁচানো। আমরা খণ্ড খণ্ড অভ্যাস অঁত্যাচারের এক বিশরূপ ঘেঁষে নিরেছিলাম কাশিক্রমে। মাহুকের মাহুধ হিসেবে থাকা বরবাদ হতে চলেছিল। শিল্পসাহিত্যের মূলে তো মাহুধ, কলে মানবিক মূল্য প্রতিষ্ঠার এক প্রাথমিক দায়িত্ব বর্তেছিল শিল্পী সাহিত্যিকদের উপর। এই রকম ভাবনা নিয়ে আমরা জড়ো হলাম কাশিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে, যা থেকে পরে এক গৃথক সংস্থা রূপে জন্ম নেয় গণনাট্য সঙ্ঘ।

এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রেরণায় ও নেতৃত্বে সাপ্তাহিক 'অরশি' প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান, স্বর্কমল ভট্টাচার্য এবং পরে আমি আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে চলে আসার পর এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হই, আমি সর্বকণের কাজের জন্তে এবং ওঁরা লেখক হিসেবে। অবিস্তি ঐ জন্ম ছাড়াও পরবর্তী-কালের খ্যাতিমান আরও অনেকে ঐ পত্রিকায় আমাদের সহযোগী হয়েছিলেন। সে এক ইতিহাস অস্ত্রাত্ত ইতিহাসের সমান্তরালে বাকে জড়িয়ে আমাদের সেই যুগের যৌধ জীবন-কাহিনী। বাই হোক, বিজ্ঞানের সঙ্গে

আমার সংযোগটা আবণ্ড বিদ্যুত হল, এবং ঘরের পশ্চি পার হয়ে তার প্রতিভা সার্বকভাবে সৃষ্টিশীল হবার পথ পেল। রাজনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয় সব ক্ষেত্রেই বিজন অক্লান্ত উচ্চমে অগ্রসর হয়ে চলল। নাটক-রচনায় এবং অভিনয়ে তার কীর্তি আজ সকলেরই জানা। আর যারা 'নবায়' 'মরাচাদ' প্রভৃতি নাটকে তার শ্রেষ্ঠ অভিনয় দেখেছে তারা জানে সে-শ্রেষ্ঠতা কী অসাধারণ। আমার বিশ্বাস, সমসাময়িককালে এ বিষয়ে তার বৈশিষ্ট্য তুলনাহীন। তাকে আমি হাজার হাজার দর্শকের একজন হিসেবে যেমন দেখেছি তেমনই দেখেছি ঘরের মধ্যে একজন সঙ্গী হিসেবে। অনেক দিন। সব সময়েই যেন হয়েছে এ তার ভিতরকার ব্যাপার, ভেবে চিন্তে ঠিক-করা বাইরের কিছু নয়, ভিতর থেকে উঠে আসা। কোনো প্রশিক্ষণ কাউকে এখানে পৌঁছে দিতে পারে না, কোনো পরিকল্পনাই এই কল্পনায় রূপ সৃষ্টি করতে পারে না। কথক হিসেবেও বিজনের কল্পনা ছিল এক আশ্চর্য অভিব্যক্তি। আমরা ঘরে বসেই তা দেখতাম। তার উৎসরণে বাস্তব অবাস্তব একাকার হয়ে যেত, সকল সম্ভাব্যতা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত, যে-কোনো মনগড়া কথা আমাদের মনের মধ্যে শিকড় মেলে দিত।

শুধু নাটকীয় চিত্রণে নয়, সঙ্গীতেও তার সামর্থ্য ছিল অসাধারণ। বস্তুত আমার অনাটকীয় অন্তরব অল্পবাদী আমি নাট্যের চেয়ে সঙ্গীতে তার ক্ষমতার বেশী অল্পবাদী ছিলাম এবং আমার দৃঢ় ধারণা, নাটকের মতো সঙ্গীতে নিজেকে নিয়োজিত করলে সে এ ক্ষেত্রেও নতুন নতুন পথ খুলে দিতে পারত। তবে সাধারণ অর্থে চর্চা বাক্য বলে তা তার কাছে প্রত্যাশা করা যেত না। আটঘাট বেঁধে নিয়ম করে অগ্রসর হওয়ার যতাব তার ছিল না। সবটাই ছিল ক্ষুরণ। গানের কথা এবং স্বর বধন তার মন জুড়েছে তখন এক একটা অবাক কাণ্ড করে ফেলেছে। প্রথম আমলের 'ও হোসেন ভাই' ইত্যাদি গান এবং পরবর্তীকালের আশ্চর্য সৃষ্টি 'জীবন কত্যা' স্রুতিনাট্য তার প্রমাণ। এ ছাড়া তার নাটকের মধ্যে বিভিন্ন গান তো আছেই।

বিজনের বৃহত্তর জীবন এবং তারই প্রায় সমার্থক নাট্যজীবনের পট উন্মোচন আমি দেখেছি তার পাশে পাশে থেকে। সেই 'আগুন' 'নবায়'-এর কালে। তারপরও বেশ কিছুকাল আমরা কাছাকাছি ছিলাম। সমিতির বৈঠকে, রাত্তর, বাড়িতে। তার আনন্দ্য বিবাহের সঙ্গী হয়েছি বেশ কিছুকাল। জীবিকার তাগিদে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েও আমি তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করেছি। আর বধনই সুযোগ পেয়েছি একত্র হয়েছি কেবল শেষের

করেকটা বছর ছাড়া যখন আমি কলকাতারই বাসিন্দা। বৎসরাতে কলকাতার এলে তার সঙ্গে দেখা হতই, তার বাড়িতে এবং ক্যালকাটা থিয়েটারের মহলাঘরে। আমাকে দেখতে পেয়েই তার চোখমুখ কুঁচকে হাসিটা মনে পড়ে। মহলা গেরে আমার সঙ্গে ঘরোয়াভাবে বসা, কখনো তার বাড়িতে আমাদের খাওয়া। একবার তো নাটক মহলায় পর বালিগঞ্জ থেকে সিঁথিতে আমাদের তখনকার আন্তানার এল রাত দশটার সময় 'জীবন কস্তা'র গান শোনাতে। এলাহাবাদে তার বোনের বাড়িতে যখন সে যেত, চলে আসত আমাদের ওখানে। তখন সেই পুরনো আড্ডা। এই রকম কতবার কতভাবে। কিন্তু জীবনের পথ কুটিল। তা কোথায় কোন্ খালখন্দ যে লুকিয়ে রাখে, সব সময় টের পাওয়া যায় না। কাছে পৌঁছানোর সুযোগ হঠাৎ কেড়ে নেয়। তখন আবার ক্যালো মাটি, বানাও পোল। আমরা এক আরগার এলে হাত বাড়িয়ে পরস্পরকে আবার প্রায় ছুঁতে পেরেছিলাম, কিন্তু এক আরগার একসঙ্গে বসা আর হল না। বাড়িয়ে বাড়িয়েই সে বলেছিল: "অরুণা, আসবেন, না হয় আমিই বাব, অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ হয় না।" আমি ঠিক করেছিলাম আমিই বাব। শেষ পর্যন্ত আমাকে বাবার জন্তে খবর দিল অন্তেরা। এ কেমন খবর! গিয়ে দেখি সে জন্তে আছে, চোখ বন্ধ। আর কখনো চোখ খুলবে না, আমাকে দেখবে না।

রাইত কত হইল ?

চিন্তামণি ঘোষ

॥ 'রাইত কত হইল' ॥

বিজনদার বৃত্তার দ্বারি দুইক আগে রবিবারের এক সকালে বিজনদার আর আমি একটা গছটার উপস্থিত ছিলাম। পাশাপাশি বসে টুকরো টুকরো নানা কথা হয়েছিল।

‘শরীর কেমন আছে ?’

‘এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘বয়সের হিসেবে ভালই। তবে এখন খাটুনি বেড়ে গেছে। রঙমহলে এখন করছি তো। এই তো আজ আছে ডবল শো। এখানে বেশিক্ষণ থাকিব না। তাড়াতাড়ি বেরবো। এখানে আসবার সময় বাড়িতে কয়েকজন লোক এল। তাদের বসিয়ে রেখে এসেছি। কিরে তাদের সঙ্গে কথা বলে তারপর রঙমহলে বেতে হবে ছুপুরেই—আজ তো ছুটো শো। এর উপরে আছে আমার নাটকের রিহাসাল—নতুন ছেলেমেয়েদের শেখানো—’

‘নতুন কী নাটক করছেন ?’

‘পুরনো নাটকের মধ্যে ‘মরা চাঁদ’ করব। এখনকার অনেকেই ওটা দেখে নি।’

‘নতুন কোনো বই—?’

‘হাসখালির হাস’ করব।’

‘পূর্ণাঙ্ক-হিসেবে ওটা একটু ছোট হয়ে যাবে না ?’

‘না, ছাপার আপনি বোটা পড়েছেন, ঐ রকম থাকবে না অভিনয়ের সময়, অনেক বদলাবে, অনেক বাড়বে।’

কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি হিন্দী মাসিক নাট্যপত্রের (অভিনয়-সম্বাদ) বর্ষ-পুষ্টি উৎসবে আমাদের এই কথা হচ্ছিল। উদ্যোক্তারা এই

দিন বিজ্ঞানদাকে সম্বন্ধ না জানান—এটি অল্পটানের বিশেষ একটি কর্মসূচী ছিল। অব্যাপক ত্রিবিজ্ঞান শাস্ত্রী এবং পত্রিকাটির সম্পাদক স্যামুয়েলসন-বিজ্ঞানদার প্রতিক্রিয়া-চক্ৰ ভাষণ যেন।

প্রত্যুত্তরে বিজ্ঞানদা বলেন যে হিন্দীভাষী নাট্যকারীদের এই সম্বন্ধে তিনি বিশেষ পৌরুষাচিত্ত বোধ করছেন। পূর্বে বোপ করেন, 'জানি বাংলা নাটক করি বলে যে আপনাদের আমার পর ভাবেন না, অন্যায় জান করেন না, এটা আপনাদের উদার মনের পরিচয়। এইখানে জানি বলি, হিন্দী আমার মাতৃভাষা—বেশ বাংলা আপনাদের মাতৃভাষা। ভারতবর্ষের মাধব যে যেখানে যে ভাষার কথা বলে, সে সবই আমার মাতৃভাষা। জানি যে হিন্দী জানি না সে আমার লক্ষ্যের কথা।'

বিজ্ঞানদা অল্পটানের শেষ পর্যন্ত ছিলেন না। আগেই চলে গিয়েছিলেন। তার চলা-চল বেধে বিজ্ঞানদার প্রদীপ্ত বৌদ-মুত্তির কথা মনে পড়ল। সেই মুত্তির চার দিকে ভাঙ-চুর হয়েছে। কাঠামোটা ঠিক আছে, কিন্তু প্রতি হয়েছে ময়, পদ-নিষ্ঠুর। চলার গু কলার গুলীটা মনে গেছে আগের মতোই, প্রায়শ। আবার তার করার মধ্যে এসে পড়ে লক্ষ্য ইংরেজী শব্দ। তা নিয়ে মাথা ঘামান না, বেশ মাথা ঘামান না ইংরেজী উচ্চারণ-বিতর্ক নিয়ে। দ্বিবি প্রায়শ বাঙালী ইন্টোনেশনে ইংরেজী বলে মান। শুনেই বোঝা যায়, লোকটা বড়ই বাঙালী। ইংরেজী কথা তাঁর বাঙালীকে চাকতে পারে না।

কাঠামোর চার দিকে ভাঙ-চুর। হ্যাঁ, তাঁর চার দিকে লক্ষ্যের জমছে। বেশ অনেক দিন ধরেই জমছে। বহু আগে তাঁর যে একবার ক্ষয়রোগ হয়েছিল, তখন থেকেই কি? তাঁর তো ক্ষয়রোগ সেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আশপাশের আবহাওয়ার ক্রিয়াকৌতর বীজাণু কি জমছিল, বাড়ছিল? লক্ষ্যকারকে যেন প্রত্যাশিত সাজার কাটানো রাখিল না। একটার পর একটা প্রয়োজনা যেন সেই লক্ষ্যকারকে ভেদ করে উজ্জলতার দিকে বাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা। কিন্তু কিছুতেই যেন পূর্ণদৈর্ঘ্যের পদক্ষেপটা করা বাঞ্ছিত না। মনে মনে বড়টা যেতে পারছিলেন, বাস্তবে ততটা পারছিলেন না। ঐ লক্ষ্যকারই যেন বাধা দিচ্ছিল। তাই বত সাধ ছিল অল্প ছিল, ততটা সাক্ষ্য আসছিল না। সারা জীবনই এই সংগ্রাম। কিছু সার্থকতা, বহু ব্যর্থতা। সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে আবার চেষ্টা। আবার কিছু সার্থকতা, বহু ব্যর্থতা। আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা।

সেদিন তাঁর একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন। তিনি গ্রামের মানুষদের দিয়ে গ্রামের সেখানকার আবেষ্টনীর মধ্যে থিয়েটার করতে চান। গ্রামের মানুষরা তাদের নিজেদের স্বাভাবিক সহজাত প্রেরণা অনুযায়ী করবে, বিজনদা শুধু তাদের একত্র করে একটু তুচ্ছ দাঁড় করাবেন।

সেই বঙ্গ চণ্ডা বৃকের মধ্যে নিয়ে ভাঙাচোরা মানুষটা একটি অল্পবয়সী ছেলের হাত ধরে হল থেকে বেরিয়ে গেল। ছেলেটি বোধহয় বিজনদার দলের ছেলে। বিজনদার হাত ধরে নিয়ে বাগুরার সময় ও কি বুঝতে পারছে ঐ হাত থেকে তার কী নেওয়ার আছে। ঐ দিকে তাকিয়ে বিজনদার একটি বিখ্যাত সংলাপ-উক্তি মনে পড়ছে, 'রাইত কত হইল?' সারা জীবনে এর উত্তর মেলেনি বিজনদার। ঐ ছেলেটি কি এর উত্তর দিতে পারবে? ও কি বিজনদাকে হাত ধরে রাতভোরের দিকে নিয়ে বেতে পারবে?

এই কথাটা, বিজনদার ঐ নিষ্কম্প-মুগ্ধতা আজ বেশি করে মনে পড়ছে অস্ত-কারণে। বিজনদার মৃত্যুর পর একটি কিশোর ছেলে সেখানে আছাড়-পিছাড়ি করে কাঁদছিল। এ বোধহয় সেই ছেলেটি। বিজনদার দলের ছেলে। এই ছেলেটি তো বিজনদার খুব কাছাকাছি থাকত সব সময়, ও কি বিজনদার ভাঙা-চোরা বৃকের মধ্যে স্বপ্নের পাখিটার ডানা ঝাপটানি শুনে পেত? সেই কণ্ঠপটনি কি তার বৃকের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

বিজনদার দীর্ঘ কালের সহকর্মী বন্ধু ও আত্মীয় ছিল স্বত্বিক। সেও ছিল একজন ভাঙাচোরা মানুষ, অন্ধকার নেমেছিল তার চার দিকে; কিন্তু বৃকের মধ্যে পোবা ছিল এক স্বপ্নের পাখি, আশার পাখি। তার অনেক ছবিতে দেখা যায়, অনেক ভাঙচুর অনেক অন্ধকারের মধ্যে, একেবারে শেষে স্বত্বিক তার স্বপ্নের পাখিটাকে ছেড়ে দিত, অবিকাংশ সময়ই একটি শিশুর বেশে। কখনো সে 'অগদল'-এর ভেঁপু বাজাতো, কখনো তালপাতার বাঁশী বাজিয়ে মরাবাটি থেকে শুরা ক্ষেতের দিকে দৌড়তো। স্বত্বিক যদি বিজনদার ওপর কোন বই করতো, তা হলে কি ঐ ছেলেটিকে দিয়ে সে-ছবি শেষ হতো?

ঐ ছেলেটি কতটা শুনেছে জানি না। আমরা সবাই তো শুনেছি সেই পাখিটার ডানা-ঝাপটানি, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শুনেছি, শুনেছি মৃত্যুর ছ'দিন আগেও।

মঙ্গলবার, ১৭ আশ্বিন, সন্ধ্যায় তখন থিয়েটার হল-এ বিজনদার

সখানা-সভায় (উদ্যোক্তা—শিশলু কালচারাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার) আলো ছিল না। বিদ্যুৎ বিল্টাট। হাজার জেলে সভা হচ্ছিল। চার দিকেই অন্ধকার জমে ছিল। অস্ত্রান্তরের বলা হয়ে গেলে হাজারকের কাছে পাড়ালেন বিজনদা। হাজারকটার হয় ফুরিয়ে এসেছে, তবু চার দিকে চাপ চাপ অন্ধকারের মধ্যে আলো পাঠাবার ক্রান্ত প্রয়াস।

বিজনদা বললেন, ‘অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে আমি বলছি। চল্লিশের বিনোদনোত্তে আমরা অন্ধকারেই বলতে শুরু করেছিলাম। আজও কি আমরা অন্ধকারেই রয়েছি? আলো কি সত্যিই আনতে পেরেছি? আমরা গণসংস্কৃতি শুরু করেছিলাম। আসলে ‘গণ’ মঞ্চে উঠে আসে নি। আমরা ‘গণ’ পোষাক পরেছিলাম। ‘গণ’ সেজেছিলাম। অবশ্য আমাদের সাধারণ ঘাটতি ছিল না। আমরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার শরিক হতে চেয়েছিলাম। আমাদের হুর্ভাগ্য আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমাদের কাজ বুঝতে পারলেন না। আত্মীয় আশ্বালনের তদানীন্তন নেতৃত্বও না। জনগণের সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলন যে ফলপ্রসূ হতে পারে না এ বোর নেতাদের হলো না। আমরা জনা কয়েক অভিনেতা, শিল্পী, গায়ক, নাট্যকার মঞ্চে দাঁড়াইনি। কিছু ‘গণ’ মঞ্চে উঠে আসে না। এখনো অন্ধকারেই রয়ে গেলাম।

‘এখনো আমার দেশের মানুষ নিরক্ষর। প্রমিত্য তার ভাষা জানে না। এখনো আমরা জীবনকে ধুও ফুর করে দেখি। আমাদের হুর্ভাগ্য, আমাদের নেতার প্রকৃত জনগণের মুখ দেখতে পান নি।...নেতার আশাকে বলেন, শহর ছেড়ে গ্রামে নাটক করতে যান।- কী করে বাব? গরুর গাড়ী চড়ে? সরকার কী ব্যবস্থা করেছেন? কোনো গ্রামে কোনো মুক্তাঙ্গন হয়েছে? অপসংস্কৃতি রোধের কথা বলা হয়েছে, কী দিয়ে রুখবো? গঙ্গাংগ ধ্যান-ধারণার রাজ্য নিয়ে গ্রামে রাজ্য উৎসব করে? তবু আমি নাটক করতে চাই। ব্যববহুল এবং বিলাসবহুল মঞ্চে নাটক করার সম্ভাবনা আমার নেই। কাল মুক্তাঙ্গনে আমার ‘মরা টান’ করব। এক হাজার টাকার মধ্যে প্রযোজনা খরচাকে ধরে রাখার জন্যই মুক্তাঙ্গন। আমার পরশা কোথায়?...অনিরা আজকের মতো কালকেও আমার লোভ শেষ হবে কিনা। আমাদের সব চেষ্টা অন্ধকারে ভুবে যাবে কিনা। তবুও আমার কথা আমি বলে বাব।’

মঞ্চের ছ’পাশে ছুটি কিশোর দাঁড়িয়েছিল আবছা অন্ধকারে। হাতে

তাদের 'গুপ্তদল'-এর ভেঁপু নয়, তাল পাতার রাশি নয়। হাতে তাদের লাল পতাকা।

বুধবার, ১৮ আশ্বারি, মৃত্যুবনে 'মরা চাঁদ' করলেন বিজনদা। ভাড়া-দোরা মাহুবার রথ থেকে বিপুল বেগে সেই পাখিটা বুঝি পেয়ে উঠতে চায়, অন্ধকারকে দিতে চায় দূরে হটিয়ে। ঐ বিপুল প্রয়াসেই কি সোড়ারার তারটা ছিঁড়ে গেল ?

সেই রাতেই তিনটে নাগাধ ত্রোয় হয়, একটু বন্নি হোলো, হাডেয়-ভেজর থেকে উঠে এলো অতি ঠাণ্ডা একটা শীত। তখনো পাশে ছিল একটি ছেলে। সে কি ঐ প্রবল কাননের মধ্যে শুনেছিল কোনো স্মার্ত্ত আমীণ কৃষ্ঠপুর 'রাইত কত হইল ?' অর্থাৎ ভোরের কত সেরী ?

পরদিন দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ। জবানীপুর থেকে রঙমহল। রোশান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কমিউনিস্ট পার্টির অফিস, তথ্যকেন্দ্র, মাইন স্যাক্রাফেমি, মৃত্যুবন হয়ে কেঁপে উঠল। তখন রাত হয়ে গেছে। একটু একটু করে রাত ঢেগে গুহুছে কলকাতার বুকের গুপ্তর। তখন বিজনদার-বুকের গুপ্তর লাল পতাকা—তার শেষ ইচ্ছা সমুদায়ী।

শেষকক্ষের সময় কোনো রসামুঠান হয় নি—এও তাঁর ইচ্ছা সমুদায়ী।

বিদ্যুৎ চুম্বীয় প্রবল সাজান জললো। হঠাৎ একটা হুমকী স্যাক্রাফেমি আরোহ মাহুবার-টা গিলে হটলো। সবাই মিলে তখন গাইছে 'স্বাভিজাতিক'।

রথ কঠোর সেই 'স্বাভিজাতিক'-এর আড়ালে, কীকে কীকে কি লোরা বাজিল সেই স্মার্ত্ত কৃষ্ঠপুর : 'রাইত কত হইল ?'

বিজনদা সারা জীবন এর উত্তর পান নি। আমরা কি এর উত্তর দিতে পারবো ?

ভাড়াচোরা চণ্ডা বুকের খাঁচ-টা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বুকের ভেতরকার পাখিটা সারা আকাশ জুড়ে ঘুরে যেতাজে তার ডানা বাগটাচ্ছে : 'রাইত কত হইল ?'

॥ অন্ধকার ও আলো ॥

রাতের অন্ধকার জমে ছিল বাইরে, পরিপার্শে। অমাত একটা বেড়ার মতো পথ সার্চকা ছিল—তাকে ভেঙে বেয়োনো শক্ত ছিল। খুবই শক্ত। আর অন্ধকার ছিল তাঁর নিজের মধ্যেও—তাঁর নিজের বেড়া, নিজের সীমা-বহুতা। সেটাকে ভাঙাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাঁর আলো ও অন্ধকার,

ঐশ্বর্য শক্তি ও সৌন্দর্য্যতা—একই সঙ্গে তাঁকে উজ্জ্বল ও প্রতিহত করত।
বরাবরই বিজ্ঞানদা হয়ে গেলেন এক আত্মবিশ্বস্ত সত্তা।

বিজ্ঞান স্ফটোচারণের নামে প্রথমেই মনে আসে ‘নবান্ন’-র কথা। গণনাট্য-সংঘের কাজ আগেই শুরু হয়েছিল। ‘হোমিওপ্যাথি’, ‘ল্যাবরেটরি’, ‘কেরানি’, ‘অগ্নিগর্ভ’, ‘শান্তনু’, ‘অবানবন্দী’ আগেই হয়েছিল। কিন্তু গণনাট্য সংঘের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক ‘নবান্ন’। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলি যেন সংহত হল ‘নবান্ন’-এ। গৌরবময় আন্দোলনটিকে হানা দাঁধতে বিশেষ সাহায্য করেছিল ‘নবান্ন’। বিজ্ঞানদা যদি আর কিছু নাও করতেেন, এই একটি কারণেও তাঁর নাম বাংলার নাট্য-ইতিহাসে স্মরণীয় থাকত।

‘গণনাট্য’-অনুপ্রাণিত নাটকে বক্তব্যকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হত, নাটকের গঠন ভাষা ইত্যাদি অবহেলিত হত। কিন্তু বিজ্ঞানদার হাতে জীবন্ত ভাষা উঠে এসেছে। এবং তাঁর ভাষার বহু সময় কাব্যের স্পর্শ থাকত—সরল মাছের সহজ কাব্য। সে ভাষায় বহু সময় পাওয়া যেত মাটির গন্ধ, কখনো তাতে এসে পড়ত বেশজ কোনো পুরাণকথার আলো। ভাষায় এই গুণ তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের প্রায় কারোই ছিল না।

বিজ্ঞানদার মধ্যে ঘটেছিল ত্রিধারার সমাবেশ—গান, সাহিত্য, অভিনয়। গানেও তিনি সব্যসাচী—একাধারে সীতকার ও হরকার। হাতে সাহিত্যের কলম ছিল—ভাষার রহস্যময় অস্ত্রপুর্বে প্রবেশ করতে পারতেন। তার ওপরে ছিলেন অভিনয়-শিল্পী। এমন ত্রিবেণী-সংযোগ খুব কম মাছয়ে ঘটে।

এ সবই তাঁর শক্তির দিক। কিন্তু তাঁর অসুবিধেও ছিল।

বিজ্ঞানদা বলতেন, “মাছের সঙ্গে বেশো, তাদের উপলব্ধি করো। তাদের উপলব্ধি করতে পারলে গলার মডুলেশন এক্সপ্লোরেশন সব আপনি এসে যাবে। মা যখন তার ছেলের মৃত্যুতে কাঁদে, তখন কি গলার মডুলেশনের কথা ভাবে? ছেলে-মেয়েরা যখন তাদের প্রেমের কথা কয়, তখন কি তাদের এক্সপ্লোরেশন কেমন হচ্ছে এই চিন্তা করে?”

এই কথাগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানদাকে, তাঁর ধরনটাকে, বোঝা যায়। তাঁর শক্তি ও দুর্বলতার উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

মাছের সঙ্গে বেশা, মাছকে উপলব্ধি করা, খুবই বড় ব্যাপার সম্বন্ধে মাজ নেই। কিন্তু শিল্পীর শুধু নিজে-নিজে উপলব্ধি করলেই চলে না, তাকে আবার সেটা প্রকাশ করতে হয়, সেই উপলব্ধি সঞ্চারিত করতে হয় শ্রোতা বা দর্শকের মধ্যে। তাই তার প্রকাশকমতাকে শানিয়ে তোলবার দরকার হয়—এটাও

মন্ত বড় একটা সাধনার ব্যাপার। শিল্পী এই ছুই—উপলব্ধি ও প্রকাশ—নিষে তবে সম্পূর্ণ। শিল্পীদের প্রকাশক্ষমতা হয়তো সাধারণের চেয়ে বেশি থাকে, কিন্তু তাকে চূড়ান্ত আয়ত্তায় নিয়ে যেতে হলে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত জানিত করতে হয়। এখানে সবছুই ‘আগনি’ হয় না, বিশেষত বিজ্ঞানদার যেটা প্রধান কাজ, নাট্যকর্ম, সেখানে হয় না। স্বভাবকবি সম্ভব হলেও হতে পারে, স্বভাব-নির্দেশক সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানদার কাজে প্রকাশকলায় অনেক ঘাটতি থেকে যেত।

তা ছাড়া বাস্তব জীবনে শোকার্ড মায়ের কান্না আর মধ্যে শোকার্ড মায়ের কান্না—এ দুটি এক জিনিস নয়। দুয়ের তারতম্য আছে। একটি আদল বাস্তবতা, আর একটি শিল্প-মাধ্যমে বর্ণিত বাস্তবতা—এ দুটির মধ্যে সম্পর্ক আছে, কিন্তু এ দুটি এক নয়।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে, ১৯৭৭-এর শেষ দিকে একটি সাক্ষাৎকারে বিজ্ঞানদা বলেছিলেন, “আমি অর্গানিকেশনে ইন্টারেস্টেড নই, প্রোডাকশনে ইন্টারেস্টেড।”

কিন্তু নাট্যের মতো একটি যৌথশিল্পকর্মে ভালো সংগঠন ছাড়া ভালো প্রোডাকশন সম্ভব নয়। এই সত্যটি বিজ্ঞানদা মানতেন না। এই না-মানার মূলে আছে বিজ্ঞানদার স্বভাব, তাঁর বিশেষ ধরনের চরিত্র।

বিজ্ঞানদা সম্পর্কে ‘অগোছালো’ কথাটা খুবই গুঠে। ধারা নির্ধা করতে চান তাঁদের কথা ধরছি না। কিন্তু ধারা বিজ্ঞানদাকে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন, তাঁর কাজের বিশেষ মর্যাদা দেন, তাঁদের মুখেও এ কথাটা বহুবার উচ্চারিত। তাঁর প্রবোধনা দেখতে গিয়ে কি আমাদেরও এ কথা অনেক সময় মনে হয় নি যে একটা কল্পনা রূপ নিতে নিতে তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে যেন অনেকটা গলে পড়ে যাচ্ছে, শক্ত মুঠোর যেন ধরতে পারছেন না বিজ্ঞানদা। বিচারের প্রথর দৃষ্টিপাতে তাঁর অনেক অভাব ধরা পড়ে। এই সমালোচনা তো তাঁর কাজের গোড়ার ঘূর্ণ থেকেই হয়েছে। তিনিও তা নিশ্চয়ই জানতেন। কিন্তু সেগুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যায়, তিনি বিশেষ চেষ্টাও করেন নি, ওগুলিকে ত্রুটি বলে মনেই করতেন না।

স্বভাবের দিক থেকে বিজ্ঞানদা ছিলেন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মানুষ। যখন যেটা তিনি দেখতেন, সেটা সম্পর্কেই অতি-ক্ষুণ্ণ একটা সাড়া আগত তাঁর মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রতিক্রিয়া ঘটত, সেগুলিই তাঁর নাটকে এসে যেত আঁকাড়া ভাবে। যেমন, তাঁর মুখের কথার গ্রামাণ টান থেকে যেত, তাকে শহুরে

‘শিক্ষিত’ করার কোনো দায় তাঁর ছিল না ; যেমন, রাগের বা ক্রোধের মাধ্যম দুটো ধারণা কথা তাঁর মুখ দিয়ে অবলীলার বেরিয়ে যেত, সে-ভাবে ‘সংস্কৃত’ করার কোনো চেষ্টা তাঁর ছিল না—তেমনি নাটককেও ‘সুশৃংখল’ করার ভ্রমে তিনি মাথা ঘামাতেন না। তাঁর আবেগ, সহানুভূতি তাঁকে যেমন ভাবে পরিচালিত করত, তিনি তাই করতেন। এই দিক থেকেও তিনি ‘গ্রামীণ’। গ্রামের একজন সাধারণ লোকের মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি অনেক সরাসরি, প্রত্যক্ষ ; বাঁকা পথ কম নেয়। তার রাগ, ক্রোধ, ভালোবাসা, বিরূপতা সবই কিছুটা সরল পথে প্রকাশিত হয়। এই ‘গ্রামীণ’, প্রত্যক্ষ, সরল অভিব্যক্তির অঙ্গতে তাঁর নাটকগুলির বিচরণ। তাঁর অভিনয় ও নাট্যরচনার প্রধান শক্তি এইখানে—এই তাঁর স্বতন্ত্রত্ব, আবেগে, অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ায়, প্রাণবন্ত আন্তরিকতায়।

‘আগুন’ নাটকের অনেক দোষ আজ বের করা সম্ভব। কিন্তু রচনাকালে এটিকে একটু আচমকাই বলতে হয়। ওর কোনো পূর্বসারী নেই। তখনকার শিশির-প্রভাবিত মন-অঙ্গতে নেই। অল্প দিকে ওয়াই. সি. আই. করত বুদ্ধিজীবীদের নাটক, ইংরেজি নাটক, ‘আগুন’ সে-পোজেরও নয়। চালের দোকানে লাইন দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে, এয় ওপরে নাটক হতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারত না। বিজনদাও খুব স্বেচ্ছ-চিন্তে করেছিলেন তা নয়। ঐ লাইনে দাঁড়িয়ে-থাকা লোক-গুলোকে দেখতে দেখতে তাঁর যে দুঃখ ও ক্ষোভ, তাইই একটি স্বতন্ত্র প্রকাশ ‘আগুন’।

ছড়িকপ্রভ গ্রামীণ মানুষদের কলকাতার পথে পথে ঘোরা ও মরার যে বর্ষান্তিক দৃশ্য তিনি দেখেছিলেন তার বেঘনাত প্রকাশ ‘নবান্ন’। এ নাটকেও গঠনের বহু জটিল বার করা যায়। ‘নবান্ন’ সম্প্রদিত হয়ে অভিনীত হয়েছিল, তাও তার গঠনশৈথিল্যের কথা সমালোচকরা বলেছেন। ‘নবান্ন’ যে প্রাণের আবেগে লেখা, ‘বিবেচনা’ যে লেখকের মাধ্যম ছিল না, তার প্রমাণ ‘নবান্ন’-র মধ্যেই আছে। তিনি ‘নবান্নে’ বিদ্যামিশ্রের আন্দোলনকে বিশেষ গৌরব দান করলেন। কিন্তু কমিউনিস্টরা বিদ্যামিশ্রের আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী ছিল। কমিউনিস্ট-পরিচালিত গণনাট্য সংঘের ভ্রমে লেখা নাটকে বিদ্যামিশ্রের আন্দোলনের গৌরব-দান—মহাস্বাক্ষর রাজনৈতিক অপরাধ বলেই বিবেচিত হওয়ার কথা। বিজনদা তাও লিখে কেললেন। ‘বিবেচনা’ করে লিখতেন না বলেই পারলেন। বিদ্যামিশ্রের ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রাম ও

আত্মত্যাগ বিজনদ্বাকে মুগ্ধ করেছিল, তাই রান্নানৈতিক 'লাইন' ভেঙে ফেললেন।

বিজনদ্বার অপোহালো আবেগগ্রহণ ধরন—বা তাঁর স্বভাবগত—তা তাঁকে আত্মপ্রকাশে এক ভাবে সাহায্যই করেছে। এই ধরন ছাড়া তিনি অন্য কোনো ভাবে—গুহিমে গাহিয়ে—নিজেকে মেলতে পারতেন না। ঘটনার অতিঘাতে সেই মুহূর্তে তাঁর মন যে ভাবে বেগে উঠত, কঁদে উঠত, যেতে উঠত, সেই ভাবেই তার প্রকাশ ঘটত। তাঁর শিল্পকর্ম ঘটটা অকৃত্রিম হয়েছে, সজীব হয়েছে, গতাকে ঘটটা স্পর্শ করেছে, তা সবই তাঁর এই অভাবের গুণে, এই স্বভাবই তাঁর শক্তি।

আবার এই স্বভাবই তাঁর দুর্বলতা। একটু গৃহিণীপনা না থাকলে সাহিত্যও ঠিকমতো দাঁড় করানো যায় না। সাহিত্য তো তবু সৃষ্টি-মুহূর্তে একা লেখকেরই কাজ। নীতিকবি আপন মনে বেঁধে যেতে পারে তার কবিতা। কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুল, তাই সংবেদনশীল পাঠকও সে কোনো না কোনো দিন পেয়ে বাবে। কিন্তু বিজনদ্বার মূল মাধ্যম—নাট্য। এটি বহু লোকের ওপর নির্ভরশীল এক বোধশিল্প। আর অতিনয়কালেই রসগ্রহণ করতে হয় এটির। সাহিত্য যেমন দরকার মতো দণ্ড বার পড়া যায়—নাট্য সাধারণত তা নয়। তাৎক্ষণিকতা আছে এর। তাই এই শিল্পে সাংগঠনিক প্রবন্ধ অত্যন্ত জরুরি। সাংগঠনিক ক্ষমতা ছাড়া এ শিল্পে চূড়ান্ত সিদ্ধি অসম্ভব। বিজনদ্বাও ক্ষমতার অভাবে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেন নি। ঘটটা তুলে আনবার ক্ষমতা তাঁর ছিল, আবেগ বা আগ্রহের প্রাবল্যই যেন তাতে বাদ সাধত। আত্মুলের ফাঁকে গলে যেত অনেকটা। যা উঠে আসত তারও হাঁহ অনেক সময় হু-সম হত না। একটা বণ্ডিত ভাড়াচোরা চেহারা নিত তাঁর শিল্পকর্ম, বা তাঁর শক্তি, তাই হয়ে দাঁড়াত তার সীমাবদ্ধতা।

বাইরের বাধা তো ছিলই (মহলা-ঘরের অভাব, মঞ্চ না পাওয়ার, সহযোগিতার অভাব, অর্থভাব ইত্যাদি)। ভেতরেরও একটা বাধা ছিল—তাঁর শিল্পীস্বভাবের মধ্যো। এই আত্মধ্বংস—একে তিনি কোনো দিনই পুরো অতিক্রম করতে পারেন নি।

কিন্তু বিজনদ্বার কৃতিত্ব, বিজনদ্বা যেমে বান নি। অঙ্ককার চার দিকে ঘনিষে এসেছে—বাইরে, ভেতরে; আর আলোর আঘাতে বারবার সেই অঙ্ককারকে তেড়ে ফেলবার চেষ্টায় মরীয়া একটা মানুষের চিহ্নই বিজনদ্বার জীবনচিহ্ন। প্রতি মুহূর্তেই মরন্ত আর প্রতি মুহূর্তেই জীবন্ত মানুষ বিজনদ্বা। ভেঙেচুরে-পড়া, আবার গড়ে উঠতে লগেট। ব্যর্থ, পরাজিত, সার্থক, অস্বাভাবী।

‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত’-এর মঞ্চরূপায়ণ

প্রশ্নোদ্যম দাশ ৫৩

‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত’-এর মঞ্চস্থাপনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন নাট্যমঞ্চ সংস্থা ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি। বর্ষেট উৎসাহ নিয়ে এর মহলাও চলেছিল কিছুদিন। এর আগে বিষ্ণু দে-র জ্ঞানপীঠ পুরস্কারগ্রহণ উপলক্ষে হিন্দী ভাষায় রূপান্তরিত এই অঙ্কনটির একটি সকল প্রযোজনা হয় দিল্লীতে। তারই অঙ্কপ্রেরণায় কলকাতায় এটি মঞ্চস্থ করার কথা চিন্তা করা হয়েছিল। কিন্তু বিবিধ কারণে এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। একক ও সম্মিলিত কণ্ঠে আবৃত্তি ও গান এবং তার সঙ্গে শিল্পীদের কিছুটা অভিনয়ের উপকরণ নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কবিতাটির যে মঞ্চরূপ পরিকল্পনা করেছেন তা শিল্পীদের বিশেষ কুশলতা দাবি করে। এ কথাও মনে হয় যে এই পরিকল্পনার নির্ধৃত রূপায়ণেই কবিতাটির একটি সার্থক মঞ্চ-প্রযোজনা সম্ভব। শিল্পীদের নিজেদের মধ্যে সময়স ও সেইসঙ্গে নেপথ্য কর্মীদের কাজের সঙ্গেও তাঁদের সামঞ্জস্য থাকা একটি প্রাথমিক শর্ত। আবৃত্তি ও গানের অংশে তরঙ্গা, বাউল ইত্যাদি লোকশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন বা রাগসংগীতের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনায় এবং এই সমস্ত উপাদানগুলির এমন একটি মিশ্রণ ঘটেছে যার ফলে মঞ্চপ্রযুক্তিতে মূল কবিতাটি অপকল্পভাবে দৃষ্টমান হয়ে ওঠে। ফলে, শিল্পের এই ধারাগুলি সঘনো জ্ঞান থাকা, কবিতাটির সাহিত্যিক গুরুত্ব সঘনো অবহিত হওয়া এবং আবৃত্তি, গান ও অভিনয়ে সময়স থাকা—এই সবই হল এই মহৎ সৃষ্টির সকল মঞ্চ প্রযোজনায় নিয়ামক। তা না হলে নিছক প্রচলিত প্রথার আবৃত্তি ও গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হলে এর পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত’-এর এগারোটি বিভিন্ন অংশে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

স্বয়ং দিয়েছিলেন। এই অংশগুলির স্বরলিপি করে রাখা হয়েছে। গীত-শিল্পীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বা চলে ফিরে ব্যঙ্গনাময় ভঙ্গির সঙ্গে গান গাইবার নির্দেশ ছিল। আবৃত্তি যাঁরা করবেন তাঁদেরও বাণী ও ভঙ্গিমার স্বয়ং বিস্তারিত কখনো একক ভাবে, কখনো বা একাধিক মিলিত কর্তে, কখনো একটি স্বরে, কখনো বা বিভিন্ন স্বরে আবৃত্তি করতে হবে। আবৃত্তি অংশ ও গীত অংশ সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের পরিপূরক হবে। গানের অল্প সাধারণ ভাবে শিল্পীদের বলিষ্ঠ ও মার্জিত স্বরেলা কণ্ঠ প্রয়োজন। সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও স্বরপ্রক্ষেপণ ক্ষমতা ও কোরাস গাইবার মূল রীতিনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও তাঁদের পক্ষে দরকার। আবৃত্তিকারদেরও স্বর ও তাল-এর প্রাথমিক জ্ঞান থাকা চাই। অকম্পিত ও সবল কণ্ঠস্বরের সাহায্যে কবিতাটির প্রাবন্ধ্য পরিষ্কৃত করতে হবে। বলা বাহুল্য, অধুনা বেড়িও বা জলসায় চর্চিত এক বিশেষ ধরনের নিম্নাংশ আবৃত্তি-পদ্ধতি এখানে অচল।

মঞ্চে একাধিক তাল থাকবে এবং শিল্পীরা কখনো কখনো মূল মঞ্চভূমিতে উপরের তালগুলি থেকে নেমে আসবেন গান বা আবৃত্তির সঙ্গে ও তাঁদের গান বা আবৃত্তি শেষ হলে মঞ্চের পাশ দিয়ে, কখনো বা আরোহণের পথেই উঠে গিয়ে প্রস্থান করবেন। দু-একজন শিল্পীর বসবার অল্প মঞ্চে চেয়ার বা বেঞ্চি থাকা দরকার। মঞ্চে বিভিন্ন দিক থেকে আসা-যাওয়া, নানা গতিতে চলাফেরা করা বা মঞ্চের বিশেষ বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা—এগুলিকেও ছন্দোময় ও অর্থবহ করে তুলতে হবে। আর এই সঙ্গে সমতা রেখে আলো নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

অঙ্কনটির সূচনা হয় একজন শিল্পীর আবৃত্তি দিয়ে, যাঁর ভূমিকা বানিকটা স্তম্ভধারের মতো এবং পরেও যিনি কবিতাটির অল্প কয়েকটি অংশ আবৃত্তি করেন। এই প্রারম্ভিক আবৃত্তি চলতে থাকা কালেই মঞ্চে অল্প দু-জন শিল্পী আসেন ও পরস্পর কথা বলার মতো অভিনয়ের চং বজায় রেখে 'হঠাৎ উঠেছে বেধ বোলোতলা' থেকে 'কলকাতার কপালের গেহো' পর্যন্ত আবৃত্তি করেন। আবৃত্তি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দু-জন প্রস্থান করেন। এবার তিনজন প্রবেশ করেন তিন দিক থেকে ও মঞ্চের বিভিন্ন অংশে দাঁড়িয়ে পরবর্তী তিনটি স্তবক আলাদা আলাদা ভাবে আবৃত্তি করেন। 'রৌদ্র হানো বান দাও' অংশটি একটি বড় গানের দল সার বেঁধে গাইতে গাইতে চুকবেন। এর পর ও বেয়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত গান চলবে। পরবর্তী স্তবকটির ২য় পংক্তি থেকে শুরু করে প্রতিটি একান্তর পংক্তি স্বর-যোজিত

'আকস্মিক ঘণ্ড তাই চাই' পর্যন্ত। এই অংশটি তর্জার মতো করে বাংলা ঢোল ও কঁাসির সঙ্গত রেখে গাইতে ও আবৃত্তি করতে হবে।

আগে যেমন বলা হল, মোটামুটি সেই ভাবেই বাকি অংশটি একক বা বোধ আবৃত্তি ও গানে, আত্মবাহিক শব্দ ও বহুসংগীতের সহায়তায় রূপ দিতে হবে এবং একটি স্বাভাবিক পরিণতির দিকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে কবিতাটির শেষ চরণগুলি শব্দ ও দৃশ্যের মাধ্যমে পুরোপুরি সঙ্গীভূত হয়ে ওঠে।

আনন্দ-স্মৃতি

ক্ষিতাশ রায়

তুনেছি ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে যে সাত বছর অন্তর অন্তর আমাদের দেহ-কোষের উপাদানগুলি একটু একটু করে ক্ষয় হতে থাকে। প্রকৃতি তখন নতুন দেহকোষ রচনা করে ক্ষতিপূরণ করেন এবং এই অগ্রেই আমাদের জন্মান্তর ঘটতে থাকে। কয়েক দিক থেকে এই নবজীবনের গান হযতো পূর্ব থেকে পূর্বান্তরে অব্যাহত থাকে। কিন্তু জন্ম মনের কথা স্বভাব। জীবনপথে চলতে চলতে মানুষ মানুষের সঙ্গে জন্ম মনের সম্পর্ক রচনা করতে থাকে। এই সব সঙ্ঘর্ষের মধ্যে সব চেয়ে আত্মরিক হল তরুণ বয়সের সৌহার্দ সঙ্ঘর্ষ। এ সঙ্ঘর্ষে এতই গভীর যে কালিদাস “স্বপ্নং জনের” কথা বলতে গিয়ে বলেছেন “দয়িতাশ্রনবস্থিতং বনঃ ন খলু চলং স্বপ্নম্ভবনো।” মৃত্যু স্বপ্ন সেই সৌহার্দ সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটায়, মনে হয় অন্তরের একটা বৃহৎ অংশ যেন চিবকালের জন্ত নিশ্চির হয়ে গেল। কিন্তু সত্যিই কি তা ঘটে? মেটারলিংক-এর নীল পাখি বলেছিল মৃত প্রিয়জনকে যদি তেমন করে মনে রাখা যায়, তা হলে তারা বেঁচে থাকতে পারে।

সম্প্রতি আমার যে কয়জন সহস্র বন্ধুর মৃত্যু ঘটেছে, তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি শূন্যতার সৃষ্টি করেছে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও হিরণ্যকুমার সান্নালের মৃত্যু। আমার প্রতি দেহসঙ্ঘর্ষের স্মৃতি ও স্বভাবগুণে এঁরা জন্ম আমার স্মৃতিতে অচ্ছেদ্য। এঁদের মৃত্যুতে নিভৃত অন্তরে যে গভীর আঘাত পেয়েছি, স্মৃতির প্রলেপ তার উপর অল্পে অল্পে একটা আবরণ রচনা করছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-মৃত্যু যেন আমার নিজেরই মৃত্যু। এঁদের সঙ্গে আমার সৌহার্দ সঙ্ঘর্ষ এমনি গভীরভাবে আত্মরিক ছিল যে, এঁদের বিষয়ে কোনো আলোচনা বা ব্যক্তিচারণা আপাতত আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমি কেবল আমাকে লেখা তাঁদের কয়েকটি চিঠি ‘পরিচয়’-মিউগোটির কাছে হাজির করাছি এই আশায় যে তাঁরাও হয়তো তাঁদেরকে লেখা কিছু কিছু চিঠি প্রকাশ করতে দেবেন। এই সব চিঠিতে এই ছুজনের সহজ মনের যে-সব পরিচয় আছে, তা হয়তো সঙ্ঘের পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করবে।

জ্যোতিরিন্দ্রের চিঠি

শ্রদ্ধা

১২/১/৭৮

বাণী,

তোমার ছুটি বই-ই বখাশময়ে হস্তগত। তার সঙ্গে অত্যন্ত মর্মস্পর্শকারী দীর্ঘ চিঠি। আমি এখন পুরোনো original কুড়ুনী^১ নিয়েই ব্যস্ত। আমি ফুলের মেয়েদের এবং কতৃপক্ষের অবিধা ও অসুবিধা বুঝেই, তার ভিতর দিয়েই একটা ছাত্রছাত্রী-অনোচিত বন্ধ-সকল রূপধানে ব্যস্ত। এই আত্মবাহীর শেষের দিকে, কমলা ফুলেরই^২ নিজের মঞ্চে মঞ্চস্থ হবে। বখাশময়ে ধবর পাবে।^৩ তোমার পরিবর্ধিত পরিমার্জিত কুড়ুনী একবার দেখলাম। আর একটু ভাল করে দেখতে হবে। নিশ্চয়ই উন্নততর সংস্করণ হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখিনা। এবং সেটা পাঠভবনের^৪ ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা নিশ্চয়ই করানো যেতে পারবে। পুরোনোটা কেও আরও নতুন অনেক অল্প-সংযোজনায় সবুজতর করবার চেষ্টা করছি। কাজ অনেকটা এগিয়েছে। এখন শেষ রক্ষা হলে হয়। সকল হওবার পথে ফুল-মস্ত বাধা অনেক। তোমার কথাগুলি ঠিকই আছে। তাতে বেশী হাত দিচ্ছি না। কথায় নড়চড় নেই।

ইতিমধ্যে তোমার ধবর দেওয়া হয়নি, সিদ্ধার্থ^৫ পথ চলতে চলতে একজন

১. আমার রচিত ছোটদের মৃত্যুনাট্য। জ্যোতিরিন্দ্রের প্রত্যাবর্তনে এটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম।

২. কমলা বালিকা বিদ্যালয়। দিল্লী থেকে কলকাতা করে আসার পর জ্যোতিরিন্দ্র এই বিভাগের ও কলকাতার পাঠ্যবনে পালা করে গানের ক্লাস দিত।

৩. ১৯৭৫-এর গোড়ায় ‘হয়-সংযোজন করে নিম্ন অধ্যায়ের জ্যোতিরিন্দ্র কমলা বালিকা বিভাগের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উপসবে ‘কুড়ুনী’ মঞ্চস্থ করে।

৪. পুরা।

জীবনসঙ্গিনী জুটিয়ে নিয়েছেন। মেয়েটি একই Office-এ কাজ করতো। ...মেয়েটি খুবই সপ্রতিভ ও ভাল। দুজনই কাজ করে। এইবার পূজার অবসরে দিল্লীতে গিয়ে ওদের আশীর্বাদ করে এসেছি। মেয়েটির বাবা, শ্রীনাথানিয়েল অল্পরকম বিশ্বাস বহুপূর্বে Partyতে ছিলেন।

বিষ্ণুবাবুদের ওখানে* বাবার খুব ইচ্ছা আছে। কিন্তু নানা কারণে যেতে পারছি না। তোমার সঙ্গে যেতে পারলে বেশ ভাল হত। সন্ন্যস্তী পূজার সময় কোলাহল ও সমারোহ-পূর্ণ কলকাতা ছেড়ে অন্ত কোথাও গিয়ে লুকোতে পারলে ভাল হত। শান্তিনিকেতনেও বাওয়া যায়। কি বল?

আজ মিত্তুকে* নিয়ে 'লক্ষ্য' বলে একটা হিন্দী ছবি দেখলাম। একেবারে আলাদা জাতের। বেশ ভাল লাগল। Bengal Neo-realist Schoolএর ছোঁয়াচ আছে। সবই পুণা Film Instituteএর ছাত্রছাত্রীরা—শ্রাম বেনেগাল ডাইরেক্টর। রবীন্দ্রের* Fine Arts Society-এর মধ্যে তৃপ্তিদেয়* 'ঘরে বাইরে' দেখলাম মিত্তুকে নিয়ে। একটা শক্ত subject, তৃপ্তি বেশ tackle করেছে তো? আমার তো ভালই লাগল। অনেকের মতে না কি ভাল হয় নি। আমি সে মত পোষণ করিনা।

মণিকের* 'সোনার কেলা'-ও দেখলাম। বেশ ভাল লাগল। মণিকের পরিমিতিবোধ অসাধারণ। যেটা মুগাল বা ঋষিকের** মধ্যে পাই না।

তোমার কস্তারত্বদের বিশদ খবর পেয়ে খুবই ভাল লাগলো। সব স্থপে ও অস্থভাবে থাকুক।

কুড়ুনী প্রকাশনের যে তোমার নূতন proposal**—গ্রহণযোগ্য। বারাস্তরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা যাবে। আজকের মত প্রীতি ও শুভেচ্ছা আনিয়ে—একান্তই তোমার

জ্যোতিবিন্দু

* আমাদের উদ্দেশ্যে সতীর্থ ও বন্ধু বিষ্ণু দে যেওমবের সম্মিহিত বিবিধাৰ অবসব জীবন বাশন করছেন।

৬. জ্যোতিবিন্দুর কবিতা কত হস্তিত।

৭. জাতা বধীতনাথ মৈত্রে।

৮. তৃপ্তি দিত্র।

৯. সত্যজিৎ রায়।

১০. মুগাল সেম ও ঋষিক ঘটক।

১১. প্রত্যাব ছিল বরগিণি সম্বলিত হয়ে পরিবর্তিত সংকল্প প্রকাশিত হলে, আমরা দুজনে সম্মান হারে হৃদয়ী ভাগ্যভাগি কবে দেব।

ছই

২২।৩।৭৫

বাণী, তোমার বাউল সপ্তপদী পেলাম। বেশ স্মরণ হয়েছে। তোমার বর্তমান মনের রংটি ফুটে উঠেছে। এইবার একতারা, আনন্দলহরী ও দোতারার নিয়ে বেরিয়ে পড়লে হয়। সময় করে কথায় ছর চাপানো যাবে। এই সঙ্গে কমলা গার্লস স্কুলের anthemটা পেলাম। পাঠ্যবনের anthemটা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও শেখানো শুরু হয়েছে। একটা অববাক্য কিছু একটা হবে বলে মনে হচ্ছে। সকলে অবশ্য—আবালবুদ্ধবনিতা—খুব উৎসাহিত, হৃদয় বা কিছুটা অগ্রগৃহীত। Textটা পরে লিখে পাঠাবো। ‘কমলা’র anthemটা তৈরী হলে সেটাও trial দেওয়া যাবে। এমনিতে এখানে স্কুলের ব্যাপার-টাপারগুলো খুব জমেছে। কিন্তু মন বলছে—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনো-খানে—। তবে আমার attitude অবশ্য শুকদেবের কারণেই অল্পবিস্তর positive, অর্থাৎ ‘মরিতে চাহি না আমি স্মরণ ভুবনে’...। তোমার সঙ্গে এবং শিবু^{১২} সঙ্গে দেখা করতে তোমাদের পাড়ার যেতেও পারি সমস্ত সুযোগ পেলে। ISCUS-এর Conference-এ বিশেষাগত কিছু delegatesদের সঙ্গে আলাপ হল। নবজীবনের গান ও Patriotic Songs IPTA period-এর কিছু গাইতে হল। একটু ক্লাস্তিকর অবস্থা, তবে অল্প দিক থেকে খুব উৎসাহবর্ধক। Compensation আছে, মনকে তরুণায়িত করে।

এবার টুফুর^{১৩} গানটা ভাল করে শোনা যাবে। টুফুর গলার মিষ্টক ও এক ধরনের মেজুর ব্যক্তিত্ব আমাকে খুব আকর্ষণ করে। মিড্ল্যান্ড পড়াশুনো ভালোই চলছে, পরীক্ষা সন্নিকট বলে কিছুটা উবেগগ্রস্ত। তবে Confidence আছে বলে মনে হল। কাল তাকে Twelfth Night ও Thomas Hardy পড়াচ্ছিলাম, কিছু কিছু grasp করতে পারছে বলে মনে হল।

বিকুবাবুদের আগমনসংবাদ পূর্বেই পেয়েছি পপাদের^{১৪} মারকত ৮

১২. শ্রীমন্তেন্দ্রের প্রভাস সেন।

১৩. শর্মিলা রায়।

১৪. বিষ্ণু দেবের পুত্র কিছু দে।

আগামী মৌসমে, শীতাদের^{১৫} - 'স্বপ্নি কণ'-এ একটি whole night programme হবে। ওদের Puppet Section-এর সকলে অংশ গ্রহণ করবেন। ছাবে বসে একটি ভাল Documentary দেখার ব্যবস্থা করার কথাও ভাবা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াতে ব্যর্থ হবেন। এখানে মিনের বেলার বেশ গরম। তবে রাতে চিলে-কোঠা^{১৬} বেশ ঠাণ্ডা থাকে, আর নিশ্চলক তারাদের মেলা। ভালবাসা নিও। টুকুকে স্নেহাশিস—

জ্যোতিরিন্দ্র

তিম

"চিলে কোঠা"—এ এস আর হাস রোড। ৩১।৫।৭৫

বাণী, যথাসময়ে তোমার স্নেহলিপি হস্তগত। ক'দিন একটু ব্যস্ত থাকার উত্তর দিতে বিলম্ব ঘটলো। আগামীকাল 'ধানি লংকা'^{১৭}-কে নিয়ে ১২ দিনের সফরে দিল্লী রওনা হচ্ছি। ফিরছি ১৫ই জুন। ফিরে তোমার সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবো। এখানকার T.V Production Unit-এর সঙ্গে কিছুটা বোঝাবো। অন্তরের রাসনা, যদি 'কুড়ুনী'-কে বাচ্চাদের programme-এর অন্তর্গত করা যায়। পপার সঙ্গে ইদানীং সাক্ষাৎ নেই। কুড়ুনীর বৃহত্তর সংস্করণটাও ছাপতে হবে—স্বলিপি সহ^{১৮}। ফিরে এসে সব বোঝাবো। আর Students' Health Home-এর জন্ম কল্যাণে গাইতে হবে। ওখানে টুকুও তো গাইছে? কলকাতার কবে আসছো? ভালোবাসা নিও।

জ্যোতিরিন্দ্র

তার

এ এস আর হাস রোডের 'চিলেকোঠা'। ২৩।৭।৭৫

ডাই বাণী, তোমার কান্ড পেলাম। মধুশ্রী^{১৯} স্মরণে অহুতানের খবর পেয়েছিলাম। তবে হয়ে বাবার পরে। তা হোক, শ্রীমতী মধুশ্রী আমার

১৫. শীতা বন্দোপাধ্যায়।

১৬. দিল্লী কেন্দ্র জ্যোতিরিন্দ্র কলকাতার পৈত্রিক বাড়ির ছায়ে একটি করে আশ্রয় নিচ্ছেলেন। 'চিলে কোঠা' নামটা আমায় দেওয়া।

১৭. কিছুকাল শিশু অসহায় গ্রন্থ বণন দিল্লীতে দেখি, তার নাম দিল্লীজামা দানিকংকা।

১৮. ১৯৭৫ সালে গ্রন্থ বন্টনের সময় কিছু পরিবর্তন। পরিবর্তন করে স্বলিপি সহ, 'কুড়ুনী'র একটি বৃহত্তর সংস্করণ প্রকাশের কথা হয়েছিল।

১৯. মধুশ্রী বসু (১৯০৭-৭৫)।

কাছে অগ্নান মুত্থাহীন ছবি। সেই দিনীতে তার প্রথম অঙ্কনের কথা মনে পড়ে। 'রাবলীনা'-র অঙ্করাঙ্গী ভক্ত ছিল সে। তোমার অন্ত্র কভায়াও। গতবার হাসপাতালে^{২০} তার সঙ্গে শেষ দেখা। আত্মীয় বন্ধু অঙ্করক বিরোধে গুরুদেবের অনেক কবিতা অনেক গান সাধনা ও আশ্বাসের আশ্রয়স্থল। পণায় সঙ্গে আজকাল কিছু দেখা হচ্ছে। কুতুন্নি-র ২য় সংস্করণের manuscriptটা দিয়ে দেবো। সেদিন ওদের ওখানে বিজুবাবুর জয়দিন পালন করা হল, গানে, কবিতায়, আবৃত্তিতে। পণায় ভাইরা-তাই মনু^{২১} রেকর্ডিং করলেন। বিতু ভাল আছে। পরীকার প্রস্তুতিতে মন। বিনয়ের^{২২} অঙ্ক একটা বড় করে আরক সভা হবে। সে IPTA-এর^{২৩} অঙ্কতম প্রতিষ্ঠাতা ছিল। ওর অভাবে অনেকেই দুঃমান। ভালবাসা নিও। শ্রীমতী টুকুকে স্নেহাশিস—

জ্যোতিরিন্দ্র

পাঁচ

'চিলেকোঠা'। ১৭/৭৮

তোমার পত্র কয়েক দিন হল পৌছেচে। গত সপ্তাহ পাঠভবনের^{২৪} ছেলেমেয়ে ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের 'সে' ও পরশুরামের 'জুয়ুগির মাঠ' মঞ্চস্থ করতে ব্যস্ত ছিলাম। গতকাল ৪/৭/৭৮ তারিখে সকালে সে-অঙ্কঠান নির্বিঘ্নে সমাধা হয়েছে। তাই উত্তর দিতে ধেরী হল। ই। "সামন্ত-তারিক স্তম্বাংশেবের" সামান্ত এক টুকরো^{২৫} পেয়েই খুসী হয়ে আতুল চুবতে চুবতে বাড়ী ফিরতে হয়েছে। কিছু সাধনা ওরই মধ্যে। মোটে মা রাঁধেন, না.....ইত্যাদি। বিতু অর্থাৎ বানিলংকা একরকম ভালভাবেই পাশ করেছে—ইরাজি সাহিত্যে Letter পেয়ে। বাহুবপুয়েই ভর্তি হবার চেষ্টা করছে। এখান থেকে বাতায়াত, দেখাশোনার খুব সুবিধা। অতঃই উর্মিলার^{২৬} কথা খুব মনে হয়। হাড়ি পকানোটা খুব সহজ হয়ত হবে না...

২০. মাজেরহাটে পোর্ট-এর হাসপাতাল।

২১. ডা. মনোহরলাল ভাটরা।

২২. বিনয় রায়।

২৩. Indian Peoples Theatre Association.

২৪. কলকাতার পাঠভবন।

২৫. ব.জ্যোৎস্না-স্মৃতি পাবিতারিক অমিহারীর কতিপয় বাবর।

২৬. লোকান্তরিতা উর্মিলা।

তবে চেষ্টা চলিয়ে বাছি। তোমার নতুন নাট্যরূপ^{২৭} সবচেয়ে কৌতূহলাকাজ।
পরে বিশেষভাবে সব জানতে চাই।' অপর, আমি শ্রী শ্রী কালিদাসের
'মেঘদূতের' একটা স্মিতালেখ্য-গোছের করবার চেষ্টায় আছি। বর্তমান
পরিবেশে বেশ কুঃসাধ্য হলেও চেষ্টা করছি। বিজুবাবুদের খবর পূর্ণা মারকত
পাই। প্রগতি^{২৮} চন্দ্র কোনও উন্নতি হয়নি। যদি কলকাতার আসার
সম্ভাবনা থাকে খবর দিও। দেখা হবে নিশ্চয়ই। ভালবাসা নিও। তোমার
পারিবারিক খবর দিও—

চিলেকোঠার চিল—জ্যোতিরিন্দ্র

জয়

চিলেকোঠা। ১০/৭/৭। ৫ এস আর হাস রোড

তুঁহ কিত্তি-ঈশ রাক্ষ রাভেস্ত্র

কল্পনা অপার নিধি হে—

সহস্র সন্ধান পুরঃসরঃ নিবেদনশ্বেত^{২৭}, মহামহিষ রায় মহাশয় মহাহুত্তবেষু,
আপনকার দাক্ষিণ্যবান পক্ষে সকল বিষয় অবগত হওয়ায় যুগপৎ পুলক,
রেচক, কুড়ক, পূরক, আনন্দগম্য ইত্যাকার বিজুতিনিচয় অল্পভূত
হইয়াছে। এক বর্ণনাতীত অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। আপনি বিশ্বস্তস্বজ্ঞে
যাহা অবগত হইয়াছেন তাহা কিয়ৎ অংশে সত্য বটে।^{২৮} চিরজীবন এক
আঘর্ষে অল্পপ্রাপিত হইয়া এক কুঃসাধ্য স্বপ্নের পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছি।
আপনারবিগের সকলের মহাহুত্তবতার ও শুভেচ্ছায় স্বপ্ন হয়ত সফল হইতে
পারে—এইরূপ আশা হয়। আমার একান্ত নির্ভর আপনি স্বয়ং বাড়গ্রামে
উপস্থিত থাকিয়া, মদীর বাড়গ্রামের বন্ধু ও সহায়ক শ্রীকালিদাস মহাত্মার
সাহায্যে অধি-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে^{২৯} সূত্র সমাধান করেন। অন্তর্ধার,

২৭. ইংরাজী Sacrifice-এর ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'।

২৮. বিজু দে-ব.স্বী।

২৯. অদিদারী কতিপূরণের টাকার জ্যোতিরিন্দ্র বাড়গ্রামে একটি কর্ণপন্নী স্থাপন করতে
চেষ্টাছিলেন আদিদারীদের কল্যাণে।

৩০. বাড়গ্রামের সমিহিত অন্তঃপাতি গ্রামে আমার সমস্ত কিছু যদি আমি স্থানপন্নবাসে
জ্যোতিরিন্দ্রকে দিতে ইচ্ছুক হয়ে তাকে অদিদারী ভাষায় একটি পত্র লিখেছিলাম। এটি
তারই উত্তর। শর্ত ছিল কর্ণ পন্নীতে আমার অল্প মুক্তি, বিত্তি ও একটি মাসের ব্যবস্থা রাখা
থাকবে।

আমার, এ সকল বিষয়ে সহজ অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা হেতু বিলম্বের কারণ ঘটিতে পারে।

আর, আপনকার পক্ষে লিখিত শর্তাবলী সত্যই মনোজ্ঞ ও পালনযোগ্য। আপনি যে দুই গোলাধ বিধ পরিষ্কার শেষ করিয়া প্রত্যাগত^{৩১} তাহা অত্র পক্ষে জ্ঞাত হইয়া অপর আনন্দে আশ্রুত। বহুবর বিষ্ণু গত দুই দিবস কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছি। আপনকার, সর্ব বিষয়ে মহাশুদ্ধ ও মহার্ঘ এই পত্রের বিষয় বিজ্ঞাব্যব গোচরে আনিব। তিনি নিশ্চিত জ্ঞাত হইয়া আনন্দোৎক্লিষ্ট হইয়া উঠিবেন।

আপনার বর্ণিত ব্রহ্ম বা কবিত্র হানপত্রাদি হটক বা না হটক আপনকার ক্ষত্র বাবজীবন এক আশ্রয় বিশ্রামগীঠ স্থাপিত অবস্থ আনিবেন—আমাদের এই ‘কর্ষণ পত্রীতে’। এ সংঘারাম আপনাদের সকলের শুভবাধ বৃত্ত থাকিবে। কবে আপনাব ঝাড়গ্রামে শুভ পরার্ণব সম্ভব হইবে অগ্রাহ্য করিয়া এ অবস্থার গোচরে আনিবেন। গৃহাদি ও কুপের ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আপনাদের শুভেচ্ছায় ২৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারিবে। এতৎ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পত্রান্তরে জ্ঞাত করিব। আশা করি আপনকার বিদেশ ভ্রমণ সফল হইয়াছে, এবং আপনকার কস্তারা সকলে কুশলে আছেন।

অত্র, যিতু (ধানিলংকা) ভালই আছে। বাববপুরে ইংরাজী অনাস লইয়া পাঠ ও পাঠ্যে বহু। মদীয় ভাণিনের স্রীমান সুরজিতের^{৩২} সহিত নিশ্চয়ই দেখা হইয়াছে। সে-ও মদীয় এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহিত। অসম্মতিবিত্তারোণ—পত্রান্তরে সমস্ত অবগত হইবেন। ইতি একান্তই বশব্দ ও স্নেহাহুগত

অ্যোতিয়িল্ল মৈত্র।

জ্ঞাত

১ এম আর হাঙ্গ রোড, কলিকাতা-২৬। ১৫।৫।৭৭

ভাই বাপ্পি, বধাকালে তোমার স্নেহ-কার্ড হস্তগত। তুমি মার্চ-এর শেষে কলিকাতায় আসছ কেনে আনন্ডিত। তোমার নির্দেশাঙ্কযায়ী বখাসময়ে

৩১. সেপ্টেম্বর ৭০ থেকে জানুয়ারি ৭৭ পর্যন্ত আমি বিলাত ও আমেরিকায় হিলাস—কস্তাদের দেখতে।

৩২. ডক্টর হরজিৎ সিংহ—বিষভারতীর উপাচার্য।

কোনযোগে তোমার খবর নেবো। এবং ১১১০-এ হোক** অথবা ৫-এ হোক (চিলে কোঠার উদ্ভুক বাসায়) তোমার সঙ্গে মিলিত হব। ঐ পাঠা কাট্টা নিয়ে টুক করে ঝাড়গ্রাম ঘুরে আসতে পারলে ভাল হয়। সম্ভব হবে?

মোটামুটি ধানিলংকা-সহ ভাল আছি।

বিক্রম ও প্রগতিদের সঙ্গে ২১৩ বার দেখা হয়েছে। তাঁদের তোমার অন্তর্দর্শীর পত্র দেখিয়েছি। তাতে তাঁরা খুব আনন্দিত ও অমুগ্ধাশিত। এখন নির্বাচনজরাক্রান্ত। কি হয়! কি হয়! ভাব। ভালোবাসা নিও। অদূর ভবিষ্যতে দর্শনাকাজী—

জ্যোতিরিন্দ্র

আট

১৩৪১৭

ভাই বাণী, তোমার মেহ-লিপি পেয়ে পরম আপ্যায়িত ও আনন্দিত। সেদিন যে কাবুলবাবুর ওখানে** যেতে পারিনি তার কারণ নৈহাটি, পরে ব্যারাকপুর এই দুই জায়গার গানের ব্যাপারে আবৃত্তিকভাবে জড়িয়ে পড়ি। সেজন্য কবাবী। তোমার রূপকথা চিন্নাটা 'সেবমালা'*** বতবুর্ মনে পড়ে আমাকে পড়িয়ে শুনিয়েছিলে, তোমার বিশ্বপরিভ্রমার বাবার আগে, বালিগঞ্জ গেসে তোমার স্নাতক বাড়িতে।***...বিধিরাতে তোমার ভূমি-বদান্ততার কথা** আমার অবদিত নয়। ঝাড়গ্রামের ব্যাপারটা ওখানকার land-agent কালিগদ মহতোকে নিয়ে ফয়সালা করে ফেলবো। তবে একটু সময় নেবে। তোমার জমিটা আমাদের জমির সংলগ্ন নয়—অনেক দূরে। তবু কাজে লাগানো যায় নানা ভাবে। আমরা আগামী ১লা বৈশাখ ১৩৮৪-তে 'কবাবী' হস্তশিল্পের শাখার উদ্বোধন করবো। তারপর শনৈঃ পশ্চাদ্ধাবন কর্মসূচী ধরবো। বিক্রমাবুদের ওখানে গতকাল গিয়েছিলাম।

৩০. বিক্রমের বাসা ১১১০ প্রিন্স পোলায় মহরর রোড-এ সাক্ষাৎকালে অতঃপাতি জমির পাটা জ্যোতিরিন্দ্রের হাতে দিই।

৩১. পার্ক টাউ Queens Mansion হিত আমাদের উত্তরের সতীর্থ প্রবন্ধুয়ার সেদের বাসাবাড়ি।

৩২. 'সহস্রপাঠ' তৃতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত আমার রচিত 'সেবমালা' রূপকথা অঙ্গলভনে, আমি একটি চিন্নাটা রচনা করেছিলাম।

৩৩. আমার ভাই মণীসের বিদ্যুৎ পার্কস্থিত বাড়িতে।

৩৪. বিধিয়ার আমার একমুখ জমি আমি চিন্নাশিল্পী শ্রীযুক্ত বজ্রমারকে হস্তান্তর করি।

ওর শরীরের ওপর দিয়ে এখন আত্মরিক ডাক্তারী পরীক্ষা চলছে—রক্তচাপ ও হৃদয়ের কোনো গণ্ডগোল আছে কি না দেখতে। বর্ধিতাকারের ‘হুড়ুনী’-কে এইবার ধববো। পপাই প্রধান সহায় হবে। আজ ৩ দিন হল, সিদ্ধার্থ বধুসহ প্লেনযোগে এসে হাজির। Air Indiaতে কাজ করার পুরস্কার হিসাবে মাঝে মাঝে উড়ে বেড়াতে পারে। এখান থেকে Bombay যাবে। তোমাদের শান্তিনিকেতনে এত অশান্তি কেন? সুরজিৎ কি বলে? এই বিষয়ে দৃষ্টিভিত্তি।...তোমাকে অবশ্য ঝাড়গ্রামের ‘কর্ষণপল্লীতে’ নিয়ে যাবো। আশা করি তুমি কুশলে আছো। তোমার কস্তারত্বদের কুশল সংবাদ দেবে। নিরমিত খবর পাচ্ছো তো? এখানে সব মজল। ভালবাসা নিও—

জ্যোতিরিন্দ্র

অন্য

‘চিলে কোটা’ ১: ৫ এস আর দাস রোড। ২৩৪১৭৭

তাই বাণী, তোমার কার্ড পেলাম।...তোমার লম্বা আমি সব করতে পারবো। তুমি দিল্লীতে ‘তোয়ালে বাবার’^{৩০} ওখানে গিয়েছিলে জেনে আনন্দিত। তিনি দিন দুই কলকাতা এসে আমাকে contact করেছিলেন। সাতআটদিন হল ঝাড়গ্রাম বাই নি। এই মাসের শেষে যাবো—চক্রবর্ত্তপুর কেন্দ্র—সেখানে একটু কাজে যাবো। এখানে বিষ্ণুবাবু এখনও আছেন। আগামী তরা মে রিখিমায় ফিরে যাবেন। মাঝখানে বিষ্ণুবাবুর শরীর অত্যন্ত বেশী খারাপ হয়েছিল। এখন ওরই মধ্যে একটু ভালো আছেন। এখানে বধুসহ সিদ্ধার্থ দিল্লী থেকে এসেছে। অস্ত্রপাতীর খবর ঝাড়গ্রাম গিয়ে করবো। এখানে ক’দিন খুব গরম চলছে এবং সেই অল্পপাতে load-shedding বৃশংসভাবে। সুরজিৎ দিল্লী গেছে। ধানিলংকা ভাল আছে। তোমার কস্তারত্বদের খবর অবগত হলাম। অলমিতি—ভালোবাসা নিও—

জ্যোতিরিন্দ্র

জ্যোতিরিন্দ্রের সঙ্গে আমার শেষ দেখা ১৫ই অগস্ট ১৯৭৭ তারিখে। সেদিন শান্তিনিকেতন-পাঠভবনের আমন্ত্রণক্রমে স্বদেশী গানের আসরে সে ছিল

৩০. বনবিহারী ঘোষ ওরকে বুন্দো-বা। শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র শিল্পী ও সংগীতাহুরাণী। দিল্লী IIT-তে অধ্যাপনা করা কালে একদিন তাক্কাহুড়োর গ্রাম সেরে তোয়ালের ওপর ট্রাউজার চাপিয়ে হাউজ খাস-এর বাস ঘরেজিপের বলে শোনা যায়। ‘তোয়ালে বাবা’ নাম জ্যোতিরিন্দ্রের দেওয়া।

প্রধান অতিথি। আগের আমি যেতে পারি নি বলে অস্থগান শেষ হতেই আমার সঙ্গে দেখা করতে চলে এসেছিল। বারান্দায় বসে আমরা বেশ আড্ডা অমিরেছি, এমন সময় গেট-এ এসে দাঁড়াল বিশ্বভারতীর Ambassador। এম্বিক ওমিক ধোঁজ করে, শেষে কার কাছে বেন ধোঁজ পেয়ে ছায়াবীণিতে হাজির। বেশ একটু অনিচ্ছায় জ্যোতিরিন্দ্র দিয়ে উঠল গাড়িতে, বলল, “কাল সিনে পাঠকবনে ক্লাস নিতে হবে, নইলে থেকে যেতাম। পরের বার এসে তোমার কাছে থাকব।”

এবার হিরণকুমার প্রসঙ্গ।

চিহ্নবাবু (চিরোহন সেহানবীশ) চিঠি লিখে জানানলেন, “মাসছে ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৪) হাবলমামার ৭৫ বছর পূর্ণ হবে। আমরা তার আগের দিন অর্থাৎ ২২শে (রবিবার), বিকেল ৫।০টার ৭ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড-এ একটা অস্থগানের আয়োজন করছি। তাতে বক্তৃতা হবেনা, প্রচুর আড্ডা গল্পওষব কিছু গান ও বৎকিঞ্চিৎ মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা থাকবে। একেবারে যদি অসম্ভব না হয় তা হলে আসবেন আশা করি। ভালো লাগবে, অনেক চেনা মাস্থের সঙ্গে দেখা হবে।”

আমার তখন নির্জনবাসের পালা চলছে। আমি অস্থগানে যোগ দিতে পারি নি। চিহ্নবাবুর কাছে একটা পান লিখে পাঠিয়েছিলাম “পরে ভ্রামলবাবুর “ কাছে গুনেছিলাম, জ্যোতিরিন্দ্র রবীন্দ্রনাথের “ওলো শেফালি”

০১.

ও ভাই কুতূহলী

ওলো কুতূহলী

হরেক রকম ঝাড়লে পাবি

হাবলবাবুর বুলি।

বইখাতা আর কাগজ পাবি

খাবার সিনিস যেমন থাকি,

কেক চপ আঁচ সুগনি দাঁদা

কিযো পিঠেগুলি।

পুঁটীরানের কাঁচাশোলা অলুযোগের দই,

চৌধীন আর সানীকাবাব কিনীধানের বই।

সাধ যদি রে আড্ডা দিতে

কোখাব পাবি অমন স্নিতে,

ইডলি দোসার সঙ্গে কফি

হাবলবাবুর বুলি।

০২. ভ্রামলকুকু বোষ।

গানের গুর সংযোজন করে, আমার এ-গান অবলীলার গেয়ে সমবেত শ্রবীজনের মনোরঞ্জন করেছিল।

হিরণকুমারের চিঠি

১৩৮২ সালের নববর্ষে হিরণকুমার আমার চিঠি লিখলেন :

জক

১২০ বি রাধা হুবোথচর ব্লক রোড। কলিকাতা-৫৭। নববর্ষ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

শ্রীতিভাজনেষু, আম নববর্ষে শ্রবণ করছি উমাকে^{১১} ও আপনাকে। আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলি—প্রায় রোজই, সে সব কথা আপনি কি শুনতে পান? শুধু একটি গীত রচনা করেই কি আমাকে অমরত্ব দান করবেন? আমার এই নতুন আত্মনার কি পদ্যরচয়িতা পড়বেনা সত্যি? আমি কিন্তু ও-পথে যেতে চাই না। আমার চান বাংলা দেশের দিকে, সোনার তরী চিহ্না কল্পনা বিশেষ করে কলিকার আর সর্বোপরি হিরণদাবলীর বাংলা দেশ। এ-অঞ্চলের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। কিন্তু বালুকামুগুর উবর বীরভূমে কি তার কিছু পাওয়া যায়?

একটি অমরোথ। ইন্দ্রিকা দেবীর খাতা^{১২} থেকে তুলে দিতে হবে সেই সব ছড়াগুলি—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কুমুদ চৌধুরী বা লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রকৃতির নিমন্ত্রণপত্রের উত্তরে। পারবেন কি? আর একটি বাসনা আছে। আমার সঙ্গে যেতে হবে কুষ্টিয়া, সেখান থেকে হিজলাবট^{১৩}—পৃথিবীর সব চেয়ে মনোরম আরগা। সেখানকার মাঠে ঘাটে গড়াগড়ি দিয়ে কুষ্টিয়া হয়ে বাব শিলাইবা। তারপর নৌকা বাজা—হিরণপত্রের সেই সব নদ নদী দিয়ে। পদ্মা পেরিয়ে শাবনা, তার পর ইচ্ছামতী (অগ্নি তরী, ইচ্ছামতী) হয়ে যমুনা (বিরাট যমুনা), তারপর খালের ধারে শাজাদপুর কুঠিবাড়িতে ছ' রাত কাটাও। তারপর চলন বিল আজাই দিয়ে

১১. উমারায় (১৯১০-৭৫)।

১২. বিজিতলায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে যে পারিবারিক খাতা ছিল, ইন্দ্রিকা দেবী চৌধুরাণী সেটি পাণ্ডিত্যবশতেনের রবীন্দ্রভবনে দান করেন।

১৩. মাতুলানয়।

ছোট নদী নাপর, তারই ধারে পতিসর বা কালীগ্রাম—বেখানে বসে কবি লিখেছিলেন কচ ও দেববানী (আমার দেওয়া পাণ্ডুলিপি রয়েছে আপনাদের সংগ্রহশালার)। পতিসরের কাছারিবাড়ি তেমন কিছু নয়। নৌকোতেই থাকতে হবে। যখন দুর্ধ্রুব তখন দুর্জনে যুব ওপারের মাঠে বেখানে কবি সন্ধান পেয়েছিলেন অপকুপের। ‘একটি সোনার চেলি-পর্য্য বধু অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাখায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে।... যুগযুগান্তর কাল সমস্ত গোল পৃথিবীটী একাকিনী, শুষ্কিত, অশ্রুপূর্ণ রান দৃষ্টিতে, মৌন মুখে, শ্রান্ত পদে প্রদক্ষিণ করে আসছে’... আমার অশান্ত মন অহসরণ করছে এই বধুটিকে, অড়িয়ে আছে তার এলো চুলের পাকে পাকে, I am looped in the loop of her hair। ইতি

হিরণ্যকুমার সাত্তাল

ছুই

১২৪বি রাজা হুবাচন্দ্র মন্দির বোড কলিকাতা। ২৫ এপ্রিল ১৯৭৫

শ্রীতিভাষনেবু,

আপনাকে ও শোভনলালকে** কোটি বার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কুমুদ চৌধুরীর ছটি লাইন বাদ পড়েছে—

‘বাঁচি কি মরি

যদি বাঁচি যেতে পারি’,

এর পরেই হবে

‘এত কহে পারে ধরি

শ্রীকুমুদ চৌধুরী—।’

অন্ত ছড়াটি** কার রচনা তা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি জ্ঞানি নই।

** শোভনলাল ক্ষত্রপাধ্যায়। এর সম্মারতাক্ষে পারিবারিক খাতা থেকে ইঙ্গিত ছড়াগুলি কপি করে পাঠিয়েছিলাম।

৩৫. ছুই মিনি কংরে আমি খরচিত একটি ছড়া পারিবারিক খাতা থেকে উদ্ধৃতি বলে চালাতে চেয়েছিলাম। ছড়াটি এই—

যে কথার স্বত্ব

ভুলেছো চায়ের কাপে,

তাব তোড়ে পড়ি

কেব কোর অভিলাষে।

হিরণ্যজ্ঞ। প্রথম বিশিষ্ট সন্মান পান নি সেই চেলিপরা বহুটি অবশ্যই
আছেন হিরণ্যজ্ঞের শ্রেণিতে। হিরণ্যজ্ঞাবলীর ২৪৬নং পত্রে। কিন্তু পাবনার
পত্রাধারের “শ্রীতলাই” নামে জ্যোতিরিন্দ্রদের বাড়ি আমি অনেকদিন আগে
দেখেছি। তখন ওদের বাবার নামই আনন্দাম। ওরা যদি অল্পে থাকে তো
হামাগুড়ি দিচ্ছে। তখন বাড়িটি বিপন্ন—পদ্মা এগোচ্ছিল। তারপর সবে
গেছে। এখন বাড়িটি হুহু অবস্থায় আছে কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র দ্বিতীয়
স্বায়ের গানে হুহু বেঁধে আসার জমাচ্ছে। সম্প্রতি মেয়েছে ‘স্মৃতি সস্তা
ভবিষ্যৎ’-এর ওপর। ইতি কৃতজ্ঞ—

হিরণ্যকুমার সান্তাল

তিম

124B Raja S. C. Mullick Road

Calcutta-700 047 নববর্ষ ১৩৮৪

প্রীতিভাজনেষু, তা হলে এই কথাই প্রমাণ হচ্ছে আর একটি নববর্ষও
দেখে গেলাম। শান্তিনিকেতনেই বর্ষা নববর্ষোৎসব করেছি—আপনার
আবিস্কারের পূর্বে ও পরে।

আপনি কলকাতার কখনো আসেন কিনা জানি না। এলে যদি হুবিধা হয়
কোন করলে সুখী হব। যদিচ আমাদের নতুন Crossbar কোন প্রায়ই
নিঃসাড় থাকে। নম্বর ৭২৩ ০৬৮। আমাদের হুজনের সজায়ণ জানবেন। ইতি

হিরণ্যকুমার সান্তাল

জ্যোতিরিন্দ্র নেই, হিরণ্যকুমারও নেই—আছে কেবল তাদের সঙ্গ সান্নিধ্যের
আনন্দস্মৃতি। জ্যোতিরিন্দ্র তার একটি চিঠিতে লিখেছিল “তবে আমার

তার চেয়ে ভালো

স্বপ্নের এক পাতার

আব সোনারি

তিম চায়খানা বাড়ির।

গোড় লাগি তাই

হিঙ্গু জিহ্বা আব হুবি

যাবে নাকো চায়

স-বিধি পি চৌধুরী।

‘হিরণ্যকুমার পাঁকা লছরী বলে নেকী মাল ট্রিক করতে পেরেছিলেন।

attitude অবশ্য শুরুসেবের কারণেই অন্নবিত্তের positive, অর্থাৎ মন্বিতে চাহি না আমি হৃদয় জ্বলনে.....।” রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহ প্রেমের, আমাদের জীবনের গভীর বোগ—সেখানে আমরা নিত্যের স্বাধ পাই, অমৃতের পরিচয় পেয়ে থাকি। প্রেমের মধ্যে আনন্দের মধ্যে যে মাহুকে আমরা দেখেছি, তাকে অমৃতের মধ্যে দেখেছি। সমস্ত নীমা অতিক্রম করে তার মধ্যে অসীমকে দেখতে পাই এবং মৃত্যুতেও সে আমাদের কাছে রয়ে না। হৃদয়জনের আনন্দমুখিতে জ্যোতিরিত্র ও হিরণ্যকুমার চিরকাল বেঁচে থাকবেন। মৃত্যোরামৃতং গময়.....

সংবোধন

জ্যোতিরিত্র মৈত্র

‘জিনেকোটা’

এস. আর. দাশ রোড

কলিকাতা-২৬

তপসের ঠিকানায় ক্রীতদীপ রায় জ্যোতিরিত্র মৈত্রকে একটি পোস্টকার্ড পাঠান। পোস্টকার্ডের লেখা পিঠে পাশাপাশি দুই কলামে ১. আর ২ সংখ্যার নীচে ছটি বাউল গান। উক্তোপিঠে এই চার পংক্তি :

কিত্তিকোপার রচনায়

ছটি বাউল গান পাঠালাম

তুমি হুই দিয়ে

প্রাণসংকার করবে বলে।

১৩/৭৫

দ্বি দশেক পরে ক্রীতদীপ রায় মশাই জ্যোতিরিত্র মৈত্রকে একটি এনভেলোপ পাঠান। ঠিকানা একই, শুধু একটি লাল রেখার নীচে 5 S. R. Das Road, Calcutta-26 এই দু-পংক্তি নতুন সংবোধন।

এনভেলোপে ক্রীতদীপ রায় নামাঙ্কিত ছাপা প্যাডে জ্যোতিরিত্র মৈত্রকে লেখা ক্রীতদীপ রায়ের চিঠি এবং পৃথক একটি পাতায় ‘বাউল সপ্তগী’।

দ্বিতীয় সাতের চিঠি

চিঠিটি দীর্ঘ। এখানে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করা হল।

20. 3. 75

KSHITIS ROY

সাই জ্যোতিরিন্দ্র, এবার তুর্ভাগ্যক্রমে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতে যোগ-
যোগ ঘটলনা। তুমি ব্যস্ত ছিলে, আর আরিও চিলেকোঠার আরেকবার
হোঁ দিতে পারলামনা। অগত্যা Port-এর হাসপাতাল থেকে তোমার
পোঃ কার্ড-এ লিখে দুটো পদ পাঠালাম। তুমি সুর দেবে বলেছ—সেই
লোভে, একটা নয় দুটো নয়—একেবারে বাউল সপ্তপদী লিখে পাঠালাম।
কথাগুলো অল্পাধন করলেই বুঝতে পারবে ক্ষিতেশ্বরের মনের অনুভূতি
অবস্থা। তুমি আমার ব্যথার বাধী বলে কোনো লক্ষ্যসংকোচ না রেখে
এসব পাঠিয়ে দিলাম। শুক্ল কৃপা হলে তোমার সুরায়নে এসব পদ কেউ কেউ
হরতো গাইবে।...

ক্ষিতেশ্বরের গান

‘বাউল সপ্তপদী’র সাতটি পদের মাধ্যম লাল চতুর্কোণে ঘেরা অক্ষরে
বিস্তৃত পরসংখ্যা।

পোস্টকার্ডের ১ সংখ্যক গানই ‘বাউল সপ্তপদী’র প্রথম পদ। পোস্টকার্ডের
২ সংখ্যক গান কিন্তু ‘সপ্তপদী’র চতুর্থ পদ। ছ-একটি বানান বা বাক্যচিহ্নের
তফাৎ ছাড়া উভয় পাঠে ভিন্নতা বিশেষ নেই। পংক্তিবিশ্বাসে অবশ্য
যথেষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে।

। পাঠভেদ ।

‘বাউল সপ্তপদী’র প্রথম পদের সপ্তম পংক্তি “কেউ পারে না”,
পোস্টকার্ডের ১ সংখ্যক গানে নবম পংক্তি কিন্তু ছিল “কেউ জানে না”।
‘সপ্তপদী’র প্রথম পদের একাদশ পংক্তির “তুই” শব্দটি পোস্টকার্ডের ১
সংখ্যক গানের পঞ্চদশ পংক্তিতে নেই। ‘সপ্তপদী’র একই পদের নবম
পংক্তির “গোলকর্ষাধার” শব্দটি পোস্টকার্ডের একই গানের একাদশ
পংক্তিতে “গোলকর্ষাধার” ছিল। তাছাড়া, ‘বাউল সপ্তপদী’র এক সংখ্যক
পদের ষাটশ পংক্তিতে আছে “তোয় ছ জন মিলে লয় বিপথে,” পোস্ট-
কার্ডের ১ সংখ্যক গানের ষোড়শ-সপ্তদশ পংক্তিতে ছিল “তোয়ে ছ’ জন

মিলে/লয় বিপথে"। মনে হয় 'সপ্তপদী'তে কপির ভুল আছে এবং শব্দটি "তোয়" নয় "তোরে"ই হবে।

পোস্টকার্ডের ২ সংখ্যক গানের চতুর্থ পংক্তিতে ছিল "দেখার চেয়ে", 'বাউল সপ্তপদী'র চতুর্থ পদের তৃতীয় পংক্তিতে আছে "দেখনা চেয়ে"। পোস্টকার্ডে একই গানের সপ্তম পংক্তিটি ছিল "আত্মা দিল আত্মরামে", 'সপ্তপদী'র চতুর্থ পদের ষষ্ঠ পংক্তিতে "তোরে" শব্দটি যোগ হয়েছে আর "আত্মরাম" হয়েছে "আত্মারাম"। পোস্টকার্ডে ঐ গানেরই শেষ দুটি পংক্তি ছিল "প্রাণানন্দে/দে রে সাড়া", "তুই" সহযোগে তা হয়েছে 'সপ্তপদী'র চতুর্থ পদের শেষ পংক্তি।

বাউল সপ্তপদী

এক

অগম পথের হৃদিশ পেলি কই
তোয় আনাগোনা
গয়ঠিকানা,
তুই আশমানেতে পাড়লি মই।
জ্বরেব ধার সে রাখাখানা
সেধা চলতে ফিরতে
কেউ পারে না
গুরু-সহায় বিনা।

ভবের গোলকধাঁসায় দিশা পেতে
তোয় দিশারী নেই গুরু বই।
তুই চুঁড়লি কত দিনে রেতে
তোয় ছাড়া মিলে লয় বিপথে,
মাঝি বিনে মাঝদরিয়ার
কেমন করে পাষি থই ॥

কিতেধেপাব গুরু ভা'হু
রাইয়ের আবার যেমন কা'হু।
অয় গুরু অয় গুরু বলে
গুরুচরণ শরণ লই ॥

ছাই

তোয় সন্তু সাজা সার
হলো এবার,
অস্মার থলু সংসারে ।
গুজ্জ হলি পত্তি হলি
আবার পিতা হয়ে কী করিলি,
সন্তান তোয় সন্তাপেতে
সংসারে যে থাকতে নাবে ॥

তোয় সতী গেল সাক্ষী গেল
অবশিষ্ট কী রহিল,
তোয় ইতোনষ্ট ততোস্ত্রই
অদৃষ্ট কে বুঝতে পারে ॥

কিতেধেপার কর্মফলে
এ জনম তার ব্যয় বিফলে,
মুখিক সমান ব্যয় বুঝি প্রাণ
পড়তে জ্ঞাতা কলে ।
মেধিসু বেন অদ্ব্যস্তরে
পড়তে হয় না অধ্যস্তরে
গুরুচরণ করে শবণ
এবার যা রে চলে পরপারে ॥

তিন

যে আমার মন জেনেছে
মনের মাছুষ সেজন,
ব্যর্থী যে বুঝতে পারে
কোথায় বুকে বেদন ।

আমি সেই ব্যথার ব্যর্থী
খুঁজে বেড়াই নিতি নিতি,
পীরিত্তির এই তো গীতি
বুঝতে পারে স্বজন ।

দিনে রেতে প্রাণে মনে
 শয়নে কি আগরশে,
 খুঁজি তার হেথার হোথার সবতনে ।
 কোথা সে ঘোঁসর সাধী
 বিহনে বিরহী রাত্তি
 নয়নে জালাই বাতি
 বিছাই বুকে আসন ।

চার

ও মন, কেন রে তুই মনবরা,
 তোর মজাতে মন কী আঘোজন,
 দেখনা চেয়ে অগতজোড়া ।
 বাপের খুশি মায়ের গ্নেহ
 গড়ল বে তোর সাধের দেহ
 তোরে আশ্রা দিল আশ্রারামে
 মন দিল রে মনচোরা ।
 তোর ভাঙাতে খুম উঠল রবি
 রূপে রঙে আঁকল ছবি,
 খুম পেলে তোর নিমেবহার
 আগে চন্দ্র আগে তারা ।
 প্রাণের খুশি ফুলে ফলে
 প্রাণের প্রকাশ অলে ছলে,
 তোর প্রাণে মরণ প্রাণে বাঁচন
 তুই প্রাণানন্দে যে রে লাড়া ।

পাঁচ

ও তোর আসল সত্য নেই জানা
 মাটির দেহ মাটির পিদীম
 সলতে অলে জীবনখানা ।

হুংকারে সে নিবলে পরে
আঁষার নেবে আসবে ঘরে,
বাইরে এসে দেখা দেখি সে
হৃদয়দেবের আনাগোনা।

নেবে যদি ঘরের বাতি
ভাবিল কবে যুচবে রাত্তি।
রবির আলো বিশ্বপ্রাণ
অলছে সে যে অনির্বাপ
যত্নরাত্তি কাটলে পরে
উঠবে অলে কিরণসোনা।

ছয়

সাধের জীবন ভাবলে তুমি
আঁকড়ে ধরে রবে,
আনলিনিকি এ জনমে
মাটিই খাটি ভবে।
মাটি হতেই উঠল যে প্রাণ
মাটি চবেই মাছুষের আন,
বড় সাধের এই ধনমান
ওই মাটিতে মিশবে।

মাটির মাছুষ পথে ঘাটে
পায়ের তলে মাটি কাটে,
মাটি নিয়ে কাটাকাটি
দেখি ভবের হাটে।
হুদিনের এই মাটির খেলা
মাটির বুকে হুদিন খেলা
সাজ হলে হেলাফেলা
ধুলোয় ধুলি হবে।

সাত

ও তোর কান্ন কি মিছে
 কারবারে,
 সবই পেল ছারখারে ।

কী মূলধন লয়ে হাতে
 নেবেছিলি বেবসাতে
 এবেবে ধৈর্য কতের খাতে
 হাবুডুব
 ডুবলি ধারে ॥

কার কাছে কি পাওনা ছিল
 কী দিয়ে তোর কী রহিল,
 খাতক যে হক
 কত নিল
 রামরাবণে তোর মারে ।

পালটে গণেশ চেউলে হলি
 লাল বাতি তোর জেলে বিলি,
 কেমন ছিলি কেমন হলি,
 ভেবে দেখিস বারখারে ।

হিসেব নিকেশ এবার সেয়ে
 বারবকেয়া সকল ছেড়ে
 দেখিস যদি কপাল ফেরে
 আসবি বধন
 ফিরতি বারে ।

বাউল সন্তগদী
 সমাপ্ত

বাউলসহকারী কান্নাগজ ঘেঁটে কিছু দেখা ও চিঠিপত্র পাওয়া গেছে। তাঁর কতক কবিতা
 স্বাক্ষরিত মৈত্র সৌভাগ্যে প্রিন্টিং প্রেসে চিঠি ও পান প্রকাশ করা সম্ভব হল। —সম্পাদক

দুইটি মৃত্যু, কিছু শিক্ষা

মৃণাল সেন

মৃত্যুর সঙ্গে মানুষ চিরকালই লড়াই করে এসেছে। মৃত্যুকে সহজে মেনে নেওয়ার পাত্র নয় মানুষ। কিন্তু, আশ্চর্য, এ-যুগের দুই লড়াই মানুষ বারো বারো লড়াইয়ে খেটে-খাওয়া মানুষের সামিল হয়ে থেকেছেন সারা জীবন, বারো সংগ্রামী চেতনা ছড়িয়ে রয়েছে তাঁদের সামগ্রিক শিল্পকর্মে— তাঁদেরই কবিতায়, গানে, নাটকে এবং তাঁদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায়, সেই দুজনেই কেমন এক ধরনের অবিশ্বাস্ত আপন-এর মধ্য দিয়ে রাজ কিছুদিনের ছাড়াছাড়িতে শেষ হয়ে গেলেন। একজন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আর-একজন বিজন ভট্টাচার্য।

আপসই বলব।

বাঙালির বাইরে মেয়ের সঙ্গে দেখা করে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কলকাতায় কিরছিলেন, দুঃপালার ট্রেনে করে আসছিলেন। পাড়ি এসে দাঁড়াল হাওড়া স্টেশনে, সারবন্দী কুলীরা হুড়মুড় করে উঠে পড়ল এ-কামরায় ও-কামরায়, রাজীরা সবাই একে একে নেমে পড়লেন প্ল্যাটফর্মে, নামলেন না একজন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। কেউ জানল না কখন যুঁহিয়ে যুঁহিয়েই মৃত্যু ঘটে গেছে তাঁর। নিঃশব্দে, বিনা প্রতিবাদে, বিনা প্রতিরোধে।

আর বিজন ভট্টাচার্য?

আগের দিন রাতে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে ‘মরাচাঁদ’ নাটক করলেন। শেষ দৃশ্যে হত্যাশার অঙ্ককার খাঁষ থেকে হঠাৎ, হঠাৎই, লাফিয়ে উঠলেন, চিংকার করে উঠে বললেন: “শচীনবাবু, আমি বাঁচবো!!!” গান গেয়ে উঠলেন বিজন ভট্টাচার্য, মঞ্চের সবাই তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন, হয়তো বা মঞ্চের বাইরের অনেকেও:

বাঁচবো বাঁচবো

আমরা বাঁচবো রে, বাঁচবো

ভাঙা বুকের পাতার দ্বিধে

নয়া বাংলা গড়বো।

চল্লিশ দশকের ভয়ংকর ছুঁদিনে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী গান।

তারপর বাড়ি ফিরলেন বিজ্ঞান ভট্টাচার্য, পদ্মগুজব করলেন, ষাণ্ডবাদাওয়া করলেন, স্বতাবল্লভ হৈ চৈঃ চলল ষানিককণ। পরের দিন ভোরবেলায় উঠলেন, কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করলেন, সামান্য একটু অস্থিরতা। একটু পরেই মৃত্যু। কেউ জানার আগেই।

এই বিজ্ঞান ভট্টাচার্যই কয়েকদিন আগে তাঁরই শিল্পজীবনের সহকর্মী জ্যোতিষিঞ্জ মৈত্রেয় স্বতিসভায় মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। চিংকার করে বলেছিলেনঃ মৃত্যু আমাদের সকলেরই আসবে জানি। কিন্তু আমরা লড়ব, চ্যালেঞ্জ জানাব। সহজে আমরা মৃত্যুকে ছাড়ব না। অথচ কত সহজেই না এঁরা মৃত্যুকে রাস্তা ছেড়ে দিলেন। হুজনেই।

ছুটো মৃত্যুই ভয়ংকর রকমের আকস্মিক, চমকে দেওয়ার মতো, বিহ্বল করে দেওয়ার মতো। ছুটো মৃত্যুই এমনভাবে ঘটল যা সবাইকেই অবশ করে দিল ছুই প্রচণ্ড অসন্তর্ক মুহূর্তে।

সবাইকেই।

তাই মুহূর্তের মধ্যেই সমস্তরকম রাজনৈতিক দলগুলির উপরে উঠে সবাই ছুটে এলেন ছুই দৃতবেগের পাশে। এবং পরে হুজনেরই স্বতিসভায়। চল্লিশ দশকের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলির কথা তখন উপস্থিত সকলেরই মুখে মুখে ফিরছিল।

সে এক বীভৎস ইতিহাস। সারা ছুনিম্নায় তখন চলছে ফাসিস্ট তান্ত্রিক। আর চলছে সেই অসভ্য উন্নয়নের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী সাহসের জীবনপন লড়াই। লড়াই ইরোরোপে, আফ্রিকায়, এশিয়ার প্রাচ্য ভূখণ্ডে।

সরাসরিভাবে যুদ্ধ আমাদের দেশে পৌছতে পারে নি। কিন্তু বা এসেছিল তা হল যুদ্ধ-জনিত এক কর্ণ চাপ। এই চাপ এসেছিল আমাদের তদানীন্তন যেত প্রজন্মের তরক থেকে, তাঁদেরই একান্ত অল্পপত কালো সহাজনের মারফত। বাঙালার পকাশের মনস্তর সেই অসহ্য দিনগুলিরই এক দুঃসহ দলিল। শাসকের তৈরি সেই ভয়ংকর আকালের মধ্যেই সেদিন

অন্ন নিয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান' এবং বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'অবানবন্দী' ও 'নবান্ন'।

আকালে অসংখ্য মাহুকের মৃত্যু ঘটল, পকাশ লাহেরও বেশি, কিন্তু বেঁচে রইল 'নবজীবনের গান', 'অবানবন্দী', 'নবান্ন'। এবং আরো অনেক কিছুয় সঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সেই গান বে-গান মৃত্যুর আগের দিনও প্রতিফলিত হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের পলায়।

ভাবতেও শিহরণ অসম্ভব করি সমস্ত শরীরে, সমস্ত অস্তিত্বে।

বুকের তোলপাড় আর ছতিকের হাহাকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচগান নাটকের মধ্য দিয়ে বাঁরা সেদিন সাধারণ মাহুকের কথা বলতে পেরেছিলেন তীব্রভাবে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের সপক্ষে বাঁরা দুর্জয় ফতোয়া জারি করেছিলেন সেদিন এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন—তাঁদেরই হৃদয় প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও বিজন ভট্টাচার্য। যেমন ভুলবার না সেদিনের কথা, তেমনি ভুলবার না এঁদেরও কথা। এবং এঁদেরই সৃষ্টিধর্মী কয়েকজন সহযোগীর কথা ও সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য অল্পসামান্যের কথা। সাহস, নিষ্ঠা, মতামর্ষ ও শিল্পবোধের এক অসামান্য সমন্বয়ে সেদিন এঁরা চমকে দিয়েছিলেন দেশের সমস্ত মাহুকে। শিল্পরাজ্যে এ-হেন "অল্পপ্রবেশে" বাঁদের ভয় পাওয়ার কথা তাঁরা বধ্যারীতি ভয়ও পেরেছিলেন। কিন্তু এঁদের দাবিয়ে রাখা যায় নি সেদিন। এঁরা সেদিন "ভাঙা বুকের পাজরে" নতুন ইস্‌থেটিক্‌স্-এর অন্ন দিতে পেরেছিলেন। এই নতুন ইস্‌থেটিক্‌স্-এর প্রবক্তাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের নাম ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরকালীন হয়ে থাকবে।

এমনি করেই এঁরা দেশের রাজনীতি ও ইতিহাসকে, তৎকালীন সর্বাঙ্গের দুঃসহ অবস্থাকে, সাধারণ মাহুকের গুরুত্ব বক্তব্যকে সরাসরি টেনে এনেছিলেন নাচে গানে নাটকে। এমনি করেই চলল ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

১৯৪৭-এর আগে ও পরে : দুইয়ের মধ্যে আকাশ-অবিন ফারাক। ৪৭-এর আগে জানা ছিল কার বিরুদ্ধে লড়াতে হবে, জোট বাঁধতে হবে কিসের ভিত্তিতে। ৪৭-এর পরে গোটা চেহারাটাই অটল হয়ে উঠল, তর্ক উঠল, সহনশীলতা কমতে শুরু করল। অটলতা, তর্ক, অধৈর্য্যনা বেড়েই চলল উত্তরোত্তর, বাড়ল দেশের রাজনীতিতে, দেশের অর্থনীতিতে, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিব্যবহায়ে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও।

কলে, সমস্ত জোটে যেমন ফাটল ধরল তেমনি ফাটল ধরল সংস্কৃতি-

কর্মীদের মধ্যেও। কিকিদ্দমিক বিকল্পতাও দেখা দিল। একদল তেড়ে নানা দল হল। বা কিছু ঘটায় আর সবটাই ঘটল ইতিহাসের আভাবিক নিয়মেই।

তখন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র একা। বিজ্ঞান ভট্টাচার্যও। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র পাড়ি দিলেন দিল্লীতে জীপুজকম্পানি, আধা-সরকারী সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিলেন। আর বিজ্ঞান ভট্টাচার্য আরো পাঁচজনকে মতো কিছু অহুগামীদের নিয়ে দল গড়লেন।

দিল্লীর দপ্তরী সমাজে ‘নৃধ্বংসীর গলি’-র কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে কেউ চিনল না, নিজের মধ্যে শুটিয়ে-বাওয়া লুকিয়ে-ধাকা মাহুকের মতো গুমরে মরলেন। তবু প্রাণের তাসিখে বোগাযোগ রাখলেন কলকাতার সঙ্গে। সাড়াও পেলেন। একবার সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে, তিন-তিনবার বঙ্গবন্ধু বটকের কাছ থেকে।

আর বিজ্ঞান ভট্টাচার্য কলকাতার মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন, নাটক লিখলেন, গান বাঁধলেন, সমস্ত রকম পার্শ্ব অবাচ্ছন্দ্যর মুখে ছাই দিয়ে এগিয়ে এলেন পাণ্ডুরূপের সামনে। চুটিয়ে নাটক করলেন মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও।

এবং একদিন, কখন আবার নিজের ঘরেই ফিরে এলেন, কলকাতাতেই, টেনের কামরার ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মারা গেলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। বিজ্ঞান ভট্টাচার্য মারা গেলেন নিজেরই ঘরে; বিড়র বইপত্র আর পাণ্ডুলিপির ভিড়ে, পুজ পুজবধু ও মাতৃসমা বুঝা রাধুনী হিরণ আর পোষা পাখিটার চোখের সামনে।

ছুটে। স্মৃতিগভীরেই নানাকথার ফাঁকে নানা আরোজনের মাঝে মধ্যে ধরা গলায় অনেককেই বলতে শুনেছি : আবার কি আমরা সেই রকম হতে পারি না যখন আমরা সবাই এক ছিলাম ?

এই উক্তির মধ্যে অনেক খেদ ছিল, কিন্তু প্রত্যয়ও ছিল অনেকখানি।

আমি বলব, এবং অনেকেই বলবেন : আজকের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কি আমরা সেই প্রত্যয়টুকুকেই আঁকড়ে ধরতে পারি না ?

“তবু মনে রেখো”

প্রশান্তি দে

১৯৩২ সাল, নভেম্বরের শেষ। এম. এ. ফিক্‌স্‌ ইয়ার ক্লাস। আমাদের একজন প্রফেসর যিনি ক্লাসিক্যাল নাটক পড়াতেন—খুব দিল-দরিয়া লোক, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একান্তভাবে মিশতেন, দূর ব্যবধান মানতেন না—তাকে সকলে গিয়ে ধরল—“ভার, একদিন একটা social হোক, অনেক পড়াশোনা হয়েছে।” তখন এম-এ ক্লাস ঠিক জুলাই মাসেই শুরু হত, আর পরীক্ষাও ভরা-বাহলের মধ্যে ঠিক জুলাই-অগাস্ট মাসেই হত। আমাদের প্রফেসরটিও যাকে বলে “মাই-ডিম্মার” লোক, তাই যেমনি অনুরোধ করা হল, তেমনি উনি খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেলেন। আমরা তখন—আমার বন্ধু হুদা আর আমি, মজা দেখবার জন্য বিকেলে আমার আন্ততঃ্য বিল্ডিং গেলুম। দেখি গিয়ে—এলাহি ব্যাপার। অনেক কিছুই হচ্ছে। ক্লাসের বেক অন্তভাবে সারে সারে লাকানো হয়েছে,—প্রফেসরের “ডেয়স” (days) ও চেয়ার টেবিল কোণার স্থান পেয়েছে। আমাদের তখনকে সামনের বেকে বসতে দেখা হল। আবৃত্তি, বাচ্চাদের নাচ-গান ইত্যাদি মজার। আমার পাশেই হাইব্রেকের উপর একটা হায়মোনিয়ম রাখা ছিল। হঠাৎ, আমার পাশে একজন এসে বসে আমার কানে কিসকিসিয়ে বললেন (কিন্তু সেটা এমন করে বলা হল, আমার মনে হল, ‘হল’ শুধু সকলেই সে কথাগুলি শুনেতে পেয়েছে।)—“ভীষণ নার্ভাস লাগছে।” প্রকাণ্ড বড় চোখ, মুহূ হাসি—আমি একটু অবাকই হয়েছিলুম—একদম চিনি না—এই রকম জোর কিসকিসে আন্তরিক কনফিডেনশিয়াল কথা। কে এই ভক্তলোক? মজার তো। তিনি কিন্তু অনেকগুলি গান বেমালায় পেয়ে গেলেন, দারুণ গলা, আর বেশ কালোরাতি কাঁরাও আছে গলাতে। মনে আছে, খুব হাততালি

পড়েছিল। স্থলতাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কেরে আনিস? স্থলতা বি. এ. স্কটিশ থেকে পড়েছিল, সে কলেজ ছাড়াও অনেককেই চিনত। ও বলল—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। তাই নাশটা মাত্র তখন আনলুম। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু কিছু সেন্ট জেভিয়ার্সের-এর ছাত্র, বি-এসসি অনার্স সহ পাস করে, স্পেশাল ইংলিশ পরীক্ষা দিয়ে, ইংরিজিতে এম, এ পড়তে এসেছেন।

ওরা সকলে মিলে একটা দল “ব্যাক বেঞ্চার” ছিলেন—আমার স্বামী, পরিতোষ চ্যাটার্জি (ভালো ফুটবল খেলতেন—অল্প বয়সেই মারা যান। তুনেছি জ্যোতিরিন্দ্র বাবুরও শব্দ ছিলো ফুটবলে “শাইন” করার, কলেজে খুব খেলতেন), বরেন রায় (প্রেসিডেন্সি কলেজের সে বছরের “বেস্ট বয়”), সৌরীন দত্ত (স্বধীনবাবুর ছোট ভাই), কিতীশ রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—আরো কারা দলে ছিলেন আমি জানিনা,—এই ক-জনকে পরে বেশ ভালো করে তুনেছি। আমার বিয়ের পর জ্যোতিরিন্দ্রবাবু প্রায়ই আসতেন,—এবং বোধহয় তখন কবিতা লেখাও শুরু করেছেন। আমার একটা মজার কথোপকথন মনে আছে। জ্যোতিরিন্দ্র—আনেন, আপনার মতো আমিও একটু আধটু পদ্য লিখি। মাঝে মাঝে পায়খানাতে খুব ভালো লাইন মাথায় আসে। ওখানে কাগজ পেনসিল রেখে দিয়েছি, তাড়াতাড়ি শৌচ করে, উঠে এসে লাইন কটা লিখে ফেলি।

তিনি বললেন—ও রকমটা না করাই ভালো। মাথায় রেখে দেবেন, পরে লিখে ফেলবেন।

জ্যো.—তুলে বে বাই।

বি—বাক্ গে, ও কটা লাইনের অস্ত্র মায়া করবেন না। বীরে হচ্ছে কবিতা লেখাই ভালো।

মাসখানেক বেকত সহজ সরল, এবং আমরা যাকে বলি “পাঙ্গুলা”—এজগতের বেন লোক নয়—সেটা তখনই বুঝেছিলুম। খুব হেসেছিলুম সকলে, স্বভাবতই। এবং বহুক্ষণ হয়ে গেল সহজেই। তখন অনেক কবিতা লিখতেন, কিছু ‘পরিচয়ে’ ছাপাও হয়েছিল। অনেক বই রিভিউ করতেন। আমার মনে আছে, বুক কোম্পানি থেকে উনি একটা মোটা বই কিনে আনলেন Lady Murasaki's Tale of Genji। সেটা জ্যোতিরিন্দ্রবাবুকে দেওয়া হল রিভিউ করতে। খুব অল্প সময়েই রিভিউটা করে এনে দিলেন। আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিলুম—এতো মোটা বই পড়ে ফেললেন এত তাড়াতাড়ি? আমাদের নিচু গলায় বললেন—একঘেয়ে বই, খানিকটা পড়েই

বুঝে গেছি, উন্টে পাণ্টে, মাঝে মাঝে পড়েছি। রিভিউ করা সহজই—
series of anecdotes।

আমাদের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল। প্রায়ই ছপুয়ে আসতেন, বিকেল পৰ্ব্বত থেকে চলে যেতেন। চকলবাবুও আসতেন—নিবিড়ভাবে বাজনা শোনা হত। বই পড়া, তর্কাতর্কিও হত। তারপর ক-দিন আসেন না। একদিন সুধীনবাবু ঠেকে বললেন—আপনার বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র, মজার লোক। মিউজিকমের বেঞ্চে শুয়ে শুমোচ্ছেন বেশি ছপুর বেলা। শুনেছি, বটুবাবুর এক মাসির বাড়িও ছপুয়ে মাঝে মাঝে যেতেন। তিনিই একদিন ঠর মাঝে বললেন—তোমরা সব বলো, বটু অসামাজিক লোক, খুব মিত্রক তো। প্রায়ই ছপুয়ে আসে, গল্প কবে, পান করে।—ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল। বটুকবাবুকে ঠর বাবা articulated করেছিলেন এক অ্যাকাউন্ট্যান্টের অফিসে—বটুবাবু এমনভাবে অফিস পালাতেন! অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া হলনা। শুনেছি, সেই উত্তরলোকটির অফিসে গিয়েও তাঁর নিজের ঘরে দিবানিরাটি সারা হত—তিনি আপত্তি করার অত্যাচার খুঁজে বার করতে হয়েছিল। বিনি আর্টিস্ট—মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পৰ্ব্বত, তিনি শত বি.এসসি কেমিস্ট্রি অনার্স সহ পাশ করলেই বা কি, অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছে articulated হলেই বা কি, জোর করে কি মোড় ঘোরান যায়? শুনেছি, ঠর কবিতার বই ছাপাবার জন্য বটুবাবুর ভাইয়েরা কেউ ঠর বাবার কাছে কথাটা পেশ করেন—তাতে ঠর বাবা ডেকে ঠকে প্রশ্ন করেন—“তুমি কি ঠিক জানো, তোমার কবিতা ‘কবিতা’ হয়েছে?” বিনীত জ্যোতিরিন্দ্র মাথা নিচু করে, মাড় চুলকিয়ে, বলেছিলেন, “আজ্ঞে, তা তো বলতে পারি না।” এ গল্পটা বটুবাবু আমাদের কাছে নিয়েই করেছিলেন।—“কি করে বলি? বল তাই।”

১৯৩৭এ মে মাসে আমরা পুরী বাই। তখন আমার স্বামী রিপন কলেজে কাজ করেন। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, রিপনের প্রিন্সিপ্যাল, আমাদের প্রফেসর, তাঁর একমাত্র ছেলে বেত্তকে নিয়ে ইনস্পেকশন বাংলাতে গিয়েছিলেন। চকলবাবু, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু, রথীবাবু, সমরবাবু সকলে সম্ভবত সি-ভিউ হোটেলে ছিলেন। স্নানের সময় তো বটেই, বাকি সময়েও সকাল বিকেল খুব আড্ডা ও বেড়ানো হত। রবিবাবু আমাদের সকলকে দুটো ট্যাক্সি করে কোনারকে নিয়ে গিয়েছিলেন—ওখানে গিয়ে, মন্দির দেখার পর, বিচুড়ি রান্না করে খাওয়া হয়েছিল। তখনকার কোনারক অনেক

হন্দর ছিল। অনেক বেশি মূল্য অক্ষত ছিল। বেউলটাও অনেক বেশি আটুট ছিল। ডাঃ হরেন দাশগুপ্তও তখন ইনস্পেকশন বাংলাতে ছিলেন—তিনি আমাদের আগের দিন কোনারক গিয়েছিলেন। জ্যোতিষ্মিবাবু আগে পুরী থেকে চলে আসেন। আমার স্বামী ঠুন্দের বাড়ি গ্লো করে দিয়ে একদিন ঠুন্দের ট্রেন ফেল করিয়ে দিয়েছিলেন। পরে চকলবাবুকেও আটকে রাখবার চেষ্টা করেন একইভাবে, চকলবাবু দৌড়ে গিয়ে চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়েন। বটুবাবুর খিনিসপত্রের ঠিক থাকত না নিশ্চয়ই, তখন থেকেই। কারণ আমি দেখেছিলুম ঠুন্দের তোয়ালেতে বাংলা হরকে “বটু” লেগাইয়ে লেখা—নিশ্চয় ঠুন্দের মায়ের করা, তখন ঠুন্দের বিয়ে হয়নি বোধহয়। খুব আনন্দে সে দিনগুলি কেটেছিল।

মধ্যে বটুবাবু বধে চলে গিয়েছিলেন। ফিরলেন ১২৪২এ। তখন কমলা পার্লস ফুল নিয়ে আমি উঠে পড়ে লেগে গেছি—ফুলটাকে বে করেই হোক দাঁড় করাতে হবে। ১২৪২এ ফুলটা বদ্ধ করে দিয়েছিলেন গভর্নমেন্ট। অনেক চেষ্টা করে খোলা হল। আমরা তখনকার শিক্ষারিডীরা সকলে মিলে কি পরিচয় করেছি তখন ফুলটার অভ্য, তাঁরাই, এবং আমাদের ছাত্রীরা ও ছাত্রীদের অভিভাবকেরাই আনেন। ১২৪৮এ আমাদের ছাত্রীরা ‘শব্দকলা’ নৃত্যনাট্য মঞ্চ করে। নৃত্য নির্দেশনা দেন শ্রীঅতীনলাল ও শ্রীশশিকর। এবং জানদানন্দিনী দেবীর ‘সাত হাই চম্পা’-র অভিনয় হয়। আন্তোভোব কলেজের হলে হয়েছিল। ডাঃ কার্টিজ অভিনয় দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। তখন বলেছিলেন এর পরে ছাত্রীরা বা করবে গভর্নমেন্ট হাউসের বাগানে হবে। উনি ব্যবস্থা করে দেবেন। এবং এই অর্থ সংগ্রহ করে একটা বিল্ডিং ফাণ্ড শুরু করা হবে। ফুলের নিজের বাড়ি চাই।

আমার স্বামী অনেকবার আমাকে বলেছিলেন—মেয়েদের দিয়ে ‘চণ্ডালিকা’ করাতে। ১২৪২-র প্রাইভেট সময়, দোলপূর্ণিমার পরের দিন, আমরা চণ্ডালিকার প্রথম দৃষ্টা গভর্নমেন্ট হাউসে করি। জ্যোতিষ্মিবাবু বধে থেকে এসে কমলা ফুলের অন্তর্গত শব্দ মিজ কীর্তন শিকালয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষার ভার নিয়েছেন। কাজেই, ঠুন্দের সাহায্য আমরা পেলুম পুরো মাত্রায়। সে এক অপূর্ব পরিবেশে চণ্ডালিকার প্রথম দৃষ্ট অভিনীত হয়। বড় বড় গাছে কোকিল ডাকছে, “আজি পূর্ণিমা রাতে আগিছে চন্দ্রমা”—পানের ও নাচের সঙ্গে, স্টেজের পিছন দিকে প্রকাণ্ড দোলের চাঁদ

উঠেছিল—মনে আছে। “মাটি তোমের ডাক দিয়েছে”—গানটার আগে মাঝল বাক্সিয়ে বসেবাবু—“আ...আঃ” একটা সাঁওতালী টান দিতেন, ছোট-মেয়েরা হাত তালি দিতে দিতে সাধারণ গ্রাহকোমর শাড়ি পরেন, স্টেজে দৌড়ে ঢুকে এলো। আমরা জ্যোতিরিন্দ্রবাবু নির্দেশে সাঁওতাল পরগনার একটা দূরের হাট থেকে একটা সাঁওতালী মাঝল নিয়ে বাই। অনাদিপ্রসাদ (চট্টোপাধ্যায়) তখন উদয়শঙ্করের আলমোড়া লেটার থেকে চলে এসেছেন—জ্যোতিরিন্দ্রবাবুদের পাশের বাড়ি—এস. আর. দাশ রোডে থাকেন। উনি নৃত্যপরিকল্পনা করেন অপূর্ব! এবং সব সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর সহ-বোগিতায়। তখন জ্যোতিরিন্দ্রবাবু আই পি-টি-এর অভিজ্ঞতা অর্জন করে কলকাতায় এসেছেন—শান্তি বর্ধনের সঙ্গে কাজ করেছেন। শান্তি বর্ধনকে উনি প্রশংসা করতেন, ভালবাসতেন—নৃত্যপরিকল্পনায় ও পরিপ্রসঙ্গে অসাধারণ বলে—বারবার আমাদের আনিয়েছেন। সেজ্ঞাই আমি সাহস করে এত বড় চ্যালেঞ্জ নিতে পেরেছিলুম—সঙ্গে আছেন জানতুম বিষ্ণু দে ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। পরে, ‘চিহ্নাঙ্গনা’ ও অন্ত নৃত্য পরিকল্পনায় আমরা পেরেছিলুম শ্রীমতী শ্রীশ্রী (ঘোষ) ব্যানার্জিকে। তিনিও উদয়শঙ্করের দলের। পরে শ্রীপ্রহ্লাদ দাসও একবার আমাদের ‘বসন্ত’ নৃত্য পরিকল্পনায় দায়িত্ব নেন।

ডঃ কাটজরু আমাদের চণ্ডালিকার প্রথম দৃষ্টের প্রচেষ্টায় খুব খুশি হয়েছিলেন, এবং স্টেজের উপর একধিকে চণ্ডালিকা-প্রকৃতির অভিনয় বে করেছিল—শ্রীমতী অলকা সেনকে নিয়ে, এবং অন্তরিকে চণ্ডালিকার মা মায়া—বাসবী রায়কে নিয়ে, দাঁড়িয়ে বলে দিলেন চণ্ডালিকার একটা দৃষ্ট ক্ষেত্রে উনি তৃপ্তি পেলেন না। সমস্ত নৃত্যনাট্যটাই উনি দেখতে চান, আমাদের ছাত্রীদের দিয়ে করা! প্রচণ্ড দায়িত্ব! এবং সঙ্গে সঙ্গে বাধা। স্কুলেব কতৃপক্ষের পছন্দ নয়, মায়া নৃত্য ইত্যাদি। জ্যোতিরিন্দ্রবাবুকে ডেকে আমরা শিক্ষয়িত্রী বয়েকজন, ধারা এই সবেদ গভীর দায়িত্ব বুঝতেন, বিশেষ করে আমার বন্ধু, যিনি অপূর্ব গানও করেন, এবং ধীর উপর অনেকটা বেশি দায়িত্ব বর্তাবে বুঝেছিলুম, শ্রীমতী সবিতা বাগচী (ইনি জ্যোতিরিন্দ্র-বাবুরও আত্মীয় বৃহৎদের একজন)—আমরা গভীরভাবে চিন্তা করলুম—কি করা যায়? এরকম অচর্যোপ এগেছে ডঃ কাটজরু কাছ থেকে, কি করে আমরা তা উপেক্ষা করব? অনাদিবাবুকেও ডাকা হল। মায়া নৃত্য অপেক্ষা সন্মত করতে হবে। বাধা আছে তবুও—চণ্ডালিকা তো নৃত্যনাট্য। অলকা খুব ভালো নাচতে পারত, কিন্তু তখন ওর দশম শ্রেণী, পরীক্ষার

বছর। লেখাপড়ায় ও খুব ভালো। তাই আমরা খুব চিন্তা করে ঠিক করলাম—অলকার পরীক্ষার পর আমরা চণ্ডালিকা করব। ১২৫০-এর রাষ্ট্রী বন্ধনের দিনে আমরা সমস্ত চণ্ডালিকা ভঃ কাটছুকে দেখাতে পারলাম। অলকা মায়ার অভিনয় করল, অনাদিবাবু অপূর্ব মারানুত্যা অনেকটা কথাকলি, ধানিক দেশী নাচের চঙে কম্পোজ করলেন। মাধবী তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী—প্রকৃতির নৃত্য করল—অনেকটা ভারতনাট্যমের মাধ্যমে। গ্রিহাসীলে ধাকা—স্বরলিপি থেকে গান তোলা, গানের মাধ্যম থেকে নৃত্য পরিকল্পনায় ফেলা—সে যে কি কঠিন চিন্তা ও পরিশ্রমের ব্যাপার এবং তারপর কি ক্ষে আনন্দ, তা যে না দেখেছে সে সম্যক বুঝতে পারবে কিনা জানি না। এক একটা আয়গায়—বেশন “ভুবু একটি পঙ্খ অল”—সে আয়গার অভিনয় ও নৃত্য, এবং তারপর—“কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি পরম মুক্তি”—সারা স্টেজ ছুড়ে সেই আনন্দের প্রকাশ। ‘চণ্ডালিকা’ রবীন্দ্রনাথের একটা সেরা সৃষ্টি—কথায় ও স্বরে, কি আশ্চর্য সংযোজনা। এবং প্রতি ক্ষেত্রে, শিক্ষক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—ছাত্রীদেয় এবং সমবেত সকলকে, অনাদিপ্রসাদকে নৃত্যের পরিকল্পনার সাহায্য হিসাবে বুঝিয়ে দিতেন, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে। আমাদের ২য় ও ৩য় দৃষ্ট সম্পূর্ণ তুলতে অনেক সময় লেগেছিল, কিন্তু ধৈর্যচ্যুতি কার্যকর হয়নি। একবার আমাদের বন্ধু ক্রীতীশ দায়কে আমাদের গ্রিহাশীল দেখতে বলেছিলুম। উনি একটা সংশোধন করে দিলেন, মনে আছে। “রাজবাড়ীতে বাজে ঘণ্টা”—জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর ভাবার আমরা “হারোয়ানের ফুলের ঢং ঢং”, “gong” ঘণ্টা বাজাছিলুম,—রাজবাড়ির বড় হোলানো ঘণ্টার কথা তাই ‘রাষ্ট্রী’ তুমি মনে করিয়ে দিলে। অনাদিবাবুকে প্রতি পদক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের কথা ও স্বরের মানে বুঝিয়ে দিতেন উনি, বলতেন—“অনাদি, এখানে এই কথা এবং এই স্বরের মানে হচ্ছে—এই।” এরকম শিক্ষকতার আনন্দ ও অসীম ধৈর্য আমি আগে কখনও দেখিনি। আমার মনে পড়ছে—আমাদের সঙ্গে লগত বিনি করতেন—শৈলেন দে—ঘরে ঢুকে চারিদিকে উপর-নীচে চেয়ে বিস্ফারিত চোখে, মুখে একটু হাসি নিয়ে বলেছিলেন—“ঘরটা স্বরে স্বরে ভরে গেছে।” অনাদিবাবু ভালো নাচ না তুলতে পারলে ধমক দিতেন, তখন খেয়তের মুখটা অপ্রস্তুত লজ্জার নার্তাস হাসিতে মুখটা এমন করণ হয়ে উঠত, আরো সুন্দর দেখাত। সেই ঝাঁক ভীত সুন্দর মুখের হাসি নিয়ে নিউ এম.শ. আরের স্টেজে বধন আমাদের চুড়িওয়ালী ঢুকলো, একটা অফ্ট শুভন শোনা গেল—

“বাঃ!”

চণ্ডালিকার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হল একটি খুব সহজ গান দিয়ে—“বর্ষ বর্ষে সমুজ্জল”। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু অনাদিবাবুকে পাশে বসিয়ে গানটা শোনালেন। তারপর বললেন,—খুব সহজ সরল অল্প ভক্তি দিয়ে পুজারিগীরা ধালা নিয়ে যাচ্ছে—এই হবে নাচটা। গানটা শেষ করতেন লয়-টা টেনে রেখে দলের শেষের মেয়েটির নাচের ভক্তিটা খুব সুন্দর—উইংস থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে বাবার পর ধরতে দিতেন পরের গানটি, যেন প্রকৃতি, চিন্তা করে, এগিয়ে এসে একটা পড়া ফুল কুড়িয়ে নিয়ে গুনগুন করে গান আরম্ভ করে—“ফুল বলে।” ছোটখাটো কাজ—দারুণ বোঝাপড়া জ্যোতিরিন্দ্রবাবু ও অনাদিবাবুর মধ্যে, আশ্চর্য শিক্ষা। তারপর আসে মা-মেয়ের কথোপকথন। সেখানে কথকতার মত উড়ে যেমন গান, তেমন নাচ। ছোট দৃষ্টান্ত এখনও আমার কত যে মনে আছে। যেমন “দ্বিজের বংশে”—সুধু একটা মূক্সা দিয়ে পৈতেটা বুঝিয়ে দেওয়া বা “নয়ন তোমার নীচু করো”—এমন সামান্য মুভমেন্ট—চোখটা উপরে তুলে নামিয়ে দেওয়া। অনাদিবাবু এই minimum কাজে excel করেন—একেই খুব লিরিকাল হয়, নাচ গানকে অহুসরণ করে। একটা অপূর্ব গান “চকে আমার তৃষ্ণা” মনোটিনি বা নৃত্যের একঘেয়েমি ভাঙবার জন্য বলা হল—“বে ফুল কানন করতো আলো” দেখানে anti-clockwise বা দিক থেকে ডান দিকে ঘুরে নাচতে হবে। বার বার অহুসরণ করে ওটা টিক করা হল। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কীর্তি (প্রায় Shakespearean বললেই হয়) এই পতীর আত্মনাথের দুঃখের দৃষ্টে রাজবাড়ির অহুচরের প্রবেশ! “সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গেল”—যেমন কাটা কাটা গলায় গান গাওয়া তেমনি নাচ, (নাচটা প্রায় জ্যোতিরিন্দ্রবাবু অনাদিবাবুকে নেচে দেখিয়েই ছিলেন—হাঁটু ভেঙে ভেঙে।)—“সেই নিদারুণ শোক”—গলায় ঠগ-কারার শোক—“ঘুম নেই তার চোখে”—হায় হায় ভাব নাচে। তারপর তেড়ে এসে আঙুল দেখিয়ে মায়ার দিকে ধাওয়া “ও চারপের বৌ।”—তেমনি গলায়ও গাওয়া—এ এক অপূর্ব সন্মিলন—টেনশন করেকটি পংক্তিতে করেক মুহূর্তের জন্য ভেঙে তোলা! দ্বিতীয় দৃষ্টটাই সব থেকে লম্বা—সেটাকে কবিতার এ ভাবে ভাগ করে হাফা করে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে যে মেয়েটি এই পাঁচটা করত তার মেক-আপের কথা জিজ্ঞাস্য—তখন ছোট ছিল—মনে করিয়ে দিল। মেয়েটির পালে একটি তিল ছিল। রানীর পেয়াদার মেক-আপটাও খুব অদ্ভুত, কিন্তু তিলটাকে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু নাকি বড় করে এঁকে দিতেন, তাতে সমস্ত চেহারাটা আরো মজার দেখাত। তারপর, আবার

আরম্ভ চল—মা-মেরের কথোপকথন—“মহা জানিস তুই, মহা দিয়ে দে তাকে তুই এনে”—আরেক পর্বার সমস্ত অভিনয়টা উঠে গেল। মা তার শেষ অঙ্গ—তার স্বায়মন্ত্র—প্রয়োগ করবে ঠিক করছে, “পাপের পথে পাসীরসী” চলতে তৈরি হচ্ছে—“তোমারে করিব অসম্মান—তবু প্রশাম, তবু প্রশাম, তবু প্রশাম।” প্রকৃতি বলছে—“আমার ঘোষী করো……” অনাদিবাবু উৎসাহের বোঁকে নাচগান এক সঙ্গে করছেন—“তুমি উচ্চ, আমি নীচ”। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু খুব নম্র, বিনীত স্বরে বাধা দিলেন—“অনাদি, তুমি নাচটা দেখাও, আমি গানটা করি। গানের কলিটা—তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ, ধরব তোমার ফাঁদে আমার অপরাধে……”।

চণ্ডালিকার তৃতীয় দৃশ্যটির মনটা যে কোন উচ্চতর লোকে নিয়ে যায়—কঠিন ত বটে, স্থূল লয়ে, নাট্যবোধে—কলে নৃত্য পরিকল্পনার বিরাট সজ্জাবান। প্রথম দৃশ্যের সহজ পতি থেকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কোথায় যে তুলে দেন—গান শুনলে, এবং নাচ দেখলে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। প্রকৃতির মানসিক টানাপোড়েন, একবার “মামি দেখব না, দেখব না তোমার সর্পণ”, তারপরেই বিপরীতে “না, না, না—পড় মহা তুই, পড় তোমার মহা……” এখানে গানের ও নাচের লয়ে নাটকীয় টেনশন দেখাতে হবে, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু সেটা সহজেই সম্যক বুঝেছিলেন এবং অনাদিবাবুকেও সেটা পুরোমাত্রা বোঝাতে পেরেছিলেন। মায়ানৃত্য থেকে আরম্ভ করে “শেষ নাগ মহা” পর্যন্ত একটা ধারা, যেখানে প্রকৃতির আর্তি—“স্বপার্ত প্রেম তার নাই দহা, তার নাই ভয়, নাই লজ্জা” আমাদের আগিয়ে তোলে—তারপর—মাকে নাড়া দিয়ে—“দুর্বল হোসনে হোসনে। এইবার পড় তোমার শেষ নাগ মহা। নাগ পাশ, বন্ধন মহা।” তারপরেই প্রচণ্ড আবেগের ঝড়ের গান, টেনশনের মুহূর্ত—জ্যোতিরিন্দ্রবাবু দরাজ গলার টেমপো তুলে দিতেন—এখনও গায় কাঁটা দেয় ওই গানটার কথা ভাবতেই—“জাগেনি, এখনো জাগেনি / রসাতল বাসিনী নাগিনী।” সমস্ত গানটার এমন একটা জোর আছে, ছন্দো পুঙ্খালি গলার জোর না থাকলে গানটার স্পষ্ট স্বরূপ প্রকাশ পায় না—এবং জ্যোতিরিন্দ্রবাবু লক্ষণ গাইতেন। আমরা পবেও কতবার বাড়িতে শুনতে চেয়েছি এবং গেয়েছেনও। অনেক সময়ে, শরীর ভালো না থাকলে, বলতেন ও গানটা আজ গাইতে পারব না। চণ্ডালিকার রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব গানের পরস্পরা (juxtaposition) সাজিয়েছেন dramatic interpretation এর maximum effect দেবার ভঙ্গ। তাই ওই গানের টেনশনের পরই

আসছে চিমে লয়ে “ঘুমের ঘন গহন হতে”—অপূর্ব স্থাপনা। একবার একজন আমেরিকান কবি Karl Shapiro এসেছিলেন—তিনি সময় পেলে শুধুত্রেস রিহার্সাল দেখতে আসতেন। একজন ঠাণ্ডা কাছে (apologetically) মন্তব্য করেন—“আপনার নিশ্চয় এ সব magic আর superstition অদ্ভুত absurd লাগছে।” কবি তৎক্ষণাৎ উত্তর করেন—“তাহলে তো আমরা Hamlet Macbeth কিছুই দেখতে পারব না, বা অনেক অপেরাই—অনেক কিছুতেই magic তো আছে।”—এই violent drama-র সব শেষে এসে বাচ্ছে অপূর্ব শান্তি—“প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমার।”

পরে চড়া পর্দায়—“জয় হোক তোমার জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক। কমা করো।” গভীর গলায় আনন্দ (জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর গলা) গাইত তিনবার: “কল্যাণ হোক তব কল্যাণী!” জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বলেছিলেন—আনন্দ আশীর্বাদ করে প্রথমে প্রকৃতিকে, তারপর তার মা মাথাকে, শেষে বৌদ্ধ ভিক্ষুক আনন্দের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমবেত সকলকে আশীর্বাদী দিয়ে গেলেন, তাঁর এই অপূর্ব কীর্তির শেষে। শেষে আবার বৌদ্ধ মন্ত্র—মনটাকে পবিত্রতার চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে যায়। গ্রীক নাটকের ক্যাথারসিস রবীন্দ্রনাথ এনে দেন গানের কথায় ও সুরে—জ্যোতিরিন্দ্রবাবু সেটা তাঁর গলার সুরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে রূপ দিতেন। (Pure eunciation) এ কিছুক্ষণ শুভ হয়ে থাকতে হয় এরকম অভিনয় দেখলে, কিছু পরে নিজের অস্থিষে কেঁরা যায়। বীরা শুনেছেন, তাঁরা ভানেন, জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর গলায় কনচৌল ছিল অসাধারণ; নিজের “নবজীবনের গানে” নানা গলায় গাইতেন—কাছে, দূরে, মেয়েলি গলা, পুরুষালি, ধানিকটা যেন ventriloquist এর কারসাজি গানের গলায় আনতে পারতেন। যেমন বিজনবাবু ‘ব্রহ্মবুজ আশার রাতে’—কি ভাঙা গলায় ফিসফিসিয়ে কুতুড়ে আবহাওয়া সৃষ্টি কবতেন!

আমাদের রিহার্সাল হত এপ্রিলের শেষ থেকে জুন, জুলাই অবধি—বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, ছুটির দিনে ছপুয়ে আরম্ভ। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু না এলে আমাদের বন্ধু ও সহকর্মী শ্রীমতী সবিতা বাগচী (জ্যোতিরিন্দ্রবাবুরও সম্পর্কে কাকীমা!) রিহার্সাল শুরু করে দিতেন, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এসে পড়তেন। মনেই পড়ছে না উনি না বলে আসেন নি—খবর দিতেন। নিজেকে রিকশ কবেও এসেছেন। অনাধিবাবু আরো “ক্যাপা” লোক, ঠেকে লোক পাঠিয়ে আনাতে হত। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু ঠেকে খুব সামলাতে পারতেন। “চণ্ডালিকা”র নৃত্যপরিদর্শনা এমন হৃদয় হয়েছিল, আমরা অনেকবার

অনেক জায়গায় করবার জন্ত আমন্ত্রণ পেয়েছি। মহাকাতি সদনের অভিজ্ঞতা মনে থাকবে—সালটা মনে নেই। একজন আর্টিস্ট আমাদের সঙ্গে করবেন বলে নিজেই এসেছিলেন। রিহার্সালও দিয়েছিলেন—গানের সঙ্গে নাচের। শেষ দিনে তিনি করতে পারলেন না। তার আগের বিকেলে আমরা জানতে পারলুম। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু অবিচলিত ভাবে অহুতান করে তোলেন, সবিতা মা-মেয়ের ছুজনেরই গান করে গেলেন—অতগুলি গান করা, কি পরিশ্রম—হুম রাধা দায় একজনের পক্ষে। আগে জানতে পারলে আমাদের ছাত্রীদের কারকে দিয়ে তৈরি করা যেতো—সে সময় পাইনি আমরা। তবু ছেয়ে বাইনি। সেবার কাবেরী বসু (পরে চট্টোপাধ্যায়) আমাদের ছাত্রীদের সঙ্গে করেছিল—মায়ার অভিনয় ও নাচ। বিজ্ঞান কংগ্রেসে (১৯৫২-৫৩—টিক কোন সাল মনে নেই)—প্রেসিডেন্সি কলেজে ডঃ জে. সি. সেনগুপ্ত তখন প্রিন্সিপাল, ১০,০০০ লোকের সামনে আমাদের চণ্ডালিকা পরিবেশন করা হয়। একবার রাইক ক্লেস করেছিল,—কিছুক্ষণ পর আমরা জানতে পারি—সমস্ত ২২ দৃষ্ট আবার করা হয়। হাইলে সেলাসির জন্ত নিউ এম্পায়ারেণ্ড করা হয়। তখন জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বোকারো চলে গেছেন। ১৯৫৬ চৌ-এন-লাই এর জন্ত রাজসভানে করা হয়, তখন যেরকম বিশ্বাস গান করেন।

১৯৫১ সালে ডঃ কার্টজুর আমন্ত্রণে আবার রাজসভানে আমরা ‘বলন্তোৎসব’ করি—নৃত্য পরিকল্পনা শ্রীপ্রহ্লাদ দাস। জ্যোতিরিন্দ্রবাবুই গানের শিক্ষা, রাজার পাঠ পড়েন রথীন মৈত্র। বাকি সব পাঠ জ্যোতিরিন্দ্রবাবু ও আমাদের সহকর্মীরা ও ছাত্রীরাই। নির্দেশনা ও শিক্ষা—জ্যোতিবিন্দ্রবাবুই। ‘বলন্ত’ নাটক বাছা হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর ইচ্ছায়—‘ছোট ছোট ছাত্রীদের দিয়ে নৃত্য-শ্রীতাভিনয় করা বাকি।’ স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাবে—খুব জম্বর হয়েছিল। ছোটরা যা করে তাই তো জম্বর হয়ে যায়।

‘চিজাদা’ অভিনয়ের সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর খেয়াল হল—উনি সজ্ঞত করবেন। সজ্ঞাতে মন নেই। সবিতা খুব চিন্তিত। অনেকগুলি তবলা নিয়ে অর্জুনের সখাদের সমবেত নৃত্যের সঙ্গে তবলা লহরা নিয়ে মেতে গেলেন। যত ক্ষুদ্র তবলা চলে তত ক্ষুদ্র অর্জুনও তার সখাদের নৃত্যের পতি বাড়াতে হয়—গুয়াও হার যানবে না, উনিও থামবেন না—শেষে অনেক সময়ে আমাকে এই কঠিন প্রতিবোধিতা বন্ধ করতে হত।

কিন্তু অভিনয়ের দিন তবলা লহরী ও অর্জুন ও সখায়েদর নৃত্য বহু প্রশংসা ও বাহবা পেয়েছিল দর্শকদের কাছে। ‘চিদ্ভাঙ্গনা’র শেষে বৈশিক মন্ত্র ছিল—এসবে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর দায়িত্ব উৎসাহ ছিল। ভালো সংস্কৃত জানতেন, উচ্চারণও খুব স্পষ্ট ও সুন্দর—গভীর স্বরে গান করতেন আবৃত্তি করতেন, আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন। ফলে ‘চণ্ডালিকা’র মতো ‘চিদ্ভাঙ্গনা’ও গভীর ভাবে শেষ হত। আমরা চিদ্ভাঙ্গনা সুরূপা কুরূপা আলাদা করি নি, পোশাক ও মেক-আপে আলাদা করা হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলুম মনে দুঃখ হতে পারে—একজনকে “কুরূপা” বলা আরেকজন হবে “সুরূপা”। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু, সবিতা ও আমাদের অল্প বয়স্ক সহকর্মীরা এই ঠিক করেছিল। মণিপুরী নানা রঙের হাফা ঘাঘরাও ফুলের টিচার ও মেয়েরা মিলে তৈরি করেছিলেন।

এরপরে অনেকগুলি ছোট নাচ-গান কম্পোজ করা হয়েছিল, যেমন “এই তো ভালো লেগেছিলো”—১০-৮০ জন মেয়েকে নিয়ে। সেটা একবার স্পোর্টস-গ্রাইন্ডের সময়ে হয়েছিল, পরে ১৫ই অগস্ট শ্রীমদ্রবিন্দু দিবসে ময়দানেও মেয়েরা করে। এই নৃত্যটি অনাদিবাবুর পরিকল্পনা। আরেক বছরের প্রাইম-স্পোর্টসে—“ওগো কিশোর আজি”তে—১০-১০ জন মেয়েকে নিয়ে, শ্রীমতী দীপ্তি ঘোষের (ব্যানার্জি) নির্দেশনায়। সি-এল-টি-তে ছোটরা “কাবাড়ি-কাবাড়ি” নাচের পরিকল্পনা করেন শ্রীমণি-শঙ্কর—গানে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু, সবিতা ও ছোট মেয়েরা। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু ‘পাহাড় নদী মাছবের গান’ও একবার সি-এল-টি-তে পরিবেশিত হয়, পরে কাকর কাকর অহুরোধে সেটা আবার বেশদ্রিয় পার্কে দেখানো হয়। সি-এল-টি-তে একবার সুরেলা recitative করে ৩৫ জন ছোট মেয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের “দিনের আলো নিভে এলো” করা হয়,—জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর নির্দেশনায় ও অরুণাঙ্গী,—বিশিষ্টকরের নৃত্য পরিকল্পনা।

‘চিদ্ভাঙ্গনা’র পর আমরা কি করব ভাবছিলুম। ‘কাল যুগয়া’ মনে করেছিলুম একবার বা ‘বান্ধিকি-প্রতিভা’ কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর বেশি উৎসাহ ছিল না। উনি বলেছিলেন—“আমরা বেশি সিঁহন দিকে ফিরে যাব না।” তাই খুব চিন্তিত ছিলাম, কি করা যায়। এমন সময়ে শান্তি বর্ধনের ট্রুপ নিয়ে ও’র জী কলকাতার এলেন। ‘রামায়ণ’—অপূর্ব নাচের পরিকল্পনা, আর কি পোশাক! মেখে খুব আশা ও আনন্দ হল। নিউ এপ্পায়ায়ে বসেই ঠিক করে ফেললুম ‘ডাসের বেশ’—পাপেট ড্যান্সের

মতো নাচ ও চটের ওপর রং করে পোষাক তৈরি করা হবে। পরদিন সকালেই জ্যোতিরিন্দ্রবাবু আমাদের বাড়িতে এলেন। আমি শুঁকে আমার প্লানের কথা বললুম—খুব খুশি। শান্তি বর্ধনের জো উনি খুব ভক্ত ছিলেন। তখন ‘তাসের দেশ’ বই আনা হল—খানিকটা পড়লেন—বইটা বাড়ি নিয়ে গেলেন, ছপ্তরে ফুলে গিয়ে পড়া হবে। অনাদিবাবুকে উনিই খবর দেবেন।

তিন-তলায় আমাদের রিহার্সাল ঘর—তৃতীয় শ্রেণী তিনটের সময়ে ছুটি হয়ে যেত, তারপর বেক দেয়ালের দিকে সরিয়ে আমাদের নাচগান হত। আমি আগেই বলে রেখেছিলুম সকলকে—সবিতা তো ভয়েই অস্থির—“কি কঠিন, প্রপত্তিদি!” তবু বখন জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এসে গেলেন, ও সবটা পড়া শোনালেন—সে কি দারুণ পড়া—নাটকটা জীবন্ত হয়ে উঠল পড়ার রপড়ে, কথা বলার ও এক্সপ্রেশনের অভিনয়ে। কে কি করবে আমরা তখন ঠিক করে ফেললুম। তারপর নাচের স্টাইলটা হবে পাশেট ধরনের—কি রকম হবে অনাদিবাবুকে বোঝালেন। “সাধারণ নাচ নয় হে, অনাদি, কাঠ-কাঠ নাচ দিতে হবে। মেয়েদের ড্রিল করাও।” অনাদিবাবু চুপ করে বসে। “কি হে অনাদি, ওঠো—মেয়েরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে যে!” অনাদিবাবু নিশ্চল। আরো দু তিনবার বললেন—আমিও খোঁচা দিলুম—“উঠুন, সময় বয়ে যাচ্ছে যে।” তখন ছুন, আমরা অগস্ট-সেক্টরের মধ্যে করব ঠিক করেছিলুম। অনাদিবাবু নড়েন না। হঠাৎ দেখি, হারমোনিয়মটা লাক দিয়ে ডিঙিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু—ওঠ-বোস, ডাইনে-বীয়ে, সামনে-পিছনে, মেয়েদের দেখাতে আরম্ভ করেছেন, মেয়েটা হো-হো করে হেসে—কিন্তু ঠর সজে ড্রিল-নাচ করতে লাগল! অনাদিবাবুর inertia ভেঙে গেল, inspired হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিয়ে নিলেন। সেদিন আমরা সকলে বা আনন্দ পেয়েছিলুম, বা হেসেছিলুম, ভুলবার নয়।

দারুণ রসিক লোক ছিলেন, সকলেই জানেন। এই রকম একবার কোন হল নিউ এম্পায়ারে একটা নাচ-গানের ডায়ালগিট প্রোগ্রাম করেছিলেন, সেটার প্রোগ্রামে বেশি লেখা—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। খুব কৌতুহল হল বটুবাবু শুধু গান করবেন, না, এদের সকলের মতো নাচ-গান? আশ্চর্য হবার কিছুই নেই—আই-সি-টি-এর দলে শিব-ভূগায় নাচের কথা মনে পড়ে গেল, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বিনয়বাবুর গানের সঙ্গে বাংলা দেশের নাচ—“রবি হায় হায়, ঠৈল-বিনা বাতি বুঝি নিভা যায়।” বা মনে হয়েছিল

ঠিক তাই, গলায় লম্বা ঝাঁজ করা চাদর বুলিয়ে মঞ্চে বেকলেন, কথকতা স্টাইলে, পান, এবং স্টেজ ঘুরে ঘুরে নাচ—পানটার বুয়াটা ‘বিঙে ফুল কাঁড় কাঁড়’। বর্ণা মজুমদার লাল ডুরে শাড়ি পরে নেচেছিল—“রাধা-রাধীর মান হয়েছে।” হাসতে হাসতে আমাদের সব দর্শকদের চোখ বেয়ে জল পড়িয়ে ছিল।

‘তাসের দেশ’—সমস্ত অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর শেখানো নৃত্যপরিকল্পনা অনাধিপ্রসাদের। সমস্ত কথোপকথন, উচ্চারণ, বরভঙ্গি, ছক্কাপড়ার, রাজার কথা, তাসদেশ প্রদীপের সম্পাদকের গলায় অর, কথা বলার ঢং—চলা, বলা, দাঁড়ানো, সমস্ত গুর শেখানো। এই কয়েক বছর একসঙ্গে কাজ করেছি, ইন্টারপ্রিটেশনে একবার আমাদের মতামত হয়—সেটা ‘তাসের দেশ’র শেষ দৃশ্য—কইতনের চরিত্র নিয়ে। সেখানে সফ্যার রিহাসাল স্থগিত রেখে আমরা আমাদের বাড়িতে আসি—আমার বামীর কাছে ছোটো মত পেশ করা হয়। উনি আমাদের বুঝিয়ে দেন—চরিত্রটা তো develop করে গেছে (বা আমারও মনে হয়েছিল)—সব ঠিক হয়ে যায়। তাসের দেশের পোষাক চটের উপর রং দিয়ে শালু লাহিড়ী করেছিলো, মেয়েদের সাহায্যে—বতবার করা হয়েছে ততবার ‘হাউস ফুল’ গেছে। এই নৃত্যনাট্য করে ফুলের ছাত্রীরা যে ফুলের নতুন বাড়ির অস্ত্র কত টাকা তুলে দিয়েছে তার হিসাব আমি করতে পারিনি। আমার সহকর্মীরা এবং তারা প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন, মহা উৎসাহে, ফুলটা যেন একটা লিম্বুনির মতো বনুবন বন্ধারে বাজত—কত রকমের কাজ হতো নীচের তলা থেকে উপর পর্যন্ত—সকলে ঠিক করে যাচ্ছে, ঠিক যেমন সব কটা বয়স একটা সিমফনিতে ঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় লয়ে বেজে ওঠে—তবেই না অগুরু সঙ্গীত শোনা যায়। এর মধ্যে টিকিটও বিক্রি হয়েছে, পরিষ্কার হিসাবও রাখা হয়েছে। কালেক্টরের অফিসে প্রমোদকর রেহাইয়ের জন্য আমার কখনও কোনো অনুরোধ হয়নি। বরং আমি আলাদা একটা ছোট ঘরে বসে যখন অপেক্ষা করেছি, অফিসাররা বলাবলি করেছেন : কমলা ফুলের অভিনয় দেখেছেন? গুরা চরিত্র বাছেন যেন মেয়েদের চেহারার সঙ্গে চরিত্রের মিল দেখে—এমন অভিনয়ও করে ছোট ছোট ছাত্রীগুলি—আশ্চর্য লাগে, প্রেশনালদের বাড়ি।—এই প্রশংসা অবশিষ্ট বেশির ভাগের অংশ ছাত্রীদেরই প্রাপ্য। অনেকটা জ্যোতিরিন্দ্রবাবু ও অনাধিবাবু, শ্রীমতী সবিতা বাগচী, এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীদেরও প্রাপ্য। সবাই একজোট হয়ে কাজ করতে গেরেছিলুম বলেই আমাদের

সাক্ষ্য। কমলা জুলা ১৯৫৫-র ডিসেম্বরে নতুন বাড়িতে উঠে বার—তখনও একটা গান ও নাচ অনেক ছাত্রী মিলে হয়েছিল—“ও তোর আনন্দ ওই এলো ঘারে”—সমবেত কর্ণে, নৃত্যপরিকল্পনা অনাদিগ্রন্থাদ। এর সঙ্গে সংযুক্ত মন্ত্রণাও শিখিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রবাবু।

এ সব কাজের অন্ত জ্যোতিরিন্দ্রবাবু, অনাদিবাবুদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত অবশ্যই, কিন্তু যে পরিমাণ জ্ঞান বিভা বুদ্ধি অভিজ্ঞতা তাঁরা চেলে দিতেন—তার মূল্য কখনও অর্থ দিয়ে বিচার করা যায় না। এবং যে বিন্দু শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আমি তখন কাজ করতে পেরেছি—প্রচুর দারিদ্র আমার উপরই বর্তাত—সে অন্ত আমি এখনও কৃতজ্ঞ বোধ করি—এ রকম পরিবেশ না হলে এরকম বা কোনো রকমেরই কাজ করা যেত না, কখনই।

১৯৫৬ সালে জ্যোতিরিন্দ্র বাবুকে কলকাতা ছেড়ে বোকারো চলে যেতে হয়। সে বছরই আমরা ‘শাপমোচন’ করি, দেবব্রত বিশ্বাস গান শেখান ও করেন,—অপূর্ব সে গান পাওয়া হয়—অনাদিবাবুর নৃত্য পরিকল্পনা। এখন আমাদের রিহার্সাল হচ্ছিল, ছোট একটা অস্থবিধা দেখা দিল। “অহম্মদের পরম বেদনা জহ্মদের আহ্বান”—এই অংশের বয়লিপি পাওয়া বাচ্ছিল না। কি করা যাবে—ওটা কি, বাক্য বলে recitative—তেমন রাখা হবে? কথাগুলির মধ্যে স্তর বেন অন্তর্নিহিত আছে, বুঝতে পারছি! হঠাৎ, সেই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বোকারো থেকে এলেন। আমি আমাদের অস্থবিধার কথা বলাতেই তত্ক্ষণ সেই অংশটুকু গেয়ে শোনালেন—কথকতা—আমি সেটুকু টেপ করে রেখেছিলুম, এবং সেই স্তরেই দেবব্রতবাবু গেয়েছিলেন। টেপটা আমি এখন কমলা জুলা ছেড়ে আসি, অনেক রেকর্ড বই ও অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সেটাও জুড়ে ফেলে আসি।

আমি এত বিভারিতভাবে কমলা জুলের অভিজ্ঞতার কথা লিখলুম, কারণ ৭ বছরের বেশি আমরা তাঁর সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করেছি। আই-পি-টি-এ-তে উনি কাজ করেছিলেন। কিন্তু সে সময়ের কাজের কথা কেউ কি জানেন, বা লিখবেন? বিনয়বাবুও তো নেই! আমরা যে সুযোগ সুবিধা সাহায্য পেয়েছিলুম জ্যোতিরিন্দ্রবাবুকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে তার কিঞ্চিৎ নমুনা হিসেবে আমি লিখলুম। আমার সব কথা, এত বছর পর, স্মরণে নেই, সে কথাও ঠিক। আর, আমি শুধিয়ে লিখতে পারছি না, বিচলিত হয়ে বাই। আমাদের অন্ত অহুতানেও জ্যোতিরিন্দ্রবাবুকে আমরা পেয়েছি—গান করেছেন, আবৃত্তি করেছেন, শিখিয়ে দিয়েছেন ছাত্রীদের।

উদাহরণ স্বরূপ মনে পড়ছে—খ্রীষ্টান কমলা বহু বার নামে ফুলটা—তার সত্যদিনে—জুলাইয়ের শেষে—আমরা প্রতি বছর একটা গভীর অহুঠান করতুম—গান কবিতা রচনা পাঠ দিয়ে। একবার মনে আছে—সে বছরই ২৬ অক্টোবর তার বি, এল, মিজ মারা গেলেন—সেই বছরের জুলাইয়ের অহুঠানে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু গেয়েছিলেন—“ক্লান্তি আমার কমা করো, প্রভু।” আমার চোখের জল আমি রুখতে পারি নি, লেডী মিজের হু-চোখ বেয়ে যেখেছি ধারা বয়েছে, আমার বন্ধুদেরও দেখেছি, অনেকেরই একই অবস্থা। এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে পড়ে যাচ্ছে আমার স্বামীর একটা কবিতা—“এই আমার ক্লান্তি কি পাবে কমা?” “দেশ” পত্রিকায় বেরিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু কবিতাটি দেখেন স্বামীবাবুর বাড়িতে, এবং তৎক্ষণাত্ তাতে স্তর আরোপ করেন। পরে, আমাদের তুলিয়েছিলেন। এবং ১৯৭৫ এ ক্যালকাটা ফুল অব্‌ রিউজিক হলে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুকে বে সন্মর্না দেওয়া হয়, সেখানেও গেয়েছিলেন।

এমন উদাসীন অমায়িক লোক তো কমই দেখেছি, মনে হয়! মাঝে মাঝে, যখন কলকাতায় ছিলেন, আমাকে এসে বলতেন—“অনুক দিন কটি মাংস খাব”—বা অন্ত কিছু। একদিন এ রকম বললেন—আমি কলাইফুল্লা বাড়ি, বুধবার ফিরে এসে খাব। অনেকদিনই এ রকম বলতেন, কিন্তু আসতেন না। সব কিছুর বতো এ কথাও ভুলে যেতেন। সেদিন তাই আমি জেরা করে বললুম—“আসবেন তো ঠিক?” “নিশ্চয়ই”, হেসে বললেন। কিন্তু এলেন না। আমার স্বামী তখনই বলেছিলেন—আসবে না, দেখো। পরের বুধবার এসে হাজির—“কই, আমার মাংস কই?” আমি বললুম—“গত বুধবার রেঁধে রেখেছিলুম, এতদিনে পচে গেছে।” তাতে কি হার মানবার পাত্র? “বুধবার তো বলেছি, কোনো বিশেষ বুধবার তো বলিনি।” আমি ক্লেপে গিয়ে বলেছিলুম, “আবদার দেখো—আমি প্রতি বুধবার মাংস রেঁধে বসে থাকব, ঠুঁর ইচ্ছা হলে বা মনে পড়লে এসে খাবেন। বেশ, বাস্কা।” তাড়াতাড়ি কথা স্মরণে বললেন, “জানো তো, সবাই ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফালা হয়ে যেয়ো? আমি ফালা হয়ে ঢুকে ছুঁচ হয়ে যেতলুম।” কোথায় গিয়েছিলে বল ড। টেশনের নামটা কি?—আমার স্বামী বিজ্ঞাসা করলেন। অনেকক্ষণ জ্যোতিরিন্দ্রবাবু মাথা চুলকে বললেন—“আর্চর্ড।” কতোবার এলুম গেলুম। Kaolin mines আছে কিছুতেই টেশনের নামটা মনে পড়ছে না।”

ওখানে ঠিক বাবা কিছু টাকা ইনভেস্ট করেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রাব্যুতর ভ্রত, যদি কিছু কাজ হয়। অল্প পার্টনাররা শুঁকে ঠিকিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এই রকমই খেরালী উদাসীন। কিছু, গান বা কবিতার বিষয়ে কখনও দেখি নি উদাসীন হতে। একবার, মনে পড়ছে, কমলা ফুলের কোনো একটা খুব সফল অফটারের পর, শ্রীযুক্তা সীতা চৌধুরী আমাদের, ছাত্রীদের এবং জ্যোতিরিন্দ্রাব্যুতরকে বিকেলে নিমন্ত্রণ করেছেন। ছাত্রীরা অনেক গান করল। তারপর, আর কিছু মনে পড়ছে না, সকলে চুপ। আমি বললাম, “জ্যোতিরিন্দ্রাব্যুতর আপনার একটা গান করুন না।” কিন্তু কেটে— “কি যে বলেন!” পাশের ঘরে শ্রীচীন চৌধুরী মহাশয় বসেছিলেন। উনি বললেন— “করুন না।” আমি বললাম— “নবমীরবনের গান বা কবিতার গান।” রাজি হলেন না, বড় বলে। শেষে আমার অনুরোধে “এসো মুক্ত করো” গাইলেন। শ্রীচীনবাবু ওঘর থেকে উঠে এসে বললেন— “একটা গানের মতো গান বটে।”

১৯৫৭-এ আমি বাঘবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কন্টিনজেন্ট-ইন-চার্জ (Contingent-in-charge) হয়ে ইয়ুথ সেক্টরিয়ালে দিল্লী বাই। তখন জ্যোতিরিন্দ্রাব্যুতর দিল্লীতে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটা বাড়িতে থাকেন, রিজের (Ridge) এর কাছে। অল্প অনেক কিছুর মধ্যে আমাদের একটা নাটক অভিনীত হবে—স্টেজ সাঙ্গার অল্প কতগুলো জিনিস প্রয়োজন—একটা বই-এর শেলফ, কিছু বই, একটা বন্দুক, একটা বন্দকের ছবি দেওয়া একটা ক্যালেন্ডার—আরো কিছু জিনিস। আর ছাত্র-ছাত্রীদের গলা ঠিক রাখবার জন্য একটা বেশী ওষুধ “কাং” জ্যোতিরিন্দ্রাব্যুতর জী উমিলা—তৈরি করে দিয়ে আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রাব্যুতর বাড়ির কাছেই তখন শ্রীমদ চৌধুরী ও শ্রীমদীপকুমার সান্তাল থাকতেন—কাজেই সব জিনিসপত্র সহজেই জোগাড় হয়ে গেল। এবং বাঘবপুর নাটকে প্রথম স্থান অধিকার করল। আমি প্রায়ই জ্যোতিরিন্দ্রাব্যুতর বাড়িতে গিয়ে স্থান করে, বাছের ঝোলমাত ঘেঁষে দারুণ তৃপ্তি পেতুম, কেটারারদের বেশি মশলা রান রান আমার সইত না। রিজের (Ridge) কাছে জ্যোতিরিন্দ্রাব্যুতর পাখির ডাক নকল (mimic) করতেন, পাখিগুলি আবার জবাব দিত। আমার চোখ খারাপ, আমি সব সময়ে পাখি দেখতে পেতুম না, কিন্তু উত্তরের ডাকটা ঠিক শোনা যেতো। নিজের বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রাব্যুতর বলেছিলেন—“Words-

worth-এর কবিতাটা মনে আছে—The Idiot Boy (Prelude-এ)—
বে আত্মলের কাক দিয়ে পাখির ডাক নকল করত, আর পাখিরা অবাক
মিত ? I am that Idiot Boy !”

১৯৭৬-এর ১লা আকুয়ারি রিথিয়া শৌছেছিলেন। তখন তাঁর ছোট
মেয়ে জুহিতা (মিতু) আমাদের কাছে, ওর ফুলের শেব পরীকার পর,
ছুটি কাটাচ্ছে। তার আগে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু জার্মানি গিয়েছিলেন।
ওরা ঝোপানে ওকে একটা খুব সুন্দর বাঁশি দিয়েছিলেন—সুন্দর দেখতে,
দারুণ কারুকার, সব স্পটগুলি দেখায়। হঠাৎ বিকেলের দিকে আমরা
তিনি একটা মিষ্টি বাঁশির আওয়াজ। মিতু তখন বলে উঠল—‘বাবা।
ওর একটা ও রকম বাঁশি আছে।’ ঠিকই দেখি, রিক্শ চড়ে হাসতে
হাসতে হাবির। আগেও অনেকবার রিথিয়ার আমাদের কাছে গেছেন—
হঠাৎ আশ্চর্য করে দিতে। একবার আমরা চানন্ নদীর (চন্দ্রনানদী,
গঙ্গার গিয়ে পড়ে, রিথিয়া থেকে ৬-৭ মাইল দূরে, অপরূপ শিকনিক
করার আয়গা) ধারে শিকনিকে বাছি—জ্যোতিরিন্দ্রবাবু আমাদের ছেলে-
মেয়ের সঙ্গে ‘নাক বরাবর’ অকলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে
একটা গরুর গাড়ি। আমাদের শিকনিকের খাচ্ছব্য, হাঁড়িফুড়ি ও
ইরাকে (আমাদের বড় মেয়ে) নিয়ে বাচ্ছিল, আমরা সকলে হেঁটে সঙ্গে
বাচ্ছিলুম। সেবার শ্রীমতী বদুয়া ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কিরণ বদুয়া, আমাদের
তখনকার রিথিয়াবাসী অল্প বয়সী আমাদের সঙ্গে শিকনিকে বাচ্ছিলেন।
অকল থেকে মাঝে মাঝে রাত্তার বেরিয়ে হঠাৎ ছাতা খুলে গরুর স্তর
দেখিয়ে গলারন—সে কি স্মৃতি শিল্পর মতে, বটুকবাবুর। আবার
‘নাক বরাবর’ অকলে অভর্জন। চানন নদীতে স্নান, খিচুড়ি খাওয়া, তারপর
চোখে কামাল ঢাকা দিয়ে নিদ্রা—তা না হলে বজাটা হল কি ? খুব আনন্দ
হয়েছিল। প্রায়ই দূতের দিকে ডাকিরে বলতেন (ফরাসী জানতেন
কিছুটা)—le notation de terrain। একবার, সন্ধ্যার সময়ে প্রায়
পাগল হয়ে গেলেন—নস্ত্রি হুরিয়ে গেছে। অনেক রাত্রেও, আমাদের
ছেলের সঙ্গে, অনেক দূরে, বজুর বাড়ি গিয়ে নস্ত্রি পেয়ে বস্তি।

১৯৭৬ সালের রিথিয়া ষাণ্মাটা খুব মূল্যবান হয়েছিল। আমাদের
নাতনীরা তখন ‘সহজপাঠ’ ২য় ভাগ, পড়ত। বাইরের ঘরে হারমোনিয়ম
একটা জোপাড় করে রাখা ছিল। ‘সহজ পাঠ’র পৃষ্ঠা খুলে ‘সেহিন ভোরে
দেখি উঠে’ কবিতাটিতে জ্বর দিয়ে কেললেন। মিতু আর নাতনীরাও

চটপট্ট শিখে ফেলল। পরে, আরেকদিন, আরেকটা কবিতায় স্তর দেওয়া হচ্ছিল—‘ঐমার আসিছে ঘাটে’—আর এয়া সকলে হলো ‘ঐমার পার্টি’। তাই, যখন ‘কালান্তর’-এ আমরা খবরটা পেলুম, অভিযানে কান্নার ভেঙে পড়া গলায় নাভনীরা বলেছিল, ‘বেশ, ঐমার পার্টিটা ভেঙে দিলেন তো!’ ওদের বেড়াতে নিয়ে যেতেন, পাখি দেখা দেখাতেন, কি করে প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যেতে হয়, যাতে পাখিরা অনায়াসে আসে—যাকে ববে ‘freeze’ করা পাছের তলায়—সে সব শিখিয়েছিলেন—ওরাও খুব আনন্দ পেত, ঠুঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে—সে বেড়ানো সাধারণ বেড়ানোর থেকে প্রচুর তফাৎ।

ইদানীং কমলা ফুলে, ঐকিতীশ রায়ের লেখা ছোট নাটিকাটি—‘হুড়ুনী’ মঞ্চস্থ করেছিলেন। আমরা দেখি নি, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বলেছিলেন আমরা, ‘একবার তোমরা কলকাতায় থাকলে ওটা আবার করাও, তোমরা দেখতে পারবে।’ সে দৌভাগ্য আমাদের আর হল না। ‘লব্ধকর্ষ পালা’ আমরা দেখেছি, শুনেওছি, ঠুঁরই মূর্খে ventriloquist চালেও! ঠুঁর মাথার ইদানীং ছিলো ‘রাজকাহিনী’র গল্প নাটক করে অভিনয় করা, গান দিয়ে, কিন্তু সময় ও আশ্চর্য্যভাবে বোধহয় হয়ে ওঠেনি।

‘স্বতি সত্তা ভবিষ্যৎ’ বইয়ের অনেক কবিতায় স্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু আগে ১২৭২-এ চিঠিতে লিখেছিলেন ঠুঁকে—‘তোমার কবিতায় আমি হুড়ুনী করতে পারছি না।’ দ্বিতীয় অঙ্কঠানে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু ও দ্বিতীয় জীবনব্যাস দাবিত্ব নিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনে রিখিয়া আসবেন টেলিগ্রাম পর্বত করেছিলেন, শেষ পর্বত, আসেননি। কিন্তু কি অম্বর সীতিনৃত্যাহুঠান করেছিলেন, এবং স্তরগুলি কি অপূর্ব দিয়েছিলেন, দ্বারা দেখেছিলেন এবং পরে এখানে শুনেছেন, তাঁরা জানেন। এখানে একটা ও রকম অঙ্কঠান করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ১২৭৩-এ আকস্মিকভাবে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর জ্যা উর্মিলা মারা যান। সে ছুঁটনাটা ঠুঁর শরীর-মন ভেঙে দিয়েছিল, জানি—কাককে যদিও জানতে দেন নি। শেষ কটা বছর হাণিমুখেই চালিয়ে গেছেন, সকলকে আনন্দ পরিবেশন করে। ইদানীং ঠুঁকে বলেছিলেন—তাই, তোমার কবিতা আমি বুঝে গেছি। লেজুটই, কত গানে স্তর দিয়েছেন, সবগুলির বোধহয় অল্পলিপি করা বা দেখানোও হয় নি, বা টেপ করেও রাখা হয় নি সময় ও সুবোপের অভাবে। কেউ কি কখনও হুঃখপ্রেমও আশ্বাস করেছেন যে শেষটা এত কাছে এসে গেছে? আমার দ্বারীর সঙ্গে একটা বিশেষ

সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন—(যে অল্প ওঁর পক্ষে এখন জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর বিষয়ে লেখা প্রায় অসম্ভব—আমার মনে হয়, এবং যে অল্প আমিই এত সব শিখছি, খানিকটা নিজের মনকে হালকা করতে যদি পারি) বেন-গিঠোপিঠি ছুই ভাই। উনি হচ্ছেন, “মেজ” ভাই—“মেজদাদা” বা “মেজবাবু” (আমার স্বস্তর বাড়িতে)। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু খুব পছন্দ করতেন, সব সময়ে ডাকতেনও “মেজবাবু” বলে, নিজের নাম চিঠিতে প্রায়ই সই করতেন—“শ্রী সেজো”। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু জানতেন, ওঁর পয়ের ভাইটি, কেশব, ১৯৪১-এ দাঙ্গার পর মারা বান—তাঁর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল, সকলেরই। তারই কি অভাব পূরণের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রবাবু হলেন “শ্রী সেজো”? আবার তো সে ছান খালি হয়ে গেল।

পঁচ বছর, ১৯৭৭-এ যে মাসে আমরা বেদিন যিথিয়া কিরে বাই, আগের সন্ধ্যায় এসে অনেক গান গাইলেন। আমাদের পুরনো হারমোনিয়মে বেলাও করতে হাতে লাগত—বললেন হাতে ব্যথা। জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর গলায় “আমি চকল হে” দারুণ লাগত, এবং উনি খুব ভালোবাসতেন। সেদিন ওঁর সে গানটা শোনার তৃষ্ণা মেটেনি। একবার গাইবার পর অল্প কটা গান গাইলেন। উনি বললেন—তোমার সেই গানটাতো শোনা হলো না—আমি চকল হে! বিনা দ্বিধাভিত্তিতে আবার গাইলেন, পরে বললেন হেসে—“আরেকবার তো একটু আগে গাইলুম।” উনি বলেছিলেন—বারবার তোমার গলায় ওই গানটা শুনেছে ইচ্ছা হয়, কেউ ওরকম দরদ দিয়ে গাইতে পারে না।—আর তেঁা কখনও শুনেতে পাবেন না—তাই বোধহয় সেই সন্ধ্যায় ছবার শুনেছিলেন। বাড়ি বাবার আগে নিচু গলায় আমার বলেছিলেন—“আর গান শোনাতে ভালো লাগে না। মাথা ভর্তি হয়। খালি কম্পোজ করতে ইচ্ছা করে। ছোটো ফুলে ছোটোছুটি করতে ক্লান্ত লাগে। আমার মাথায় হয় আর হয়।” কথাগুলি কানে বেজে আছে—আমাদের পোড়া দেশ, সে অযোগ্যত্ব আমরা করে দিতে পারি নি—ওঁকেও বঞ্চিত করেছি, নিজেরাই সব থেকে বেশি বঞ্চিত হলুম। উনি তো বা পেয়েছেন, কষ্টের জীবনে, আমাদের দিয়ে গেছেন—একটু স্বস্তি একটু শান্তি আমরা দিতে পেরেছি? এরকম বিস্তৃত আর্টিস্ট থাকে বলে, কষ্টসহিষ্ণু দিলদরিয়া লোক আমরা কি আর পাব? এ রকম লোক দূরত্বা, কিন্তু আমরা তাঁদের চিনতে শিখি নি, এবং বারবারই মূল্য দিতে ভুল করি। যেমন আমরা হারালুম আরেকজনকে—জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর এবং আমাদের

বন্ধু, আশ্চর্য প্রতিভাবান পুরুষ—বিজ্ঞান ভট্টাচার্য! একটা শুণ থাকলেই আমরা অহঙ্কারে দিশাহারা হই—এঁদের কত কমতা কত শুণ ছিল, তার সম্পূর্ণ লম্বাবহার করবার সুযোগ আমরা করে দিতে পারলুম না।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবু ছুটি ছোট করে হায়দ্রাবাদ থেকে চলে আসছিলেন—
 টি. ভি. প্রোগ্রাম আছে বলে! তার জন্ত তাঁকে আর মাথা নিচু করতে
 হল না। কত লোক রেডিও প্রোগ্রাম পান—কত ভালো, এবং কত
 তত-ভালো-নয় পায়ক এবং গায়িকা পান করেন। জ্যোতিরিন্দ্রবাবুও তাঁর
 দল একটি মাত্র প্রোগ্রাম পেয়েছিলেন, ১২৭৬এ, তাও দিল্লী থেকে রাত
 ২-৩০ টায়, এবং বোধহয় তা মিঃ পি. সি. চ্যাটার্জির মৌলতে। আমরা
 যিথিয়ার শুনতে পেয়েছিলুম। আর কখনও তো তাঁকে প্রোগ্রাম পেতে
 শুনি নি—এই তো আমাদের দেশের ব্যবস্থা! এইচ-এম-ভি-কেও কতবার
 বলা হয়েছে রেকর্ড করতে—জ্যোতিরিন্দ্রবাবু লাজুক ছিলেন, এগিয়ে গিয়ে
 নিজের কথা বলতে পারতেন না, তাই কলাঘিয়ার প্রাচীন একটি ভিক-
 ছাড়া আর করা হয়নি—এবং সেটাও এখন বাতিল! কিছ; ওই ছুটি গানেই
 মাহুঘটি বেছে নিলেন দুটি গান : একটি বেন ঠর নিজের বিষয়েই গান—

“অগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।

যন্ত্র হল, যন্ত্র হল মানব জীবন।”

জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর পাখি, এবং পাখির ডাক ভালবাসায়, “le notation
 de terrain” র ভালবাসায়, আনন্দে—

“নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটারে বেড়ায় সুরে,

শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন ॥”

যত ছুঃখকষ্ট অর্ধাভাব ঠর জীবনে থাকুক না কেন, কেউ এই আনন্দ নষ্ট
 করতে পারেনি—ঠর মনের পবিত্র আনন্দ। তাই কবির পরের কথাগুলি
 আরো বেশি বেন জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর পক্ষেই প্রযোজ্য—

“তোমার যজ্ঞে বিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি—আকস্মিক ভাবেই
 একেবারে তাই। এবং ঠর নিজের কবিতাতে গানে “গানে গানে গৌণে”
 বেড়িয়েছেন “প্রাণের কান্না হাসি”—কতো লোকের প্রাণে কান্না-হাসি ছুঃখ-
 কষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা। এখন তাই মনে হয়, “সময় হয়েছে”, এবং সত্যই গিয়ে,
 এবং মাহুঘের অগতের মধোও শুনিয়ে গেলেন “অযত্ননি”। হার মানেন নি,
 জীবনের অয়ই গেয়ে গেছেন।

রেকর্ডের অস্ত্র দিকটাও বলতে পারা যায়, আরো বেশি জ্যোতিরিন্দ্র :

মৈত্র-র উপযুক্ত—টিপিক্যাল মাহুটিকে পুরো মাজার চেনা বার : গুরুত্ব পান আর কেউ কি প্রাণ ভরিয়ে প্রার্থনা জানিয়ে যাবেন, দেশের মন্ত্র ? শুনেছি, কাঠকাটা বোদে, ছাতা বগলে, জ্যোতিষি মৈত্র রাজধানীর রাজপথ দিয়ে একলা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছেন, নিজের মনে, নম্র স্বরে, গানে—বতবার রেকড বাজাই ততবারই মনে হয় সেই প্রার্থনা উচ্চারিত হচ্ছে, ওই দরজা গলার। এই প্রার্থনা যে আমাদের দেশে একান্ত প্রয়োজন—এর থেকে আর কি ভালো প্রার্থনা আছে ভারতের মন্ত্র :

“এ ভারতে রাধো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ—

তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী,

তোমার স্থির অমর আশা ।

অনির্বাপ ধর্ম আলো, সবার উদ্দেশ্য আলো আলো,

সবচেঁহে দুর্দিনে হে,

রাখো তারে অরণ্যে তোমারই গর্বে ।

বকে বাধি দাও তার বর্ম তব নির্বিঘ্ন,

নিঃশঙ্কে যেন সকলে নির্ভীক ।

পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়—

থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে ॥”

এ প্রার্থনা যদি সফল হয় আমাদের কাম্য আর বেশি কি থাকে ?

জ্যোতিরিন্দ্র স্মরণে

ব্রাহ্মণ্যের মিত্র

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (আমাদের বটুকদা) মহাশয়ের সঙ্গে আমার সেই সমস্ত আলাপ হয় নি যখন তিনি ব্রিটিশ শাসনের শেষদিকে নানা সাংস্কৃতিক কাজে ব্যাপ্ত ছিলেন। তখন তিনি কাব্য জগতেরও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তখন আমি যুবক, কলেজের পড়া বেশ কয়েক বৎসর আগেই শেষ করেছি এবং কলকাতাতেই থাকি, তথাপি একান্তভাবে ঘরকুনো হয়ে থাকতুম। কভাবের এই বিচ্ছিন্নতার জন্য আমি অনেক কতিগ্রস্ত হয়েছি—আজ সেইসব স্তেবে অহুশোচনা হয়। বটুকদার সঙ্গে আলাপের পরে জেনেছিলাম তাঁর প্রকৃতির মনোও এরকম একটা বিচ্ছিন্নতাবোধ ছিল, বার জন্ত তিনিও কোনও সংস্কার সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকতে পারেন নি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ কোনো স্তরে ধরে হয় নি। চৌরঙ্গির রাস্তায় যেতে যেতে পার্ক স্ট্রিটের ঘোড়ে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। আমি তাঁকে নমস্কার করলুম, নিজের পরিচয় দিতে বাচ্ছি, দেখলুম তিনি আমাকে চেনেন। অনেককাল ধরে ফুটপাথেই কথা হল, কত বিষয়ে। একেবারে নিরতিমান লোক, অতিমাত্রায় স্নেহশীল। বাঙলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিবিধ অঞ্চল থেকে কত গান সংগ্রহ করেছেন সে কথা বললেন, কিন্তু সখেদে বললেন—“কাউকে দিয়ে কিছু করতে পারলুম না—এইটাই দুঃখ রয়ে গেল।” এই প্রচণ্ড দুঃখ নিয়েই তিনি গত হয়েছেন, তাঁর প্রতিভাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি নি এবং প্রথম ইনস্টেলেকচুয়েল হওয়াতে তাঁর পরিচিত অনেকের সঙ্গেই তাঁর আস্থার মিল ছিল না। একদা বারো তাঁর ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়িয়ে কাজ করেছে, শিকালান্ত করেছে, তারা একে একে কমার্শিয়াল লাইনে চলে গেল, যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করল এবং অর্থ উপার্জনও করতে লাগল প্রচুর; কিন্তু বটুকদা সেই পথের পথিক কোনদিনই হতে

পারেন নি; হয়তো চেঁচা করেছেন, কিন্তু সে চেঁচা পরিত্যাপ করেছেন, কারণ অনশ্রিয় হবার ব্যাপারটাই তিনি বুঝতেন না। সম্ভ্রান্তি প্রয়াত হাবলদাও (হিরণকুমার সান্ডাল) এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁকেও দেখেছি সবাইকার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করতে, কিন্তু কোথায় তাঁর একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল—সেই একাকীত্বের জন্ত তিনি তেমন করে বেন নিজে থেকে রচনার, সাহিত্যকর্মে স্রুটিতে তুলতে সচেষ্ট হতেন না।

বহুদিন পরে দিল্লীতে গিয়েছিলাম একটি সরকারি কাজে। আমি থাকতুম করোলবাগের একটি সামান্ত হোটেল। কাছেই থাকতেন বটুকনা। একদিন এলেন এমনি দেখা করতে। অনেক কথাবার্তা হল। সেবারে দিল্লীতে বাঙালি সমাজের অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কলকাতা ছাড়লেন কেন। মুহূর্তেই প্রায়টাই এড়িয়ে গেলেন, কেবল এইটুকু বললেন—“অনেক পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু কলকাতায় সেটা হুই-উঠল না এবং দেখা গেল কলকাতায় থাকারটাও বোধহয় নিরর্থক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।” দিল্লীতে কয়েক বছরই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। অনেক অহুষ্ঠানও তাঁর দেখেছি ওখানকার বাঙালি ছেলেমেয়েদের নিয়ে; কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ তাঁর পরিকল্পনামতো কিছু করার যোগ্যতা তাদের অনেকেরই ছিল না। অবশ্যই কেন্দ্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের গানেব অহুষ্ঠানই করাতেন, তাঁর কম্পোজিশন কিছু শুনেছি বলে মনে পড়ে না। দিল্লীতে বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে তিনি ‘রামলীলা’ করেছিলেন বলে শুনেছি, কিন্তু সেটি আমার দেখা হয়ে ওঠেনি।

লোকসঙ্গীতের বহু সংগ্রহ ছিল তাঁর; কিন্তু তিনি ছিলেন রাগসঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। রবীন্দ্রনাথের “অগতে আনন্দবজ্র তোমার নিমন্ত্রণ” গানটি তাঁর কাছে বার বার শুনেও তৃপ্তি হত না। এই সব গানেই তিনি ছিলেন বিশেষ দক্ষ, লোকসঙ্গীত তাঁকে আমি পাইতে শুনি নি—অমরোষ করেও না। অথচ সমগ্র ভারতের এবং বহির্ভারতের লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে বহু চিন্তা ও সমীক্ষা তাঁর ছিল। আনিয়া তাঁর মৃত্যুর পর আজ সেই সঙ্গর কিতাবে কাজে লাগানো হচ্ছে।

দিল্লী থাকার কালে তিনি একবার কলকাতায় এসেছিলেন। আমি তাঁকে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম। খাওয়া হাওয়ার পর বললেন—“চলো ভীষ্মবেহের বাড়ি যাওয়া যাক, তোমার বাড়ির কাছেই থাকেন। এই বেলা দেখা না হলে আবার কবে দেখা হবে কে জানে।”

ভীষ্মদেবকে তিনি তুমি সন্মোদন করতেন, বহুদিনের পরিচয় ঠিকের। আমরা ছুজনে গেলুম ভীষ্মদেবের বাড়িতে। ভীষ্মদেব খুশি হলেন। সেদিন প্রায় ছুশটা ঘরে ঠিকের মধ্যে নানা কথা হল অনেকের প্রসঙ্গে, তাঁদের আমি চিনি না। দেখলুম ভীষ্মদেবের স্থিতিশক্তি প্রখর। তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে সে সব দিনকণ, তারিখ এবং তিথি পর্বন্ত বলে যেতে লাগলেন। তখন সবে ওঙ্কারনাথ ঠাকুর যারা গেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম—ওঙ্কারনাথ সম্বন্ধে তিনি কিরকম ধারণা পোষণ করেন; উত্তরে সোজা বললেন—“ও গাইত বটে কিন্তু কোনোরকম রাত্তা খুঁজে পায় নি, পণ্ডিচেরিতে গিয়ে গেয়েছিল কিন্তু “মা” খুঁশি হন নি।” শচীনদেব বর্ষণ সম্বন্ধে কথা উঠলে বা বললেন—সেটা নেহাৎ করুণ ব্যাপার। শচীন দেববর্ষণ একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য পণ্ডিচেরিতে গিয়েছিলেন। সংবাদ শুয়েও তিনি তাঁকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলেন এবং শেষে তাকে চলে যেতে বলেছিলেন। বটুকথা বললেন—“তুমি তাকে সোজা চলে যেতে বললে?” ভীষ্মদেব নির্বিকার ভাবে বললেন—“কি জানি কেন ভালো লাগল না ওর সঙ্গে কথা বলতে, তাই বললুম তুমি এখন যাও।” বটুকথা আর কিছু বললেন না। আমরা ঠিক ওখানে চা খেয়ে বেরিয়ে এলুম। বটুকথা কিরে গেলেন তাঁর বাড়িতে। সেই আমার বটুকথার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ।

তারপর তিনি দ্বিতীয় পাট চুকিয়ে কলকাতার কিরেছেন শুনেছি, কিন্তু আর কোনও কাজে হাত দিয়েছিলেন কিনা জানি না। একদিন রেডিওর দেবচন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এসে বললেন “আমাদের আবৃত্তির ব্যাপারে স্ববীজসম্বন্ধের একটি ঘরে একটা আলোচনা হবে, বটুকথা আপনাকে বার বার আসতে বলেছেন।” গিয়েছিলুম তাঁর আস্থান অংশারে, কিন্তু তিনি আসতে পারেন নি, বোধ হয় স্বেচ্ছাবাবুরও আসবার কথা ছিল, তিনিও আসেন নি। আলোচনা আর সেদিন হল না; তবে রিক্রেশমেন্টের জন্য চপ কাটলেট-গুলির সম্ভাবহার বথারীতি আমরাই করেছিলুম।

উদাসীন প্রকৃতির স্নেহপ্রণয় বন্ধুবৎসল অথচ একান্ত আত্মকেন্দ্রিক এই ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হইতে যথেষ্ট সঙ্কলান্ত করতে পারি নি—এই দুঃখ আমার রয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে এমন একটি ‘ইনটেলেকট’ থেকে আমরা বঞ্চিত হইলুম যার পরিপূরণ সহজে হবার নয়।

নবজীবনের মুখ চুমে

রঘুনাথ গোস্বামী

“তুমি নিশ্চয়ই রঘুনাথ, আর আমি হচ্ছি বটুকদা।” বক্তা কাঁচাপাকাচুল সহস্র একব্যক্তি লোক টেবিলের ‘অশিক্ষণ’ বিভাগের সিঁড়ি দিয়ে উপরতলায় উঠে এসে নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন, “তোমার সঙ্গে আমার আগে কখনও দেখা হয় নি কিন্তু আমি তোমাকে চিনি।” বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললাম “আপনাকেও আমি অনেকদিন থেকেই চিনি, কিন্তু কখনও দেখা হয় নি।”

বটুকদা আমার আত্মীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁকে চিন্তার অগ্নি কারনে। ‘মধুবংশীর গলি’র কবি, অরশিদ্দী, সত্যজিতের ‘রবীন্দ্রনাথ’ আর স্বস্তিক ঘটকের ছবির অরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল। তাঁর খবর পেতাম এক-আধজনদের কাছে। খবরগুলোর কোনোটাই অবশ্য সাংবাদিক স্যামারাস কিছু ছিল না। তাঁর তত্ত্ব হয়ে-ওঠার অধোগ ঘটে নি পরিচয়ের আগে। কিন্তু বটুকদা মন কেড়ে নিলেন পরিচয়ের প্রথম দিনেই। পরিচয় ঘটল রাজ সেনিন ১৯৭৪ সালের গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায়।

আমরা তখন লোক টেবিলের ‘অশিক্ষণ’ বিভাগের বাড়িতে পাপেট থিয়েটার নিয়ে মেতে আছি। গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জায়গা দিয়েছেন। কুলের ছাদে পাকাপোক্ত ঞেজ করা হয়েছে। ছতলার বারান্দায় পাপেট নিয়ে নানারকমের পরীক্ষা আর মহলা হয়। গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় আমরা বথানিরমে বর্ষাক্ত হয়ে কাজ করছি। বটুকদা অকস্মাৎ এসে হাজির হয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। গল্প হল। আমাদের কাণ্ডকারখানা বেধে খুশি হলেন। আনালেন দিল্লীর পাট চুকিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এরপর নিয়মিত আমাদের আধড়ার আসবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলেন। কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা বড় আশ্বাস লুকিয়েছিল। প্রথম দিনের

যন্ন পরিচয়ে কতটুকুই বা কথা হয়েছিল বা নিয়ে উদ্বেজিত হয়ে ওঠা যায় । কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল বটুকদার কলকাতায় ফিরে আসাটা আমাদের কাছে একটা বড় ধবর ।

তারপর থেকে ‘স্বশিক্ষণ’ বিভাগয়ে আমাদের আশঙ্কার এসেছেন প্রায় নিয়মিত । কোনোদিন দোতলায় আমরা মহলা দিতে দিতে বা কাজ করতে করতে স্তনতে পেতাম নিচের মিউজিকরুমের প্রকাণ্ড গ্রাঁও পিয়ানোটা বম বম করে বাজছে । বৃথতাম বটুকদা এসেছেন । পিয়ানোটি টিউনিং করা হত কালে ভব্রে । তাই আঙুরাজ বেহত বেহুরো, আর যথেষ্ট পরিমাণে কালাক্রান্ত হয়ে পড়ায় পিয়ানোটির রীডের অনেক জলিই ছিল অবশ । বটুকদা কি কারদার বেন সেগুলো বশ করে পিয়ানোটি বাজাতেন প্রায় বিনা আয়াসে । কোনো কোনো দিন ‘স্বশিক্ষণ’-এ এসে দেখতাম বটুকদা আমাদের আগেই এসে একা একা বস হয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছেন । দরজার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে স্তনতাম । দেখতে পেলে ঘরের ভিতর ডাকতেন । একদিন হঠাৎ বাজনা থামিয়ে বললেন “অনেকদিন ধরে একটা খুব বড় কম্পোজিশন মাথায় ঘুরছে । এইটেই হবে আমার সবচেয়ে বড় কাজ । যা স্তনহিস এগুলো হল সেই কম্পোজিশনের কতকগুলো ক্রেজ । টুকরো টুকরো করে তৈরি করছি, বদলাচ্ছি, ভাঙছি, নতুন করে তৈরি করছি ।” কাজটার গুরুত্ব বুঝে বটুকদাকে অরাজ্জিত পিয়ানোটির বিকল অবস্থাটা স্মরণ করিয়ে দিলাম । গাইয়ে বাজিয়েরা মন্ত্রপাতির ব্যাপারে পান থেকে চুন ধসলে বুক চাপড়াতে শুরু করেন । এটাই স্বাভাবিক । বটুকদা কিন্তু এব্যাপারে ছিলেন ব্যতিক্রম । অবশ্ব আর বয়সের ভারে শিথিল পিয়ানোটা বাজাতে বাজাতে শুধু কখনও কখনও আমাদের দিকে বিব্রত মুখে তাকাতেন । বৃথতাম ক্রমাগত অবশ রীডগুলো এড়িয়ে, বেহুরো রীডগুলো টপকিয়ে সজীত স্রষ্ট করার স্বপ্নাদায়ক কসরতে বটুকদা বিব্রত । একটা ভালো পিয়ানোতে কাজটা করছেন না কেন একথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি ।

“ভালো পিয়ানো কোথায় পাব বল”, উত্তর দিয়েছেন বটুকদা । তাঁর জানাশুনা ছ-একজায়গায় ভালো পিয়ানো ছিল । কিন্তু সে সব জায়গা তাঁর পছন্দ নয় । বলতেন “এমন নির্ঝড়ান্ট জায়গা কোথায় পাব । এখানে আপন মনে অনেক পাগলামি করা যায় ।”

কলকাতায় ফিরে আসার পর কম্পোজ করার মতো একটা ভালো পিয়ানো আর সেই সঙ্গে একটু নির্জনতা বটুকদা পান নি । চেষ্টা কতটুকু

করেছিলেন তা আমার জানা নেই। কারণ চোঁচোরিঙ্গ বলতে বা বোঝার তা ওঁর ঘাটে ছিল না। ব্যাপারটা অনেকে বটুকদার উদ্ভবের অভাব বলে কতোরা দিয়েছেন। আসলে হয়তো বটুকদার জীবন-অভ্যাস ছিল অন্তরকম। বা সহজে পাওয়া যায় বা না আছে তাই নিজেই সঙ্কট থাকতে ভালোবাসতেন।

আবার পুরনো কথায় ফিরে আসি। বাজাতে বাজাতে বটুকদা চিনিয়ে দিতেন তার কম্পোজিশনের বীষ। কিতাবে রিক্যাপিচুলেশন হচ্ছে— ফিরে আসছেন বীষে। টুকরো টুকরো করে বাজাতেন। সংবীভূত স্বরের বিচ্ছিন্ন যোজাইক। কোথাও বর্ণাঢ্য, কোথাও ধূসর। কোনো অংশে আর্চব রক্তিম বিস্তা, কোথাও রজনীর শেখ তারার মতো নৈঃসঙ্গ্য। বটুকদার বড় এই কম্পোজিশনের অল্প প্রত্যক্ষ আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠল, ধীরে ধীরে। লেক টেরেসে ‘হুশিকপ’ বিভাগেরে ভাঙা পিরানোতে বটুকদার কম্পোজিশনের অংশগুলি শোনার নেশা আমাদের পেয়ে বসল। কিলের বেন একটা ছুটি ছিল সেদিন। ‘হুশিকপ’-এর মিউজিক করে আমরা এদিক ওদিকে ছড়িয়ে বসে আছি হু-চারজন। বটুকদা বাজাচ্ছেন। নির্জন ছপূর। লেক টেরেস পাড়াটা প্রায় নিঃশব্দ। হঠাৎ বাজনা ধামিয়ে বটুকদা বললেন তিনি যে কম্পোজিশনিটা করছেন তার মধ্যে ধরে দেবেন তাঁর সারাজীবনের রিয়েলাইজেশন। আরও অনেক কথা বললেন সেদিন তাঁর এই কাজটির সম্বন্ধে। এই কম্পোজিশনের একটা ভিহুয়াল এক্সপ্রেশন থাকবে। নৃত্য হবে একটা মাধ্যম। হং, আলো আঁধার আর রহস্যময় সব দৃশ্য বস্তু থাকবে। বটুকদা সেদিনই প্রথম তাঁর কম্পোজিশনের মিউজিক্যাল আইডিয়াটা প্রকাশ করলেন আমাদের কাছে। কতটুকুই বা আমরা ধরতে পেরেছিলাম। কিন্তু আইডিয়াটির অপার্থিব দার্শনিক গভীরতা আমাদের মনকে অভিভূত করেছিল। সম্মোহিত হয়ে আমরা শুনেছিলাম বটুকদার কথা। সবটাই প্রায় বসন্তোক্তির মতো। তব্ধের অনেকখানিই হয়তো থেকে গিয়েছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু এই অসমাপ্ত সঙ্গীতের মোজাইকের নানা অংশ আমাদের স্মৃতিতে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে। ইঙ্গিতমাত্রই তা বেজে ওঠে আর্চবভাবে।

কলকাতার লোক কি চিনত কম্পোজার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে? খোজ খবর রাখত কি রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিচিত পরিসীমার বাইরে জ্যোতিরিন্দ্রের

অন্ত সব ঐশ্বৰ্য্যের, সঙ্গীত ভাবনার ? বটুকদার বিরোধে লোকসানের হিসাবই হয়তো করা গেল না।

অগ্নদিনের মধ্যেই আর একটা ব্যাপার বা আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল তা হল সঙ্গীতের বিষয়ে বটুকদার সংস্কারহীনতা। বটুকদার মতো উচ্ছ্রান্তের স্বরকার সঙ্গীতশিল্পীর পক্ষে যে ধরনের পিউরিট্যান মনোভাব একান্ত বাস্তবিক, এই আশ্চর্য্য মানুষটির মধ্যে তার চিরুদ্বাজ ছিল না। স্বরসর্জনাই ছিল তাঁর কাছে প্রধান ব্যাপার। স্বর, বেণু-বীণা-মৃদঙ্গ-মুগ্ধ-মুমলী দিয়ে তৈরি কি টিনের প্যাটরা, ভাঙা পেয়লা, ব্যাঙের চামড়ায় ছাওয়া ছেলেখেলার বেহালা আর পুঁই বাঁশ দিয়ে তৈরি সে ব্যাপারে বটুকদা ছিলেন সংস্কারমুক্ত। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা তৈজসপত্র আর অস্তাবনীয় বস্তুনিচয়ের মধ্যে অলৌকিক সব শব্দের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে বলে বটুকদা মনে করতেন। এই সব শব্দের সমাহারে বিচিত্র সঙ্গীত রচনার ব্যাপারে তাঁর ছিল অপরিমীম আগ্রহ।

এর সঙ্গে কখনো বোঝ করতেন নিজের গলা দিয়ে বার করা অভূতপূর্ব সব শব্দমালা। এসব তিনি করতেন একজন কম্পোজারের সিরিয়াসনেস নিয়ে।

বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মর্মর প্রাশাদবালী হয়েও বটুকদা ছিলেন এক ধরনের দ্রাভ্য। অন্ত্যজ বরসমষ্টির সাহায্যে এইসব স্বরসৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে ছিল আশ্চর্য্য এক মুক্তি আর সম্ভাবনা। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রচল বিরুদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ড বেধে বটুকদার আশপাশের লোকরা যথাবিহিত উপেক্ষায় বিজ্ঞপের হাসি হেসেছেন। অম্বয়ন্তরা বলেছেন পাগলামি, ছেলেমাহুবি। বতদূর আনি বটুকদার এই ধরনের কাজের কোনো নজিরই বেঁচে নেই। বটুকদার সঙ্গে এগুলিও লুপ্ত। খেলার ছলেও কেউ এগুলি সম্ভবত রেকর্ড করে ধরে রাখেন নি। তখন আমরা ছায়াপুতুল ভাঙোপাপেট ব্যবহার করে স্টাটিলাইট টি. ভি. প্রোগ্রামের অন্ত উপেক্ষকিশোরের “চুই বাব” গল্পটির কিংবদন্তি তৈরি করছি, একদিন বটুকদা হেষ্টিংস স্ট্রিটের অফিসে এলেন। আসা মাত্রই বটুকদাকে ধরলাম কিংবদন্তি মিউজিক করে দেওয়ার জন্য। বটুকদা তৎক্ষণাৎ রাজি। চিহ্ননাট্যটি চাইলেন। চিহ্ননাট্যটি খামে ভরে তাঁর হাতে দিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম “কতদিন লাগবে।” “ঘণ্টা দুয়েক”—বলেই আমাদের অবাক করে দিয়ে একটা টেবিলে বসে গিয়ে সঙ্গীত ও ইফেক্টগুলি অনর্গল

বলে যেতে লাগলেন আর চিত্রনাট্যের পাশে সাধা আয়গাটুহুতে তা লিখে যেতে লাগলেন পর পর। ষষ্ঠী ছুয়েকের মধ্যেই কাজ শেষ। সময়ে বটুকদাকে আনিয়ে রাখলাম মিউজিক রেকর্ডিং-এর লব্ধ বেশি যত্নোদ্ভী নিয়োগ করার মতো আমাদের অর্থ সামর্থ্যের একান্তই অভাব। “কুছ পরোয়া নেই। জন তিনেক বাজিয়ে জোগাড় কর”-বটুকদা বললেন। জন তিনেক যন্ত্রবাদককে হাজির করলাম রেকর্ডিং-এর দিন। বটুকদা এসে যন্ত্রীদের কাকে কি বাজাতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে মহলা শুরু করলেন। দেখা গেল যে কজন যন্ত্রী আনা হয়েছে তাদের যন্ত্রগুলি বহন করা ছাড়া আর কোনো যোগ্যতা নেই। স্বীকার করছি সামর্থ্যের অভাবে প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রী আমরা আনতে পারি নি। কিন্তু বঁারা এসেছেন তাঁরা যে এত নিম্নমানের তা আমরা কেউই আগে আন্দাজ করতে পারি নি। বটুকদা তাদের নিয়ে কিছুক্ষণ স্বতন্ত্রাঙ্গতি করার পর মহলা ধামিয়ে আবার কানে কানে বললেন- “এরা যা পারবে তেমন করে মিউজিকটা আবার লিখতে হবে।” আমরা স্নাকাসে হয়ে সেলাম লজ্জার ভয়ে। আধঘণ্টার মধ্যে আবার নতুন মিউজিক-বটুকদা তৈরি করে ফেললেন। নিজে নিলেন যত যন্ত্রের ভাড়া পেরালা যাতু আর কাঠের টুকরো টাকরা, যাত্রা থেকে কেনা কটকটি, পুঁইবাঁশি— এইসব। চতুর্থ শ্রেণীর বাদকবৃন্দ দিয়ে সেদিন প্রথম শ্রেণীর স্বরসৃষ্টি করলেন বটুকদা। উপেন্দ্রকিশোরের ‘ছাই বাঁশ’ গল্পের বনের মধ্যে গাছে গাছে অসংখ্য পাখ-পাখালি। নিজে হলেন পাখি। একাই সৃষ্টি করলেন নানা পাখির বিচিত্র কলকাললি। বনের মধ্যে পাখি হয়ে বেঁচে রইলেন বটুকদা।

অকসি হাজির হতেন সময়ে অসময়ে। কখনো ঘোর ঝিলে রৌদ্র মাথায় করে। গ্রোম-জল-ঝড়-বরষার কাছে হার মানতে রাজি নন। নানা কাজে সময়ে অসময়ে অকসির বাইরে যেতে হত আমাকে। অকসি কিরে এসে টেবিলের উপর কখনও কখনও পেতাম ডেকের উপর রাখা আমার ফেট পেন দিয়ে নানা রঙিন কালিতে লেখা দু-চার ছত্র কবিতা। বুঝতাম বটুকদা এসেছিলেন।

কোনোদিন ধরে নিয়ে আসতাম বটুকদাকে দমদমের বাড়িতে। রেকর্ড শোনা হত। দেশী-বিদেশী সঙ্গীত স্তনতে স্তনতে বুঝিয়ে দিতেন ধরিয়ে দিতেন সঙ্গীতের নানা ক্রিয়াকৌশল আর আশ্রয় রহস্য। বটুকদার সংস্পর্শে আমরা শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। বটুকদাকে দিয়ে নানা স্রবস্রুতি। গোপন বাসনা ছিল বটুকদার শ্রেষ্ঠ গানগুলো টেপ করে রাখবা।

বাড়িতে এলে হারমনিয়ামটা কাছেই রেখে দেওয়া হত। ইচ্ছা হলে গাইতেন। কটা পানই বা ধরে রাখা গেল। অবহেলা আর আলস্তেই দিন কেটে গেল।

কদিন বৃষ্টির পর সবে আকাশের মেঘ কেটেছে। বর্ষা ষোয়া প্রাণের আকাশ চাদের আলোর উদ্ভাসিত। বটুকদা এসেছেন আমাদের বাড়িতে। হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে বললেন “মন্নার শোন।” কিছুক্ষণ মন্নার গাইবার পর অকস্মাৎ গান থামিয়ে বললেন “এবার শোন রবি মন্নার। মিঞাকি মন্নার, সুরদাসী মন্নার এমন বধন আছে তখন রবি মন্নারই বা কেন থাকবে না।” সেদিন রাতে বটুকদা গাইলেন রবীন্দ্রনাথের মন্নারের অনেকগুলি বিখ্যাত গান। - শেষ গানখানি ছিল “চিত্ত আমার হারালো।” রেকর্ড করে নিয়েছিলাম গানটি। প্রাণের সেই রাতে জ্যোতিরিন্দ্র বৈষ্ণব এই গানটির আন্তর ভাবসম্পন্ন নতুন করে উন্মোচিত করেছিলেন আমাদের কাছে।

দোলের দিন বটুকদাকে একবার আমরা পেয়েছিলাম আমাদের মধ্যে। সেবারের দোল আমাদের স্মৃতি থেকে কখনও মুছবে না। সারাদিন হুবকের মতো ক্রান্তিহীন আনন্দে পেয়েছেন আর নেচেছেন। সেই রাতে আমরা বটুকদাকে নিয়ে বসেছিলাম এক প্রান্তরে। আরপাটা কলকাতার বাইরে। আমাদের চার পাশে ছিল কতকগুলি গাছ। গাছের পাতার ঝাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো চাদের আলোর বিচ্ছিন্ন কান্নাকাঁজ বাসের উপর আর সমবেত মাছুবগুলির সর্বাঙ্গে। বসন্তপুর্ণিমায় সেই রহস্যময় রাত্রিকে অপার্থিব করে তুলেছিলেন বটুকদা তাঁর গানের ডালি উন্মোচিত করে দিয়ে। কিছুদিন ধরে বটুকদার মধ্যে এসেছিল কি একটা চাপা অস্থিরতা। বে কলকাতাকে বটুকদা ছেড়ে গিয়েছিলেন, প্রবাস থেকে ফিরে এসে সে কলকাতাকে চেয়েছিলেন ফিরে পেতে। খুঁজে পেতে চাইছিলেন একটা আরপা বেখানে পা রাখতে পারেন। পেয়েছিলেন কি? ফিরে এসে দেখেছেন সহবোধারা সব রূপান্তরিত, মৃত বা নিকৃষ্টি। বারা নতুন তারা আত্মআবৃত। এগুলো হয়তো সবই আমার অজ্ঞান।

কথা ছিল কত কি বেন হবে। কিছুই তো হল না। শ্রুতগর্ভ কলকাতা বটুকদাকে বিব্রণ করে তুলেছিল। ইহানীং কলে আসা দিনের নট্যাংগজিয়ার দুর্গে হয়তো আবার আত্মর খুঁজতে শুরু করেছিলেন। বহুতর জনশ্রুত ভাঙা আসরে প্রাণপণে পলার শিরদুলিয়ে গাইতে শুরু করেছিলেন ‘নবজীবনের

গান'। প্রত্যাবর্তনের পর এ শহরের সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের দ্বারা বটুকদা অবশ্য একেবারে ব্যবহৃত হচ্ছিলেন না তা নয়। রবীন্দ্রনাথের কিছু গভীর কঠিন ও 'নট সো পপুলার' গান গাইবার অল্প মাঝে মাঝেই নানা মঞ্চে এখানে এখানে বটুকদার ডাক পড়ত। গুরুদেবের অমৃত্যু বার্ষিকীতে খাঁকতির কালেও বটুকদার ব্যস্ততা বাড়ত। তাছাড়া বিভাগস্বরের 'বোধোদয়' বা শঙ্করাচার্যের 'মোহমূলগর' প্রস্তুতি নিয়ে দ্বারা কঠিন আর পরীক্ষামূলক সঙ্গীতালেখ্য আত্মীয় কিছু করার চেষ্টা করতেন তাঁরা বটুকদার শরণ নিতেন বা তাঁকে ব্যবহার করতে চাইতেন।

অনেককাল আগে বটুকদা বেহিনীগুরে 'কব্জী' নামে ফার্ম শুরু করেছিলেন কয়েকজন মিলে। কি কারণে বেন তা বন্ধ হয়ে যায়। বছর খানেক ধরে আবার 'কব্জী' শুরু করার কথা ভাবছিলেন বটুকদা। বাড়িগ্রামে অল্প একটু জায়গাও সংগ্রহ হয়েছিল। এব্যাপারে বটুকদা ছুঁচোর জন মনের মতো লোককে সঙ্গী পেতে চাইছিলেন। কলকাতার বটুকদার বন্ধু আর স্বস্থ বীরা আছেন তাঁরা আর সবাই বটুকদার নতুন উদ্ভবের কথা শুনে কলকাতার কায়দার হাসাহাসি করেছিলেন ধার্মীতি। সমস্ত ব্যাপারটা আর সবাই কাছেই ছিল বটুকদার নতুন পাগলামি। কেউ কেউ শ্রমণ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বয়সের কথা। বটুকদা 'কব্জী'তে যে ছুঁচোরখানি মাটির আবাসগৃহ থাকবে সেগুলি ডিজাইন করতে বলেছিলেন আমাকে। যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর এই উদ্ভবে। শালগাছের দেশ বাড়িগ্রামে পাশিচাঁকা প্রভাত আর রাত্রির শুকতার লোভ দেখিয়েছিলেন। আভাবিক ভীষণতার বটুকদার 'কব্জী'র স্বপ্ন থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছি।

বটুকদা কিছু কারো কথা শোনেন নি। একা কলকাতা আর বাড়িগ্রাম বাতারাতে করেছেন অসংখ্যবার প্রথর জীয়ে উন্মাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। 'কব্জী' গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ইহানীং তাঁকে অধিকার করেছিল। বটুকদা স্বপ্ন ছাড়া থাকতে পারতেন না। একটা স্বপ্নকে অম্লসরণ করা ছাড়া মাহুকের আর কিই বা করার আছে। আসলে বটুকদা কলকাতা থেকে পালাবার অল্প ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতার আকর্ষণ বটুকদার বোধহয় কমে আসছিল দিন দিন।

ইহানীং স্বতিকথা লিখতে শুরু করেছিলেন। বয়েসভূমি পাবনার নামকরা জুবামী পরিবারের ছেলে বটুকদা। বাবার কাছে শেখা সংস্কৃত ভোজ্য স্বপ্নে আবৃত্তি করার সময় লক্ষ্য করেছি মার্কসিস্ট বটুকদার মুখের উপর

ছাড়িয়ে পড়া কি এক ছাতি। স্মৃতি কথা থেকে কিছু কিছু অংশ মুখে বলেছেন এক-আধবার। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সম্বন্ধ। শৈশবে বাবার হাত-ধরে ঘুরে বেড়ানো। শীতের পড়ন্তবেলায় ঘুরে পয়সার বিলীতমান চর।

লেখা কতটুকু এসিয়েছিল? কেউ খোঁজ নিয়েছে কি? একরাতে বটুকদা আমাদের বাড়িতে এলেন। অনেক রাত পর্যন্ত রেকর্ড শোনা আর আড্ডা চলল। পরদিন ছিল রবিবার। আমরা বেশ করে কজন ঘিরে বললাম বটুকদাকে সকাল থেকে। আকাশটা ছিল মেঘলা, আগের দিন রাত্রে প্রচণ্ড বর্ষণ হয়েছে। বটুকদার মনটাও যেন কি কারণে ছিল মেঘলা। হায়মোনিয়ারটা টেনে নিয়ে কিছু একটা সুর শুন শুন করে আলাপ করছিলেন। হঠাৎ বললেন “দরবারী আর টোড়ি নিয়ে মতো করে মিশিয়েছি, শোন।” দুই প্রান্ত—রাত্রি আর প্রভাত। দরবারী আর টোড়ি। অনেককণ আলাপ করলেন। আলাপটির মধ্যে ছিল এক আশ্চর্য বিষয়তা। তারপর গাইলেন :

রজনীর শেষ তারা, গোপনে আঁধারে আধো-চুমে

বাণী তব রেখে যাও প্রভাতের প্রথম সূর্যমে ।

সেইমত যিনি এই জীবনের আনন্দরূপিনী

শেষকণে যেন যেন তিনি নবজীবনের মুখ চুমে ।

গানটির গভীর বেদনা সকলকে তরু করে ছিল। গানটির মধ্যে বটুকদা নিম্নে উজাড় করে দিয়েছিলেন সেদিন। আমার মনে কি এক শব্দ ধরিয়ে দিয়েছিল এই গান। বটুকদার কি যেন ব্যাধি ছিল সেদিনের গানে। এইটাই আমার শোনা বটুকদার শেষ গান। গানটি রেকর্ড করেছিলাম। কিন্তু টেপটি বাজিয়ে পুরো গানটি শুনতে পারতাম না। বুকটা কেমন ফুলে উঠত, গলাটা আটকে আসত গানটা শুনতে শুনতে। বন্ধ করে দিতাম টেপ-রেকর্ডারটা।

আমি তখন দিল্লীতে। শুনলাম বটুকদা নেই। কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় আর ফিরলেন না। বটুকদারকে বোঝা হলে জিজ্ঞাসা করতাম, “কলকাতায় না ফিরে কি ভালো করলেন বটুকদা।”

বটুকদা হেসে বোধহয় বলতেন, “ভাধ কলকাতায় আর না ফিরে ভালোই করেছে।”

বিজ্ঞান ভট্টাচার্য

করুণ্য বিদ্যাবী লোকায়ত নট ও নাট্যকার

রমেশ দাশগুপ্ত

পত শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি থেকে বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা নাটকের প্রবর্তন ও প্রসারের শতবর্ষে—প্রথম থেকেই এমন সব নাটক লেখা হয়েছে, যেগুলিকে তত্বানীত্বন চিরায়ত বিশ্ব-নাটকের নিরিখে গুরুত্ব মনে হতেনি সাময়িক স্বাভাবিক সমস্তা নিয়ে রাষ্ট্র নাটক। লোকের রাগ পড়ে গেলে এ নাটকও পড়ে যাবে। এদের কয়েকটা নাটক কিন্তু একশ বছর পরে মঞ্চস্থ হয়েছে মর্শকমণ্ডলীকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। দৃষ্টান্ত দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’।

বাংলা নাটকের এই বিশেষত্ব ব্যতিক্রম নয়, মূলধারা। এর আসল কারণ, বাংলা নাটক পরাধীনতা থেকে মুক্তির সংগ্রামের একাদিক্রমিক গণঅভ্যুত্থানের যে ঘটনাবলি থেকে নরনারীকে গ্রহণ করেছে, সেগুলি পরম্পর থেকে অবিরোধ। এজন্তে এরা চিরায়তের রাজা পেয়েছে।

বিজ্ঞান ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটক এই মূলধারার অন্তর্ভুক্ত। তের শ পঞ্চাশের বাংলার মঞ্চস্থরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক এর বিষয়বস্তু। এই প্রতিরোধ বাংলা নাটকের মূল ধারার প্রকাশ। পড়ে যাওয়া দুঃখ থাক, আগামী এক শ বছরে ‘নবান্ন’ মর্শকমণ্ডলীকে সাহসের জন্তে সাহসের করণীয়কে এবং চিন্তনীয়কে জাগিয়ে রাখবে।

বাংলা নাটকের একশ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সাধনা এবং লড়াই—এর একজন যোগ্য ধারক ও বাহক বিজ্ঞান ভট্টাচার্য। একাধারে নট ও নাট্যকার আরও হয়েছেন। বেশন সিরিশ ঘোষ। বিজ্ঞান ভট্টাচার্যও সেই ঘটনা ঘটিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ভট্টাচার্যের সৃষ্টি এক অবিভীতির সৃষ্টি।

তিনি বাংলার প্রথম বিপ্লবী লোকায়ত নট ও নাট্যকার। নাটক লেখা ও তার নট হিসেবে তিনি যেমন উৎসর্গিত একাধিক্রমে বিপ্লবে, তেমনি একাধিক্রমে লোকায়তে। এর আগে এমনটি আর কেউ করেননি। বিপ্লবী নাটক ও নটকে গত একশ বছরে আমরা আরও পেয়েছি, কিন্তু এই দুটির সর্বাঙ্গিক সম্মিলিত সম্মিষ্ট রূপ দিয়ে বিজন ভট্টাচার্য প্রবর্তন করেছেন নবযুগের। গত শত বর্ষের একমুঠি তিনি, আবার আগামী শতবর্ষের স্রষ্টা তিনি। বাংলা নাটকে লোকায়ত চিন্তা ও জীবনের প্রয়োগ রবীন্দ্র-নাথও করেছিলেন। ‘অচলাতন’ এবং ‘এমনকি’, ‘রক্তকরবী’ নাটকে এসেছে লোকায়তন বস্তুবাহী লৌকিক পরিবর্তন। আরও কারো কারো লেখায় লোকায়ত এসেছে। কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবায়’ থেকে শুরু করে ‘যেবী-পূর্ণন’—প্রায় প্রত্যেকটি নাটকের পরিমণ্ডলই লোকায়ত। একটিমাত্র বড় নাটক ব্যতিক্রম, সেটি ‘অবরোধ’। সম্ভবত, নাট্যকার এই নাটকটিতে বহু-শিল্পের কর্মীদের কোনো লোকায়ত প্রতীকের আবর্তে যেখানে পারেন নি বলেই এই ব্যতিক্রম। চেষ্টাও ছাড়েননি। তার প্রমাণ ‘চলো সাগরে’। বহু-শিল্পের কর্মীদের জীবনকেও তিনি এখানে লোকায়ত পরিমণ্ডল দিয়ে আগা-গোড়া মুড়ে দিয়েছেন। অবশ্য এমত তাঁকে অমাহুয়িক পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে। কলকাতার শহরতলীর কারখানার মজুরদের বহুভাবী ও বহুসংস্কৃতিতে যে লোকায়ত ভিত্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে, তাকে তিনি দৃষ্টগোচর শ্রবণগোচর করেছেন। এমত্রে তাঁকে গানের আল্প্রয় নিতে হয়েছে।

লোকায়ত রীতিনীতি ও চিন্তা ও বস্তুমহিতা প্রয়োগ তিনি যেমন গীতি-নাট্য ‘জীবনকল্পা’ লিখেছেন ওয়া নিয়ে, তেমনি নাটকের পর নাটক লিখেছেন। আউল বাউল কীর্তিনিয়া নিয়ে।

কিন্তু ব্যাপারটা গীতিপ্রবণ থাকেনি। এই সঙ্গে আর একটি অভিজ্ঞা প্রযোজ্য। সেটি ‘বিপ্লবী’। এই বিপ্লব বাস্তববাহী। তার নাটক বিয়োগাঙ্গিক, কারণ, বিপ্লবীদের প্রাণ দিতে হয়েছে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে যেমন লোকায়ত দৃষ্টি সর্বাঙ্গিক, তেমনি বিপ্লবও সর্বাঙ্গিক।

যে হাজার-হাজার বছরের লৌকিক চিন্তার বস্তুতাত্ত্বিকতা-সম্মত রীতি-আচার ধ্যানধারণা থেকে একেবারে লোকায়ত প্রতীকের উদ্ভব ও তার পরিমণ্ডল, তাদের খণ্ডিত না করে কিংবা বিন্দুমাত্র অবমূল্যায়ন না করে একটা সম্পূর্ণ নতুন লোকজগৎ গড়বার নিরন্তর সংগ্রাম হচ্ছে বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ও নটজীবনের প্রাণ-সজ্জা।

অল্প বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন কোন শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবীর সম্পর্কে আসায় সুযোগ, প্রাণীণ জীবনে ও নিপীড়িত কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং প্রগতি লেখক সংঘ ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ বিজ্ঞান ভট্টাচার্যকে আদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতার বিপ্লবে একান্ত করেছিল। বিপ্লব ও 'লোকায়ত' এই দুটি অবিভাজ্য অভিদা লৌকিক রৌচিকতার মধ্যে যে ব্যক্তিক চারিত্রিক সূত্র কালের সর্বস্বরের দাবিদার, তাকে অন্তর নিভুড়ে প্রকাশ করার ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দেবার ক্ষেত্রেই সম্ভবত বেঁচে থাকার শেষ মনটিকে পূর্বসূরী তাঁকে প্রধান নটের কাহণ্য করতে হয়েছে তাঁর নিজের লেখা নাটকে।

লোকায়ত জীবন দর্শনের প্রতীকে তিনি আশ্রিত করেছেন শ্রমজীবী জনগণের সেই শ্রেণীগত অত্যাধিকারকে, যার মধ্য দিয়ে সমস্ত শোষণ, ক্রন্দন ও অশ্রুচক্ষুর অবসান ঘটানো সম্ভবপর বলে তিনি মার্কসীয় দর্শন থেকে জেনে নিয়েছিলেন। কবিতারা করেছিলেন তিনি মার্কসবাদ লেনিনবাদকে।

লোক জীবনের উপস্থাপন বাতে বস্তুনিষ্ঠ হয় স্বেচ্ছান্তে লোকায়ত প্রতীক নিয়ে বিজ্ঞান ভট্টাচার্য যে চর্চা করেছেন, সেটা যেন তাত্ত্বিকের ধ্যানস্থ হওয়া। কিন্তু এটাও তিনি সম্ভব করেছেন যে, হাজার হাজার বছরের লৌকিক প্রতীকের কোন মোহকেই তিনি গ্রাস করেন নি। লোকজীবনকে তার বিপ্লব সঙ্ঘার সাঙ্ঘার ব্যাপারে কোনো দ্বিধা আসেনি তাব মনে।

তাঁকে চম্ভিশ, পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকের বিশ্ববিপ্লবী আবহে রেখে দেখলে তাঁর এই মোহহীনতার একটা পরিষ্কার কৈক্লিস্ত পাওয়া যেতে পারে।

অবশেষে ও অন্ত সর্বত্র অপ্রতিরোধ্য বিপ্লবী গণঅত্যাধিকারের ও গণ আগ্রহের বাস্তব সংঘর্ষন তাঁকে শক্তি স্তুগিয়েছে। তবু একটা ষটকা থাকতে পারে। লোকায়ত প্রতীক বা আবহ বা রীতির ব্যবহার বস্তুতাত্ত্বিক হওয়া সত্ত্বেও শক্তি জোগাবার সঙ্গে সঙ্গে অবিরোধিতাও সৃষ্টি করতে পারে। বিজ্ঞান ভট্টাচার্যকেও লোকায়তের ব্যাপারেই অবিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। লোকায়তে যে আধিমিতা কিংবা আবহমানতার সত্যশব্দ, তাতে বস্তুতাত্ত্বিকতার সাপ্তাত্তেও গুণগত উত্তরণের অবকাশ নেই। অথচ বিশ্বকে বদলাবার এবং নিজেদের বদলাবার অস্ত্রে এই গুণগত উত্তরণের উল্লক্ষন অপরিহার্য। একথা ঠিক যে, লোকায়ত প্রতীককে গণবিপ্লবে ব্যবহার করা সম্ভব, কারণ এর মধ্যে লোকজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার বস্তুতাত্ত্বিক

উপকরণ রয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এই প্রতীককে তারাও ব্যবহার করার অস্ত্রে প্রয়াসী হতে পারে বারা হিতাবস্থার শোষণ ব্যবস্থাকে বজায় রাখার অস্ত্রে পুরাতনকে আঁকড়ে ধরার স্থপারিশ করে। লোকায়ত প্রতীকের বৈশ্ববিক উপকরণ শুলোকে পাঠ করার অস্ত্রে নিছক পুরাতনের উপকরণ শুলোকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে সাম্রাজ্যবাদ ও তার ভাবদায়রা।

স্বতন্ত্রাং বিজ্ঞান ভট্টাচার্যকে লোকায়তকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বাহ্যবিচার বাড়াই বাড়াই করতে হয়েছে। কাজটা হয়েছে তাই শুকতরুর কবের পরিশ্রমসাধ্য। কঠোর সাধনসাধ্য। কয়েকটা কথা কানে এল, আর সংলাপ তৈরি করলাম, কিংবা একটা ছুর কানে এলো আর গান বেঁধে ফেললাম, এত অক্ষম হয়নি ঘটনাটা। বয়ং ভাটিতে উঠানে ঠাঁড় টানতে হয়েছে অনেক সময়। কিন্তু নদী তিনি প্রধানত একটাই বেছে নিয়েছিলেন। সেটা লোকায়ত। আর এই নোকারতের গহীনেই বাংলা নাটককে বিপ্লবের বাহক করেছিলেন।

এখানেই তাঁর অনন্তপূর্বতার সবচেয়ে বড় স্বাক্ষর। তিনি অনন্তপূর্ব এই অস্ত্রেও যে, তিনি অবিরোধিতাকে জয় করেছেন। যে প্রমত্তবী নরনারী একালে বিপ্লবের পুরোধ, তাদের সত্তার মজ্জার মজ্জার লোকাচার মিশে থাকায় তাদের পরিপূর্ণ বিপ্লবী বিজ্ঞানের অস্ত্রে এই লোকাচার সম্বন্ধে জান-বোধ ও সহমর্মিতা চাই-ই-চাই। এই লোকাচার তিনি জুগিয়েছেন। চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলনের গোড়াপত্তনে এটা ছিল একটা মূল উপকরণ। কবিদালরা এনে ঠাঁড়িয়েছিলেন গণমুখী আধুনিক লেখক-লেখিকা ও শিল্পীদের পাশে এই তাসিমেই। বিপ্লবের সাধারণ গুণনীয়কটিকেও অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল এই সঙ্গে। লালপতাকা নিয়ে সামনে এসিয়ে চলেছিল প্রমিত শ্রেণী। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের এবং সাম্যবাদী বিশ্ব-বিপ্লবের আক্কেল আঁকা হয়েছে এই পতাকায়।

বিজ্ঞান ভট্টাচার্য এই সাধারণ গুণনীয়কটিকে দেশের মাটিতে গভীরতম শিকড়ে-শিকড়ে বুকে নিতে পেরেছিলেন। তিনি হয়েছিলেন গণনাট্য-আন্দোলনের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কর্মী। সফলতার অভিব্যক্তি করেছিলেন তিনি গণনাট্য আন্দোলনকে, লোকায়তকে বিপ্লবে পরিপূর্ণভাবে বিস্তৃত করে।

বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের বিপ্লবী লোকায়তের উপকরণের সবচেয়ে বড় অংশ জুগিয়েছেন বিজ্ঞান ভট্টাচার্য।

উপরোক্ত কৃতিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গবৎ হিসেবে বিজন ভট্টাচার্যের নাট্য-কর্মের ছুটি বিশেষত্বের এখানে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে। এই বিশেষত্ব দুটি তাঁকে লোকায়তের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী গণনাটকের অন্তর্ভুক্ত করার সঙ্গে অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার সম্পর্কে অড়িয়েছে।

প্রথমত, অনন্ত নট ও নাট্যকার হলেও যেহেতু একটা নতুন পর্বের তিনি প্রবর্তন করতে চেয়েছেন এবং যেহেতু এই নতুন পর্বে ব্যক্তি ও সমূহ পরম্পরের পরিপূরক, সেজন্যে রীতিপদ্ধতি ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে নিজেকে তিনি নিঃশেষে উৎসর্গ করেছেন সম্মিলিত বৈপ্লবিক নাট্য উদ্ভোগ। গণনাট্য আন্দোলন যখন বহুধা বিতর্কিত, তখন লোকায়ত ধারার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো কোনো সময়ে একক হয়ে পড়লেও বিচ্ছিন্নতা-বাদের শিকার হতে যেন নি তিনি নিজেকে।

তাঁর এই সম্মিলিত বৈপ্লবিক উদ্ভোগে উৎসর্গিত রূপটিকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের কয়েকজনের, তাঁকে যখন প্রথম দেখি ঢাকায় ১৯৪৪ সালে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে। কলকাতার গণনাট্য সংঘ ‘অবানবন্দী’ নাটক, নবজীবনের গান, মহাস্বামী নৃত্য ও মধুবাসীর গানের সম্মিলিত কার্যক্রম এবং সম্মিলিত শিল্পীদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল ঢাকায়। বিজন ভট্টাচার্যকে দেখেছিলাম অল্প সব শিল্পীদের সঙ্গে এক হয়ে বিশেষ হয়েছেন। তখন তাঁর চোখেমুখে যৌবন বহি। বয়স ছাষিশ-সাতাশ। নবজীবনের গানের রূপবান সুবা ও উদাত্ত কণ্ঠস্বরের অধিকারী গায়ক বিজন ভট্টাচার্যই অবানবন্দীতে ছুঁতকপীড়িত রূপলাবণ্যহীন রক্ত বিলোহী চাবীর ক্ষুরিকায় অভিনয় করলেন।

বুঝে নিয়েছিলাম, এই শিল্পী সত্য সত্যই জনগণের শিল্পী, নিজেকে বিপ্লবে উৎসর্গিত করতে সক্ষম, অস্ত্রধারণ সঙ্গে নিতে সক্ষম।

তাঁর সঙ্গে একই সাথে সেদিন কিংবা পরে কাজ করেছেন এরকম দুজনের কথা মনে পড়ে যায় এই কথার দ্বারা। জ্যোতিরিন্দ্র বৈদ্য ও ঞ্জয়িক ঘটক। নিজেদের উৎসর্গিত করেছিলেন তাঁরা গণ-লোকনাট্য।

বিজন চরিত্রের বিতীর্ণ বিশেষত্বটি এই যে, তাঁর সব কটি নাটকের মধ্যে এবং তাঁর নটজীবনের অন্তরঙ্গতার একটা বিশেষ উপকরণ তিনি নিয়েছিলেন বিপ্লব থেকে। এই উপকরণটি ‘ক্রোধ’। অর্থাৎ বিজন ভট্টাচার্যের আয়েকটি অভিনয়—তিনি রাগী। অন্তর ও অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড রাগী।

কোনো কোনো নাটক দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, এই ক্রোধকে তিনি নিয়েছেন আধুনিক ইউরোপীয় নাটক থেকে।

খুব সংক্ষেপে বলতে চাই, এই ক্রোধের উপকরণ ব্যবহারে তিনি আর্মেন কবিউনিষ্ট নাট্যকার ব্রেথটের সহযোগী, সাথী। বিজন ভট্টাচার্যের ক্রোধ, জীবনের প্রতি বিকার-উচ্ছ্বাসক 'এবসার্ড' নাটকের ক্রোধ নয়। বিজনের ক্রোধ মাহুকের শৃঙ্খলমুক্ত হবার সংকল্পের ক্রোধ।

ব্রেথটের সঙ্গে অবশ্য তার আর কবি উপকরণে সহযোগিতা রয়েছে। সেটি গণসঙ্গীত। অর্থাৎ বিপ্লবের সংগ্রামের লোকগীতি রচনা।

নবজীবনের শিল্পী

দিলীপ বসু

“এই তো সেদিন, ট্রেন থেকে দিল নামিয়ে। হাতের তলার সব্বেরে চাপা-অচল পুরানো টিকিট—। দিল কে নামিয়ে অচেনা দেশে জীবনের ট্রেন থেকে।”

প্রায় আকস্মিক অর্থেই কবি জ্যোতির্বিজ্ঞান মৈত্রেয় ‘মধুবন্দীর গলি’র কথাগুলি সত্য হল। ভারতের অন্ততম সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেনে ২৪শে অক্টোবর রাতে ঘুমের মধ্যে একটি সেকেন্ড ক্লাস কামর। থেকে হঠাৎ ধাবমান ট্রেনের মধ্যে মৃত্যু এসে তাঁকে আমাদের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

বেপরোয়া যে মানুষটি জীবনটাকে তুড়ি মেয়ে কাটিয়ে গেল, বহু বিপর্ষয়ের মধ্যে বার হাঙ্গামা-উল্লাসের কলহারা কখনও শুকিয়ে গেছে বলে জানি না সেই আমাদের পরম প্রিয় বটুকদার সারা জীবনটাকে যদি একটা গান বলে ধরি (এবং ধরলে কিছুমাত্র ভুল বা অতিরিক্তোক্তি হবে না), যে গানের মধ্যে সুরের, তানের, অলঙ্কারের প্রাচুর্যে রসিক শ্রোতাদের মনকে একেবারে ডরিয়ে দেয়, সেই তাঁর জীবনের গান বখন সম্মে এসে থামল, তখন তার পরিসমাপ্তিতে পরম শ্রান্তি। আর রসিক শ্রোতৃমণ্ডলীর মতো আমরা তাঁর গুণমুগ্ধ স্নেহভাজন অগণিত শ্রদ্ধাবৃন্দ আজ নির্বাক।

বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতি কবি জ্যোতির্বিজ্ঞান মৈত্রেয় মৃত্যুতে যে কতখানি হারাল, সে মূল্যায়ন হয়তো একদিন হবে। এই মুহূর্তে তা উপলব্ধি করার মতো কারো মনের অবস্থা নেই, সে চেষ্টাও করব না। আমার মতো আরও অনেকে তাঁর কাছে নানানভাবে গুপ্ত। তার সবিশেষ উল্লেখও এখানে করব না। বটুকদার মহাপ্রয়াণে আমরা পরমাত্মীয় বিরোগজনিত কষ্ট পেলেও শোক করতে পারব না। কারণ যে কবি বাঙলার পকাশের মধ্যদ্বারা নবজীবনের গান গেয়েছেন, তাঁকে আমরা স্মরণ

করতে পারি তাঁর বহু লেখা ও গানের মাধ্যমে। সেই চেষ্টাই খানিকটা করব অক্ষম শিথিল ভায়াক্রান্ত কলম নিয়ে।

ইংরাজি প্রবাহবাক্য অল্পসারে মুখে রূপোর চামচ নিয়ে তাঁর জন্ম, কিন্তু বাড়ির ও মাতুলালয়ের প্রবল স্বদেশীয়ানার বাতাবরণে মাহুব তিনি ছেলেবেলা থেকেও। কলেজ জীবনে কবি বিষ্ণু ঘের সহপাঠী, ত্রিশ দশকে বাঙালার তরুণ কবিধাতাতে অরুণ রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন, কবিগুরুর আশ্রয়ে একাবিক-বার শান্তিনিকেতনে বাস, বার কোঁটুকময় বর্ণনা তাঁর কাছে কয়েকবার শুনেছি।

জ্যোতির্দ্বিত্ব মৈত্র কিছু শুধু কবি নন, তাঁর গানের গলাও ছিল মধুর, জোয়ারিতে ভয়পুত, তার সঙ্গে মিলেছিল বালক বয়স থেকে রূপহী তালিম, পরে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, বাহুল বা প্রভৃতি অনেকের কাছে তালিম। অতীতকে এই ক্যাসিক্যাল সঙ্গীতের তালিমে বার জরি তৈরি হয়েছে, সে পেল ইন্দিরা দেবীর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ও গায়কীতে তালিম। বোবাই বাজে, এই ছইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ দুয়ের কথা, রবীন্দ্রগায়কীর শুদ্ধবাপী রূপহী ঘরে মিলেছে খেয়াল; এই প্রয়াগসঙ্গমে তিনি অবগাহন করার চূর্ণভ সৌভাগ্য লাভ করলেন।

আর এই ক্যাসিক্যাল ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে বার ভিন্ন একেবারে পাকা তার গুপরে যে মাহুব-নিজে কবি, সে যখন গণ-আন্দোলনের ও জনজীবনের পরশ পাথরের হোঁচট পেল তখন একেবারে খাঁটি সোনা তৈরি হল।

১৯৪১-এর ২২শে জুন সোভিয়েত জুরি যখন ক্যাসিক্যাল বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হল কবির বয়স তখন ত্রিশ। তখনই কবি গণ-আন্দোলনে আকৃষ্ট হলেন। ঠিক এই সময়েই আর একজন তরুণতর কবি সূতাব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ‘পর্যাপ্তিক’ আর এর অব্যবহিত পরেই তখনকার তরুণতম লেখক সোমেন চন্দ্র মজা ২১ বছর বয়সে ক্যাসিক্যালের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানাতে গিরে শহিদের মৃত্যু বরণ করলেন ৮ই মার্চ, ১৯৪২।

পকাশের মধ্যদ্বয়ে কবি জ্যোতির্দ্বিত্ব মৈত্রের ‘মধুবংশীর গলি’ (রচনাকাল ১৯৪০-৪৪) আশাঘের মাতিয়েছিল। আশেও মাতিয়েছিল শঙ্কু মিঞার দ্বারাজ কণ্ঠে তাঁর অনবদ্য আবৃত্তি। ২৫ নম্বর মধুবংশীর গলির আকর্ষণ অনেক বার মধ্যে পড়েছে জুধা বাংলায় ছবি, মিলিটারির উৎপাতে কলকাতার বর্ণনা, মধ্যবিত্ত জীবনের বিধাবলম্বিত পদক্ষেপ আর তার মধ্যে ‘বন্দ

অঙ্গে উঠছে উঠছে স্টালিনগ্রাদে, মস্কোভায়, টিউনিশিয়ায়, মহাচীনে।
কাছেই কবি ডাক দিচ্ছেন : “প্রস্তুত করো তোমাদের সেইসব দিনগুলির
অন্ত / যখন প্রত্যেক সূর্যোদয়ে পাবে নবজীবনের স্রোত।”

সেই “নবজীবনের স্রোত” লিখলেন কবি তাঁর ‘নবজীবনের গানে’,
যেটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে অন্তত আমার মনে হয়। পটভূমি বাংলার
পঞ্চাশের মহত্তর—কলকাতার পথে পথে বুদ্ধা-প্রদীপিত মালবের তখন
ডাক আবার উঠেছে ‘ক্যান্ দাও।’ সেই ডাককে সুরে বসিয়েছেন
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—এ তো বীটোভেন-চায়কোভ্‌স্কির সমপোজীয় কাজ।

আর নবজীবনের গানের কথায় লড়ে সুরের মিল যেন হরপৌরী মিলন।
রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এতবড় কাজ যিনি করেছেন সেই দ্বিতীয় নাম
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, এটা শুধু আবেগের কথা নয়—প্রমাণ করার কথাসাধ্য
চেষ্টা করব।

“পথে পথে শকা—আ-আ—পথে পথে শকা”—রাগ মালকোশ বা মালব-
কৌশিক। বটুকথা নিজেই কোথাও লিখেছেন যে, মালকোশকে তিনি দরবারী
সাজ থেকে জনগণের মাঝে বসিয়েছেন।

“হিংসা হেনেছে কতো অল্প ধর্মিতা পৃথীয়ে করেছে বিবজ”—রাগ দুর্গা।

“দামা দামা বেজেছে, দামা বেজেছে, চারিদিক রণরঙ্গে মেতেছে।
কোটি সিংহের জুড় কেশর, ফুলে ফুলে গুঠে’...রাগ হিম্মোল।

যেটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে,—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁর সহজাত
অপিচ বিদ্বৎ সাংগীতিক প্রতিভাতে যে রাগগুলি নির্বাচন করেছেন,
মালকোশ, দুর্গা, হিম্মোল—সবগুলিই ঐড়ব আতের (পাঁচটি পর্দার সমাবেশ)।
আর নিশ্চয়ই তুপালীর ধরচ পরিবর্তন করে গান্ধারকে বড়জ করে মালকোশ
বা পঞ্চমকে বড়জ করে দুর্গা অথবা কোমল পর্দা এনে ধরজ পরিবর্তন
করলে হিম্মোল পাওয়া যাবে। আর একথা তো খতঃসিদ্ধ যে লোকসঙ্গীতের
মূলে রয়েছে তার সাধারণ অনায়াসলব্ধ গঠনতন্ত্র, যেটা পল যোবসন থেকে
সবাই বলে যেন—লোকসঙ্গীত হবে পেটোটিলিক বা ঐড়ব আতের।

কাছেই এই ক্লাসিকাল বা দরবারী সাজের রাগগুলির পাশাপাশি যখন
বটুকথা নবজীবনের গানে লোকসঙ্গীত ব্যবহার করেন, ভাসানের গান,
সারিগান প্রভৃতি—উদাহরণস্বরূপ “ও শহরের বন্ধু রে, ঘরের বার করলো দেখি
আমারে”। অথবা “সারি সারি নৌকা...বজবুত হয়ে গেছে হাত” ইত্যাদি

ইত্যাদি, তখন ক্লাসিকাল ও লোকসংগীত মিলেমিশে যে সামগ্রিক স্রসংবদ্ধ রূপটি আমরা পাই 'নবজীবনের গানে', তার তুলনা কোথায়।

অবশ্যই ক্লাসিকাল সংগীত এসেছে দেশী সংগীত বা লোকসংগীত থেকে। মার্গ সংগীত বা শাস্ত্রীয় মতে মনোচ্চারণ মাত্র নয় এ মত অবশ্য আদর্শকে বামী প্রজ্ঞানানন্দ থেকে অনেকেই হুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তাই তো দেখি, আলি আকবর খাঁ সাহেব, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, বিলারেং খাঁ সাহেবের হাতে বাংলার লোকসংগীত কেমন অনাদ্যাসে বাজতে পারে একেবারে দরবারী সংগীতের সঙ্গে, বিশেষ করে বখন তাঁরা রাগমালা বাজান বা শেষ আসরে তৈরবী। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলব এখানেই আলি আকবর-রবিশঙ্করের এতো অগংগোড়া খ্যাতির রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। তাঁরা ক্লাসিকাল সংগীতকে পুরো দরবারী সাজেই লোকসংগীতের মাঝে নিয়ে গেছেন।

অমিত শক্তির এই মাছুষটি সৃষ্টি করে গেছেন অনেক কিছু, বার বেশ-ধানিকটা হারিয়ে গেছে বা যেতে বসেছে বলেই আমার ধারণা। কারণ বটুকুটা অয়েছিলেন আতশিয়ার মানস নিয়ে, সৃষ্টি করেই বার আনন্দ-কিন্তু নিজের সৃষ্টিকর্ম-সম্পর্কে যিনি উদাসীন। একটা উদাহরণ দি। বাধীনতা-উত্তর যুগে নানা অবস্থার ক্ষেত্রে বটুকুটা বখন প্রায় বাধ্য হবে যিল্লীর কলাক্ষেত্রে চাকরি নিলেন এবং সেখানেই প্রায় ১৫ বছর কাটালেন তখনও কিন্তু চাহুরিয় তাসিফ থাকলেও তিনি সৃষ্টি করেই চলেছেন। রামলীলাতে সুরারোপ এবং নতুন ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই মৌলিকত্বের দাবি রাখে, এবং বটুকুটার সাঙ্গীতিক প্রতিভার স্বাক্ষর কিন্তু কখনই বা সেকথা জানে।

জীবিরোগের পরে বটুকুটা বখন আবার কলকাতায় ফিরে এলেন তাঁর সেই নতুন উদ্ভবে আবার নতুন করে প্রিয় কলকাতায় কাছকর্ম শুরু করলেন। এই প্তত করেক বছরে আমার পরম সৌভাগ্য ও অক্ষয় সম্পদ লাভ হয়েছে। বখন এক-একদিন সকালবেলা, অবশ্যই আগে থেকে কোনো খবর না দিয়ে বা যিনি ঠিক না করে তিনি আমাদের বাড়িতে সকালের দিকে এসে হাজির হতেন, সেদিন অল্প যে কোনো কাজ সৃষ্টিত রেখে কেবল তাঁর সঙ্গে আলাপ। আলোচনা কোন খাতে বইবে সেটা নিশ্চয়ই আগে থেকে ঠিক নেই, তবে আমার সঙ্গে প্রায় সবদিনই সংগীত নিয়ে আলোচনা হত। বেশির ভাগ সময়ই আমি বা আমরা ছিলাম মুগ্ধ শ্রোতা। অনর্গল বর্ণার মোতের মতো কথা বলে যেত এবং মাঝে মাঝে উৎসাহের চোটে কোনো পয়েন্টে উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার অল্প পলাতে হুঁর তাঁকতেন। চুপি চুপি বলি, আমার হু-

একবার ছুটুমিও ছিল—আলোচনাকে এমন জায়গায় নিয়ে ফেলতে যাতে তাঁকে পলাতে গান তুলে বোঝাতে হয়।

বিষ্ণু যে ‘স্বস্তি সত্তা-ভবিত্বং’ বইতে, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাবার পরে, তাঁর কবিতাতে গানের ছর দিয়ে বেন পদপুরণ করলেন বিষ্ণু দেব আকেশোর বহু, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। কবিতা ও গান মিলিয়ে নতুন একটা রূপ আমরা এতে পাই। প্রসঙ্গত, এই পরীক্ষা অন্তরঙ্গও হয়েছে। আলি আকবর খাঁ সাহেব লংগুয়েজ রেকর্ডে ফরাসি কবি বদলেয়ায়ের ‘ছুর ছা মাল’ কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে যে সরোব বাজিয়েছেন, তাতে ললিতা-গৌরীর মতো রাগ নির্বাচন আশ্চর্যভাবে কবিতার মেজাজের সঙ্গে মিলে গেছে।

মৃত্যুসাগর মন্বন করে যে কবি জীবনের লক্ষ্যকে অভিবেক করে গেছেন তাঁর তো মৃত্যু নাই। তাঁর লেখা ও বিশেষ করে ‘নবজীবনের গান’ প্রেরণা যোগাবে উত্তরপুরুষকে ছুনিয়াতে শান্তি ও সমাজতন্ত্রের অস্ত্র মহাসংগ্রামে, যে মহাযজ্ঞে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

আমরা আমাদের অন্তরের সকল প্রহ্লা ও ভালোবাসা উন্মোচিত করে অর্ধ নিবেদন করি তাঁর উদ্দেশে। তাঁর আরও কাজ চালিয়ে যাবার মহা অধীকার রয়েছে আমাদের সকলের।

বটুকদাকে যেমন দেখেছি

অলকানন্দা গুহ

[এবার সাপ্তাহিক পরীক্ষা দিয়েছে]

এক

ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সেই পানের জ্বরটা এসে মনটাকে নাড়া দিয়ে যেত। জ্বলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর জন্ত রিহার্সেল চলছিল। জ্বরটা বেন কেমন,—হঠাৎ লাগিয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, বুকটা কেমন টনটন করে ওঠে।

সেই অচুটানেই জনলাল সেই অবাক করা ‘নবজীবনের গান’। তার সঙ্গে চিনলাল এর রচয়িতা—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে। এই যে পরিচয়ের স্মৃতিপাত, তারপর থেকে কেমন করে যে কাছাকাছি চলে এলায় এই মানুষটি, কবে যে তাঁর ‘জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র’ নামের মন্ত বড় পরিচয়টা খসে গিয়ে নেহাৎই ‘বটুকদা’ হয়ে গেলেন, তা খোঁজাই করিনি। অথচ তাঁর সঙ্গে আমার কদিনের বা পরিচয়? নাটকের মহড়ার, পানের আসরে বডুটুক দেখা হয়েছে, তারই মধ্যে কত আপন, কত কাছের মানুষ হয়ে গেলেন। নিজেরই উপচে পড়া খুশির বেগে নিজেই তিনি হড়মুড়িয়ে আপন করে নিলেন, আলাপ করার সুযোগ দিলেন না। পরিচয় হতে না হতেই কত সহজভাবেই বললেন, “তুই তো আমার আপন লোক, কী বলিস?” আমি শুধুই আশ্চর্য হয়ে বাই তাঁকে দেখে। এমন লোকও হয়? জুলভাতার বক্তৃতা শুধোণ নেই, কৃষ্ণমতা-ভক্ততার আবরণ নেই লেশমাত্র, হাসি পেলেই হেসে ফেলেন, আনন্দ হলেই গেয়ে ফেলেন, কী আশ্চর্য! কত সহজেই আমাদের বাড়িতে আসতে রাজি হয়ে গেলেন, গীড়ানীড়ি করতে হল না একটুও। বড়মানুষ-জুলভ আচরণ নয় তো এটা! অনেক মেধা আমার

বাকি আছে এখনো, কিন্তু এপর্যন্ত এমন অভূত লোকের দেখা পাই নি। কোনোদিন দেখা পাওয়া যায় কিনা জানি না।

অভিনয় হচ্ছে 'গুরু'র। বটুদা পরিচালনা করছেন। সেই প্রথম অল্পস্বল্প করলাম, 'অভিনয়'-ও একটা শিল্প। বটুকদা আমাদের অনাড়ম্বর মনগুলিতে চরিত্রোপযোগী অল্পভূতি আগাবার আশ্রয় চেষ্টা করে চলেছেন। অবাক হয়ে দেখতাম, কেমন করে বিপরীত দুটো চরিত্রের অভিনয় একসঙ্গে দেখিয়ে চলেছেন বটুকদা, প্রত্যেকটা কথার মুখের রেখাগুলি কেমন করে বদলে যাচ্ছে, আর বটুকদা মুখের দিকে চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন করে প্রত্যেকটা চরিত্রের প্রত্যেকটা অল্পভূতি আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। এমন করে নিজের মন দিয়ে সকলের মন স্পর্শ করতে, নিজের প্রত্যেকটা অল্পভূতির দোলায় অন্তরের ছলিয়ে দিতে আর কাউকে কখনো দেখি নি।

'নটীর পূজা' অভিনয়ের সময়ও দেখেছি, বটুকদা যখন আশ্চর্য চক্রে বলেছেন, "ভেবে দেখ, তুই সেই চরিত্র, যার মধ্যে..." কত সহজে তখন সেই চরিত্রটা উপলব্ধি করতে পেরেছি তাঁর উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে, চরিত্রটার স্রুতে স্রুতে অনেক বেশি ভুবিয়ে দিতে পেরেছি নিজেকে—তাঁরই প্রত্যেকটা অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে। অন্তর্কে উপলব্ধি করাবার এই ক্ষমতা আর কারোর মধ্যে দেখি নি। মোটামুটি অভিনয় করে নাটক 'উৎসব' দেওয়া নয়, অভিনয়ের শিকড় গেড়ে দিয়েছেন তিনি মনের মধ্যে। যে কোনো চরিত্র অভিনয় করার আগে চরিত্রটা বুঝিয়ে দিতেন বটুকদা। এই 'বুঝিয়ে দেওয়াটা'ও আশ্চর্য। আশ্চর্য সহজভাবে ডাক দেওয়া যেন—"আর, আরো চরিত্রটার মধ্যে হারিয়ে ফেলি নিজেকে।" এ বেন লুকোচুরি খেলা বা সাতার কাটার ডাক। বেন এর চেয়ে সহজ কিছুই হতে পারে না। আর সত্যিই, তেমনি সহজ-স্বাভাবিকভাবে নিজের অস্তিত্ব ফুলে সকলকে নিয়ে ভুব্ব দিতেন চরিত্রগুলির গভীরে। কী করে যে নাটকের যুগ, নাটকের চরিত্র, নাটকের ঘটনাগুলি আবিষ্ট করে ফেলত আমাদের, বুঝতেই পারতাম না।—এই প্রথম 'নাটক' জিনিসটাকে ভালবেলে ফেললাম।

এই ছুই নাটকের মাঝখানে অনেকগুলি দিন কেটে গেছে। 'নবজীবনের গান' শিখেছি বটুকদার কাছে। তাছাড়া আমাদের ফুলের যে কোনো গানের অল্পটানেই বটুকদা ঝেঁকেছেন পরিচালক হিসেবে। সেখানেও দেখা হয়েছে। গানেই বটুকদাকে পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। স্রবের মধ্যেই

তো যত্ন হইবে থাকেন সবসময়ে, আর আপনা থেকেই গেয়ে ওঠেন মাঝে মাঝে। গলাটাও ছিল অতৃপ্ত। এবারসেও সকলের গলা ছাপিয়ে উঠত। যেখানেই বটুকদা সেখানেই গান, আবার যেখানেই গান সেখানেই বটুকদা। স্বষ্টির অন্ত বাড়ি কিরতে পারছি না, বটুকদা গান ধরলেন বিনা ভণিতায়। একটু পরে দেখলাম আমরাও গাইছি তাঁর সঙ্গে।

আরেকদিন, ক্লাসের আগে সকলে অড়ো হয়েছি গানের জন্ত, বটুকদা বেরিয়ে এসে শুরু করে দিলেন। তাঁর টগবগে উৎসাহের ছোঁয়ায় সমস্ত ছেলেমেয়ে গেয়ে উঠল। এত উৎসাহে, এত জোরে আর কখনোই আমরা গাইনি। বঁারা ভেতরে ছিলেন ছুটে এলেন দেখতে—কিসের স্পর্শে আমাদের গলা এমন দরজা হল।

সিঁড়ির পাশে, অকিসের ধারে মাঝে মাঝেই দেখা হত বটুকদার সঙ্গে। হৈ চৈ করে ডাক দিতেন—“আরে, তুই কি আমার ভুলে গেলি?” প্রতি যুর্তে, প্রত্যেকটি কথায় রাশি রাশি আনন্দ যেন কেনিয়ে উঠে-উপচে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। প্রাণের বেগে আশেপাশের সকলকে ভাসিয়ে নিচ্ছে যেন। বটুকদার ওই খুশিতে টলটলে মুখটা দেখলেই মনটা কেমন আপন। থেকে আনন্দে ভরে ওঠে। কোনো কিছুই বিরুদ্ধেই যেন তাঁর কোনো অভিযোগ নেই। সবকিছুই তাঁর কাছে মজার। এমন করে সমস্ত আনন্দরিকতা দিয়ে মানুষকে, পৃথিবীকে কেউ যে ভালবাসতে পারে, তা এর আগে ভাবতেও পারতাম না।

শেষ বেদিন দেখা হল, চোখমুখ উজল করে বলে উঠলেন, “আচ্ছা, ‘ক-ব-ব-ব-ল’-এর সেই বুকের কথা যদি সত্যি হত, বয়সটা যদি চল্লিশের পরেই কমে থাকত, তাহলে কেমন মজা হত বলত?” তারপরই সেই প্রাণখোলা হাসি, ব্যার স্পর্শে নিমেষের মধ্যে মনটা উনার প্রশস্ত হয়ে ওঠে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। বন্ধ ঘরে পুবে-বাতাসের মতো, একরাশ জুইয়ের গন্ধের মত সেই হাসি চারপাশের পৃথিবীটাকে অনেক বড় করে দেয়। আর ঐ হাসির মতো, হঠাৎ করে আলা আগিয়ে তোলা বাতাসের মতই বটুকদা পেতে না পেতেই মিলিয়ে গেলেন, কিন্তু স্পর্শটা থেকে গেল। তাঁর মনের রস্তের মতই শেষ পর্যন্ত এই কথাটাই জেগে রইল—“আশ্চর্য!”

যে বটুকদা আমাদের খুবই পরিচিত ছিলেন

সরসিজ সেনগুপ্ত

[বটু বেগী]

বটুকদাকে আমি কতটুকুই বা দেখেছি, আর কি বা জানি বটুকদার সম্বন্ধে। কিন্তু তবুও যেদিন তখনলাম যে বটুকদা আর আমাদের মধ্যে নেই তখন বেন মনে হল কত আপনজন চলে গেলেন আমাদের মধ্যে থেকে। বটুকদার কথা বলতে গেলে বলতে হয় আমার ক্লাস থি রেয় গোড়ার কথা।

১৯৭৪ সালে আমি এক বছরের জন্য বিশেষ কারণে দিল্লী গিয়েছিলাম। তারপর যখন ১৯৭৫ সালে কলকাতায় এসে আবার পাঠভবনে ক্লাস থি রেয় পুরনো বন্ধুদের মাঝে ফিরে এলাম, তখন দেখি সবার মুখে শুধু একই কথা বটুকদা মিস্ আর বটুকদা মিস্। কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারিনি কে এই বটুকদা মিস, কে তিনি?

একদিন আমি ক্লাসে বসে, বসে ভাবছি—ক্লাস থি থেকে ফোরে উঠতে চললাম আর পাঁচমাস মাত্র বাকি কিন্তু এখনও আমার বটুকদাকে চেনা হলনা—এমন সময় ক্লাসে ঢুকলেন আমাদের গানের টিচার রঞ্জনামিস্ অর্থাৎ রঞ্জন সেন। ঢুকে বললেন, “ভাজ আমি তোমাদের গানের ক্লাস নিতে পারবনা, আজ তোমাদের গানের ক্লাস নেবেন বটুকদা।” আমি আনন্দে নেচে উঠলাম। ভাবলাম আজ তবে আমার বটুকদা মিসের সঙ্গে পরিচয় হবে। কি রকম দেখব তাকে? রাগী না মজার, মোটা কি রোগা?

গানের ক্লাসে অর্থাৎ হলে যখন ঢুকলাম দেখি চেয়ারে এক ভদ্রলোক বসে বসে পান চিবুচ্ছেন, পায়ে খয়েরি খড়রের পান্জাবি, সাফা হুতি, চোখে খয়েরি রঙের মোটা ক্রেমের চশমা, পায়ে কাব্‌লি চমল—চেহারা দেখে মনে হল ইনি নিশ্চয় ভীষণ রাগী হবেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সে ধারণা ভেঙে গেল। বুঝতে পারলাম ইনি ককনো রাগী হতে পারেন না

ইনি নিশ্চয় খুব মজার। গান করাতে করাতে বটুকদা মিস হঠাৎ খুব মজার একটা কথা বললেন, সেটা হচ্ছে যে, “তোরা আমাকে বটুকদামিস কেন বলিস রে? আমার কি মিসেদের মত বড় বড় চুল আছে?” তারপর থেকে বটুকদাকে কেউ আর “বটুকদা মিস” বলে ডাকে নি।

সেই সময় আমাদের খুলে লাল-কালোর রিহাসাল চলছিল। একদিন বটুকদা আমার লাল-কালো করার অভ্যাসে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছু গান ও কবিতা শেখালেন তারমধ্যে আমার একটা কবিতার সুর খুব ভাল লেগেছিল সেটা হচ্ছে—**সু-টি-সুটি, গি-রগি-টি, নিঃ-সাড়ে বায়...**,

জি-উ-গর, লবল-বি পোকা-ধ-রি খায়।

একটা গানের সুর খুব ভাল লেগেছিল কিন্তু সেটা এখন আর মনে নেই। কিন্তু কেন জানি না আমাদের লাল-কালো আর হল না।

বেশ কিছুদিন পরের কথা আমি তখন ক্লাস কোরে উঠে গেছি, এরকম সময় একদিন বটুকদা আমাদের কয়েকজনকে নিচে হলে ডাকলেন। আমরা লাফাতে লাফাতে গেলাম, গিয়ে শুনলাম কাল থেকে আমাদের আবার রিহাসাল হবে তবে এবার লাল-কালোর নয় বুদ্ধু-ভুতুমের। শুনে আমাদের যেমন আনন্দ হল, আবার সন্দেহও হল হবে তো? (এই নাটকটা শেষ পর্যন্ত হয়েছিল।) আমরা সবাই যে বার ক্লাসে চলে গেলাম। তার পরের দিন আমরা হলে গিয়ে বসে আছি বটুকদা তখনও আসেন নি। এমন সময় ঘপাস করে একটা আওয়াজ শুনে আমরা চমকে উঠে পেছনে তাকিয়ে দেখি, হলে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ করে কাবলি চম্বল ছিঁড়ে বাওয়াতে বটুকদা মেঝেতে পড়ে গেছেন আর তার ফলে চশমাটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে খুলে গেছে তবে চশমাটা না পড়ে বটুকদার কানের সঙ্গে আটকে গেছে। কিন্তু বটুকদা এসব খেয়ালই না করে মাটি থেকে উঠে পড়ে পাঁচ মিনিট ধরে “আমার চশমা কোথায় গেল? আমার চশমা কোথায় গেল?” করে খেয়াল করলেন চশমা কানেই লেগে আছে। একদিন আমরা চারবজ্র একসঙ্গে কে কি খেতে ভালবাসি তাই নিয়ে আলোচনা করছি এমন সময় বটুকদা সেখানে এসে বললেন, “জানিস খাওয়ার ব্যাপারে কখনো কোনো সনিক্তা করতে নেই যেমন ধর কেউ তোকে চারটে মিষ্টি দিয়ে বললো আর ছোটো দি? তুই খবরদার না বলবি না, বলবি হ্যাঁ দিন”। এইসব হাসি ঠাঠার মধ্যে দিয়ে বটুকদা আমাদের রিহাসাল করতেন। আমি নাটকে বড় রাজপুত্র অভিনয়

ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭৮] যে বটুকরা আমাদের খুবই পরিচিত ছিলেন ১৭৭

করেছিলাম। যেদিন রিহার্সাল থাকত আমি ও বাকি কজন রাজপুত্র নির্ধািত বকুনি খেতাম বটুকরার কাছে ঘোড়ায় চড়ার ভান করতে পারতাম না বলে।

এসবের পর বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে আমি ক্লাস কাইডেও উঠে গেছি। বটুকরার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়, খুব বেশি আর দেখা হয় না। এককম সময় একদিন আমার হাম জ্বর হল। সেই সময় আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল যেদিন বটুকরা আমার একদিন জুপুরে ঘেঁষে গেলেন আর আধঘণ্টা খাট বাজিয়ে ভক্তন শোনালেন। তার কিছুদিন বাধে দাঁড়াই হঠাৎ কলেজ থেকে হতভম্ব হয়ে বাড়ি ফিরে এসে মাকে বললো, “মা আজ রাত্তার কি দেখলাম জান?” মা বললো, “কি?” দাঁড়াই বললো, “দেখলাম রাত্তার কতগুলো বস্তির ছেলে মিলে প্রচণ্ড লড়াই করছে, এমন সময় সেখানে হঠাৎ বটুকরা কোথা থেকে এসে বললো এই মারামারি করছিস কেন? চল, গান গা—

আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে,

নইলে বোদের রাজার সাথে মিলবে কি স্তর্ভে।

বলে গান করতে লাগলেন।”

বুঝু-ভুঝুমেয় নাটকে আমার একটা পার্ট ছিল সেটা হচ্ছে,—খেদার দাঁও; খেদার দাঁও। বটুকরা সেটা জ্ঞনতে খুব ভাল বাসতেন। যখন দেখা হত বটুকরার সাথে তখনই বলতেন, “খেদার দে, খেদার দে” অর্থাৎ খেদার দেয় পার্ট জ্ঞনব। কিন্তু বটুকরার সাথে শেষ যেদিন দেখা হল পুজোর আগে জ্বল বাসে যেদিন আমি বটুকরাকে খেদার দেটা শোনাতে পারি নি কারণ আমার সেদিন গলাভাঙা ছিল, তাই ঘেঁষে বটুকরা নিজের ঝিকে হাত করে বললেন, “আমি এখন খেদার দে” বলে চলে গেলেন। তার কিছুদিন পরেই জানতে পারলাম বটুকরা আর আমাদের মধ্যে ইহলোকে নেই। আমার তখন মনে হল আমার খেদার দে পার্টের শুকন বোবার আর কেউ থাকল না।

শেষ লেখা

হিরণকুমার সাত্তাল

এই অসমাপ্ত রচনাটি হাবুলদার শেষ লেখা। লিখেছিলেন ৮ জানুয়ারি ১৯৭৮, বুধবার টিক আগের দিন—সন্ধ্যাক

সাধনবাবু অনেক আয়গার বেড়িয়েছেন। অনেক রকম খাওয়া খেয়েছেন আর যই পড়েছেন অসংখ্য। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত তিনি কিরে গেলেন না তাঁর শৈশবের মধ্যপ্রবেশ। যখন ভুবন স্রমণ করে, কিরে গেলেন সেই অতি পরিচিত আয়গাটিতে, দেখলেন তার চেহারা আর চরিত্র দুই বসলে গেছে। এই হল জীবনের ট্র্যাজেডি। কেয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ একথা একদিন বলেছিলেন অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাবে। ১৯১৯ সালে আলিয়ান-গুয়ালাবাসের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকারের খেতাব কিরিয়ে দিয়েছিলেন তখনকার ভাইসরয়কে যে চিঠি লিখে তা কে না পড়েছে? কিন্তু অনেকেই জানে না এই চিঠি লেখার আগে তাঁর মন-কী রকম বিচলিত হয়েছিল। সে সময়ে ক'দিন প্রায় অহোরাত্র তাঁর কাছে ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি ঐ সময়ে কবির অস্থিরতার কথা যে রচনাটিতে লিখে গিয়েছেন সেটি খুব প্রচারিত হয় নি। কবি সেই সময়ে চেয়েছিলেন পানিহাটির সেই বাগানবাড়িতে একবার যেতে যার কথা তিনি লিখে গেছেন জীবনস্মৃতিতে। প্রশান্তবাবু তাঁকে নিয়ে গেলেন সেখানে। কিন্তু কবির অশান্ত মন শান্ত হল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলে তিনি বললেন, সেখানে আর কেয়া যায় না।

কিন্তু তবু হন চার বাগ্নবায় কিরিতে। তবে এ হল বার্থক্যের কথা। অল্প বয়সে নতুন নতুন আয়গা দেখার উৎসাহ টেনে নিয়ে যেত এখানে ওখানে—কাছে ও দূরে। আদি ডাঙার পথিক, আকাশ বিহার করার

স্বপ্নেও হয়নি কোনদিন। অলপশেষেও বা বেড়িয়েছি তা খুব বলবার মতন নয়।

[সুভাষ ঠিক করেকদিন আগে হিরণ কুমার এক বৈয়দিক ব্যাপারে প্রচণ্ড ও অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছিলেন। শেষ ক'দিন তিনি খানিকটা উদ্ভ্রান্তের মতো সারা শহর ঘুরে বেড়ান। একজনকে বলেন, আমি তো পথেরই পথিক। উপরের রচনার শুরুতে এই বিবাদের হয় কানিত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।—স্বশোভন সরকার]

সত্যার কবিতায় মন্থনা

শিখা সরকারকে লিখিত

(১)

আনো, কেজো, একদিন সন্ধ্যাবেলা
ঘরে ঢুকে বেধি কোণে করিছে থেলা
বিরাট সর্প হেলে, ভীষণ তেজী।
হায় রে, বাড়িতে মোর ছিল না বেজী।
হমিবার লোক আমি নহি তো আনো ?
হাঁকিলাম—‘ওরে, হরি, ভাতা আনো’—
বীর বিক্রমে উঠি চৌকি-পীর ;
ছুটে এল হরি ছাড়ি রাসা-ঘর।
হিলাম আদেশ—‘ওরে এখনি আরো’।
বলিয়া তখনি ঘুরে সরিহু আরো।
সারিল। সাবাস হরি। সূত-মম
শৌর্যে বীর্যে প্রায় মনিব-সম।
কহিলাম—‘ওরে দাও ফেলিয়া ছুঁড়ে
রাতার পরে, নয় আতাইঁড়ে।
তারপর হতে রোজ রাজি-বেলা
লিকলিকে কত সাপ করে যে থেলা
বিছানার পরে মোর, ঘুরে ঘুরে,
তনিয়া পাই না শেষ। বাঁচি কি করে ?
কোথা হতে আসে তারা, কোথা সে যায় ?

আমারেই রোজ রাতে কেন যে চান্ন ?
 জিলাসা কোরো তুমি বাবাকে থাকে
 ঐ যে শাপের দল কোথায় থাকে ?

কলকাতা, ২২, ১২, ৩৩

২

কেজোমদি, চিঠি পেয়ে হলাম বস্ত ।
 থাকেন বাড়ির কাছে দেবী লাবণ্য ।
 দেবদেবী হেথা হোথা আছে বহু অস্ত,
 মোর কাছে তারা সব পড়ীয় অরণ্য ।
 উপলাপথের দশা অতি ভয়স্ত,
 বাবুলমাঝা ও শোভা পিসির অস্ত ।

যদি ফুলে বলি কহু, “চা পেতে পারি ?”
 দস্ত খিঁচিয়ে বলে, “খাও না বাড়ি ।”
 জানো না, এখানে কত চড়ে না হাঁড়ি ?
 মানে মানে দাঁও এবে ধানক্ষেত পাড়ি ।
 তাইতে ওদের সাথে হয়েছে আড়ি ।
 এইখানে আজ তবে টানিলাম হাঁড়ি ।

পুনশ্চ, জানি নাতো শুনিয়াছ কিনা,
 হোম-ভিলা মশগুল—হেবী ম মলিনা,
 অমল, খোদন, তুলু, বুচু, খোকা, বীণা,
 আরো ছটি ছোট প্রাণী, নাম তো জানি না,
 দিনরাত নাচে গায়—বিন্ বিন্ বিন্,
 “আর কিছু নাহি চাই, কুকুট বিনা ।”

মিরিঙ্গি, ২৫, ১০, ৩৭

৩

বৌ বন্বন্ব সুপ্রতিছে ঐ ইষ্টিমারের সাকা,
 কাকুর সোণা আজকে আমি দিছি পাড়ি ঢাকা ।

বাটলারে কইয়া দিছি খামু আমি পক্ষী
কিমু আমি দিন সারেকে, বুঝনি, লক্ষী ?
আসমানেন্তে ক্যাবল ম্যাথ, ভুয়ে শুধু বুটী ।
মা বাবারে কইয়ো, মনি, হাবল মামা মিটী ।

পদ্মানবী, ২৪. ৬. ৩৮

(৪)

এতদিন এখানে তো ছিলাম নেহাৎ মন্দ নয় । ট্রামে চড়ি ককি খাই ।
বায়স্কোপও বন্দ নয় । ঘুরি কিরি পথে বাটে, খানা-কাটা মাঠে মাঠে ।
সেপাই এসেছে কত, গুনতে আমি পারিনে তত, যেখানে সেখানে ঘোরে,
দেখলে পরে বাই সরে । অতুত সব মাহুত ডারা, কী কাজ হবে তাহের
যারা ? কী করে যে সময় কাটায়, দেখলে পরে পা টাটায় । এ হোটেল, সে
হোটেল, বখন বা পায় তাই গেলে । সিনেমা আর আইস-ক্রীম, এই হল
তাহের ভ্রীম ।

তোমার বাবা আমার কাছে ধেরে ধেরে ভালোই আছে । হঠাৎ হঠাৎ
ওঠেন যেতে, অঙ্ককার এই শহরেতে, চুপি চুপি আসেন ঘুরে, এখান-ওখান
কাছে ঘুরে ।

মাঝে মাঝে বাজে বাঁশি, তুললে ঠিক পায়না হালি । এই ধরোনা মধ্যরাজ,
খাটের ওপর এলিয়ে শাজ, নিখা দিছি দিবিয় স্থখে, এমন সময় উঠল ঝুকে ।
সর্বভেদী তীর আগরাজ, এ-আর সি-র হর-কাগরাজ ।.....কান পেতে
কনো শুধু, যুদ্ধের হামামা পৃথিবী জুড়িয়া বাজে । ইতি হাবল মামা ।

কলকাতা, ২. ৪. ৪২

লিমেসরিক । জখলেন রাইস ।

মঙলানবিশ শুষ্টিয়

বৌঝিহের পুট্টয়

অভাবিত বহরে

তাক লাগে শহরে ।

করেছি আমি পণ,

করব জন-রণ

শত্রুপক্ষ না আসে যতক্ষণ ।

আক্রমিলে বন্ধ
 দেব রণে ভক্ত
 বাঁচাতে মোর মূল্যবান অন্ধ ।

যা কিছু চাও, বাঁধা অযাব, ভ্রামলক্ক ঘোষের :
 (ভেবে দেখলে ব্যাপারখানা এমন কী আর ঘোষের ?)

“ঘরে আছেন পত্নী
 আগে তাঁহার মত নি
 কেন না, ওজন তাঁর হু’মশ হু’সের ।”

কুলকি চালে ভাল বেতালে হাঁটেন নীরেন মায়,
 বাংলাদেশের নোংরা মাটি হৌন কি না হৌন পায় ।

বলেন, বৃহৎ হেসে,
 “নইতো আমি যে - সে,
 সাম্যবাদের পালিশ লাগাই রোমাক্কতায় ।”

উড়ে এসে আপানীয়া ছুড়ে বসে বারুয়া
 দেশ ছেড়ে পালালো কি তাই কাজলার বা ?
 হস্তুরা এসে পুছে যারে ঘাড়ে ধাবা
 কলকাতা ছেড়ে বাঁচে কজলার বাবা ।

ভ্রাতৃস্বায় কীদে আজ খামার ও খেত ।
 হেতু তার—বোমা-ভীক ব্রাহ্ম-কায়েৎ
 কতিপয় গণ্ডা
 সবলা ও বগা
 বারগণ্ডায় গিরে হ’ল অমারেৎ ।

কলকাতা, ১৯৪২

অন্তর্য লংঘনহীত

১

অলিন্দে দণ্ডায়মানা গণ্ডার পামিনী
 মণ্ডাপুট বগাবদেহ লাট সরোজিনী ।

২

অগা ছিল তার ল্যাবরেটরিতে,
 রবি ছিল তার বোটে,
 অগা কহে 'হায়, কী হবে উপায়,
 অর্থ যে নাই মোটে !'
 রবি কহে 'শোন, ভয় নাই কোন,
 ত্রিপুরার মহারাজ
 বত টাকা লাগে, তত টাকা দেবে,
 চলিবে তোমার কাজ ।'
 এই কথা শুনে তড়িৎকোলাসে
 অতীব হ্রস্ব হাঁচে
 অগা লাক ধের অধেশে বিধেশে—
 হাঁক ছেড়ে রবি বাঁচে ।

[বাৰীলতা লাভের পর শ্রীমতা সরোজিনী মাইফু উত্তরপ্রদেশের পতঙ্গি হন। সেই সন্ধ্যা একদিন তিনি 'উত্তরাধ'—এই উপন্যাসে বারানসীর ঝাঁড়িয়েছিলেন। নিচের থেকে উঁকে দেখে প্রথম ছড়াটি লেখা হয়। ছড়াটি শ্রীমতা মাইফু শুনে উপভোগ করেছিলেন।

আচার্য অপরীশতের শতবার্ষিক উদ্‌যাপন সম্ভ্রমত্বের এক অবিবেশনে শ্রীমতিলিবিহারী সেন 'অপরীশত ও স্বাধীনতা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়ছিলেন। দ্বিতীয় ছড়াটি লেখা হয় এই প্রবন্ধ শুনে শুনে। প্রসঙ্গত এখানে অপরীশতের বিদ্রোহের 'শর্ত জরাজ' সম্পর্কিত পরীক্ষার লিখিত রয়েছে।]

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা

তুমি যে করেছ বিয়ে, তাহে ইহা যায় বোঝা
 প্রগতির অলিগলি একা চলা নয় গোড়া
 -রোখা মত চোখা পং হোঁচটেতে-ভরা পথ
 হবে কাৎ হাতে হাতে না মিলিলে আলবৎ
 অতএব মনে রেখো এই যে জুটেছে খুঁটি
 টানটানি করলেই দীপানি ধরবে হুঁটি ।

[একটা বড় লোকপা, ওপরে লেখা]

শ্রীমান দীপেন্দ্র ও শ্রীমতী চিরয়ীকে
 হিরণ্যকুমার সান্তালের আশীর্বাদ

ভেতরে একটি স্বপ্ন কার্ডের টুকরোর কবিতাটি লেখা। সেই সঙ্গে লেখা

হিরণ্যকুমার সাম্রাজ্যের আশীর্বাদ

এক টুকরো কাগজ ১২ কার্তিক ১৩৬৭

আগ ছিল একটি টাকশালে ছাপা কাগজ, বার নির্দিষ্ট অর্থমূল্য আছে।]

ফুলটি (বর্ধমান জিলা)

৮ এপ্রিল ১৯৬১

এ কথা কি জানো তুমি হে দীপেন্দ্র পরিচরপ্রাণ,
কালশ্রোতে ভেসে যাব জীবনযৌবন ছবি প্রবন্ধ ও গান ?
শুভ দিগন্তেব কোলে রচে ইন্দ্রজাল,
বোঝা-না বোঝার বেশা অভিনব বৈধানিক গল্পের অজ্ঞান,
তাই নিয়ে অনশিকা জনে জনে অমায় বচনা,
তারপরে একদিন মুহূর্তের ময়ীচিকা মিলার সহসা।
কালের চাকার ধনি শুনিতে কি পাও ?
শতাব্দীর পর হয় শতাব্দী উষাও !
কাগজের পরে এই কলমের দাগ,
সময়ের বুকে যেন সাহিত্যের কণিক সোহাগ।

যোর লাগি করিও না শোক !

প্রভোৎ* প্রমোদ* আশি তোমার তো আছে বহু লোক,
রাম বহু স্রষ্ট্রিয়* (মরে যাই।) শিব* সোনামণি,
প্রত্যেকেই গোটা এক গোলক আগার ধনি।

বেহিকেই করি দৃষ্টিপাত
রচনার নৈপেয়া প্রপাত
রাশি রাশি অর্থহীন বচন উচ্ছ্বাসে
মন কাঁপে আসে।

মহাজন যেন গত সে পথের কিনারাতে দাঁড়াও এখনি,
উদয় দিগন্তে ওঠে জোর শঙ্খধ্বনি।

এ শতাব্দী হয় হোক নয়,
আরেক শতাব্দী লাগি প্রস্তুত হবে না পরিচয় ?

সম্পাদক, পরিচয়

[‘পরিচয়’-এর রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যার ক্ষেত্রে লেখা চেয়ে আমি হাবুলদাকে একটি চিঠি দিই। তাতে এসমস্ত লিখি আশঙ্কা হয় রবীন্দ্রনাথের বিশ শতাব্দীবার্ষিকীর সময় হঠাৎ কিছু লেখার সুযোগ তিনি না-ও পেতে পারেন।

কাজের সুবাদে তাঁকে কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে হয়। সেখান থেকে কবিতার চিঠির উত্তর পাঠান। পরে বিশেষ সংখ্যার একটি প্রবন্ধ অবত্ৰ লিখেছিলেন। কিন্তু তার জন্য আমাদের অনেক কাঁটখড় পোড়াতে হয়।—দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

১. আমাদের তৎকালীন কিছু গল্প নিয়ে রীতিমতো বিতর্কের সৃষ্টি হয়। নানা অভিযোগ ওঠে। বলা হয় ‘আধুনিক’ কবিতার মতো এইসব গল্পও পড়ে বোকা যায় না। সিরাজুল নামে এ আসলে লেখকদের মনের বিকার, অবন্দরী বুর্জোয়া ভাবাদর্শের রীতিমত প্রকাশ মাত্র।

২. ‘জনশিক্ষা সমিতি’র উদ্যোগে ও প্রবীণদের আওতায় ঐতিহ্যবাহীন সেহানবীশের বাড়িতে আমাদের গল্প আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনদিন ধরে একটি আলোচনা সভা চলে। জনাকীর্ণ সেই কিস্তারসভার আগাসোড়ায় তিনদিনই ঐশ্বর্যশালী সরকার, ঐশ্বর্যশালী প্রমোদ মিত্র, হিরণমুখার সাজান প্রবুধ উপস্থিত ছিলেন। চিহ্নিত তো ছিলেনই। ঐশ্বর্যশালী হালদার উপস্থিত ছিলেন কিনা মনে পড়ছে না। বোধহয় তখন তিনি কলকাতার বাইরে।

প্রথম দিন শ্রী অশোক রায় সেবারের শারদীয় পরিচয় থেকে শ্রীমদেব রায়, শ্রীপ্রভাত্য জয়, সত্য ভদ্র ও আশার চারটি গল্প বেছে নিয়ে উদ্বোধন সহযোগে তাঁর অভি.বাগুণি পেশ করেন। দ্বিতীয় দিন আমি অভিব্যক্তদের গল্পে উত্তর দি (আমাকেই তিনি প্রবান আমানী করেছিলেন)। তৃতীয় দিন আবার অশোকবাবু বলেন, আমিও। তাছাড়া শ্রীপ্রভাত্য জয়, শ্রীভদ্র সাজান প্রবুধ মহান গল্প আশোকদের গল্পে বেশ আবেগ ও যুক্তির সঙ্গে কথা বলেন।

পরে অশোকবাবুর লিখিত বক্তব্য ‘সাহিত্যিকের দায়িত্ব’, ‘পরিচয়’-এ প্রকাশিত। গল্প-বিগল্পে অনেকগুলি চিঠি প্রকাশিত হয়। জলপাইগুড়ি থেকে শ্রীমদেব রায় আমাদের চৌদ্দ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ লেখা ‘পরিচয়’-এ প্রকাশিত—‘সমালোচক দায়িত্ব’।

এই বিচারসভা আবার আরও এক স্মরণীয় ঘটনা।

এই সভার কথা জুলে হাবুলদা বহুকাল অবধি আমাকে স্মরণে রাখা করেছেন।

১. প্রভাত্য জয় ২. প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ৩. হরিশ্রী মুখোপাধ্যায় ৪. সিদ্ধেশ্বর সেন

বিভিন্ন ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত রচনা

পূত্র বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে, নয়া দিল্লীর জজমন্ডলম নৈক বিধিভাষ্যে "Nature of Creative Experience in Fine Arts and Literature" সম্বন্ধে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেই আলোচনাক্ষেত্রে বিভিন্ন ভট্টাচার্য এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।—দয়াকর ভট্টাচার্য

I must admit I find the very setting for this Seminar somewhat unreal. When the invitation to this Seminar reached me I was busy rehearsing my latest play—*Haanskhali* *Haans* (The Ducks from Haanskhali). It is a play about a mass of the lumpenproletariat, a huge band of beggars. The cult of beggary has a ritualistic aura in India. The beggar is a terror to the more comfortable classes, a projected hand is a force, a force generated in the land and soil of this country. They are set against the background of a construction operation, the digging for the underground railway, symbolizing technological progress and change. As Bonbibbi, the forest goddess, complains to the Earth Mother, her elder sister, against the exploitation of her people, now suffering in the big city, there is a tremor on the earth till the accumulated earth and mud crumble swallowing up Bhishma, one of the vagrants. The beggars take the event in their stride; and while Bhishma is taken away to the morgue, they decide to take the ditch right up to Haanskhali in the Sunderbans. The more I rehearse my play, the more I realize the

absurdity the projecting this enormous image with my bhaddarlog actors. I do not have the minimal facilities even to work on this project. For days on end I have rehearsed in a badly maintained park in the heart of the city with noises pouring upon us. Even if I am able to produce this play, I know that a badly literate urban audience will fail to appreciate the traditional models I use along with the technological models. I do not find much sense in a Seminar like this when I find my creativity stifled at every point.

The crisis of the artist today is the crisis of the individual isolated from society. As the artist is able to generate a broad social understanding among the people, leading to an activation of the people against the forces of reaction, the artist himself is integrated to society in the process. When the artist fails to achieve this inter-action with society, he can only flounder in the hallucination of his egotism.

Life is a struggle for existence. But this struggle itself for the Indian artist has lacked a focus. The legacy of a feudal orientation has inhabited social action. Over the last year and a half it was not just a caucus at the ministerial level or the bureaucratic level, but a caucus growing like a cancer into the body politic of the intelligensia, generating the inertia or a rheumatic trauma. It was a situation for which the killer as much as the killed was responsible.

My whole self responds to the social reality; and even as I try to liberate myself, I try to liberate my art. I grapple with the snake even as the snake grapples with me. At an undefined point something explodes,

erupts, giving me an insight into the core of reality and provoking me to solve the issues involved. This point lies beyond my premeditation. It is the nature of a qualitative leap, but not in the dark, at the crest of a circular labour process involving me and my art.

I have been working against this very inertia since the days of the last World War. Our country was then passing through one of her greatest ordeals. The ordeal of colonial exploitation and repression reached a culmination in Bengal in the man-made famine of 1943 that took a toll of more than fifty thousand lives according to official statistics. I spotted in a Calcutta street a crawling baby fumbling over the corpses searching for its mother's breast. The mother was already dead. Even while we organized gruel kitchens to feed the starving people, I felt the need to do something more meaningful. Only when I wrote my play *Nabanna* and staged it, did I have the feeling that I had at last become a mother to that hungry child even as I mothered my play to make it grow into a performance for the people. That image of the crawling child has haunted me ever since. Whenever in my creative quest I miss the crawling baby, I shift my position endlessly till the child comes to view again. In my creative work I have always tried to maintain this perspective of the mother. Though quite simple, this perspective is difficult to find today as the hobgoblins born out of the socio-economic morass cover up the lenses. Between the mother and the child falls the shadow. To feed the child in the person of the people is the objective of the artist aware of his social role and responsibilities. But when most of the cultural groups in the country have to more about with begging

bowls, they cannot hope to serve the people to the best of their consciences. The mothers themselves are dehydrated, while the children are in a kind of dead freeze. I know there are lots of problems to be tackled; but that is no reason why the arts should languish. It is for the arts to generate that mother spirit and take it into social and political action. In a developing country like ours even the political leaders should be more mothers than domineering fathers. They have however been quite often monstrous fathers devouring their own flesh and blood or morons proud of their limited visions and trying to be wiser than their teeming and bewildered children. Even a matriarch at times can be a cruel father as we have seen ourselves. For that is how things shape themselves in our country. It was my concern for the crawling child that prompted me to write my first musical, *Jeeyankanya*, in 1945, when I watched callous leaders and a callous ruling class paving the way with diabolical consistency for the partition of the country. The allegory of two families of snakecharmers and healers of men combining their wisdom after years of separation to revive a young girl was accessible to a wide range of the audience. I could have moved further with this form to further an awareness only if I had the minimal organizational support and a band of committed artists.

After the Partition, I found a powerful image in the uprooted refugee, disowned by the middle class in his country of adoption. In my *Gotrantar*, I made my refugee schoolmaster identify ultimately with the workers in the slum who prove to be his haven. In *Devigarjan*, I moved into the experience of the peasantry, into the economic

repression and exploitation they endure even today. Drawn to a last ditch they are compelled to revolt. The violence of their revolt I associated with the *Devi's garjan*, the roar of the angry goddess. As long as my people make the gods and goddesses dance, I am prepared to accommodate the belief of my people.

While I have the satisfaction of having remained loyal to my social commitment, and having been responsive to the social and political changes that have affected my country, I feel frustrated and diffident when I realize that I have not been able to take my work to the masses of the rural audience, and that I have not been able to involve them in my work. I feel sick when I have to use in my productions petit bourgeois artists aping the sturdy and rugged peasants. We have not been able to make use of the histrionic potentials embedded in our folk musical and theatrical forms. I can only dream of a troupe of haves-nots playing themselves and destroying in the process all the cosy gestures and forms of our urban theatre. As long as we do not realize that dream, we can only peddle faint shadows of life and reality. It is a shame to be estranged from the people and the truth that they embody.

August 1977

Bijan Bhattacharya

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের অপ্রকাশিত রচনা

বটকম্বার কুলি খাঁটাখাটি করে শ্রীমতী স্মৃতিতা বৈজ কিছু চিঠি ও পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন।

পাণ্ডুলিপির সংখ্যা বেশি নয়—অধিকাংশই অসমাপ্ত কবিতার খণ্ডা। দু-চারটি সম্পূর্ণ কবিতাও আছে। আর আছে এক তবক পদ্ম, তিন লাইন খরলিপি, সম্ভবত একটি শিঙ-পীড়িনাটোর অংশ। কালো আর সবুজ কালিতে লেখা ‘অরণ্য রাত্তো’ ‘বাসকুল’ প্রভৃতি শিরোনামার পীড়িনাটোর পীড়ি-অংশ, কঁাকে কঁাকে পেলিলে লেখা নির্দেশনা সম্পর্কিত notes, পেলিলেই Listen & React শিরো-নামে অনেকখানি ইংরিজি লেখা, লাল কালিতে Environmental Workshop (based on Music+rhythm) বিষয়ে কিছু মন্তব্য—অপর পৃষ্ঠায় লাল কালিতেই শিশুমনের স্বপ্ননশীলতাকে উস্কে দেবার জন্য বেন কিছুটা অগত চিত্র। ছাপা প্যাড, কলটানা ফুলফ্যাপ সাইজের কাগজ, সাদা কাগজ, টুকরো কাগজ, সবুয়ের খাম আর এনভেলোপের ছেঁড়া পিঠ—যখন বা পেয়েছেন তাতেই লিখেছেন। তিনটি কবিতার নিচে ১১/১১/৭৫, ১৬/৮/৭৫ এবং ৬/৮/৭৬ তারিখ আছে। অল্পগুলি কখন লেখা বোঝার উপায় নেই। মাত্র একটি-দুটি পাণ্ডুলিপির অবস্থা অকত—আর সবই হিঁড়ে আসছে, লেখা হয়ে বাচ্ছে অম্পষ্ট, কোনোটার বা তেলের ছোপ লেগেছে, কিছু বা হুসড়ে মুচড়ে গেছে।

পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রকাশিত কবিতার প্রথম খণ্ডাও আছে। যেমন, লেনিন জন্মশতবর্ষে লেখা ‘তবে এসো’ কবিতাটি। Jyotirindra Maitra, New Delhi-5 ছাপা প্যাডে এই দীর্ঘ কবিতার যে খণ্ডা পাই। সেটিই ‘লেনিন শতাব্দী’ নামে লেনিনের উদ্দেশে নিবেদিত একশোজন বাঙালি কবির কাব্য সম্বলনে ১৯৭০ সালে

প্রকাশিত হয়েছিল। খশড়া আর প্রকাশিত কবিতার পাঠে প্রভেদ নামমাত্র—বোঝাই যায় কপি করার সময় সামান্য পরিমার্জনা করা হয়েছে।

বটুকদার পাণ্ডুলিপিগুলি রক্ষার ব্যবস্থা এবং অপ্রকাশিত রচনাগুলি বেছে প্রকাশ করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। 'পরিচয়'-এ আমরা পুস্তককপি এবং ছপানি কবিতা প্রকাশ করলাম। বটুকদার জানি এগুলি এখাবৎ কোথাও ছাপা হয় নি। পুস্তক রচনাটি এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্মৃতি বলে এই টুকরো লেখাটুকুর শুকনু অপরিণীত। প্রসঙ্গত, বটুকদার জীবনের শেষ পুস্তক রচনা গত শায়দীর 'পরিচয়'-এই প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয় কবিতাটি ওয়ুধের খামড়েঁড়া কাগজে পেলিলে লেখা অসমাপ্ত। একটি শব্দ কাটাকাটির ফলে স্পষ্ট কোনো অর্থ বহন করে না। "প্রতুলোকের জীবন প্রান্তরে" পংক্তিটি আঙুর লাইন করা। অত্র একটি কবিতার মার্জিনে "হঠাৎ রাজি আসে/চলন-বিলেয় কালো মোটা মোটা মাঝি পাড়ি বেবে" পংক্তিটি পাওয়া যায়। তৃতীয় কবিতার প্রথম পংক্তির আদি বা বিকল্প রূপ কি?

ষষ্ঠ কবিতাটি, বোঝাই যায়, সাম্প্রতিক রচনা। [রঘুনাথ গোস্বামীর আঁকা?] প্রতীকচিহ্ন সম্বলিত 'কবীর' ছ-রঙা ইংরিজি প্যাডে [KARSHANI (AGRO ECONOMIC COMPLEX) JHARGRAM, MIDNAPUR, WEST BENGAL, INDIA] স্পষ্ট হৃদয় হস্তাক্ষরে লেখা। কবিতাটি অসমাপ্ত, মনে হয় এটিই প্রথম খশড়া (কারণ, আর কোনো পাঠ আমরা পাই নি)। কিন্তু বেখায় বেন কপি। হতে পারে এটিই বটুকদার শেষ কবিতা। সেক্ষেত্রে তাঁর অন্তিম অসমাপ্ত পংক্তিটি চমকপ্রদ বৈকি।

রচনাগুলি সবই শ্রীমতী স্মৃতি মৈত্রীর সৌভাগ্যে প্রকাশিত হল—সম্পাদক।

৩০ এপ্রিল, রেডিওর সংবাদ শুনিছি। সাইগন বদলে বাজে। ভিয়েতনাম,—হো চি' মিন এর অগ্নি-সকল, ভিয়েতনাম—সাইগন হয়ে গেল হো-চি-মিন নগরী। ত্রিশ বছরের সংগ্রামের চূড়ার মুক্তির

পতাকা উড়ছে। আমেরিকার ক্যানিষ্ট দল্লারা হেরে গেল চূড়ান্ত-
ভাবে হেরে গেল। কিন্তু এই দুই মাসের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত
সংগ্রামী প্রাণের মাছুষেরা এগিয়ে গেল একটা প্রত্যয়ের তপস্যায়
উচ্চতর প্রজ্ঞার স্বরে। মার্কস এডেলস্ লেনিন হো চি মিন—
ইতিহাসের একটা বিরাট আবর্তন বিবর্তনের ছন্দেই সবে এসে
মিললো—মার্কস-লেনিন। হো-চি-মিন।

১

পাতীৰ প্রলিত শুধু
বেঁচে যায় জীবনের চৈতন্য বিহার,
প্রাণাবেগ আরণ্যক শ্রাবলে বিলীন,
প্রচণ্ড বিদ্যুৎবহ বেগের চূড়ার কুক্ষার।
কারণ এ জীবনই তো ব্যাপক হরিণ।

১৩/৮/৩৮

২

অনেক ভাল ভাল কবিতার পংক্তির বোঝা নিয়ে
রাজি পোয়ানো প্রচণ্ড ক্ষত বিক্ষত দিন,
আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।
পুরোনো বাক্সের, পুরোনো যন্ত্রের গন্ধ ছুঁই হাতে।
দৈনিক চিন্তায় এত বর্ণাশুদ্ধি কেন?

৩

হঠাৎ কালো চলন বিলের মাঝির মত রাত
আমার নিয়ে পাড়ি অমায় হুল হারানো শোতে
অনেক তারার সপ্তর্ষির পার
অধুনা তার বপুগুলি শুধু গাছের সারি
এক লোকের জীবন প্রান্তরে
[?] প্রতিদিনের মনের পাড়ায়
এ সব চিত্র প্রবাসী

৪

যেথেকে তে

আলিঙ্গনে হলে তুমি
কত বিকৃত ।
তাই হবে, যদি তুমি এখনও আডালে
দূরে দূরে থেকে
আন্দোলন-স্বপ্নিও থেকে বাও সরে ।
কুখ্যাপ ও শবের মাঝে
খুঁজে পাও আশ্রয় বিবোধ
অর্থপূর্ণ শব্দ । তার মাঝে বয়
বর্ষ-শ্রোতবিনী—অথবা
রক্তের নদী জীবনের গাছ খসে

আমার আশ্রয়ে তুমি নিঃশব্দিত

আমার আশ্রয়ে তুমি নিঃশব্দিত, হে আকাশ !
বিভবিত জীবনের বুড়ু প্রত্যাহা চোখ
তোকেই দেখে বারবার এক দর্পণের মত ।
আমার শরীর ছোঁওয়া এ পৃথিবী
অজস্র অরণ্য ঘের, ভাঙাচোরা শহরের পাশে ।
কৃতকার্ষ মৃত্যুর সাহচর্য পেতে পেতে
চিন্তায় ক্লান্তি আসে—
নির্মিতের তপোবনে দাবদাহ, মায়ী ।
সম্মানিত সংগ্রামও জোটে না বাহতে ।
বসন্তের শেষ চির চূষনের চূড়ার বিলীন ।
অসংখ্য নক্ষত্র-কীট শোনে
অন্ধকারের মহা সঙ্গীতের মোহন বিজার ।
তাই দেখি বারবার দর্পণিত আমার শরীর

[একট ভিন্ন পাঠ :

আমায় আনন্দে তুমি নিঃশব্দ হে আকাশ ।
বিড়ম্বিত জীবনের বুকু প্রত্যাশী চোখ
তোমাকেই ঘেঁষে এক দর্পণের মত
নিম্পলক সূর্যের শরীর ।
আমায় এ প্রসারিত বেহ-হৌত্তরা এ পৃথিবী
অজস্র অরণ্য ঘের ব্যবহৃত শহরের পাশে ।
কর্তৃকার্য মৃত্যুর সাহচর্য পেয়ে
চিত্তায় ক্লান্তিও আসে
নির্মিত্তির তপোবনে দাবদাহ, মারী ।
সম্মানিত সংগ্রামও তো জোটে না বাহতে ।]

৬

আমায় এখন কেউ জেই

ঐ বারায় মেখেছিল উল্কি পরেছিল
হাতে বজ্রম,
চোখে কিণের বেন মলম
কাম কামনার নীল মেঘের মত,
হাতছানি ঘের,
হিল্ হিল্ করে হাসে
সমাজের দৃষ্টি আড়াল করা অন্ধকারে
নোংরা বোবনের দেহ ছুঁয়ে
পাকা কলের মত টিপে টিপে ঘেঁষে
জিইয়ে রেখেছিল কৃষ্ণচূড়া অশোক
পলাশ কুদাঁচ মহরা
আর তোমাকে আমাকে,
আর পুরোনো কলের গানের রেকর্ডের মত
বসুধা মালিনী
শোক নিহত করবার অন্ত—
আমি জানতাম । অথচ কাউকে বলি নি ।
কারণ কেউ নিহত না হলে

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের অপ্রকাশিত রচনা

[গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম দিকে লেখা একটি গণসংগীত বা ভাষাবিরোধী পটভূমিতে লেখা হয়েছিল। ১৯৪৩ সাল নাগাদ আশাম সরকারী ছাত্রকেডারেশনের কালচারাল কোয়ার্টার অনুষ্ঠানস্থলিতে ব্যালে নৃত্যের সঙ্গে গানটিকে যুক্ত করা হয়েছিল। এবাবৎ অপ্রকাশিত এবং স্বল্প প্রচারিত। সুব সম্ভবত এটি তাঁর প্রথম গণসংগীত—সাধন দাশগুপ্ত]

ও ভাই—ই—ভাই,

বাই.....বাই.....

এসো ধান কাটি কসল কাটি কাণ্ডেতে দিই শান
কাণ্ডে মোদের মিতারে ভাই, কাণ্ডে মোদের জান ।
এই পজবে মোদের প্রাণের দুর্গ এই অমিন,
তাকে ছেড়ে শহর পানে যাবে কে কোন দিন,
গড়ব মোরা ক্ষেত খামারে মত্ত ইমারত
গোলা শুয়া সোনার ধানে বাড়াবে ইচ্ছত ।
লড়ছে বারা মরছে বারা তারাও মোদের ভাই,
(এসো) কাণ্ডে শানাই এই ইমারত শক্ত রাধি তাই ;
আমাদের এই মাঠের রাজ্যে আর কে আছে রাজা,
দস্যু যদি লুঠতে আসে দেবই আমাদের সাজা,
কাণ্ডে লাঙল মাখাল গরু মাটিই মোদের প্রাণ,
এরাই মোদের ঢাল তলোয়ার এরাই ধহক বাণ ।

হিরণকুমার সান্ত্বালার চিঠি

হিরণকুমার বোম্বকে

৮ একতালিয়া রোড

কলিকাতা

৪ মে ১৯৪৫

প্রিয়বাবু—

আপনার ২৮ তারিখে লেখা চিঠি ২রা মে পেলাম।

এবার আবার বড় ইচ্ছে ছিল সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের কোলে গাছের ছায়ার ছায়ার কক্ষির মৌতাত ভ্রমণো। কিন্তু এখন নতুন বাড়িতে গিয়ে থাকি অসম্ভব। ১৫ই তারিখে আফ্রিকা জার্মানি মিটিং। আগেই যদি চলে যেতে পারতাম কতি হত না, কিন্তু এখন আর ছুটি নেওয়া চলে না। তার পরেও যাওয়া চলে না, আপনারা না থাকলে কী করে থাকব। আর যদি বা ছুটি পেতাম তাহলে চাকর বাকরের ব্যবস্থা না করে ভৈরবসপত্র সঙ্গে না নিয়ে নতুন জায়গায় কি করে যাই? আপনার চিঠি ২৪ দিন আগে পেলে চেষ্টা করতে পারতাম।

শান্তি প্রিয়বাবু কলকাতা এসেছেন কিন্তু তাঁরও ছুটি নাই। তা ছাড়া এখানে এখন তিনি আছেন টুয়ে—রোজ ১০ টাকা ভাতা, তাতে হাসির হাসির সবার কেশুর কখনের দাম উঠে আসবে। বাইরে গেলে লোকসান।

নীয়েন রাখারমন বসে গেছে বিয়ে করতে। ওদের বিয়ে ঠিক নয়—বহিষ মুখুন্ডের। ট্রেড ইউনিয়নকর্মী সান্তা ভালোবাসে।

কদিন আগে খোয়াব দেখলাম। বাদশাবংশম স্বয়ংস্বয়ম নয়—নীয়েন। নীয়েন একা নয়। কোন নারীও সঙ্গো নয়। স্বয়ংস্বয়ম হচ্ছে নীয়েনের সঙ্গে একটি

বায়রের বাচ্ছার। নীরেন দাঁড়িয়ে একটু উঁচু জায়গায়। বোধহয় একটা পাঁচিলের ওপর আর বানরের বাচ্ছাটা একটা একতলা পাকা ঘরের ছাদের ওপর। কিছুক্ষণ পরে নীরেনের জিৎ হবার উপক্রম হ'ল তখন হঠাৎ সেই বাচ্ছার যা এসে স্বয়ং ক্রুদ্ধ চোখে নীরেনের দিকে তাকাল—তারপর দৃষ্ট পরিবর্তিত হ'ল, নীরেন লোপ পেল, চলে গেলাম এক বিরাট বাড়িতে সেকলে হালের, তার প্রশস্ত চত্বরে মেধা হ'ল কুপেশগুপ্তব সঙ্গে। সে বলল আপাততঃ তাদের হলবল সব শুধানেই রয়েছে। তারি আনন্দ হ'ল, ঘুম ভেঙে গেল।

যেতে ইচ্ছে করছে কিছু ঐ মুক্তি। কলকাতাতেই লোক পাইনে তো 'বিন্নলি' বাবার। বেড়াতে গিয়ে রাঁধাবাড়া ক'রে খাওয়া চলে না—তার ওপর বল তোলা বাসন মালা, কাপড় কাচা। দেখবেন পূজোর সময় বাড়ি পাওয়া যায় কিনা। ইতি।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রেয় চিঠি

অমিল কাজিলালকে

বটুকার আবার অন্তত ২০ খানা চিঠি বখোচিত বন্ধুর অভাবে রক্ষা করা যায় নি। বাকিগুলি প্রকাশ করা হল। আমাকে লেখা বকটুকার কয়েকটি চিঠির কিছু অংশ আমার স্মৃতিসারে এংং বিনা স্মৃতিতে 'ক্রান্তিক' নামে একখানি কাগজে ছাপা হয়েছে। বঁার "সৌম্যভে" চিঠিগুলি ছাপা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশের অন্ত চিঠিগুলি আমার থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। চিঠিগুলির ঢীকা কে লিখেছেন জানি নে, কারো নাম নেই, কিন্তু তাতে অনেক ফুল আছে।—অমিল কাজিলাল

(১)

New Delhi

24.5.67

ঐতিহ্যঅনেন্দু—

অমিল, কিছুদিন পূর্বে তোমার চিঠি পেয়েছি। নানা কাজে ব্যস্ত থেকে উত্তর দিতে দেরী হল। কিছু মনে কোরো না। ইতিমধ্যে সুবোধ ব্যানার্জী, ও বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বিশ্বনাথ গত ২০শে—অবনীর ওখানে এসেছিল। অনেক কথা শোনা গেল, অনেক আচ্ছা দেওয়া গেল। তোমাকে খুব miss করেছি। আমার ক'লকাতা বাওয়ার এখনও কিছু ঠিক নেই। ঠিক হলে তোমাকে অবশ্য জানাবো। এখানে সর্ব-দিল্লীর বাঙ্গালীদের নিয়ে—দল-মত-নির্বিশেষে একটা কমিটি গঠিত হয়েছে। বিহার ও বাংলা

রিলিকের অন্ত টাকা ও কাপড় সংগ্রহ করা হবে। আমাদের গান বাঁধতে বলা হয়েছে। আশা করি সকল ভালো আছেন। অজ্ঞ শুভ।

বটুকদা

(২)

নিউ দিল্লী

22.11.67

ঐতিহাসিক—

অনিল, কাণ্ডটা দেখলে ত। Ajoy Mukherjee goes.—P. C Ghosh sworn in—।

এটা অবশ্য অনেক পূর্বেই আমরা অহমান করতে পেরেছিলাম। তবে এত অতর্কিতে হবে ভাবতে পারি নি। এই সেদিন (১১ই নভেম্বর) দিল্লীর কালীবাড়িতে অজয়বাবু-বিশ্বনাথ কুশীল ঝাড়া গুজবিনী ভাবায় সব বলে গেলেন—“U. F. Ministry যদি যায়—তবে প্রস্তুত আছি আমরা রাস্তায় এর মোকাবিলা করতে হবে—অনেক রক্তপাতা বইবে ইত্যাদি ইত্যাদি সব কথা।……”

আজকে অত্যন্ত crucial day-তে তোমায় চিঠি লিখছি। ২২ তারিখের rallyর খবর এবং aftermath—সব খবর দিয়ে চিঠি দিতে ভুলো না। আমিও “লোকস্বজন” করার জন্য কলকাতায় বাচ্ছি না। অজিত গুপ্তকে স্পষ্ট ভাবায় লিখে দিলাম। তাছাড়া P. C. Ghoshএর regime-এ witch huntingও যে চলবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কি যে করতে ইচ্ছা করছে বলতে পারি না। বাই হোক আগামী ১৯২০ ডিসেম্বরে এবার ভারতীতে আমার উপস্থিতির সম্ভাবনা আছে। সময়মত জানাবো। ইতিমধ্যে শুধানকার সব চিঠি আকাজ্ঞা করি।

এখানকার খবর একরূপ।

With greetings

বটুকদা

(৩)

2/5/68

শ্রীতিভাষনেবু

কিছুদিন পূর্বে শ্রীমতী রাহু—তোমার কন্যা—একটা alarming চিঠি দেয়। তাতে তোমার গুরুতর অসুখের সংবাদ পাই। বুঝতেই পারছি আমি নানাস্থানে engaged হয়ে আছি। কলে এর পূর্বে তোমার খোঁজ নিতে পারি নাই। সম্বর তোমার বর্তমান শারীরিক অবস্থা ও কুশল জানিয়ে চিঠি দেবে। তা না হলে খুবই দুশ্চিন্তায় ভুগবো। খুব বিবাহের formal নিমন্ত্রণ পত্র পেল। শিরে সংক্রান্তি—আর মাত্র ১০।১২ দিন বাকী আছে।

অজ্ঞ সব মঙ্গল। আগামী শুভদিনের preparation সবাই উদ্যত ও উৎসাহিত। তোমাদের সকলের শুভেচ্ছায় ভালয় ভালয় সব উৎসে পেলেন বাচি।

শ্রীঅমল্য ভট্টচার্যকেও নিমন্ত্রণ করব।

ভদ্রাকাজী

বটুকরা

স্নেহের, রাহু-মা,

তোমার চিঠিতে অনিলের অসুখ সংবাদে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। পত্রপাঠ সব কুশল-সংবাদ লিখে পাঠাবে। খুব বিয়ে আগামী ১৬ই মে-তে সেই নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। আমার শুভাশিস গ্রহণ করো।

জ্যেষ্ঠ

(৪)

New Delhi

19. 8. 61

শ্রীতিভাষনেবু

অনিল, কন্য শেখ চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। দেহজাত বাস্তবিক লজ্জিত কিন্তু বিশ্বাস করো (তুমি কিছুটা আশ্বাসিত করেছ) আমি বাড়ি মুখ শুভে post-marital ঝগড়া সামলাতে ব্যস্ত ছিলাম এবং এখনও yet out of the woods। আমার মত সাধারণ গেরস্ত-পোষা লোক—বার কোনও extra

income নেই বা অসহুপারে উপার্জনের পছাও জানা নাই—তার বা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। বাই হোক এটা temporary phase বলেই মনে হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই শরীরে মনে ও অর্থে একবারে বিক্ষুব্ধ অবস্থা। শাস্ত্রে বলে স্বপ্নগ্রস্ত শরীর ও মন অন্তঃস্থ। তাই স্বপ্ন-শোধের পালা চলছে এখন।

বাই হোক, তুমি পুজায় আসছ—এটা নিশ্চয়ই সুসংবাদ। খুকু ও জ্যোতির্ষ্ময়রা ভালই আছে—বসেতে তারা নতুন বাসা পোরোগীওতে বেঁধেছ। তোমার আশ্ব্যের কুশল ও উন্নতি কামনা করি।

বটুকলা

(৫)

2.5.68

প্রীতিভাষনেয়ু—

কিছুদিন পূর্বে 'প্রীতি' রাণু—তোমার কত্মা—একটা alarming চিঠি দেয়। তাতে তোমার গুরুতর অস্থির সংবাদ পাঠ। বুঝতেই পারছি আমি নানাভাবে engrossed হয়ে আছি। ফলে এর পূর্বে তোমার খোঁজ নিতে পারি নাই। সমস্ত তোমার বর্তমান শারীরিক অবস্থা ও কুশল জানিয়ে চিঠি দেবে। তা না হলে খুবই দুশ্চিন্তায় ভুগ্ন্বে। খুকুর বিবাহের formal নিমন্ত্রণ পত্র গেল। শিরে সংক্রান্তি—আর মাত্র ১০/১২ দিন বাকী আছে।

অজ্ঞে সব মঙ্গল। আগামী শুভদিনের preparation এ সবাই উদ্যত ও উৎসাহী। তোমাদের সকলের শুভেচ্ছায় ভালো ভালো সব উৎসর্গে গেলে বাচি।

প্রীতিমূল্য ভট্টাচার্যকেও নিমন্ত্রণ করব।

শুভাকাঙ্ক্ষী

বটুকলা

স্নেহের রাণু মা,

তোমার চিঠিতে অনিলের অস্থির সংবাদে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। পত্রপাঠ সব কুশল-সংবাদ লিখে পাঠাবে। খুকুর বিয়ে আগামী ১৩ই মেতে গেই নিজে ভীষণ ব্যস্ত। আমার শুভাশিস গ্রহণ কোবো

মোহন

(৬)

New Delhi

4. 1. 69

শ্রীতিভাষ্যনেষু,

New Year's Day স্মারক ! তবে happy কিনা বলা মুশ্কিল । তোমার স্নেহলিপি শেষে ধন্য হলাম । November-এ আমার ষাণ্ডয়া রদ হয়ে গেল । বেশি আগামী Feb-এ কী হয় ! সবই পাকে চক্কর আবর্তে-স্থায়মান । বিনয়ের সঙ্গে গত পরও দেখা হয়েছিল । সবটি "একরকম" আছে—"দুই রকম" আর থাকতে কাউকে দেখলাম না—অবশ্য exceptions are there ।

আমি গত নভেম্বরের গোড়ায় সাইকেলের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হই, হত হতেও পারতাম । তাই, খাবি ষাণ্ডয়া মাহ—আরও কিছুদিন ঠিকিয়ে রাখলো এরা । চাঁদ-কেবল মাহুগলোর হেমাঙ্ক দেখে বাঁচি না । আমাদের মত কবিদের দল—ভাবছে—কবিতা লেখার উপাদানগুলোকে সব ভেঙ্গে চূরে নষ্ট করে দিয়ে—"কি লাভ হইলো ইথে পদীর পিসির"—॥ পৃথিবীর মাহুগ-দের বৈদম্বিন অবস্থাটার একটু improvement হলে বাঁচা বেত । Feb. এর Election সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করতে আজ্ঞা হয় । বখাশীরা ? অজ্ঞ গুণ ।

বটুকদা

(৭)

নিউ দিল্লী

২. ৪. ৬২

শ্রীতিভাষ্যনেষু,

অনিল তোমার পত্রাবলী পেয়েছি । উত্তর দিতে দেরী হয়েছে—সেও ক্ষমাধী । কারাকলে নবকলেবর ধারণ করবার পর কি অবস্থা ? জানবার জন্য কোড়হুগ প্রবল । মে মাসের শেষের দিকে বাবার সম্ভাবনা আছে । তুমি এদিকে একবার আসবে না ? এখানে বিঘ্ননাথ, সোমনাথ শুভানী

গেন ইত্যাদিদের সঙ্গে মূল্যকাণ্ড হয়েছে। তোমার অভাব feel করছি।
যদি সম্ভব হয় চলে এসো না কয়েকদিনের জন্য। শ্রীতি তত্তেচ্ছান্তে

বটুকদা

(৮)

24. 6. 69

শ্রীতিভান্ননয়,

ইতিমধ্যে এখানকার নাটুকে দল নিয়ে, শরীর বিশেষ অসুস্থ নিয়েই, কলকাতার গিয়ে ৮ই ও ৯ই জুন লক্ষকর্ণ ও কবয়ঃ (বনকুল) show করে এলাম। অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় তোমাকে বখাসময়ে খবর দিতে পারি নি। ঠিক কেন যে দিতে পারলাম না, তা explain করে বোঝাতে পারবো না। চূর্তাগ্যবশতঃ তাই হবে গেল। নিজে অবশ্য খুবই ব্যস্ত ছিলাম। কারণ production-এর মূল দায়িত্ব আমার পরেই প্রাপ্ত ছিল। অথচ কোনও যোগাধ্যবন কিছুই ছিল না। চরম দায়িত্ব নিয়েই এ কাজটা করতে হয়েছে। তাহলেও তোমাকে খবর না দেবার কাবণ এটা নয়। ভাগ্য ফলতি সর্বত্র। আশাকরি, অমার্জনীয় হলেও নিজগুণে আশাকে ক্ষমা করো। আশাকরি কুশলে আছো—

তুমি অনেকদিন চুপচাপ ? ক্ষমাপ্রার্থী

বটুকদা

পুঃ আমি দাঁহু হয়েছি—একমাস হল। খুকুর মেঘে হয়েছে—বটুকদা

(৯)

28. 7. 69

অনিল,

বখাসময়ে তোমার পোস্টকার্ড পেয়ে আশস্ত হলাম। হ্যাঁ, দাঁহু হয়েছি এবং তিন পুরুষের বিবর্তনের রাস্তায় পা বাড়ালুম তবে টাঙ্কের বা অবস্থা দেখলাম, তাতে মধুচক্রিকা টানে গিয়ে কয়বার প্রবৃত্তি হুচে গেল।

এবার তোমার সঙ্গে দেখা না করতে গেলে—তোমার চেয়ে আমিও কম স্ক্রল হইনি। তবে অসুস্থ করে আর বেশি স্ক্রল হয়ে না—এক মাঘে শীত পালায় না—সুখে আসলে পুরিয়ে দেবো—।

তোমার এখানে আনা over-due। আসর বেশ সরগরম। অনেক কথা—অনেক ব্যথা—অনেক কিছুই তোমার অপেক্ষায় আছে। অত্র শুভ। তোমাদের কুশল দিও।

একাত্তাই তোমাদের

বটুকরা

পুঃ তোমাকে একটা কাজ দিতে পারি? চিহ্নর কাছ থেকে—হয়ত “মণীবা”র পাবে—শ্রীমতী সুচিহ্না মিত্রের বর্তমান residential addressটা মেনে পাঠাতে পারো? খুব উপকার হবে

—বটুকরা

(১০)

অনিল,

বথাসময়ে তোমার পত্র পেয়েছি—সুচিহ্নাকেও চিঠি দিয়েছি কোনও উত্তর পাইনি। তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে—এবং অবশ্যস্বামী বলে উত্তর দিইনি। বাই হোক তুমি যে এত নৈতিক বোধাধ্যায়ী অব্যাহু হয়ে গেছ বুঝতে পারি নি। মবলংকর হলে গিয়েছ জনলায়। ক্রমশঃ ব্যস্ততার আমার দিনচর্চা হয়ে গেছে। সকাল ছাড়া দেখা হবার উপায় নেই। তাই সকালেই আমার প্রতীক্ষা করলে আমি স্থগী হবো। অস্ত্রান্ত বিবয়ে,—ধীরে ও অনিবার্ণভাবে Finalé,—Curtain Call এর দিকে এগোচ্ছি। কোনও দ্বীপ-প্রান্তাও তাকে ঠেকাতে পারবে না। বিকাল ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত ব্যস্ত। এসব ব্যাপার প্রায় পূর্বের মত। বিনয়ের সঙ্গে প্রায়শঃই দেখা হয়। অস্ত্রান্তরা ভালই আছে। আবার আসবো—সকালে। আজ সন্ধ্যায় ক্যারলবাগে, সন্ধ্যা ৭-৭।১০ টা পর্যন্ত থাকবো।

২৭/৮/৬২

বটুকরা

(১১)

24. 9. 69

প্রীতিভাষনে—

অনিল, তোমার কার্ড বথাসময়ে পেয়েছি। হ্যাঁ, এবারে তোমার সঙ্গে ভাল করে আড্ডাই দেওয়া গেল না। হুর্ভাগ্য আমারও। “সপ্তাহ”

পত্রিকায় হো-চি-মিন্‌ স্রবণে একটা কবিতা আমার বেরিয়েছে। পড়েছ ?
সত্যিই এক মহামানবের—এক যুগের পুরুষের প্রকাশ হল। He was
uncontroverially great। Stalin বা Mao অবিসম্বাদী নন।
Marxist-Linivist tradition-এর best exponent চলে গেলেন।
মিল্লীপ বোসের সঙ্গে দেখা হল—Indo—G D R Conference-এ
এসেছিল। চিহ্নও এসেছিল। আশা করি সকলে কুশলে আছেন। চিঠি
দিও—

—বটুকরা

(১২)

New Delhi 27.2.70

অনিল,

তোমার পত্র পেয়েছি—।

সব চেয়েছি—

পাইনি, কারণ দিল্লী আসোনি’—

কেন যে—জানি না। এবার

উবাও মনের পাখার—অস্ত্র কোথাও—

মিল্লী সুদূর—। মনেও কি দূর ?

মার দিও,—অনেক ধবরই পাচ্ছি বদিও—।

কিন্তু ঘটনা, ঘটনা ঘটনা। ঘটছে বদিও অনেক কিছুই।

প্রশ্ন করেছ—আমি কি বুঝ ? হয়তো বা তাই—

তবুও অনেক মনকে নাচাই।

—বটুকরা

পুনশ্চ:

গাঁজার কলকে নিয়ে কি

কল্‌কী এবার এলো

চরশ-ভাজের বাজার পাচার—।

সহস্র মাথা—সহস্র লাঠি—

ভয় মুক্ত হাজার হাজার

আমার বস্ত্র আছে অরণ্য—

সভ্য বস্ত্র একাকার আজ।

নূতন বেদের বেদমন্ত্র—

নূতন সমাজ।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

(১০)

New Delhi 1.3.70

প্রীতিভাষনেষু—

একেবারে ছড়ার ছড়া-ছড়ি।- খুব ভালো লাগল। তুমি ঠিকই লিখেছ—“মরলে শহীদ, বাঁচলে গান্ধী—।” কী যে ছুঁচোর কেমন চলছে—তা বলবার নয়। যে অযোগ্য নষ্ট করা হোলো—ইতিহাস তার স্মৃতি-আসলে শোধ নেবে। দিন আগত ওই। নজালাইটরা অযোগ্যের সন্ধানে গুপ্ত পেতে আছে। কিন্তু (খ) শিব-সৈনিকের মলেয়াও বসে নেই। এইটেই হচ্ছে crucial ব্যাপার! আমাদের অবস্থা—বাসে মারলেও মরেছি, রাবণে মারলেও মরেছি। বিপ্লবী “ঐন্দ্রিয়িক”-রাও বেশ টল্-টলারমান (unstable) মনে হচ্ছে। তাদের অবস্থা precarious। বাজে উপহারও তো একটা সীমা আছে। Day of reckoning—এলো বলে। Lumbago or no Lumbago—তোমার সঙ্গ এসময়ে আমাদের খুবই কাম্য। বেরার্ড-রোডের ঘাঁটিতে তোমার আবিষ্কার প্রাথমিক। এখন এখানে বসন্ত। এই ঋতু এবং এর আগমন সংবাদ যেন নিষিদ্ধ গোপন প্রণয়ীর মত উকি মারে। প্রকান্তে এই নির্দোষ, রাজনীতি-রিত্ত সংবাদটির পরিবেশন নিষেধ। কিন্তু বসন্ত একদিন আসবেই, দেখে নিও। এবং তুমিও আসবে—একান্তই সঙ্গ-লিপ্সু

বটুকদা

পুনশ্চ :

হ্যাঁ একটা সংবাদ! আমি দাঁত নিয়ে বেশ কষ্ট পাচ্ছি। অসহযোগী দীর্ঘ পক্ষাশ, বছর চরক্যানন্দী হয়ে কাটিয়ে এবার বিদায় চাইছে। কিন্তু এ বিদায়ের ব্যথা প্রাণাঘাতিক। মনীষের চিঠি পেরেছি—খুবই সর্ম্পন্দী।

Award পেয়েই খুব nostalgic ভাবে আমাদের চিঠি দিয়েছে। “এমপের” আচার্যকে চেনো? অনেকদিন আগে একটা কবিতা সম্বলিত চিঠি দিয়েছিলাম এখনও কোনও উত্তর নেই। কী ব্যাপার! বোধ হয় reject করেছে অথবা চিঠি পায়নি। কিছুদিন আগে শ্রীপদ্মভূষণ মিত্র (শম্ভু) দিল্লী এসে ঘুরে গেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হয় নি—আমিও খুব দেখা করার জন্য চেষ্টা করছিলাম না। বিশ্বাসের খবর কি? “চলো সাগরে”—না কি? দেখেছো? ঊৎপলের “লেনিনের ডাক?” আমাদের এমিকেও “লেনিন” ডাকাডাকি করছেন খুব—চিঠি দিও

—বটুকদা

(১৪)

নব দিল্লী c 2L3.70

স্বাধীনতা দিবস-বিবিকারান্তে

নিবেদন যেতঃ—

তোমার “৮শকা”—বিশ্বাসাত্মক পক্ষে সবও অস্বাভাবিক হিট্-হিট্ হিট্কারিত হার্যাক চমক-চূনিত হয়ে গেল। কিয়দিবস পূর্ব থেকেই নাতিশাসাস্তিক ঘড়-ঘড়ান্ড প্রবণ গোচর হচ্ছিল। শিবনেত্র হয়ে অত্র সন্তানবর্গ করজোড়ে অলদাঐ-অল্দি মোক্ষব্রণার অবসান কামনা প্রার্থনারত ছিলাম। অহুনা আগমঃ শান্তি! ও শান্তি: ও শান্তি: ও শান্তি...

শিরশিত্তি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেবশর্ম।

অনিল,

তোমার আর মণ্ডির আগমন প্রতীক্ষায় রইলাম। সাহিত্য Award হয়ত ২২শে। সেদিন আমার গানের ফুলের certificate পরীক্ষা। ফলে caremonyতে উপস্থিত হয়ত সম্ভব নয়। পরে অবশ্যই হবে কয়েকদিন নিশ্চয় থাকবে?

—বটুকদা

(১৫)

বৈশাখ, ১৩৭৭

ভাই অনিল,

নতুন বছরের প্রথম বর্ষের শুভাকাংক্ষা গ্রহণ করো। (কারণ আমাদের সমবেত মাতৃবিয়োগের পর—১৭ই মার্চের পর নতুন বছরের শুরু)।

তুমি না আসতে পারায় আমরা সকলেই খুব আশাহত হয়েছি। কিন্তু নিরুপায়।

তোমার বর্তমান পরিস্থিতি কিরূপ? শারীরিক মানসিক ও কেমিরিক।

ভালবাসা নিও

—বটুকদা

নূতন বছরের পদ্য :

কালোই লাল, লালই কালো

জ্বলে নীলে, রঙে জলে

নূতন পুরোহিত মন্ত্র বলে—

সবই এক, একই সব—

মানো, নইলে সবই শব।

বটুকদা

(১৬)

New Delhi 5

13/5

অনিল,

বধাসময়ে পত্রাহত। এর মধ্যে সবচেয়ে আহত হবার মত লাইন—
“হুচতুর কল্যাণীজ ছদ্মবেশে তলে তলে আমাদের বধাছানে বংশধর সঞ্চালনে
তৎপর—” একেবারে আছোলা হলে রক্তারক্তি। ঠিকই লিখেছ—“বামাচারী
(শবাচারীও বটেন) তাত্ত্বিকদের ব্যক্তিচায়ে ইত্যাদি ইত্যাদি।” বেশ
কাণ্ড! পটিশের বৈশাখের মনের আকাশ এইসব শবাচারী শব্দে ভরে
গেছে। ভ্রাক-চৈতন্যদের এখনও কি চৈতন্য হবে না! আমার সঙ্গে ঈশ্বরই
তোমার দেখা হবে। ঋষিক কিছু কাল আমার সঙ্গে করতে চায়। সেটা

অবশ্য short film বা documentary পর্যায়েই হবে। আগামী ২৪শে যে কলকাতার পদার্পণ করবো।

—বটুকদা

New Delhi

(১৭)

20-10-70

অনিল,

ঐতিহাসিক শ্রীতি আলিফন গ্রহণ কোরো। কিছুদিন পূর্বে তোমার কার্ড পেয়ে পরম আনন্দ লাভ করেছি। একেবারে Shakespeare থেকে Lao-Tse অনেক প্রণিধানযোগ্য মহা-বচন সব। Maoকে যে quote করেনি এই বাঁচেয়া। এবারে দিল্লী একেবারেই আসবে না প্রতিজ্ঞা করে বসেছ? এখানকার পূজা একরকম কাটলো। আমি আর বিনয় মিলে হাউস-খালে উৎপলের “রাইফেল” নাটক করলাম। আমি বলাবাহুল্য লকীতের chargeএই ছিলাম। এবার দিল্লীর অনেক আয়গার ‘রাইফেল’ হয়েছে—অস্ত্র অনেক group এর দ্বারা; একেবারে riddled with rifle bullets, কলকাতার অবস্থা কি? canada-Quebecএ যুগান্তকারী ব্যাপার ঘটতে চলেছে? অমলকে আমার Bijaya Greetings দিও।

তোমার পরিবারস্থ সকলকে আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। পত্রদ্বারা আমাকে অভিনন্দন কোরো।

শিবমিতি

বটুকদা

(১৮)

10-11-70

শ্রীতিভাষনেধু—অনিল,

তোমার পোষ্টকার্ড পেয়ে পরম আনন্দিত হলাম। তুমি অনেক তীর্থ-রেণু সংগ্রহ করে পুণ্যার্থন করেছো—মৎস্যস্থ হতভাগ্যকেও কিছুটা তাপ

দ্বিও। অনেক প্রগতি-ধর্মী বাক্য ও কর্ণে এতদিন লিপ্ত থেকেও ঠিক বুঝতে পারছি না কতদূর অগ্রসর হওয়া গেছে। প্রেরণতঃই মনে আসে,—চিরন্তন-সনাতন-অনন্ত ইত্যাদি সব কিছু আছে না কি। মার্কসীয় দর্শনের সমগ্র সমুদ্র সমাজের পক্ষে পরিণতিটা কি এই? শুধু কি capitalist-রাই কি exploit করে? তথাকথিত জন-নেতারা দলীয় আর্থে massকে exploit করে না? ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় না? ধারণা ছিল, marxism বত সব নোংরাশী ইত্যাদির, স্তম্ভাশীর anarchism ইত্যাদির প্রতিষেধক panacea! কিন্তু কই কোথায় বাচ্ছি আমরা? কোন তলহীন সর্বনাশের গর্তে? Ethics in any form বলে কি কিছু আছে অবশিষ্ট? লিখেছ—পুঞ্জেরা নিজেরের “ভয়ানক বাচ্ছা” বলিয়া আত্মপরিচয় ঘোষণা করিবে—সেইদিন যোগকলা পূর্ণ হইবে। কিন্তু দিল্লীতে সে যোগকলা already পূর্ণ হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে দিল্লীর এক নাট্যসভা—নাম “নাট্য-কাল”, কাল-নাট্যও বলতে পারো—(যার মধ্যে আমাদের প্রাক্তন comrade ধ্বংসেও involved) এক নাটক রক্ষা করে নাম “আমরা কলকাতা”। তার অভিনয় দৃষ্টে introduce করেছিল—সত্যিকারের জীবন্ত তত্ত্বের বাচ্ছা (বিশেষ ভাঙার চার পা বাঁধা অবস্থায় চিঁ চিঁ করে পরিভ্রমি চৌক্য করছে) এবং বিজ্ঞাপক ঘোষণা করছেন audienceএর দিকে তর্জনী লেহন করে—“আমরা সকলেই তত্ত্বের বাচ্ছা”—বিজ্ঞানের মত দর্শকদের reaction—“হ্যাঁ আপনারা হতে পারেন, তবে আমরা বাচ্ছি বাচ্ছের বাচ্ছা”। পিছনের এক row থেকে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—“হ্যাঁ, তবে paper-tiger !!”—ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি আছো কোথায়। একেই বলে living theatre!

আমিও তোমার মত কোমরে আক্রান্ত হয়েছি। বুঝতে পারছো তোমার একবার এখানে আসা স্বপ্নকার। হুঁচকারিন পূর্বে অনীতিবাবুকে দেখলায় ‘বলভবনে’। অর্থাৎ আজকাল তুমি অনীতিবাবুর পার্শ্বে নও। তোমার Mark Twain উদ্ধৃতিটি খুবই বখাষ ও সমরোচিত।

এখানে Right reaction Hindu Chauvinism অতি ভয়ানকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—তারা বলছে—“Peace bomb” “Spiritual regeneration” ॥ গতকালই গুদের Conference শেষ হল। প্রচুর লোক জুটিয়েছিল—শিবসেনারাগে এই অ-শিব বড়বয়ে লিপ্ত ছিল। অতএব বখাষী তোমার দিল্লী আসার প্রয়োজন। তোমার মাতৃদেবীকে আমার

প্রার্থনা দিও। কতটা ভয় ও তরিশপ্তিকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। তুমি আমার ভালোবাসা জানো—

—বটুকরা

(১১)

New Delhi-5

15. 12. 70

অনিল,

তোমার কার্ড পেয়ে আমারও হৃদয়ের জিয়া বন্ধ হয়ে বাবার উপক্রম হয়েছিল। যে কয়টি হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয় যুক্ত আছে তুমি তার মধ্যে অন্যতম। আমার পত্রের অনেক দিন অবধি কোনও উত্তর না পেয়ে আমার মনে অনেক রকম হুচিন্তা উঁকিঝুঁকি মারছিল। তুমি নিশ্চয়ই complete bed-restএ আছো। সম্পূর্ণ বিশ্রামের পর তুমি আমাদের হৃদয়ের আনন্দ-সঙ্গে ফিরে এসো। এই আশার ও তোমার জ্ঞাতব্যার্থীদের প্রার্থনা। চতুর্দিকে বা হৃদয় বিদারক ঘটনারি ঘটে চলেছে তাতে হৃদয়-ঘটিত অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। আমরা একরূপ আছি। বন্ধি পারো তোমার বর্তমান অবস্থা জানিয়ে চিঠি দিও।

বটুকরা

(২০)

New Delhi-5

৪-১-৭১

অথ হৃদয়-ঘটিত

অনিল,

আমি ইতিমধ্যে বয়ে ৮ দিনের জন্ম গিয়েছিলাম—কতটা ও নাতনিকে দেখতে। ফিরেছি কাল (৩১।৭১) তোমার কার্ড অপেক্ষারত দেখলাম। বয়ে থেকেই বাববপুর তাইস চ্যান্সেলার নিধনের খবর পেয়েছি। comment is unnecessary। তোমার হৃদয়-ঘটিত পর্যালোচনা হৃদয়-সংবেদ ও বধ্যবধ্য। ইংরাজ-জাতির তাই হৃদয়-হীনতার নানাভাবে বিকাশ সারা পৃথিবীতে প্রকট। এবং so-called নেতা, জনপতি সওয়াপন আর বিয়ক

বুদ্ধিভীষীরা! জনয়ের বিচার্ট মহাধেশে সারা পৃথিবী জুড়েই এই বিক্ষোভ চলেছে। এক কথার আমরা সকলেই অন্ন-বিত্তর, উদ্বিগ্ন, শঙ্কাজ্ঞত ও নানাপ্রকার অপ্রিয় চিন্তায় বহ্ন। কিন্তু নিরাপন্ন পলায়ন কি সম্ভব! ঠিকই লিখেছ—“চিন্তা যে আমাদের পেয়ে বসেছে সেই ১২৩৬-৩৭ সাল থেকে!” বাই হোক তুমি যদি ঝাট মাসে তা হলে দেখা হবে নিশ্চয়ই। অনেক কথা, অনেক ব্যথা অমে রয়েছে। আমরা একরূপ আছি।

ভালোবাসা নিও

বটুকধা

যদি পারো উত্তর দিও

বটুকধা

(২১)

New Delhi-5

12. 7. 71

অনিল,

শ্রীমান শান্তনুর বিবাহের আত্মীয়দিকে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে (8. 5. 71) তোমার আবির্ভাব। তারপর ৩০ দিন বৈবাহিক ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে গেলাম। তারপর এই প্রবল-চিহ্নিত তোমার কার্ড। স্বাক্ষরানে আলো-আধারিতে কেটে গেল। ইতিমধ্যে হঠাৎ গলাহার মহাপ্রয়াণে খুবই shocked হয়েছিলাম। তারপর ধারাবাহিক বজ্রার স্রোত;—শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, রাজনীতিক—বাংলাদেশ! ইরাকিয়া ধা। জুটো-অ্যামেরিকা—ইজলন্ড—চৈনিক পিংপং—শরণার্থী—, হত্যাহত্যা!! আর হত্যা!!! আরও কিছুদিন এই রকম চললে—(আমার frail constitution) “জুখিত পাবাণে”র পাগলা মেহের আলির মত অবস্থা হবে। ওখানকার অবস্থা যদি সম্ভব হয়, একটু intimately—ভেতর ব্যাপার লিখে অনিও।

ভালোবাসা নিও। প্রণয় প্রণম্যাদের প্রণাম দিও। ছোটদের স্নেহাশিস—

বটুকধা

১লা আগষ্ট, ৭১

রবিবার

তাই অনিল,

তোমার এক পূর্ণ-পদ্ম পেলাম। এবং বেশ অভিনিবেশ সহকারে পড়ে সমস্ত ধ্রুবকম করলাম। আমি তোমার সহিত এক-ধ্রুব এক-মত এক-পথ। তবে তবু একটা ব্যাপার আছে; “তবু”—উপলব্ধিকার অল্প অনেক কিছুই করে যাচ্ছি। “বাংলা-দেশ” সংক্রান্ত আন্দোলনেও নিদ্রী হিসাবে থাকি কটা ঐতিহ্য। তবে ঐ, সহ-সম্মী ও সহ-কর্মী খুবই কম পাঠ। বেশীর ভাগই হলুদ!!—আর racket-সন্ধানী। খুব ছুঃখের বিষয়—এখানকার কিছু বাঙালী ও অবাঙালী section “বাংলা দেশ” সম্পর্কে বেশ callous আর বিরুদ্ধ মনোভাব-সম্পন্ন। তবু গান লেখার চেষ্টা করি—। নিম্নোক্ত হারদ্যার বলে এখানকার (এবং সারা ভারতেরও) একজন বিখ্যাত উচ্চ কবির কবিতার ওপর (“লহু হিন্দু হকীকত হার”) সঙ্গীত ও ballet তৈরী করবার কাজে লেগে আছে। এটা ইয়াহিয়া খাঁ ও পাক-*fascism*এর বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী কবিতা। তবে “গরিবী বাচ্চাও” budget এর ঠেলায় প্রায় সবাই কুপোকাং। অর্থ নাই, তবু অনর্থ আছে। আমাদের (?) পাটি আর তুধাকবিত প্রগতিশীল চিন্তা-বীরদের সম্বন্ধে বা মন্তব্য করেছ—তা সম্পূর্ণভাবে মানি। পুরোনো পাটির অনেক ঘুঘু (এখন তারা বাড়ী-পাড়ী ও এরোপ্লেন-বিহারী) নানা ছদ্মবেশে নানাভাবে racket ও সুবোপসন্ধানের ঘুরে বেড়াচ্ছে। গারে পাটির নামাবলী, মুখে মার্কস-নাম। অথচ তারা পেটি বুর্জোয়ার চূড়ান্ত। চেনো অনেককেই। নাম করলাম না। এখন আমি সাধারণত ওদের এড়িয়েই চলি। সব শালা *social climbers*! নেহাৎ কাজের উপলক্ষ ছাড়া দেখা সাক্ষাৎ হয় না। এদেরই ভীড়ের ভেতর ছএকটা খাঁটি লোকের সন্ধানও পাওয়া যায়। তারা বতটুকু পারে *hoping against hope*, নীরবে কাজ করে যাচ্ছে।

ভাল লাগে না। কিছুই ভাল লাগে না। ভীষণ *chronic insomnia*র ভুগছি। সবই নার্ভের ব্যাপার। *Everything is getting on my nerves*! ঘুম নেই। আশা নেই!! প্রত্যাশা নেই!! তবু—ঐ তবু!!!

তোমার কত কল্যাণীরা শ্রীমতী রুপুর একটা বিবাহ হয়ে গেলে আমিও নিশ্চিন্ত হই। ভাল ছেলের সন্ধান পেলে তোমাকে নিশ্চয়ই জানাবো। হুফুস ও দিলীপের বিবাহ সংবাদে খুব আনন্দিত হলাম। আরও একটু সবল ও সুস্থ অবস্থায় এয়িকে আবার আসবে না? এবার রুপকেও নিয়ে এসো। এবার আগাটা না-বহুর! স্থনীতিবাবু তো মাসে মাসেই দিল্লীতে আসেন। গলাদা তো চলে গেলেন—“বহুরপী”র কি অবস্থা জানি না। শহু তো রবীন্দ্রভারতীতে পেছে। অমল, বিজন—কে কেমন আছে? মোটামুটি বৈপ্লবিক হত্যা-টত্যা কেমন চলছে? শ্রেণীশত্রু নিধন আর বিপ্লব! এক কাজ করলে হয়—যতসব বৈপ্লবিক লোকেরা আছেন মায় lumpen-স্তোত্রা পর্যন্ত—সব বে বা পারে হাজিরায় নিয়ে—পড়ের মাঠে সমবেত হয়ে “তবে যে শালারা আর”—বলে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করে—সকলে সকলকে ধ্বংস করে ফেললে বোধহয় মার্কস-মন্ত্র বিপ্লবের চূড়ান্ত হয়। প্রায় ১৯২০ লক্ষ লোক এভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। শিরে করাঘাত করে ভাবি—কোথায় রইলেন মার্কস-একলেস—কোথায় রইলেন লেনিন—হোচিমিন্—! হা হতোম্!

এ সবই বলাই বাহুল্য—for home consumption বাহিরে প্রকাশিতব্য নয়।

কেমন আছে? ভালোবাসা নিও। তোমার উত্তরের প্রত্যাশায়।

—বটুকরা

(২৩)

22.10.71

ভাই অনিল,

তোমার পূর্বের ছই পত্রই হস্তগত। এখানে নানান স্বামেলার জড়িত থেকে ঠিক সময় উত্তর দেওয়া হয় নি। সেজন্য ক্ষমা চাইছি। তুমি কবে আসছ? সঠিক জানাবে। এখানে কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশ থেকে প্রায় জিশজন শিল্পী এসেছিলেন। আলাপ করে খুব ভাল লাগল। প্রায় তিন সপ্তাহ দিল্লীতে ছিলেন। তবে ভিতরের অনেক সব কথা আছে—ওদের মধ্যে মিশে সে সব জানতে পাঠা যায়। এখন বিনয়ের বাড়ীতে সজল-রেবা-তাদের

কড়া—বেড়াতে এসেছে। দেখা হয়েছে। অনেক কথা জ্ঞানাম—জানতে পারলাম। সরোজের কথাও—[.....]।

এদিকে চতুর্দিকে সাজ সাজ রব।

লড়াই কি সত্যি সত্যিই লাগবে ???

নিজাঙে কমা করে উত্তর দিও। সকলে এক প্রকার আছি।

বটুকরা

(২৪)

১১ই মার্চ, ৭২

অনিল,

বাসমত্রে তোমার পোস্টকার্ড হৃদয়ঙ্গম।

আমি এখনও বাসাবল করতে পারি নি। সময়ও অর্ধাতাবে। যে কোনো বাসা বহুলাতে পেলেই ভাড়া ৪৫০/- টাকার কম হবে না। অর্থাৎ বাড়ী ভাড়াটা দিবে শ্রেষ্ঠ অনশন বা অর্ধাশনে কাল কাটাতে হবে। সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে। তবু নিম্নলিখিত বোঝার মত তথ্যগুলি বুঝিয়ে চলেছি। সিদ্ধার্থর একটা অসুস্থতার চাকরী জোগাড় করার চেষ্টা আছি। সে চেষ্টা সফল হলে, ওরই মধ্যে একটু relief পাবো। ভারতীয় (কাঁচ) কলাকল্লের সঙ্গে নৃতন পর্যায়ে গিয়ে জানতে পারলাম—ওখানে আর বেশীদিন টিকতে পারবো না। ওখানে সব anti-ইন্দিরা অনগন্য fascist-এর দল। অত্যাচার পদে পদে আমাদের হিংসাধ্বষণ চলছে। আমার সঙ্গী আরও হুচারণন আছেন। সকলেই ন যবো ন তবো—জাব।

আজ ইন্দিরা-কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে এলাম।—হাতে কালি বেধে। তোমাদের ওখানে ...রা কি করছে? ধবরের কাগজ মারফৎ অবস্তা-প্রমোদ-জ্যোতির প্রমাদপূর্ণ কাণ্ড-কারখানার ধবর পাচ্ছি। রেডিও regularly শুদ্ধি—বেশ ভাল লাগে শুদ্ধিতে। কবে যে পাবনট, খুলনা—ঢাকা ইত্যাদি সব ঘুরে আসতে পারবো না জানি না। খুব ইচ্ছা করে যেতে। ইতিমধ্যে একদিন নারায়ণ সেনের ওখানে গিয়েছিলাম,— নিক্সন—চু-এন্-লাই—মাও—ইত্যাদি সব বিষয়ে অনেক আলোচনা হল। আমার ১৬ই মার্চ Ballet troupe এর সঙ্গে বেনারস যাবার কথা আছে।

আমি হরত ওদের সঙ্গে এখন যাবো না। পরে যোগদান করবো—১০।১২

দিন বাড়ে। তাতে মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে হয়ত দেখা হবে—।
ইলেকশানের খবরাখবর দিয়ে পত্রপাঠ উত্তর শেলে ভাল হয়।

অলমিতি

—বটুকরা

(২৫)

7-8-73

অনিল,

গত শনিবার (4-8-73) সন্ধ্যা ৬-৩৫শে আমার স্ত্রী Willingdon হাসপাতালে পরলোকগতা হয়েছেন। হঠাৎ cerebral strokeএ আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ আর লিখতে পারছি না। কেমন আছো?

—বটুকরা

(২৬)

৫/১১/৭৩

ভাই অনিল,

শোকাবেগ প্রশমিত, তবে শূভস্থান পূর্ণ হবার নয়। মিতুকে ক'লকাতায় তার বিদ্বিষ-মামাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। তার চিঠিও পেয়েছি। Transfer নিয়ে গেছে। চেষ্টা হচ্ছে, কোথাও বহিঃরশ্মি প্রেরণে স্তম্ভিত করিয়ে দেওয়া যায়। মনীষার নিয়মিত বাও? বহিঃবাও, দিলীপ বোসকে আমার কথা বোলো—আর বোলো—সে বহিঃপূর্বের কথামত—আলি আকবর music schoolএ উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের class খুলতে পারে তাহলে এ হতভাগ্যের কিছু সাশ্রয় হয়। এখানকার বাসা ভেঙে গেছে। এখানকার বাস উঠিয়ে October নাগাদ ক'লকাতায় পৌঁছবার ইচ্ছা আছে। বিষ্ণু-চিহ্নগ্রাণ আমার স্তম্ভ চেষ্টা করছে। সিদ্ধার্থ রাধে, আমি খাই। স্মৃতির হুঃসহ বোকা নিয়ে অস্ত্রমনক হয়ে থাকবার চেষ্টা করি। চিঠি দিও। দিলীপকে বোলো।

—বটুকরা

(২৭)

11A/38 W.E.A. 20-9-73

স্রীতিভাষনেয়—

অনিল, আশাকরি আমার চিঠি হস্তগত হয়েছে। ইতিমধ্যে দিলীপ বোসের চিঠি পেয়েছি। আলি আকবরের ফুলের অবস্থা ভাল নয়। কিছু মনে কোরো না, আমার বর্তমান মনের অবস্থায় গান বাজনা কাব্য কালচার-কালচার কিছুই ভাল লাগছে না। ওতে আর্থিক বা পরমার্থিক কিছুই হবার নয়। তার চেয়ে ক্ষেত চাষ করা বা হোকান বেওয়া অনেক ভাল। গান-কবিতা আমার নিজের ক্ষমতা নিজের কাছেই থাক। এ বিষয়ে আমি seriously চিন্তা করছি। অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য না হলে প্রাণধারণ চকর দেশোদ্ধার—culture—vulture তো অনেক করা গেল। না হল দেশোদ্ধার—না হল স্বাচ্ছন্দ্য।

Environmental change দরকার। অলের ওপর নাম স্বাক্ষর করেছি। লোকসেবায় ভূলে যেতে দেয়ী হবে না। ভাল আছি। এখন কলকাতায় বাচ্ছি না। চিঠি দিও

—বটুকরা

(২৮)

5.10.73

তোমার “অন্তর্দেশীয়-পত্র কার্ডে” লেখা চিঠি পেয়েছি। এখানে চিহ্ন ও উমা দুজনের সঙ্গেই দেখা হয়েছে। “পাঠসভা” ও অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে। ইয়া, ব্যাপারটা প্রায় পাকাই, নভেম্বরের আগে কলকাতায় বাওয়া সম্ভব নয়। কমলা গলস্ ফুলেও কথা আছে—সেটা জাহাজঘরীর আগে পাকবে না। তবে তুমি বা লিখেছ—তা ঠিক নয়। দুটো ফুলে ভাগ্যভাগি করে। সপ্তাহে ৫ দিন ক্লাস—২ ঘণ্টা করে। তার বেশি এখন physically পারা সম্ভব নয়—সেটা স্পষ্ট বলে নিয়েছি। তারা আপাততঃ hours এর সম্বন্ধে বেশি জোর দিচ্ছে না। আর এটা প্রেক্ষাপটের tuitionই নয়। গান-শেখানো ছাড়াও নতুন নতুন creative experiment এর ওপরই ওরা emphasis দিতে চায়—অন্ততঃ আমি তাই তাদের convince করিয়েছি। তা ছাড়া বছরে প্রায় ৪ মাস ছুটি। এবং বিকাল ৪।০ টার পর free to

do anything & like—এ freedomটা খুব অল্পের। দিল্লীশের সঙ্গে পড়ালাপ চলছে। ব্যাপারটি ঠিক মামুলীভাবে চাষ-বাস নয়—একটু অন্তরকম—multipurpose co-operative farming—একটা colony বা village এর মত—যার অন্তরস্থলে পান, দুজা-নাটক ও painting ও থাকবে। এবং এটা একলায় ব্যাপারও নয়—সামূহিক প্রয়াস। যে যেমন সামর্থ্য, বুদ্ধি ও রুচি ও বয়স অনুযায়ী যতটুকু পারবে তা সাদরে গ্রহীত হবে। সুস্থ বহুল স্বাস্থ্যস্বাভে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে তাকানো যাবে না। এটাকে বলা যেতে পারে total, complete, creative living। এই অনশনে অর্ধাশনে উৎসাহিত করে জীবন ধারণ থেকে মুক্তি। বহু বহু দিন পূর্বে যোশির সঙ্গেও এই ‘artists’ cooperative colony সম্বন্ধে কথা হয়েছিল—central troupe সূত্রে—সে বোম্বের ১৯৪৭-৪৮-শে তারও আগে দীক্ষা নিয়েছিলেন আচার্য সি. সি. রায় এবং শুকদেব রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বাই হোক এ অন্ত ব্যাপার। সাক্ষাতে বিশ্ব আলোচনা করবো। অনেকদিন পূর্বেও এই আদর্শে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করতে পারলে আমাদের দেশের অনেক social, economic, ও political maladies থেকে বাঁচতে আমরা পারতাম। এই সব cooperative cellsগুলোই এক একটা বিপ্লবের denও হতে পারতো। তুমি বা লিখেছো—তোমার disillusionment আমিও share করি। তবু...!!! সিদ্ধার্থ এখন পাকা রাগুনী হয়ে গেছে। সেই আমাকে বাঁচিয়েছে, দেখ-ভাল করছে। ব্যক্তিগত জীবনের যে দিকটা চিরদিনের মত খুঁজ হয়ে গেছে—তা ভরাবার বুধা চেষ্টা করছি না। Through creative work এর sublimation আনবার চেষ্টা করছি। তুমি কবে নাগাদ আসছো? তার অপেক্ষার রইলাম—জানিও। উত্তর দিও। অমলের, রাম বহুব্রের খবর কি?

ভালবাসা নিও

তোমার বটুকরা

পুনশ্চ

মিতু, তার আমার বাড়ীতে, বিছর কাছে আছে। পড়াশুনা কলকাতাতেই আপাতত

বটুকরা

(২০)

11A/38 W. E. A, Karolbagh

16/2/74

অনিল,

এবারে সত্যিই মনো হচ্ছি কলকাতায়—এ মাসের শেষের দিকে—২৭শে
সিঙ্গে কলকাতায় পৌঁছছি। থাকবো রথীর গুহানে—4, Heysham Road,
Bhowanipur, বিজনের বাড়ীর। দেখা অবশ্যই হবে। আমি প্রৌঢ়
জীবনকে ধারণকে করে। অস্ত্র সব সাক্ষাৎকারে—

অলমিতি

—বটুকরা

(৩০)

5 S. R. Das Road, Cal-26

26/10/74

অনিল,

৮বিজয়ার প্রীতি ও আলিঙ্গন পাঠাচ্ছি—গ্রহণ কোরো। আজ দিল্লী থেকে
কিরলার। আমার ছোট ছেলে তার নিজের পছন্দমত তার এক বাচ্চবীকে
বিরে করে কেলেকে। তাই মিতুকে নিয়ে attend করতে গিয়েছিলার।
মেয়েটি খুব ভাল বলেই মনে হল। তোমার মাকে আমার প্রণাম দিও।
শ্রীমতী রুপকে আমার আশীর্বাদ। দিল্লীতে ভবানীর বৃত্ত আমাকে খুব
শোকাহত করেছে। বেশ হাসিখুশি আনন্দময় তাজা টাটকা ছেলেটা ছিল—
চলে গেল। Brain Cancer নাকি হয়েছিল। নিরতি কেন বাধ্যতে। বলা
বাহ্য্য ছ একদিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করবো—National Library
তেই হবে। সাক্ষাতে অনেক কথা হবে। ইতিমধ্যে ঢাকার ঘুরে এলাম—
খরচ পেয়েছ বোধহয়। এবার ৮পূজা সংখ্যায় প্রচুর কবিতা-লেখা ইত্যাদি
লিখেছি—হয়ত চোখে পড়েছে। আজ চলি—অলমিতি—

বটুকরা

(৩১)

5, S. R. Das Road,

Calcutta 26

15/11/74

প্রিয় অনিল,

গত ৮শালীপূজার তোমার ঠখানে কালী দেখা হল না। আমি তার আগের দিনই কলকাতার থেকে গলায়ন করে কল্যাণীতে এক জায়গায় গিয়ে লুকিয়েছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে, অনেকদিন বাদে কলকাতার ৮পূজার অতিমানবীয় religious fervour দেখলাম আমার heart ও nerve এর পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়। সেই জন্য কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ত কথা রাখতে সাহস পাইনি। আচম্কা আওয়াজে আজকাল palpitation হয় এবং রাজে একেবারে ঘুম হয় না। আশাকরি নিজগুণে আরামকে কমা করবে। আমি ঈশ্বরই তোমার সঙ্গে “মনীষার” অথবা বাড়ীতে দেখা করবো। অমল ও রাম বহুদেবের সঙ্গেও দেখা করতে চাই? আমি কল্যাণী থেকে গতকাল ফিরেছি। এখবর পেলাম—বেশ ভাল লাগল। আমার সময়োচিত আলিঙ্গন ও সম্ভাষণাদি নিও—

বটুকদা

(৩২)

৫, এস. আর. দাস রোড,

১লা বৈশাখ,

১৯৮২

শ্রীতিতামনেয়,

অনিল, শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। আমার শরীরটা বিশেষ ভাল বাচ্ছে না—B. P. বেশ high হয়েছে। কলে বিবাহ-বাসবে উপস্থিত না হতে পারলে আশ্চর্য বা দুঃখিত হয়ো না। পরে হৃদয় হয়ে রুণ-দম্পতীকে আশীর্বাদ করে আসবো। শুভকার্য হুঁতাবে সম্পন্ন হোক, এই কামনা করি। আশা করি তুমি হুঁহু আছো। শ্রীমতী রুণকে আশীর্বাদ ও হাকে প্রণাম জানাই—

একাত্তর তোমার বটুকদা

(৩৩)

প্রিয় অনিল,

দ্বিতীয়বার এসে ফিরে গেলাম। আমার কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত আছি। মাঝখানে শরীর বেশ খারাপ হয়ে পড়েছিল—সেই পুরোনো Gastritis—তার ওপর অরু। শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। এখন ভাল আছি। I just took a chance এর আগের দিন তাপস সেন আমার সঙ্গে ছিলেন। আবার আসবো। পুরো July মাসটা হয়ত থাকতে হতে পারে। তুমি একদিন Ballygunje Place-এ “পাঠভবনে”—আমাদের rehearsal সুনতে এসো না। সময় সন্ধ্যা ৩টা থেকে ৯টা। আজ চললাম। বেলা ২-৪০

বটুকরা

শ্রীপেন্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা

‘নবজীবনের গান’—এর দ্বিতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞ মৈত্র তরুণ বয়স থেকেই আমাদের কাছে কিংবদন্তীর পুরুষ। আমাদের সাহিত্যিক জীবন শুরু আগেরই তিনি দ্বিতীয় প্রবাসী। বড় একটা কলকাতা আসেন না, এলেও নিত্যন্ত অনিষ্টজনেরা ছাড়া কেউ সে খবর জানতে পারে না।

সেবার, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কোনো সময় হবে, বটুকরা কলকাতা এলে সম্ভবত শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-র উদ্যোগে চৌরঙ্গী রোডের একটি বাড়িতে (নীলা মজুমদারের বাড়ি কি?) তাঁর গান শোনার ব্যবস্থা হয়। সাহিত্যিক সমাজে মতাদর্শগত ভাগাভাগি তখন বেশ প্রবলই ছিল। কিন্তু অবাধ হয়ে লক্ষ্য করলুম অন্যাকীর্ণ সেই ঘরে বিষ্ণুবাবু মতোই শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীনিরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখও বটুকরার গান সুনতে এসেছেন। তাঁর গলা সেদিন ভালো ছিল না। ‘নবজীবনের গান’ সেই প্রথম তিনি। একদম শেষে পেরেছিলেন “নাই রস নাই, দারুণ দহন বেলা”। আজও এ-গান আমাকে হত করে।

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীহরিশ মুখোপাধ্যায় ও আমি নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলন উপলক্ষে দ্বিতীয় বার। ছিলাম বিনয় রায়ের বাড়ি। বটুকরার সঙ্গে সেইবারই আমার নিবিড় পরিচয় হয়।

১৯৭০ সালে, লেনিন অম্মশতবর্ষে, 'আমি 'লেনিন শতাব্দী' নামে একশো জন বাঙালি কবির লেনিনের উদ্দেশে নিবেদিত কবিতার একটি সংকলন সম্পাদনা করি। এই সংকলনের অন্তর্গত একটি দীর্ঘ কবিতা চেয়ে আমি বটুকহাকে চিঠি লিখি। 'মধুবংশীর গলি' একদিন তিনিই লিখেছিলেন— এই কথা তাঁকে মনে করিয়ে দি।

কু-একজন অন্তরঙ্গকে বার দিলে এই সময়টা কলকাতার সঙ্গে চিঠিপত্রের বটুকহার সম্পর্ক কী। আমাদের প্রায়শ্চেষ্টে সঙ্গে সম্পর্ক তো তখনো ঠিকমতো গড়েই ওঠে নি। বটুকহা এই সময় কলকাতার পত্র-পত্রিকায় কিছুই প্রায় লেখেন না। দিল্লীর বাঙালিদের কাগজে যদি কিছু লেখেনও, আমরা জানতে পারি না। (তার অর্থ এই নয় যে সাংস্কৃতিকভাবে তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন দিল্লীতে। 'রামলীলা' এবং অনেক কিছু করছেন। কলকাতায় এগেণ্ড সত্যজিৎ রায় আর ষষ্ঠিক ঘটকের ছবিতে সুর দিয়ে গেছেন।) বোধহয় বলা বার সাধারণ ভাবে আমাদের সাহিত্যিক পরিমণ্ডল থেকে তিনি তখন বিচ্ছিন্ন।

এই অবস্থায় আমার চিঠি পেয়েই বটুকহা বড় একটা কবিতা লিখে পাঠান। তাঁর মধ্যে হয়তো নতুন করে লেখার আগ্রহ জাগে। সেই থেকে 'পরিচর' 'কালান্দর' এবং সহবাসী কিছু পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। মঞ্জুর রায়েদ তৎপরতার 'সারস্বত লাইব্রেরি' নতুন করে 'মধুবংশীর গলি' প্রকাশ করে। তারপর বটুকহা কলকাতা আসেন এবং রাস্তারাস্তি সকলের হয়ে বান—বেন মাঝখানে কোনোই বিচ্ছেদ ঘটে নি। নার্সারির শিশু, নবীনতম লেখক বা শিল্পী...সকলেরই তিনি বটুকহা।

'আমাদের নবজীবনের গান' লেখার সূত্রে বটুকহার সঙ্গে আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়ি আসতেন। আমার শর্ত ছিল এলেই রাজতোপ আর অর্ধ পান খাওয়ার। বটুকহা বাচ্চাদের মতো মিষ্টি খেতে ভালো বাসতেন। বালক মেয়েজনাথ 'পাঠভবন'-এ তাঁর ছাত্র। সেই ছবানেও আসতেন। বৃদ্ধা মা থেকে শিশু বোনদি পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই তাঁর খাতিয়। মেয়ে বটুকহার হাত বা কাঁধ ধরে এমনভাবে বুলত যে বটুকহাকে মনে হত গাছ। একবার একটা টিকানো লেখা বন্ধ ইনল্যাণ্ড হাতে করে "চিঠি চিঠি" বলতে বলতে বাড়ি চুকেছিলেন। বললেন—বিশ্রান্ত ভাকবান্ন খুঁজে বেড়ানোর চেয়ে ভেবে দেখলাম তোমার হাতে তেলিভারি দেওয়াই সেক্ষেত্র। কি বলিস ?

আমি জানি কলকাতায় অন্তত একশো বাড়িতে বটুকদার এমন বাতায়াক ছিল।

‘কবী’র স্বপ্ন বলে বটুকদা প্রায়ই আমাকে উত্তেজিত করতেন। বলতেন—এ হবে আমাদের নয়া সংসার, কমিউন লাইফ। প্রত্যেকেই স্বজনশীল, নিজের নিজের মিডিয়ামে কাজ করছে। শুধু রাসায় জন্ত একটি লোক—বাকিটা স্বাবলম্বন। ইচ্ছা আকরজিৎ হু হিহ নীত। আর যোগ বাটির সঙ্গে, মাহুকের সঙ্গে, ঝাড়প্রাচীর আরিবাসীদের সঙ্গে। কবী... বুঝি ?

একবার হিন্তর গানবাজনার পর একসঙ্গে বাসে কিরছি। বেশ অনেকটা পথ। বটুকদা চেম্বুজে হাত ঘুরিয়ে নিজের মনেই গুনগুন করছেন। হঠাৎ হুর্জাজা ধামিয়ে বেশ একটু উত্তেজনার সঙ্গে বললেন—জানিস কীপ, আমি শালা গান গাইতে গাইতে মরে যেতে চাই। আমি হব গানের শহিদ। (বটুকদা ছিলেন মূর্তিমান কচি, আর কোনোদিন তাঁর মুখে আমি স্নায়ু শুনি নি।)

আমার অল্পহতার সংবাদ পেয়ে হারজাবাহ বাওয়ার ছু-একদিন আগে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি এসেছিলেন। জীবনে সেই একদিনই তাঁকে ডিপ্রেসড, কিছু বা পরাজিত, মনে হয়েছিল। কিন্তু সেভাবে তলিয়ে ডাবি নি। কারণ মাহুটটা কে বটুকদা!

তারপর হঠাতই ‘আকাশবাণী’র সংবাদ শুনলাম।

ভারতের সব থেকে ক্ষতগারী ট্রেন ‘করমণ্ডল এক্সপ্রেস’-এর সব থেকে উঁচু একটা বার্থে শুয়ে বটুকদা সবার অভ্যুত্রে শেখনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সার্থক হয়েছে বটুকদার জীবনভর আননির্মিতির সাধনা। হাওড়া স্টেশনে কেউই বৃত্ত সহযাত্রীকে চিনতে পারে নি। তারপর বোলা যেটে ভারত-সংস্কৃতির মোড় ঘুরিয়েছেন। আমি জানি কামরার আলো যখন কীপ, সবাই যখন সুমোহে, ধাবমান ‘করমণ্ডল এক্সপ্রেস’-এর উঁচু বার্থের নিরালা আলোয় শুয়ে বটুকদা তখন ছবীর প্রতির আবেগে আপন মনে গান গেয়ে উঠেছিলেন। চরম মুহূর্তে কি গান তিনি গাইছিলেন, অথবা কোন রাগ—যদি জানতে পারতাম।

বটুকদা আমার অনেক চিঠি লিখেছেন। গোড়ার দিকের কয়েকটি এবং শেষের একটি অবিকল প্রকাশিত হল। প্রথম চারটে চিঠি পোস্টকার্ডে আর শেষ দুটি ইনল্যাণ্ডে লেখা ছিল। —দীপেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নব-দিল্লী ৫

4.4.70

তাই দীপেন,

কয়েকদিন হল তোমার কার্ড হস্তগত। লেনিন লম্বা যুংসই ঠিক কী লিখবো ভেবে পাচ্ছি না। অনেক কিছুই তো লেখা যায়। সব মাথার মধ্যে ভীড় করে আসে, এসে গোলমাল পাকিয়ে দেয়। বাই হোক আমি চেষ্টা করছি আনবে। হু' এক দিনের মধ্যে কিছু প্রসব হয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যে মণীন্দ্র^১ এসেছিলেন Award^২ নিতে। ক্যারলবাগে বজীর সংসদে একদিন তার কবিতা পাঠ হল।—“এই ভয়—ভয়ভূমি।” খুবই ভাল লাগল—খুব bold, direct আর honest। ও বলে এতে “মহু-বংশীর গলি”র খুব influence আছে। হবেও বা! তোমার খবর কি? অনেকদিন দিল্লী নামক গ্রামে পদার্পণ করে নি। প্রীতিভক্তহাস্তে—

বটুকখা—

New Delhi

25/4/70

স্নেহের দীপু,

তোমার কার্ড পেয়ে স্তব্ধ হলাম। আমার পূর্বের লেখা কার্ড পেয়েছিলে তো? শেষ পর্যন্ত একটা কবিতার কাঠামো খাড়া করতে সক্ষম হয়েছি। কিছুটা plain speaking, শক্ত কথা directly বলার চেষ্টা করেছি। অথচ কবিতাও হতে হবে। নাতিবৃহৎ ২৩ পাতার কবিতা হয়েছে। হয়ত তোমাদের ভাল লাগবে। কিছু কিছু section antagonised হবে হয়ত। তা হোক। Fair copy করে ২৪ দিনের মধ্যে তোমার 765 'P' Block, New Alipur এর ঠিকানায় পাঠাবো। কি বল? ঋদ্ধিক* এখন এখানে। আজ তার সঙ্গে দেখা হবে। অনেক নতুন plan নিয়ে এসেছে।

স্বভাবের* খবর কি?

দয়া করে Date দিয়ে চিঠির উত্তর দিও। আমার কবিতাটির নাম হবে—

“তবে এসো”—(লেনিনের নামে শপথ)

বটুকখা—

New Delhi 5

11/5/70

মেহের দীপু,

তোমার কার্ড পেয়ে আশ্চর্য হলাম। দেবী বেধে তাবহিলাম—হয়ত কবিতাটা তোমার হস্তগত হয় নি। কবিতাটা তোমার ভাল লেগেছে ভেনে খুশী হলাম। কিন্তু অল্প সকলের অল্পমোদন পাবে কি? পক্ষ্য আমাদের এমন বন্ধা-প্রশ্ন—কে যে কোন্ দিকে চলবে, প্রায়—unpredictable! তবে এ সময় একটু গুরুত্ব হয়েই থাকে। খুব historic ও important transition period এর মধ্য দিয়ে আমরা চলছি। সুভাবের খবর কি? সে তো, অন্ততঃ আমাদের কাছে, অনেক দূরের মাহুত হয়ে গেছে। কেন বলতে পারি না! তোমাদের সেই মিষ্টানের দোকানের ওপর—পরিচয়ের আড্ডাটা বেশ ছিল। মিষ্টতা থেকে দূরে সরে গেলে কেন? আর কিছু না হোক, মাঝে মাঝে, রসগোল্লা, রাক্তভোগ ইত্যাদি সব সেবন করা যেত—কি বল? চীৎকার? খবর কি? এইই হয়ত কলকাতায় দেখা হতে পারে

নিত্য শুভাহুয়ারী

বটুকবা

New Delhi 5

19.10.70

প্রীতিভাজনেষু

দীপেন্দ্র, তোমার কার্ড পেয়ে ব্যপারোনাতি আনন্দিত। “লেনিন্ শতাব্দী”—পাঠাওনি কেন? মঙ্গীক্সের কাছে এর বিষয়ে জানতে পেরেছিলাম। বই কি পাঠাবে? যদি পাঠাও তাহলে পড়ে আমার মতব্য পেল করব। “কালান্ডর” বা—“পরিচয়”—এ ঈশ্বর-চন্দ্র সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখতে—বলেছ। চেষ্টা করে দেখবো,—এই পর্যন্ত বলতে পারি। বিভাসাগর সম্বন্ধে অনেক কিছুই লেখা যায়। কিন্তু—inspired হয়ে “কবিতা” লেখা যায় কিনা জানিনা।—মঙ্গীক্স-রা লিখে নাকি?

পূজা আশাকরি নির্বিঘ্নে—হতে পেরেছে। হুতাবের ধবর কি? ওকি একেবারে সরে দাঁড়িয়েছে?

মুখা সম্বর চিঠির উত্তর দিও। আশ চলি—

তোমার বটুকদা

New Delhi 5

27.10.70

প্রীতিভাজনেমু

দীপেন, তোমার কার্ড ও “লেনিন্ শতাব্দী” পেয়ে—খুব আনন্দিত হলাম।—সংকলনটি বেশ মনোজ্ঞ ও বিশিষ্ট হয়েছে। তোমার কার্ডে হুতাবের ধবর পেয়ে খুব ভাল লাগল। দেখি বিভাসাগরের ওপর কিছু লেখা যায় কিনা—চেষ্টা তো করি, তারপর যা হবার হবে। যদি স্প্রেন্সব হয় সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে লিখে পাঠাবো।

এক্সো-এশীয় লেখক সম্মেলনে নিশ্চয়ই—বোগদান করব। “শান্তি-সংহতি ও আত্মীয়তা” এই সবেস ওপর যদি লিখতে পারি, লিখবো। এবার পুজার—বিনয়-রা হাউস-খালে উপলব্ধ “রাইকেল” নাটকটার—stage version করল। তার গান ও আবহ সৃষ্টি আমার ছিল। মোটামুটি সকলে appreciate করেছিল।

বিকুধাবু* মণীন্দ্র, লোকনাথ*—এদের সঙ্গে দেখা হয়? খুব শ্রদ্ধা হইত আমার একটা কবিতা সংকলন বেয়োবে। মণীন্দ্র তার ভার নিয়েছে। মণীন্দ্রও তো এক্সো-এশীয় লেখক সম্মেলন উপলক্ষে দিল্লীতে আসছে।

ঔষিকের ঘটকের documentary “বারার লেনিন” বেবেছে? তার মধ্যে আমার music আছে। তার মধ্যে লেনিনের ওপর একটা নতুন গান সংযোজিত হয়েছে। শেষটার landgrab দেখানো হয়েছে। Censor এ তাই আটকেছে। খুব powerful ছবি হয়েছে। ঔষিকের latest ধবর কি?

এখানে একটা গানের ছল চালাই—“বঙ্গ ভারতী” নাম। শুধু মণীন্দ্র-সঙ্গীতই নয়—বাংলাদেশের সমস্ত গানই শেখানো হয়। West Bengal Govt. এর grant এর ওপর চলে। তবে কতদিন চলবে জানি না।

আগামী মার্চে হয়ত এখানকার বাঙ্গালীদের সমবেত প্রচেষ্টায় Bengal Association—সারকং—(এর মধ্যে কার্যলব্ধগণের “বঙ্গীয় সংসদ” একটা leading role নিচ্ছে),—“বঙ্গ সংস্কৃতি-সম্মেলন”—সপ্তাহ-ব্যাপী উৎসব অহুত্বিত হবে। মুখ্য উদ্দেশ্য বর্তমান বাংলা দেশের একটা image project করা। এর মধ্যে—গান, নাটক, বাজা, কথকতা, কবির গান, ফিল্ম, চিত্র ও শিল্প প্রদর্শনী—মায় বাংলাদেশের রসগোলা-সন্দেশ-ইত্যাদি সব থাকবে। “বর্তমান শতাব্দীর বাংলা”—এর ওপর বড় করে চিত্র প্রদর্শনী এর একটা important—feature থাকবে। চিত্র এ ব্যাপারের সব জানে। তোমাদের সক্রিয় সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সম্মেলনে—একদিন “নবজীবনের গান” balletised form এ stage করার চেষ্টা চলছে। দেখি কতদূর কি করতে পারি। আমার বর্তমান activity র অনেক খবরই দিলাম।

তোমাদের সংকলনে “তবে এসো” কি সকলের ভাল লেগেছে ?

আর কি খবর ? চিঠির উত্তর দিও। এই উপলক্ষে কলকাতার সঙ্গে, বিশেষ করে তোমাদের সঙ্গে, একটা সেতু রচনা হোক। আজকের মত চলি—চিঠি দিও with greetings, তোমাদের

বটুকরা

(৬)

১৫. ১. ৭৭

প্রীতিভাজনেয়, দীপেন এইবার আমাকে সত্যিকারের প্যাচে কেলছে। রিভিউ আর্টিকল^১ লেখা আমার পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। তবু তুমি যেকালে অনুরোধ করেছো তখন একটা কিছু করতে হবেই।

আছি ভালই। গত রবিবার শ্রীরামপুর গিয়েছিলাম, অসীমেশ গোস্বামীর আমন্ত্রণে। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভালই লাগল। শ্রীমান মেধেশ্বের^২ সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে আমাকে তার গৃহে আসবার অন্তে নিমন্ত্রিত করেছে। আবার একদিন তোমাদের ওখানে যেতে হচ্ছে। দেবেশের^৩ খবর অনেকদিন রাখিনি। আজকের মত পত্রালাপ বন্ধ করি।

তোমাদের সকলের নিত্য কুশলকামী

বটুকরা

১. বইজ্ঞান
২. সাহিত্য অকাডেমিৰ পুৰস্কাৰ
৩. বৰ্ষিক বটক
৪. হস্তাৰ ক্ৰমোপাধাৰ
৫. বটকৰা ছুল ভাঃব গুনেছিলেন 'পৰিচয়'-এৰ টিকানাবল হ'বহে।
৬. চিন্মোহন সেহানবীণ
৭. উৎপল দত্ত
৮. বিহু মে
৯. লোকনাথ ভট্টাচাৰ্য
১০. সমালোচনা সংখ্যাৰ অন্ত বটকৰাকে আলাউদ্দিন ৰাঃ-ৰ ওপৰ লেখা একট বই
কিঃয়ছিল। শেষ অবধি সমালোচনা লেখেন নি।
১১. বেবেলনাথ ক্ৰমোপাধাৰ
১২. বেবেল ৰায়

“বটুকদা” : স্মৃতি নয় শুধু, অপরাঙ্কের শিখা

বৈদ্যন চট্টোপাধ্যায়

“বটুকদা” নামক ফেরারী আশাবীকে ধরা ধার কি করে—১১ সালের জুলাই মাসে দিল্লীর বাসিন্দা হিসেবে রাজধানীতে পদার্পণ করেই চুক্তিতা। বটুকদার ঠিকানা বলছে, সে থাকে দিল্লীর বে প্রান্তে, আমার অবস্থিতি তার অপর প্রান্তে। দিল্লীর পরিব্রাজ্য যাতে বেশি নড়াচড়া না করতে পারে, তার ব্যবস্থা পাকা। ট্যাক্সি ছাড়া গতি নেই। বাতাসাতে নিধন ৩০ টাকা ধরচ তো পড়বেই। তবে কি মাঝপথে, বটুকদার কর্মস্থল, বাকে বটুকদা বলে “ভারতীয় (কাঁচ) কলা কেন্দ্র,” সেখানেই গিয়ে চড়াও হবে? কিন্তু বটুকদা কি এখনো সেখানে আছে, বৈনবাড়ীর (কাঁচ)-কলা পরিবেশন করছে? এতদিন ধরে একই জায়গার বটুকদা বিরাজ করছে বিশ্বাস করা শক্ত। এই সব সাত পাঁচ ভাবছি, আর কনুই প্রেসের মহিমায় বিহ্বল হয়ে একটা হাজারি দোকান খুঁজছি, এমন সময় হঠাৎ কানে এল: “এ ভারতে রাধ নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ”। একটা অ্যান্ড গলার কে বেন গুনগুন করে গেয়ে চলেছে পাশ দিয়ে। চমকে উঠে দেখি, বটুকদা, আমার কে? দিল্লীর দারুণ গ্রীষ্মের ভর ছুপুরে ওই গান শুনে শুনে কনুই প্রেসে দিয়ে যাওয়ার মতো হুঃসাহস আর কার হতে পারে? হাতে সেই ছাতাটা আছে, বহিও বন্ধ। মাথায় মার্ভাও খেব অবিবাহ নিষ্কপ করে চলেছেন। কনুই প্রেসের পোক্ত অ্যান্ডকল্টও গলে গলে যাচ্ছে।

—সেই ছাতাটাই বটুকদা?

—কোন ছাতাটা?

—আরে, সেই যে সেই ছাতাটা? মনে পড়ছে না? যে ছাতাটা মাথায় দিয়ে ১৯৪২ সালের জুন মাসের এমনি এক ভর ছুপুরে বিজুবাবু

বৈঠকখানার জানালায় টোকা দিয়ে আমার ডেকে কিস্ কিস্ করে বলেছিলে, “বৌদায়ন, দরজাটা খোল তো, একটু গান করবো”।

বিজুবাবু তখন পরশের ছুঁতে, সবে খেয়ে উঠে হোতলায় শোবার ঘরে উনি, বাক্য বলে, “উচ্চমার্গের চিন্তায়” মুহিত-নেত্র। খবর গেল। বাড়িতে ছোটবেলায় একটা প্রায়-খেলনা হারমোনিয়া ছিল। সেইটা বাজিয়ে চল্লিশের দশকের বাংলার জুঃখের আর পরিমার চারণ-কবি গেরে চলল একের পর এক গান রাত ৯টা পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের গান, অরচিত নবজীবনের গান, বঙ্গার গান, মিহিলের গান। মাঝে মাঝে কালোরাতি তানও। কারণ, বটুকদা গেরে গেরে বুঝিয়ে দিতে পারে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের ঠাঁটে তাঁর কথাগুলো সুরে বেঁধেছেন।

বটুকদা তখন “স্বীতবিতান” নামক সঙ্গীত শিক্ষণ কেন্দ্রে বাক্য বলে “উচ্চতর” রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের তালিম দেয়। মাস গেলে ৪৮ টাকা ৬ আনা—যেটা বেড়ে ৬৬ টাকা হয়েছিল, বটুকদা দেশছাড়া হয়ে চলে যাওয়ার সময়ে। আর ছিল কমলা গার্লস স্কুলে একটি সঙ্গীত বিভাগ। তার তৎকালীন অধ্যক্ষা শ্রীমতী প্রশান্তি দে-এর উদ্যোগে সংগঠিত সেই বিভাগের ছাত্রীদের চণ্ডালিকা, শাপমোচন ইত্যাদি স্মৃতি-নাট্যাঙ্কটান সেকালে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল। বটুকদাই তার স্কুল গার্লস ও প্রকৃত নির্দেশক ছিল।

এছাড়া বটুকদা বলে যে, সে নাকি সপ্তাহে একদিন গান শেখাতে আসানসোলেও যেত মাঝে মাঝে। বেতার কেন্দ্র বা প্রামোফোন কোম্পানির কর্তারা কোনদিনই বটুকদার গৃষ্ঠপোষকতা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অবশ্য করা সহজও নয়। কারণ, একে তো রবীন্দ্রনাথের ক্রপদী ও কঠিন গান ছাড়া অন্য কিছুতে বটুকদার মন ওঠে না, প্রায় আধুনিক গানের মতো কোমর হোলানো চণ্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত পাইতে বটুকদা অক্ষম; তার উপর কোনো নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে বটুকদার শারীরিক উপস্থিতি স্থানচিত্ত করা একটা ছুঁট ব্যাপার। সেকালে রেডিও-তে আগে টেনু করে রাখার ব্যবস্থা ছিল না। প্রোগ্রাম করতে হত শরীরে নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে রেডিও টেনে উপস্থিত হয়ে। যেদিন যাওয়ার কথা তার পরের দিন ছাতা ও ঘাড় হোলোতে হোলোতে বটুকদা গিরে হাজির হয়েছেন; এরকম নজিরও যে আছে একথা বটুকদা অস্বীকার করতে পারবে না।

ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। কলকাতার ও বাংলারই একান্ত নিম্ন এই সম্পদ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, যুব-শ্রীর সলির জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র কলকাতায় ভাঙ-কাপড় ছুটলো না। পরিবারের অন্ন-সংস্থানের সন্ধানে তাকে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হওয়ার আগেই, কোথায় বোকারোর ইন্সল, কোথায় দিল্লীর কলা কেন্দ্রে চলে যেতে হল। তার ফলে বিপ্লব দুই দশকে যারা বড় হয়েছে কলকাতায় তাদের কাছে বটুকদা, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বড় ছোর একটা হৃদয় কিংবদন্তী, অনেক ক্ষেত্রে তা-ও নয়, শ্রেফ অজানা, অচেনা একটা নাম। অথচ চল্লিশের দশকে বটুকদার পানের কথা আর হুর বুক ভরে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ৪৩-এর মঞ্চভরের স্কটপাথের মৃতদেহের দুর্গন্ধের সঙ্গে, রামেশ্বর-আব্দুল সালামের রক্তে স্বেচ্ছা ধর্মতলার ধুলোর সঙ্গে গ্রহণ করে নি, এমন মানুষ কলকাতায় কমই ছিল। আর, তাই, বটুকদাকে রবীন্দ্রসমনে সম্বোধনা জানানোর কথা উঠলে পর পক্ষ ব্যক্তিবিশেষের মুণ্ডে খেল গেল আমলাছলভ চেউ : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র আর সলিল চৌধুরীকে একসঙ্গে সম্বোধনা জানালে বেশ হয়। কথাটা সলিল-বাবুর কানে উঠলে তিনি ধ্বংসোনাশি লঙ্কিত হতেন, এ বিষয়ে কোনো সম্বোধনা নেই।

কারণ, প্রকৃত অর্থে, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক উভয়তাই বটুকদাই শিক্ষাগুরু। এটা তাত্ত্বিক বিচার নয়। শ্রেফ কালনির্ধারিত। বটুকদা শিক্ষাগুরু সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ দ্বিধা হরের, মার্গ বা লোকসঙ্গীতের ঠাটে প্রকৃত এপিক চৈতন্তের বার্তাবাহ পাশ্চাত্য সিমফনি রচনায়। বটুকদা শিক্ষাগুরু সঙ্গীতের মাধ্যমে এই এপিক চৈতন্তের সঙ্গে সর্বপ্রথম জনসাধারণের জীবনবাজার একান্তরতা রচনায়।

বটুকদা ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের চর্চা করেছে, রায়পুর বরানায়। আর, রবীন্দ্রসঙ্গীতের খাটি, নির্ভেজাল, ক্রপদী উত্তরাধিকার পেয়েছে স্বয়ং ইন্দিরা দেবীর কাছে থেকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলার বাউল, সারি, জারি ভাটিয়ালি ইত্যাদি ধারা। সেই সঙ্গে স্বরকারের তৈরি বন ১৯৩২ থেকে ৩৭ এই সময়ে শ্রবণ করেছে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিপুল শ্রোত-ধারায়। স্বর্গত অপূর্বকুমার চন্দ্র, সেকালের চক্রবেড়ের বাসিন্দা (।) নীরোদ চৌধুরি, চকলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্ববাবুর ব্যক্তিগত সংগ্রহে সব সনাতন আটাত্তরি গ্রামোফোন রেকর্ড ছিল, তিরিশের সত্তাপগার দিনের মধুর মধ্যাহ্ন ও অলস সন্ধ্যায় সেই রেকর্ড শুনে কবি স্বরকারের স্নায়ুতে

স্বায়ত্তে ভারতীয় ধারার লিরিক একস্বরের দরবারি মহিমার সঙ্গে ইতিহাসের এপিক সমুদ্রগর্জন বাসা বাঁধে। পছন্দ বেশি বেথোফেন, বাখ, ও মৎসার্ট। কিন্তু, মজা হল, বটুকদা বেথোফেনের যে সব রচনার নাম করল তাদের মধ্যে নবম পঞ্চম সিমফনিয়ের তুলনায় এরোটিকা ও পাস্টোরেলের মতো রচনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব মনে হল। বাখের কথার বিশেষত উল্লেখ করল বটুকদা হার্পসিকর্ডের মতো plucking instrument-এর ব্যবহার।

মনে হয়, বটুকদা তখনই সন্ধান করছিল কাউন্টার পয়েন্টের, ডিসোন্যান্সের, যাতে সেই নাটকীয় এপিক চৈতন্যকে জ্বরে বাধা যায়, যে চৈতন্তের “খ্যানের মাহুবে আজ বিশে গেছে হাজার মাহুব”, যে চৈতন্তের অ্যাবসর্গ ছিলার একদিকে “আমার একাকী আকাশ কী বাঁশি বাজিয়ে গেছে একলা রাতে” আর অন্যদিকে বিনিময় বাজির বুক চিরে আর্ন্তস্বর বেজে ওঠে “সুখার, কান্নার, ক্ষ্যান দাও, প্রাণ দাও”, যে চৈতন্তের গমকে গমকে “নবজীবনের সমীরণ চোখে মুখে ছড়ান্নে, গ্রাম ভেঙে আজ এসেছি শহরে, এনেছি দুঃখ, এনেছি মৃত্যু, এনেছি রোগ, এনেছি শোক হেঁড়া বলি তবে স্তরে”।

ভারতীয় মার্গসজীতের বিভিন্ন রাগের সংস্থাপনায় বৈপরীত্যের সম্ভাবনার কথা ও স্তরের অর্থনায়ীত্ব মিলনে এপিক চৈতন্তকে সাঙ্গাতিক রূপধানের সম্ভাবনার প্রথম পাঠ বটুকদা নিয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই কাছে—“চণালিকা”র মতো রবীন্দ্রনাথের রচনায়। বটুকদা তাই বলে। বটুকদা আরো বলে : “কর্মালিভম্কে জীবনের চাপে ঢালাই পেটাই করতে হবে, এই ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, one has to grow into life's situations musically। তাই দৈনন্দিন জীবনের ও প্রকৃতির sights and sounds থেকে কথা ও স্বর নিঙড়ে বের করতে চেয়েছি।”

বটুকদা বলে : যেমন ধরো, নদীর ধারে বাঁশি বাজায় কেউ। বাঁশি বা বেহালায় মেলতি। বা দোতারায folkish inflexion। আবার দেখো, একই সময়ে চলেছে একটা ভূখ মিছিল। আতি, পদধ্বনি। চাই তখন কর্কশ বিপরীত-ধর্মী শব্দ, ড্রাম বা মাদল-ঢাক।

বটুকদা বলে : ভারতীয় মার্কসংগীত যেন অনেকটা liner drawing-এর মতো, perspective নেই। কিন্তু, মনে আছে তোমার “নবজীবনের গানে” “পথে পথে শব্দা, মোড়ে মোড়ে বাজে মৃত্যুর অঘডকা” ইত্যাদি সব কথা বাধা হয়েছে মালকোবে। অথচ, মালকোবে তান কবলেই কেবল কাজ হবে না। ক্ষুদ্র লয় বা গ্রাম পরিবর্তনের দ্বারা perspective, depth, আনতে হবে।

তারপরেই হয়তো, পরবর্তী স্তরকে, মালকোবের dominant noteটা পাখী
ঝাপটাতে ঝাপটাতে মুক্তি পাবে কোনো লোকসঙ্গীতের সুরবিত্তারে।

বটুকদা বলে : লোকসঙ্গীতের আঁকাড়া ব্যবহার নয়। রবীন্দ্রনাথের
গীতিনাট্যে যেমন, কোথাও কোথাও orchestration-এর আভাস থাকলেও,
আসলে তো একসুরের আলাদা আলাদা গান মানার মতো গাঁথা—তাও নয়।
উদ্দেশ্য একটা total orchestration-এর সাংগঠনিক শৃঙ্খলায় বিভিন্ন
সুরকে thematically বাঁধা, একটা সামগ্রিক পরিবেশ বা musical
environment রচনা করা, কর্মালিঙ্গমকে ঢালাই করা জীবনের চাপে
নার্টকীয় প্রতিবেগের রূপরেখায়।

এইভাবে রচিত হয় “নবজীবনের গান” ১৯৪৩-৪৪ সালে। জ্ঞান ঘোষ
বশাই-এর করা স্বরলিপি আর স্বর্গতা সরোজিনী নাইডুর ভূমিকা সহ বই
হিসেবে ছাপা হয় ১৯৪৫ সালে (?)। “স্বপ্নার গান” রচিত হয় ১৯৪৬ সালে।
স্বরলিপি পাওয়া যায় না। সুরকারের স্বতিই একমাত্র ভরসা। সেটা শুক
বিশ্বত নয়—আমরা জানি। বেমালুম ভুলে যায় বটুকদা। বিনয় রায় ও
প্রীতি ব্যানার্জি (সেকালে “সরকার”) যদি সাহায্য করেন হয়তো উদ্ধার
করা যায়। “মিছিল” রচিত হয় ১৯৪৬-৪৭ সালে। “পরিচয়” পত্রিকা
ছাপা হয়েছিল, বতসুর মনে পড়ে। স্বরলিপি নেই। তারপর রচিত হয়
“পাহাড়, নদী ও মাছের গান”। ১৯৫০-৫১ সালে। “সাহিত্য পক্ষে”
ছাপা হয়। স্বরলিপি নেই। বিশাল এই গান কেউ কোনদিন সবটা শোনেও
নি। বিষ্ণুবাবুর বৈঠকখানায় অংশ বিশেষ কখনো-সখনো গেয়ে শুনিয়েছে
বটুকদা।

তারপর বোকরো হয়ে দিল্লী। ভারতীয় কলাক্ষেত্রের একাধিক অপেরা
ও ব্যালের সঙ্গীত রচনা ও নির্দেশনা। অনেকে জানেনই না, বটুকদা
কোরিওগ্রাফিও রীতিমত জানে। শ্রীমতী প্রণতি বে তো বলেন যে,
কমলা গান্ধী ভুলের মেয়েদের “চণ্ডালিকা” বা “শাপমোচন” ইত্যাদি করানোর
সময়ে এমনও ঘটছে যে বটুকদা নৃত্যরূপ ধানেও অনাদি বাবুকে সাহায্য
করেছেন। আর ভারতীয় কলা ক্ষেত্রের বর্তমান নৃত্য নির্দেশক, কখন
নাচুজি, স্পষ্টই বলে “Batukda is as much a choreographer as I
am”। কখন এককালে গণনাট্য সন্মেল ছিল, উদয়শঙ্করের সঙ্গে বিলেত
আমেরিকা ঘুরেছে। ভারতীয় কলাক্ষেত্রের রামলীলায় তুলসীদাসের
কাব্যে সুরসংযোজনা সবটাই বটুকদার। সম্প্রতি ভারতীয় কলাক্ষেত্রের

যারা দিল্লীতে অস্থিভিত্ত ভারতীয় বাধীনতা আন্দোলনের আলোচ্য ব্যাংক দেখেছেন শুনেছেন তাঁরা বটুকদার অল্প শিল্পশক্তির সাক্ষ্য দিতে পারবেন।

কিন্তু, এই বহুশব্দী মানুষটি দিল্লীতে কীভাবে থাকে? কলকাতার অনেকেই ধারণা বটুকদা রাজধানীতে বহাল তবিরতেই আছে। শিল্পের মতন সরল এই মানুষ নিজের দুঃখের কাঁছনি গায় না, কখনো, অতরলতম বন্ধুদের কাছেও। কিন্তু, বিধাতা পুরুষ যদি কেউ থাকেন, তো তাঁর জানার কথা, ৬২ বছর বয়সে বটুকদা একটু আরাম পেলে কারোর কোন ক্ষতি হত না, একটু কাজের সুযোগ পেলে দেশের দেশের আশ্রয় বিলাক উপকার হত। কলকাতার ব্যাংক কালচারের পাণ্ডা তাঁরা যদি আর একটু মানুষের মতো হতেন তাহলে রবীন্দ্রভারতী থেকে বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রসদন ইত্যাদি সংস্কৃতির ঘোঁকানে নিদেন পক্ষে খাতা লেখার কাজ একটা বটুকদা পেত।

এইসব প্রতিষ্ঠানের মাতঙ্গর ব্যাংক তাঁদের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও বটুকদার কম নয়, আর সৃষ্টি ক্ষমতার কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল। কিন্তু, মুখিল অনেক। একে তো সম্পূর্ণ ভোলানাথ এই মানুষটি তার উপর বটুকদা, কিন্তু, এখনো পাকা কমিউনিষ্ট, লাল কার্ড একটা থাক আর নাই থাক। এমন কি এই সেদিন, দিল্লীতে কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল গেল পার্লামেন্টে, তার সামনে হরিয়ানা দল ব্যাণ্ডে যে সুর বাজাতে বাজাতে গিয়েছিল, সেটা পাঁচ দিনে বটুকদা বেঁধে তাদের শিখিয়েছিল। ডায়ালে উঠে গানও গেয়েছিল। কিন্তু বিগত ২৫ বছরে (১৯৫৮ সাল থেকে) কমিউনিষ্ট পার্টির দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা বটুকদার সঙ্গে কত আঙুলটাও কখনো তুলেছেন কিনা সম্ভেহ। এমনকি গানগুলো রেকর্ড বা টেপ করানো, মায় অরলিপি সমেত একজ্ঞ ছেপে বের করারও কোনো প্রচেষ্টা হয় নি। অথচ বটুকদার কীর্তি ভারতীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য পরিমায় অংশ। বুদ্ধ পূর্ণচন্দ্র বোশির কীর্তির মতোই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অতএব, বটুকদা ক্ষরিক। একেবারে নির্ভেজাল। প্রয়োজন হলেই, ডাক পড়লেই বটুকদা হাজির—ওই লক্ষ মানুষের পরস্পরের musical environment-এর জুঁবার আকর্ষণে। অমোঘ তার সৃষ্টিশক্তি এখনো। এইতো সেদিন বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে জনলুম দেখলুম বিজুবাবুর “স্বতি সত্তা-ভবিষ্যৎ-এর” নাটকীয় সাক্ষাতিক রূপায়ন বিজ্ঞান ভবনে কবির জ্ঞানপীঠ

পুরস্কারপ্রাপ্তি উৎসবে। কবিতার বিভিন্ন স্তরের উচ্চারণকে কেমন করে orchestrate করা যায়, বিজুবাবুর কবিতার অন্তর্নিহিত এপিক সিমফনির বিস্তারকে, এমনকি personalকেও public poetryর অর্কেস্ট্রায় পরিণত করা যায়, ওই উৎসবে না থাকলে বিশ্বাস করতুম না। প্রায় ৩০/৪০ জন ছেলেমেয়েকে রঙ্গমঞ্চের বহুস্তর বিস্তার সাঙ্গিয়ে কবিতার যে এক নবজন্ম। 'হিন্দি-বাংলা' মিশিয়ে। এই একটি কাজ করানোর জন্য জ্ঞানপীঠ কমিটি আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

বটুকদাকে ফেরৎ আনতে হবে কলকাতায়। বটুকদার অপরাধের শিল্পী-অভাবের অভিব্যক্তির এখনো বহু বাকি। পকেটে আধ ডজন পরিকল্পনা ঘুরছে—ব্যাল, অপেরা, গান—ছেঁড়া কাগজে লেখা কিছু কিছু, যেমন “ভারততীর্থ” কবিতার অপেরা রূপ, বিশ্বয়কর চেহারা নিতে পারে। ৫০/৬০ জন শিল্পী ও ২০/২৫টি সঙ্গীতযন্ত্র সমাবেশে সে যেন ভারতবর্ষের ইতিহাসেরই মতো বিশাল। কত টাকা কত দিকে তো নয়-ছয় হচ্ছে। কিছুই কি করা যায় না? “বহুকণী”-র মতো সংগঠন, বা বাংলা নাট্যক প্রতিষ্ঠা সমিতির মতো একাধ্র উদ্যোক্তাবৃন্দ বটুকদাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনুন, তাঁকে গড়ে দিন একটি স্থায়ী “ensemble”। খেয়ে না খেয়ে গান করার মতো ছেলেমেয়ের অভাব কলকাতায় কোনোদিন হয় নি, এখনো হবে না। বটুকদারও তাতে বোধহয় খুব আপত্তি হবে না—দিল্লীতেও তো গ্রাশাচ্ছাদনের খুব একটা এলাহি ব্যবস্থা বটুকদার মতো মানুষের জন্য নেই।

এই পর্বস্ত লেখাটা ছাপা হয়েছিল “বহুকণী” পত্রিকায় ১৯৭৩ সালে ৪০ সফলনে। তারপর বটুকদাকে আনা গিয়েছিল কলকাতায়, কবি বিজুবাবু মতো একনিষ্ঠ বন্ধু ও শ্রীমতী উমা সেহানবীশের মতো অকৃত্রিম অহুবাগীব ঐকান্তিক আগ্রহে ও প্রয়াসে। ইতিমধ্যে উর্মিলাদি (বটুকদার স্ত্রী) দিল্লীতেই পরলোক গমন করেন। “পাঠতবন”, “ইন্দিরা” ও “কমলা গার্লস স্কুল”—এর কতৃপক্ষের আত্মকূল্যে বটুকদা তার ছোট মেয়েটিকে নিয়ে শেষ কয়টি বছর তার আপনজনদের মধ্যেই কাটিয়ে বেতে পেরেছিল। অথচ, আমাদের চরম অপদার্বিতার ফলেই বোধহয়, বটুকদা শেষ কয় বছরে যে কাজ করতে পারত—করবে বলেই কলকাতায় এসেছিল—সে কাজ প্রায় কিছুই হয়ে উঠল না। শঙ্কু মিশ্র ও বাংলা নাট্যক প্রতিষ্ঠা সমিতির উদ্যোগে

কেন্দ্রাঙ্গি-মার্চ ১৯৭৮] “বটুকদা” : স্মৃতি নয় শুধু, অপরাধের শিল্পী ২৩৭

“স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত”-এর অপরাধমী রূপায়ন, রা সত্যজিৎ রায়ের সাহচর্যে “হ ব ব র ল”-র রূপান্তর, অথবা বিস্মৃত প্রায় “নবজীবনের গান”, “বন্ধার গান”, “মিছিলের গান” প্রভৃতির পুনরুত্থান ঠিকমতো হয়ে উঠলো না। ভবিষ্যতেও বংশধরের জন্ত বটুকদার অপরাধের শিল্পশক্তির কোনো স্থায়ী পরিচয়ই আমরা ধরে রাখতে পারলাম না। “পুতুলনাচের ইতিকথা” ও স্বাক্ষরের ২টি ছবিতে (“মেঘে ঢাকা তারা” এবং “কোয়ল পাছার”) সঙ্গীত পরিচালনার আকর, সত্যজিৎ রায়ের অসামান্য “দ্রবীভূতনাথ” ডকুমেন্টারি, আবহগঙ্গীত, কিছু গানের স্বরলিপি, ব্যক্তিগত সংগ্রহে কয়েকটি চৈপ, কিছু ছাপা কবিতা ও একটিমাত্র রেকর্ড ছাড়া আর প্রায় কিছুই নেই। দ্বিতীয় TV কন্সার্ট বহি দয়া করে কেলে দিয়ে না থাকেন, তাহলে “স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের” হিন্দী অর্জুনের কিয়দংশ হয়তো এখনো ধোঁজ করলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু, কেউ কি করবে? “পাঠভবনের” বে ছোট্ট শিল্প-শিল্পীদের নিয়ে তাদের “বটুকদা-মিম্” নাচত গাইত, “লক্ষকর্ণ” নিবে হৈ চৈও বাধিয়েছিল, তাদের শৈশব স্মৃতি কতদিন থাকবে?

এ আকস্মিক রাখবো কোথায়? স্মৃত্যুর পর ধবরের কাগজে প্রকাশিত একটি শোকসভার বিবরণীতে দেখলাম অর্নৈক সরকারি কর্মতালীন ব্যক্তিনাকি শোকের সঙ্গে “ক্রোধ”ও প্রকাশ করে কলেছেন, বটুকদার প্রতিভার সম্যক প্রকাশ ও সামাজিক স্বীকৃতি তার জীবদ্দশায় ঘটেনি বলে। এতদিন এঁরা ছিলেন কোথায়? এখন স্মৃত্তের পবিত্র স্মৃতিকে রাজনৈতিক বোল-বোলাওয়ার কাজে লাগানোর জন্ত “রাষ্ট্র মধ্যবরসী”-র গদ্যায়ান ভূমিকার অবতীর্ণ হলে ভাপাড়ে শহুনের মতো দেখাবে না? এদেশের “মার্ক্সবাদী” রাজনীতির মহাজনদের মধ্যে একমাত্র পূর্ণচন্দ্র বোশী ছাড়া, সেই চন্দ্রশেখর শেখ থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে, আর কে বুকে হাত রেখে বলতে পারেন যে, শান্তি বর্ধন-বটুকদা-বিজনদাদের মতো বহুমুখী প্রতিভাকে দেশের রাজনীতিতে প্রমত্তাবী শ্রেণীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে লাগানোর চেষ্টা তিনি করেছেন? কেউ না। “অনন্তার মুখরিত মধ্যে” শিল্প ও রাজনীতির পাঁটছড়া বেঁধে সাম্যবাদী আন্দোলনে সামাজ্যতান্ত্রিক মর্নিবিকতার প্রতিমা নির্মাণের স্বপ্ন আর কেউ দেখেন নি।

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আজ তাই প্রায় ফাঁকা পাওয়াই মাত্র। কেননা ওই সংগ্রাম ঠিক মাইকে মঞ্চে গলাবাজি করে হয় না। বিকল্প সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে হয়। বারো সৃষ্টি করবেন তারা তো অধিকাংশই—তাই

একজন মহৎ ও সুদূর ব্যক্তিক্রম ছাড়া—বাজার ধরে বিকিয়ে গেছেন ইতিমধ্যে। আর বটুকদা-বিজনদ্বারা তাই অবাস্তব রবাহুতের মতো আনন্দটা কাটিয়ে গেল বিগত প্রায় তিন দশক—সকলের অলক্ষ্যে ট্রেনের কামরার বা গাঁজা পার্কের পিছনের গলিতে এক সকালে পরম প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। মুখে কোন বিরক্তি বা অভিযোগের রেখাও তো ছিল না। ভারতবর্ষের সাম্যবাদী আন্দোলন তার একান্ত আপন বন্ধুর বৈরাগীম্বেব অবাচিতভাবে গেয়েও হেলায় হারাল। সে আন্দোলনের চরম আত্ম-বিশুদ্ধি, লক্ষ্যস্ফুটন আর এক নিদর্শন।

বটুকদা-বিজনদ্বয়ের ব্যক্তিগত ব্যর্থতা আমাদের সকলের ষোণাঙ্গিত-পাপ—আমরা যারা আজ সাম্যবাদী আন্দোলনের বহুবিভক্ত শাখা-প্রশাখার উল্লাসুল লক্ষরূপে দিচ্ছি, নির্বাচনী রাজনীতির নির্ভঙ্ক দলাদলিতে, অলৌকিকমতের নেশায় ও রেযারেবিতে সে আন্দোলনের আত্মাকে গলা টিপে মারছি, ২৫ বছর ধরে ধেরেও সাধ মেটেনি। “রাগী মধ্যবয়সী”-র গদীমান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাত্ক্ষণিক রাজনৈতিক কারদার কিকির খোজা আমাদের সাজে না; বাঁদের কোন স্থিতি নেই, সে-আন্দোলনের শরিক বাঁরা ছিলেন না কল্পনাকালে, তাঁদের সাজে হয়তো বা। এরকম সহজ সমাধানের পথ আমাদের খুঁজলে চলেবে না। বটুকদা-বিজনদ্বয়ের বায়ুভূত নিরাশ কণ্ঠের ভেঁকে বলছে: “কৃতোঃ শ্বর কৃতং শ্বর”। তৈরবীর প্রভাতী গাভীর্বে মনে করিয়ে দিচ্ছে:

“তবু দেখে বেতে হবে দুঃ,

পথ হবে খুবই বন্ধুর,

এখনো তো বাঁধনের বোঝা

ঝেড়ে ফেলে বেতে হবে দুঃ।”

আজ আমাদের আত্মতৃষ্টি, আত্মনিরীক্ষার দিন। আজকের সব বাঁধনের বোঝার অনেকটাই তো নিজেদের হাতে গড়া হাতকড়ি, কৃতকর্মের দায়ভাগ।

পরিচয়

১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেবলী) আইনের

৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

- ১। প্রকাশের স্থান—৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭।
- ২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক
- ৩। মুদ্রক—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভারতীয়; ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলিকাতা-৭

৪। প্রকাশক—ঐ, ঐ ঐ

৫। সম্পাদক—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয়; ৬১২/১, ব্লক-৩
নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর যে-সকল অংশীদার মূলধনের
এক-শতাংশের অধিকারী, তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

- ১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট ১২, ব্লক এইচ, সি. আই. টি. বিল্ডিংস,
ফ্রিস্টোকার রোড, কলকাতা-১৪ ॥
- ২। সুনীলকুমার বসু, ৩৩ এল,
মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২ ॥
- ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, গুড
বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১২ ॥
- ৪। হিরণকুমার সান্যাল, (মৃত) ৮, একডালিয়া
রোড, কলকাতা-১২ ॥
- ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭ ॥
- ৬। দেহাভক্তান্ত আচার্য ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥
- ৭। সুপ্রিয়া
আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥
- ৮। সত্যব মুখোপাধ্যায়, ৫বি,
ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২২ ॥
- ৯। সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১/৩, ফার্ন
রোড, কলকাতা-১১ ॥
- ১০। শীতান্ত মৈত্র, ১/১/১, নীলমনি দত্ত লেন,
কলকাতা-১২ ॥
- ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭/৪, বাহুবপুর সেনট্রাল রোড,
কলকাতা-৩২ ॥
- ১২। সত্যজিৎ রায়, ১/১ বিশপ লেকসর রোড, কলকাতা-২০ ॥
- ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায় (মৃত), ৪২/৭এ, বালিগঞ্জ মেস, কলকাতা-১২ ॥
- ১৪। হরিশংস নন্দী, ২১এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬ ॥
- ১৫। প্রব মিত্র,
২২বি, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২১ ॥
- ১৬। শান্তিরাম রায়, 'সুস্মিতিকা', পরকা
মেন রোড, কলকাতা-৩২ ॥
- ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, শান্তিনিকেতন, বীরভূম ॥
- ১৮। অরবিন্দ ভট্টাচার্য (মৃত), ২/১, কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা-১২ ॥
- ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩বি, পরচা রোড, কলকাতা-১১ ॥
- ২০। নারায়ণ
মুখোপাধ্যায় (মৃত); ৩সি, পঞ্চাননভাঙ্গা রোড, কলকাতা-১১ ॥
- ২১। দেবীপ্রসাদ
চট্টোপাধ্যায়, ৩, শঙ্কুনাথ পতিত প্লট, কলকাতা-২০ ॥
- ২২। শান্তা বসু,

১৩/১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ২০। বৈষ্ণাধ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২১ ॥ ২৪। ধীরেন দাস, ১০/৬, নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৬। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৪, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ ॥ ২৬। বিজেন্দ্র নন্দী, ১০তি, স্কিরোল শাহ রোড, নবাবদিয়া ॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০, ব্রাহ্মতল বহু লেন, কলকাতা-৬ ॥ ২৮। সুনীল সেন, ২৪, রঙ্গা রোড সাউথ (বাড লেন), কলকাতা-৩৩ ॥ ২৯। দ্বিজীপ বসু, ২০০ এল, ভানুপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৩০। সুনীল মুন্সী, ১/৩, গরচা কার্ট লেন, কলকাতা-১২ ॥ ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পায় প্লেস, কলকাতা-১২ ॥ ৩২। হিমাব্রিশেষ্বর বসু, ২এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১২ ॥ ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩১এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪৭ ॥ ৩৪। অচিন্ত্য ঘোষ, রোড, টি. নগর, মাদ্রাজ-৭ ॥ ৩৫। চিত্রোহন সেনানবীশ, ১২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২১ ॥ ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, পি ২৬, প্রেমহাস লেন, কলকাতা-৪০ ॥ ৩৭। সুরত বন্দ্যোপাধ্যায়, পি ৫, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-২২ ॥ ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, ৮৬, আন্তর্য্য মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫ ॥ ৩৯। প্রমোদ গুহ, ১এ, মহীশূর রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ৪০, বাধাধাধ সাহা লেন, কলকাতা-৭ ॥ ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পি ৫, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-২২ ॥ ৪২। দ্বীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬১২/১, ব্রক-ও, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫০ ॥ ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৪৪। নির্মাণ্য বাগচি, ক্র্যাট বি সি ৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ৪৫। তরুণ গাঙ্গুল, ৩১/২, হরিতকী বাগান লেন, কলকাতা-৬ ॥ ৪৬। বিভা মুন্সী, ১/৩, গরচা কার্ট লেন, কলকাতা-১২ ॥ ৪৭। বেহুইন চক্রবর্তী, ক্র্যাট ২, ১০, রান্না রাজকুমার স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত, ২, বহুনাথ সেন লেন, কলকাতা-৬ ॥ ৪৯। অজয় দাশগুপ্ত, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৫০। সুরেন ধরচৌধুরী (স্বত), ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥

আমি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য ।

(স্বাক্ষর) অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

১০. ৩. ৭৫

3749

756.3
0171

89
23-5
23-76

প্রকাশিত হ'ল

বিপ্লব গকাশ বছরে সাহাবাহী আন্দোলনের যে সাহিত্যিক ফল আমাদের
ঘরে উঠেছে তার প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ একটি ছবি আমাদের হৃদিতে
সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় নি, এটা নিঃসন্দেহে অভাবের, হুঃখের কথা।

সুশীল জানা ও সৌরী ঘটক সম্পাদিত

মানুষের গল্প

“সে বাই হোক উক্ত আন্দোলনের অভিঘাতে যে কতজন উল্লেখ্য কথাকার
বাংলা কথাসাহিত্যকে নতুন শক্তিতে শাসিত ও সমৃদ্ধ করে তুলে
ছিলেন তাঁদের এক একটি ছোট গল্পকে হুলি মলিন বিশ্বাসি থেকে
উদ্ধার করে পুনরায় প্রত্যক্ষ করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন
সংকলকর—বাঁরা এক একজন পরিচিত কথানিরী।।.....
এ গল্পসমষ্টি যুগের ইতিহাসের স্বাক্ষর।”

ডঃ কুদিরাম দাস

রামতনু লাহিড়ী

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখক সুচী : বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র সেন/নীরেন্দ্রনাথ রায়
গোপাল হালদার/মানিক কন্দ্যোপাধ্যায়/সোমনাথ লাহিড়ী/শ্বর্নকমল
ভট্টাচার্য/নবেন্দ্র ঘোষ/সুশীল জানা/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়/সোমেন
চন্দ/সত্য গুপ্ত/ননী ভৌমিক সাবিত্রী রায়/প্রদ্যোৎ গৃহ/সুলেখা
সান্যাল/সৌরী ঘটক/সমরেশ কন্দু/দীপেন্দ্রনাথ কন্দ্যোপাধ্যায়
দেবেন রায়

১৫ টাকা

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙালী : নরহরি কান্নরাজ

২৫ টাকা

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্রোতস্রা—কৃষক বিদ্রোহ, সেনা বিদ্রোহ,
উনিশ শতকের বাংলার আগরণ, অহিংস কংগ্রেস আন্দোলন, স্বাধীনসাহী
আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন সম্মিলিত হয়ে যে মহাসমুদ্র সৃষ্টি করেছিল
—তার তথ্যনিষ্ঠ বিশদ বিবরণ এবং মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ
আন্দোলনের তত্ত্বগত ভিত্তির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ—এই বইটিতে পাওয়া যাবে।

মনীষা গ্রন্থালয়

৪১৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

শাখা : মেদিনীপুর, বঙ্গলপুর, শিলিগুড়ি, মালদহ, হুগাঁপুর
বালুরঘাট, ইসলামপুর, বোলপুর

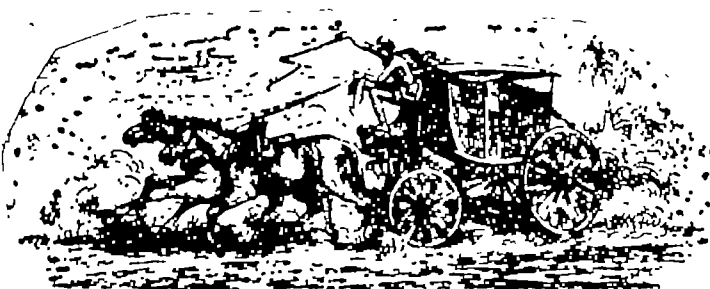
কলকাতা কালেকাল

পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই কলকাতার বাড়-বাড়ন্ত। ফ্রাইডের ডাক সাড় দিয়ে গ্রাম গল্প থেকে লোক ছুটে আসতে লাগল শহরে। বনজঙ্গল কোটে যেখানে বসত বামাব, সে জায়গা তার। ফ্রাইডের পর হেষ্টিংস। তাঁর আমলেই কলকাতা হল বাংলার রাজধানী। কোর্ট-কাছারি, আইন-আদালত, স্কুল-মাদ্রাসা, পাকা বাড়ি, পাকা রাস্তা, সব কিছুই বেড়ে চলল দিনে দিনে। সেই সঙ্গে যানবাহনও। জীবনযাত্রার গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শহরের রাজ-পাথ ছুটে চলল ব্রাউনবেরী, ল্যান্ডোলেট, ক্রুসার, আরও হারেক রকমের ঘোড়ার-চাকা বাড়ি।

সে কলকাতা আর নেই। পলাশী যুদ্ধের আগে এই কলকাতার লোকসংখ্যা ছিল এক লাখের মত। এখন বৃহত্তর কলকাতা মিণিসে ৭০ লাখের বেশী। আম্রকের কলকাতার জীবনযাত্রার গতিও আরও দ্রুততর, শ্রুতি আরো ব্যাপক। অথচ এই গতি পক্ষে পাদ ব্যাহত, বিপর্যাস। কারণ শহরের জন-সংখ্যার তুলনায় পথ অপরিমিত, কাজেই যানবাহন অল্প।

এই বাড়ন্ত কলকাতার যানবাহনের নিদারুণ সংকটকে দূর করতেই ডুগর্ড-রেলের বিশাল পরিকল্পনা। কিন্তু এ পরিকল্পনাকে সার্থক রূপ দিতে পারে যল্ল নর, মল্ল যয়, কলকাতার মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা। কিছুকালের কট স্বীকারের সহিষ্ণুতা দিয়ে কেবল তাঁরাই আসন্ন কের তুলাত পারেন ডুগর্ড রেল-এর উল্লেখ ভবিষ্যৎ।

বাড়তির গথে কলকাতা



১৯৩৮

MP

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ডুগর্ড-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট অথোরিটি (রেলওয়েক)

মানুষের গল্প

সুশীল জানা ও সৌরি ঘটক সম্পাদিত

১৫ টাকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতল্লাহ লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ হুদ্রাম হাস বলেন,
“এই গল্প সমষ্টি যুগের ইতিহাসের সাক্ষর”

বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগে বাংলাদেশে ভাগ্য-
বিবর্তনের মধ্যে এই দেশের সংগ্রামী সাহিত্যিকদের হাতে যে কসল কলেছে
তারই একটি জলন্ত সংকলন। প্রগতিমুখী সমাজ জীবনের প্রয়োজন ও উন্নত
সাহিত্যিকতার দাবী—এই দুইকে মিলিয়ে এই সংকলন।

ভারত রুশ কথার : বাঙালীর রুশ চর্চা

কেশব চক্রবর্তী . . . ২০ টাকা

ভারত ও রাশিয়া দুই বিশাল প্রাচীন দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক যে পলাশীর
যুদ্ধের সময় থেকেই গড়ে উঠেছে তারই তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস। বইটি নতুন
করে চিন্তার খোরাক যোগাবে। অমৃতেন্দু রূপক চক্রবর্তী ও অন্তান্তরা লিখছেন,
“বাঙালী চিন্তের রুশ রাজপ্রীতি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, রুশরাজস্রোতীর
প্রতি সহানুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।...বইটি পড়লে মনে হয়, ভারত রুশ
বৈজ্ঞানিক উদ্ভল অব্যাহত-উনবিংশ শতাব্দী”।

মনীষা গ্রন্থালয়

৪-৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০

২১শে ফেব্রুয়ারি যে বই আকস্মিক প্রকাশনা ঢাকা শহরকে আলোড়িত
ও সাময়িক শাসকচক্রকে সন্ত্রস্ত করেছিল—বাংলাদেশে নিষিদ্ধ

এ লামা আমরা রাখবো কোথায়

আর্ট স্টেট সহ হামি কাগজে ছাপা। মূল্য ২ টাকা

বাংলা ভাষার অবশ্যই বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ সংকলন

সংস্কৃত সাহিত্য সংগ্রহ

প্রথম খণ্ডে থাকছে : মহাকবি ভাণ্ডারী রচিত বন্যবাসবহন, প্রতিমা নাটক, চারদণ্ড, উরু ভঙ্গ, মধ্যম ব্যাঘোঃ, পঞ্চরাত্রম ও কর্ণভারম নাটকের মূলসহ বঙ্গানুবাদ ; পারিভাষিক শব্দের সূচী ; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত হুদীর প্রবন্ধ—সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব ও ডঃ রমা চৌধুরী লিখিত প্রথম খণ্ডের ভূমিকা।

আর্টখণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক মূল্য ১০ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তিকালে ও প্রতিখণ্ড সংগ্রহকালে ১০ টাকা দিতে হবে। একত্রে জমা দিলে মূল্য ৭৫ টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে

বিবেকানন্দ রচনাসংগ্রহ

দ্বয় খণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক মূল্য ৭০ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তি ও প্রতি খণ্ড সংগ্রহকালে ১০ টাকা জমা দিতে হবে। একত্রে জমা দিলে ৬০ টাকা।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত

নিবেদিতা

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক মূল্য ৫০ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তিকালে ৫ টাকা ও প্রতিখণ্ড সংগ্রহকালে ২ টাকা জমা দিতে হবে।

বইপত্র ৮১০ চিত্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-২

পন্নিচয়

বর্ষ ৪৭

সংখ্যা ১০—১১ মে-জুন ১২৭৮

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫

চিঠি

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-এর পত্র শুদ্ধ

প্রণতি দে ও বিষ্ণু দে-কে লেখা ৫

সকেলম ও সন্দ্বীপনা প্রণতি দে

এবং

The light in the dust lies dead

গোপাল হালদার ১

সাহিত্য বিচ্ছিন্নমণী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৩

'চতুরঙ্গ'-এর করণ কোশল

কাতিক লাহিড়ী ৩৮

মুসলমান অন্দরে বিয়ের সীত

আকসার আমেদ ৪২

বাংলা মুদ্রনের সমস্যা

ভক্তেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৭

ছোটগল্পের শিল্পরূপ

পার্শ্বপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৭

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রণেশ দাশগুপ্ত ১৪৮

গল্প

কাঠের ঘোড়া

হরেন্দ্র মহাস্তি ৭৪

অনুবাণ অমির চন্দ্রবর্তী

দারিদ্র্যের সীমা

অসিত ঘোষ ৮০

সতী ও সৈনিক

গুণবর মাসা ১১৪

তোতা

বিশ্বনাথ বসু ১২১

কবিতাভাষ্য

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অসীম রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, বিপ্লব মাজী ১৩০—১৩৮

রত্নেশ্বর হাজরা, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ, দাউদ হায়দার,
সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভ বসু, শুভাশিস্ গোস্বামী, নীরেন্দ্র হাজরা ১০৫—১১০

নাট্যপ্রসঙ্গ

অমলেন্দু চক্রবর্তী ১৫৪

বিদ্যোপপত্তি

কার্তিক লাহিড়ী, বিপ্লব মাজী, নাগাজুন ১৫৭—১৬৭

পুস্তক-পরিচয়

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৮

বিবিধ প্রসঙ্গ

মলয় দাশগুপ্ত, দেবেশ রায়, স্ববীর রায়চৌধুরী, অমল আচার্য,
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, কৃষ্ণ ধর ১৭৫—১২৬

প্রস্তাব

অুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপসংশোধক

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র
গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ
অুবোধ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্তা সেনগুপ্ত কর্তৃক দাশ দ্বাৰা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৩ চলতাবাগান সেন, কলিকাতা-৩ থেকে মুদ্রিত ও ৮০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
থেকে প্রকাশিত।

The light in the dust lies dead

গোপাল হালদার

সেদিনের 'বেঙ্গলী'-তে বেনের মহামাত্ত কাউকে হারালে স্বয়ংক্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখতেন, 'A prince among men has fallen.' শ্রীকৃষ্ণ হিমশঙ্কর সাহিত্যের বিরোধে তেমন কথা বলা অত্যাশ্চর্য্য হবে। কিন্তু বেনের সংস্কৃতি কেমনে বলা চলে না কি The light in the dust lies dead. আমাদের সংস্কৃতিকে কেনে এত সানন্দ উজ্জল আলোক-রেখা বিহার দিয়েছে—বুদ্ধির এমন দীপ্তির সঙ্গে এমন সর্কোতুক রসবোধ আর আমরা পাব না।

আমি ছিলাম ওর সঙ্গে পরিচয়ের নবগর্ভায়ে সংযুক্ত সম্পাদক—তিনি আমার alter ego বরলে সামান্ত জ্যেষ্ঠ হলেনও 'পরিচয়'-র দিক থেকে আমার অসামান্ত জ্যেষ্ঠ; আর 'পরিচয়'-এর প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলে আমাদের কালের সাহিত্য ও সংস্কৃতি কেমনে আর সকলেরই তুলনার সেরূপ জ্যেষ্ঠ।

সত্যবতাই 'পরিচয়'-এর কথাই আমার প্রথম মনে পড়ে—তিনি ছিলেন আমারও পূর্বে সে-পত্রের অন্ততম কর্তার, স্বয়ংক্রিয়ের সমাদৃত সহবোধী। 'পরিচয়'-এর সেই আভিজাত্য-সংচর্চন যুগের পর্ব ও শালীনতাকে যোগ্যরূপে বহন করে তিনি বর্তমান 'পরিচয়'-এর এই গণতান্ত্রিক প্রয়াসের মধ্যে দিয়েছিলেন সেদিনের স্বচ্ছ শালীনতা আর এ-দিনের প্রয়োজনীয় গতিময় নির্ভরতা তাঁকে আশ্রয় করেই নতুন দিনের 'পরিচয়'-এর বাজারস্ত—তিনি ও তাঁর তৎকালীন সহস্রবছরের জ্ঞেয়তার পুঁজি নিয়ে। বিশেষ করে তাঁরই ওপরে পড়েছিল সেই পুরনো-নবীনে মিলিত নবজাতক 'পরিচয়'-এর পালন-ভার—আমরা ছিলাম তার সহবোধী—সম্পাদনার তাঁর অভ্যস্ত বিচার-বিবেচনার নিঃস্বন্দ ও নিশ্চিন্ত। তাঁর কচিবোধ ও রসবোধ দুই ছিল আমাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং প্রায়ই স্থিরতর।

এমন কথা বলা সম্ভব হবে না—তা সর্বদা অসম্ভব, কিংবা সকল বিষয়ে অবিসম্বাদিত। যেখানে তা নয়, এমন দুটি প্রসঙ্গের কথা আমার এখনো মনে পড়ছে—‘হানুলী বাকের উপকথা’ ও ‘নবাব’ নাটকের তাঁর সমালোচনা। কাল ও-দুটি বস্তুকেই সম্বন্ধ স্বীকার করে নিয়েছে। সহবোধী হিসাবে তখনো তাঁর সমালোচনাকে আমরা প্রমোদিত মনে করি কি, তর্কও করেছি। কিন্তু সেই তর্কে এও বুঝেছি—তাঁর কথার একটি বিশেষ ধরণের বাধার ছিল, রচির এক বিশেষ আলোকে ও রসগ্রাহিতার ক্ষমতার নিরিখে সে-বস্তুত্ব অগ্রাহ্য করা চলে না। আমাদের সঙ্গেই তিনি একমত হতেন যে, সমগ্রভাবে দেখলে—ওই বিশেষ দৃষ্টি সবেও—‘হানুলী বাকের উপকথা’ ও ‘নবাব’ সার্থক সৃষ্টি। কিন্তু, সার্থক হলেও সর্বাংশে সৃষ্টিহীন নয়। সার্থক হিসাবে যে সৃষ্টির মর্যাদা হ্রাসিত, তার দৃষ্টির কোণটুকু বিষয়ে অচেতন থাকার কোনো মানে হয় না—বরো সেই রচনার গুণগ্রাহী তাঁদের পক্ষে। এ বুদ্ধি তুল বলে আমি তখনো মনে করি নি, এখনো করি না। কিন্তু বিপদ এই—সমালোচকের ও সম্পাদকের এই বিশেষ দৃষ্টিকোণটি সকলের তো চোখে পড়ে না—সমগ্রভাবে তাদের বোধ-ভ্রম হয়েছে, তা তাঁরাই বা বিশ্বাস করেন কেন? অন্তরিকে শ্রুতি ও শিল্পীরা নিশ্চয়ই অতিমানী, তাঁদের বর্তমান কর্মই যে তাঁদের শক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ নয়, নতুন নতুন কীর্তিতে প্রতিটি-দানকে ছাড়িয়ে যাওয়াই বা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ও স্বাভাবিক—এ আশা তখনকার মত তাঁদের মনে থাকে না, তাই ওরূপ সমালোচনাকে লেখকরা মনে করেন বিকল্প সমালোচনা—নেতিবাচক, এমন কি হয়তো বিপক্ষপাত।

বাক, এরূপ তুল বোঝাবুঝি ‘পরিচয়’-এর সম্পাদনার ও সমালোচনার না হয়েছে তা নয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার জ্যেষ্ঠ-সহবোধীকে সন্তুষ্ট করতে বাণা পাই নি, একমত না হলেও তাঁর রচির ও রসবোধের ওপর আস্থা স্থাপন করত দ্বিধাও করি নি। কারণ, শুধু রচি ও রসবোধের প্রশংসা নয়, নিশ্চয়ই, আমার বিবেচনা, হিরণ সাত্তাল মহাশয়ের তা ছিল প্রশংসা-সামান্য। রসবোধের ক্ষমতা ও গভীরতা—কিন্তু হিরণ সাত্তালের সেই সঙ্গে আরও ছিল সকল সংশ্লিষ্ট প্রতি আন্তরিক স্নেহ ও সৌহার্দ্য। সেখানে তিনি সত্যই নির্ভল ক্ষমতা-মনের মালিক, নিঃসন্দেহ রসিকতায় নির্ভর ব্যক্তি-স্বর্গে সত্য উৎসাহী; অযোগ্যের অহঙ্কার বা মূঢ়তাবোধ হাসিতে বিকল্পে নিপাত করতেও প্রস্তুত, কিন্তু জীবনব্যাপী, প্রগতিবাহী প্রতিটি সৃষ্টিপ্রয়াস ও কর্মোদ্যোগকে রসিকতা-মিশ্রিত সন্তোষের মধ্য দিয়ে স্বাগত করতে দ্বিধাহীন, প্রতিহীন অকুণ্ঠিত রস।

এই কথাগুলি হিরণ সান্তালের বিরোধে তাঁর সহযোগী হিসাবে প্রথম বলা আমার প্রয়োজন, না হলে এ বিষয়ে আসলে গুরুত্ব না হিলেও চলে। কারণ সম্পাদক-কর্ম হিরণকুমার সান্তালের একমাত্র কর্ম নয়।—নানা দিকেই তাঁর গুরুত্ব পরিচয় উজ্জ্বল। বোধহয় শৈশব উত্তীর্ণ হতে না হতেই তিনি রবীন্দ্র পরিবেশে স্থান পেয়েছিলেন, সে স্থান কবির প্রতিটি সৃষ্টিগর্বের মধ্যে তিনি রসগ্রাহী শ্রোতারূপে স্থিরতর করে দিয়েছেন—আপনার সময় অক্ষীলনে ও অক্ষুণ্ণ পরিশীলনে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত, রবীন্দ্র-শিল্প, রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-সংস্কৃতিতে এমন অস্বন্দর্শী ও ঐকান্তিক বিশ্লেষক ও বিচারক বেশি দেখা যেত না। কারণ, তাঁর উৎসাহ ও রসপিপাসা শুধু সাহিত্য বা সঙ্গীতে, অথবা অস্ত্র আরও দু-একটি ক্ষেত্রে, বদ্ধ ছিল না, তিনি সমগ্রভাবেই রবীন্দ্র-সৃষ্টি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতেন। আবার প্রতিটি বিশেষ গান ও প্রতিটি বিশেষ কবিতা বারবার ভাবনা ও জিজ্ঞাসার দ্বারা অধিগত করতেন। তারই ফলে তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করতেন। অস্ত্র সকলের বিরুদ্ধে হলেও তা নিয়ে প্রথম ও সৃষ্টিভাবী হতেও দ্বিধা করতেন না। তার আরও একটি কারণ, তিনি রবীন্দ্র প্রতিভাকে সমগ্রভাবে স্বীকার করতেন শুধু তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে বান। রবীন্দ্রনাথকেও তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের সঙ্গে সমপর্যায়ে বসিয়ে, সেই বৃহৎ-শিল্প ও রস-সৃষ্টির প্রেক্ষাপটেই দেখতেন। সে ভাবেই রবীন্দ্র-সৃষ্টিরও বিচার করতেন। শুধু রসবোধই তাঁর প্রবল ছিল তা নয়, রসদৃষ্টিও ছিল সেরূপ উদার এবং ব্যাপক—সকল বিষয়ে উদ্বুদ্ধ, উৎসাহী, আনন্দময়। অথচ, এই শিল্পপ্রাণ অরসিক মানুষই আবার জানতেন—শিল্প নিশ্চয়ই শিল্প হিসাবে বিচার্য, কিন্তু সৃষ্টির বাপকাঠিতে গ্রাহ হতে হলে শিল্পের আসল বাপকাঠি জীবন, আসল প্রেরণা মানবতা, শেষ সার্থকতার ইতিহাসে বিকাশের মধ্যে আপনার সার্থকতার।

তাই শিল্পরসিক অনেক রবীন্দ্র-চক্রের পরিহাসকে অগ্রাহ করেই হিরণ সান্তাল অক্ষুণ্ণ মেনে নিয়েছিলেন প্রগতিবাদীদের সঙ্গে ‘পরিচয়’র পালন তার। কারণ, পরিহাসে তিনি নিজে ছিলেন অপরাজেয়, আর শিল্পবোধের মতো জীবনকোষে ও মানবিক দায়িত্ববোধেও সমান দৃঢ়চেতন। আর, সেজন্যই আপন চিন্তের এই স্থিরতাতেই তিনি ‘পরিচয়’-এর পুরাতন কর্মী ও লেখকদের কাছে ছিলেন—হিরণকুমার সান্তাল নয়, ‘হাবুসদা।’ অমায়িকতার, সরসতার, এমন-কি ভোজন-রসের বাস্তব চর্চার ও আলোচনার সর্বদা তাঁদের অগ্রজ বন্ধু, আশ্রয়দাতা ও প্রেরয়দাতা।

ব্যক্তিগত কথা বলতে সাহস করি না—একই সময়ে বটুক, বিজন ও হাবুলদাবুকে হারিয়ে কলমও হাতে নিতে পারি না। বহিই বা আজ তা নিয়েছি যোবোই কি করে ঠিকের ছেড়ে আমি কী হারিয়েছি। আমি আর আমি নেই।

১০ এপ্রিল এই লেখাটি ঘিরে ১২ তারিখে গোপালবাগাটনা চলে যান। লেখাটি আমরা হারিয়ে বেশি, পটিনার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে আদ্যেকবার কিছু লেখবার ক্ষমতা সময় তখন ছিল না। কলে ‘স্বপ্ন সংখ্যা’ ‘পরিচয়’-এ আমরা গোপালদার কোনো রচনাই প্রকাশ করতে পারি নি। গোপালদা আমাদের সমস্ত অপরাধই মার্জনা করেন। পাঠকরাও আমাদের কিছুটা ক্ষমা দিল্লই করবেন, কারণ সেই লেখাটি বুঝে বের করে আমরা এই সংখ্যাই প্রকাশ করলাম—সম্পাদক।

বিক্র বে ও প্রগতি বে-কে লেখা
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের পত্রগুচ্ছ

সংকলন ও সম্পাদনা : প্রগতি দে

Post Card : ঠিকানা—Sri Bishnu De
Rikhia via Deoghar
S. P. Bihar

৫ এস আর দাস রোড “চিলে কোর্ট” 26.7.75

বিক্র বাবু,

তোমার হাত তেঁকেছে অনেক আগের
ভনেহি।

তোমার সবচেয়ে ‘ভাঙ্কার’ কথা মনেই
রাখতে পারি না।

হাত তো নয়ই।

ইতিমধ্যে কিছু মারকং চিঠি পাবে।

তোমার কয়দিন স্বরণে

ছবিন আগে—অনেক গান

রেকর্ডিং। আমি কিছু ছাড়াই।

স্বতি-সত্য ভবিষ্যতের, আবৃত্তি সহ

গানের রেকর্ডিং। অর্ঘ্য সেন

উপস্থিত ছিলেন। কিছু ভায়রা—

মনোহর লাল—রেকর্ডিং। ভাল

বেশিন। আজ দ্বিতীয়ের কান্ড পেলাম।

“ক্যাগা—বাউল।”

ওর কথা ভাবতেই, সব কিছু

নির্জন নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। সেদিন

আমাদের প্রয়োণো বহু বিনয় রাইও (L.P.T.A)

(অন্ত পৃষ্ঠায়) গত হয়েছেন—মন্মোহনে,

গণ চর্চনায়। (৩রা জুলাই)

তোমার ফিল-হাল,
তবিরং ব'হাল"—তো?
ধবর দিয়ে চিঠি লিখো।
তোমাকে প্রণতিক
আন্তরিক ভালবাসা জানিয়ে
এবারকার মত—

জ্যোতিরিন্দ্র—

পুঃ শ্রীমান্ ভিক্টোর তীক্ষ্ণ কর্ণধর

recorded হয়েছে—জ্যোতিরিন্দ্র

(২)

Inland letter ঠিকানা—Shri Bishnu De, Pranati De
P. O. Rukhia (via B. Desghar)
S. Pargana
Bihar
814112

Sender বাইবার
5 S. R. Das Road, Calcutta-700 026
২রা অগাষ্ট, ৭৫

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি—

তোমার ও প্রণতির কার্ড পেয়ে উৎফুল্লিত।

বিষ্ণুর অনবধানতার ফলে হাততালার বিষয় ধবর সেধিন রুশাইয়ের কাছে
পেলায়। ২১০ দিন হল তার পিতামহ ২৩ বৎসর বয়সে মারা গেলেন।
সবই গোবর্ধন ও গোলক-লীলা, বিষ্ণুর। উদ্ভেলিত গোলক একটু ঐরকমই হয়।
রথীবাবুও অনেকদিন আগে মহিষের পৃষ্ঠে চড়ে হাত ভেঙেছিলেন।
মহিষারোহী রথীর কথা ভাবা যায় না। বিষ্ণু তো তবু আরোহী হন নি।
আমি তার জান হাতের জন্ত আন্তরিক উৎসেগ প্রকাশ করছি। আমাদের
জান হাত আর বিষ্ণুর জান হাত অনেক তফাৎ। Physio therapy করান
উচিত হাত-কজি সচল করায় জন্ত।

সম্প্রতি, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্শ্বপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুকে
নির্দেশ—“কোমল পাঙ্কজে বিষ্ণু রে”—লিখেছেন। আমাকেও পাঠিয়েছেন।
খুব বিষয় ও স্পষ্ট বিষ্ণু-কাব্য সমালোচনা। পড়ে আমি অত্যন্ত খুসী
হয়েছি। বিষ্ণুর কাব্য নিয়ে এরকম বই লেখা হয়নি। ভবিষ্যতে হবে কিনা
জানি না। এটার খুব দরকার ছিল—অনেক আগেই।

কিতোরের চিঠিও পেয়েছি। ওর কথা ভাবলে মনে খুব বেহনা অনুভব করি, অসহ্য নির্জনতার, নিঃসঙ্গতার ও ভুবে যাচ্ছে। আমি দুই ভুল নিয়ে; শিশু-সমুদ্রে কাঁপ দিয়ে একরকম আছি। ঝানিকটা বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাচ্ছি। আমি কবে যে তোমাদের স্নেহাশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছতে পারবো, বুঝতে পারছি না। বিতুর final পরীক্ষা (November-এর শেষে) হয়ে কালে হয়ত অবসর মিলতে পারে। ইতিমধ্যে তোমরা বিনয় রায়ের মক্কেতে শোচনীয় পঞ্চ-দুর্ঘটনার যত্নসংবাদ পেয়ে গেছে। ও আমার একজন অত্যন্ত অন্তরঙ্গতম স্নেহের অন্ততম ছিল। এই তো সেদিন দিল্লীতে “বই-বাবুদের”^৮ ওখানে ১০ই জুন ৭৫এ শেষ দেখা হয়েছিল। তার ঠিক ১৬১৭ বাবেই প্রয়াত হল। এখনও ওর উজ্জল কণ্ঠ ও দীর্ঘ কঙ্কু মেহের উপস্থিতি অনুভব করি। এখানে সকলেই খুব সর্থাহত। অর্জকে^৯ বলাতে সে বললো—“তর নাই, আমিও বাইত্যাছি—বিনয়ের লগে দেখা করব। সেখানে আমার ration card-এর ঠিকানাভা বহলাইতে দিছি...”।

মিতু তার আসন্ন পরীক্ষার পড়া নিয়ে খুব seriously মর। ওরই ভিতর, ওর মায়ের মত, রক্ষণাবেক্ষণ করে। ধরক দেয়—শাসন করে, কড়া কৈফিয়ৎ দিতে হয়। তোমাদের সকলের শুভেচ্ছা ও স্নেহান্বিত বণিত হোক ওর ওপর। এই কামনা।

আজকের মত চিঠি শেষ করি। এখনই মিতু ভুল থেকে ফিরলো (১ইটা)। বাওয়া বাওয়া সেয়ে বিশ্রাম করে ওকে নিয়ে ওর বই কিনতে বেরোতে হবে। অবসর মত উত্তর দিলে খুব খুশী হব। তোমাকে ও প্রণতিকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে—একান্তই তোমাদের স্নেহান্বিত বটুবাবু।

(৩)

Inland letter : ঠিকানা দেখা দিক হতে—Sri Bishnu Dey.
P. O. Rikhia (via Deoghar
Santal Parganas (Bihar)

Sender's name : Batu-babu
-5, S. R. Das Road, Calcutta 700 026

১০/১১/৭৫

প্রান্তরসরী বেলবাবু ১০

অনেকদিন তোমাদের খবর পাই না জীমান পপার কাছ থেকে অবসর সংগ্রহ করি। আমি জার্মানী থেকে গত ২২ নভেম্বর কলকাতার প্রত্যাগত। খুব সুন্দর দেশ দেখে এলাম। আর পেট ভরে গান বাজনা নাটক ব্যালে দেখে এলাম। বাথ, বীঠোফেন, মোৎসার্টের দেশ; কার্লমার্কস-এলেন্সের

বেশ—দেখে এলাম। গত বছর ধ্বংস ভূগ থেকে (marshall aid না নিয়েই) হুম্বর স্থান প্রাণোচ্ছল বৌবনলী নিয়ে পাড়িয়ে উঠেছে আবার। অবাক লাগে socialist reconstruction-এর কর্মকাণ্ড দেখে। বার্লিন ছাড়া, ফ্রেসডেন, হুসাইমার, পটসডাম, লাইপ্‌জিগ, রটক এবং কিছু কিছু প্রামাণিক ঘুরে বেড়িয়েছি। হুম্বর বলিষ্ঠ পরিচ্ছন্ন রূপ সর্বত্র। Berliner Ensemble এর তিনটে নাটক দেখেছি গোর্কির The Mother, Mother Courage, Three Penny Opera। তাদের rehearsal দেখারও সুযোগ মিলছিল। Theory of alienation, গিরগ লুকাচ, Brecht-এর এবং Stanislavskyর নাট্যদর্শন নিয়ে অনেক বিতর্কমূলক আলোচনা হল। আমি অন্ততঃ খুব উপকৃত হয়েছি। বাচ্চাদের স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম, Children's Theatreও দেখলাম। Puppet playও দেখলাম। পরে ঐ স্কুলের rector ও secretaries; কিছু পাঠের মেসারসও ছিল—এদের সঙ্গে স্কুল সংক্রান্ত খুব অল্পরকম আলোচনা ও exchange of experiences হল। বললাম কলকাতার school activitiesএর কথা। কিছু কিছু ছড়া, গান demonstrate করলাম—পিয়ানো বাজিয়ে। ওরা ভীষণ খুশী, যে কলকাতার বাচ্চাদের নিয়ে এরকম School activities আছে। এবং আমাদেরও কিছু কিছু creative experiments হচ্ছে। ওরা খুব খুশী হয়ে স্কুলের বাচ্চাদের জন্য অনেক রঙীন slides, slide projector সহ, তাদের ছড়া-গান-এর স্বরলিপি records—free gift to the children of Calcutta বলে আমার হাতে দিল। এবং personally দিল ধানী। খুব হুম্বর। দেখতে পুতুলের মত। কিন্তু খুব হুম্বর আওয়াজ, আর চাবিকাঠিগুলো নানা রং বেগুণ এর। অকৃত হুম্বর দেখতে। আমি শ্রেক একলা গিয়েছিলাম। এবং কোনও গান ওখানে record করানো আপাততঃ সম্ভব হল না। না হোক পে। এরকম অভিনব ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। মিত্র পয়ীক্ষা হয়ে গেছে। বলছে তৌ, এক রকম দিয়েছে। এবার কয়েক দিনের জন্য তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো পপার সঙ্গে। পরে যদি সম্ভব হয় আমি গিয়ে নিয়ে আসবো। তোমাদের কি অভিমত? আমার আর্মীনী সক্রিয় বিবরণ অবশ্য প্রগতিদেবীর পাঠ। তাকে দেখিও। তোমার হাত কি রকম? অস্ত্র শারীরিক অবস্থা? ক্ষিতীশের অনেকদিন খবর নেই। আমি একরকম আছি,—Anti Fascist গান গেয়ে বেড়াচ্ছি। অস্ত্র খবর বখাষ আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমার জ্যোতিষ্ম

(৪)

Post Card : ঠিকানা—Sri Bishnu Dey
Rikha (Via Deoghar—Baidyanath Dham)
Santal Pargana,
Bihar
814112

° 5, S. R. Das Road, Cal-26

16, 12. 75

শ্রীভক্তদেব,

আশাকরি পপাদের সঙ্গে শ্রীমতী মিতু নিরাপদে পৌঁছেছে। আমি পূর্বে একটা চিঠি লিখেছিলাম। পাও নি কি? কেমন আছো? হাত সচল আছে তো? John Irwin^{১১} না কি ওখানে বাজেন? যদি সম্ভব হয়—(সম্ভব করে তুলবো—) শ্রীমতীর ছুটিতে রিখিয়ার গিঁয়ে মিতুকে নিয়ে আসবো। এ সময় হয়ত খুব ঠাণ্ডা পড়বে। শশা আছে? নিয়ে যাবো—কফল, মশারি? যদি পারি তোমার জন্য কিছু “পানীয়ও” নিয়ে যাবো। সনৎগা^{১২} তো ওখানে গেছে শুনলাম। ইরা-সত্যেশ্বরও^{১৩} তো বাবে বলছিল। আমি গেলে—অস্থবিধা হবে হয়ত। এখানে ক’দিন Anti-Fascist সংগ্রাম (মিটিং এ) চললো। কলকাতায়-পাটনায়^{১৪} খুব সমারোহ হল। পত্রবল প্রায় বিপর্যয়! আমি পাটনায় বাইনি। শ্রীযুক্ত প্রণতির কেতী-বাড়ী কি রকম চলছে? একটা স্তম্ভগোছের মালীরও তো দরকার। এখানকার খবর বিশেষ দেবার মত কিছু নেই। শ্রীমতীর আবেগের প্রত্যাশার—

শিত্তাধর

জ্যোতিষ্মিত

(৫)

AIR INDIA (হাঙ্গা টুকরো কান্ডের চিরকুট)

কন্দের কোন্,

আজ সন্ধ্যার পর শ্রীমদার্চ “বুদ্ধ পুরোহিতকে” অরণ করা যেতে পারে?

শ্রীসেজো^{১৫}

(৬)

Inland Letter : ইয়রিকিতে নিজের হাতে লেখা ঠিকানা

Sender's Name : শ্রী ক-কলিকাত-২৩ Pin-৭০০০২৩

২২/১২/৭৫

পরমপ্রত্যক্ষরকারী কন্দের কবি-জ্যোতিষ্মিত “বি”

বথাকালে পত্রাধিত। খুব সম্ভব মনে মনে তোমাদের চিঠি লিখেছিলাম। এবং সেটাই কোনো অদৃষ্ট কাঙ্গনিক ডাক বাক্সে কলে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা

করছিলাম। এটা সম্ভব। আজকাল অনেককেই চিঠি লিখি-নি ভেবে চিঠি লিখি এবং চিঠি লিখেছি ভেবে লিখিনা। এ এক মহা সমস্তার ব্যাপার। বাক তো.....ওরিকে তো প্রচণ্ড বেগে ক্যানিষ্ট বিরোধী বর্ণক্ষেত্রে বিভ্রাৎ পতিতে ঢাল তলোয়ার-আপবিক অস্ত্রাদি চলছে। কী তুমুল লড়াই, ভাবা যায় না। সেই ৩১শে ডিসেম্বরে পার্ক সার্কাস মহমানে গিয়ে আপাততঃ শেষ হবে।^{১৩} খুব পরিশ্রান্ত। ডান হাতে, বাঁ হাতে, বাঁই বাঁই করে তলোয়ার ঘুরিয়ে, এ বরসে আর কতক্ষণ চলে? তাই ১লায় আগে হরত রিখিয়া রওনা হতে পারবো না। তোমার নির্দেশ অনুযায়ী বতবুর লম্বা প্রস্তুত হয়ে আসবো। শীতের সঙ্গে মোটা নেবার অভ্যাস তো আছেই—দিল্লীতে থেকে। ভেবো না। আশাকরি মিতু-মা তোমাদের ওখানে ভালভাবে আছে। লিখেছে—জেরু ও জ্যাঠাইমার আদর বন্ধের বর্ণনা করা যায় না। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও চাইছিলাম তোমাদের সংস্পর্শে ও রিখিয়ার নৈসর্গিক পরিবেশও আসুক। এতে ও অনেক পরিবর্তিত হবে। এখন ফুলে অবস্থা দুটি। কিন্তু সৈনিকের দুটি কোথায়? ‘বর্মক্ষেত্রে-কুকক্ষেত্রে’ বৃত্তা ছাড়া পরিজ্ঞান কোথায়? ‘তুকানে’ আশাই হুবিধা। সীট রিজার্ভ বোধহয় করবার দরকার হবে না। হারমোনিয়াম আনা সমস্তার ব্যাপার। আমার নিজের তো নেই। ঐ তোমাদের লীলাবাবু^{১৪}—টিলাবাবুদের বলে দেখোনা। “হুবিধা” বলে কথা, একটা জোগাড় করতে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন। তুমি একটু চেষ্টা করও। ইতিমধ্যে তারা-বাবু^{১৫} ওখানে গিয়েছিলাম। ওরাও তো রিখিয়ার কাছে বসে। বাড়ীতে অনেক অস্ত্র বিক্ৰম চলছে। আপাততঃ একটু প্রশমিত। দ্বিতীয় নিজেকে সতর্ক করেছে। অনেকদিন কোনও খবর পাই না। অধিক কিছু লিখিবার নাই। ঘোর রবে বুক চলিতেছে ও চলিবে—

ইতি তোমার সহস্রাধিক গুণমুদ্র একান্ত রেহাশ্রিত

ঐ-“ব”—।

তোঃ তোঃ পরব ক্ষেত্রে শিল্প পদারবী জীবিতা প্রাপ্তি—

তোমার অজল-কসল কেন্দ্রী বাড়ীর এটুকু কোণে পেতে নেবো বাসা এ করেছিছ আশা। নিদেন পক্ষে পক্ষ তড়াবায় অন্ত একজন সবল সক্ষম লোকেরও তো দরকার। সে বিষয়ে আমার এক বিনীত আবেদন তবীর দরবারে পেশ করে রাখছি। আগামী বৎসর ১লা, জানুয়ারী ১৯০৬ এর আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। আশাকরি মিতু-মা তোমাদের কাছে ভালই আছে। সে এক উজ্জ্বল চিঠি লিখেছে। ভয়, আমাকে আবার না ফুলে

বার। মিত্রের ইহানীং স-ভৎসনা mothering খুব চলছিল। ও চলে গিয়ে মাঝেমাঝে খালিখালি ঠেকে—সেটা অস্বীকার করে লাভ নেই। তবু তোমাদের (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) তাই (২) দেখে ছায়া ও বতরু পায় ততটুকুই ওর পক্ষে মজল। আমি তো খুব নিশ্চিন্তে আছি। জন আরউইন তোমাদের ওখানে আছে। অনেকদিন তাকে দেখিনি। নিশ্চয়ই এখন প্রৌচস্বের সীমাত্তে। এখন আমার আর সময় নেই। তিনটে বাজে। যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করতে বেতে হবে। ক্যানিষ্টরা তো এখনও মরছে না। যুক্তবীজের বাড়ি। যদি বেঁচে কিনি আবার দেখা হবে—। উত্তর দিও—“টা-টা”—

জ্যোতিরিন্দ্র

(৭)

Post Card : মিত্রের হাতে লেখা টিকানা—Sri Bishnu Day
Rikha, (Via Deoghar-Vaidyanath Dham)
Santal Pargana
814 112

9.1.76

প্রাণত্যাগের,

টিক ৭-১০ মি: এ হাওড়ার। ৭-৫০ এ বাড়ী। ভিড় কিছু ছিলনা। সে দিন প্রাণতির বেওঘরে কেনাকাটি করে ফিরতে নিশ্চয় খুব দেয়ী হয়েছিল। বাত্মহের* খুব ভাল ছেলে। খুব সেবাপ্রবণ। তাকে এবং কন: ভোমাকে* আমার শ্রীতি ও শুভেচ্ছা দিও। লক্ষ্যায় কটাখানেক পপাহের ওখানে কাটিয়ে এসেছি। রিখিয়া-তথ্য শুনে খুব খুসী। তুমি ও প্রাণতি আমার আত্মরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা গ্রহণ কোয়ো। তোমাদের আত্মাত্মিক শুভস্বাভাব জের বতদিন চলে ততদিনই মজল। সমস্ত অরণ্যভূমি, পৃথিবী ও জিকুট পাহাড়ের প্রাতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

একাত্তই তোমাদের শ্রীবটুক

(৮)

Inland letter : মিত্রের হাতে লেখা টিকানা—
Sreejukta Pranati Day
Dadi, Mejki, Chhutki & Party
Rikha-(Via Deoghar)
Santal Pargana, (Bihar)
814112

Sender's Name
শ্রী সত্যজিৎ মিত্র
এ এস আর দাদি রোড
কলিকাতা-৭০০০২০

“মিত্রের আসিছে বাটে”

উদারের
হবি

মে-জুন ১৯৭৮

১৭/১/৭৬

তোমাদের চিঠি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। তোমাদের ছবি পেয়ে আমার

আরও খুঁসি। আমাদের এই হলটির নাম দেওয়া থাক—“ঈমার পাটি”—
কি বল? আর ঐ ঈমারটির নাম দেওয়া থাক—“রিখিয়া”—কি বল?
নতুন গানের সুরগুলি মনে আছে তো? ঈমার পাটিটা কলকাতায় এলে
আবার গানের আসর বসবে। তারপর—“চেয়ে চেয়ে চূপ করে রই”—
চূপ—প…………।

নতুন কি ফুল ফুটলো? নতুন কি পাখী দেখলে? Adar^{২২} পাটা
একটু সেরেছে বোধহয়। সুনন্দম বৈজু^{২৩} মাখনের দাম বাড়িয়েছে। কলে
কেবু বন্ধ। বৈজুকে আমাদের ঈমার পাটি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো।
এরপর মিতু পিসি চিঠি লিখবে। তাই চিঠি শেষ করলাম।

তুমি, মেজকী,^{২৪} ছুটকী^{২৫} আমার আশীর্বাদ মেনো। ইতি

‘পান-দান্দা’-^{২৬}

মেজোরাধু—বধাকালে পজাদিত। ভাল আছি। তোমাদের শুভবার
কথা ফুলতে পারছি না। শ্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে—

তোমার-ব’

(২)

Inland Letter : নিজের হাতে লেখা ঠিকানা—Sri Bishnu Dey
P.O. Rikhia (Via Deoghar)
Santal Pargana
Bihar 814112

দিটে J, Moitra
Calcutta-26

১৮/৭/৭৩

ঐতিহাসিক

অনেকদিন তোমাদের খবর-বার্তা দি পাঁই না। শ্রীমান জিফুর কাছ থেকে
মাঝে মাঝে গিয়ে সংগ্রহ করি। প্রশান্তির চোখের কোণও উন্নত হয়নি, সে
খবর পেয়েছি। এখন বনুজনের নিয়মিত বর্ষণে কলকাতা স্নাত ও প্রাবিত।
পরমও প্রশান্ত। পপারের উচ্চোগে ও উৎসাহে “স্বতি সত্তা ভবিষ্যত” এর
long playing record করবার এক পরিকল্পনা হয়েছে চাঁদা উঠিয়ে। সঙ্গে
নবজীবনের গানেরও হবে। এতে অনেকেরই উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। পপার
চিঠিতেও তুমি এই খবর পাবে। এটা করতে পারলে খুব ভাল হবে,
সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে স্ত্রীমাতার^{২৭} পালিতা কস্তা পুষ্পের বিবাহ হয়ে গেল। স্বশিক্ষণের

বাড়ীতে ঐ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনেক কবি ও কবিরশপ্রার্থীদের ভিড় দেখলাম।

এখানে আর নতুন কিছু খবর দেবার নেই। ওখানে রিষিয়ার বর্ষার রূপ নিশ্চয়ই খুব অভিনব ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। কিছুদিন পূর্বে কিতীশ একটি পত্রাশ্রিত করেছিল। ও বোধহয় মিছুনিকে^{১৮} দেখতে বিলম্বিত আছে।

তোমার ও প্রশান্তির কুশল সংবাদ দিয়ে নিশ্চিত্ত করো। আমাকে নানা কাজে ও অকাজে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে। আর ভাল লাগছে না। এইবার ছুটি নেবো। মিতু ভাল আছে। কল্যাণী রায়ের কাছে সেতার শিখছে। কলেজে ভর্তি হওয়া এখনও দেরী আছে।

কমরেড তোমার খবর কি? শপা ও মীরা^{১৯} তার বা report দিল তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। আমি আমার এক জায়গা খুঁজে নেবো। মিতুর একটা স্ববন্দোবস্ত করবো। তারপর দুই ফুলকে^{২০} ছব্রমাসের নোটিশ। তারপর উদাও। প্রেশার বেশ বেড়েছে। আর নয় এবার কেটে পড়া।

যদি পারো চিঠি লিখে তোমাদের সব খবর জানিও। ইতি

একান্তই স্নেহাঙ্গুত (স্নেহাঙ্গুত)

জ্যোতিরিন্দ্র

(১০)

Inland Letter : ঠিকানা—Sri Bishnu Dey
P.O. Rikhia (Via Deoghar)
Santal Pargana
Bihar
814112
জ্যোতিরিন্দ্র
কলিকাতা-৭৬

“সিলেক্টার্স” : এল আর হান্ রোড ২৪/৭/৭৬

পরম্পরার প্রাতিশ্রুতির এবং অশেষ স্নেহাস্পর্শ, মেজোবাবু, তোমার হস্ত-লিপি পেয়ে অভিভূত। দুই ফুলের মাঝখানে টানা-পোড়েনের মাকুতে পড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। মাঝে একবার B. P. 3 (diastolic) বেড়ে গিয়েছিল। এডেলফিন্ প্রয়োগে এখন স্থিতাবস্থা। ওমিকে রায়ের সুম, আজকালকার modern চাকরের মত, বাজার করে আসি বলে ছুটি নিরে, আর বাসায় ফেরেনি। ইহাঙ্কেই কি বলে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি। এই সব নানা কারণে পত্রাশ্রা তোমাদের খবর নেওয়া হয়নি। সেজন্য আমি

অত্যন্ত “লজ্জিত” ও অস্বস্তিপূর্ণ। তোমার মহৎ সর্জনশীল বৈকল্পিক ঔদ্যোগে অস্বস্তিকে কমা কোরো। G.D.R বা U.S.S.R এ যাবার কোনও নিকট সম্ভাবনা নেই। সম্প্রতি কোনও ইচ্ছাও নেই। ও সব অপিসের বড় বাবুয়া দ্বান, আমি তো মধ্যম কেরানী। তোমাদের কাছে গেলে বা “অন্ত কোনও নিজের পাহাড়ী আরগায় গেলে আমার মন ভরে যায়। পপা, স্মিরা, ইরা—তারাবাবু মারকত তোমাদের ধবর সংগ্রহ করি। পপার initiative এ, Long Playing করবার একটা বড়ম্বর হচ্ছে—“স্বাভি-সস্তা” “স্বাভি-সস্তা” ও নবজীবনের গানের—হুটো পুরো Disc—বেশ অর্থগাধ্য ব্যাপার। তাই টাকা তুলে করার বন্দোবস্ত হচ্ছে। শ্রীমান হুতাব চৌধুরী ও হুপূর্ণা চৌধুরী এ বিষয়ে পূর্ণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবার ওদিকে লুচ্ মিজের “টায় বশিকের পালার” কাজও আরম্ভ হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে “হু-একটা” গানের সুরও দিয়ে ফেলেছি—ওটাও একটা বিরাট project, তবে time consuming ও খুব long drawn ব্যাপার।

এবারকার ‘পরিচয়’ তোমার হাতে পৌঁছেচে? আমার সেই লম্বা কবিতা—‘বার্লিনের হাত ধরে স্বপ্নের মেজাজে’—পুরোটা ছাপিয়ে দিয়েছে। সকলে বলছে খুব ভাল হয়েছে। আমারও ভাল লেগেছে। তোমার কেমন লাগবে জানি না। এ সংখ্যার স্বাধীনবাবুর^{৩১}—তোমাকে লেখা অনেক চিঠি বেরিয়েছে। বেশ interesting! আমার সবচেয়েও “আপনার বন্ধু” বলে বেনাশা উল্লেখ আছে। তোমার চিঠিগুলো ছাপলে আরও ভাল হত। পোপালদারও^{৩২} একটা ভাল লেখা আছে।

প্রশস্তির চোখ সবচেয়ে,—বা ধবর পাই,—তাতে খুব উদ্বিগ্ন। তোমার চিঠিতে একটু ভালর দিকে জেনে, ভাল লাগল।—তোমার হাত কেমন? আমারও নক্ষিত হস্ত মাঝে মাঝে ব্যথার কাতর হচ্ছে। Gout? leader’s Camps কি জানি (বয়স তো হেলো ॥)। আমি এখন প্রায়শঃই বেপরোয়া ভাবে বা-তা কবিতা লেখা আরম্ভ করেছি। সবগুলো যে ভাল হয়, না নয়—তবে কলম মোটাশুটি সচল। আশাকরি তুমি অনেক সার্বিক ও মহৎ কবিতা রচনা করে চলেছো।... আমি পান ছাড়বো না কোনোমতে। পান শেখানো এখন খুব ক্লাস্তিকর হয়ে উঠছে, getting on my nerves বাক্য বলে। আসলে, একটা পরিবেশের পরিবর্তন চাই। তাছাড়া এই সব ইন্টেল কিংকল করে কিসল্য হবে না। এ এক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এ এক ব্যর্থ শ্রম। আমি বতদিন বাঁচি কিছু না কিছু কাজ করে বাবোই—যে রকম কাজ আমার পছন্দ—লেখার,

ছয়শতিকা,—এবং বা এই সবের অল্পকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে সেই রকম কাজ।
 বিমালয় বড় দূর—অনাস্থায়। ওখানে বাবো না। তোমাদের কাছাকাছিই
 কোথাও—কলকাতার ৩৪ নম্বর রাস্তার মধ্যে। রবীন্দ্রবাবু আমার সঙ্গী
 হবেন বলেছেন। গত ৩০।৪০ বৎসর ধরে বা স্থায়ীকৃত করেছি তার সঙ্গে
 নিজের জীবনেতিহাস বিশিষ্টে—খানিকটা autobiographical কিছু লেখা
 লিখে বাবো তাবহি। এ সম্পূর্ণ আনন্দগত—satisfaction—এতে কারো উপ-
 কার হবে বা ভাল লাগবে বলে বিশ্বাস করি না। কিন্তু বাম্বপুত্র ও প্রেসিডেন্সী
 ফটোতেই apply করেছে। বাম্বপুত্রে আগেই enroll করে রেখেছিলো।
 Presidency ২৬শে form fill up করে mark sheet ইত্যাদি দিয়ে
 আসবে। এটাতে অবশ্য পণ্য সাহায্য নেবে। বেটা লেগে যায়। দিল্লীর
 বইশুধুবি** সব ভাল আছে। শান্তনুবাবু** হারজাবাধে অধিষ্ঠিত। ভাল
 আছে। সুদেফা-সুদেফীরা** সব সচ্ছন্দ ভাল আছে। যদি হাতে বেশী ব্যাধা
 না feel করো চিঠি লিখলে কৃতকৃত্য হবে। আমার বুড়ো আত্মলে ব্যাধা।
 শুশোভনবাবু** শরীর খুব ভাল আছে না। দেখা করে আসবো—তিনি
 ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আর কি?

সকল ভালবাসা নিও। প্রণতিক্রমে দিও—

জ্যোতিরিন্দ্র

(১১)

Inland Letter : ঠিকানা—Sri Bishnu Dey

Mrs. Pranati Dey

P.O. Rikhia

Santal Parganas (Bihar)

814112

From

বই

কলিকাতা-২৬

০১/৭/৭৮

প্রান্তরস্বয়ং কবিকাবিরচিত,

তোমার ২৭।৭।৭৮ এর পত্রপ্রেরণায় আপাদমস্তক পুলকিত। আমাদের
 বর্ষা প্রত্যাহ কর্ত্ত এবং প্রাত্যহিক কর্ত্তম অভিব্যক্তি ও পিচ্ছিল পতন। আমার
 সাধিকতার আত্মবান ভনে আবৃত্ত।

লখা—চাক্তি হুটো হবে। প্রথম, স্থিতি সত্তা ভবিষ্যত ও অতীত বিকু-
 সঙ্গীত-স্বরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। দ্বিতীয় চাক্তি, নবজীবনের গান ও
 স্বস্তির গান। এই আপাততঃ ঠিক হয়েছে—পণা, হুতাব** আর আমি বিবদ

আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। চাঁদার চাঁদি ও অন্তর উপায়ে অর্থ সংগ্রহ সম্ভব। ওদিকে শত্ৰুর 'চাঁদ বণিকের পালা'র কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আর্থনিক প্রারম্ভিক হয় কিছু দিগেছি। এত এক epic বয়। পরিচয় আমাদের ফুটপাথ থেকে কিনতে হয়েছে। তোমাকেও পাঠায়নি। কী ব্যাপার ॥

অরুণ সেনের সঙ্গে বেশ কিছুদিন আগে দেবেশবের আড্ডার^{১২} দেখা হয়েছিল। আমি বোঁজ নেব। সুশোভন বাবুর ওখানে এখনও বেয়ে উঠতে পারি নি। বেতে হবে।

মিতু প্রেসিডেন্সীতেও চেষ্টা করছে। স-ছবি আবেদনপত্র দিয়ে এসেছে। বাদবপুয়ে আগেই দিয়েছে। লেডী ব্র্যাবোর্সে চেষ্টা করবে না কি ?

রবীন্দ্রনাথ ও আমার দু'একজন অন্তরঙ্গ ও বাণপ্রস্থ প্রার্থী। বিশ্রাম কুটির বল, সংকেত-গুহাই বল—একটা কিছু হবে। তার অন্ত হস্ত পাহাড় কাটতে হতে পারে। কোথায় হবে কিছুই ঠিক নেই। জীবনের শেষ পর্বায়ে কোন অরণ্য-গুহার গুহাহিত হবো, কে জানে? তবে কলকাতার কাছেই অবশ্য।

তোমার লেখনী-হস্ত আরোগ্য লাভ করুক এই প্রার্থনা করি। বাংলায় কবি-কোলাহলে কান পাতা দায়। আর ঐ, সঘর্ষণা ও স্মারক সত্তা। এক দিক বলে বেড়ে দৌড় দিতে ইচ্ছা করে। সেই অন্ত আমাদের অধিষ্ট অপরিচিত। অলমিতি—মেহাস্পায় বটু

প্রতি,

তোমাকে সরাসরি চিঠি না দিলে লিখবে না বলে লিখলাম। তোমার চোখ ও দৃষ্টিশক্তির অন্ত অত্যন্ত বিচলিত ও উষ্ণ। ভেবেছিলাম আঁকি করে দেবো। পারলাম না। নিত্য তোমার আরোগ্য কামনা করি। কিন্তু পোড়া বায়ুন তো নই—কমুনিষ্ট। ফলে লাগসই হচ্ছে না। গৈতেও নেই এক ষণ্ড। তোমার পৈশে কেমন হচ্ছে ও চুরি যাচ্ছে? তোমা কমরেডের খবর কি? কিছু খবর অবশ্য পপাদের কাছ থেকে পেয়েছি। কুশল-বার্তা দিও।

—অ্যোতিরিঙ্গ

(১২)

Inland letter : ষ্টিকানা—Shri Bishnu Dey
P. O. Rikhia
Sental Parganas
Bihar
814112

From : J. M. Cal-26

১৫ই আগস্ট, ৭৮

অরুণজ্যোতিষের

তোমার লাল কালিতে লেখা পোস্টকার্ড পেলাম।

রেডিও প্রোগ্রাম ভাল লেগেছে মনে আনন্দিত। আশা করি অরুণ সেনের চিঠি এতদিনে পেরেছে। এবং ‘পরিচয়’ তোমার হাতে পৌঁছেছে (প্রশস্তির চিঠি আনা পেল)।

এখানে ‘স্বকাত-অরুণ্ডার’ অরে ভূগর্ভি—ভিজে ভিজে।

শুধু মিত্রের যোগসেলে পুরস্কার প্রাপ্তি আশাভের সকলকেই আনন্দিত করেছে। “স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত”, recording উপলক্ষে কথা বলেছিলাম। সে পদাধের ওপর আত্মাহীন—বিরক্তিই প্রকাশ করছে—আল্‌হা! এবং সে আরো এই projectএ যোগদান করবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য এক হিসাবে তা ভালই হবে। কারণ ইদানীং তিনি যে চণ্ডে কবিতা আবৃত্তি করছেন, সে চণ্ড আমার পছন্দ নয়।

বিত্ত বাধবপূরে ভর্তি হবারই চেষ্টা করছে। মনে হয় ভালই হবে। সম্রাতি সে ইনকুয়েন্সার ভূগছে।

আমিও খুব দুঃখ নই। খুব ক্লান্ত। ছুটি নেবো তাবহি। একেবারেই ফুল-সম্পর্কহীন হলেই ভাল হয়। এমনিতে ওরা ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। কিছু কোণল অবলম্বন করতে হবে বলে মনে হচ্ছে। প্রাপটা এবং লেখাটা সবার আগে। এখন কলমের ভগ্নায় বা আসছে, লিখে ফেলছি। এ এক উৎপাত শুরু হয়েছে। তাতে অবশ্য মনটা ভাল আছে। একটা নির্জন পরিচিত লোকহীন আরণ্যে খুঁজছি।

তোমার ও প্রশস্তির সার্বিক আরোগ্য কামনা করি—

একাত্তর তোমাদের

জ্যোতিরিন্দ্র

* বিশেষ কারণে চিঠিটার অলবিশেষে ছাপা হলো না।

(১০)

ধাম লেখা : ষ্ট্রিকান—Shri Bishnu Dey

P. O. Rikhia

Deoghar

Santal Pargana

Bihar : 814112

২৩/৮/১৬

বর্ষাব্যয়—

তোমার ১২ তারিখের পত্র ২৩শে হস্তগত। আনন্দিত। উৎসাহিত।
স্বকান্ত জয়ন্তীর অর নেমেছে। বৃষ্টি থেমেছে। চিলে কোঠার আকাশে
সুড়ি। রাজে উজ্জল তারা। তারের বৃষ্টিহীন জীবনবাত্রা ধামে তেজা।...

মিতু আজ বাদবপুরে ভর্তি হল। শ্রীমতী বশোদরা বাগুচির কাছে কি
প্রণতির কিছু বই আছে?

ক্যাপা বাউল কিতীশ কলকাতায় এসেছেন। এখনও দর্শনলাভে
বঞ্চিত। কোনে সমাচার পেলাম।...আমার টিউটনিক দীর্ঘ কবিতা তুমি
পড়েছ ভেনে আনন্দিত। এখন পরিচয় কবি-সম্প্রদায়ের ভাল লেগেছে।

আজ সলিল চৌধুরী পরিচয় কার্যালয়ে পদার্পণ করেছিলেন। অনেক
ভালো ভালো কথা হল। অনেকদিন বাধে তাকে দেখে, কথা বলে ভাল
লাগল। আগামী ২৫শে অশোভন বাবুকে তাঁর ৭৫তম জন্মদিনে স্মরক
গ্রন্থ দেওয়া হবে। তিনি এখন পি. জি হাসপাতালে স্থানান্তরিত।

আমি ১৯৭৭ সালে কলিকাতা ত্যাগ করবো। ৬৬ বৎসর বয়স্ক বালকের
এবার বিশ্রাম দরকার। মিতুর অন্ত কোনও ছদ্মস্তা নেই। এখানেই
ভাল থাকবে। দেখ-ভাল করবার লোক আছে। নিষ্ঠাবতী। আমার
সম্পর্ক মাঝেমাঝেই পাবে। কলকাতার খুব বেশী টানটানি চলছে—অবধা
আহুতর। সেইজন্যই কলিকাতা-ত্যাগ। অপরিচয়ের অরণ্যে বিশ্রাম।
অরণ্য ছাড়া আরোগ্য নেই। ফুলেও ব্যর্থপ্রম।

তোমার হাত, এবার ধামো হে-বলছে। বললেই হল। ইয়ার্কি?
প্রণতির চোখ অনেক ভালো, তবে এখনও চাক্ষুষ—explain with
reference to the context...তারার বাবুদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।
সম্রাট টিপু** তখন হুমত। অতুলবাবুর** সৌমন্ত্র সূচক আপ্যায়ন।
অন্ত ঘরে হনীলবাবুর** সাক্ষীতিক পর্জন।

অন্তান্ত থবর বর্ষাবর্ষ।

সেহসিদ্ধ অমিবাভ বটু

** বিশেষ কারণে চিঠির অপেক্ষিতের ছাপা হল না।

২০।৮।৭০ তারিখের চিঠির শেষ

২০।৮।৭০

প্রণতি,

তোমার চিঠি ও anecdotes পেয়ে আনন্দিত। সত্যিই এ-জীবন বিচিত্র। বিশেষতঃ কবি—স্বরকারের। ঠিক বলেছে—ওরা অভিনয় করেন—আমি যা মাঝায় আসে লিখে বাই। কিছু আত্মজীবনী লিখবার দায়িত্ব অসম্ভব করি। নির্জন পরিবেশ না হলে হবে না। আবু কাস্ত ও বিধ্বস্ত। মিতু আজ ঘাঘরপুরে ভর্তি হল। বশোবরার কাছে তোমার কিছু বই আছে—তারাবাবু বললেন। মিতুর কাছে লাগবে? তোমরা চিঠি লিখলে ভাল লাগে। কিতীশ কলকাতায়। শ্রীমতী তোমাদের উত্তর আশা করছি

—জ্যোতিরিন্দ্র

(১৪)

খাসে লেখা চিঠি, মিতুর চিঠির অন্তর্গত। ঠিকানা নিম্নের হাতে লেখা

Sree Pranati Dey

P. O. Rikhia (via Deoghar)

Santal Parganas,

Bihar Pin Coda 814 112

২০।৮।৭০

প্রণতি,

কার্ড পেলাম। আগামী কাল মিতু regular ছাত্রী হিসেবে ঘাঘরপুর কলেজে যাবে। আর ওদের newcomersদের নিয়ে একটা get together welcomeএর একটা বেশ অনুষ্ঠান হল। ছাত্র-ছাত্রীদের খাওয়াল—snacks ইত্যাদি। বেশ ভালই তো বন্দোবস্ত। পরিবেশ মিতুর ভাল লাগছে। চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী মিতু পপাঘের ওখানে গিয়ে বইগুলি সন্ধান নিয়ে আসবে। এতে কোনই অসুবিধা নেই।

পপাঘের ওখানে ক' দিন থেকে যেতে পারি নি। মাঝে শরীর বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সর্দি, কাশি আর ইত্যাদি। রক্ত চাপও সামান্য একটু বেড়েছে। এখন থেকেই সাবধান হচ্ছি—“বয়স তো হোলো।”

মেজবাবুর শরীর কেমন চলছে? তার শ্রীহস্ত কি বলে? শ্রীহস্ত প্রসাদ থেকে বঞ্চিত। আমার শরীর বলছে—বিল্বাম নাও—কিন্তু এখানে থাকলে বিল্বাম কোথায়। নজরুল গেলেন—তারপর মিটিং, শোকাংশ, গান, তারপর আলোচনাচক্র। এই আলাতচক্রে ঘুরে ঘুরে প্রাণান্ত। এইবার পালাই পালাই ভাব। “অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়, লভিব মুক্তির স্বাদ”—

বলবার মত শরীর ও মনের অবস্থা নয়। স্কুলের বাঁধাধরা routine-এর মধ্যে মন বসাতে পারছি না। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তঃস্থলে একটা মারাত্মক রকমের গুণগোল আছে। বাক্যে বন্ধক পে। লেখাটাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করছি। হিজিবিজি কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং লিখে চলছি। তোমরা দু জনে আমার প্রীতি-ভক্তেচ্ছা নিও—

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

(১৫)

Inland letter : ঠিকানা—Shree Bishnu Dey,
P. O. Rikha,
Santal Parganas
Bihar-814 112

From J.M. Calcutta-26

০১/৭/৩৬

প্রিয় মেজোবাবু,

তোমার প্রীত লিখিত বিষ্ণু-ভক্তী-রিখিয়া জিকুটের কেলানিডুংরেখাচক্র—
অত্যন্ত অতি দেয়। আনন্দিক শান্তি। আনন্দিত।

মর্ত্যলোকে আবার গুণগোল। নজরুল অন্তর্হিত বাংলাদেশের
অভ্যুত্থান। আমার আগামী, জাবী কঠোরতার অন্ত ভাবিত। লেখনীর
নিরুপলব্ধ।

গত রবিবার (৫ই) ষড়্‌গুপ্তপুত্রে স্বকান্ত-স্বরণ সভায় বলে এলাম—আবুতি
করলাম—“তবু আজ বসন্তকণ ধেবে আছে প্রাণ

- প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো অঞ্জাল”

এ বিষয়ে এ শিল্প বাসবোণ্য করে যাবো আমি—এবিষয়ে কতটুকু
অবহিত আপনারা? শুধু এ শিল্প নর, সমস্ত শিল্পদেয়, সমস্ত নবজাতকদের
অন্তর্হিত শিল্প-পল্লী রচনা করুন—নাম দিন “স্বকান্ত-পল্লী”—এ নবজাতককে
(অর্থাৎ ধর পাটি) ধরে রাখার অন্ত নব নবতর শিল্পদেয় উদ্ভবের
প্রয়োজন—স্বকান্ত-কান্তি নিয়ে...ইত্যাদি। এইসব বাক্যতান্না মেয়ে,
পালিয়ে এসেছি। কিন্তু লোষ্ট্র-প্রাপ্তি হবার সম্ভাবনা। এবার পাঁচাকা-
‘পারবো না’ বলা আরম্ভ করেছে। কলিকাতা নগরী ত্যাগ না করলে ঘাড়ে
ধরে পারাবে। আসল কথা কলিকাতা নগরীতে মিতু থাকে। ধলে বাঁধা
তা নইলে কলম বগলে করে যে ছুট—বঃ পলায়তি ন জীবতি...

প্রণতির প্রতি,—পূজোতে তোমাদের কাছে যাবো না। পরে। আপাততঃ
টাটায় বাস্বর** কাছে থাকি। তারপর বাটশিলা, ধলকুমগড়-চাহুলিয়া-

পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন। ও দিকটাও বেশ। পাখী, পাহাড়-নদী। পরে ফাঁক
বুঝে—রিথিয়া। পপায় ভারী মজা কি বাড়ী কর করেছে?

শরীরে নানা প্রকার ব্যাধি অল্পপ্রবেশের চেষ্টা করেছে। পানের ঘমকে
ভাগাছি। চোর ব্যাটারী বহি ভাগতো, হুবিধা হত। চোর-লোক কলিকাতার
বোমকেশ মুস্তাফি হয়ে বশে থাকে মুন্সিল। অবশ্য রিথিয়ায়-কুলতোড় পৌঁপে-
তোড় চোরের অভাব নেই। কি করা যাবে—বে দিকে কিয়ানি আঁধি.....।

মিস্ত্রী প্রণতিক পয়ে চিঠি দিচ্ছে। কিছু বই নিয়ে এসেছে। আপাতত
সব ভাল।

তোমাদের আত্যন্তিক আশ্বা ও কুশল কামনা করে

একাত্তর তোমাদের—একবারেই—বাক বলে—“ব”।

Inland Letter : হুসিতা সৈয়দ

26.11.76

প্রতি কে-কে লেখা চিঠির সঙ্গে

এই মেসোবায়ু,

তোমার আরক্ত আহ্বান পৌঁছেছে।

আমি আছি—বাক বলে আছি—কায়কেশে তো বটেই আরও বহুবিধ
ক্লেশাহুত রয়েছে। তোমরা এখন তো খুব অরুচিক্ত—প্রায় ২০০০ হাজার
হোমগার্ড তোমাদের ঘিরে রয়েছে—প্রণতির চিঠিতে সংবাদ বিবৃত। সজয়
অর্থাৎ সজীব (আসল নাম) হুগ্, ঘুগ্ জায়ো।

পান? হাঁ পান পাইতে যাবো—হোম গার্ডরা চলে গেলে।

এখন আপাতত—কুল ব্যক্ততা—আরবিক ক্লাভি—নিজাহারা রাত।

ভবদীয়

মেজো—

(১৭)

Inland letter : ঠিকানা—Shri Bishnu & Mrs. Pranati Dey.

P. O. Rikha

Dist. Santal Parganas (Bihar)

814112

From Jyotirindra

Calcutta-700 026

11.77

কবিকবিশেষ,

ইংরাজী নববর্ষের শুভ কামনা জানাচ্ছি। কিছুদিন পূর্বে তোমাদের কার্ড
পেয়েছি। গত বছর মনে পড়ে, ঠিক এই সময়ে তোমাদের কাছে ছিলাম।
বেশতে বেশতে বছর ঘুরে এলো।



কলকাতার পদার্পণ করলে তখন অবশ্য সাক্ষাৎকার দর্শন প্রবণ সবই সম্ভব হবে।

প্রায় মাসাধিককাল কবিতা-গানে ভাটা পড়েছে। শরীর ভাল আছে। নৌকো নদীর ছিঁড়বো ছিঁড়বো করছে। মনে হয় ১২৭৭—এই জ্বলন্ত দড়ি-দড়া ছিঁড়ে ফেলতে সক্ষম হব। কোথায়, কিতাবে; আপাতত উহ।

শ্রীতি শুভেচ্ছান্তে

তোমার জ্যোতিরিন্দ্র

১৩৮৭

প্রতি,

ইংরাজী নববর্ষের (১২৭৭) শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। তোমাদের কার্ডে সব অবগত হই। তোমরা কবে আসছো? গতবার এই সময়ে তোমাদের কাছে ছিলাম। আমি ও মিতু বহাল তবিরতে আছি। মিতু মনে হচ্ছে কলেজ—পড়াশোনা seriously নিয়েছে। ভালও লাগছে নিশ্চয়। আশা করি তোমার আলম্বে এখন অনেক তীর্থযাত্রী। এবার আর যাওয়া হল না। তোমাদের সকলের কুশল সংবাদ চাই।

শ্রীতি শুভেচ্ছান্তে

জ্যোতিরিন্দ্র

(১৮)

Inland Letter : নিজের হাতে লেখা টিকানা—

শ্রীমতী বারি, মেজিঃ ও হুটকী হস্তরিতার

Shri Bishnu Dey & Mrs. Pranati Dey

P. O. Rikha

Dist. Santal Pargana

Bihar

814112

From Jyotirindra Calcutta 700 026

12.1.77

পরবর্তীকালে,

তোমাদের সম্মিলিত পত্রসঞ্চারে অভিসিদ্ধি। তোমাদের কলকাতা আগমনের সম্ভাবনার পুলকিত। ঐসব 'গৃহ-রাক্ষসেরা' এখনও তোমাদের শান্তিপূর্ণ উপত্যকা অধিকার করে বসে আছে,—খুবই উদ্ভিন্ন করে তোলে। তোমার সারমেয়-সংসার নবাগতদের ভীড় শুনে আনন্দ শিহরণ! বেকর্ডের

আয়োজন চলছে একটু স্লথ পতিতে। এখানে শীত কমে আসছে। বসন্তের আমেজ দিকে দিকে। অর্থাৎ টিকা নিতে হবে। মিতু ভাল আছে। পড়াশুনার ব্যস্ত। তোমাদের, তোমার একান্ত কুশল কামনা করে—

জ্যোতিরিন্দ্র

* ইনল্যান্ড লেটারে আঙুল করে লেখা

পরম স্মৃতিচিহ্ন, প্রণতি, তোমাদের সকলের চিঠি পেয়ে পরম আপ্যায়িত। তোমরা গৃহ-রক্ষীদের অভ্যাচারে পৃথুর্দত্ত—এ ধরনে বিশেষ উদ্বিগ্ন। এ আপদ বিদায় হবে কবে? আমরা ভাল আছি। আমার হাতে আজকাল খুব ব্যথা হয়, গরম জলে ডুবিয়ে রাখলে কমে যায়। স্ত্রীর লেখনী সব সময়ে সচল নয়। তোমাদের সকলের অশেষ কুশল কামনা করে—

জ্যোতিরিন্দ্র

দাদি, মাই, মেজকি,

তোমাদের সকলকে আমার ও স্নেহাশিস পাঠাচ্ছি। Jojo-Adar বাচ্চাদের কুশল কামনা করছি। ওরাই বেন সত্যিকারের Home-Guard হয়ে ওঠে। তোমরা কবে আসছো? তিনটে শালিক আশা করি স্থখে শান্তিতে আছে। ইতি—

আশ্বিনীধর

পান দাশন্য

(১৯)

Inland letter : ঠিকানা—Shri Bishnu Dey,
Sreemati Pranati Dey,
Dady, Mejki, Chhutki
P. O. Rikhia,
Dist Santal Parganas, (Bihar)
814 112

From J.M. Cal-700 026

২৩/১/৭৭

বেঙ্গের সেকো,

তোমাদের সম্মিলিত পত্র-কোরালাে অভিজ্ঞত। দাদি, ছুটকী, মেজকী এবং তোমাদের soprano ও baritone সমস্তটা মিলে দারুণ Symphonic effect। কী যে ভাল লাগল, বলতে পারি না।

আমি সম্ভ্রান্তি হুই ফুলের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মাঝে পড়ে বিপর্যস্ত annual function ইত্যাদি সব ব্যাপার। পাঠকবনের ডামাডোল শব্দ পর্যন্ত শব্দ হয়েছে। এবার শুরু কমলা গার্লস ফুল। একটা ছাড়ে তো আরেকটা

ধরে। মাঝে মাঝে ভালই লাগে। আবার মাঝে মাঝে খুবই tired হয়ে পড়তে হয়। তখন মন পালাই পালাই ভাক ছাড়। আবুও উৎকিষ্ট হয়। রিখিয়ার মত অত দূর ছুরিগম্য আরগায় নয়, কাছেই একটা ডেরা করার মতলবে আছি—ভাল অরগ্যানিস্ম—অদূরে পাহাড় অথচ বাংলাদেশের মধ্যেই। তবে আমার এটা হবে কর্মবজালা। একটা group সংগৃহীত হয়েছে—তথাকথিত চেনা গ্রুপের মধ্যে নয়। স্বাভাবিকের টাউনের অন্তঃপাতী একবার গিয়ে দেখে এসেছি। আবার যাবো। এবং একটা যৌথ সংস্থা রেজিস্ট্রী করা হবে, নাম—“কৃষী”—agro economic complex of multipurpose farming। এবং স্থানীয় অত্যন্ত influential আধিবাসী—মহাতো আমার প্রধান সহায়। যতদূর মনে হচ্ছে (বেশী বহাফোর্ট করা ঠিক নয়) আগামী ছয় মাসের মধ্যেই তোমাদের স্বাভাবিক বন-ভোজনের আমন্ত্রণ জানাতে পারবো। কলকাতা থেকে যেতে Steel Express ২৪: ১৫ মি: লাগে অত্যন্ত local shuttleএ ৩৫ মিনিট। অত্যন্ত strategic আরগা, যে ধরনের কাজ করতে বাচ্ছি তার পক্ষে। তা ছাড়া রিখিয়ার অনেক অসুবিধা অনেক বিহার-স্বলভ বগড়া এখানে নেই—মানে অনেক কম ও controllable অথচ অস্বহীন সুবিস্তৃত অরগ্যালোক হাত বাড়ালেই হৌগবা যায়। সুদেহা আর তার বয়—জ্যোতির্ময় বন্দোপাধ্যায়—কৃষীগ্রামে ডেরা বঁধতে প্রস্তুত burning all their boats। আর কাউকে টানছি না—বা আসবে না। এ মাসে registered হয়ে থাক পরে সব progress report দেওয়া যাবে। আমরা একটু দাঁড়িয়ে গেলে—say after 1978—এখানে environmental workshop-school ইত্যাদি যা এখানে ভাল করে করতে পারা গেল না—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে-দের নিয়ে আবাসিক ভাবে করবার প্রয়াস করবো। তখন তোমাদের কথা—বিশেষ প্রণতির কথা খুব মনে হবে। তোমরা এখানে এলে শুনো। পান, লেখা—নাটক ইত্যাদির প্রচুর অবসর পাবো। এবং লিখবো। আমরা ভাল আছি। মিতু কলেজ ও পড়াশুনার ডুবে আছে। ভালই হয়েছে। শান্তনু, খইবাবু গুরু (২)^{১০} সব ভালো আছে। ভালো থাকো। Keep away from Home Guards। মার্চ অবধি টিকে থেকে কলকাতা চলে এসো। তখন সাক্ষাৎকার চলবে। অধিক অনেক কিছুই লেখার ছিল কিন্তু স্থানান্তরে হল না। অলমিতি। ভালবাসা জেনো—

তোমাদের বটুশাবু

প্রশংসা, তোমার পক্ষে বিশ্বয় ধবর পেলাম। তোমরা আসছো শুনে ভাল লাগছে। প্রতীকার দিন গুণছি। তোমার চোখ কি বলছে? বিকৃত চিঠিতে অনেক সংবাদ আছে। পড়ে নিও। জো-জো আর অ্যাডামের বাচ্চারা Home Guards দের তাক্কাবার মত শক্তি সঞ্চয় করুক। দাদি, ছোটকী, মেজকীদের অশেষ ভালবাসা জানাচ্ছি। সকলের প্রতি শ্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে—একাত্তই তোমাধের

জ্যোতিরিন্দ্র

দাদি, মেজকী, ছোটকী তোমাধের চিঠি পেয়ে আনন্দিত। যে পাখি বেধেছো—স্থানীয় বাংলা নাম “কনা কুঁয়া” “Crow pheasants”—কুউং। কুউং ॥ করে ডাকে। Larks, Finch lark বেধেছো? আজকের মত আশীর্বাদ জানিয়ে—তোমাধের

গান দাদেনদা

জো-জো, অ্যাডা আর তাহের সন্তান সন্ততিদের আশীর্বাদ জানাই—

গান দাদেনদা

(২০)

Inland Letter : ঠিকানা—ঐকিৎ বে, ঐকুল প্রশান্তি বে,
মহাস্থান ঝিকুট, ভিসরিয়া সরাপেয়—
পোঃ বিখিরা। রেঃ সীজতাল পরশা
বিহার ৮১৪ ১১২

Sender—জ্যোতিরিন্দ্র

কলিকাতা-২৬

৮/২/৭৭

প্রিয়বরেন্দ্র,

তোমার পোষ্টকার্ডে পরম আপ্যায়িত। ই্যা, হুই ফুলের টানা-পোড়েনে গ্রাম শিল্প সম্বন্ধে একটা আধাঘাতি গামছা তৈরি হচ্ছে বটে। কিন্তু তা কবি ও সঙ্গীতশ্রমীর লক্ষ্য। নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে ব্যাপারটা কাটিয়ে উঠবো ঠিকই। তবে ক্লাস্তি অবশ্যজ্ঞাবী। সেখানেও তোমাকেই মানছি—“ক্লাস্তিতে কিসের তরু?...মাটির যেমন ক্লাস্তি আসন্ন ফসলে”—ইত্যাদি। ই্যা, তাছাড়া পদ্মাপারের শিতলাই হাউস তো আছেই। তবু সেটা যেন অবতলাহিত পেইনটিং এর মত অস্পষ্টতর হতে চলেছে। শারীরিক ও মানসিক ব্যতিতে। আমি যেমন agro-economic complex এর স্বপ্ন সঞ্চয় করবার প্রয়াসী, সে দিক থেকে ব্রাহ্মগ্রাম আদর্শস্থানীয়। on all counts Fast train এ পৌঁছতে (Steel Ex. বা ইম্পাত) ২ ঘণ্টা ১৫ মিঃ লাগে। শালবনে ঘেরা কলকাতার শহরতলী বললেই হয়। বাংলা দেশের ভিতর।

আশা, বিহার বা u. p. য় যে কোন আশা-প্রদ আয়গার সমতুল্য। এবং অর্থ উপার্জনের উপায় ও সুযোগ বিভিন্ন। তুমি ও প্রগতি এখানে আসলে নিশ্চয়ই খুব আরাম পাবে। শহর ও অরণ্যের মধ্যে নির্বিবাদ সহাবস্থান। আগে একটা আত্মনা বানিয়ে নিই। হয়তো আরও ৪৫ মাস সময় লাগবে। বাড়ীতে স্পষ্টত: কাউকে জানাই নি। একটা ছেলেমানুষী গোছের surprise দেবার ভঙ্গ। আমি এখনও কিছুটা কর্মক্ষম। এখানে আড্ডা গাড়তে পারলে একটা সম্পূর্ণ renewal হবে—শরীরের ও মনের। সাক্ষাতে অনেক কিছু বলা থাকবে। একদিন মিতু ও আমি পলাদের ওখানে গিয়েছিলাম। সকলের সঙ্গে দেখা হয় নি। জোজো ও আড়ার সন্তান একটা পপার ওখানে তুললাম—ভীষ্ম কর্তৃ। মিতু ভাল আছে। পড়াশুনা, কলেজ, বন্ধু—বাঙালীদের নিয়ে ভালই মজে আছে। আমি আগামীকাল পুকুরিয়ায় বাজি। কিরবো কাড়গ্রাম হয়ে, ১৫ই বা ১৬ই।

সঞ্জীব-সঙ্করের ব্যাপারটা সত্যই চমৎকার। জগদাবুর বাঁড়ের জুতো বেশ মারাত্মক প্রবল। কীর্তনের ধুমায় আরও অনেকে। তোমাকে ও প্রগতিককে ঈশ্বরই দেখবার আশায়—

তোমাদেরই জ্যোতিষিত

জ্যোতিষিত

পু: 'স্বতি-সন্তা-ভবিষ্যতের' মহড়া ছুদিন দেওয়া হয়েছে। পাঠ ভবনে। স্বভাব ও সত্যের এর কর্ণধার।

বটুক

(২১)

Inland letter : ঠিকানা—Shri Bishnu Dey

P.O. Rukhia, Santal Pargana, Bihar

From : Batu-babu, 5 S. R., Das Rd., Cal-26

ঐতিহাসিকন্যু.

১লা জ্যৈষ্ঠ, '৭৭

অনেক আগেই চিঠি লেখা উচিত ছিল। নানা কারণে সম্ভব হয়নি। চিলে কোঠার ঘর থেকে লিখছি। মধ্য রাত্রি। প্রচণ্ড বারি বর্ষণের আওয়াজ ও জলের ঝাপটার জেগে উঠেছিলাম। রথীবাবুর বড় ছেলের বিয়েতে ঝাওয়া ভালই হল। মেয়েটি বেশ। রথীবাবু বললেন, তোমার চিঠির কথা। বিধি কি এখনও হোম গার্ডের দ্বারা সুরক্ষিত? আমাদের এটিকে অর্থাৎ কাড়গ্রামে আমাদের চার বিঘের ক্ষেতে এখন ধানে ভর্তি। কবিতা নতুন কি লিখলে? তোমার হাত? আর প্রগতির চোখ? অধিকাংশ সংবাদ পলাদের কাছে সংগৃহীত হয়।

আমি ভাল আছি। কবিতা লিখছি না, গান মাঝে মাঝে। স্বরণ-সত্য
বা অন্তর। আর কি? মিতু ভাল আছে। রাজনৈতিক বেরাধারি শিথিল।
ক্লান্ত। অনেক আয়পায় ডাকে যেতে পারি না। প্রবন্ধে কিতীশ বাবুর* ধবর
কি? চিঠি পেলে আপ্যায়িত হব। নিত্য-সত্যস্বার্থ্য

তোমার

বটুবাবু

(২২)

ধামে লেখা হাশানো কাগজে

“দিলে কোঠা”

রকের হবি—Grey

e এস আর দাস বোড, কলিকাতা-২০

হাশা Grey রকের অক্ষর

শাল অক্ষরে হাশা—KARSHANI (AGRO ECONOMIC COMPLEX)

JHARGRAM, MIDNAPORE, WEST BENGAL, INDIA

মাই ডিয়ার কেজোবাবু,

১১/৮/৭৭

বধাকালে পত্রাভিসিদ্ধি। ডিপ্লোমিয়া জিকুটের পরিচিত হস্তাক্ষর।
তোমাদের গ্রন্থানের পর “কবিতা” নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কলে তোমাদের ও
আরও অনেকের সঙ্গে পাত্রিক সংযোগ ছিল হয়। তাছাড়া বারিপাতের
প্রাণলো শরীরটাও ঠিক যাচ্ছিল না। আমাদের সকলের পরিচিত প্রিয়জন,
আমার সঙ্গীতগুরু, বন্ধু ও অসাধারণ সঙ্গীত শিল্পী ভীষ্মদেব প্রয়াত হলেন।
আমি সেদিন সন্ধ্যার সুখলাল কাবুনানি হাসপাতালে ছিলাম। সাড়ে
সাতটার বাড়ী চলে আসি। আটটা পাঁচ মিনিটে (৮ই অগাস্ট) ভীষ্ম চলে
গেল। -রাত দশটার পর বেতারে ঘোষণা। মন খুব ধারণা ॥

ঝাড়গ্রাম থেকে সম্প্রতি ফিরেছি। ওখানকার বৃষ্টিস্রাত শাল অরণ্য,
উচ্চাষচ জমি খুবই নয়নাভিরাম। কবিতার ক্ষেত্রে এখন একমাত্র গান—

এক কোমর ধান! আর ধার ॥—প্রায় ৮/১০ বিঘার আউল বুনে দেওয়া
হয়েছিল। ওখানে সুদৃশ্যী সুস্বাদু, আমার আমাতা এবং অপিতা** ও
অমৃতারা** (এর মধ্যে একজন তোমার টিপ্পাদ্রী) আছেন। এবং বাসস্থিত
হবেন। অর্থাৎ ঝাড়গ্রামে আমার উত্তরপের প্রথম সোপান প্রতিষ্ঠিত।
নিজের ঘর বাড়ী ঘরদোর আপাততঃ দূর অন্ত্। পর্যায়ক্রমে ক্রমশঃ সবই
হতে পারবে। মিতু ভালই আছে। ইতিমধ্যে স্বতন্ত্রের** বিয়ে হয়ে গেল।
নিমন্ত্রণ পত্র পৌঁছেছিল নিশ্চয়ই। প্রশতির অধ্যবসায় ও কর্মপ্রয়াস প্রসিদ্ধ।
বাগান ফলপ্রসূ। প্রশতির চোখের কষ্ট, তোমার হাতের। আমারও হাতের
কষ্ট—ফুলে যায় বুদ্ধাজুতের কাছে। ব্যথা হয়। “হ্যাঁ, বয়স তো হোল”

ইত্যাদি। পরম মেহাস্পর্শ ক্ষিতীশের* অনেকদিন খবর পাই না। আমি আগামী ১৫ই অগাঠ শান্তিনিকেতন যাচ্ছি—“নবজীবনের গান” গাইতে। তখন হস্ত দেখা হবে। তোমাদের হোম গার্ডরা কি বলে? খসছে? না বাড়ছে?

অবসর ও মেজাজ অল্পব্যয়ী চিঠি লিখে। আজকের মত বৃদ্ধাঙ্কুর দেখালাম—বেশ টন টন করছে।

একান্তই তোমাদের

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

পুঃ কবীর লেটার হেড্‌ সফফে মন্তব্য প্রার্থনীয়।

বটু

(২৩)

Inland Letter . ঠিকানা—Shri Bishnu Dey

Mrs. Pranati Dey
P.O. Rikha
Dt. Santal Parganas
Bihar 814112

From : Jyotirindra
5 S R Das Rd. Cal-26
700 026

প্রিয়জনবৎ,

২৮/৮/৭৭

প্রজ্ঞাপিত। ঝাড়খ্য়ামে গিয়েছিলাম, পাকা ঘানে কেউ মই দিচ্ছে কিনা, দেখতে। সব বধাবধ। ভীমের প্রয়াণ আমার খুবই ব্যথার কারণ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সেই আমার প্রথম গুরু। ভীমের তৌজনপ্রিয়তা সফফে কিছু তথ্য আরিও জানি। এখন সুব কিম্বদন্তী হয়ে গেল। তবে দিলীপ রায়ও তো কম গেলেন না দেখছি। প্রাপ্তিপক্ষে হোমগার্ড সংবাদ খুবই উৎসাহজনক।

INRECO (ইনরেকো) নামক এক কাম্পানী শত্ৰু মিঞের কঠে “মধু-বংশীর গলি”র একটা লং ঘেইং বের করেছে। তারা আমার কাছে কিছু পাঠায় নি। অস্ত্রের মারফৎ একটা পেলাম। সৌজন্য অননুগ্রহণীয়। শত্ৰু যেমন আবৃত্তি কবে,—সকলে নিয়েছে। শত্ৰুর আবৃত্তি সফফে আমার অবশ্য কিছু reservations আছে। রাই হোক একটা রেকর্ড তো হয়ে রইল। স্মৃতিসস্তা ভবিষ্যত বা নবজীবনের গান সফফে এখনও স্পষ্টভাবে কিছুই কবতে পারা যায় নি। এটা আমার মনোকষ্টের কারণ হয়ে রইল। অশচ শুভাকাঙ্ক্ষী ও উৎসাহীর দল কম নেই। ইতিমধ্যে (১৫ই অগাঠ) শান্তিনিকেতনে তখনকার আমন্ত্রণ পেয়ে নবজীবনের গান শুনিবে এলাম। ক্ষিতীশ বাউলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলছিল কলকাতা বাবে। এসে ফিরে

পেল কিনা জানি না। আর বিশেষ কিছু খবর দেয়ার নেই। মিতু ভাল আছে। পড়াশুনা কলেজ ও বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত। প্রণতির চিঠি পেয়ে খুব উৎসাহিত ও আনন্দিত। আশাকরি সব কুশল—আজ তাহলে আসি, এঁা,
একেবারেই বাকে বলে—তোমাদের

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

প্রণতি,

“হোমগার্ড-সংবাদ” সভ্যই harrowing! লীলাবাবুও লীলায়িত এক মনো? মিতু, চিঠির উত্তর দেবে। বাড়িগ্রাম থেকে প্রত্যাগত। ঘান ভাল আছে। আর সকলে ভাল। তোমাদের শারীরিক ভাল থাকার প্রয়োজন আছে।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষায়ী

জ্যোতিরিন্দ্র

খাস লেখা চিঠি : ঠিকানা—Shree Bishnu Dey
Sjta. Pranati Dey
P.O. Rikha
Dt. Santal Parganas
Bihar
P. Code 814112
“শ্রাবণ বর্ষপই শ্রেষ্ঠ”

একই নামে পাঠানো মিতুর
চিঠির তারিখ ১৫. ২. ৭৭

অজের কিছু যে মনোপেশ—

বহুকালে পজারিত। পানের আসর। মাঝে মাঝে সজীত পরীক্ষা নিই। অর-আড়ি সর্দি কাশি হাতে ব্যাধি এখানেও। অথচ আকাশ বৃষ্টিময়। বাড়িগ্রামবাড়ি নিরমিত। ঘানের কল কাটা হয়েছে। বেশ লাগে মুক্তিকায় সমতা। প্রায় জিশ চলিশ মণ হবে। সমতার ওজন। হ'লত বিঘের এই। ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে। এর পর বারো বিঘা। ট্রাক্টার। সরিষা ও সূর্যমুখী। সর্বত্র নির্মমভাবে বিদ্যুৎ সংরক্ষণের অভ্যাচার। ক'লকাতার ভিড় কাটা। অসহ্য বেলরোয়া নায়ক বৌবনের মুখে বুলো গৌরু হাড়ি, অবিকৃত চুল। রাজনীতি বিপর্যত। তবু ভালো লাগার ক'লকাতার সাহিত্যে পুঁই হই, বেঁচে উঠি। ক'মার অযোগ্য ক্লাভিও আসে। কি করা হবে। তোমাদের হোমগার্ড অজরিত জীবনের প্রতি পতীর সহায়কুতি। ১১০ এম. বাবার সময় কম পাইনি এহ বাহ। একটা কবিতা উপহার দিই—

শ্রাবণ বর্ষপই শ্রেষ্ঠ অগণন মাটির দ্বারীতে।
মাটির ভিত্তিছে বুকে অজরার শিকড়ে শাখার

এক আদিগ্রাম উষাহ অপের,
বান্ধহারী শস্তের খাড়াখাড়া জীবনের ছকে ।
জমিক গ্রহিল হাত অহুতবগুঠ পেই,
চৈতন্তের গোবর্ধন ধরে মাখে অনায়াস
স্বস্তির বৈভবে ॥

অভ্যন্ত নদীর পাড়ে এখানে কোথায় ? শাল
সেগুন অথবা ঘন অজের শিমুল দীর্ঘ
কণ্টকিত আরণ্যক প্রত্যয়ে প্রবীণ ॥

ওদিকে অজস্র হাতে
বর্ষণের বীজ নিয়ে সমাধিস্থ চাবী,
সুগন্ধের লোকায়ত আদিম শ্রেণীর পণ্য
আনন্দের ধানে ॥

অথচ সংহত সব নির্লোভ কজির-গানে
শব্দ শিবিরে । তাই জীবনে বর্ষণই শ্রেষ্ঠ
আরোগ্যের আনে,
রক্ত ক্রোধ মানির বিজ্রোহে ।

কৃতান্ত চিত্ত মাধবী অরণ্য সংসারে
স্ববিস্তৃত বিপ্লবের হাতে ছন্দ পায়

বৃদ্ধ বাদিজের মগ্ন গভীর মন্ডারে ॥ ইতি অবিসম্বাদীরূপে তোমাদেরই
জ্যোতির্মিত্র মৈত্র ।

ঐক্য প্রগতি যে সমীপে,

তোমার চিঠি পেয়ে আপ্যায়িত । Statesman এ রিবিয়া সংবাদ ছেপে-
ছিল । তোমাদের home thieves বা home rascals বিশেষভাবে বিহারে
বিহার করে । বুর্জোয়া সমাজের arch reactionary ব্যাপার এগুলো ।
জন্মকে এরা নষ্ট করে । আনন্দকে ধ্বংস করে । তোমাদের জন্ম মনো-
বুস্তির ধার এরা ধারে না । উচ্ছ্বল হুচরিত্রতার প্রতীক এরা । অত্যাচারী,
সেই হিসাবে ক্যানিষ্ট । এর জন্তই চাই চরম বিক্ষোভ । কিন্তু কোথায় সেই
প্রতিকৃত বিপ্লব ? মন ক্লান্ত হয়, হতাশ হয় । এদিকে বাকুগ্রামে “কর্ষণী”
খান কাঠা সারা হল । এবার কাড়াই হবে । মেয়ে-আমাই ওখানকারই
বাসিন্দা হয়ে পড়েছে । একটা English medium school নেই । তাই

আচ্চাদের পড়াশুনার অঙ্গবিধা হয়েছে। ওখানে কিছু বাচ্চাদের পড়াশুনার অঙ্গবিধা হয়েছে। ওখানে কিছু বাচ্চাদের একটা ideal school করা সম্ভব। খড়্গপুরে ভাল স্কুল আছে—পুরোণো—St. Agnus (St. Agnes?)—নাম আছে। সেখানেই ভর্তি করার চেষ্টা হচ্ছে। নবজীবনের গান ও স্মৃতি-সত্তা ভবিষ্যতের recording করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি ও মিতু ভাল আছি। রথীবাবু আজকাল T.V. তে আবির্ভূত হচ্ছেন। অন্ত্যস্ত খবর স্বাধাধ।

তোমাদের মেহমত

জ্যোতিরিন্দ্র

পাঠটীকা

১. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র গৈকুন্ড বাড়ির চিলকোঠার থাকতেন।
২. বিষ্ণু দে-র পুত্র।
৩. জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর কবিতা, কল্পা, হস্তিতা।
৪. সহপাঠী বন্ধু ক্ষিতীশ রায়।
৫. বিষ্ণু দে-র বাড়ির একটি ক্ষুদ্র।
৬. সনৎ বহুর কবিতা পুত্র।
৭. জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর পুত্রের ভাই।
৮. আমাদের বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর ছোট্ট ছেলে সিদ্ধার্থর ডাকনাম। এই নামকরণের সঙ্গে একটা মজার ঘটনা জড়িত আছে।
৯. দেবব্রত বিশ্বাস।
১০. বিষ্ণু দে। উনি তাঁর মা-বাবার মেজো ছেলে। (১৫নং পাঠটীকা ত্রুটি)
১১. বিষ্ণু দে-র বন্ধু। Victoria & Albert Museum-এর Indian Section-এর Keeper. কাঁচের জল ডিসেম্বর ৭৫ এ এসেছিলেন। কদিন রিবিয়ার ছিলেন।
১২. সনৎ বহু।
১৩. ইরা—বিষ্ণু দে-র বড় মেয়ে, সত্যেশ (চন্দ্রবর্তী)—বড় ভাই।
১৪. কলকাতার ক্যাসিবিবোদী রাজ্যসম্মেলন এবং পাটনার আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
১৫. জ্যোতিরিন্দ্রবাবু তাঁর মা-বাবার মেজো ছেলে। বিষ্ণু দে-র পুত্রের ভাইটি—কেশব—তাঁর ভাইমেয়ের মধ্যে ছিল মেজো। কেশব ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে মারা যান। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু কেশবকে খুব ভালোই চিনতেন। উনি ছিলে ‘ঐ মেজো’ হয়ে বিষ্ণু দে-র মনের সেই আতাবটা পূরণ করার চেষ্টা করতেন—বেন হুজুরে পিচোপিচি ভাই।
১৬. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পঞ্চদশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে পার্ক-মার্কার্স বরদানে ২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর সম্মেলনব্যাপী উৎসব হয়েছিল। এই উপলক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু একটি ক্ষুদ্র গান রচনা করেছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে ও বিশেষজ্ঞদের সিরে গড়েছিলেন ‘অনবঙ্গ’ পার্টি। ‘নবজীবনের গান’ ও গান্ধী হয়। শ্রীশঙ্কর মিত্র এসে আনুষ্ঠান করেন ‘স্বয়ংসিদ্ধ গান’। বিজয় ভট্টাচার্য ‘নবায়ন’ গ্রন্থের দৃষ্টান্ত জড়িত করেন। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু হন ‘সুফিল আসান’।
১৭. তরানামা স্থাপনাগার, রিবিয়ার গ্রাম-পকারেত্তের সুখিয়া। ডাকনাম—লীলা’।
১৮. বিষ্ণু দে-র দ্বিতীয় কন্যা—তারা—উত্তর’ বহু।

১৯. 'রিখিরা' গ্রামের একটি ছেলে। জ্যোতিরিন্দ্রাব্যু ও বিকুকে সে জানুয়ারি ১৯৩৩-এ কলকাতা ফেরার সময় ট্রেনে ডুলে দিয়েছিল।
২০. জুবদেবর রাও, 'রিখিরা'র পোষ্টমাষ্টার।
২১. দামিনী দে, বিকু দে-র বড় নাতনী।
২২. 'রিখিরা'র বাড়ির golden retriever কুকুর। মাসকরণ করেছে তারার ছোট ছেলে।
২৩. লীলাবাবু ('রিখিরা') বাড়ির লোক।
- ২৪ ও ২৫. বিকু দে-র মেঝো ও ছোট নাতনী।
২৬. বিকু দে-র নাতি মাতনীর। জ্যোতিরিন্দ্রাব্যুকে এই নামে সম্বোধন করে।
২৭. হুজাব সুখাপাখার।
২৮. ক্ষিতীশ রায়ের বিলেত-প্রবাসী দেহ মেয়ে।
২৯. বিকু দে-র পুত্রবধু।
৩০. কমলা বালিকা বিড়াল ও পাঠকবন।
৩১. হুজাবাখ দত্ত, কবি।
৩২. পোপাল হালদার।
৩৩. সিদ্ধার্থ (৮নং পাহলীকা জটব্য) ও তার স্ত্রী।
৩৪. জ্যোতিরিন্দ্রাব্যু বড় ছেলে।
৩৫. হুয়েকা—জ্যোতিরিন্দ্রাব্যু বড় করে। 'হুয়ডী'—বিকু দে মজা করে মিতুর এই নাম দিয়েছিলেন।
৩৬. হুশোভন সরকার।
৩৭. হুজাব চৌধুরী। 'ইন্দিরা'র সঙ্গে বৃন্দ।
৩৮. লোক টাউনে দেবেশ রায়ের বাড়ি।
৩৯. টিগু—বিকু দে-র ছোট বোহিজে, উক্তবা বছর ছোটপুত্র।
৪০. অতুল বহু—বিখ্যাত শিল্পী। উত্তরার বড়র মহাপুত্র।
৪১. হুনীল বহু—উত্তর-তার-তার সঙ্গীতবিশারদ। সম্পর্কে অতুলবাবুর ভাই, ওঁরক বাড়িতেই থাকেন।
৪২. জ্যোতিরিন্দ্রাব্যুর এক বোন, টাটামসরে থাকেন।
৪৩. জ্যোতিরিন্দ্রাব্যুর ছোটপুত্রবধু। (৮নং ও ৩০নং পাহলীকা জটব্য)
- ৪৪ ও ৪৫. জ্যোতিরিন্দ্রাব্যু ছই নাতনী।
৪৬. রবীন দে এর বড় পুত্র।
৪৭. ১/১০ প্রিন্স গোলাম রহমান রোড, বিকু দে-র কলকাতার বাড়ির ঠিকানা।

সাহিত্য বিচিহ্নধর্মী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য শব্দের আভিধানিক অর্থ অতি বিচিহ্ন। খাতুগত অর্থ হচ্ছে অন্তের সহিত যোগাযোগ স্থাপন-মাধ্যম। রামমোহন রায় এই অর্থে লিখেছেন—‘হুইয়ের সাহিত্য [মিলন] অথবা পার্থক্য’। অন্তের সহিত মিলনের জন্য বাক্য নষ্ট। মানুষের মনে বিচিহ্ন ভাবনার প্রোত, না বলা কথার বস্তা নিরন্তর বয়ে চলেছে। অপ্রাপ্ত সে কথা বলে অশরীরীর সাথে। এই বাক্যবস্তার কতটুকু সে শব্দে ব্যবহার করে? যখনই ভাবনা শব্দে বা বাক্যে রূপগ্রহণ করে তখনই তার সামনে আসে প্রোতা। মানুষের এই বাক্যবস্তার কতটুকু লিপিবদ্ধ হয়। মোটকথা আমরা যা কিছু বলি বা লিখি সবই অন্তের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত হয়—এই মিলন প্রয়াসের আদি সংজ্ঞা ‘সাহিত্য’।

সাহিত্যের অন্ত আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘কাব্য’। কাব্য বলতে বোঝায় কবিতা, গদ্যকাব্য বেমন—কাদম্বরী। ‘সাহিত্য মর্পণ’ একটি অতি পরিচিত সংস্কৃত শ্রুতি। রচয়িতা হচ্ছেন সাহিত্য-তাত্ত্বিক বিশ্বনাথ কবিরাজ। এই গ্রন্থে মুখ্যত অলংকার সম্বন্ধে আলোচনা থাকলেও বহু ব্যাপক বিষয় নিয়ে কথা আছে; যেমন—কাব্যের লক্ষণ, ব্যঞ্জনা, অভিধা, নায়কোচিত লক্ষণ, কাব্য, মহাকাব্য, দৃষ্টকাব্য, গদ্যকাব্য, চম্পূকাব্য প্রভৃতির পার্থক্য ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে কাব্যের বা সাহিত্যের বিভিন্ন রীতির আলোচনা, যেমন—বৈদম্বী, পৌড়ী, মাপধী।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর বালালা অভিধানে জানাচ্ছেন যে, সাহিত্য-বকলকার মতে কর্মশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বিরোগশাস্ত্র, কাব্য-কবিতা, গণিত, জ্যোতিষ—সমস্তই সাহিত্যের অধিকারবিনী। তিনি আরও বলেন, ভাগ, বিভাগ, শ্রেণী, অব, প্রত্যকাদি ভেদে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রযুক্ত

হয়। তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন যেমন Pure Literature বিজ্ঞান সাহিত্য, Scientific Literature, বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, Historical Literature ঐতিহাসিক সাহিত্য, Religious Literature, ধর্মসাহিত্য।

ভারতের আদিভূমি ধর্মসাহিত্য বেসংসাহিত্য। একদল বলেন বেদ তিনটি—ঋক্, যজুঃ, সাম বা অগ্নী। লোকে দেবতার উদ্দেশ্যে ঋক্ বা কবিতা রচনা করত—সেইগুলি সংগ্রহ করে ঋকসংহিতা সংকলন করেন বেদব্যাসরা। যে সব কবিতা যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত ব্যবহৃত হত তাহের বলা হত যজুঃবেদ। কালে মতান্তরে তা দুইভাগ হয়ে যায়—ভ্রু ও কৃক। আর এই সব কবিতার মধ্যে বেঙ্গলো গানের মতো হয় দিতে পাওয়া হত—তাহের বলা হত ‘সাম’। এই অগ্নী হলো রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের বেদগ্রন্থ। এই অগ্নীর বাইরে ছিল ব্রাত্য। এই বিরাট ব্রাত্য জনতার মন্ত্র, গান তুচ্ছতাক, বিচ্ছিন্ন সংস্কার, কুসংস্কার অর্থাৎ জনতার সর্বপ্রকার ভাবনার চিত্র পাই অধর্ববেদে। কিন্তু বেদ তো আর ধর্মপুস্তক নয় ঋকাদি বেদের দ্বারা আত্মবর্ষে আছে মাহুদের চিকিৎসা বিষয়। গজাত্মবর্ষে লেখেন গালকাপ্য সুনি। আছে অশ্বাত্মবর্ষে, বহুবর্ষে ইত্যাদি। আমরা যখন বৈদিক সাহিত্য বলি, তখন চতুর্বেদীয় গ্রন্থ ও বেদাঙ্গাদি বুঝি। যেমন বৈদিক ধর্মসাহিত্য আছে, তেমনি আছে পৌরাণিক ধর্মসাহিত্য, তান্ত্রিক ধর্মসাহিত্য।

ধর্মসাহিত্য শব্দটি ব্যবহার করলেই প্রশ্ন ওঠে—কোন ধর্মের সাহিত্য? তখন ধর্মওয়ারি সাহিত্যের তালিকা দিতে হয়, যেমন—হিন্দু ধর্মসাহিত্য, বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য, ইসলামীয় ধর্মসাহিত্য। তারপর আসে দেশওয়ারি ধর্মসাহিত্যের কথা, যেমন—চীনের ধর্মসাহিত্য। তার আবার ভাগ উপভাগ—চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য। যখন বিশেষ দেশের সাহিত্যের কথা আসে, তখন শুদ্ধ সাহিত্যের আলোচনা সূচিত হয়—ইংলণ্ডের Ecclesiastical history পৃথকভাবে আলোচনার বিষয় হয়ে আছে। এখানে বেডে-এর লেখা লাতিন ভাষার ধর্মসাহিত্য থেকে শুরু করতে হবে। কিন্তু কেডমন-এর প্রথম ইংরেজি বাইবেল কাহিনী ‘শুদ্ধ’ সাহিত্যের অন্তর্গত হয়ে আসছে। শুদ্ধ সাহিত্যে অতি সূক্ষ্ম ভাষা-বিতাণের ইতিহাস চর্চা হচ্ছে—যেমন ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—অর্জ সেইন্টসবেরি লিখলেন History of Criticism and Literary Taste in Europe.

শুদ্ধ সাহিত্য বলতে কেউ যেন স্নীল সাহিত্যই না বোঝেন। কারণ সাহিত্য, স্নীল বা অস্নীল দুই-ই হতে পারে। মহাত্মারতে অস্নীলতা নেই?

শকুন্তলা পড়াতে পড়াতে অধ্যাপকরা বিশেষ অংশ তাকাতাকি উঠে বান না ? মোটকথা স্রীলতা অস্রীলতা আপেক্ষিক শব্দ। লেখকের উদ্দেশ্য বহিঃস্থ অস্রীলতাকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে পাঠক পাঠিকাদের মনকে কামনায় উজ্জ্বল করা—তবে সেই লেখা pornography-র মধ্যে পড়ে। ইতালীয় লেখক বোকাচিওর 'ডেকামেরনের' গল্পগুলি অস্রীল বলে নিন্দিত হলেও তা বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে—রচনামূল্যে, কাহিনীবৈশিষ্ট্যের দ্বারা। কিন্তু ক্যাসানোভা-র লাম্পাটা কাহিনী স্রবস করে লেখা হলেও তো তা সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী স্থান পায় নি। রেনল্ডস তাঁর *Mysteries of the Court of London* গ্রন্থে ইংলণ্ডের বহু কলেঙ্কারির কথা সত্যতারে বর্ণনা করেছিলেন। বাংলায় এই স্রবসগ্রন্থের তর্জমা হয়েছিল 'লনডন রহস্য' নামে ৭ খণ্ডে। অল্পবাদ করেন জুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনেত্রকুমার রায়। কিন্তু আজ তার নাম কেউ জানে না, পড়া তো দুয়ের কথা। আরব্য রজনী বা *Arabian Nights*-এর বহু কাহিনী অস্রীল। কাহিনীর বাচনভঙ্গির দ্বারা সে-এই বিশ্বসাহিত্যে অমরস্থান লাভ করেছে। সকল ভাবায় তার অল্পবাদ কাহিনী প্রচারিত হয়ে আসছে। আধুনিককালে তলস্তয়ের আনা কারেনিনা আর লরেন্সের-এর লেডি চ্যাটারলিজ লাভার এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে আনা কারেনিনা সাহিত্যের দরবারে স্থান লাভ করেছে অল্পবাদের মাধ্যমেও। প্রশ্ন—কেন এটি হল ? মোটকথা স্রীলতা, অস্রীলতা সাহিত্যতত্ত্বে গৌণ—শৈলী, রীতি, কাহিনী বেগানে মুখ্য স্থান অধিকার করে সেটাই হয় সার্থক অমর সৃষ্টি।

মধ্যযুগের সংস্কৃত কবি জয়দেবের স্রীভগবিন্দের গান চরম erotic বা অস্রীল। কিন্তু তার হৃদয়, অল্পপ্রাণ, শব্দচয়নের বিশিষ্টত্বে অমরসাহিত্য হতে পেরেছে, এমন কি ধর্মসাহিত্যরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে বৈষ্ণবসঙ্গদের মধ্যে। আসলে সাহিত্যিক শৈলী বা রচনাকুশলতা এই স্রীভগবৎকে অমর স্থান দিয়েছে, এমন কি ইংরেজি অল্পবাদ সমাদৃত হয়েছে। শুদ্ধসাহিত্যে কবিতা, নাটক, গল্প, ধর্মবর্ণন, সমাজসমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু এসব গৌণ। কেননা এইসব তত্ত্বকথা মুখ্য হয়ে উঠলে তার সাহিত্যিক সত্তা নষ্ট হয়ে যায়—জন বানিয়ান এর পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস তার উদাহরণ। আবার বেটারলিঙ্কের রাহস্যিক নাটক 'দু' বাড' শুদ্ধ সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। শুদ্ধসাহিত্যে প্রধান বিচার্য হচ্ছে—*not what you write, but how you write*। এই 'how' হচ্ছে সাহিত্যে

অবয়বতালভের একমাত্র কষ্টিপাথর। উন্নত রচনামৈলীর উপাদান হচ্ছে অলঙ্করণ। কিন্তু অতিঅলঙ্করণ বা নিরাতরণ বাক্য কোনোটিই সাহিত্যকে হুম্বর করতে পারে না। একটি উদাহরণ দিই—সিঁঠে একজন হাত বুলুচ্ছে আর একজন খামচাচ্ছে—ছুটো একই প্রক্রিয়া—তফাৎ হচ্ছে degree-র। অতিকথন, অপকথন সৌন্দর্যের সীমা লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত। এই সূক্ষ্মবোধ বার আছে তিনি সার্থক শুদ্ধ সাহিত্যিক।

কিন্তু কাল বহলের হাওয়ার সৌন্দর্যের সীমার পরিবর্তন হচ্ছে। কচি বা ক্যাশনের সাথে তার যোগ আছে। এককালে সাহিত্যে যে-সব উপমা বা রীতি সমাদৃত হত কালান্তরে তার রূপান্তর হচ্ছে। তবে সমসাময়িকের জয়ধ্বনি বহি সাহিত্যে না থাকে তবে তাকে পার্থক্যমাত্র ধরে রাখা না। রাধাকৃষ্ণ রাঘের হিরণ্ময়ী কিরণময়ী উপভাসের কথা আজ আর কেউ জানে না। হাচিনশন-এর If winter comes ১৯৩০ সালে কি জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু লোকে আজ তার কথা ভুলে গেছে। অথবা হপকিন্স এক নাম তাঁর জীবৎকালে কেউ জানত না। মৃত্যুর (১৮৮২) ত্রিশ বৎসর পর তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হল—বা পড়ে বিস্মিত হল ইংরেজি কবি-সাহিত্যিকের দল। কেন এটি হল—সাহিত্য নতুন হুম্ব, নতুন রস পেল—‘মরে না মরে না মৃত্যু, শত শতাব্দীর বিশ্বস্তির তলে’।

গুচ্ছসাহিত্যের বাইরেও বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক রচনা সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। গ্রীক দার্শনিক Plato-র রচনার অল্পবাক্য বাক্য পড়েছেন তাঁরা সাক্ষ্য হেবেন এ কথার। গত শতকে ইংরেজ লেখক হান্সলে, বর্তমান শতাব্দীতে জিন্স, ঐতিহাসিক সিবন, মেকলে, ক্রয়েড, চার্লিস ইংরেজি সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছেন। বাংলাসাহিত্যে রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ, অগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ লিখেছেন বা সাহিত্যে সম্মানলাভ করেছে।

কয়েকদশক পূর্বে শিক্ষাবিসয়ক একটি ইংরেজি বই-এ পড়েছিলাম ক্রাশের প্রাথমিক বিভাগের থেকে ছাত্রদের করাসী ভাষা রচনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে আসছে। ফলে করাসী গদ্য রূপে-রসে ধুরোপীয় সাহিত্যের দরবারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। দৈনিক Temps (Times) পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি গুচ্ছসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নমুনাক্রমে পঠনীয়। আমাদের দেশের কোনো পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এ মান পায় না কেন? কী ভণে Temps সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সাহিত্যে সম্মান পেয়েছে? বিবরণ শুণে

নয়, রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে। রচনাশৈলী অর্থাৎ বাচনভঙ্গিই সাহিত্যকে রসোত্তীর্ণ করে। প্রশ্ন এই রসোত্তীর্ণলোকে কীভাবে পৌঁছানো যায়? তার উত্তর মেলে না। আমি যে বহুর রসের স্বাদ উপভোগ করি তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অহুত্ব। রসাহুত্ব অতের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায় না। শুধু সাহিত্যের পরম সার্থকতা তখনই যখন লেখক পাঠককে এই আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হন

চতুরঙ্গের করণ-কৌশল

দার্শনিক ও সাক্ষাৎকার কাঠামো

কার্তিক লাহিড়ী

স্বীকৃতি আদৌ চেষ্টা করেছিলেন কিনা তা আমাদের জানা নেই, তবে 'চতুরঙ্গ'-র শরীর থেকে তথ্যবোদ্ধ কিংবা প্রলেপ হাজার প্রবন্ধেও মুছে কেলা যায় নি। এ-উপজ্ঞানের হজে হজে ছড়িয়ে আছে আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় কথা; কখন-বা কোনো কোনো সাধনার একঘেষিকতা বা এসব ছাপিয়ে বাহ্যের পূর্ণতার একটা অস্পষ্ট ছবি, যে ছবি নিশ্চিত ঐহিক নয় যাতে ধর্মীয় অভ্যাসের আধিক্য করা সহজ, তবু এসব সব্বোপাধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ স্নাত হয়েও কেউই 'চতুরঙ্গ'-কে ধর্মীয় উপজ্ঞান বলবেন না।

আধ্যাত্মিকতার নিহিত অথচ ধর্মীয় নয়—এমন কূটাভাস (paradox) আমাদের ধর্ম লাগায় যথেষ্ট, এবং এই কূটের স্বরূপ উন্মোচনে আরোপে উপজ্ঞানটির অভিনব বা প্রকরণের নবীনত্ব নির্ণয় স্থানান্তরিত করে কিনা তা তাবনার বিবরণ হয়ে পড়ে, অথবা 'চতুরঙ্গ'-এর করণ-কৌশলে নিহিত থাকে ঐ কূটাভাস তাও আমাদের জিজ্ঞাস্য হয়।

১. শুক্লী আমাদের ছজনকে যে ঘরের বর্গলোকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, আজ মাটির পৃথিবী তাকাকে ভাঙিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিল। এতদিন তিনি রূপকের পায়ে তাবের মত কেবলই আমাধিপকে ভরিয়া ভরিয়া পান করাইয়াছেন, এখন রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি হইয়া পাজটা মাটির উপরে কাত হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে।

(পৃ: ৩৫, নিম্ন-রেখা আশায়)

২. এই নাটকের মুখপাত্র যে ছটি তাদের অভিনয়ের আগাগোড়াই

আঙ্গণত—আমি আহি প্রকান্তে, তার একমাত্র কারণ, আমি নিতান্তই গৌণ। (পৃ: ৩৮১—৩৮২)*

এখন উদ্ধৃতি, বিশেষ করে নিয়ন্ত্রণ অংশে, ‘চতুরঙ্গ’-এ উপস্থাপিত সমস্তার কিছু আভাস মেলে; রূপ ও রূপক দুটি একান্ত ও অত্যন্ত পরস্পরবিরোধী প্রত্যয় না হলেও সঙ্গুণ প্রত্যয় নিশ্চয় নয়, বরং উভয়ের মধ্যে বিরোধের তীব্রক ও সময় সময় প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্যীয় ও অস্বত্ববস্যা। বিশেষত নিয়ন্ত্রণ অংশের পূর্বাংশ পড়লে আমরা রূপ ও রূপকের আদর্শায় বাক্ষ্যে রূপ ও অরূপ বসাতে পারি, অতএব এখানে অরূপ অর্থেই রূপকে গ্রহণ করা হয়েছে, এবং সমগ্র উপজ্ঞানের পরিমণ্ডল তেমন বিষয়ের ইঙ্গিতবহ।

রূপ ও রূপকের হুবাহে এসে পড়ে রূপ ও অরূপ, জ্ঞান ও রস, মন ও শরীর, সীমা ও অসীম, আন্তরিক্য ও নাস্তিক্য ইত্যাদি বিরোধী প্রত্যয়গুলির কথা। ‘চতুরঙ্গ’ উপজ্ঞানে বিপরীত প্রতীতিগুলি যেমন অগমোহনের জ্ঞান ও বুদ্ধিসর্ববতা এবং শচীশের ক্ষয় ও রস লাগরে নিমজ্জন নিশ্চিতভাবে অরূপত: বিপরীত, যেমন বিপরীত মনোভঙ্গি শচীশের শরীরকে উপেক্ষা করা এবং দামিনীর শারীরাহতব স্বাক্ষর করা বা অস্বত্বভাবে শচীশের অরূপ সাধন ও দামিনীর রূপের প্রতি আকর্ষণ।

অর্থাৎ ‘চতুরঙ্গ’-এ চরম বিরোধী প্রত্যয়গুলি কেবল পাশাপাশি অবস্থিত নয়, প্রতিটি বৃত্তি বা অহুত্বিত বৃত্তিই বিরোধী কিংবা একটির সঙ্গে অস্তের সম্পর্ক শঙ্কয়ুলক হোক না কেন, তাহের স্থান এতটুকু সংকুচিত না করে বরং প্রতিটি প্রত্যয়ের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে স্পষ্ট ও অটুট রাখা হয়, যাতে জীবন সামগ্র্য সমস্ত আপাত বৈপরীত্যের মধ্যে উজ্জল ও দৃঢ় হয়ে ওঠে, যেন সমস্ত বিরোধের অবসান হয় জীবনের প্রচণ্ড সজ্জতির টানে। আর এখানেই উপজ্ঞানটির সঙ্গে ‘ইশোপনিষদ’-এর উপস্থাপনা পদ্ধতি বা কারণ কৌশলের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।** কারণ এ-উপনিষদের অহুত্বত বিচ্যর-পদ্ধতি হল চরম বিরোধী সংজ্ঞার কোনোটির অধিকার বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে তাহের মধ্যে সজ্জতি বিধান করা। (শ্রীঅরবিন্দ: বিবিধ রচনা, উপনিষদাবলী, শতবার্ষিকী সং, শ্রীঅরবিন্দ সাহিত্য সংগ্রহ, পৃ: ১৫৫)

* ‘চতুরঙ্গ’-র উদ্ধৃতি রবীন্দ্র-রচনাবলী (অঙ্গশতবার্ষিক সং) দ্বয় ৭৩ থেকে গৃহীত।

** ইশোপনিষদ রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞতম শ্রিয় পুস্তক ছিল, এই উপনিষদের বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিই হৃত বাবা গদ্য-অনুবাহ রবীন্দ্র রচনার পাত্তর দায়। শ্রীপ্রবন্ধনাথ বিশি আশিরোহে—“ভারতীয় সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে উপনিষৎ, তন্মধ্যে আবার ইশোপনিষৎ রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে শ্রিয়।” (রবীন্দ্রনাথ-প্রবাহ, দ্বিতীয় ৭৩, ১ম সং, পৃ ১০)

ত্যাগ ও ভোগ, সত্ত্বা ও অসত্ত্বা, বিদ্যা ও অবিদ্যা, কর্ম ও অকর্ম, প্রকৃতি বিপরীত সংজ্ঞাগুলি অথচ 'ঈশোপনিষৎ'-এ কোনো আখ্যান, কথা, অন্তরঙ্গ সংলাপ বা আলাপের মাধ্যমে স্থাপিত নয়, বা অন্তর্ভুক্ত উপনিষদের একটি প্রিয় পদ্ধতি ও কৌশল। উপরন্তু উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি নিশ্চিতভাবে আচ্ছিন্ন (abstract) ভাবনা এবং তার উপস্থাপনা রীতিও বাস্তব সম্মত নয়। মস্তকের পর মস্ত্বা বিস্তৃত হয়েছে, অথচ তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ও সহাবস্থিত হয়েছে বিপরীত বস্তুসমূহ, তবু তাতে চিন্তন কোন সমর করণ (action) বিহীন নয়। জ্ঞান ও মননের উপর জোর পড়লেও সেই জ্ঞান যে কর্মবিমুক্ত নয় তা স্পষ্ট হয়ে গেছে উপনিষদটির দ্বিতীয় মস্ত্বা—কাজ, করে বাঁচা চাই এইখানে একশ বছর। / অন্তর্থা নেইকো এর, কর্মসত্ত্বা হয় না যে নয়।

'চতুরঙ্গ'-এ আচ্ছিন্ন ভাবনার আধিপত্য অস্বীকার করা যায় না, এবং আমরা জানি বিমূর্ত ভাবনার উপস্থাপনায় সচরাচর পাত্র-পাত্রীর অভিনয়টোর উপর জোর পড়ে যেহি, সেজন্য কাহিনী ও ঘটনার দিক থেকে দেখলে উপস্থাসটিকে আকস্মিকতা ও উল্লঙ্ঘনের উদাহরণ বলে মনে হতে পারে, তখন উপরের দ্বিতীয় উচ্ছৃতিটি একেজো আমাদের সহায়ক হয়। শ্রীবিলাসের উক্তি (উচ্ছৃতি নং ২) উপস্থাসটির করণ-কৌশলের যে ইঙ্গিত মেলে তাতে কোনো কুশাশার সৃষ্টি হয় না, অথচ তাতে রহস্য ও প্রকাশ মেশামেশি করেই তো আছে। সেজন্য 'চতুরঙ্গ'-এর উপস্থাপন রীতি তথাকথিত কিংবা প্রাথমিকত কোনোও সাধারণ রীতি নয়।

অথচ প্রধান পাত্র-পাত্রীর অভিনয় আত্মগত্ব হলেও তা আত্মবিবেচনের প্রশ্ন প্রকরণ মনোবিকলনের রীতিও নয়, যেহেতু সেই আত্মগত অভিনয়টি প্রকাশিত হচ্ছে ঐ আখ্যানের অন্ত একটি চরিত্রের মাধ্যমে, যে-চরিত্রটি গোপ ও অ-সাধারণ নয়। শ্রীবিলাস কথক, সে যেমন প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করে, তেমন ভাবে সাহায্য নেয় তারেরির কিংবা চরিত্রের কাছে জেনে নিয়ে বর্ণনা করে এমন ভাবে যা প্রায় প্রত্যক্ষ গোচরেই সাধিল। ফলে উপস্থাসটিতে তথাকথিত মনস্তত্ত্ব মূলক রীতি কিংবা সর্বজ্ঞ লেখকের সর্বগ্রাসী ভক্তি গৃহীত হয়-না, বহিঃ সাহায্য নেওয়া হয়েছে তৃতীয় এক ব্যক্তির যে প্রধান পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত অভিন্ন অথচ যে কথকের আসনে বসেও নিরাসক্ত রক্তা ও প্রায় নিরপেক্ষ দর্শক। তাই এ-উপস্থাসের করণ-কৌশল কোন অভিনব বা নব্য হয়ে ওঠে না, হয়ে যায় একান্ত মৌলিক।

এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ। ‘জ্যাঠামশার’, ‘শচীশ’ ‘হামিনী’ ও ‘শ্রীবিলাস’ ইহার চারি অংশ। চারটি অংশ আপাতদৃষ্টিতে যেন চারটি কঠিন পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে, যার একটির সঙ্গে আর একটি অংশের কোনও সম্পর্ক নেই। তাই একটি অংশ থেকে আর একটি অংশ বাওয়ার সময় হ’লোটে খেতে হয়, কারণ দু-টি অংশের যথোকার ফাঁক ভরাট করা হয় নি কোনও কাহিনী বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়ে, বরং উল্টে অংশগুলিকে কঠিন অমির উপর ঝাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং প্রাথমিক ভাবে তাতে জোড় লাগানো হয় নি। সংযুক্ত করা সম্ভব ছিল কিনা তা বিচার সাপেক্ষ, আমরা তবু এইটুকু বলতে পারি যে চারজন উপন্যাসের নট-নটী তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব এত স্বকীয় ও স্পষ্ট (এমনকি শ্রীবিলাস বাকে অভ্যন্তর নিরীহ ও সাধারণ বলে মনে হয় প্রথমে, সে-ও যে প্রধান পাত্র-পাত্রীর অভ্যন্তরীণ এবং তাদের নেশার তিতবিরক্ত হয়ে ওঠে তা তার কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (জঃ পৃ ৩৬-৫-৩৬) যে তাদের সাধনার ধারা পৃথক খাঙে-ইঁতু বয়ে যায় না, তা তাদের মানস-জীবনের গভীরে চারিয়ে গিয়ে যেন পারস্পরিক মিলনের পথই বন্ধ করে দেয় সময় সময়—তাই জ্যাঠামশারের প্রত্যক্ষবাদ (positivism), লীলানন্দ-শচীশের রূপবাদ এবং তা থেকে শচীশের স্বরূপবাদ, হামিনী ও শ্রীবিলাসের রূপ-স্বরূপের সীমা-অসীমের সমন্বয়বাদ প্রভৃতির প্রশস্ত মিলনের ক্ষেত্র আছে কিনা তা প্রচণ্ড জিজ্ঞাসার বিষয়, হয়ত সাধনামূল্যের সমন্বয় সম্ভব নয় কিংবা একমুখ বে জুরোধর্শনের প্রয়োজন তা ব্যক্তিত্ব-বিশ্তাজিত চরিত্রের এমনকি হামিনীর মত সগ্রাণ চরিত্রের অধিকৃত নয় বলে ‘সাধ বিটল না’ তেমন হাহাকারে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে, অথচ স্পষ্টতই সমন্বয়ের চেষ্টা ছিল হামিনী-শ্রীবিলাসের জীবনে।

আর সেই প্রথম চার অংশের অন্তর হলো ক্ষুদ্র মতো বয়ে চলে তা নিষিদ্ধ পাঠে বোকা যায়। সেক্ষেত্র চারটি অংশ সৌধের চারটি তন্তু বলে মনে হলেও সেই তন্তুর উপর বিজ্ঞান করে থাকে সৌধের ছাদ, আর তন্তু সরিয়ে নিলে যেমন ছাদ নিরাবলম্ব হুলতে থাকে, তেমন ভাবে উপন্যাসের চারটিই মাজ একটি তন্তু সরিয়ে নিলে ‘চতুরঙ্গ’-এর ছাদ-ই শুধু নয় ইয়ারতটি ধলে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অন্ততঃ দেখা যায় যে কাহিনী এক একটি অংশ থেকে আর একটি অংশ উপচে পড়ে পাঠকের অগোচরে হ্রত-দীপ্য চকিতে, তখন চারটি

অংশ আর বিচ্ছিন্ন থাকে না, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বা বারায় পরিণত হয়। প্রবাহ যেমন অবিচ্ছিন্ন বহমান, অথচ তাতে নানা ছেদ ঘটে হয়ত প্রাকৃতিক কারণে, যেমন বিরাট উপলব্ধিই পথ রোধ করে দাঁড়ায় সময় সময়, তবু স্রোতধিনী হলে তাকে বিরে পাশ কাটিয়ে প্রবাহ কেবলই নিচে নেমে আসে স্বাভাবিক নিয়মে, এই উপভ্রাসে তেমন ঘটে; কারণ এখানে বস্তুভার বর্জন করে লেখক তাতে প্রতিবেশ সঞ্চার করেন অথচ সে-পত্তি এতই সংগঠিত যে প্রাথমিক পাঠে তা অলক্ষ্যেই থেকে যায়। তাই পাঠককে কখনো লক্ষিয়ে বেতে হয় দু-তিন বাণ বা কহাচ স্রোতের টানে নজরেই পড়ে না যে সেই প্রবাহ এক একটি ভাবধারাকে নির্বিঘ্নে অভিক্ষেপ করে চলেছে উদ্ভঙ্কন না করেই। বাইরের ঘটনা-পরিবেশকে এমন দূরে ঠেলে রাখা হয়েছে যে আমাদের সাধারণ মাপের কার্য-কারণে চরিত্রের আচরণের হ্রাশ মেলা ভার হয়ে ওঠে—‘বলাকা’-র যেমন পত্তি-স্থিতির ঔজ্জ্বল্য হ্রাস করে দিয়েছে প্রবলভার, অথচ স্থিতির টানেই সেখানে পত্তি প্রচণ্ড হতে উঠেছে, ফলে সেখানে বহমানতা ‘বতঃই’ অল্পভব্য। ‘চতুরঙ্গ’-এ সমগ্র আখ্যানটি কেবল ঘটনা-পরিবেশের ভারমুক্ত হয়ে হয়ে আস্তরে এত তরঙ্গসমূহ হয়ে ওঠে অস্ত্র তাকে প্রবাহ ভাবতে প্রথমে অগ্রবিধে হয়, কিন্তু কল্পধারাও তো প্রবাহ বটে এবং সেই প্রবাহ যে মারাত্মক ও বিপজ্জনক তা অহুমান করা হুঃসাধ্য নয়। এমন চারটি ভাবের প্রবাহ আবিষ্কার করেন শ্রীমদ্রবিন্দ ঈষোপনিষৎ প্রসঙ্গে, যে-প্রবাহের বলে ‘বহুপত্তঃ বিপরীতঃ সব মূল স্বপ্নের সময় ও সজ্জতি সাধন করা হয় সেখানে।’ (শ্রীমদ্রবিন্দ, ঐ, পৃ ৮৫)

আপাতদৃষ্টিতে বা পৃথক পৃথক মনে হয় উপভ্রাসে তা যে একটি অস্ত্রের সঙ্গে অধিত সেকথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক-একটি ছক ভাঙার বিচ্ছেদ বিন্দু-রূপে আত্মহননের ঘটনাগুলিতে—ননীবালার মৃত্যুতে অর্গমোহনের ছক, অর্গমোহনের মৃত্যুতে (এক হিসেবে অর্গমোহনের মৃত্যু আত্মহননের সামিল) শচীশের নাতিক্য বৃদ্ধির ছক বিক্ষত হয়, আর প্রধান পাত্র-পাত্রীর অভিনয়ের সবটাই আত্মগত বলে ‘এক একটা ভাববৃত্ত মনের মধ্যে ভেঙে পড়ার পরই আত্মহননের ঘটনা সংযুক্ত। মৃত্যুগুলি এক একটি ছকের প্রান্তবিন্দু বলে বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে পাওয়ার কৈশিক্য অ-প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।’ (কাতিক লাহিড়ী : বাংলা উপভ্রাসের রূপকর ও প্রযুক্তি, পৃ ১২২)। আর এ-উপভ্রাসের এক একটি সাধনা বা মতের চরম প্রান্ত বিস্মৃতে স্থাপিত হয়েছে মৃত্যু ও বিচ্ছেদের ঘটনা, ফলে একটি ভাব বৃত্তের

শেষ গ্রহিমোচন হলোই অল্প ভাববৃত্তের পথ সুগম হয়ে যায়, অথচ সংক্ষিপ্ত অংশ বা ভাববৃত্তগুলি শেষ করার জন্য লেখকের কোনও তাড়াহড়ো নেই। প্রতিটি ভাববৃত্তকে স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অথচ একটি যে আর একটিতে আশ্রিত (যেমন জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশের রসসাগরে নিমজ্জন বা স্বামীর বাড়াবাড়িতে হামিনীর বিব্রোহ বা ‘আসক্তির বহুনের প্রানিকে সন্ধ্যা না করার জন্যই বিবাহের অনতিকাল পরে হামিনীর মৃত্যু ঘটানো’ (ঐ পৃ ১২০) ইত্যাদি, তা লেখক স্পষ্টভাবে না লিখলেও কখনো বিবৃতি ও নানা অঙ্গবঙ্গের ব্যবহারে গুপ্ত থাকে না।

আর এ আখ্যান রচনা যে কঠিন তা শ্রীবিলাসের কথার প্রকাশিত হয়ে পড়ে, হয়ত সজ্জিত বা সমগ্র চরিত্র বলেই অথবা ‘জীবনের পর্দার আড়ালে অদৃষ্ট হাতে বেদনার যে আল বোনা হইতে থাকে তার নকশা কোনো শাস্ত্রের নয়, কর্মমালার নয়—’ (চতুরঙ্গ, পৃ ৩৭৫) অথ বৈচিত্র্যকে কৈবল্যের চরম সীমার নিয়ে বাঁধা হয় নি, বরলে ঐচ্ছিক হাটাকারে উপভাসটি শেষ হয় বা আর এক ধরনের মুক্তি, তবে তার সঙ্গে ধর্মীয় কৈবল্যের প্রভেদ যথেষ্ট এবং মৌলিক। আর তাতে আমরা আশঙ্ক হই, কারণ কৈবল্যে উপভাসের সমাপ্তি ঘটলে বা উচ্চাঙ্গ দার্শনিক প্রস্থান হলেও উপভাস হয়ে উঠতো না। অথচ ‘চতুরঙ্গ’-র অন্তরে রয়ে গেছে সেই ক্ষুদ্র দার্শনিকতার পেটিকা এবং শরীরে মিলে খুঁজে পাওয়া যায় ঐশোপনিষদের তত্ত্বটি।

ঐশোপনিষদের ‘চেটা হল সব গ্রহির চরম প্রান্তর গ্রহণ করে, পৃথক করে পাশাপাশি রাখা, বাড়ে গ্রহিমোচন ইঁদার সঙ্গে সঙ্গেই তাড়ের বধ্যবধ স্থান ও সঙ্ঘ নিখিঁটে হতে পারে। চরম প্রান্ত-বস্তুর একটি অস্তটির উপর আশ্রিত, স্বীকার করা হয়েছে বটে, কিন্তু কোনটির অঙ্গের সঙ্গে চোঁচ করা হয় নাই বা কোনটিকে অথবা পৌণ স্থান দেওয়া হয় নাই।’ (শ্রীমদ্রবীন্দ্র সাহিত্য সংগ্রহ (৮), পৃ ১৫৬)। শুধু ‘চতুরঙ্গ’-র করণ-কৌশলের সঙ্গে এর মিল আছে এমন নয়, তাঁর সমগ্র কাব্য-সাহিত্যেও এ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়—‘কবির দৃষ্টিতে আপাত-বিপরীত সকল সমন্বিত। কবিতায় কবির মনে এই তব্বই অন্ততায় রূপ পাইয়াছে। রবীন্দ্রবর্ণনে বলা হইয়াছে রূপ—অরূপ, স্থিতি—গতি, বস্তু-ভাবনা পৃথক পৃথক সম্বাদ নহে—একই অর্থতার ভিন্নরূপ বা সংজ্ঞামাত্র।’ (প্রভাতভূমার মূখোপাখ্যান : রবীন্দ্র জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৭১-৩৭২)

‘চতুরঙ্গ’-এ এই রীতি গ্রহণ করার জন্য লেখককে আগ-বাড়িয়ে তর্কবিদ

বা নীতিশিক্ষকের আসন নিতে হয় নি, ফলে কোনও মতবাদ সম্পর্কে এখানে পক্ষপাতের প্রশ্ন ওঠে না। হযরত শ্রীবিলাসের মতো কথকের মারফৎ বিবৃত না করলে এমন অপক্ষপাত নিরাসক্তি সম্ভব হত না; তাই আধ্যাত্মিকত্বের স্পর্শ উপভাসের ছত্রে ছত্রে অচ্ছূত্ব হলেও তা ধর্মীয় হয়ে ওঠে না, হযরত প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা আত্মবিষয়ক অহুসদ্ধানে ব্যাপ্ত [অধ্যাত্ম—অবি+আত্মা, বা আত্মা অধিকার করিয়া বর্তে (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস: বাবালা ভাবার অভিধান, প্রথম ভাগ; ব্রটব্য বঙ্গীয় শব্দকোষ) বলে মাহুকের আত্মের লেখানে কেন্দ্র হয়ে ওঠে, ধর্মের বাহু অহুঠানের প্রতি তত বনোযোগী হয়ে ওঠে না— ‘চতুরঙ্গ’ সেই অর্থে-ই ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচারের মাধ্যম হয় না; স্ববীজনাথের কাছে শিল্পেব নিয়ম প্রাধান্য পায় ব’লে এমন কাঁড়া নির্বিঘ্নে কেটে যায়।

২

ঐশোপনিষদের করণ-কৌশলের সাদৃশ্যে আবার অত্রদিকে ‘চতুরঙ্গ’ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সাগীতের আলাপ ও রূপের গঠনের সঙ্গে সহজেই তুলনীয় হয়ে যায়। আলাপ ও রূপের চার তুন বা কলির (আত্মারী, অভয়া, সকারী ও আভোগ) মতই ‘চতুরঙ্গ’-র চারটি অংশ স্ব-স্ব নির্দিষ্ট কক্ষে অধিষ্ঠিত। আমরা গান ও আলাপের সাংগীতিক সিলসিলা (পারস্পর্ষ) ও কাঠামো বিষয়ে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি উদ্ধৃত করছি :

‘গানের প্রথম ভাগের নাম আত্মারী, বাহাকে মহাড়া, কিংবা গুরা (ধ্রুব) বলে; ইহা আরম্ভ হওয়ার কোন সুর নির্দিষ্ট নাই। কিন্তু আলাপে প্রথমেই রাগের উত্থান দেখাইতে হয়, তৎপরে মধ্যসপ্তকে, স্বরপ্রাসের প্রথম সুর যে সা, তাহা হইতে আত্মারী আরম্ভ করার রীতি প্রচলিত। প্রসিদ্ধ গায়কেরা রাগের অধিকাংশ রূপই স্বহস্তোত্তে প্রকাশ করিয়া থাকেন; বাহা বাকি থাকে, তাহা অন্তান্ত কলিতে পরিব্যক্ত হইয়া রাগের মূর্তি সম্পূর্ণ হয়।

‘গানের দ্বিতীয় কলির নাম অভয়া; ইহাতে সুরের একটি নিয়ম নির্দিষ্ট আছে এই-বে, ইহা প্রায়ই মধ্যসপ্তকের মধ্যস্থান হইতে আরম্ভ হইয়া তার সপ্তকের সা’—এ আরোহণ করতঃ তথায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লইয়া, তৎপরে রাগ বিশেষে কেহ আরো উপরে বাইয়া নামিয়া আইসে, কেহ বা ঐ সা হইতে নামিয়া আসিয়া আত্মারীর সুরের সহিত মিলিত হইয়া সমাপ্ত হয়।

‘গানের তৃতীয় কলির নাম সকারী; ইহার নিয়ম এই, গানের আত্মারী ভাগ

যে মধ্য সপ্তকে সম্পাদিত হয়, তাহারই উচ্চাংশ হইতে অবরোধ করিয়া গায়কের সাধামত ষাট সপ্তকের কতকদূর পর্যন্ত নামিয়া, আরার আরোহণ করতঃ সা-এ সমাপ্ত হয়। তৎপরে গানটি পুনর্বার আরোহণ প্তি অবলম্বন করতঃ, তার সপ্তকের কতকস্থান পর্যন্ত বিচরণ পূর্বক পুনর্বার আরোহণ করিয়া, মধ্যসপ্তকের কোন স্থানে সমাপ্ত হয়,—এই প্রকার অবস্থাপন্ন কলিকে আভোগ বলে; ইহা গানের শেষ কলি।' (সীতিন্দ্রসার, ইং ১৯০৪, পৃ: ৭৬-৭৭)।

অর্থাৎ আলাপ বা গানের চার অংশের বিচরণ ক্ষেত্র স্নিহিষ্ট, এবং সমস্ত রাগ-রাগিনীর আলাপও রূপে এখনও এই নিয়ম অচলিত নয়; অথচ চারটি তুক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে বিচরণ করলেও প্রতিটি তুক অস্তত্বকের সঙ্গে অধিত্ব হয়ে যায় রাগের বিশিষ্ট আবেশে। রাগ-বোধক স্বরসমষ্টির সাহায্যে রাগের প্রকৃতি ও ছন্দ অল্পব্যয়ী গায়ক চারটি তুকের বিশেষত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন, অথচ সংগীত সমাপ্ত হ'লে যে রাগে সংগীতটি পরিবেশিত হয় তার অম্লরূপ স্নিহিত হতে থাকে শ্রোতাদের মনে এবং তখন প্রতিটি কলির স্বকীয়ত্ব ও স্বাভাব্য মিলে বিশেষ সংগীত সামগ্র্যে এক হয়ে যায়।

'চতুর্থক'-এর চারটি অংশ গানের সেই চার কলির সঙ্গে সহজেই মিলিয়ে নিতে পারি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের তেমন উক্তি উদ্ধার করা সম্ভব নয়, যে উক্তি বলে যেবে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে সাংগীতিক কাঠামো বিংশ রচনাকে উপভাসে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন, অথবা সাংগীতিক কাঠামোর আদলে উপভাসের পারিপাট্য রচনার উৎসুক ছিলেন; যদিও তিনি গল্পরচনাকে সংগীতে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন তার নজির মেলে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত এক চিঠিতে, তিনি লেখেন 'গল্পরচনার আত্মশক্তির, হৃদয় আত্মপ্রকাশের, ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গল্পের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গল্পরচনা স্বরসংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। - লিপিকা কি গানে গাঁওরা যায় না ভাবছ?' (সংগীত চিন্তা (১৯৬৬) পৃ ২০৫)। কবির এ ইচ্ছা উপভাস পর্যন্ত প্রসারিত ছিল কিনা বা প্রসারিত হতো কিনা কে জানে।***

*** উপভাসের দাবীট অবশ্য এখানে বশেষে ইঙ্গিতবহু, কারণ চতুর্থক ভারতীয় উচ্চাংশ সংগীতের অতীত একপ্রকার সংগীত—'যে গানে চারটি তুকের মধ্যে একটিতে বাণী, একটিতে ভাবনা, একটিতে বাস্তব বোল এবং অবশিষ্ট তুকে সরস' থাকে তাহাকে চতুর্থক বলে। ইহার প্রথম কলিতে চতুর্থক পদটির প্রয়োগ থাকিবে। ইহাও খ্যাতের অন্তর্গত।' (গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : সঙ্গীত চক্রিকা, রবীন্দ্রকীর্তী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, পৃ ১১)

তবু উপজ্ঞাসে সাংস্কৃতিক রীতি অচল নয়, তার প্রমাণ বেলে টমাস হানের উক্তি—‘ডেথ্, ইন্ তিনিং’ উপজ্ঞাসে I first learned to employ music as a shaping influence in my art. The conception of epic prose-composition as a weaving of themes, as a musical complex of associations. I latter on largely employed in the ‘Magic Mountain. (Stories of Three Decades, 1946, Preface, page VI)। উপজ্ঞাসে সাংস্কৃতিক বিজ্ঞাস সেই রচনার সুপ্রযুক্ত হয় যে উপজ্ঞাস বিশেষ করে আত্মসুখী এবং বেখানে আবেগ ও আদর্শ প্রকট হয়ে উঠতে চায়। ‘চতুরঙ্গ’ উপজ্ঞাসে এই উক্তির লক্ষণ বর্তমান, তত্পরি ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য হয়ে পড়ে, কারণ ‘চতুরঙ্গ’ এ নির্বাচিত ভাষা ধ্বনি ও ছন্দের যে চাঁদ খুঁটি করে তা কবিতার এলাকা পেরিয়ে সংস্কৃতির রাজ্যে পাড়ি দেয়।

অ্যাঠামশার অধ্যায়টি চতুরঙ্গ-এর আত্মসুখী, কারণ এই পর্বেই স্থির হয়ে গেছে উপজ্ঞাসটির স্বরূপ, যেমন আত্মসুখীতে গায়ক প্রকাশিত করেন রাগের অবিকাশ ও অপরিহার্য রূপ। অঙ্গমোহনের নিরস জ্ঞান চর্চা বুঝিয়ে দেয় জীবন কেবল সৃষ্টির শাসন মেনে চলে না, সেখানে ‘মাহুকের সযত্নে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না’, আর তাই এই অধ্যায়ে বেন অব্যবহিত হয়ে যায় সেই মোক্ষা কথাটি যে আংশিকতা বা একদৈশিকতার জীবনের বিরাট তাৎপর্য-আবিষ্কার করতে গেলে তার পরিণতি বিবাদাত্মক হয়ে ওঠে নিশ্চিতভাবে।

শচীশ অধ্যায় যেমন তুলনীর অন্তরায় সজে। অন্তরায় হ্রসবে উচ্চগ্রামের দিকে জোয়ার চেষ্টা করা হয়, তার চলন আত্মবিক তাবে উত্তরাঙ্গের দিকে। অ্যাঠামশারের সূত্রের পর শচীশের রস সাগরে নিমজ্জন ও নোঙ্গরহীন নৌকোর মত নানা পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলা, তা আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে দামিনীর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, যে প্রবেশ জীবননাট্যকে কেবলই টানের (tension) দিকে নিয়ে চলেছে, আর তার সপ্তকের বড়ল কিংবা আরও উচ্চতর বোধের স্রোত সেই দৃষ্ট।

তারপর দামিনী অধ্যায়ে আত্মসুখীর যে স্রব অন্তঃসপ্তকে বরিত হয়েছিল তাই এবার মল্ল সপ্তকে বেজে ওঠে সকারী হয়ে। এখানে আমরা দেখি ও শুনি দুটি ছবির দীর্ঘ হওয়ার সংস্কৃত চড়ারঙে বা উচ্চগ্রামে অঙ্কিত বা উন্মিত নয়, তবু অঙ্গমোহনের সোচ্চার বিদ্রোহের মত দামিনীর বিদ্রোহ সোচ্চার হয়ে ওঠে মধ্যে মধ্যে আত্মসুখীর-ই দীর্ঘ অঙ্গসরণে কিছু ভিন্ন এবং নির সপ্তকে।

আর নবীনের জীবন বিষয়ে আত্মহত্যার পর শচীশের কাছে হামিনীর আত্মনিবেদনে আখ্যান এবার সরাসরি প্রবেশ করে আভোগে, বহিঃ শ্রীবিলাস গর্বের পূর্বে আমরা হামিনী-র পরিণিষ্ট অংশে কিছু সংবাদ পাই, কিন্তু কাহিনীটি কিভাবে উপসংহারে পৌঁছায় তার বিবরণ আলো মস্ত নয়, এবং তা যে কত নির্মম সেকথা নদীর-পার বেয়ে বালির উপর দিয়ে গিয়ে জলার ধারে উপবিষ্ট শচীন ও হামিনীর ঘটনায় প্রকাশিত। আর তারপর হামিনী একসময় শ্রীবিলাসের দিকে মুখ ফেরায় ও তারের স্বাভাবিক পরিণতি পরিণয়ে বলে ও 'গাং মিটিল না'-র স্তব্ধ হাহাকারে 'আভোগ' শেষ হলে আমরা কেবল উপভাসের সামগ্রিক বুলেটের দিকে চমৎকৃত ভাবে তাকাই, তাতে তখন আত্মসচেতন আত্মসনাক্তকারী-নর-নারীর আত্ম অহুসঙ্কান আত্ম-আবিষ্কারের আকৃতির স্রব রপিত হতে শুনি।

আলাপ বা প্রসঙ্গের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যকার ঝাঁক ভরাট হয়ে যায় পরিবেশ-রাগটির নকশার টানে, কারণ গায়ক বা বাদকের ধ্যানে মানস নেজে ছুটে ওঠে-রাগের সামগ্রিক চেহারা এবং তারই বলে গায়ক কেবলই তুলে ধরতে পারেন রাগের বিশিষ্ট আমেজ। 'চতুরঙ্গ'-এ তেমন একটি অভিলীন স্রব কাঙ্ক্ষ করে চলে থাকে বলা যায় আত্মাহুসঙ্কান আত্মআবিষ্কার করণ-কৌশলে যাকে বলবে পারি বন্ধন-মুক্তি কিংবা মুক্তি-বন্ধন, কবিতার ভাষায় বা দাঁড়ায় অসংখ্য বন্ধন-স্বাবে মহানন্দময়/লভিত মুক্তির স্বাদ।' অর্থাৎ সেই মূল স্রবটি হচ্ছে পাশাপাশি অবস্থিত বন্ধনপত: ছুটি বিপরীত প্রত্যয় এবং তা পেরিয়ে সত্যতির সাধনা।

অগমোহনের মত মুক্ত পুরুষ শেষ পর্বত অড়িয়ে পড়ে ননিবালার মায়ায়, তখন তিনি তো আগাগোড়া অড়িয়েই ছিলেন শচীশের বাঁধনে। তাই বধন-তাকে 'গুড্‌বাই' বলতে হয় তখন শচীশের চলে যাওয়া অগমোহনের বন্ধ-বিবীর্ণ করিয়া সমস্ত অগং অসীমতার ছাইয়া কেলিল। (পৃ ৩৬০) উপভাসের সবচেয়ে মুক্ত ও স্বচ্ছ পুরুষটিও অড়িয়ে যায় হৃদয়ের বন্ধনে, অবশেষে তার মুক্তি ঘটে বৃত্তান্তে। 'শচীশও মুক্তি পেতে চায়, কিন্তু বার বার সে-ও অড়িয়ে পড়ে—এমনকি তার অল্প সাধনার ক্ষেত্রে সে ছাধিনীর বন্ধন কাটিয়ে ওঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে—'হাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। হামিনী তুমি আমাকে বদা করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।' (পৃ ৩২২) আর হামিনী তো বন্ধনে অড়িয়েই বেতে চায় তার মুক্তির জন্য, শচীশকে সে বলে 'তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন

কিছু মন্ব হাও বা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস—বাহাতে আমি
বাঁচিয়া বাইতে পারি। আমার দেহতাকেও তুমি আমার সঙ্গে বজাইয়ো
না।" (পৃ ৮২)। এমনকি শ্রীবিলাসও সেই বীখনকে টেনে কেলৈ মুক্তি-
প্রদায়ী হয়—“তাঁদের নেণার আসাদে আমি একেবারে ঘর্জরিত। মাহুককে
ঠেলিয়া কেলিয়া হুহুমাঝ মাহুকের হুহুহুতিগুলাকে লইয়া দিবারাজি এমন
করিয়া ঘাঁটাঘাটি করিতে আমার বতব্বর অকুচি হইবার তা হইয়াছে।”
(পৃ ৩৫-৩৬)। তখন এই মুক্তি-বন্ধন বন্ধন-মুক্তির পাখার ফুটে উঠেছে
আত্মাহুসন্ধান আত্মাবিকারের হ্রদ।

‘চতুরঙ্গ’-এর সাহিত্যিক কাঠামো নিটোল, অখণ্ড ও সমগ্র হয়ে উঠেছে
ঐ বন্ধন মুক্তির নকশায় আত্মাহুসন্ধানের রাসিগীতে, কিন্তু তা নিপুট অভ্যচারী
হয়ে আছে যেমন তানপুরা গায়কের হ্রদ ধরে রাখে সজতকারীর চেক্রে
নিজেবে আরও গুপ্ত রেখে। আর উপভাসটির অতি সংক্ষিপ্তি, তাহার
কারুণ্য ও সেই সূত্রে একটি নিটোল বন্ধন অখণ্ড সীমা পেরিয়ে অসীমের অভ
আকৃতি প্রভৃতি লক্ষণগুলি যেন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রূপের সঙ্গে
মিলের ইঙ্গিতটি স্পষ্ট করে দেয়, এবং রবীন্দ্রনাথের রূপের প্রতি পূর্ণপাত
ছিল সে-সম্পর্কে তাঁর নাম উক্ত ‘সঙ্গীত চিন্তা’ গ্রন্থে মেলে, আর তাঁর সংগীত-
জীবনের প্রথম পর্বারে রূপের অহুসরণে রচিত বাহ্যিক বর্ণিত গানগুলির
মতো ‘চতুরঙ্গ’ হয়ে ওঠে প্রায় অনাড়ম্বর অলঙ্কার বর্ণিত একটি গভীর রচনা।

আবার ভারতীয় সঙ্গীতে রূপ যেন সাহিত্যিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত
হয়ে থাকে, তাকে প্রদর্শিত করতে হয় না, বরং সঙ্গীতের রূপ-মহুর গতি ও
লয়ের মধ্যে নিত্য ফুটে ওঠে ভারতীয় চরিত্রটি, তেমনভাবে ‘চতুরঙ্গ’-এর
সারা শরীরে তার করণ-কৌশলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় উপভাসটি কোনও অবসর-
বিনোদনের তরল উপকরণ নয়, তার রসে রসে ছড়িয়ে আছে রক্তাক্ত-
হৃদয়দীর্ঘকারী সমস্তা ও ব্যক্তিত্বের সঙ্কট—এমনকি দার্শনিক অর্থে দার্শনিকতা
অখণ্ড তা কেবলই অন্তঃসলিলায় মতো আমাদের অগোচরে থেকে প্রবাহিত
হয়ে চলে সারাঙ্গণ। তাই ‘চতুরঙ্গ’ দার্শনিকতা আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ হয়েও
শিল্পিত আবেগে উপভাসিকের প্রচণ্ড নৈব্যক্তিকতার উপভাস হিসেবে সার্থক
এবং আর্ট হিসেবে অনবদ্য হয়ে ওঠে।***

*** টেকনিক্—এর প্রতিপদ হিসেবে ‘করণ কৌশল’-এর প্রতি আমার বৃষ্টি আকর্ষণ
করেন গ্রন্থের উত্তর অঙ্গলেনু বহু, একতর আমি তাঁর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীবিলাস বহু তাঁর
“শিল্পকথা” গ্রন্থে ‘করণ-কৌশল’ ব্যবহার করেছেন উপরিউক্ত অর্থে। তাঁরই অবলম্বনাক-
পরিভাষাটি গ্রহণ ও অনুশীলন করতে চেয়েছিলেন।

মুসলমান অন্দরে বিয়ের গীত

আফসার আমেদ

বাংলার মুসলমান অন্দরে বিয়ের গীত একটি অনাবিকৃত রত্নসীপ। বিয়ের গীতে সর্বপ্রকার লোক সাহিত্যের মত অতীত থেকে বর্তমানে ধারাবাহিক গতি লক্ষ্য করা যায়। মুখে মুখে শুনে শুনে ব্যক্তি পরম্পরায় গীতের চলমান রীতি স্রব হয় নি আজও। বিশেষ করে মুসলমান সমাজে। এর আদি পটভূমি গ্রাম, গ্রামের মুসলমান ঘরে লোকাচারের মতই বিয়ের গীত চলে আসছে। গীতের প্রাচীন গতিতে বর্তমানের মিশ্রণ হয় অল্প অল্প করে। এইভাবেই বেঁচে থাকে তার প্রাণধারা। গীত রচনা হয় আপনা হতেই। সঠিক রচয়িতার নাম জানা যায় না। তবে যিনি বেশি চর্চা করে থাকেন তাঁরই পক্ষে সম্ভব গীত রচনা করা। কারণ ভূমি ভূমি গীত নাড়াচাড়ার ফলে তাঁর মনে যে প্রভাব পড়ে তাতেই গীত সৃষ্টির অল্প বাস্তবিকভাবে জন্মে ওঠে। গীতের আদি রূপটির ঝাড় পৌছের ফলে কে কোন সময়ের বলা মুশকিল। যে গীত কয়েকটা আদি শব্দ বরাবর চলে আসছে সে অবশ্যই গীতের বয়স সম্পর্কে ধারণা করা যায়। অর্ধের দিক থেকে গীতে প্রাচীন ও বর্তমানের যে সম্পর্ক পড়ে ওঠে তাতে অর্ধের কিছুটা ব্যাঘাত ঘটে বইকি। একটার সঙ্গে আর একটার জোড়াভালিতে গীতের প্রথম ও শেষ অংশের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তা হলেও হেঁড়া হেঁড়া অর্ধশ্লিষ্টেও রসস্বষ্টিকে ব্যাহত করে না। লোকসাহিত্য কোনমতেই জটিমুক্ত নয়, তাহলে সে সাহিত্য হয়ে যেত।

আধুনিক যুগে মানুষের চলাকোরা সহজ হয়ে গেছে। এক জেলা হতে আর এক জেলা খুব কম সময়ের মধ্যে যাওয়া যায়। তাই একটি গীত যে জেলার রচিত সেটি সে জেলার আর থাকে না। পাশাপাশি জেলার জেলার

ছড়িয়ে পড়ে। জেলার জেলার উচ্চারণের যে বৈশিষ্ট্য সে কারণে কিছু কিছু গীত কোন জেলার চিহ্নিত করতে পারি। বিপরীতে বলা যায় এক জেলার গান আর এক জেলার গানে উচ্চারণগত পার্থক্য স্পষ্ট করতে পারে। সেজন্য যে গান যে অঞ্চলে পাই সে গানগুলি যে সে অঞ্চলেরই একথা ঠিক নয়। একই গান ভিন্ন ভিন্ন জেলার ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাহলে কোনটা কোন জেলার তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তাই কোনটি কোন জেলার বলতে বাঙালি গোলমালটি বেশি।

ভাষাগত দিক দিয়ে এই সব অঞ্চলের যেমন আরবি উর্দু প্রভাব আছে তেমনি সে সব শব্দচরন দেখা যায়। তুল উচ্চারণের ব্যবহার অনেকখানি। গানগুলি বাঁধা হয়েছে কথ্যভাষায়। প্রাচীন সাহিত্যে যে সাধুভাষার ব্যবহার আছে এই গীত সহজ সরলতার দিক হতে অনেকদিন থেকেই আধুনিক। কথোপকথনের যে ভাষা গীতগুলি সর্বকালের পাই কথ্যভাষার রচিত হয়ে আসছে।

বিয়ের গীতে দুটি প্রধান চরিত্র বর-কনে। এই দুটি শব্দের প্রাচীন দুটি বিশেষণ পাই, তা হল: 'বাবা'-'কুরি'। বাবার কনের আর একটি নাম 'কামিন' বা 'কামিনী'। তাছাড়া আর সব চরিত্র ভিড় করেছে সে-সব পৌণ-চরিত্র। বরের কনের বা-বাবা, নানা-নানি বাবা-বাবি দেওর-ননদ শাশু-শাশী ননদাই ইত্যাদি। এইসব চরিত্রের ভিড়ে কম্পনসময় ব্যঙ্গের সঙ্গীত আরো ধন করে তোলে। ব্রাহ্ম-নারিকাকে নিয়ে শুধু বললে এক-ধেরি লাগে। এবং যেখানে নারিকার মধ্যে পৌণ-চরিত্র এবং হাজির সেহেতু তাদের বোঝাযোনে গীতগুলি জমজমাট ও অর্থপূর্ণ হয়। আর আনন্দ উপভোগ বর-কনে করে না, করে আত্মীয় পারিবার। ব্যঙ্গগীতিতে তাদের উপস্থিতি না থাকলে গুয়ো আনন্দ হয় না। তাই বিয়ের গীতে পৌণ-চরিত্রগুলি খুবই প্রয়োজনীয়।

মুসলমান ঘরে সাধারণত বিয়ের গীত পাওয়া হয় বিয়ের ছদ্ম আবেগে। অজান্তে অকলে আরো আগে থেকে পাওয়ার নিয়ম আছে। বরের বাড়ি বরকে নিয়ে কনের বাড়ি কনকে নিয়ে পাড়াপড়শি ও আত্মীয় মহিলারা গায়। বিয়ের দু-দিন আগে বর-কনের গায়ে হলুদ পড়ে (পাজহরিয়া)। আমরা মুসলিম হিন্দু যে ধর্মবিশ্বাসে আবদ্ধ হই না কেন লোকাচারের দিক থেকে অনেক সময় একান্ত হয়ে বাই। হিন্দু রীতিতেও গায়ে হলুদ ঘের মুসলমান রীতিতেও ওই একই। উভয়ে পাশাপাশি থাকার ফলে একে

অগ্নের প্রভাব বেড়ে কেলতে পারিনি। বিয়ের দু-দিন আগে বা হিড়িক সেই দু-দিন বিকেলে ছুটি একই রকম লোকাচার দেখা যায়। প্রথম দিন বরের বাড়ি বরকে নিয়ে গায়ে হলুদ মাখানো হয়। এবং কনের ক্ষেত্রেও একই। সেই সাথে গায়িকাদের সঙ্গ পলার 'ইনানো-বিনানো' গান পরিবেশটাকে মাতিয়ে তোলে। দ্বিতীয় দিন 'উবো' হয়। সেটি হল বরের বাড়ি বরকে কনের বাড়ি কনেকে একটি চৌকিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। কনের পরনে যে লাল পাড় শাড়ি থাকে তা আলতা ছিটিয়ে রান্নানো হয়। বরের হুতিতেও একই নিয়ম। যে চৌকিতে কনে বা বর বসে তার পারায় নিচে চারটি পান থাকে। এবং চারটি পারায় লাল স্নতো বাঁধা হয়। এবার ময়দা ছেনে কপালে পটি বসিয়ে মাথার এক পো কিংবা আরো বেশি সরবের তেল ঢালা হয়। কপালে ময়দার পটি দেবার কারণ হল বাতে তেল পড়িয়ে চোখে না পড়তে পারে। সেই তেল বড় একটি থালায় এসে পড়ে। সেই থালায় ভুঁড়ো হলুদ থাকে। সবটুকু তেল হলুদ ভুঁড়োর মাথামাখি হয়ে যায়। সেই তেল হলুদ গায়িকারা বর বা কনের গায়ে মাথাতে থাকে। এই তেল হলুদ মাথাবার পেছনে ছুটি কারণ আছে, একটি হল গায়ের ময়লা সাক হয় এবং অপরটি হলুদের স্পর্শে শরীরের লাভণ্য আরো বেশি করে ফুটে ওঠে। এইসব আচার-অহুটান চলাকালীন সীত কিছু থাকে না। ওরই সঙ্গে গেয়ে চলে। বারা গান গান প্রত্যেকেই মহিলা। বর-কনের মাঝেদের গান গাইতে দেখিনি খুব একটা। তবে এমন রসিকা না ছেলেদের বিয়েতে টোট সামলাতে পারেন নি দেখা যায়। শুধুমাত্র গানই নয় তার সঙ্গে অগ্নি নাচের ব্যবহার আছে। আর পাড়-পড়নি আত্মীয়-বন্ধন ছাড়াও ভাড়াটে গায়িকা দেখা যায়। তারা নাচে ও গান গায় দুই-ই। এবং কিছু কিছু হিজড়া এইসব সীতের পুরোপুরি স্বত্তি অবলম্বন করেছে। তারা পেশাদার। পেশাদার গায়িকাদের গ্রাম্য কথা 'লিচো' বলে। এরা আমন্ত্রিত না হলেও পড়নি ও আত্মীয়েরা সীত পরিবেশনের অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সেই সঙ্গে ছেলেদের সিঁচকারির রং তো আছেই। এই রং খেলায় যে হিন্দু লোকাচার বোলের প্রভাবে প্রভাবিত। সারা বিয়ে বাড়ি আনন্দে মগ্ন হয়ে ওঠে। গায়িকার মুখে গান গুরে টুকটুক লাল সঙ্গ টোটে 'ইনানো-বিনানো' সুরের সীত সারা পাড়াকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

হলদি তেলে গুঁড় বুরু

আর না মাথার মাখা যে

কোথা গেছে কোথা গেছে
 আমি গেছ শিশু আরশে
 নৌকাখানি লাগে যে।
 বয়েষ মায়েষ কাঁদাল দিয়ে
 যাচ্ছে যেন লাল দ্বারা শাহাজাদা
 মুখু ছেলে বউ তো পেয়ে
 আমায় ধরে ডাকবে না
 বাপকে বলে কুস্তা ছাপল
 বাঁধয় ছাপল সাজবে না।
 চাই না রে তোর খাট পালক
 বিছানা তোর সাজবে না—
 কোন ধরিতে চলে গেছে
 আসবে কখন ঠিকানা।

তেল হলুদ মাখাবার সময় বোন দাদাকে শাহাজাদা সেজে বিয়ে করতে
 যেতে দেখল। তারপরেই স্বর কেমন আতে আতে পালটে যাচ্ছে।
 বউ পেয়ে মুখু ছেলে আর তার বোন্নিটিকে মনে রাখবে না। এবং পরবর্তী
 বিবাহিত জীবনে বাপের সঙ্গে ঝগড়া ঐচ্ছিকি অশ্রীতিকর ঘটনাগুলো মনে
 মনে নিরীক্ষণ করছে। দাদার চরিত্র বোনের কাছে যদি এরূপ হয় তাহলে
 সে তার বিয়ের সময় তার দেওয়া খাট পালক নিতেই পারে না। শেষের
 ফুলাইন পীতের মুখ্য ভাব হতে অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে। দাদা কোথায় কোন
 প্রায়ে বিয়ে করতে গেছে, কখন আসবে তার অপেক্ষায় সে আছে।

বিয়ের আগের দিন তেল হলুদ মাখাবার সময় কনে-বরের মুখে কীর
 (চালের পায়ের) দেওয়া হয়। আঙ্গুর-বজন দ্বারা মুখে কীর দেবে তারা
 সাদ্যমতো টাকা দেবে। এই রীতিই প্রচলিত। সেজন্য এক থালা কিংবা
 আরো বেশি কীর আগরে উপস্থিত থাকে। বর-কনে নাম মাত্র কীরের
 খাদ নেয়, খায়ও না। থালার কীর ওই আগরে হাতে হাতে বিলি হয়।
 মুখ্যত ছোট ছেলেমেয়েরা খায়। কীর বিতরণের বা হিড়িক পড়ে—
 কাড়াকাড়ি দাপাদাপি সে এক হরিশূটের আনন্দ। বর-কনের মুখে কীর
 দিয়ে আঙ্গুরেরা টাকা দেয় আর গায়িকারা 'স্মিত গাওনা' করে চলে।
 সেই সময় পীতের স্বর পালটায়।—

কালুন্দি ঘানের দিকনি
 গালে দিলে তার মিলোনি
 বা বেঁধেছে জননী।
 উঠে রে মোর সায়েরা ধাতুন দিক ধাও
 সাইতের লগন তোমার বয়ে যায়
 বাবাজী কোর্ট আপিসের টাকা পায়
 তবে উঠে সায়েরা দিক ধায়।

সায়ের স্নেহের হাতের রাসা কীর খেলে গালে মিলিয়ে যায়। তেল-
 হলুদ মাথাবার সময় কনেরা কেউ কেউ ঘরের কোণে বসে কাঁদে। এবং
 তার পরেই মুখে কীর ঘেবার পালা। কনে যদি বিছানা নেয় তাহলে
 অছটানাদি হয় না। কনের এই ঘরের কোণে বসে থাকার একটি মাত্র বৃত্তি
 ঘেঁষিয়েছে গারিকারা। কনের বাবা কোর্ট থেকে স্বত্বকণ মাইনে না পায়
 সে কি করে বেতে পারে। কারণ টাকা নী হলে বিয়ে হবে না। তারপর
 যখন শোনে বাবা টাকা পেয়েছে তবে মুখে কীর নেয়। কনের ঘরের প্রতি
 ভালোবাসা তা সীতটিতে প্রকাশিত।

বর আর কনের দু'বাড়িতে এই একই ছবি দেখা যায়। দুই বাড়িতেই
 সীত গাওয়া চলে। বর পালকী করে বিয়ে করতে আসবে এই বা। সেই
 দিনটির অপেক্ষার কত জরুরা করনা সীতে-প্রকাশ পায়। কনের বাড়িতে
 কনেকে নিয়ে পায়।—

ভাতা চাল ওই ভেঙে গেছে
 গুঁই শাগের ভায়েতে
 বেড় টাকা দিয়ে নখও গড়াই
 আখিনা বিবিজীর তরে বে।
 আখিনা ভাঙে পানের ঝিলি
 জামাই ধায়নি তাই লাঞ্জে বে
 কি ফুল ফুটালি আখিনা
 'কড়ে' গ্রামের মাঝে বে।

আবার বরের আসরে—

দামাধ তো আসতেছে বামায়ে বামায়ে
 কামিন কর বাতাস জামাইকে

আদি বাতাল করবনি করবনি

কব'জির হেলনে' হাতও মোয় বাধা হবে যে।

বরের বরের মেয়েরা কনের ঘর থেকে অনেক কিছু আশা করে। পুরুষদের অলংকার বলতেই ধরা যায় বড়ি-আংটি-বোতাম। সীত পারিকারী ওই তিনটি অলংকার কিরকম পেতে চায় তা নীচের গীতটা দেখলে বোঝা যায়। এবং সেই সঙ্গে মনমত অলংকার না হয় সেগুলো কাকে কাকে দান করে দেবে সেটিও সীতের মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে বরকে। এখন গীতটা শোনা যাক।—

উত্তর দখিন পুবে যে লাল
জোড়া ময়র পাখি উড়ছে যে লাল
ওই বুঝি থালে দিবে রে লাল
ওই বুঝি থালে দেয় রে লাল
সোনার বড়ি যদি হয় রে লাল
হাত বাড়ায়ে লিও রে লাল
এমনি বড়ি যদি হয় রে লাল
সামান্ডর বিলায়ে দিও রে লাল।
হিরার আংটি যদি হয় রে লাল
হাত বাড়ায়ে লিও রে লাল
সোনার আংটি যদি হয় রে লাল
শালা বিলায়ে দিও রে লাল।
সোনার বোতাম যদি হয় রে লাল
চাচাখন্ডর বিলায়ে দিও রে লাল
পেনির বোতাম যদি হয় রে লাল
পলা বাড়ায়ে লিও রে লাল।

গীতটির প্রথম দু-লাইনে যে ভাবটি প্রকাশ হয়েছে তা কেবলমাত্র কল্পনাকল্পে একটি মনোরম পরিবেশের চিত্রকল্প অঙ্কিত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম আকাশে জোড়া ময়র উড়ছে। তারপরেই সীতের আসল বক্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিবাহিত জীবনের পূর্ণাঙ্গালে কনে বরের কাছ থেকে কি বরনের গহনা আশা করে তাও পারিকারের কল্পনায় সুন্দরভাবে রূপ পেয়েছে। পুরুষরা

অনেক সময় টাকা থাকলেও অলংকার গড়ায় সময় কার্পণ্য করে। জী বাবীর চাতুর্ঘ্য ধরে ফেলেছে। তাই প্রতি লাইনে ‘আলিম’ বলছে।—

বড়ই চতুর বাজে আলিম নিউনি তোমার কান হয়।
আমলেট বহি আনলে আলিম হারমণ কাটতে ফুল গিয়া
বড়ই চতুর বাজে আলিম নিউনি তোমার কান হয়।
তোড়া বহি আনলে আলিম বংশুর দিতে ফুল গিয়া
হার বহি আনলে আলিম লকেট দিতে ফুল গিয়া
বড়ই চতুর বাজে আলিম নিউনি তোমার কান হয়।

আবার ব্যঙ্গের সুরে বাবী কিরূপ অলংকারে সাজাবে জীকে তা নীচের গীতটিতে রসালো তংশীতে আছে।—

ও নাক নেড়ে নেড়ে
ও তুই বাবি চলে
ও তোয় ভালই হবে।
যয়ে আছে ভাতা ঠেকা (চুবড়ি)
ভেঙে গড়িয়ে ঘোব মাখার কাঁটা
ও নাক নেড়ে নেড়ে ..
গাছে আছে পাকাতাল
ভেঙে গড়িয়ে ঘোব মাখার আল
ও নাক নেড়ে নেড়ে...
যয়ে আছে ভাতা ঝোড়া
ভেঙে গড়িয়ে ঘোব পায়ের তোড়া
ও নাক নেড়ে নেড়ে...।

বউ-এর খুব নাক মাখার কাঁটা, মাখার আল এবং পায়ের তোড়া না হলে তার চলবে না। এই তিনটির সাদৃশ্য বধাক্রমে চুবড়ি তাল আর ঝোড়ার। বস্তুগত সাদৃশ্যে গীতটির কোঁচুক সার্থক রূপ পেয়েছে। প্রথম অংশে বউ নাক নেড়ে নেড়ে মায়ের বাড়ি বাবার ইংগিত আছে।

বউ বাবীকে কিনতে বলেছে,

নীল আসমানী চুড়ি গো দামাদ
যেমনো যেমো তার আরশি—

বউ-এর সাথ বর আনবে আসমানের মত নীল চুড়ি এবং তাতে ঘেঁষাঘেঁষি

আয়না বসানো থাকবে। জ্বর আবেদন রোমাঞ্চিকতার ভরা। কিন্তু তার পরিবর্তে আমি কি করল সীতটির শেষটার আছে।

মায়ের চুড়ি কিনিলুম
আগো চুলে বাঁধিলুম
সুখজীর চুড়ি কিনিলুম
ধুতি কিনিলুম ধুতির খুঁটে বাঁধিলুম।
ভাবিজীর চুড়ি কিনিলুম
পকেটে পুরিলুম।
কামিনীর চুড়ি কিনিলুম
মায়ের শুবা মানালুম
কোলে পিঠে করিলুম
কামিনীর শুবা মানালুম
খেজুর ছড়ি মারিলুম।

মা-বোন-ভাবির ও জ্বর চুড়ি কিনে আনল আমি কিন্তু চুড়ি কারও পছন্দ হল না। মা-বোন-ভাবির গোবা কাহুতি মিনতি করে ভাঙাল। শেষে জ্বর গোবা ভাঙাতে খেজুর ছড়ি লাগল। জ্বর আয়না বসানো নীল চুড়ির মধুর আবেদন শেষে এভাবে যে মিটবে জী কখনোই তা করনাই করেনি। গায়িকারা বাস্তব অভিজ্ঞতার এই আশাহত ঘটনার সত্যের সমালোচনা করতে ছাড়েনি। পর্দানিশীনা জ্বরের নালিশ আনাবার মাধ্যম সীতেই হৃত।

আগে বলে নিই সীতে যে সব নাম ব্যবহার হয় কনে-বর ও গ্রামের নাম সেগুলি গায়িকারা সেই সব নাম বসিয়ে দেয় বেগুলি বর-কনের আসল নাম এবং ওই এলাকার গ্রামের নাম বিয়ের সীতের আসরে আসল বর-কনের নাম দেওয়ার হুঁত একটাই বা হল সীতগুলিতে আসল নামগুলি থাকলে আরো বেশি আকর্ষণীয় হয় এবং বর-কনেকে বিদ্ধ করতে সুবিধে হয়। কাছাকাছি হাট টেশনের নাম উল্লেখ থাকে। সীতের মধ্যে ঠিকানা প্রকাশ করাও রীতি। নীচের সীতটি দেখলে বোঝা যাবে।

ছোট শিশি আনা আনা বড় শিশি ছ'আনা
মাথায় দিলে মাথা ধরে এ কেমন বুদ্ধি
কোথা থেকে আসছ নবাব কোথায় তোমার ঠিকানা ?
আরামবাগ থেকে আসছি আমি খানাহুলের ঠিকানা।

কি কি নাতা থাকে হে নবাব আমার তুমি বল না।

খাতার নাতা থাকে গো কামিনী তাও জানো না।

ছোট শিশি...

অনেক দিনের পর এসেছি কামিন তোমার রেখে বাব না

কোথা থেকে আসছ নবাব কোথায় তোমার ঠিকানা ?

আর একটি গীতে সেখানকার কুমোরদের উল্লেখ করেছে। কোথাকার কুমোর সে আরগার নাম পাওয়া যায়। বিয়ে বাড়িতে খাওয়ানোর সুবিধের জন্য মাটির হাড়ি সরি মালা আলি বাবড়ীয় জিনিসপত্র ব্যবহার করা হয়। কুমোরদের সেসব জিনিস বায়না দিতে হয়। তার জন্য বিয়ে বাড়ির একটা খরচ আছে। কিন্তু গায়িকারা তার সমাধান একটি ব্যয়ের মধ্য দিয়ে করেছে। তা হল :

হিরেপুয়ের কুমোররা বায়না চেয়েছে

যত গোড় হাড়ি যত গোড় সরি দিবে বলছে

বরের বুকে তারা দানে চেয়েছে

দোব দোব বরের বুকে দানে দোব যে—

সায়েনা অবাব পেয়ে কুমোরতাই

কোবে কোমর বেঁধেছে।

বরের বু (দ্বি)-কে নিয়ে বরের ঘরে সোয়গোল পড়ে যায়। বরের বু এমন একটি ব্যক্তি চরিত্র তার গুণ কিছু নেই বরং দোব ফুরি ফুরি। বরের বুকে নিয়ে আর একটি গীত শোনা থাকে। কনের মনে প্রশ্ন হচ্ছে এত রাত হল তবুও তার বাবী ঘরে এল না। গীতের ভিত্তি গণনা কিন্তু গায়িকারা বিয়ের আসরেই করে থাকে। বা হোক, জ্যোৎস্নারাত্রে কনে বাবীর অপেক্ষায় বসে আছে। বউ অনেক কথা ভাবছে, নিজেকে প্রশ্ন করছে।—

বগভূমুর চামিরাত

কেন যে আলিম এ্যাতো রাত ?

গায়িকারা পাণ্টা উত্তর তৈরী করে :

বরের বুকে রয়েছে বাত

ভাতার আনতে এ্যাতো রাত।

আমরা জানি বরের বু হল কনের নন্দ। সমাজে ননদের চরিত্র কনের কাছে কিয়ৎকম বলতে হয় না। তাই গায়িকারা গানে ননদকে ব্যক্তি

করতে ছাড়েনি। এই গানে ননদের জন্মই তাতার আনতে যামী এই
জ্যোৎস্নারাতে আরো কত রাত করে বাড়ি কিয়ল। বতকণ যামী ঘরে
করে না ততকণ বউ কিছু খায় না। তারপর যামী বখন এল :—

সেই ঘরেতে মাতুরা
অল সিরণ করে গো
সেই ঘরেতে অলিল আলি
চলে চলে পড়ে গো।

বিয়ের আগে পর্যন্ত বর কেমন দেখতে কনে জানতে পারে না। লোকমুখে
অনেক কথা শোনে কিন্তু কোতূহল থেকে যায়। কেউ রসিকতা করে বলে
খোঁড়া-কানা-কুঁজো। তাই কনে আমড়াগাছের হরেক রঙের পাখিকে প্রাক্ত
করে নিজের মনে বোধ হয়।

আমাদের ওই আমড়াগাছে
হরেক রঙের পাখি বসেছে
সত্যি করে বল না পাখি
আমার বন্ধু কেমন আছে ?
লোকে বলে খোঁড়া খোঁড়া
খোঁড়া নয় সে বলবার মোড়া
লোকে বলে কুঁজু কুঁজু
কুঁজু নয় সে মুড়ি ভুজু
লোকে বলে কানা কানা
কানা বলে কানা কানা
কানা নয় সে নখের টানা।

কনের মাও জামাই সম্পর্কে অনেক কথা শোনে। আর একটি গীতে
ব্যঙ্গ রসের চাতুর্ঘ্যে মায়ের মনবোধ দেখা হয়েছে। যদিও গীতটিতে অগ্রিয়
বর্ণনা দিয়ে শ্রেণ তামাসা করা হয়েছে।

জানিনা মাগো জামাই মোর কালো গো
হোক না পোড়ে জামাই
আবার আলো গো।
জানিনা মাগো জামাই মোর দৈতড়ো গো
নারকোল কুরবার ভাল গো।

আবার আমাই কিরকম বেধতে তা দেখাতে পারিকারা গেছে বিয়ের
আসরে। ভাল কি খারাপ কনের মায়ের মনে এই সব ভয় হয় বই কি।

আমলিপাতা শামলিপামছা
আমাই কেন মোর কালো গো
কোন্ মশালজী মশাল ধরেছ
মুগিরে ধর মশাল বে।
কনের মাও আরমান করেছে
বেধবে দামাদেব মুখও বে।
বাইয়ে বেরিয়ে বেধ গো কুরির মা
মজলিশ উজালা আমাই গো।

এবার কনের বোনের ছটকটানি। শালীদের ছটকটানি কনেরের
থেকেও বেশি।

আমলিপাতা শামলিপামছা
বোনাই কেন মোর কালো গো
কোন্ মশালজী মশাল ধরেছ
মুগিরে ধর মশাল বে।
কনের বুঝ আরমান করেছে
বেধবে দামাদেব মুখ বে।
বাইয়ে বেরিয়ে দেখো কুরির বুঝ
মজলিশ উজালা বোনাই বে।

শালীকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ে না পারিকারা। এখানে বেড়-শালী অর্থাৎ
কনের বুঝকে ব্যঙ্গ করেছে। কনের বুঝ সাধারণত বোনারের সাধনে বেরোয়
না। ছোট শালীকে নিয়ে বর যেমন ইয়ার্কি ঠাট্টা-তাবালা করে কিন্তু
বেড়-শালীর বেলায় তা ব্যতিক্রম। সব সময়ে সে লুকিয়ে থাকবে। কিন্তু
পারিকারা এতই চতুর যে উভয়ের মনের কথা ভেদে ফেলেছে। বোনাই
বেড়-শালীকে বেধবার লোভ সংবরণ করতে পারে না, শালীরও একই মনের
কথা টেনে এনে পীড়িকার রং চড়িয়েছে।

কনের বড় বুনের খিড়কির সময়ে
লালও মেহেদীর গাঁছও বে
সেই না মেহেদী তুলে কনের বুন-
হাত পা করেছে লালও বে—

সেই না লালও দেখে বোনাই

দেড়-শালীকে চেয়েছে দানতে।

এখন উপায় ? বোনাই যদি দেড়-শালীকে পেতে চায় তাহলে এমন লক্ষ্য করি হতেই পারে না। বস্তু দোষ করল ওই মেহেরীর গাছ। মেহেরীর লাল দেখেই বোনাই মুগ্ধ হয়েছে। এখানে দোষ করল ওই মেহেরী গাছ। অতএব পারিকারী কোন্‌ত দেখাল—

ডাকাও ডাকাও কনের বড় বোনাইকে

কাটাও মেহেরীর গাছও যে

সেই না মেহেরীর গাছও থাকলে

পায়ে ইচ্ছাত লুটায় বাবে যে।

ব্যক্তি ও সমালোচনার কনের মাকেও ছাড়েনি রসিক মন। কনের মাকে নিয়ে প্রত্যক্ষ হাসি ভাষালা করতে দেখেছি। উপরোক্ত গানের মত আরো গভীর রসালো মন্তব্যে কনের মাকে ঠাট্টা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া কনের মায়ের গালে তেল-হলুদ মাখাবার দাপাদাপি হয়ই। এই তেল-হলুদ মাখাবার হিড়িক উঠে যেহেতু বন্ধুর মধ্যে দেখা যায়। হোলির আধীর দেবার হড়োহড়ি দাপাদাপির মতো সে দৃশ্য। বিয়ে বাড়ির সে চিত্র আঁকতে গেলে অনাবশ্যক ব্যাপ্তিতে প্রবন্ধের বিবর তারাক্রান্ত লাগবে। আগের সীতের মত রসিকা পারিকারের ভাষালা লক্ষ্য করা যাক।

চালতাতলায় চালতা ফুলচাতর খেলেছে

সেইখানেতে লুটকর আমাই পালক ডেলেছে

সেই পালকে বসে শাউড়ি আমাই পাশা খেলেছে

সেই না পাশা খেলতে খেলতে শাউড়ী ছেঁরেছে

কোথায় ছিল পায়ের পোমড়া ঢিলা মেঁরেছে।

বারেক ছিল নতুন আমাই শরম ঢেকেছে।

এই বরসে শাউড়ি আমার পাগলা সেজেছে।

এতেও পারিকারের তৃপ্তি হল না। তারা আবার গাইল—

উঠোরে মোর কচি আমাই ছিপে রাখ হুই পেঁখেছি

মাছের মাখায় কাঁচা ডালিম আমারের মাখায় রক্তমালা

সেই না মাছও বেঁচতে বাবে উলুবেড়ের হাটে যে।

শাউড়ী লেবে মাছের ঝাঁকা

আমাই লেবে পানির বালতি যে

সেই বাছও বিক্রি করে আমাই কিনবে গাছা পেড়ে শাড়ি বে
সেই শাড়ি পরে শাড়ি আমাদের কাছে ঘুরবে বে।

উঠোরে মোর কচি আমাই...

নোনদাই-এর কাছে সেলেজের চূর্বলতা থাকে।- পারিকাদের আমাই-
শাড়ীর প্রতি মন্তব্য :

শাড়ি রসের কলসি মাগো

আমাই রসের পেয়ারা।

তারপরেই কনের নোনদাইয়ের কাছে আবেদন—

ও নোনদাই উঠো না

উঠেছি আমি শিরডালে

পাড়ব আমি পাকা পেয়ারা

ও নোনদাই উঠো না।

নোনদাই-এর প্রতি কনের চূর্বলতার এমন উৎকৃষ্ট রসমধুর ব্যক্তিতে শেষ
নয়। এবার আরো অর্থপূর্ণ।

বাসন ভরা নাতা দিচ্ছ নোনদাই খেলো গো

পালক ভরা বিসনা দিচ্ছ নোনদাই ভলো গো

সেই না খাবার খেয়ে বলে নোনটা নোনটা লাগে গো

সেই বিসনার শুয়ে বলে কেমন কেমন লাগে গো।

কনের প্রতি এই রসালো মন্তব্যের শেষে কনেকে তার বড় বুড়র কাছে
নিরে সিন্ধে গুপরের সীতের আবেদনে কিয়ৎপে সে সাড়া দিল দেখা বাক।

হলুদ রঙের পাখিরে মন

সবুজ রঙের পাখি

ছুরি মেয়ে দেখে বুড়ু রসেতে ভরা।

বিয়ের পর বর কনে সম্পূর্ণ অপরিচিত। হঠাৎ কনের পাশে গা-ঘেঁষে
যদি বেগানা দামাধ (অচেনা লোক) বলে তাহলে স্বভাবত কনে বিরক্ত হয়।

লাল ছড়ি হাতে ঘড়ি

দামাধ বেকল বাধনাতে

কোথাকারে বেগানা দামাধ

বসেছে বুড়ির গা-ঘেঁষে ?

তার উত্তর দিচ্ছে বর :

হাজার টাকার দেন-মোহর কিনে

বলেছি তোমার পা-ঘেঁষে।

বিয়ের সময় দেন-মোহর বাঁধা হয়। কোনো বিয়েতে হাজার এক টাকা কিংবা আরো বেশি। কোনো কারণে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তাহলে কনের দেন-মোহরের টাকার দাবী থাকবে। মুসলমান সমাজে এই রীতিতে বিবাহ বন্ধনের দৃঢ়তা অনেকটা অক্ষুণ্ণ থাকে। সেই দেন-মোহর বেখে সব্বদেই কনের সংগ পেয়েছে। এই রীতি কনের পক্ষে গৌরবের ব্যাপার।

বরকে কনে অনেক সময় তার ভাবি (বৌদি)-র সঙ্গে হাসি-ঠাঠা করতে দেখেছে। মেয়েদের মন বেমন একটুতেই আশঙ্কা করে তেমনি স্বামীদের জন্ম করতে কষ্টিতে কম বার না। ঘরে বিল এটে বলে থাকে। এবার গোঁবা ভাঙাও।

বাই আপটায় মারা বার

কপাট বেনো গো কামিন বাসর বাই।

কনে বলে :

আমার বাসরে নাইকো ঠায়

তোমায় তাবিজীর বাসরে রহো রাত।

কনে বরজা খুলই না। স্বামী বরজার কাছে বার বার আসবে কিরে যাবে। স্বামী বার বার মান ভাঙাতে আসবে সে ভৃত্তিটা কম নয়। কিন্তু স্বামীকে রাতের বেলা যে ঘরে চুকতে দিল না তাহলে স্বামী কোথায় গেলো। সকালে উঠে কনের জীবন উৎকর্ষায় কাটে। (পারিকারের অভিজ্ঞতালব্ধ তাই পানগুলি আসরে বেশি অনগ্রহ।) মাহুঘটা কার কাছে সারারাত গেলো? শেষে স্বামীকে সহাসরি জিজ্ঞাসা করে বলে।

দামাধ ভূমি কার পালকে

মুন্ডালে সারারাত?

দামাধ তোমার মাখার পাগড়ী ভিজে মালুম হয়।

পাগড়ী ভিজে হবার অর্থপূর্ণ কারণ আছে। সহবাসের পর মুসলমান সমাজে স্নান করার রীতি আছে। স্বামীর পাগড়ী ভিজে বেবেজী অর্থ বুঝতে পারে। তাই আবার জিজ্ঞাসা করে।

দামাধ ভূমি কার বিছানায়

মুন্ডালে সারারাত?

খামী বলে :

কামিন গো তোমার ভাবিজীর দরদলানে হুমছ শারাত ।

সীতের শেষের পরিণতি যে এরকম হবে কনে ভাবতে পেরেই ছিল না । মান অভিমানের মধ্যে অমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটল তাতে কনের বুক ব্যথায় ভরে যায় । সীতে বাস্তব সমস্তায় জীবনমুখীনতার রূপ পার্লিকাদের অভিজ্ঞতা টেনে এনেছে ।

সাধারণত খামী শহরে চাকরী করে । ক্ষেত্রে অনেকদিন ছাড়া ছাড়া । খামীর অল্পপছিত্তিতে জীর কিতাবে কাটে তাও সীতে বলা হয়েছে । খামী না আসায় জী হালকা রাগ অভিমান করে বলে । মন উড়ো উড়ো । কিছু আর ভাল লাগে না । সব থেকে বেশি রাগ খামীর ওপর । হাঁচিপান বাটা ভরে রেখেছিল তাও শুকিয়ে গেল । গাঁদাফুল তুলে রেখেছিল তাও শুকিয়ে গেল । হাঁচিপান আর গাঁদা ফুলের ওপর দ্বিগুণ রাগ প্রকাশ করল জী ।

বাটা ভরি ভরি হাঁচিপান
গবনে শুই শুকিয়া গেল রে
জউসি গাঁদাফুল
আগে যদি জানতাম রে
শুণা বলে ডাকতাম রে
দুইদুই গাঁদাফুল ।
বাটা ভরি ভরি হাঁচিপান...
আগে যদি জানতাম রে
বাপ্সি বলে ডাকতাম রে ।
দুইদুই গাঁদাফুল ।
বাটা ভরি ভরি...
আগে যদি জানতাম রে
তিয়োর বলে ডাকতাম রে
শুকিয়া গেলরে পরদেখী গাঁদাফুল ।

বাটাতরা পান গাঁদাফুলের সৌন্দর্য শুকিয়ে গেল । ছুটি প্রতীকের ব্যবহারে নতুন বৌ খামীর অল্পপছিত্তিতে কিতাবে হাঁচিপান গাঁদাফুলের মতো শুকিয়ে বাচ্ছে তা বোঝানো হয়েছে । খামী দেখি করে আসবে জী আগে যদি বুঝতে পারতো তাহলে খামীকে শুণা বলে ডাকতো, বাপ্সি-তিয়োর বলে ডাকতো । খামী না আসায় জীর মনের অবস্থা এরকম শুকনো ফুলের মতো হয়ে গেছে ।

দূরদেশী পরদেশী সে। বিদে হয়ে যন্তরবাড়ি আসছে তিন্ত্র স্বামী তাকে ছেড়ে শহরে। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা গীতটির বক্তব্যের কাছে সহজেই ধবা পড়েছে।

আবার দীঘির ধারে জোড়া ডালিমের গাছের পাকা ডালিমের লোভ দেখিয়ে ঐ প্রবাসী স্বামীকে চিঠি লিখে ঘরে আসতে বলছে। বলছে :

উত্তর পাহাড়ে কাটালুম দীঘি
সামনে শাহানের ঘাট যে
তারই পাহাড়ে করে এল
জোড়া ডালিমের গাছ যে।
ডালিম ধরেছে থোকা থোকা
পরে লুটায়ো খায়ও যে
লিখন লিখিলুম তাকে কেলিলুম
একবার বেন দেখে যায়।

গাছে ডালিম ধরেছে শুধু তা দেখার জন্যই চিঠি লেখা? না এর মধ্যে কোন গুঢ় অর্থ আছে? পত্র লেখিকার মনের বাসনা ডালিমগাছের মধ্যে মূর্ত। সাধারণতঃ মুসলমান মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়। স্বামী শহরে কয়েকমাস থাকলে জ্বর বয়সের শ্রী কমনীয়তা ফুটে ওঠে। জ্বর আবেদন স্বামী এসে একবার তাকে দেখে যাক। ডালিমটি সম্পূর্ণ সৌন্দর্যের সার্থক প্রতীক।

উত্তরে স্বামী লেখে :

আগি করি ব্যাকের চাকুরি
ছুটে নাহি পায়ও যে
কামিনী তুমি থাকো শিশু আরশে
আম্মজানের কোলেতে
আগি বাচ্ছি আশিন মাসে
ছপাঁশুয়ার পার্শ্বে
ডালিম মেকে রাখো বতনে
যেবে খাব হুজনে।

স্বামীর বাড়ি ফেরার এখন আর আশা নেই। ঐ রাগ অভিমান বেধাল গীতটির শেষ ছুটি লাইনে।

ভালিম শেকে লয় হল

মুখপোড়াটা কই এল।

এবারের শীতটায় আমি আসবে বলেছে সেজন্ত দ্বী সারারাত জেপে জেপে
কাটিয়েছে কখন আসবে তার অপেক্ষায়। কিন্তু জেপে জেপে ভোর হয়ে গেল
তবু আমি এল না।

ও কালোসোনা

আসবে বলে কথা দিলে

কেন এলে না

তোমার তারে সাজিয়েছিলাম

ফুলের বিছানা।

সারারাত জাগিয়ে বাতি

খুশি তো আসে না

ভোরেরবেলা উঠে দেখি গাড়ি চল না

বিস্মিত তুংয়ের আলো নিবিয়ে গেল।

এ গান আশাহতের গান। দ্বী আকাঙ্ক্ষার গান। ফুলের বিছানা
সাজিয়ে বাতি জাগিয়ে সারারাত বসে থাকল আমি আর এল না। গাড়ি না
চলাটা দ্বী বৃকে ব্যথার উল্লেখ হল। আমার কাছ থেকে হৃৎ পাওয়া বড়
একটা ভাগ্যের ব্যাপার।

বিয়ের গীতের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ তো চললই। অবশেষে বিয়ের
দিন এল। কনে বিদায় করতেই হবে। মা-বাবা-ভাই-বোন আগনজনদের
ছেড়ে চলে যেতে হবে। বিয়ের শীতে যে আনন্দ হল তার দাবি ওই একটি
বিশেষ করুণ ছর সকলকে ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। শীতে এই মুহূর্তটি
গানিকাদের কণ্ঠে রূপ পেয়েছে :

মা কঁাদে গো মা কঁাদে গো

দুখের বাটি ধরে

সেই মা দুখ দিয়েছিল গলা ভিজিয়ে

বাপ কঁাদে গো বাপ কঁাদে গো

গরলের বাতা ধরে।

সেই বাপ গরু কিনেছিল গোল সাজিয়ে।

ভাই কঁাদে গো ভাই কঁাদে গো গরুর খুঁটো ধরে

সেই ভাই গরু দিবে বসেছিল গোল সাজিয়ে।

বুন কাঁদে গো বুন কাঁদে গো পালকীর খুরো ধরে
সেই বুন গাল দিয়েছিল রাঢ়ী থাকি বলে ।

মায়ের স্নেহ বনমতার প্রতীক ছুধের বাটি। মেয়ে বিদ্যায়ের সময় সেই স্নেহ বনমতার প্রতীক হাতে করে মা কাঁদছে। চাষি বাপ পোয়ালের বাতা ধরে কাঁদে। মাঠে মাঠে লাঙল কবে চাষ করে মুখে অন্ন তুলে দিয়েছিল সে বাপ। ভাই গরুর খুটো ধরে কাঁদছে। তার সাধ ছিল বোনকে সে পোয়াল ভরে গরু দেবে। মা বাপ ভাই-এর ভালোবাসার এমন টান তাদের ছেড়ে কনে কি করে স্তিন দেশে চলে যাবে? শেষে বোনের কথা বলা হয়েছে। বোন পালকীর খুরো ধরে কাঁদছে। কিছুতেই যেতে দেবেনা এমনই ভাব। বোনের ভালোবাসার টানটা আরো বেশি। অথচ সংসারে যখন উত্তরের ঝগড়াবাটি হয়েছিল তখন বোন 'রাঢ়ীথাকি' বলে গাল দিয়েছিল। যে বোন এ কথা বলেছিল সেও বিদ্যায়ের বেলায় সবচেয়ে আপন হয়ে গেছে। স্নাতকের এই বাস্তব-হৃদয়ের কল্পন রূপটি মন প্রাণকে সত্যিই স্পর্শ করে।

স্নাতকের ভাঙার এখনও বাংলার মুসলিম অন্তরে অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে। অন্তর সস্ত্রদ্বায়ে এই রীতি প্রায় মুছে গেছে। কিন্তু মুসলমান নিচু সস্ত্রদ্বায়ে গীত ছাড়া বিয়ে হয় না। নকসি কাঁধার মতো আজও তারা রঙিন স্ত্রীতো দিয়ে ঝাঁকটোরা ছন্দে বুনে চলেছে গীতের মত ছড়াগান প্রবাদ রূপকথা।

বাংলা মুদ্রণের সমস্যা

ডক্টর মুন্সুফের মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি সাহিত্য একাডেমি বাংলা ভাষার লেখা, ছাপা ও টাইপ করার সমস্যা নিয়ে এক আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। মুদ্রক ছাড়া বহু সাহিত্যিক ও বহুবিদ উপস্থিত ছিলেন। যুক্তাক্ষর-গঠনে সমতা ও বাংলা মুদ্রণের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

একই অক্ষর, বিশেষ করে যুক্তাক্ষর-গঠনের বিভিন্ন রূপ দেখা যায় মুদ্রণে, লেখায় ও টাইপে—যেমন ঞ, হ, ঞ, শূ, হ, ঞ, ক, ক, ক, ক, ক ইত্যাদি। এইসব যুক্তাক্ষর লেখা, মুদ্রণ ও টাইপে সমতা আনার প্রয়োজনীয়তা সঘনো আলোচনা হয়। টাইপ-রাইটার ও মনো-কী-বোর্ডের ছকে বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করা হয়। একাডেমির এই প্রয়াস খুবই সমরোচিত এবং প্রশংসার্হ। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই এ সমস্যা মুদ্রকরা একক ভাবে সমস্যাগুলি তুলে ধরেছেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে। বাংলা মনোটাইপের ছকটি যে বর্ণমুদ্রক ও একান্ত অবৈজ্ঞানিক এ-বিষয়ে লেখক ১৯৪৮ সালের শুরুতেই বিলাতে মনোটাইপ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহিত্যিকরা মুখ্যত বানান সমস্যা ও টাইপ রাইটারের বিষয়ে সংবাদপত্রে মধ্যে-মধ্যে আলোচনা করছেন। কিন্তু সাহিত্যিক, বহুবিদ ও মুদ্রকের যৌথ আলোচনা এই প্রথম। সাহিত্য একাডেমি এ বিষয়ে যথাযোগ্য পথপ্রদর্শকের কাজ করলেন।

আলোচনার শুরুরপাত হইতে মজ। তবে সমস্যা অনেক ব্যাপক হলেও সমাধান দুঃসহ নয়—যদি আমরা নীতি সঘনো একমত হই।

প্রথম, একই যুক্তাক্ষরের বিভিন্ন রূপ। শূ, ঞ, ক, হ, হ, ইত্যাদি। টাইপরাইটারের কী-বোর্ডের মধ্যে বাংলার সব অক্ষরকে স্থান দিতে গেলে

বর্তমান কী-বোর্ডে ২২টি অক্ষরের বদলে ৫০০-র অধিক করতে হয় এবং আকার বাড়িয়ে চতুর্ভুজ অর্থাৎ প্রায় চার হাত আকারের করতে হবে। তেমন টাইপরাইটারে দু-হাত প্রসারিত করে টাইপ করতে হবে। কিংবা উ-কারাদি বর্ণের পরে বোপ করতে হবে, ঠিক নিচে দিতে গেলে তেড়-কী করে টাইপের পড়িকে ত্বর করতে হবে। কিন্তু ছাপার অক্ষরের এ অসুবিধা নেই। বসত ইচ্ছা অক্ষর বাড়ানো যায়। বর্তমানে মুক্তাক্ষরের সংখ্যা ৪৩২, এবং একমাত্র উ-কারাঙ্ক মুক্তাক্ষরের সংখ্যাই ৭০, যদিও মূল বর্ণ ৫২টি মাত্র। ছাপায় কেন্দ্রে এই বিপুল অক্ষর সমস্তা সবচেয়ে পড়ে আলোচনা করব।

স্বাধীনতার দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই উ-কারাঙ্ক মুক্তাক্ষরের বিশেষ রূপগুলি অদৃষ্ট হয়েছে। ছাত্র শিক্ষক কেউই আর শু লেখেন না, লেখেন শূ। এ-অন্তে কোনো কতোয়ার প্রয়োজন হয় নি। বোধহয়, অল্প সময়ে বেশি লেখানোর তাগিদেই এই বিশেষ রূপগুলি লোপ পেয়ে গেছে অলক্ষ্যে এবং বিনা প্রতিবাদে। ভালই হয়েছে—অতীতে বোড়ার পাতার পৌঁছে আমাদের অনেকের পা ভেঙে যেত, ইংরেজি শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটত কার্ট বৃকের বোড়ার পাতাতেই। মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্রচুর উপকারের সম্ভাবনায় এই উ-কারাঙ্ক অক্ষরকে বিয়ুত করে লেখা ও টাইপ করার প্রচলন। উ-কারাঙ্ক ও ফলা বৃক্তের বিশেষ রূপ অদৃষ্ট হয়ে গেছে লেখা ও টাইপ করা থেকে। যা মুক্তিযুক্ত তাই ঘটেছে নিঃশব্দে। বাকি সমস্ত বৃক্তবর্ণের বিশেষ রূপের বিলোপ সাধনে কোনো অসুবিধা ও অসহ্য থাকার কথা নয়। হ-র আয়গায় হু, হ-র আয়গায় হু, হ-র আয়গায় হু আপনো থেকেই এসে গেছে। এখন প্রয়োজনে শুধু এগুলিকে এবং মুক্তাক্ষরের বিশেষ রূপকে বর্জন করার নীতিকে রীতিবদ্ধ করা। লেখা বা ছাপায় মধ্যে এগুলিকে বেন অপরাধীর মত কুণ্ঠিত তাবে না আসতে হয়—বীর মর্মান্বাজে আহুক এইটুকু কার্য।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ছাপার অক্ষরে হাতে কম্পোজের ক্ষেত্রে (হাতে বহু পাঠ্যপুস্তক ছাপা হয়) মোট মুক্তাক্ষরের সংখ্যা (লাইনো কম্পোজের ক্ষেত্রে অক্ষর সংখ্যাগুলি পাশেই বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল) ৪৩২ (১১৩), এর মধ্যে উ-কারাঙ্ক ৭০ (১৭), উ-কারাঙ্ক ৩৫ (৪), ই-মুক্ত ৮ (০-লাইনোতে ই-কার, ঈ-কারের মাধ্যমে প্রসারিত নয় বলে পাশে বসালে কোনো অসুবিধা হয় না)। ই-মুক্ত ১৭ (১—ঈ); ক, খ, ব, ল ও

নিচে না-রেখে পাশে বসালে পাইকার ২৪-এম ২৬ লাইনের প্রতি পাতার মাঝ ৮৯এম মতো (প্রতি ২৬ লাইনে ৬ লাইন বা তিন পাতার এক লাইন) আরপা বেশি লাগবে। আর উ-কার প্রতিটি পাশে বসালে আরও অনেক বেশি আরপার সাশ্রয় হয়। এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

২। উ-কারান্ত ছাড়া উ-কার, ঞ, ব, ঝ-ফলা ও ধ-যোগে বর্ণের যে বিশেষ রূপগুলি চলে আসছিল তার ব্যবহার ইতিমধ্যে উঠে গেছে। যেমন ঙ, ঙ্গ, ঙ্গ, ঞ, ঞ্গ, ঞ্গ, ঞ-এর বদলে র্, ক্, দ্ব, না, ঙ্গ, ঞ্গ ইত্যাদি লেখাও ছাপা চলেছে। একই নীতিতে ত-যুক্ত বিশেষ রূপগুলি বাদ দেওয়া যায়। অর্থাৎ জ, ঞ, না লিখে ত্, ত্ লিখলে ক্ষতি কি? আমরা কত বাদ দিয়ে কত লিখছি, ত-র আরপার তততে দোষ কি; দ্ব, ডড, চচ চলছে। তত চললে কি অশুদ্ধ হবে?

৩। উ-কারাদি ছাড়া যে-যুক্তবর্ণ আছে তার সংখ্যা ১১২টি। লাইনোতে এই সংখ্যা বহুলাংশে কমানো হয়েছে হাক-বন্ডি বা অধ-অক্ষরের উদ্ভাবন করে। ব্যঞ্জনবর্ণের অধ-বর্ণ ব্যবহার করলে যুক্তবর্ণের সমস্তা একেবারে মেরটানো যায়। এতে ১১২টির বদলে মাত্র ২৪-টি অধ-বর্ণের প্রয়োজন হবে।

৪। বাংলা অক্ষর সাধারণত জি-স্তর। উপরের স্তরে ই-কার যেক-আদি, মধ্যে বর্ণের মূল কাঠামো আর নিচের স্তরে উ-কার, ঞ, ঝ-ফলা আদি। এই জি-স্তরের অন্তর্গত বাংলা বই-এ প্রতি লাইনের পর সিকি বা আধ লাইনে ফাঁকা রাখতে হয় লেডের সাহায্যে—ইংরাজিতে এর ব্যবহার অপরিহার্য নয়। এই লেড না-দিলে ওপরের লাইনের উ-কারের সঙ্গে পরের লাইনের ই-কার জুড়ে গিয়ে ছাপার সময় অনর্থ সৃষ্টি করবে। প্রতি লাইনের পরে এই লেড বা ফাঁক রাখার অন্তে ১০০ পাতার বই ১৫০-এ পাতায়। ফলে, ছাপার খরচ বাড়ে, কাগজের অপচয় হয়।—অক্ষরের এই তিনটি স্তরের মধ্যে একটি (তৃতীয়) বাদ দিতে পারলে, অর্থাৎ উ-কারাদি বর্ণের পাশে দিলে (নিচে না দিয়ে—যা লাইনোটাইপে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে) মুদ্রণ ও কাগজের ব্যয় অনেকাংশে কমানা যাবে, মুদ্রণ ক্ষততর হবে, কম্পোজ করার ব্যয় হ্রাস সাশ্রয় হবে।

৫। এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। বাংলা টাইপ কেস বা অক্ষর-ডালার সংখ্যা ও লে-আউট বা অক্ষর বিস্তার। ইংরাজি ভাষা বা রোমান অক্ষরে হাতে কম্পোজের টাইপ-কেস বা অক্ষর-ডালা দু-টি—আপার ও লোয়ার কেস। বাংলা কম্পোজ করতে আপার,

লোয়ার, রাইট ও লেফট এই চারটি কেস কম্পোজিটারকে হাতড়াতে হয়। ফলে, ইংরাজির তুলনায় বাংলায় কম্পোজের গতি কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ কমে যায়। অর্থাৎ মাতৃভাষাতে কম্পোজ করলে বিদেশী ভাষার চেয়ে শতকরা ২৫ ভাগ বেশি সময় লাগে। অর্থাৎ এই চারটি কেসকে কমিয়ে ছুটিতে আনা মোটেই অবাস্তব নয়। এই চারটি কেসের মধ্যে রাইট, লেফট, ও আণার এই তিনটির প্রত্যেকটিতে ১২৮-টি করে ৬৮৪টি ধোপ আছে, আর লোয়ার-কেসে ৫২-টি নিয়ে মোট ৪৩৬টি ধোপে বিভিন্ন অক্ষর রাখা হয়। ইংরাজি কেসে ধোপের সংখ্যা ১৮০। সহজেই অনুমান করা যায় ভাষার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ৪৩৬-টির বদলে ১৮০ ধোপ থেকে অক্ষর তুলে কম্পোজ করতে গেলে সময় অনেক কম লাগবে। কিন্তু এহ বাহু। সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হল আমাদের বাংলা লোয়ার-কেসের বিভিন্ন ধোপে অক্ষরের লে-আউট বা স্থানবিন্যাস আমরা হবহ একেবারে অস্বাভাবিক ইংরাজির অনুকরণে করেছি। এবং তা চলে আসছে কেয়ী সাহেবের আমল থেকে। আর একটু বুঝিয়ে বলি। ইংরাজি লোয়ার-কেসে বেধানে টি, বাংলা কেসে সেই ধোপে ত রাখা হয়েছে। এইভাবে এল স্থানে ল, বি-তে ব, এম-এ ম, সি-তে ক, এন-এ ন, ডি-তে দ, এ-তে অ, আর-এ র, ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে হয় কেয়ী সাহেব ধর্ম-প্রচারের জন্তে বাংলা মূদ্রণ প্রবর্তনের সময় ইংরাজি-নথিক দিয়েই বাংলা কম্পোজ করতে চেয়েছিলেন যাতে বাংলা অক্ষর বিন্যাস মনে রাখা সহজ হয়। এ ছাড়া ইংরাজির অনুকরণে বাংলা লোয়ার-কেসের বিন্যাসের আর কোনো কারণ পাওয়া যায় না। আজও এই বিন্যাস বিভ্রান্তাগরী বা বড়তলা-সার্ট এই উভয় নামেই প্রচলিত হয়ে আসছে প্রতি ছাপাখানায়। আগে ইংরাজিতে কম্পোজ করতে শিখলে বাংলা কম্পোজ করতে আর নতুন করে লোয়ার-কেসের লে-আউট মুখস্থ করতে হবে না—এটা আপাতত একটা লাভ মনে হতে পারে। প্রায় থেকে যায়, বাংলা লোয়ার-কেসের ৫২-টি অক্ষরের লে-আউট মনে রাখা কি খুবই সময় সাপেক্ষ বা শ্রমের অপচয়। তথাকথিত লাভের কথা বলেছি। এবার ‘লাভের গুড়ের’ কথা বলি।

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, যে-কোনো কী-বোর্ড লে-আউট বা অক্ষর-বিন্যাস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করতে হয়। আর এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল ভিত্তি হল ভাষার সেই অক্ষর ব্যবহারের শৌনঃপুনিকতা। অর্থাৎ

যে অক্ষরটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়, কম্পোজিটারকে বারবার যে অক্ষরকে খোপ থেকে তুলতে হয়, তাকে সবচেয়ে অবিধাজনক আয়নার কম্পোজিটারের হাতের সবচেয়ে কাছে রাখতে হবে। এইজন্তে ইংরাজি টাইপরাইটার বা মনোটাইপ কী-বোর্ডে বিভ্রাস বর্ণানুক্রমিক বা এ-বি-সি-ডি-ই এই ক্রমে না হয়ে কিউ ডবলুই আর টি ইত্যাদি ক্রমে রাখা হয়েছে। ইংরাজি লোয়ার-কেসের বিভ্রাসও তাই বর্ণানুক্রমিক না করে পৌনঃপুনিকতা লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। অথচ বাংলার ক্ষেত্রে এর কোনো চেষ্টাই করা হয়নি আজ পর্যন্ত, কেবল সাহেবের পর এই হুদীর্ঘ সাধারণতাত্ত্বিক কালেও। ইংরাজি টি আর বাংলা ত-এর পৌনঃপুনিকতা বা এল ও ল-এর, ডি ও দ-এর, এম ও ম-এর পৌনঃপুনিকতা যে এক হতে পারে না এ বিষয়ে কোনো গবেষণার প্রয়োজন হয় না। বাংলা কম্পোজিটারের হাতে অথবা তার চাপান হয়েছে এই ইংরাজি ভাবান্তরিত বাংলা অক্ষরে ডালা হাতড়াবার জন্তে। যে-অক্ষর বেশি এবং বারবার প্রয়োজন তাকে রাখা হয়েছে ঘূরে। পৌনঃপুনিকতা-ক্রমে কেবল অক্ষর-বিভ্রাস করলে বাংলা কম্পোজিটারের প্রতিবেশ ইংরাজির তুলনায় কম ত হবেই না, বরং বেশি হবে। আর এর ফলে বাংলা মুদ্রণ-ব্যয় অনেক কমে যাবে। আধুনিক বাংলা টাইপরাইটারের কী-বোর্ড পৌনঃপুনিকতাত্ত্বিক বলে টাইপ করার গতি অনেক বেড়েছে।

বক্তব্যগুলির সারাংশ করলে,

১। উ-কার ইত্যাদি বা ফলা-যোগে সমস্ত যুক্তাক্ষরের বিশেষ রূপ একেবারে বর্জন করা হোক। প্রদত্ত ইংরাজিতে যুক্তাক্ষর বা লিগাচারের সংখ্যা পাঁচ-এ কমিয়ে আনলেও শেষ পর্যন্ত সেই পাঁচটি যুক্তাক্ষর যথা এক-আই, এম-এল, এফ-এল-আই, এক-এফ-এন, এক-এফ-এল-আই বর্জন করা হয়েছে। সব বিযুক্ত করা হয়েছে সম্প্রতি অপ্রয়োজনের যুক্তিতে এবং উৎপাদন বাড়াতে।

২। উ-কারটি বর্ণের নিচে না-রেখে পাশে রাখা হোক।

৩। জি-স্তর অক্ষরকে বি-স্তর করা। এর জন্তে উ-কারটিকে একটু ওপরে তুলতে হবে—কিংবা টাইপ কেসকে সুাইজ বা বড়ির তুলনায় ছোট করতে হবে। লাইনোতে পাইকা বাংলা আর ফাউণ্ড্রির পাইকা অক্ষরের উচ্চতা এক নয়। লাইনো পাইকার বাংলা অনেক ছোট-পাইকা বা ১২ পয়েন্টে ১০ পয়েন্ট মাত্র।

৪। সংযুক্ত বর্ণের হাকবন্ডি বা আধ অক্ষর দিয়ে করা হোক। লাইনোতে অধিকাংশ সংযুক্তবর্ণের প্রথম অক্ষরটিতে হাকবন্ডি দেওয়া হয়।

৫। বাংলা টাইপ কেসের সংখ্যা চার থেকে কমিয়ে দুই-এ আনা হোক।

৬। বাংলা লোয়ার-কেসের পুনর্বিণ্যাস করে পৌনঃপুনিকতা ক্রমে করা হোক।

বক্তব্যের বৈধতা সত্যিকার হতে পারে একথা মনে রেখেও আরও দু-একটি প্রশ্নের অবতারণা না-করে পারছি না। প্রথমতঃ বাংলা অক্ষরনকশা বা টাইপ-কেসের দারিদ্র্য। আমাদের টাইপ-কেস একটাই বলা চলে। ইংরাজিতে মুদ্রিত বিষয়বস্তুর প্রভেদে, এমন-কি মুদ্রণ-পদ্ধতির বিভিন্নতার বিশেষ টাইপ কেসের ব্যবস্থা আছে।

সেরিক বা মাজার তারতম্যে কিংবা মাজাহীনতার বহুবিধ টাইপ কেস আছে। বাংলার কিছু সবেশন নীলমণি। আমরা পাজিতে যে টাইপ কেস ব্যবহার করি রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও একই টাইপ কেস ব্যবহার করা ছাড়া গতানুগতিক নেই। লেটার প্রেস, অফসেট, ফটোগ্রাভিওরা, যে-পদ্ধতিতেই ছাপি না কেন, এন্টিক, আর্ট বা নিউজপ্রিন্ট প্রভৃতি যে কাগজই ব্যবহার করি না কেন, বাংলা টাইপ কেস আমাদের একমেব। ইংরাজিতে সহস্রাধিক টাইপ-কেস ডিজাইন ও প্রবর্তনে সংবাদপত্র ও টাইপ ফাউন্ড্রির অবদান প্রভূত। সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান মূলতঃ মুদ্রণ-ব্যবসায়ী। সাংবাদিকতার সহৎ-আদর্শের প্রতি তাঁরা একনিষ্ঠ থাকলেও, মুদ্রণের প্রতি আর-একটু অহুসারাগ, একটু প্রত্যাশা, একটু কর্তব্য থাকার আশা করা অস্বাভাবিক নয়। বাংলার নতুন-নতুন টাইপ কেস প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রকে অহুসারোগ করছি। এবিষয়ে টাইপ-ফাউন্ড্রি বা অক্ষরব্যবসায়ীরও কর্তব্য আছে। বাংলার মুদ্রণ জগৎ চিনির বলয় হয়েই আছে—তাকে একটু মর্যাদা দেওয়া হোক। বাংলা সাহিত্যে বারা লঙ্ঘপ্রতিষ্ঠ বা প্রতিষ্ঠাকামী, বাংলা সাংবাদিকতা বাঁদের উপজীব্য তাঁদের কাছে বাংলা মুদ্রণ একটু মনোযোগ প্রার্থনা করছে। উপেক্ষা আর বীতরাগের জ্বাল পুড়ীফুট হয়ে এসেছে। স্বাধীনতার তৃতীয় দশকের মধ্যে অন্তত কিছুটা আরম্ভ করা যাক।

কাঠের ঘোড়া

সুব্রত মহান্তি

সুব্রত মহান্তি ওড়িশা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক—তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর উপভাস শীলপৈলর জন্য। National Book Trust of India কর্তৃক প্রকাশিত রেষ্ঠ উড়িয়া গল্পের সংকলনে এই গল্পটি স্থান পেয়েছে।—সম্পাদক

বৈশ্ববের গল্প আছে? যদি থাকে, সেটা হচ্ছে সোমর লিথু আন্টিনা আর মধুমালাতী ফুলের মোশারেশি এক গল্প।

বেদনার ভাষা কি? নিত্যক্স বিপ্রহরে দূর প্রান্ত থেকে ভেসে আসা বাণির আলাপ।

স্মৃতির রং? দূর শাহাড়ের নীলিনা! আর অন্ধর রূপ? রাতি শেষের মলিন জ্যোৎস্না। এই-রকম ভাবে বিভিন্ন অরূপ বস্তুর গুণ নির্ণয় করে একটা অভিধান তৈরি করা বিজনবিহারীর ‘হবি’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নেশাতে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি, ধীরে ধীরে বাণকোয় ছায়া নেমে এসেছে তাঁর জীবনে। হৃদয় কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করে, প্রথম যৌবনের সেই ক্ষুদ্র সহরটাতে অনেক বছর পর তিনি এসেছেন কিরে। এই সহরের সূর্য্য, মন্দির, চা দোকান, রেস্তোরাঁ, বার প্রভৃতি স্থানে ও অস্থানে যোরবার সময় স্মরণাত হতেছিল তাঁর এই ‘হবি’র। তারপর চরিত্রহীনতার অপরাধে কলেজ থেকে বহিষ্কার। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজের মাসোহারা বন্ধ, সেই ক্ষুদ্র সহরের লোকসমাজে নিম্না ও ষিকার প্রভৃতি নানা ঘটনা বিজনবিহারীর জীবনে সেদিন গিরেছিল ঘটে। এরপর, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন সহরে ঘুরে, ফুটপাথ আশ্রয় করে বিজনবিহারী মাছুষ হয়েছেন। কিন্তু সব আয়গাতেই সেই ‘হবি’র অন্ত একই অহুসদ্ধান ও জিত্রাসা—প্রথম চুখনের রূপ কি রকম? বিদ্যায় বেখার মত আঁকা বাঁকা? মৃত্যুর বর্ণ কি? নীল না ঘোর কালো?

এই তো সেদিন উত্তরপ্রদেশের সেই দূর সহরের কর্মক্ষেত্র থেকে বিদ্যার

নিজে যেনে চড়বার সময় জানতে পারলেন যে বিহারের যদি কিনি থাকে তবে সেটা হচ্ছে ট্রেনের ইঞ্জিনের ভইনিল। দীর্ঘ পচিশ বছরের কর্মক্ষেত্র থেকে বিহার বেলায় স্টেশনে এসেছিল এক কেরলী ঐস্টান, যে ছিল তাঁর একাধারে ধানসারি, বাবুর্চি ও বন্ধু। ট্রেনটা সিগ্‌নাল পোস্ট অতিক্রম করা পর্বত সেই বন্ধু তার ময়লা কালটা প্রাণপণে নাড়াক্সিল। বিহারের রূপ কি? হলানচড়া একটা ময়লা কাল ?

প্রথম যৌবনের সহরে কিসে এসে বিজনবিহারীর মনে হল এ যেন একটা ভিন্ন সহর—সেদিনের সেই অতি পরিচিত সহর নয়, যে সহরের পথে পথে তিনি শুরু করেছিলেন জীবন-জিজ্ঞাসা। স্টেশনে নায়া মাত্র তিনি স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন এ এক ভিন্ন সহর। কোথায় গেল সেই ককালসার ঘোড়া টানা বসি গাড়ি, যে গাড়ির কোচড্রানের কুর্নিশে জেগে উঠত মধ্যযুগীয় আড়ম্বরের চেতনা—ধরবারি কানাড়ার রেশ ? এখনকার মিটারযুক্ত ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে সেই কুর্নিশ করবার সৌজন্য আর পাওয়া যায় না, তার আচরণে বলতে গেলে রক্ততাই প্রকাশ পায়।

সে ট্যাক্সি চালার ট্যাক্সি আরোহীর মত জীবিকা অর্জনের তাড়নায়, আপেকার দ্বিনের কোচড্রানের মতো জীবনচর্চার বিলাসে নয়। জীবন ও জীবিকার মধ্যে সেই মধ্যযুগীয় নিবিড়তা বিহার নেবার সঙ্গে সঙ্গে বিহার নিয়েছিল শান্তি আর সৌন্দর্য বৈচে থাকার প্রক্রিয়া থেকে।

এটা একটা অজানা সহর। এই জায়গাতেই না ছিল হর্ষবর্ডন মেস ? কিন্তু এ যে দেখা যাচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। ঐ স্টোরের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকা লিপ্‌ষ্টিকমুখী, হৃৎকেশী সেলসগ্রাল কি জানে এইখানেই একদিন ছিল হর্ষবর্ডন মেস, যার ম্যানেজার ছিল পৌবর্ধন হাস, যিনি ছিলেন এক সরকারি অফিসের বড়বাবু, যার সময় 'কাঁট অফিস অয়ে স্কেসের তহারকিতে, আর তার মধ্যে নিজের পূজা পাঠে ? নিঃশব্দ, নিঃশব্দ জীবন !

‘ও আপনি শাড়ির ভ্যারাইটি খুঁজছেন। ঐ কাউন্টারে ঘান, বেশ ওয়াইড রেঞ্জ পাবেন।’

‘কস্‌মেটিক্স ? এ কাউন্টারে নয়।’

এটা সেই তিন নম্বর রুম, যেখানে ছিল পৌবর্ধন বাবুর আত্মনা—চমকুটিতে লেখা ছিল—No admission for the public. শান্তির নিবাস। ঘরের এক অন্ধকার কোণে হরিণের ছাল, কমণ্ডলু, হুঁসানি প্রভৃতি পূজাপাঠের সামগ্রী, তার পাশেই একটা জলচৌকির ওপর অফিসের কাইল আর মেসের হিসাব।

মেন্টা আর নীলু সাহর 'আদর্শ মিটার ভাণ্ডার' ছিল একেবারে পাশাপাশি। দোকানটার সামনে একটা লেখা বুলন্ত—'আজ নগদ কাল বাকি।' সব ঘোষণার মত এই ঘোষণাটিও পালিত হত তার অহুসরণে নয়, তার ব্যতিক্রমে—আমাদের মত রিক্ত ব্যক্তিদের জন্য। কালো বুল আর মাকড়সার আলো নীলু সাহর আদর্শ মিটার ভাণ্ডারের ভিতরটা আলিবারার জ্বার মত। দেয়ালে চপ্‌খড়িতে লেখা খাতকের বাকি হিসেব। একবার ঘটনাক্রমে সেকম্পীয়রের গুরো রচনাবলি দোকানে বাঁধা দিতে হচ্ছিল—দেখাওঁদিতে ছই সের-রসগোলা খেয়ে—হাতে পয়সা ছিল না। সেকম্পীয়র 'ট্রেজেরি' নাটকের কি 'ট্রেজেরি'। দোকানদার আর বাকি রাখতে চাইল না সেদিন। কারণ, বিজনবিহারীর বাকি হিসেবে দেয়ালের ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত ভরে গেছিল। সেকম্পীয়র সেই যে বাঁধা পড়েছিল, নীলু সাহর কবল থেকে তার আর মুক্তি হয় নি। এখন সেই স্থানে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত একটি সিনেমা হল। ম্যাটিনিতে দেখান হচ্ছে একটা আমেরিকান ছবি। সম্পূর্ণ উল্লী অভিনেত্রীর ছবি। ছবির নাম—'The night is dark'—for adults only. ছইজন পলিতকেশ বৃদ্ধ প্রাচীরপাতের সেই ছবি দেখছিল।

এ-যুগ নপুংসক স্ত্রীঘর যুগ। সেই অস্ত্র যৌনচর্চার এইরকম উত্তেজক বিজ্ঞাপন না দেখলে সৃষ্টিক্রিয়া বোধহয় অচল হয়ে-পড়ত। স্বাধীনতার পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী বোম্বার লালিত ও পরিবর্তিত বশিকনন্দনের মত ক্ষীত হয়েছে এই সহর, বিজনবিহারী এখানে সম্পূর্ণ অজানা আগন্তুক।

কোথায় গেল রাত্তার ধারের সেই জ্বলা ফুলের ঝাড়? কোথায় বা সেই বাঁশের বন, যেখানে প্রতি মধ্যাহ্নে বিজনবিহারী স্তনতে পেতেন পায়রার বক্বকম, ঘুঘুর ভাক? আজ সেখানে দাঁড়িয়েছে পাঁচ-সাত মহলা বাড়ির অস্ত্র তার ক্ষুধিত লোহকাল প্রাগৈতিহাসিক রক্তমুখী দেবতাদের মতো। সেই লোহকাঠামোর আবেপানে শ-শ-কুলির ঝুপড়ি।

সেদিন তাই এ অজানা অস্ত্র সহরে বিজনবিহারী তাঁর বিগতদিন ও পরিচিত ব্যক্তি খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ এক গলির মোড়ে সেই বহুপরিচিত ফুল-গুলাকে দেখতে পেয়ে যেন অকুলে কুল পেলেন।

গত ত্রিংশ বছরের সবরকম পরিবর্তন, বিবর্তন, মহামারী, বড়ক ও যুদ্ধের ঋণ্য থেকেও এই ফুলগুলা যেন অপরিবর্তিত থেকে গেছে, কুল ভালা নদী-তীরের বুড়ো শিরীষ গাছের মতো।

বিজনবিহারীকে সে কি চিনতে পেরেছে? "চপহার কাঁধের ভেতর দিয়ে

তার চোখচুটো দেখাছিল মরা মাহের মত ক্যাকাসে, প্রাণহীন। পাকানো গৌরুজোড়া সাধা হয়ে গেছে, কিন্তু অতীতের স্মৃতি এখনও বহন করে আছে। তিরিশ বছর আগে এই জাবগাটাতে বেল ও বকুল ফুলের মালা একটা কাঠিতে ঝুলিয়ে নিয়ে বেরনভাবে সন্ধ্যাবেলা দাঁড়িয়ে থাকত, আজও সে তেমনিভাবে ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

‘একটা গৌড়ের মালা দাও তো। না, না, ছুটো দাও। দায় কত?’

‘বার আনা, মানে পঁচাত্তর পয়সা।’

‘পঁচাত্তর পয়সা?’

‘মাহুয়ের জীবন ছাড়া সব কিছুই দাম বেড়ে গেছে। পঁচাত্তর পয়সার কমে হবে না।’

‘খুচরো নেই? আচ্ছা, তবে টাকাটাই রেখে দাও। আমাকে চিনতে পারছ তো? মনে পড়ে না? ভাল করে মনে কর তো? কিশোরী বান্ধিরের ঘর এই গলিতেই ছিল না কি?’

অনেক বছর পর এক পরিচিত মুখের সন্ধান পেয়ে, ফুলওয়ালার দেখা কৃষ্ণিত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—জলের ঢেউ এর ওপর স্বর্ধকিরণের মত। ফুলওয়ালার বুড়াকে অন্তরঙ্গ করে নিতে বিজ্ঞবিহারীর আর মোটেই দেরী হল না। তিনি বুড়োর হিকে এগিয়ে ধিলেন একটা সিগারেট।

চৈত্রমাসের বেল ফুল—তার গছের একটা রূপ আছে—সে রূপ সকাল বেলায় উচিতার, দ্বিত্যার, অগাপবিহ কৈশোরের রূপ।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় সেই বুড়োর কাছ থেকে গৌড়ের মালা কেনা বিজ্ঞবিহারীর এক নিত্যকর্মে পরিণত হোল।

ফুল কেনবার অবসরে ঐ বুড়া ফুলওয়ালার ছাড়া যে-দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে বিজ্ঞবিহারীর পরিচয় হয়েছিল, সে একজন ২০১২৬ বছর বয়সের এক যুবক। সেও ফুল কেনবার অন্ত প্রতিনিধি ঐখানে আসত একটা ফুটার চড়ে। তার পরনে থাকত একটা নীল রংয়ের প্যান্ট, টেরিলিন শার্ট, গলায় লাল ক্রমাল। তার চুলগুলো কিছু কৌকড়ান ঐ সহরের একজন বিটনিক।

বিজ্ঞবিহারী সেই বিটনিকের সাথে আলাপ করবার উদ্দেশ্য করতই দেখতে পান তার ফুটার জুড় গর্জন করে সিটি হোটেলের বোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। একদিন বিজ্ঞবিহারী ফুলওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন—‘ঐ বাবুটি কে? রোজই তো দেখি তোমার কাছ থেকে ফুলের মালা কিনে নিয়ে যায়’। ফুলওয়ালার উত্তর ছিল—‘এ ছনিয়ায় টাকার খেলা। পয়সা ছাড়া

এখানে কে বা কাকে চেনে? ফুলগুলা বুড়োও একজন দার্শনিক। -‘নাও এই সিগারেটটা, তোমার নামটা যেন কি’? ‘বনগুয়ারী।’ বনগুয়ারীলাল নামটা ফুলে গেছেন বাবু। নামটা বলে ফুলগুলা হেসে উঠল কি জানি কেন! ‘কিশোরী বাইয়ের ঘরে আজকাল কারা থাকে?’—বিজনবিহারী জিজ্ঞেস করলেন।

সেই বিগত দিনে বনগুয়ারী ছিল এই গলির চলন্ত গেজেট। কার ঘরে কে আজ গেছে, অথবা আসবে, কার ঘর আজ খালি আছে, সেইসব ব্রতান্ত গলির মোড়ে পাড়িয়ে থাকা বনগুয়ারীর কাছ থেকে পাওয়া যেত। এই সব খবর দেবার জন্য বনগুয়ারী ফুলের মালার উচিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য নেবার কোন প্রয়াসই পেরে না। সেই অতীত দিনের ফুলে ধাপ্পা স্বস্তির ছায়ায় বনগুয়ারীলাল যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। বিজন বিহারী আবার জিজ্ঞেস করলেন সেই অবান্তর প্রশ্ন—‘কিশোরী বাইয়ের খবর কি?’ বনগুয়ারীলালের বোঝা হাসি শুনে বিজন বিহারী অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন, যেন প্রশ্নটা করা তাঁর উচিত হয় নি।

কিশোরী বাইয়ের মুজরাতে বছবার শোনা ‘ছান্দ’, ‘চৌপরি’ সব যেন মুহূর্তে হয়ে উঠছিল বিজনবিহারীর মনে—‘বন্ধু মাগনি এতে কিরে’, ‘জান খাও মেয়ে পরদেশিয়া’—ভৈরবী ধুঁকী।

বনগুয়ারী বলল—‘মিউনিসিপ্যালিটির লোক সহরকে নির্মূল করার জন্য অনেকদিন হল পুয়ের এখান থেকে উঠিয়ে দিয়েছে। একজন কিশোরী বাইয়ের আয়গার শ’শ’ কিশোরী বাই’। বনগুয়ারী আবার অট্টহাসি হেসে উঠল, সেই হাসিতে বিজনবিহারী আতঙ্কিত এই ভেবে যে সেই কুখ্যাত গলির মোড়ে তাঁকে কেউ দেখে কেলল নাকি! তাঁর অবচেতন মনে সেই আশঙ্কা থেকে গিয়েছিল।

একটা দারি মোটর পাড়ি সেই গলির ভিতর ঢুক গেল। বিজনবিহারী প্রসন্ন করলেন—‘এ গলিতে এখন কারা আছে, বনগুয়ারী? কমলা, রাধা, ভুবনমোহিনীর দল সব গেল কোথায়?’—জিব কামড়ে বনগুয়ারী জবাব দিল—‘এ গলি কি আগেকার সেই গলি আছে বাবু? এখন এটা একটা রোড—একজন নেতার নামে। কিশোরীবাইয়ের জিটেতে এখন একজন নামজাদা উকিলের বাড়ি, ভুবনমোহিনীর বাড়ির হাতার আর যেখানে বকুলতলা ছিল, সেখানে হয়েছে এক নেতার আস্তানা, তার উল্টোদিকে খবরের কাগজের এক বড়বাড়ি। এখন এখানে বড় বড় লোকের আস্তানা।’

কিশোরীবাদী প্রভৃতির দেহ ছিল গণ্য, কিন্তু তাদের প্রাণ ছিল অীবিকার উপরে, কিন্তু আজকের এই নতুন কিশোরীবাদীদের দেহ ও আত্মা—ফুটেই গণ্য, হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তর ভারতের সেই সহরে বিজনবিহারী বহু অক্ষত দেহ দেখেছিলেন কিন্তু অক্ষত আত্মার সন্ধান তিনি কোনখানে পান নি।

বমুনায় কথা মনে পড়ে গেল।

রিজ হোটেলের রিসেপশনিষ্ট—টোটে সোলাপি লিপস্টিক, গালে রক্ত পিঠি খোলা ব্লাউজ, পাখার ফুটো মুক্তার মালা, বব করা চুল। রিজ হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে বমুনাকে দেখা যায় ফুলদানিতে গন্ধহীন ‘কেনা’ ফুলের স্নান স্তবকের মতো। এই লোভনীয় বিভ্রাপনে আকৃষ্ট হয়ে বিজনবিহারী ওখানে এসেছিলেন দ্বন্দ্বী আত্মার সন্ধান, কিন্তু পেয়েছিলেন এক মক্ষণ লোভনীয় দেহ, ভিতরে কীটদৃশ্য আত্মা। পালায় বিমান ষাটির রক্তের খারে কঁকর বিছান এক নির্জন প্রান্তর। শুক্লা তিথির জোছনা মেঘের ওড়নার ভিতর থেকে বাড়ে বাড়ে উঁকি দিচ্ছিল লক্ষ্যবর্তী কিশোরীর মতো নিজেকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে। বমুনায় পরনে সেদিন ছিল এক চকোলেট রংয়ের শাড়ি। জোছনার আলোকের সাথে সেই শাড়ির রংয়ের ছিল এক অদ্ভুত সিম্ফনি। বমুনাকে দেখাচ্ছিল এক অশরীরি স্বপ্ন নারিকার মতো, কিন্তু তার চুই আঁখিতে ছিল সরীসৃপের স্মৃতি বহ্নিনিধা, বেটা পল্লববেশের সঙ্গে মোটেই খাপ খাচ্ছিল না।

‘তুমি প্রেমে বিশ্বাস কর বমুনা?’ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বমুনা বলেছিল—
‘আমি বিশ্বাস করি প্রয়োজনে’।

বনওয়ারীলালের কথাতো বিজনবিহারীর স্মৃতিচারণে বাধা পড়েছিল। বনওয়ারী বিজ্ঞানোচিত গাভীর্থ সহকারে বলছিল—‘কিশোরীবাদীদের দল যদি আজ এ সহরে থাকত, তবে তাদের পেট চালান দায় হত’—এই বলেই সে প্রাণখোলা হাসি হাসল। বিজনবিহারী ও বনওয়ারীর পুরোন দিনের স্মৃতির রোমন্থন বাধা গেল সেই ফুটার-আরোহী বিটনিকের হঠাৎ উপস্থিতিতে। সে ৫০ পয়সা দিয়ে একটা গোড়ের মালা কিনে নিয়ে চলে বাচ্ছিল, আলাপ করবার ইচ্ছে বিজনবিহারী তাকে উদ্বেগ করে বলে উঠলেন—‘এই যে, আপনার দেহি দেখে ভাবলাম, আপনি হয়ত আজ আর আসবেন না’। ফুটার-আরোহীর চোখ মুখে যে ভাব ফুটে উঠল তার অর্থ—অন্তের ব্যাপারে মাথা গলান কেন বাপু? ফুটার একটা গর্জন করে গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বনওয়ারীর শেষ মালাটা বিক্রি হয়ে যাওয়াতে সে স্নানি ভয়ে

একটা হাই তুলে নিজের পথে চলে গেল। বিজনবিহারীও একটা রিক্সা করে ছুটারের পিছনে ছুটে চললেন। আজ যেমন কবেই হোক ছুটার গুলাকে ধরতে হবে, আনতে হবে বেগমুলের গন্ধ কোন অবিশ্বরণীয় অতীতের স্মৃতি আগিয়ে তোলে ছুটারগুলায় মনে, কিসের আকর্ষণে সে প্রতিদিন ছুটে আসে বনগুহারীর কাছে বেগমুলের মালা কিনতে ?

ছোট্ট সহরটা ৩৩ অচেনা হোক না কেন, বিভিন্ন গলি ও উপগলিতে একদা যাওয়াতে অভ্যস্ত বিজন বিহারীর পক্ষে সেই লোকটাকে খুঁজে বার করতে ঘেরি হল না, তাকে পেয়ে গেল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ গলির ধারের ভিতর বারের সামনে ছুটারটি একটা কাঠের ঘোড়ার মতো ঠাঙিয়ে আছে। বিজনবিহারী তার নোটবুকের নম্বরের সাথে ছুটারের নম্বর মিলিয়ে দেখে নিলেন। আকাশি রংয়ের সেই বহু পরিচিত ছুটার। বিজনবিহারীকে ফাঁকি দেওয়া কি এতই সহজ ? ছুটার আরোহী হয়ত পড়েছেন জেমস বন্ড-গোয়েন্দা উপন্যাস সিরিজ। বিজনবিহারীও কম বান না এঙ্গার গুলাশেন, আগাধা কুটি প্রভৃতি তাঁর পড়া আছে।

বারের ভিতর থেকে ঢেকুর তুলতে তুলতে কয়েকজন বেরিয়ে এল, আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না, বারের সামনের গলি রাস্তা নিশ্চয় হয়ে গেল।

বারের ভিতর খরিকারের ভিড় ছিল না। একটা গোলটেবিল ধিঁয়ে তিনজন লোক মাথা নিচু করে বসেছিল, যেন কোন শোক সভাতে বসেছে। এ্যাস্ট্রের ভিতর থেকে পোড়া সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরে উঠছিল। বার কাউন্টারের অদূরে সেই ছুটার আরোহী একটা টেবিলে একা বসেছিল—সামনে একটা খালি মাল। গেলাসের দিকে তাকিয়ে সে কি ভাবছিল কে জানে ! তার সাটের বুকপকেটে পোড়ের মালাটা দেখা যাচ্ছিল। বিজন-বিহারী তার কাছে গিয়ে বিনীতভাবে প্রশ্ন করলেন—‘আমি এখানে বসতে পারি কি ?’ অভিব্যক্তিহীন ছুটি যেন কাচের চোখ বিজনবিহারীর মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। পরাক্রান্ত সৈনিকের মতো পা ছুটো লম্বা করে সামনের চেয়ারের ওপর রেখে সে বসেছিল—পায়ে তার ছুচের মুখের মত জুতো। সে পা ছুটো উঠিয়ে নিয়ে, চেয়ারটা পায়ে ঠেলে দিয়ে বললে ‘হ্যাঁ, বসতে পারেন। কিন্তু আপনার বিলের পয়সা আপনাকেই দিতে হবে’—তার কণ্ঠে ছিল ব্যবসারী-হুলুন্ড সাফ্ সাফ্ কথা। বিজনবিহারী প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন—‘নিশ্চয়, নিশ্চয়, শুধু আমার নয়, আপনারটাও আমি দেব।

বর.....আপনার কি চাই? আমার জিন হলেই চলবে—জিমলেট’।
নিম্পৃহকণ্ঠে লোকটি উত্তর দিল—‘বর জানে আমার কি বরকার’।

বিজনবিহারীর অস্ত্র বর নিয়ে এল একটা জিমলেট আর সেই লোকটার অস্ত্র একটা সেলাসে হুই পেস মাপের যে পানীয় সেটা বোধহয় স্বদেশী জিনিষ। তার উৎকট গন্ধ এক অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করল বলে বিজনবিহারীর মনে হল। লোকটি এক নিশ্বাসে সেলাসটা খালি করে অগ্নান বধনে হাত দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

বিজনবিহারী নিজের সেলাসটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে জিঞ্জের করল—
‘আপনি বেলফুল খুব ভালবাসেন, না? আচ্ছা বলুন তো বেলফুলের গন্ধ আপনার মনে কি ভাবনা আগিয়ে দেয়?’

লোকটি কোন উত্তর দিল না। আবার এক প্রান্ত জিমলেট ও লোকটির অস্ত্র স্বদেশী ‘ডোদকা’ এল। বিজনবিহারী তাঁর প্রাণের পুনরাবুত্তি করলেন—কারণ, আজ যে স্ববিধা পাওয়া গেছে, সে স্ববিধা আর নাও পাওয়া যেতে পারে—মূল্যবান তথ্যটি আজ আবিষ্কার করতেই হবে। অপ্রসন্ন কণ্ঠে লোকটি উত্তর দিল—‘আমি গোড়ের মালা কিনি কোনো স্বত্তির উদ্দেশ্যে নয়, মালা কিনি সেই ‘বিচ্’টার অস্ত্র—বেলফুল তার বড় প্রিয়’।

কে সেই বেলফুল প্রেমিকা ‘বিচ্’ আর কে এই নব্য মহাজন ‘ডগ’—বিজনবিহারী কিছুই বুঝতে পারলেন না। লোকটি নিজে থেকেই রহস্য উন্মোচন করে বলল—‘টেমিকোন অপারেটর মনীষা-মনি, আজ আসতে দেয়ি করছে কেন? কি জানি হয়ত আজ সেকেন্ড শো-তে সিনেমায় গেছে’।

বিজনবিহারী একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে খোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পেশাদার মনোস্তাফিকের মত প্রশ্ন করলেন—‘কার অস্ত্র আপনি মালা কেনেন তা কেনে আমার কোনো লাভ নেই। রোবনকালে আমিও ঐরকম বিচ্দের কামড়ে কম আহত হই নি; তবুও ওদের অস্ত্র গোড়ের মালা কিনতে হয়, ওদের অস্ত্র অপেক্ষা করতে হয়। রোবনের সেটা এক বৃত্তিগত ব্যাধি। আমার প্রাণ বেলফুলের গন্ধ আপনাকে কি মনে করিয়ে দেয়—কি সেই অতীতের ঘটনা ও পরিবেশ?’

আর একবার দেশী ডোদকা আনবার অস্ত্র বিজনবিহারী হতুস করলেন। বিজনবিহারী প্রগল্ভ হয়ে উঠছিলেন। তিনি বলে চললেন—‘আমার কথাই বলছি—বেলফুলের মৃদু গন্ধ আমাকে মনে করিয়ে দেয় অতীত দিনের পাড়া পায়ের এক ফুল বোর্ডিং, গ্রীষ্মকালের সকাল সবে শুরু হয়েছে, ঘুমন্তরা চোখ

কচলাতে কচলাতে ছায়া চলেছে জ্বালাম পণ্ডিতের পাঠশালাতে সকালবেলার প্রার্থনা করবার জন্য। শকা, সংকটহীন পৃথিবীর অপাশবিদ্ধ একটি সকাল; পাঠশালার আদিনার ফুটে থাকি রাশি রাশি বেলফুলের ফুলে দিনটি বেন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। আজও এক মৃত্যু বেলফুলের মধ্যে সেদিনের কথা হঠাৎ জেগে ওঠে আমার মনে। এমার বলুন তো, আপনার কি রকম মনে হয়।’

অকারণ কলঙ্কার সে লোকটা গর্জে উঠে বলল—‘আমি আজ সব কিছু ভুলতে চাই। আপনার মত ইন্ডিয়ট রাই অতীতের রোমন্থনের জন্য বেলফুলের মালা কিনতে পারে, কিন্তু আমি কিনি সেই বিচ্চার জন্য’। তারপর একটা অস্বাভাবিক হিকা তুলে সে টেলিফোন বুথে ঢুকে গেল বোধ হয় মনীষাকে ফোন করতে। চেয়ার থেকে টলতে টলতে উঠে ঘাবার সময়, তার পকেট থেকে মালাটা তুলে পড়ে গেল, কিন্তু এতো আগ্রহে কেনা ফুলের মালাটা উঠিয়ে নেবার ধৈর্য বা অভিনয় তার ছিল না। মালাটা তার জুতার তলে লুপ্ত হয়ে পড়ে রইল।

বিজনবিহারী বিসের টাকা মিটিয়ে বেরিয়ে এলেন। ফুটারটা তখনও পাড়িয়ে আছে কার্দের ঘোড়ার মতো।

নিম্নন আলোকে আলোকিত সেই গলি রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিল ঘূরের গুহা থেকে পড়ে থাকা কোন রোগীর বিষম মুখের মতো—ঐ নিদ্রাতে ছিল না ঘূরের প্রশান্তি, ছিল শুধু দুইটি ফুলের মধ্যে সীমাহীন বিরতি।

উড়িয়া থেকে অম্বাবা—অমির চক্রবর্তী

দারিদ্র্যের সীমা

অসিত ঘোষ

কাঁচা সড়কের বগল বেবে গরু পাড়িটা হড়হড় করে নেমে গেল মাঠে।
খুলো উড়িয়ে সামনের পথ আড়াল করে কেমন গৌয়ারের মতো গরু ছুটো
দৌড়াচ্ছে! মাঠে এবড়ো-খেবড়ো লিক হয়ে বাগুয়ার ফলেই হড়হড় শব্দ হচ্ছে
পাড়িটার, বাঁহুনিতে কানি বেয়ে ইট কথানা পড়ে গেল।

গাড়োয়ান ধেয়ালগু করে না। তাড়ি টেনেছে হয়তো।

এ-সময় তালপাতার ছাউনি পেতে তাড়ির দোকান বলে সামনের
চাটানটায়। সাঁওতাল বেয়ে-ময়দ বিকেল বেলায় তাড়ি গেলে, গান করে,
নাচে। ঢোলকের ডিমডিম শব্দ হয়।

কুপতি ইট ক-থানা একত্র করে জবল—‘কাছে লাগবে।’ পরক্ষণেই
চৌচিড়ে উঠল—‘হোঃ মাতাল হোয়েচ নাকি।’ গাড়োয়ান মাথা তুলে তাকাল
পিছন দিকে। ‘ইটগুলো লিবেনি?’

গরু ছুটো হাঁকিয়ে উঠেছে। সামান্য ইসারাতেই দাঁড়াল। ইটগুলো
একসঙ্গে একবারে নিয়ে যেতে পারবে না বলে ছুপাত ছুথানা ইট বারবেল
তোলার ভঙ্গিতে গাড়ির ওপর ছুড়ে দিল।

‘কায় ঘরে তুলবে গো?’

‘ইড়গালা কুতুদের ওধেনে!’

‘কুতুরা কবে বড়লোক হলো?’

‘ভাননি, ফাশুন বাসে মেয়ের বিয়া দিল, কত ধুম! ছেনাধের পালা
পড়েছে এখন, ঘর না করলেই লয়।’

তাহলে গরিব আমির হয়। আর আমির?

ভাবতে-ভাবতে মোড়ে এলো। এখান দিয়ে চলাকেরা করে। লোকজন বসে। ছু-পয়সার কারবার করে মাছুষ। তবু দুঃখ যায় না, না-বলতেই চুঘারে এসে পড়ে। সেবার বর্ষায় হুঘলের দুর্দশার সীমা ছিল না। পয়সার অভাবে, ছাউনি দিতে পারেনি ঘরের চালে। সারা বর্ষাটা চোখের জলেই ভেসে গেল। ‘আহা, এতগুলো ছেলেপিলে। ভূপতির ঘরে এক বর্ষার দিনে এসেছিল।

‘একটা বিড়ি দাও ত।’ ভূপতি বিড়ি চাইল।

‘পৃথিবীটা বদলে যাচ্ছে।’

‘একটুও নয়,...’ মাথা ঝাঁকানির বোঁকেই মত্তের জোয় প্রকাশ পাচ্ছে।

এ-নিয়ে বগড়া হয় হয়। ভূপতি হা-হা করে ওঠে। ‘কর কি তমক ?

‘তুমিই বল, বদলাচ্ছে, মোটেই না।’

‘বদলাচ্ছে।’ ভূপতি বলল।

এ-তল্লাটের সংঘাতস্ব নেওয়া হলো। কে কেমন ছিল, এখন কেমন রয়েছে। বেশির ভাগ মাছুষ পরিব হয়ে পড়ছে। অভাব বাড়ছে, তার লক্ষে কলুষতা। মাছুষ পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাস করছে। প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছে না। নিশ্চার ভয় অহরহ তাড়াকরছে।

‘আমরা বদলে যাচ্ছি।’

কেমন বেন নীরব হয়ে গেল মাছুষগুলো। তর্ক করছে না। ভূপতির কথায় সাহায্য দিতে পারছে না। চারের কাপ, চামচ নাড়ার শব্দ। দক্ষিণের হমকা হাওয়ায় অশব্দ গাছের পাতার গড়গড়ানির জের কানে বাজে।

‘তমরা বল।’ টেস্ট রিলিকের মাটি কাটা মজুর সোমনাথ সঠান ঝাড়িয়ে বলল—‘আমরা পরিব হচ্ছি কেনে?’ বলেই মাথাটা এমনভাবে খুঁচে দিল বুকের দিকে, যেন সে-ছাড়া উত্তরটা আর কেউ পাবে না।

সবাই হেসে উঠল। সোমনাথের সহজ সত্য কথাটা এমন হাস্তাসর হয়ে উঠবে আগে ভাবেনি কেউ। আসলে মাছুষ বা দেখে তা থেকেই সাধারণ উত্তর পায়। কখনো কখনো তাতে থাকে ব্যাপ্তি, কখনো বা সঙ্গীতাত্মক চূড়ান্ত বিকাশ।

‘তোমরা ছাড়।’

‘কেনে, আমি মাছুষ নয়?’

‘হাজারী-মুজরী করবি তাড়ি গিলবি,...’

সোমনাথ হুঁসে উঠল। রাগি বাঁড়ের মতো এখনি শিঙ দিয়ে বাজে মজলিসটাকে তখনছ করে দেবে।' বতসব অকস্মাৎ ভিড়। কিছু শান্তভাবেই বলল—'ই-সব বাজে কথা। সামনের গো-গো হাঁকাচ্ছে, কেমন করে? রিলিফের চাল-গম পাড়ি পাড়ি তুলচে, বেয়টি হচ্ছে নি। আসলে চোর-বন্দ্য বেড়ে গেছে।'

সোমনাথের কথাগুলো সবাই শুনছিল। বলায় রকম স্কম এমনি। কথা শেষ করতেই হররা হাসির রব উঠল। হাসি কেন থামতে চায় না। হারিশ্চন্দ্র এমন অকাটা মুক্তির কথা শুনে মাছুবগুলো হাসচে।

'তুই চোর, হুনিয়াকে বলিস চুরি করে বড়লোক হচ্ছে।'

খাটি কথা। পেটে ভাত না থাকলে, মাঠে কাজ না পেলে সোমনাথ মলবল নিবে চুরি করে। বড় কিছু করলে লোকে বলে—ভাকাত। সচরাচর চোরই বলে। পুলিশ এসে সোমনাথকেই ধাঁধে, গ্রামের লোক চোখ কপালে তুলে—'কি করেন দারগাবাবু, উত্ত আমার ঘরে রাত কাটাল, চুরি করল কখন।' সোমনাথ মিটিমিটি হাসে। কোমরের দড়ি খুলে বেওয়ার পত্র বীর হুয়ানের মতো চালে লাঝিয়ে ওঠে। ঘরামীর কাজ করে। 'হারামজাদা, এরপর আর তোকে ছাড়াবনি। সামান্য না পেলেই তোয় চলচেনি।'

'খুড়া, সামনেই বাদলা আসচে...।'

'তুই না থাকলে ঘর ছাওয়া হবে নি?'

'আর চুরি করবনি খুড়া। ইচ্ছত লিয়ে টানাটানি করে পুলিশ।'

সোমনাথ সাধু হতে পারল না। বাপ-বেটা-বউ মিলে পতর খাটিয়েও চোর অপবাদ গেল না। গরিবীও গেল না। নিরুপায় যোদ্ধার মতো পালিয়ে গেল। ভূপতিও উঠে পড়বে ভাবল। মাছুবগুলো প্রায়ই এরকম প্রশ্ন নিয়ে হৈচৈ করে। সঠিক উত্তর পায় না। সেও স্তেবে পাচ্ছে না। সোমনাথের মতো উত্তর নিয়ে হাজির হলে পাঁচজনে হেসে এমন সব কথা বলে—শেষ পর্বত নাকচ হয়ে যায়। আর সকলেই গরিবীর হাত থেকে মুক্তির নেশায় বে-বার পথ ধরে। ভূপতিও...

ভরাট জোয়াল তখন। গায়ে তেল। বুকে ভরসা। পৃথিবীটা রামধনুর রঙ বিছিয়ে মোহিত করত ভূপতিকে। হারিশ্চন্দ্র? তুচ্ছ ব্যাপার। বাহুবলে ক্ষয় করা যায়। কিছু পরে পরে টের পাচ্ছিল, বাহুবলের ব্যাপার নয়

পিছন দিক থেকে-কে বেন ধাক্কা দিয়ে কেলে দিচ্ছে। কি এমন অদৃষ্ট শক্তি! বাহাংলে বশ করা যায় না! হাতের মুঠোর আসে না! নাগালের বাইরেই পরাক্রমে বিরাজ করে। বলে—‘কুস্তির বাচ্চা, এত স্বপ্ন কিসের?’ স্বপ্ন আর রক্তিন পৃথিবী। কি যে বাহু আছে!

ভূপতি বিয়ে করবে।

‘তুই নাকি বিয়া করবি?’ ইয়ার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে।

‘হ’!

‘উ-মেয়েটার সঙ্গে আমারও সম্বন্ধ হয়েছিল! কি রূপের ছটা!’

‘বাইরেটাই সব লয় রে,...’ ভূপতি বিজ্ঞের মতো বলেছিল।

‘ভিতর বলতে আমি-জারগা ত?’

কঠোর সত্য। এই সত্যই ভূপতিকে টেনেছিল। এ-সত্যটাই মাহুদ জেনেছিল। ভূপতি অর্ধবর্ষে বসীরান হতে চায়। চাষ-বাস করে উন্নতি করাই তার লক্ষ্য। কেউ বাধা দেয়নি। গরিব মাহুদেরা বলেছিল—‘তুমি আমাদের সঙ্গে থাকচনি তালে?’

‘না!’

সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল। অন্নপূর্ণার ভিতরটা ক্রমেই স্পষ্ট হলো। লোকে যা বলত, তা আদৌ নয়। অন্নপূর্ণার অন্তর বড় বড়। এত কঠোর মধ্যেও কলরু পড়তে দেয়নি। নীরবে কর্তব্য পালন করে গেছে। কোনো অভিযোগ নেই। তিনটি সন্তানের মা হিসেবে অন্নপূর্ণা অবিচল রয়েছে। জীর ভূমিকাও সমালোচনার উদ্দেশ্য। মাহুদের কাছে বাইরের রূপটা আজ আর বড় নয়। ভূপতি মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করে। ‘কে চূড়ি করল?’ ‘কে তার স্বপ্ন ভাঙল?’ ‘আমার অন্নপূর্ণাকে কে এমন বীন করল?’ প্রশ্নের আর অস্ত নেই। তারই দুর্বলতার জন্তে সকল হওয়া গেল না। কি সেই দুর্বলতা! বোঝা যায় না। সেজন্তে বড় ছেলে শ্রীনিবাসের মধ্যেই উত্তরটার তন্মাস করে। সাহস করে। এখনো অবলম্বন হারায়নি। দাঁড়াবার অযোগ্য রয়েছে। আবার পুরোপুরি ভরসাও পায় না। অহঙ্কারের পাহাড় ধসে-ধসে বৈদ্যনিন হতাশা গড়ে তুলছে। বিশেষতঃ মনোভাব। হিংস্রতার লজ্জার ভূপতি নীরব। শ্রীনিবাস সেরকমই বলে।

‘তমার রাগ বেড়েচে, সবার সঙ্গে হিংস্রতা কর!’

‘তালে চুপচাপ বসে থাকব?’

‘হ্যাঁ।’

ছেলের এই অছুরোধ মতোই নীরব হয়ে গেছে। একটু আগেই বাবার পথে বেধে গেছে, তুমুল তর্কের স্তূপপাত হয়েছে মোড়ের চা-দোকানে। গিয়ে হযতো বুঝেছে। এই অবেলায় কেন বে বুঝে। মেজ ছেলেটাও এমনি সময় করে। দাদার পাশেই মুখ ঝুঁজ ঝুঁজ পড়ে। জুপতির অহকারগুলো এক-একটি টুকরো। ভরসাছিল।

হু ভাই ঝুঁজ পড়েছিল। সারাদিন জুপ্তর শুমোট পরম গেছে। মাটির দেওয়াল বলে ঘরের ভিতরটা বেশ শীতল। মা সিনেছে পড়শীদের সঙ্গে গল্প করতে। উঠোনের আতা গাছটা থেকে শুকনো পাতা বয়ে পড়ছে। ভালো-ভালো কিশলয় ফুটছে, অনেক ফুলও। এ-বছরও আতার ফলন ভালো হবে। বাতাবিলেব্র ফুল স্বাস বিলোচ্ছে। অজুত এক অহজুতি জাগে। চোখ পুড়ে আসে। এখনি বুঝিয়ে পড়বে।

পাশের ঘরের দরজা খোলার আলতো শব্দ। জামা এলো হযতো। নিরিবিলি স্থখের পর্দা জুলিয়ে কথা বাজে। ‘বল ঠকাবে না।’ চাপা স্বর। হযতো স্বপ্ন। ‘বল ঠকাবে না।’ কার কাছে বেন প্রতিশ্রুতি আদায়ের বোঁক প্রশ্ন পায। পৃথিবী ও মাছবের ওপর কত বিশ্বাস নিয়ে শব্দগুলো উচ্চারিত। শ্রীনিবাস এমন কঠোর প্রশ্ন শুনল। অথচ কেমন বেন উবেগও রয়েছে। স্বপ্ন নয়। জামার ঘরে কে ॥

শ্রীনিবাস বাইরে এলো। দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল। পরে পিছন দিকে জানালার কোকরে একটা চোখ পেতে দিল। প্রথম চোটেই ঘরের ভিতরটা অহকার। সেই অহকার ফিকে হতে-হতে ছোটো মাছবের অবয়ব। অস্পষ্ট অথচ সত্যি। সাপের মতো ফুলে ওঠে।

জামাকে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে। জামা বাবা দিয়ে সামনের ফুলে পড়া মুখটা সরিয়ে দিচ্ছে।

‘বল ঠকাবে না?’

দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে কথা শেষ করলেই কিছুক্ষণের মধ্যেই দৈত্যের বুক ধাবি খেতে থাকল জামা। জামা ফুলস্থ স্থখের কাছে ঠোট তুলে ধরল। বৃকের কাছের পলকা ক্রকটা ছিঁড়ে গেল। একটা বাবা নির্মমভাবে আঠার মতো বসে গেল।

‘বল ঠকাবে না?’

চমকে ফিরে তাকাল। পিঠের ওপর পরম নিঃশ্বাস। অবিনাশকে টেনে
গোলক তলায় নিয়ে এলো। দাবার ইসারা মতো অবিনাশ গাল পাড়ল না।
নীরবে পাশে দাঁড়াল। মাথার ওপর থেকে গোলক ফুল বয়ে পড়ে। অস্ত্র-
য়নক হয়ে পড়ে।

‘মুণ্ডরটা কেলে রে।’

‘ক-খা অসারবনি?’

‘কেলে রে।’

পরনে ট্রাউজার। চকরা-বকরা শার্ট। নাকটা চোখা। গৌক-দাড়ি
পরিপাটি কামানো। জুলপি কান ছাড়িয়ে অনেকখানি নেমেছে। অতীন
বাইরে এলো। ঘরের মধ্যে শ্রামা কাঁদছে। ‘অসতর্ক বোন আমার।’
স্রীনিবাস ভাবল। পালাবার চেষ্টা না করে অতীন ক্রাচ্ছে এসে দাঁড়াল।
ধাবড়ে যায় নি। অপরাধীর লক্ষণগুলো আচরণে স্পষ্ট।

‘ধারাপ মেয়েরা তুকতাক আনে বুঝলি নিবাস।’

‘তারপর?’

‘শ্রামা মত্তর করেছিল।’

‘এই বুঝলি?’

‘হ্যাঁ।’

‘মত্তরই করেছে। অস্ত্র মেরেব মত্তন শ্রামারও বয়স হোয়চে ত।’

‘না না, মত্তর—ধারাপ মেয়েরাই আনে।’

‘শ্রামা ধারাপ, তোরাই কাছে শুনলাম।’

অবিনাশ রাগে ফুঁসছে। অতীনকে চিবিরে ধাবে। শহরের বাস গ্যারেজে
ক্লিনারের কাজ করে অতীন। গ্রামে ঘনঘন আসছিল ইলানীং। সংসারে
কেউ নেই। একখানা ঘর ভাড়া করে একাই থাকে। বাউলুলে।

‘তুই ঠকাবি নাকি?’

‘না, ঠকাতে ত আসিনি।’

‘বিয়ে করবি?’

‘শ্রামা ধারাপ—ইটা সত্যি না মিথ্যা আগে বলুক দামা, নাহলে আমি
অকে অসারব।’

‘তোরা ভয়ে বলচি নি—শ্রামা খুব ভাল মেয়ে।’

তিনজনে মোড়ের দিকে চলে গেল।

সন্ধ্যাব পর অন্নপূর্ণার ধারাপ লাগতে থাকল। কেমন যেন খাপছাড়া।

ঘর-পেরন্তের কাজ ভাষা করে নি। শ্রিনিবাস কথা নিয়ে ঘরের মধ্যে।
অবিনাশ করেনি এখনো। ভূগতি চূপচাপ বসে।

‘ও শ্যামা তোদের কি হল?’

‘ও নিবাস, কি পড়িস অত, বইটার মলাটে কার ছবি রে? মাছের
অত দাড়ি হয় নাকি!’

‘তুমি যে গোমড়া হয়েছে বসে আছ?’

‘কবে হাসতে দেখেচু গনি?’ ভূগতি বেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

অন্নপূর্ণা কিছু বুঝতে পারছে না। প্রাত্যহিক সাবনীল চালের সঙ্গে
গরমিলই বেশি। হঠাৎ সবাই বেন একটা মন্তর শিখে কেলছে। ফাঁস করলেই
অন্নপূর্ণা ভেনে ফেলবে। অবশ্য যে-মন্তর আনার কৌতূহল তা কেউ জানে না।
মাছের আনন্দিত জীবন কিরিয়ে দেওয়ার মন্তর।

কৈবর্তদের কাছ সার্কাস দলের সঙ্গে চলে গিয়েছিল একবার। ফিরে
গ্রামের লোকের কাছে মন্তর-টন্ত্রের কথা বলত। ভিমকে হাঁস, হাঁসকে পায়রা
করে তাক্কব বানিয়ে দিবেছিল পাড়ার মেয়েদের। পুরুষরা তেমন পাস্তা
দেয়নি যেখে বুক চাপড়ে সে অহংকার করল, তাতেও পুরুষরা হাসল শ্রেক।
আর অন্নপূর্ণা প্রশ্নটা করে বলল—‘ও পাহু, সবই দেখলাম, মরা মাছ অ্যান্ড
করার মন্তর পাহু? পারবি?’

‘কেন পারবনি খুড়ি, অ্যান্ড মাছকে কেটে অড়া লাগাচ্ছি!’

‘উটি পারবিনি। হলপ করে বলতে পারি। চাট্টিখানি কথা!’

‘খুড়ি একদিন ভেলকি দেখাব!’

বলার এমন ধরন মেয়েরা হেসে লুটপাট হয়।

তারপরই তো ডুবে মরল পুঁটির পাঁচ বছরের বাচ্চাটা। এমনিতেই
মাছের জুখে বুক ভোর হয় অন্নপূর্ণার। তার ওপর শোকাভূত কান্নায়
অস্থির হয়ে ওঠে সে। পুঁটি যেওয়ালে মাথা ঠুকে রক্তপাত করে। অন্নপূর্ণার
ইচ্ছে হয় এখনি দৌড়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে কোলে তুলে দিতে। পারে না।
বুকের মধ্যে ব্যথা ধাপড়ে ওঠে। অশ্রু হয়ে করে ধায়।

‘ও পাহু, ভেলকি কবে দেখাবি?’ অন্নপূর্ণার আবেগ মূর্তি লাভ করে
বেন।

পাহু এত মাছের কান্নার রোলার ওপর দাঁড়িয়ে। অসহায় লড়াকু
মোরগের মতো পা ঠোকে মাটিতে। এ-শোকের কাছে সবাই মাথা নত

করে। পাছর সমস্ত মিথ্যা অহঙ্কার ধুলোর মতো বাতাসে উড়তে থাকল। নির্বাক পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থেকেই দাপট দিয়ে হাঁকল, 'ই কুহুমতেই হবেনি। পামার প্রাণ পলেই আছে।'

একটা লাঠি নিয়ে বাতাসের বুকে চালাতে থাকল। ওটাই বাহু দণ্ড। মুঠোর মধ্যে হাওয়া দাপটে বরতে থাকল। অবাস্তব ভয়ঙ্কর চেহারা পাছর। পুতুলের অঙ্গে নেবে অঙ্গের ওপর বাড়ি দিতে থাকল। সারাটা দিন অল ঠেড়িয়েও ক্লান্ত হলো না। গাঁতোড়া বাহুব পাছকে প্রতিহত করতে পারল না। পামার জীবন অলেই আছে। অশরীরী আত্মার হাত থেকে অবরুদ্ধি কেড়ে নিতে গিয়ে পাগল হয়ে গেল পাছ। সেই পাগল পাছও জীবিত। অন্নপূর্ণার সামনে এসে সজল চোখে বসে। যা থাকে তাই খেতে দেয়।

'ও পাছ, তুই বিয়া করবিনি ?'

পাছ কোনো উত্তর দেয় না। স্বতির পাতা থেকে সব মুছে গেছে।

এরা আজ কি মন্ত্র শিখেছে। সব অপরিচিত মনে হয়। ভ্রামাকে মনে হয় খুব বিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। বুদ্ধ ঠাকুরার মতো জ্ঞানি-গুণী।

'ও ভ্রামা, আমার শাড়ি পরেচু কেনে ?'

'ওর জামাটা ছিঁড়ে গেছে মা।' আজকের দিনটা...।' শ্রীনিবাস বলল।

নতুন শাড়ি পরে সেদিন ভ্রামা বাবা-মাকে প্রণাম করল। অবিনাশ ঘরের বাইরে এলো। পায়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমাকে ? দাদাকে ?' 'ছোট-দাকে প্রণাম করতেই মাথা ঘরে মাটিতে ঠুক দিল। অন্নপূর্ণা আহা করে মেয়েকে বুকে তুলে নিল।

'কত বাজল বলত ?'

আবেগ অভিমান হৃদে অমতে থাকে। যে-কোনো ছুতোয় বধন গলতে শুরু করে নে-মুহূর্তটা বড় আনন্দের। তেমনি ভ্রামা মায়ের বুকে মুখ খুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'মা আমাকে সাজা দেবে ?'

'কেনে, কি দোষে ?'

আরো উদ্বেল হয়ে ওঠে। তার কানটা মা-ও বলে দোষের হয়নি।

হঠাতো জানে না। দাদারা সকলের কাছেই ব্যাপারটা চেপে গেছে। জানলে আঘাত পেতে পারে। ‘আমি অভায় করিনি?’ শ্রামা প্রসঙ্গলো কবছিল অন্নপূর্ণার বৃকের মধ্যে মুখ গুঁজে।

‘অতে দোষ কি আছে? খুঁকির মত বৃকের ভিতরে... বা ভাক্!’

শ্রামার মুখটা তুলে দিল বৃক থেকে। কারো সামনে মুখ তুলতে পারছে না। এত সহজে অপরাধ মুক্তির ঘটনা অপ্রত্যাশিত। সেজ্ঞাই লজ্জাও অসীম হয়। বাবের বৃক আরো মুখ গুঁজে।

‘দাদাকে ঘেতে বল।’

সকলেই হো-হো করে হেসে উঠল। এই কাকে শ্রামা ধোঁড়ে পালাল।

ভূপতি নীরব দর্শক। তার ভূমিকা শেষ হয়েছে। শ্রীনিবাস কোথা থেকে কি করেছে বুঝতে পারছে না। শ্রামার প্রসঙ্গে বিরক্তি এসেছে তার। একমাত্র মেয়েকে নিয়েও স্বপ্ন ছিল। সাধ আছে। সাধ্য নেই। তবুও ভূপতির নিজস্ব একটা ভাবনা আছে। খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, ‘একমাত্র মেয়ে...!’

শ্রীনিবাস এত সহজে চটে না। বাবার মুখে ছুটি শব্দ শুনেই রেগে গেল। হঠাৎ নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছোট হোক বড় হোক বিশ্লেষণের উপযোগী ঘটনা মালা থাকে। এমনকি ছুঁটনারও।

ভূপতি তব্ব হলো। শ্রীনিবাস পুরানো স্বতির পাতা গুলটালো।

সেদিন ভাইকে পেয়ে ভূপতির কি আনন্দ। গরব। ভাইয়ের মতো মানুষ দ্বিতীয়জন নেই। ধনে-বলে। গ্রামে তো নেই, এ-তলাটে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গাঁয়ে বসবাস করলে ভূপতির অহঙ্কারগুলো এত সহজে চূরমার হতো না। হুঃ, ভাই বাঙলাদেশের বাইরে থাকে। এ-হেন ভাইয়ের খাতির করতে গিয়ে ভূপতির পতন বামাল সমেত প্রকাশ পায়। শ্রীনিবাস অবিনাশ খুব রাগ করেছিল। চারদিকে দৈনা। গৃহবিবাদেও সময় ভূপতির একমাত্র এবং অব্যর্থ যুক্তি—‘গরিবী কি লোক-দেখানোর বস্তু নাকি?’

‘দুকাবার জিনিস?’ শ্রীনিবাস খেঁকিয়ে ওঠে।

‘ওকে পিটিয়ে বলারও লয়!’ অবিনাশও ক্ষেপে ওঠে।

‘তুই বাবার দিকে?’

‘না। বাবার হুঃখটাও বুঝতে হবে।’

‘সে জন্তেই তো সাবধান হতে হয়।’

এক-এক করে কাঁপ হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের ইমারত থেকে একখানা করে ইট ধসে পড়ছে। ভূপতির হেমাক টিকছে না। অতাবের তাদার অবিনাশ শহরের কারখানায় মজুরের কাজ শুরু করল। যে-লড়াই এতদিন করছিল, যতগুলি দুর্গ রচনা করেছিল সে, একে-একে ছারখার। শেষ দুর্গ শ্রীনিবাস। কারখানা থেকে কিয়ে প্রথমদিন সবার উৎসুক চোখের সামনে একটা কথাই বলেছিল—‘দাদা, ছাত্রের অভিভাবকরা যে-সুদূরুড়া দেয় তার চলবেনি ভেবেই বেরি পড়লাম।’

এতাবেই বেরিয়ে পড়তে হয়।

সেদিন দুই ভাই একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। শুড়-কাটি খেয়ে অবিনাশের নকল করে ঢকঢক জল খেল শ্রীনিবাস।

‘অবিনাশ মজুর, তুই পারবি অর সঙ্গে?’ অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করে।

দু-ভাইয়ের মুখ কালো হয়। চরাচরে খাপছাড়া মেঘের ছায়া যেমন পড়ে। ওরা দুজন বেরিয়ে বাগুরার পর ঘরটা নির্জন হয়ে গেল। ভায়া নেই, থাকলে কিছু-না-কিছু নেড়ে চেড়ে শব্দ করত।

ভূপতি পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায়। কান্নো সাধে বিশেষ কথা বলে না। পৃথিবীতে বেশির ভাগ মানুষ গরিব হয়ে পড়ছে। ছোট গ্রামখানি বাদ দিতে পৃথিবীর কথা ভাবতে পারে না সে।

তার গরিব হওয়ারটা অজ্ঞ ধরনের?

‘দাঁড়ি বাব হে। বড় ছেলাটা কাজ পেলেই ভেলকি দেখি খুব।’

মানুষ হাসত। এ-হাসির উত্তর দেওয়ার সুযোগ খুঁজছিল। প্রতিবারেই সুযোগ হারিয়ে যায়। একটি করে থাকা খায়। মানুষের কথাই সত্য হয়।

বিক্রোহী হতাশ হয়ে পড়ে।

দগদগে ঘাঘের ওপর যেন জ্বনের ছিটে। ‘ই হতে পারে নি, বড়বন্ধ।’

অন্নপূর্ণা বুঝিয়ে বলছিল। শ্রীনিবাস-অবিনাশ উঠোনে চুপচাপ বসে। ভূপতি হাউহাউ করে কাঁদছে। মানুষের ওপর কেমন বিশ্বাস হারিয়ে কেলেছে মানুষটা। সহজ হিসাবে সন্দেহ ধরা পড়ে। প্রত্যেককেই সন্দেহ। তার বিরুদ্ধে সবাই যড়যন্ত্র করছে। তা-না-হলে শ্রীনিবাস কেন প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিযুক্ত হলো না? স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে সংগঠক শিক্ষক হিসেবে আজ চার বছর কাজ করছে। সে-স্কুল সরকারী অঙ্গমোদন পেল,

ঐনিবাস কাজ পেল না? সরল শিলাস্ত ছাড়া ভূপতির আর ভাবনার নেই।
তার বিরুদ্ধে বড়বল।

ভূপতির মতো অমরপূর্ণাও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। দুটো জোয়ান ছেলে,
কোথার কি করে খবর রাখে না। থাকলে রাগা করে দেয়। না হলে,
ঘর শুছোয়। ঘরের এলোমেলো চেহারা শুছিয়ে সাজায়। বইগুলো হাতে
নিরে নাড়াচাড়া করে।

লাল বলটি। দাড়িঅলা মাহুঘের ছবি। পড়তে পারে না। পাভা
উটে ছবি দেখে। তার কাঁটার বেড়ার ওধারে এক দল শিশু ঠাণ্ডাঠাসি
দাড়িয়ে কি বেন দেখছে সামনে। যা ছবিতে নাই। শিশুদের চোখগুলো
দেখলেই বুঝতে পারে। সবচেয়ে বড় মাথাঅলা শিশুটাই কথা বলছে বেন।
এ-ছবিটাই ধরে রাখে চোখের সামনে।

একটি মায়ের ছবি। বৃকে সম্মান। পিঠে বন্দুক। কত সাহস। বড়
ভালো লাগে ছবিটা। আমার চেয়ে একটু বড় হবে।

ইরানীঃ তিনখানা কটো নিয়ে এসেছে ঐনিবাস। বড় বড়। সবগুলোই
দাড়িঅলা মাহুঘ। চোখগুলো মায়ার ভরা। ছোটবেলায় এ-রকম মাহুঘ
দেখলে ভয় পেত অমরপূর্ণা। ছবিগুলো দেখলে ভয় পায় না সে। এমন
পর্ববেষ্ণণের সময় হঠাৎ ঐনিবাস ঘরে ঢুকলে অপ্রতিভ হয়।

‘এমন অগছাল হচ্চু কেনে তুই?’

‘তমার কাজ চাই ত!’

‘হুয়। ক্যাবলার মত ছবি দেখি!’

‘বুঝতে পার?’

‘আম্বায়ে কিছু পারি!’

‘দেখ বখন দেখে যাও!’

কটোগুলোর নাম শিখিয়ে দেয়। সচরাচর বেসব নামের সঙ্গে পরিচিত
সে-রকম নাম কারো নয়। বিদেশী ভাষায় বিদেশী নাম। ছবি দেখলে মনে
হবে নিজেদের লোক। ঐনিবাস বলে—সবাই নিজেদের, খুব কাছের মাহুঘ
আমাদের।

‘অবিনাশ কুধা?’

‘ওভারটাইম, ডু-খালা কটি দাও, দিখে আসি। বাবা?’

‘অর কথা ছেড়ে দে!’

‘ছাড়লে চলবেনি! এতদিন লড়ল, উপযুক্ত বর্গদ্বারা দিতে হবে।’

‘মাহুঘটা ও বম। কারু কথা শুনলনি। বেবাক করে গেল জীবনটার।’

ঐনিবাস কেমন বললে গেছে। পরিবর্তনের দ্বারা অন্নপূর্ণা অনেকটা বুঝতে পারে। ওদের পৃথিবী খুব কঠোর। অন্নপূর্ণা অহুমান করে। ভূপতির পৃথিবীটা ছিল অল্পময়। আর তারই সম্ভানদ্বারা কেমন হিসেব করে চলে। এতে অন্নপূর্ণা খুশি হয়। বইগুলো একটিকে শুদ্ধিয়ে রেখে উঠে পড়ে।

‘তোমার ঘরটার কেমন বই-বই গন্ধ।’

‘হঁ।’

সোমনাথ একটা পিণ্ডি টেনে বসে পড়ে। চুলগুলো বেন তাড়াতাড়ি পেকে গেল। মুখের কালো চামড়া আরো কালো হয়েছে। কপালের বলিরেখা অনেক স্পষ্ট, আগের তুলনায়। হাতখানা সেরকমই কঠিন। আঙুলগুলো মোটা ও বেঁটে। দ্বার চামড়া পুরু, ধসধসে। পায়ের পাতা চওড়া। আঙুল ফাঁকা ফাঁকা। গোলুইয়ে যা হয় বর্গা নামলেই। দাঁত পোছানো। কাঁচাপাকা চুলে ভর্তি খোঁচা খোঁচা গৌক। -হাসলে মাহুঘটাকে ভালোই দেখায়। ঐনিবাস তাকেই দেখছিল। অন্নপূর্ণা কাগজে মুড়ে কটি ক’খানা ছেলের পকেটে চুকিয়ে দিল। কথা বলার সময় নেই। অতীত এসে অপেক্ষা করবে।

অবিশ্বাস যেতে পারল না। অতীত মুগ্ধভার করে কারখানার ক্যান্টিনেই অবিশ্বাসকে ধাক্কা দিল। ঐনিবাস বলল, ‘এভাবে খরচ না করলেই পারতে। আমি কটি লিয়ে এসেছিলাম।’ অতীত আরো মুগ্ধভার করল।

ভ্রামার ঘরকরনা দেখতে থাকল ঐনিবাস। মেয়েটাকে দ্বারার কোলে দিয়ে ঝুঁন ঝুঁন পেরালার শব্দ তোলে। কি তুই এই শিশু। অতীত এখন বাস ড্বাইভার। সামান্য স্নিনার থেকে পছন্দসি লাভ করল, আজ ছ-বছর পর। মিষ্টিমুখ করাবে। ভ্রামার খুব গরব। আঁকিয়ে বসেছে। মামার চুল টেনে একশা করে পাগুন। বোনটিকে একটু দেখবে, কেমন গৃহিণী হয়েছে—তারও উপায় নেই।

‘তুই কাজকর্ম কেমন করে করিস ভ্রামা?’

‘ওই বে, কমরে দড়ি বেঁধে দিই।’

‘আহা রে, তবু তুই কামেনি।’

‘হাড় ভাঙাভাঙা করে দাখ, অর বাপ একতিল কোলে তুলবে নি।’

অতীত একটু হাসল। ‘খুব কাজের কাজ কর তুমি?’

‘না। আমার পষার নি। ছেলা কোলে করা...।’

মিষ্টিমুখ করেই শ্রীনিবাস উঠল। শ্রামা আশ্রয় করে বলল, ‘মাকে নিয়ে
সবে কাল। খপর দিয়েচ?’

‘মাকে কেনে? বাবা?’

‘বাবা ত রোজ আসে। মেয়েটা এত বিজি হচ্ছে কেনে, সব সময় দাহর
কোল। একটু মায়খোর করলেই হুদিন আসা বন্ধ!’

‘তা ত জানতমনি।’

শ্রীনিবাস খুব আনন্দিত। ছোট করে হাঁ করে পাপুন। এক টুকরা মিষ্টি
মুখে শুঁড়ে দেয়। রসে স্ত্রীজায় মামার আমা। মুখের দিকে তাকায়।
শ্রামা হাসতে-হাসতে বলে, ‘দাদা ভোজন্যর ছবিটা মনে আছে?’

‘হঁ।’

‘পাপুন সেরকমই লোভি হবে।’

‘তখনি খাবার কোঁক খেরম ছিল। বাড়চে বল।’

‘হ্যাঁ। হাতের কাছে বা পাবে তাই খাবে।’

‘ওটা শিক্কেয় পরখ করা রীতি।’

‘কথা বলতে-বলতে অমন হাসচ কেনে?’ শ্রামা চারদিক দেখে। কিছু
গোলমাল হয় নি তো। অথবা মেয়েটা কাপড়ে-চোপড়ে...। যে রকম
হয়েছে, বিশ্বাস নেই।

‘নায়ে! তোর ছেলেবেলার কথা ভাবছিলম, আমার ট্যাঁকেই ত বড়
হলি। এখন পাপুনের মা।’

‘এরকম ছিলম?’

‘লোভী।’

‘ন, মোটেই না।’

বেশ আনন্দেই সময়টা কেটে গেল। অতীন চলে গেল ডিউটিতে।
শ্রামা আজকাল আর একা থাকতে ভয় করে না। পাশের বাড়ির মাসীকে
ডেকে নিত আগে। এখন একাই থাকে। যে-রাতে পাপুন আগে থাকে,
অতীনকে বেশি মনে পড়ে। সব কথা দাহর কাছে বলছিল। ভালো
লাগছিল শ্রীনিবাসের। এমনি ভালো মন নিয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ির দিকে
রওনা হলো।

অবিনাশেরও ওভারটাইম শেষ হলো বোধহয়। কারখানার পাশ দিয়ে
আসার সময় দেওয়ালে খড়িটার দিকে তাকিয়ে সময় দেখল। মিনিট চ-তিন

বাকি। ডে-লিক্টের ছুটির মতো জিড় হয় না। এখন কিছু শ্রমিক বিকিণ্ড-ভাবে বাড়ির দিকে দ্রুত হেঁটে যাবে।

বড় রাস্তার কোলে দাঁড়িয়ে মেঠো হাওয়ার মুখোমুখি দাঁড়ায়। চুল এলোমেলো করে হুলো উড়িয়ে যায় হাওয়া। লোকজন হেঁটে যায়। গন্ধ মাঠ থেকে উঠে আসে ঘরে। পাখির শেষ দলটি উড়ে যায় নিকুঞ্জে।

‘তমাদের কারখানা এক নজর দেখে এলম ছিনিবাস।’

প্রিছনে সোমনাথ দাঁড়িয়ে।

‘কাজ করার অবর আয়গা।’

‘তমাকে ঢুকতে দিল?’

‘দিবেনি মানে? অবিনাশের নাম করে গেলাম ঢুকে। কাঁড়িকাড়ি কাপড় হচ্ছে দেখলাম।’

‘ওই তরেই কাপড় কল বলে।’

‘পাছার টেনাটা দেখলাম অবিনাশকে, তোর কাকীও এরম পরে। পারলে দু-একখানা! এমনিতে দিবেনি ত।’

‘কেনে দিবেনি, মাল তৈরী করচি আমরা।’

‘তুই আমার সঙ্গে রহস্ত করচু। দেখ না কি। পুরা শাড়ি হয়ে গেলেই গণে। গাঁট বেঁধে ফেলে। আমরা ত বাজার থেকে কিনব।’

‘আচ্ছা খুঁড়া, পুরা তৈরী মালগুলো যদি আমরা সবাই ভাগ করে লি, বারা-কাজ করছি, হুখে থাকবে?’

‘না।’

‘কেনে?’

‘অনেক মাল, অনেক টাকা, মানে...তুই রহস্ত করচু...’

‘না না।’

‘মানে অনেক অর্থ।’

‘তা হচ্ছেনি কেনে?’

‘কি আনি বাপু। এমনি না কি নিয়ম।’

‘নিয়মটাকে ভেঙে ফেলতে হবে।’ ঐনিবাসের উচ্চারণভঙ্গী দৃষ্ট।

‘ঠাট্টা নয়। ছুখানা হাতাতে পারবিনি?’

‘হাতিয়েই তো জীবনটা গেল খুঁড়া। ‘চল।’

সোমনাথের কাঁধে হাত দিয়ে এগিয়ে চলল। অবিনাশও এসে জুটল।
সোমনাথের অস্ত্র কাঁধে জড়িয়ে ভিনভনে চলল। ‘খুঁড়া একখানা কাজ চার
কারণানায়।’

‘চাইই ত। টেনার অভাব হবে নি।’

‘হাতানোর ধান্দা।’

জু-জাই খুব হাসল। আসলে টেনা হাতালে হবে না। এটা জু-জাই
জেনেছে। সোমনাথকে খুব হাসাতে-হাসাতে ঘর পছন্দ নিয়ে এলো। বিদ্যায়
বেলায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—‘তরা ত এমনি ছিলিনি। কলে কাজ করলে
এমন সুতিবাজ হয় নাহব?’

‘হু।’

‘আমিও করব, ছেনাটাও করবে।’

অবিনাশ পান পাইতে-পাইতে ঢোকে ঘরে। এ-পান শোনা যায় না। ওর
মুখে। কোথা থেকে শিগেছে কে জানে। অন্নপূর্ণা বলেছিল পা ছড়িয়ে।
একটু দূরে ভূপতি। অনেকদিন পর এভাবে বাবা-মাকে বসতে দেখল।
জীনিবাস ধমকে পাড়াল উঠানে।

‘দাদা ক্যামেরা, এমন হুযোগ আর পাবে নি।’ অবিনাশ
বলল।

‘কি গল্প হচ্ছে?’ জীনিবাস ধম করে বসে পড়ল।

‘তোমের কি হয়েছে। হালকা পালকের মত উড়বি মনে হচ্ছে।’

‘বলবি গল্প?’

‘তোম বাপ নাতনীর কথা বলছিল। হ্যাঁয়ে আমার মত রূপের বহর
নাকি তোম ভাগনীর।’

‘না, মোটেই না।’

‘তোম বাপ যখন ঘনঘন যাচ্ছে, তালে দেখতে ভালোই হোয়চে।’ ভূপতির
দিকে কটাক্ষ করল।

‘তমার এক কথা।’ ভূপতি হাসল।

অন্নপূর্ণার রূপ নিয়ে কথা উঠবে সবাই ভাবত। এ-পায়ে এতদিন কেটে
গেল তেমন কিছু হয়নি। বরং গুণের কথাই বেশি হয়। বাইরের ব্যাপার ও
ভিতরের গুণাবলী, উভয়ে মিলে একটি সুন্দর নারী অন্নপূর্ণা। সরস্বতীর
বিপরীত ভাবনাগুলো তাত্ত্বিকভাবে উপস্থিত ছিল। পরে সবায় উপরে

জীবন এসে খেলা শুরু করল। মানব জীবন। সেই ধারাবাহিকতাতেই মাহুব মাহুব হয়ে ওঠে, কখনো অমাহুব। অন্নপূর্ণা মাহুবের দলে। চোখ খোলাখোলা। হুঃখ ও সুখ দুটোই বোঝে। বা কুপতি পারে নি। পারে নি বলেই বিরক্তি, পরাজয়ের গ্রানি মাহুবটাকে কেনন খিটখিটে করে তুলেছে। এ-সেজাজ ক্রমে বদলে বাচ্ছে। অন্নহীন দিন আর ফেরে নি। আনন্দ বীরে-বীরে হুকুমার রূপে বিকশিত হচ্ছে। বিকাশেরও কতকগুলো নিয়ম রয়েছে। কখনো সহজ কখনো জটিল। কখনো বা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। অলিগলি কিংবা মোড় অতিক্রম করার মতো সচেতন হলেই টের পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য দিন আসে জীবনে। অভিজ্ঞতার চাহর জড়িয়ে রক্ষা করতে হয়।

তিন বছর কিংবা কিছু কম সনের মধ্যে এটা কি একটা উল্লেখ্য দিন।

শ্রীনিবাস তাই মনে করে। ছোট পরিবারের একটা দিকে মোড় নেওয়ার পক্ষে দিনটি অগ্রগীর।

বর্ষার ঘনঘটা। কারখানার কাজ মন্দা। জল-জালালে নতুন প্রজন্মের সোয়ামোল। মাহুবের হুঃখের পুঞ্জপাত। কেননা সবাই সর্বথ উজাড় করে মাঠে ঢেলে দেয়। সারা শরৎকালটাই কষ্ট নয়। এ-কষ্টের অন্তে প্রস্তুতি আছে। কিন্তু কুপতির জীবনে যে-হুঃখ নেমে এলো তা অজান্তসারে। অশান বাট থেকে সকলেই কিয়ল নীরবে। শ্রীনিবাসের কোলে তিন বছরের পাপুন।

‘মামা বাড়ি থাকতে পারবি তো পাপুন?’ পাপুন ঘাড় নাড়ে।

‘বাবা মরে গেছে?’

উত্তর তো দেওয়া যায় না। এতগুলো মাহুবের চলে আসা, মুখছবি, অতীনের দেহটাকে নিয়ে কাজকর্ম, সর্বশেষ আগুন জেলে দেওয়া—শিঙীট নাছোড়বান্দা হয়েই দেখছিল। সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে—বাবা মারা গেছে। বাস দুর্ঘটনায় মারা গেছে। অন্নপূর্ণা চৈতন্যে কাঁদছিল—‘কপাল আমাদের।’ ক্রমা কাঁদছিল, ‘আমি ত কার ক্ষতি করিনি।’ কুপতি কাঁদছিল, ‘জীবনে সুখ সম্ব হয় না।’

‘মতীনটা খুব বেপরোয়া গাড়ি চালাও রে।’ শ্রীনিবাস অবিনাশকে বলল।

‘কতদিন সাবধান করেচি !’

‘আসলে এ-বোধ ছিল নি, বাঁচতে হয় সংগ্রাম করে—মরাটা খুবই আতাবিক, লড়াইয়ের দরকার নাই !’

‘দাদা তুই ইসব জানলি কি করে ?’

‘পড়ে, চোখে দেখে !’

‘এতখণ আমিও ভাগ্যকে দোষারোপ করছিলাম। বৃত্ত্য ত হাতের কাছে, বাঁচাটাই বেঁচে থাকারাই বত ঝামেলার। তোর কথায়—সংগ্রামের।’

‘হাল লাগচেনি !’

‘এত কষ্ট দেখেও তুমি ভেঙে পড়চ ?’

‘নায়ে। মাছব ত... !’

অবিনাশ আর কোনো কথা বলে না। সে এতক্ষণ খুব বড়াই করছিল—এসবই তুচ্ছ ব্যাপার। এখন বুঝল, এত ছটকটানি কেন ? মাছব তো। অস্থির হয়ে উঠছিল। শ্রীনিবাস চুপচাপ বসেছিল। পাগলের মতো করলেও কিছু হওয়ার নয়। সুধোমুখি ঝাঁপাতে হলে প্রজ্ঞাতি দরকার। সেমন্তেই শ্রীনিবাস নীরবে লক্ষ্য করে। সব। শেষে, আলোকবর্তিকার কাজ যেন বলে। কেমন স্বচ্ছ জীবনের দ্বারা। তরতর করে নিচে নেমে চলেছে।

ভান্নাকে ইমানীং দেখলে মনে হবে দীর্ঘাকী হয়েছে। আসলে রোগী। প্রত্যেকেরই শরীরে বয়সের তুলনায় বুদ্ধিরে বাওয়া ভাব ভুটে উঠেছে। খাই খাই মনোভাব উগ্র হচ্ছে। কেমন গোছালো মেয়ে ভান্না বদলে গেছে। মেয়েটাকে তেমন ভালোবাসে না। মা মেয়ে যখন কাড়াকাড়ি করে কটি খায়—শ্রীনিবাস নিজের একখানা কটি দেয় বোনের হাতে। ক’ বছরে কি হল ? নিকপায়। প্রেক দেখা। ছোট মেয়ের মতো ভান্না বোন যখন তার দাধাকে তোবামোদ করে একখানা আইসক্রীম খাওয়ার ভক্তে, মুখের দিকে তাকায়। ছেলেমাছবের মতো করণ দৃষ্টি বিনিময়। আটা কেনার পরসা কম পড়বে। মনে এ-প্রশ্ন শরতানের মতো মিটিমিটি আসে।

‘নাই!’

‘নাও না!’

ভ্রামা ধৌড়ে বাইরে যায়। এখনো বসে আছে আইসক্রীমখলা। বিকোচ্ছে খুব। ছেলেমেয়েরা ভিক্ত করেছে।

‘চলে যাবে দাদা!’

‘পয়সা নাই বলচি!’

‘আমি একখানা রুটি কম খাব!’

ঈনিবাস হেসে ওঠে। দশটা পয়সা দেয়। পরক্ষণেই পাপুন ধৌড়ে আসে। মায়ের হাতে বকবকে দশটা পয়সা দেখেই মামার কাছ থেকে না আর। সেও বোঝে—দ্বিতীয়বার চাওয়া অসম্ভাব্য।

‘মা আমাকে একটু দিবে ত!’

ভ্রামা একাএকাই চোবে। পাপুন লোলূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ঈনিবাস আরো দশটা পয়সা দিয়ে পাপুনকে মারে। ভাক।

‘আইসক্রীমখলা চলে গেছে ত!’

পয়সাটা কিরে নেয়। ভ্রামা শেষ পর্বন্ত পাপুনের পাল রোবন্তরে খামচে দিয়ে এক টুকরা আইসক্রীম দেয়। তা নিয়ে রাসের মধ্যে রাখে। কাচের রাসে, কেমন বরফ গলে গলে অমা হচ্ছে পাপুন দেখে।

‘কেনে যে হোরছিলি তুই, খাদ মিটাতে পারিনি স্বখে!’

পাপুন ক্রক্ষেপ করে না। বরফটা গলে গেলো চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলে। ‘বেশ, অভয়িন আমাকে চাইবেনি বলে’লিল!’

পাপুনের মতো স্বাধীন সে নয়। ভ্রামার চেয়ে পাপুনের খাতির বেশি। একান্তে মারও খায়। রুটির বিষয়ে ভেদাভেদ নেই। সেবার চড়ক দেখতে বাবে বলে পাপুন তার বন্ধুদের নিয়ে পরামর্শ করছিল। সকলেই কি কি কিনবে বলছিল। সবাইটা শুনে, পাপুন বলল, ‘মামাকে পয়সা চাইব, পাপড় খেতে হবে!’

‘খেতে খুব মজারে, আমি বেলুন কিনবনি পাপড় কিনব?’

‘পাপুন আমার তরে একটু লিয়েসবি!’ ভ্রামা মাস্কর পেতে সুমোচ্ছিল, কাত হয়ে পাশ কিরে পাপুনের হাত থেকে আমার টুকরা ছিনিয়ে খেয়ে ফেলল।

‘না লিয়েসবনি, তুমি সহজে দাও কুহু জিনিস?’

এ-নিরে গোসা। শ্রীনিবাসকে ধমকে দিল শ্রামা, 'ধবরদার পাপুনকে পাগড় বেতে পরমা হবে নি।'

'না মা তমার ভয়ে লিয়েলব।'

পাপুন চড়ক দেখে একখানা পাগড় কিনে অনেকক্ষণ রক্ষা করেছিল। ঐয় বাড়ির কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। এতখানি পথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করেও বাড়ি পর্যন্ত এক কণা নিয়ে আসা গেল না। বেহম মারল শ্রামা।

'আমি তোর মা লয়। মারের কথাটা মনে থাকে নি।'

মা বলেই সর্বক্ষণ মনে ছিল। প্রতিটি টুকরা খাওয়ার সময় মাকেই মনে পড়েছে। কিন্তু পাগড়টা বে অতি ছোট। তৃপ্তি হয় না। সাধ বেটে না। অপূরণীয় রয়ে যায়।

পেট ভরে না। অকুন্ত থাকতে হয়।

শ্রীনিবাস-অবিনাশ দুটো মানুষ কিভাবে চলছে? চলছে দৃঢ়ভাবে। সকলের সাধারণ ভাষায়, চলছে খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে। এ-অল্পতব যখন চরমে, ঠিক তখনই ভূপতি কোদাল ধরল। সোমনাথকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে যায়। মাটি কাটতে; কখনো ক্ষেতে-খামায়ে; কখনো বা ঘরামীর জোপানদার হিসেবে। বাড়ি ফেরে ক্লান্ত হয়ে। অন্নপূর্ণার ওপর হস্তিত্ব করে। ছু-ভাই মিলে হাসে। কোনো লোক বহি জিজ্ঞেস করে—'কেমন আছ খুড়া?' বেশ আছি বলে উত্তর দেয়।

বেশ আছে সব। দিন যেমন শুরু হয়, শেষও হয়ে যায়। মনে আজকাল মানির পরিবর্তে রাগ আছে।- যুগার রূপান্তরিত হয়। শ্রীনিবাস এ-যুগকে শ্রেণী ঘূণা বলে। যে-কারণে মানুষের এত দুর্দশা, বারা দুর্দশা সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধেই ঘূণা আছে। যুগাই সংগ্রামের রূপ নেয়। সংগ্রামই নতুন দরজা খোলে। সংগ্রামেরই প্রস্তুতি এক-একটি দিনের প্রতি ঘটনার মধ্যে।

অন্নপূর্ণা বুঝতে পারে। ছু-ভাই কি করে সব টের পায়। লাল কাপড়ের একখানা টুকরা শ্রামা সেদিন ওঘর থেকে চুরি করল। অবিনাশ ক্ষিপ্ত হয়ে চড় মারল বোনের গালে। কেমন আত্মনাশ করে কেঁদে উঠল শ্রামা। অন্নপূর্ণা বুকে জড়িয়ে ধরল মেয়েকে।

'কেন মারলিরে?'

‘বাগায় কাপড়টা ছুঁ কয়েচে।’

ঐনিবাস হতভম্ব দাঁড়িয়ে। ‘কেনে লিয়েচু?’

‘রাউজ নাই ত।’ ভাষা তখনও কাঁহছিল। পাপুন পাশে দাঁড়িয়ে।

ঐনিবাস বলল, ‘কালই লিয়েসব।’

‘মামা, আমার আমা?’ পাপুনও বলল।

‘তমারটাও?’

‘আমার?’ অন্নপূর্ণা হেসে-হেসে বলল।

‘তমারও।’

সকলেরই পরিচ্ছন্ন আসবে। সবাই আনন্দিত। সন্ধ্যার পর শুকনো কটি হুনজলে ভিজিয়ে ধেল অবিনাশ। পাপুন ধেল শুকনো। শ্যামা কোথা থেকে পেরাজ জোপাড় করেছিল বেধিয়ে-বেধিয়ে ধেল। ভূপতি জলে ভিজিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিবলো। অন্নপূর্ণা সবশেষে উঠল। তার চোখপুড়ে ঘুম। ঘুম কাতুরে মা। ঐনিবাস মাকে আদর করে বলে। হু-ছেলের সঙ্গে শুয়ে ভূপতি ভালো ঘুমতে পারত না। আজকাল ক্লান্তিতে সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে।

অনেক রাতে পাপুন ও-ঘর থেকে চৌচিয়ে উঠল।

‘হিমিমা গো, কাল আমরা কি খাব, মা যে সব আটা খেয়ে কেলল।’

বিশ্বয় ছাড়া কি থাকতে পারে? অধিক রাতে শ্যামা কিলোখানেক আটা হুন দিয়ে গুলে খেয়ে কেলছে। চকচক শব্দে পাপুনের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর সবাই দেখে। অন্নপূর্ণা আসো জ্বালে। শ্যামা বড়বড় চোখ করে খেতে থাকে। আটার থালাটা কোলের কাছে তেজের সঙ্গে টেনে রাখে। পাপুন কেড়ে নেবে না তো?

শ্যামা মাহুয। শ্যামার কুখা পেয়েছিল। শ্যামার সামনে এক কিলো আটা ছিলো। খেয়ে শ্যামা সন্ত করতে পারেনি। গ্রামে টিচি পড়ে গিয়েছে। ভূপতির সংসারের সবকিছুই ফাঁস হয়ে গেল। শ্যামা ঘনঘন ঘর-বাহির করল। সারাদিন। তার ডায়েরিয়া হয়ে গেছে।

শরৎকাল। চারদিকে বধন উৎসবের বাজনা বেজে ওঠার উপক্রম। আনন্দ যেতে উঠেছে প্রত্যেক মাহুয। সে-সময় ঘরের মধ্যে একদিনেই হাড়িঙ্গার শ্যামা কীণ কণ্ঠে শ্রেক বলে—‘মাপো একটু জল।’ পাপুনকে

এ-রকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। মায়ের যন্ত্রণার অংশিয়ার হতে গিয়ে পাপুনও আক্রান্ত। শ্যামা সহ করতে পারল বটে, পাপুন কোনোমতেই বুকে উঠতে পারেনি। কি-রকম লড়াই করতে-করতে শিশুটি মারা গেল? ‘মাগো একটু জল!’ জল সে পেয়েছিল।

গ্রামের মানুষ এতকণ হাসছিল।

গ্রামের মানুষের হাসি শুক্ক হলো।

পাপুনকে আশানে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুঁতে দিল।

চারদিকে জ্যোৎস্না। এ-রাতে রূপসী পৃথিবী কথা বলে।

‘বাবা!’ শ্রীনিবাস ডাকে।

‘ভূপতি পাশে এসে দাঁড়ায়। অবিনাশও।

‘আমি লাল কাপড়টা পাপুনের গায়ে অড়িয়ে দিয়েছি।’ অবিনাশও বলল।

শ্রীনিবাস তো ধেরাল করেনি। ভূপতিও। কেউ না।

‘ওর ককটা ছিঁড়ে গেছিল।’

তাতো সবাই জানে। এমনটি তো শ্রীনিবাস ভাবেনি। শোকে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। ভাই-বোন-মা-বাবা সব মনের ছুয়ারে ভিড় করেছিল। তাদের হৃৎ তাকে বিরে রেখেছিল। অবিনাশকে সে জড়িয়ে ধরল।

‘কাল আমাদের মিছিল, মনে আছে তোমার?’

‘হঁ।’

‘সোশনাথ খুঁড়াও বাবে বলেচে, বাবাও।’

অন্নপূর্ণা চূপচাপ বসে। সামনে পাহাড়। একমুখ দাড়ি, লম্বা-লম্বা চুল। সুধোঁসুধি বসে। অন্নপূর্ণা শহরের বুক ভেদ করে সহস্র মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। ইনক্সাভ জিম্বাবাও। অন্নপূর্ণা নীরবে বেন প্রাঙ্গণ করছে— ‘পাহাড়, তুমি ত অনেক ময় জান, মানুষের আনন্দিত জীবন কিরিয়ে দিতে পার না?’ শ্যামা খুঁটি চেন দিয়ে বসে। ক্লান্ত, দুর্বল, শোকাহত। শহরের উচ্চবের সঙ্গে পাহাড় আঙুল তুলে ধরে। বড়-বড় চোখ। চোখগুলো বেন টিকরে বেরিয়ে আসতে চায়।

পাহাড় স্বতিতে অজীত বলে কিছু নেই। পৃথিবী সম্পর্কে আগ্রহ নেই। পরিষ্কার একটি স্টেটের মতো তার মন। আগ্রহের এমন আচরণে অন্নপূর্ণা

ভাবল, গাছ মাছব হয়ে উঠছে। একটা আঙুল দর্প ভরে তুলে ধরেছে শূরের দিকে। সে-সময়ই সহস্র মাছবের অহঙ্কার বাতাসকে ঝাঁকিয়ে যেন ঝড় তোলে।

ইনক্কাব জিম্মাবাদ।

অন্নপূর্ণা ভাবে, গাছ কী সেই আকাজিকত মন্ত্রটা মনে করতে পারছে। মাছবের আনন্দিত জীবন কিরিয়ে দেওয়ার মন্ত্র? কন্ন শ্যামা মামের কাঁধ ধরে বসে বিশ্বয়ে বলে,—

‘মা, খুড়ার সব মনে পড়চে?’

প্রতিশ্রুতি

রত্নেশ্বর হাজারা

বড় লোভের অস্ত্র সংবর শেখাই ছোট লোভকে । তাকে ভোলাই—
 তুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুম চুইয়ে দিই চোখের পাতায়—তার
 হাতে দিই হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প আর অজমনকতা
 পকেট ভরে ডালিম—একটু হলুদ রঙের রঙ ।
 তাকে শেখাই ক্রপদ আর মন্ত্রের উচ্চারণ
 হাতে দিই বুকের সংসার ত্যাপের ছবি—

বড়দের অস্ত্র ছোটদের পাঠাই তুল দক্ষিণে । মেলায় তাদের কাছে
 ছলবেশে বিক্রি করি মুখোশ আর রঙ-করা পলকা বানি—
 কিন্তু তারা তাদের হাতের মধ্যে লুকিয়ে রাখে পদ্মপাতার অল
 সেই অলে পরক্ষণেই ভাসিয়ে দেয়
 নকল কালিতে লেখা আমার দানপত্র ।

বড় লোভের অস্ত্র ছোটখাট লোভগুলো ফেলে দিই
 পরিত্যক্ত নিমগাছের ছায়ায়
 সেই আদাড়ে-বাদাড়েই পুষ্ট হয় তাদের শরীর । একদিন কেউ
 আমার মূঠো খুলে ছড়িয়ে দেয় ঈর্ষাকিন্দলো । আর তৎক্ষণাৎ
 তারা তাদের বৌবন নিয়ে উঠে দাঁড়ায় আমার মুখোমুখি—

মাসুকের আচরণে

তুলসী মুখোপাধ্যায়

মাসুকের আচরণে কোথাও আর একতিল ছুঁপিও নেই
 অথচ দলহিকে দিবানিশি কতো না নিপুণ আয়োজন
 অন্নদিনে সোলাপের তোড়া, ভেঁজেছা আরক চিঠি নতুন বছরে
 বৃত্তাশ্চর্য পাশে প্রগাঢ় সজ্জার মতো সমাহিত শোক
 ধরা ও বজ্রাজ্ঞানে পদবাজী, হুঁসিঁকে কাঁড়াল ভোজন
 বধারীতি সব আছে, জবির পাড়ের মতো পরিপাটি আছে
 দরজার অতিথি হাঁড়ালে আয়ো সেই আগতম হাসি
 বন্ধুর মুখোমুখি আয়ো সেই উজ্জ্বলিত উষ্ণ আলিঙ্গন
 অথচ কোথাও একটুচি ছুঁপিও লেগে নেই আর !

তাহলে পৃথিবী বধল ক'রে হা-হা হাসছে মায়াবী শিশু !

আজ অন্নদিন

সত্য গুহ

বাইরে বেরোতেই একটা গন্ধ পেলাম
 তরুণ গরমের ছুপুয়ে প্রথম বর্ষা লাগলে যেমন হয়
 তেমনি আশ্চর্য ভ্রাণ হয়েছিল
 আমার অন্নদিনে

কবে আমার অন্নদিন, সে ভাবতে বাওয়া অর্থহীন
 এখন পৃথিবীর এই গন্ধে অল্পভব হয়
 আজই—এখনই মাসুকের অন্ন হল এবং

আমার অল্পভূতিতে এই এখন
 একছিটে আলোর রঙ, একটুখানি পাখির সুর, সবুজের হলকা
 আকাশের মায়া

অতিথি জুড়নো বাতাস আর জীবনের ক্ষক
স্বস্তিকার আশীর্ষ সোহাগ

আমার বেশ আরাম লাগছে—মুক্ত বন্দী তার স্বাধীনতার
যেন বিশেষ থেকে নিজের ঘরে কিরল প্রবাসী
কটা বাজছে, ভেঁা গড়ছে, ভেঁপু বাজাচ্ছে লোকাল ট্রেন
জীবনের তাড়া লেগেছে হাটে গড়ে ক্ষেতে কারখানায়
তেমন হয়েছিল ১৯১৭-র সাতুই নভেম্বরে
কলের অলে রগড়ে রগড়ে রাজি হয়ে ফেলে
ধরকন্নায় মন দিয়েছিল সাঝো জননী
আর সকল রকমে হয়ে উঠতে কোনো রকম কোনো দোহাই মানছিল না
নবজাতক

আজ কত তারিখ ...না, পঞ্জিকার কোনো বিহীন নেই
আজ বাট বছরের তরারি আছোর যুবক সেই নবজাতক
অন্নদিন করছে এবং আমি

পৃথিবীর আর পাচ্ছি
বুঝতে পারছি কী ছরত আগ্রহে এই দিন
১৯১৭-র কোলে হাত পা নেড়ে মেড়ে পান করে গেছে বুকের ছব
পেয়েছে অমরত্ব, আমি বুঝতে পারছি
আমারও দিন বড় হবার তাড়নায় তোলপাড় হচ্ছে

বত ভাবছি, বুকে আশা তারে উঠছে
রোদ উঠবে, ছপুয় হবে, সন্ধ্যা গড়াবে, দিন বদল হবে
দেখতে দেখতে বছরের পর বছর গড়িয়ে বাবে
এবং প্রতি বছরই এমনি, এই, দিনে
মাহুকের সন্ততি সমান ভাবে দেখে বাবে
সামনে বরাবর আসন্নসন্ধ্যা বান্ধেত এবং মায়ী মায়ী আকাশ
এবং বেধানেই রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষতবদল হবে
বাহুব হর বেলাবে পাখির সঙ্গে
আমরা আলোকে বাই চলে আমরা আলোকে চলে ঘাই

৬-ই জানুয়ারি, মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে

দাউদ হায়দার

তখন আমি মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মৃতিচারণ করছিলাম।

—আমার মেহের প্রত্যেকটি কোষে, রক্ত বিন্দুতে ধনিত প্রতিধনিত হচ্ছিল
তিনটি শব্দের সমূহ কোলাহল।

তখন আমার চারপাশে বিচ্ছিন্ন ব-বীপের মতো কতকগুলো দৃষ্ট ভেসে উঠল
বা, শৈশব ও কৈশোরের সম্মিলিত চিংকারে উজ্জ্বল পংক্তিমালা

বা, আক্রোশবিশিষ্ট কাছের জিউসের আলিঙ্গন তুচ্ছ এবং বা

ইথোপিয়া কিংবা অলিম্পাসও গৌরব বহন করতে অক্ষম।

এখন এই সমুদ্রতীরে, জুহুর অপরাহ্নে যে রোদ লিখছে গাথা, পরিণাম

আমার শুকনো—অন্ধকার ঠোটে নির্মিত হচ্ছে জয় অসামান্য—বা

চিরকালের অন্তে শোক, অশ্রু, বর্ণা এবং বহমান নদী।

২

আমি দক্ষিণ সমুদ্রে সাহাজ ভালিয়ে দিলাম। আমার পশ্চাত্য অজানা, অতএব
উত্তর থেকে পূর্বে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে নৈঃশব্দে আমার বাজা শুরু হল।

—ঝড় আর অলোচ্ছ্বাসে একাধিক গিরিবন্ধ পেরিয়ে

আমি এক ছায়াচ্ছন্ন বনস্থলীর ভেতরে গিয়ে পৌঁছুলাম।

—এখানে ছোট্ট হৃৎকল আর বহুতোরা-ক্ষটিক জলধারা।

৩

পল্লটি বোধহয় অনেকাংশে হোমর বর্ণিত অধিসিঙ্গলের পাতাল দর্শন বলে মনে
হচ্ছে—

কিন্তু না; তেমন কিছু নয় এবং আমি পাতালের সেইসব সন্ধ্যাবহ কোনো বর্ণনা

দেব না

কে আমার কাছে ছুটে এসে আত্মার কিংবা পরিজনের সংবাদ জানতে চাইলেন

কিংবা

কার সংবাদ দিতে গিয়ে আমি চূর্ণে ভাসাকান্ত হয়েছিলাম।

পাতাল প্রবেশে আমার বাজা বৈবাং, অবশ্য বাজার সঙ্গে সঙ্গে যেন
দৈখারে ঘোষিত হল আমার আগমনবার্তা—যেন দেবহুত, যেন
অবহেলার আমি আবার প্রত্যেককে উদ্ধার করে

বৃষ্টির ভূমণ্ডলে তুলে আনতে পারি।

—আমি তাহের দেখলাম, আমার চুই চোখ তখন কল্পন কল্পন করে উঠল

—আমি এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার আপারমস্তক কাঁপছি যেমন বড়ো ও হাওদায়
আহাজ, গাছপালা এমন কি পাখর পর্যন্ত কাঁপতে থাকে!

এবার জননী আমার কাছে এলেন, শির, জীর্ণ, দ্বান। কিন্তু না,
আমি আমার পিতাকে দেখলাম না।—হরতো তিনি ভুলে গেছেন
গ্রাম, জনপদ, বর, বাড়ি, সম্মানসম্মতি কিংবা এও হতে পারে
তখন তিনি স্মৃতিলিখনে ব্যস্ত!

আমি এবার মায়ের কাছে নতআহ্ন হলাম। যেমন সেজলার মাহুবেরা হয় যেমন
হাটু পেড়ে বলে নামাজীরা প্রার্থনা করে; তেমনি, ঠিক তেমনি
সংশয়ের প্রত্যেকটি পোশাক খুলে নাবালক শিশুর মতো নয় হয়ে
আমি তাকে আলিঙ্গন করলাম।

—তার হাত উঠল চুই চোখের মাঝখানে এবং তিনি বললেন,
আমার দেশবাসী যেন থাকে হৃদেভাতে।

আমি কিরছিলাম। আমার জলযান গেল ভেঙে। ভেসে গেল মাস্তুল, বৈঠা,
পাটাতন—

কিন্তু দৈবর পাটনীর হাত আমার চুই হাতের মধ্যে তখন একা,
ছিন্ন এবং নিশ্চল!

উপকূলে একা।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

নৌকো ভাসিয়ে দিবে

সারারাত সারাদিন

উপকূলে একা।

বহিও বা নৌকো কিরে আসে

চেউয়েই ইচ্ছিতে,

আবার ভেসে যায়।

সারাদিন সারারাত

উপকূলে একা।

হলাং হলাং জল,

নৌকো বুঝি দূরে।

হলাংহল জল,

নৌকো বুঝি কাছে।

সারাদিন সারারাত

উপকূলে একা।

সারারাত সারাদিন

উপকূলে একা।

তুফাকে

গুড বন্ড

বিবর্তায় ভরে গিয়েছে সমস্ত পথ

তুফা আমার আগিয়ে নিয়ে চলো।

বেতাল আগে বাইরে ও অন্তরে

অন্ত আকুল আত্মা বেলার স্থিতি

ওর প্রহরে নগ্ন বেন হঠাৎ

হা হা বিশাল তেপান্তরের অগ্ন্য কক্ষতা
কোথাও সে নেই থাকে পেতেই বেলা
পড়িয়ে বাবার উষ্মে সেই সকাল থেকে খুঁজি
তুফা আমার আগিমে নিয়ে চলো।

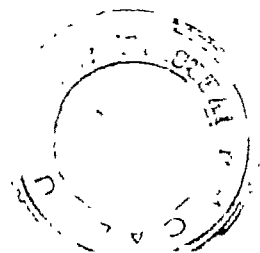
ভালোবাসার শব্দে কবে আকুল
একটি কুঁড়ির বিস্ফোরণের জন্ত
সারা শহর উজাড় করে সেতুর
ঠিক ঠিকানা খুঁজে ফেরার নাছোড় উদ্ভাসতা
এখন হাওয়ায় বহুদিনের কক্ষ বিলাপ
আকাশ জুড়ে ফেরারী সেই পাখির তুলে বাওয়া
জীবন বেন পা ছবছম বিষিয়ে ঐরা প্রহর
তুফা আমার আগিমে নিয়ে চলো।

ভয় পৌষলির করুণান আলোর
এপিটাকময় প্রায়াক্ষকায় আকাশের চক্রে
একটি করুণ মড়ার গুলির পশ্চিমদিকে চলা
সারা দিগন্ত ধরধর বেন শেবের সেহিন
কালপুরুষের বিশাল বাবার উদ্যত, ধরধর
মর্ত্য বেন পাতাল বেন তরু ধেম ধাকা
তুফা আমার আগিমে নিয়ে চলো।

বাওয়া

কুস্তাশিস্ পোস্তামী

বাই বললেই বাওয়া হয় না,
ধেতে হ'লে উদ্যম থাকে চাই।
বাই বললেই বাওয়া হয় না,
উদ্যম থাকলেও নয়,



যেতে হ'লে গম্ভব্য জানা চাই ।
 বাই বললেই বাওয়া হয় না,
 গম্ভব্য জানলেও নয়
 যেতে হ'লে পথের হাশিম জানা চাই ।
 বাই বললেই বাওয়া হয় না,
 পথের হাশিম জানলেও নয়,
 যেতে হ'লে চলার শিল্প জানা চাই ।
 বাই বললেই বাওয়া হয় না,
 চলার শিল্প জানলেও নয়,
 যেতে হ'লে উদ্বেগ থাকে চাই ।
 বাই বললেই বাওয়া হয় না,
 উদ্বেগ থাকলেও নয়,
 যেতে হ'লে বিশ্বাস থাকে চাই ।

অমলী-অমলকুমি

নীয়েন্দু হাজরা

কখনো বহি স্বপ্নে আসে, তবু পড়ে না চোখে
 তোমার মুখ, আমার বেশ, হা হা বাতাস শুধু—
 কী অসম্ভব ! গম্ভবাস শরীর ছেপে ছেপে
 ছড়িয়ে পড়ে ; বুঝি আমার গর্ভধারিণী মা

ঘুরছে চোখে : সময় চলে বৃক্কের মাঝে ঠিক
 বানে ভানে মা, খুঁটে কুড়োর সে তো অমলকুমি—
 তামাহি লেখা হচ্ছে রোজই বামিনী কেটে গেলে
 বেরিয়ে আসে খোলা আলোর সরতে পড়া দিন

হায়, অল্পে আমাদেরই চোখের চাবি ঘোরে
 গাছের ছাল কেটে কেমন শেষ রক্ত বরে

পাশেই ভাঙে নক্সা কাঁধা বুদ্ধি দিয়ে কাঁপছে
শিথিল পাতা, লেগেছে আলো, লেগেছে রোধ গারে—

আমিও নড়ি পাতার মতো, তবু আসে না মনে
সেই নদীটি, হাওয়া পেলে পান্সি পাল তুলে
কোথায় যায় আপন বেগে : মোতের ডরা টানে
আমার হাতে একটা হাল ধরিয়ে দেয় কে।

সতী ও দৈনিক

গুণময় মাস্তা

১

সেগব ছিল বাংলা দেশ মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো। উত্তেজনা আর নেশা, নেশা আর উত্তেজনা, সমস্ত মাহুব সমস্ত আতিকে বেন পাগল করে তুলেছে। চমৎকার সব খবর বেতার-লোকমুখে-সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। গেরিলা বাহিনীর আক্রমণ, ভারতীয় অওয়ানদের বীরত্ব, বনগাঁ সীমান্তে ছটি পাকিস্তানী বিমান ভূপাতিত, তখনও অবশ্য ঢাকার আকাশে ভারতীয় বিমানের অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয় নি।

গোপালদা আজ সন্ধ্যার এক এ্যাট-হোম'এ আমন্ত্রিত হয়েছেন। এই সময় আর্মির অওয়ান এবং অফিসারদের ছুটিছাটা বন্ধ, যে-কোনো সময় ক্রণ্টে ডাক পড়তে পারে, কিন্তু সনুট কোনো রকমে ছ'দিন বাবা-মা'র কাছে কাটিয়ে বাবার অল্পমতি পেয়েছে বিশেষ অল্পগ্রহ হিসেবে। হয়তো তার ইউনিট কলকাতার কাছাকাছি ছিল সে অস্ত্রেও সম্ভব হয়েছিল।

গোপালদা বিকেল থেকে কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লেন। তৈরি হয়ে নিতে তাঁর বেশি সময় লাগল না। গোপালদার পোশাকীয় আদবে সেই টিপিক্যাল বাঙালিমান্না রয়েছে গেছে, এতসব সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও, পা পর্বত লোটারো চণ্ডাপাড় হুতি, ত্রাণ্ডেল আর পাঞ্জাবি—কথানা রত্নিন স্বকর কখনো অকৃত্রিম সিক, যেমন আজকে পরেছিলেন, গলায় বেড় দিয়ে কাঁধের ওপর নক্সাপাড় শাল।

বেয়তে বাচ্ছেন এমন সময় কোন বেজে উঠল। খানিকটা উদাসীনভাবে রিসিটার তুলে নিয়েছিলেন তিনি কিছু ক্রমেই আগ্রহী হয়ে উঠলেন, 'কে, নীলা, কী ব্যাপার বল তো...না, ছাঃখিত, আমি এখনই বেরছি, না গেলেই

নয়... একরকম দরকার? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এ্যাট্রিনি রেন্ট, কাল বিকেলে, নিশ্চয়ই, কথা হিলাস, লক্ষী মেয়ে...'

কোন ছেড়ে এক মুহূর্ত অনিশ্চিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন গোপালদা, জুঁক কঁচকে উঠল একবার, তারপর বেরিয়ে গেলেন।

সনটুয়ের পাটিতে বিশ-পঁচিশ জন উপস্থিত হয়েছিলেন, অধিকাংশই পুরুষ, কয়েকজন মাত্র মহিলা। দরজার মুখেই সনটুয় মা শ্রীমতী ভট্টাচার্য আগত আনালেন। লম্বা চেহারা, অসম্ভব কদা পায়ের রঙ, চওড়াপাড় মুণিদাবাদ সিন্ধের শাখা শাড়িতে তাঁকে বেশ মর্যাদা দিয়েছে, গলার ছোট্ট বুলের মটরমালা, একটু হাসি আছে বোধ হয় মুখে, পাকধরা চুলের ডান দিকে সিঁখি, ছোট্ট একফালি সিঁছর।

'আম্বন, গোপালদাবু! সনটুয়...'

বেয়ারা হৈ এনে সারনে ধরলে, বেন এগিরে যেবেন এমনভাবে ডিলের প্রান্তটা আঙুল দিয়ে ছুলেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য, গোপালদা তুলে নিলেন কক্ষির কাপ।

সনটু এগিরে এসেছে ততক্ষণে। জীপ ব্রুইউজার, হাক-হাতা শার্টের মূল বাহামির ওপর সোনালি এবং পিঙ্কলা রঙের টোন, তার ওপর বোতাম-খোলা হাতাহীন জামা—বাসস্বস্ততার মধ্যে ওর স্বল্প তরুণ মেহের ব্যঞ্জনাই প্রধান। মায়ের মতো কদা নয়, কিন্তু লাবণ্যময়, সামরিক অহুশাসন এবং ব্যায়ামে দেহ সুগঠিত, চোয়াল ভারি হুয়েছে, সব পৌকের রেখায় সৌন্দর্য এবং পুরুবালি ভাব।

শ্রীমতী ভট্টাচার্য তখন সরে গেছেন তাঁর জামা কর্ণেল ভট্টাচার্যের দিকে। তিনি তখন একটা গোফার আরো জন তিনেকের সঙ্গে একটা ছবিগহালা ম্যাগাজিনের ওপর বসে পড়েছেন। তিনি বি-এস-এফ'এর অবসরপ্রাপ্ত।

চলে-বাওয়া মায়ের দিকে হাসিমুখে একটু তাকিয়ে নিয়ে সনটু মুহূর্তের গোপালদাকে বললে, 'মা আজকে আমার সঙ্গে কথা বলছে না...'

'মানে...'

'কাল সকালে আমি চলে যাচ্ছি তো...' অহুচে কিন্তু উদারতার সঙ্গে হেসে উঠল সনটু। 'কিন্তু মায়ের মনে জোর আছে, আই এ্যাডমায়ার হা, মেথুন, সবায় কাছেই যাচ্ছে, কথা বলছে...'

সনটুর পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছে এনা, দক্ষিণ কলকাতার তিনটে মাল্টি-পারপাউন্টের মালিক অন্যতম মজুমদারের কন্যা। বয়েস উনিশ-কুড়ি, ঘন

নীল লুঙ্গির সঙ্গে (সনটু সঙ্গে পরামর্শক্রমে রঙ নির্বাচিত কিনা কে জানে) সোনালি গেঞ্জি, ফাপানো চুলে ছ'মিকে ক্লিপ আঁটা, নাকে নতুন ডিম্বাইনের নাকছাবি। সনটুর বান্ধবী—গোপালদা জানতেন।

সনটুকে পেরিয়ে এনার দিকে তাকিয়ে হাসলেন গোপালদা, 'তালো আহ ? বাপি এসেছেন ?'

'হঁ, ওই বে...'

কর্ণেল ভট্টাচার্যের বিপরীত দিকে একটা জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মজুমদার, সিগারেট ধরাছিলেন, আলোতে তাঁর আঙুলের আঙুটি বিকিরে উঠছিল।

এনা বললে, 'কাকু, আপনি কিছ একটা আবৃত্তি করবেন...'

'আর তোমার পান হচ্ছে নিচ্চই...'

'হ্যাঁ, সনটুরও...' একটু এগিয়ে সনটুর চোখের দিকে তাকাল এনা, সনটু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর ওরা ছ'জনেই সরে গেল, গোপালদা কক্ষের কাপে চুমুক দিলেন।

গোপালদা ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে আনলেন। কেউ বলেছে, কেউ তাঁরই মতো দাঁড়িয়ে পন্ন করছে। অনেকেই তাঁর চেনা। সব রকমেরই মাছব। ডঃ হুগ্গীতি চ্যাটার্জী, এক গার্লস্ কলেজের অধ্যাপক, মিঃ ব্যানার্জী, এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। বিজ্ঞানস একজিবিউটিভ, প্রফেসর, একজন মকাভিনেতাও আছেন।

সনটুর দিকে তাকালেন তিনি, প্রাণোচ্ছল তরুণ, ওর সঙ্গে এঁদের সবাই কোনো না কোনো যোগসুত্র বা সম্পর্ক আছে। এঁরা সকলেই এসেছেন, কেন এসেছেন ?

একটা খালি আরগা বেবে বসলেন গোপালদা। হঠাৎ তাঁর মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির মতো লাগল, কারণটা ঠিক বুঝতে পারলেন না।

এক সময় এনা ঘরের মারামারি জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘিনঝিনে গলায় বলে উঠল, 'এ্যাটেনশন, প্রীজ...'

বে-বে-ববব্বা হিল তাকাল, কথা বলা বা না-বলার ভঙ্গি লেগে আছে চোখেমুখে। এনা বললে, 'সনটু একটা পান গাইবে, আমি একটা, তারপর গোপাল কাকু আবৃত্তি করবেন...'

'ওয়েল, ডাট্‌স্ ডড...' কর্ণেল ভট্টাচার্য বলে উঠলেন, সমর্থন করলেন অন্তরা।

সনটু ডান হাতটা তাল দেবার যতো দোলাতে দোলাতে একটা হিন্দী গান
বরল, এস-জি-বর্মণের সুর-শ্রেণী একটা জনপ্রিয় কিস্কী সীত। গোপালদা
আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, সনটুর গলার এখনো উঠতি বয়েসের বশ-বসা
ভাবটা যায় নি। এনা গাইল উল্টোদিকের গান, অরাজাব বাও পো—।
ভাবী বধুর উপবোধী বটে। গোপালদার হঠাৎ কী খেয়াল হল, তাঁর পালা
এলে আবৃত্তি করলেন, অত চুপিচুপি কেন কথা কও, ওপো মরণ হে মোর
মরণ। বরবধুর কবিতা।

বিদায় নেবার সময় সনটু একলাই ঘরের বাইরে গোপালদার সঙ্গে কিছুটা
এল। বললে, ‘কাকু, আপনার আবৃত্তি আমার খুব ভালো লেগেছে। একটা
জিনিস দিচ্ছি, কটোপ্রাক একটা, বাড়ি গিয়ে দেখবেন...’ বলে ওর হাতে
একটা বস্তু করা খাম তুলে দিল।

গোপালদা সনটুর হাসিভরা চোখের দিকে তাকালেন, কিন্তু তখনই দৃষ্টি
কিরিয়ে নিতে পারলেন না, ‘ইইন্ লাইফ...সিমলাইজ্‌ড্‌!’

২

পরের দিন প্রাসাদোপম বাড়িটার সময় হরজা দিয়ে ঢুকলেন গোপালদা,
নিশ্চিত গতিতে দোতলার উঠে বা দিকের ঘরের কোলানো পর্দার সামনে
দাঁড়ালেন, ভেতর থেকে গুনগুন শব্দে শেরে হাসলেন একটু, ‘মে আই
কাই ইন?’

সরানো পর্দার ফাঁকে একটি উনজিশ-জিশ বৎসরের মেয়ের মুখ দেখা গেল,
‘আজ্ঞন।’ পর্দাটা আর একটু সরিয়ে দিলে নীলা, গোপালদা ঢুকলেন।

‘কী করছ...’

গোপালদার দিকে তাকাল নীলা, তার কালো বকঝকে চোখ দুটো
হাসছে। বললে, ‘কিছু ন’, বহ্নন...’

‘কাল অত তাড়া দিচ্ছিলে কেন...আঃ, চা রেজি দেখছি...’

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না নীলা, বীয়েজ্‌ছে চা ঢালতে লাগল। এক সময়
একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে এবং নিজেকে একটা নিয়ে বললে, ‘গোপালদা, একটা
বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করা আমার জীবন হরকার, আমি একটা
ছবি আঁকছি...’

‘ত কান অব ইট, তোমার সঙ্গে আমারও হরকার। বাই মি বাই, গেল
লগ্নাহে এসে গুনলাম তুমি কলকাতায় নেই, বাসিবাড়ি গিয়েছ, বোঝে?’

‘না-না, এ আর এক মাসি, একেবারেই ঘরের পাশে ছুই পা ফেলিয়া...’ বলে নীলা একটা গ্রামের নাম বলল।

‘তা একটা ধানের শিষের উপরে একটা শিশিরবিন্দু দেখা হল?’

সেন্টার টেবিলের কাচের ওপর এক ফোঁটা চা পড়েছিল। সফ্রু কড়ে আঙুলের ডগাটা উল্লম্বভাবে বিন্দুটার ওপর চেপে হিজিবিজি টানতে লাগল নীলা, বললে, ‘দেখিনি, শুনেছি। আগেকার আমলের গল্প...’

নীলার আঙুল চলতে লাগল কিন্তু চূপ করে রইল অনেকক্ষণ।

‘গোপালদা, আইডিয়াকে ধরে রাখা যায় না কেন স্থায়ী রূপে? আর যদি একটা টাচ দিলেন আপনি, আপনার মন থেকে কিছুতেই সংশয় কাটে না, আপনি যেটাকে মনে মনে দেখছেন অতি স্পষ্টরূপে, সেটাকেই রঙ আর তুলিতে ছুটিয়ে তুলতে পারছেন না কেন? যাক গে, আপনি আমার কী মনে বলবেন?’

‘তাহলে ফোলিও ব্যাগটি উন্মোচন করতে হয়...’

‘কখন...’

‘ছেলেটির নাম সমীর ভট্টাচার্য, আমার সঙ্গে রক্ত-সম্পর্ক নেই কিন্তু আমার পরমাত্মীয় বলতে পারো, ইণ্ডিয়ান আর্মির ইস্টার্ন কমান্ডের এক ক্যাপ্টেন...’ বলতে বলতে গতকাল সন্ট্রের থেকে পাওয়া ফটোগ্রাফ বের করে নীলার সামনে মেলে ধরলেন।

নীলা হুঁকে পড়ে ছবিটা দেখছিল, ‘আমাকে কী বলতে চাইছিলেন?’

‘তোমাকে দিয়ে গুরু একটা পোর্ট্রেট করতে চাই...’

‘পোর্ট্রেট!’ তত্বগি মুখ তুলে তাকাল নীলা।

‘পোর্ট্রেট, হ্যা, ওই কথাই বলেছি আমি। কিন্তু তুমি অবাক হচ্ছে মনে হয়!’

‘গোপালদা, আপনার এই ছেলেটির ফটোগ্রাফ দেখে মনে হয় হি ইজ এ পারফেক্ট এ্যাপলো, কিন্তু আপনাকে একথা বলা আমার দৃষ্টতা, পারকেই কিংগার হলেই কি তা আর্টিস্টের বিষয় হয়?’

‘আর একটু ব্যাখ্যা কর...’

‘এ্যান ইমাজিনেটিভ এক্সপীরিয়েন্স, ফিজিক নয়, এ্যান আইডিয়া এ্যাক্সিউটেভিভ্‌লি বডি...’

‘কোরাইট ও-কে, মোস্ট সার্টেনলি আমি তোমাকে সেই আইডিয়া দিতে পারি...’

হঠাৎ থেমে গিয়েছেন দেখে নীলা বললে, ‘কী...’

‘সু আইডিয়া, ঠিক...মিস-এ্যাপলো, এই বোবনের রূপমূর্তি...ইয়েস, হী উড বী কিল্ড, ইট্‌স এ ম্যাটা অব ডেজ...না-না, সে শহীদ হবে, আজ সকালেই সে ফ্রন্টে গেছে...’

গোপালদা বেন মুখে-চোখে হাসিটা টেনে রাখতে চাচ্ছেন কিন্তু নীলা দেখলে তাঁর দৃষ্টিতে বেদনার নীল বাষ্প ছুলছে।

‘নীলা, কাল সন্ধ্যায় ওরই বিদায়-সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম, আমরা, বর্ষিষ্ঠরা, আমরা সব আন্দ্রীয়-স্বজন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, রিটার্ডার্ড কর্নেল, প্রিন্সিপাল, অভিনেতা, বা-প্রোগ্রসী, সবাই কাল আমরা স্বত্তি-বচন উচ্চারণ করেছি...’

ছির বড় বড় চোখে নীলা ওঁর দিকে তাকিয়েছিল, আশে আশে বললে, ‘আশ্চর্য, টেলিপ্যাথি না কি?’

‘টেলিপ্যাথি...’

সহসা উঠে দাঁড়াল নীলা, ‘গোপালদা, আমার ছবিটা রেখবেন আত্মন, চলুন ওপরে...’

‘চল...’

নীলাদের বাড়ির তিন তলার একখানা মাত্র ঘর, সামনে খোলা ছাদ। সেটাই তার স্টুডিও। এ ঘরে গোপালদা আগেরও এসেছেন। ছাদ পেরিয়ে ঘরে ঢুকবার সময় প্রতি বারই যেমন হয়, তেমনি একটা ঐকান্তিকতা এবারও বোধ করলেন। জানালা-দরজা বন বুননি রঙের দামি পর্দা দিয়ে ঢাকা, এক দিকের একটা ঘেরালে পুরোপুরি নানা রকম ছবি, অশীকার সরঞ্জাম, টেবিল, ইজেল সাজানো।

গোপালদা ঢুকেই বুঝতে পারলেন কোন ছবিটা নিয়ে নীলা এখন কাজ করছে, যেটাকে সে না কি অভিশ্রুত রূপ দিতে পারছে না। ছবিটার সামনে একবার দাঁড়িয়ে পিছিয়ে এলেন গোপালদা, সোকার ওপর বসে আরো নিবিষ্টভাবে লক্ষ করতে লাগলেন।

নদীর ধারে একটি মেয়ের ছবি। পাড় থেকে নেমে এসে যেঠো পথ বেবানে গলে মিশেছে, সেখানে কলসী রেখে তাকিয়ে আছে নদীর ওপারে নিগন্ত পর্বত বিস্তৃত ধানের মাঠের দিকে। গ্রামের বধূ, কিন্তু দীর্ঘাঙ্গের বেশ আভিজাত্য। চণ্ডা লালপাড় শাড়া শাড়ি। পাশের থেকে দেখানো, এক রাশ চুল গালের আঁচেরটা ঢেকে গিঠের ওপর এসে পড়েছে।

নীলাও গোপালদার পাশে বসে ছবিটার দিকে তাকিয়েছিল। বললে,
'আপনি কিছু বলবেন আশা করছি...'

'ভীপ কালার স্টাডি...চুলের কালোর সঙ্গে পাড়ের লাল যে এমন ব্যালান্স
অষ্ট করতে পারে না দেখলে আমি ভাবতে পারতাম না। তুমি কি ওকে
খুব কর্ণা দেখাতে চাও?'

'জেনেছি, তিনি প্রকৃতই গুজ্জা ছিলেন।'

'তুমি মাঠের রঙ সবুজ না দিয়ে কালো-শিল্প-হলুদে কিছু বোঝাতে চাইছ।
মেয়েটির গালে-মুখে আলোর আভা, বুকে পারছি না ভোরের না সূর্য্যোত্তর...'

'ধরুন, যে কোনো একটা হতে পারে...হতে পারে চিত্রার আলোকে
রানীর মুখখানা দীপ্যমান, হাত পারে না, গোপালদা?'

'কী বলতে চাও তুমি, নীলা...?' গোপালদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ওর
মুখের দিকে।

'আমার ছবির নাম, সত্যী...এই মেয়েটি সত্যী হয়েছিল।'

'তুমি কি গ্রামে গিয়ে এই অভিজ্ঞতাই নিয়ে এসেছ?'

'আমি বলছি ওহন...আনিদা, আমি ঠিক বোঝাতে পারব কি না...'

তোতা

বিশ্বনাথ বসু

কড়াই কালো চামড়ার পিঠ ভেঙে বারোটায়-রোদে আজ বামা খণ্ড করে
আমাই বাজারের তোতা। তেলাপিয়া, কই ইত্যাদি মৎস্য চাবের অস্ত
অলসরে কেনা আয়গায় নাকি বড়াল বানিয়ার ভাঙ্কার দালানও হবে। এ-
রকম ঢিলা অমিতে আগে লাগে ঠালাস্তিৎ। ওদিকে রাত্তার ধারে বালি আর
ছড়ি-পাখরের মজুত ২নং কালীঘাট রোডের কালভার্টটার কাছে চেলা-
বাকলের উনানের গনগনায় পিচ পলে। পিচপোড়া কেউটিয়া ধোঁয়া ছড়িয়ে
চারিদিক আড়াল করে দেয়—বেন তারপরই পাতাল। লোহার ত্রাশ ঘবে-ঘবে
রাত্তার হাড় পাজরার কত পরিকাবের মজুরি করছে যে চুই বুড়ি ও অস্ত্রাস্ত্রা
খলখসা ধোঁয়ার আটকে ঘিলা ও নাসার দেশে কৈ যাচ্ছের মত শাস নেয়।
ধূম্রহালেই জড়ানো চিকন শিক্ত, মালভোগ আর নোনার পাতারা।

কি কাজ নেই বা তোতা অল্পভালো জানে না? বেড়া দেয়—বাবুদের
বাড়ির বাইরের আঙিনায় সুন্দর ফুল বাগান বা পেছনঘর ক্ষেত বানানোর
কামলা-কাম। মাঘ মাসের আরামিয়া রোদে বসে গ্লাইউন্ডের পাতি সাজিয়ে
বাঙিল করা আর বয়ামি বনে সেই পাতিতে চাল ছাওয়া। আদাড়ে কচুলতি,
চেকি, তলজমা কলমী, হেলেকা তুলে এনে আমাই বাজারে বাবাবচী ব্যবসা।
তাছাড়া উৎসব, পরব, পাড়ার জলসায় পটমণ্ডপ করা, কাইকরমাস খাটা অথবা
লোকান্তাবে কামার শালায় মাধার ভেজা পামছা দিয়ে হাকর টানা অবধি।
আকাশে তাকাতেই ঐ যে দেখা যায় চালকলের টিনের চাল রাঙছে—পায়ে
তাকড়া জড়িয়ে রঙ মিলিরা বেন তাতালো তামাষ তুলিমায়ে আর চাল হয়
লাল, এ-রকম কাজও তোতাকে করতে হয়। ভজন ঠিকাদারের গুয়েয়ে সে
শ্রিং লাগানো হাঁটু অবধি চোট বাঁচানোর ছুতা পারে, ঠাণ্ডায়, ভূটান পাহাড়ে

—দড়িতে ঝুলে ঝুলে, অলের পাইপ লাগানোর বিপজ্জনক কাজ করত এবং ঘোর বর্ষার চিলাপাতার জ্বালালে কাটা লগে নম্বর লাগাত।

গভাবিষন ঠাকুরবাড়ির অমিতেই জামাইবাজার। ভাড়া ও হাটাই তোলা হয়। পুরাতন দেবাগাঁৱের দেয়াল নোনাষ নরম, ভাঙলায় পিছল—গল্লরের ডাণসা অঙ্ককারে আগ্রত ঘনভ্রাম ও রক্তাক্ত পাখাণ মূর্তিঘরের রূপালি সোনালি চোখ ভয়ানক অলজলায়। সন্দেহ হয়, এখানে অনেক আগে নরবলি দেয়া হত। পেছনে যে গলা দ্বিধি তার গহীন অনড় জলে ভল্লবাড়ির লোক বউয়েরা-মেয়েরা ইতিমধ্যেই নাইড়ে গেছে। অস্তথা কেবল জামাল মিশ্রির এক-পা-কাটা মেটাই—জলের কিনারে নীলশাড়িতে যেন বক। ক্রাচে ভয় দ্বিধে সে কনাতোলা অল আলাতের ভক্তিমায় গলাতোলা ও নামানো দল্লাল রাজহাঁসের কচুরি পানার কচি-কচি পাতা খাওয়া দেখছিল। এই বদনামও দেয়া হয় যে পুরোহিত হিন্দির কমিটির সেক্রেটারি বড়াল বানিয়ার সাথে বোপলাঅশে দেবকুমির ভাড়া, তিথিপরবের আর দান নাকি আশ্রমাৎ করে। তাছাড়া নীরদ ভাস্কারের সহায়তায় নাকি অনাচারও ঘটে। অবশ্য দেবপ্রিয় সেবকদের নিবেদন হল যে, বছর-বছর ওরা কেন তবে নেহাত অভিযোগকারীই থেকে যায়? কেউ কি পারে, যদি না, তাকে দিয়ে করিবে নেয়া হয়? এইতো এবার নামকঙ্ক অছঠানের কালে কোচবিহারের গর্ব বিলাতে-চাকুরে ঠাকুর পাড়ার ছেলোটর সাথে নহবৎ বাজিয়ে আমেরিকান বউয়ের হিন্দুমতে বিয়ে হল। আর-এক সাহেব নামাবলী গারে, মৃণ্ডিতমস্তকে এক গোছা-টিকি নিয়ে হেঁটে এসে হঠাৎ হাজির। জুল-কলেজ নানা আয়গায় কুকতব্বের ও কতরকমের যে দামি দামি সব বই বেচল আর বিলাল। তারপরেতে নামগানের ভাবে বিভোর শিখিল বসন নাচল, যেন সাক্ষাৎ-চৈতন্য। এইভাবেই সে নামাজত মাতায়। আহা! বিহার জুলিরে মাতায়। সবই যেন মায়। অছঠানও তাই হলো আধুনিক। একালে আর ধর্ম নাই? গোড়াই যে প্রমাণপুরুষ।

ওবার্কসপের মোটা মালিক ধেতে গেছে। মুখরকার মুখোশ আরনার মতো ধরে গ্রিল-ব্লাইয়ের কাজ করছে তেলকালো ভাঙলায়, বার্ণারের ধনেশ ঠোট থেকে জুলন্ত্রিয় জুলকি রাতে যেন তুবড়ি হয়ে নীলাভ বৈদ্যুতিতে ভোর হয়ে যায়। সাঁড়াশিতে ছেনি লাগিয়ে ঠু ঠু। খাতব শব্দে লোহার পাত কাটা হয়। চারজন বিহারী বিরাট হাতুড় হেনে গরম লাল মত্ত একখণ্ড লোহা গড়ে পিটে রূপ দিচ্ছে। ভেতরে-বাইরে লেদমেশিন, ইত্যাদির আওয়াজ আর কারিগরি ব্যস্ততা। এক কোণায় হাতে-চানা হাকরের প্রাম্য ভাবায়

তাতির আঙনে কেতলি বসিয়ে ঠাণ্ডা চাটা পরম করা হল। জাংড়া-ঠেলাগুলা ঠেলাটা ফেলে গুটি-আসা কাঠাল গাছটার তলে পায়ের মচকানো মাংস থেকে পিচ বগড়ে তোলে, একটু কেরোসিন পেলেই যেন কোনো আকশোন ছিল না। কয়রগাছের লতানো ছোবা ফল, ছোবা আর কাপড় কাচা সাবানেই গা পতর তকতকা হয়; জিলেপি গাছগুলোর কালো পাখর-বাটির মতো ঠাণ্ডা ছায়া আর সুপারি ফুলের বাঁশ যেন স্বরস্বরা ঘি-ভাত—তোতারও আন করতে ইচ্ছা জাগে। এন. ভি. এক ট্রেনিং-সেন্টারের বাইরে যেন হলুদ প্রজাপতির ময় শেরালকাটা ও দণ্ডকলসের মাঠে ঝড়িয়ে বেহারি বউ অবিকল তোতার গলায় ছাপল কয়টাকে জল খেতে ডাকতে থাকে। পায়ের কাছে রোহ-উফ জল ভরা বালতি। হস্তে হয়ে আ আ করে ডাকতে ডাকতে তারের কীক দিয়ে মাথা পিঠ গলিয়ে দেয়, বাজে ভাবো কয়বার কাশে। আর তারপর হাত বুকে বউকে তারকাটার বেড়ায় প্রায় ভর দিতে হয়—লটকে থেকে যেন জিরায়।

এখান থেকেই যেন যেথা যায় প্রাইউড ক্যান্ট্রিতে হাত-কড়াতে লগ চেয়েই—অঙ্কে র লোকগুলো যেন সপ্তদাগরি নৌকার বৈঠা মায়ছে উক জলাশয়ে। শুদামের মাঠে পাহাড়ের উচ্চতার পাতির আড়ত। মালিকের নাকি কলকাতায় কয়েকটা সিনেমা হলও আছে। ক্যান্ট্রির ভেতর থেকে গুহ্বারে লম্বা কাটারি ঢোকানো হরিজন বস্তির শুদারটার চিংকারের মতো বিচ্ছাৎস্বরের বজ্রা। আম, শিমুল কাঠের শুঁড়োর ধরকে লাগ পুড়ে যায়। এদের বউ, বুড়িরা রাস্তার টিপকলে আন করে, কাপড় ঘোর আর এখন বকবক করে থালা পাতিল মায়ছে। এদেরই কাউকে কের সন্ধ্যায় রাতে মোড়ের চায়ের দোকানটার টেবিল বেঞ্চি কাপ স্টেট সাফা করতে হয়। সেই চায়ের দোকানেই বাহ্যবান কারিগর ডাক্তারদের সুপরে টিনের সুপটি ধর বন্ধ করে শালকাঠের দাঁউ দাঁউ আঁচে বড় বড় রসগোলা জাল দেয়, একা। আর, বারার বেড়ায় হেলান দিয়ে ফুলো কোলে বিড়ির পাতা কাটে, বিড়ি বানার বালা বিধবা হিদি, নাপিতের বউ ও আইবুড়ো মেয়েরা। কানাই বাঁশি-কলাবাগানের কাছে, খারাপ পাড়ার, চুনিয়া কুমড়ো-গড়ানো চালে কবুতর ওড়ে, সেখানেই বিরে বাড়িতে রাতে ছাছাক জালিয়ে ব্যাগুপার্ট বাজনার নটনী নাচে। আর অবেলায় নাবালিকা মহিষের মতো মাতালের বলাৎকারে নট হতে দেয়।

টেশন ইয়ার্ডে আনলোড-মাল বসি। খালি তেলের টিন উপুড় করে বস্তুরা লোকেরা মিঠা তেলের তলানি জোগাড় করে। রেলের পাহাযাদাররা

যেন কিছুই বলে না। অবশ্যই শুদ্ধ, চিনি, আনাঙ্গপাতি খালাসের সময় অনেক কাণ্ড ঘটে। এমন কি পা-কাটা মেটাও বধাসাধ্য ছাঁচড়ানো করে আর যেলের পুলিশ-লাঠি তাক করে তেড়ে তেড়ে যায়, কখনো মাথাও ফাটে, হাত ভাঙে। তবে মরীয়াপনা অবিখ্যস্ত। পাহারাদার হরত যেনে গিয়ে কোনো তালকানা বুড়িকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল, লবনও পড়ে গেল। এমনি এক-চোখা চেংড়ি বা লাভণ্যবড় সামান্য ছেনালিতেই পাহারাদার গাড়লকে কাবু করে ফেলল। ততক্ষণে অস্ত্রাস্ত্রা চাকু-খুন্ডি খুঁচিয়ে বস্তায় বোঁরা বানিয়েছে। সেই চিনি বর্ণার তলে পাতা, যেন মকতুবিতের গামলা, মাস, কাঁধা বা পতর নর-করা ভাতা শাড়ি।

এইভাবেই খোন্ডা, কোনাল, কসাই-ভোজালি ও বটিহাও দিয়ে আজ ইস্ট ইণ্ডিয়া প্রাইভেট কোং-এর লগের ছাল-বাকল ছাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে। টের পেয়ে গিয়ে অতি আগরটি ক্রাচে ভয় দিয়ে লাইনের মার বরাবর যেমন ভাবে দৌড়ে আসছে তাতে ভয় লোহার চাকায় পা ধুও হয়ে বাওয়ার দৃষ্টিরই পুনরাবৃত্তি হবে। ওকে ও-ভাবে দৌড়তে দেখতে তোতার আর ভালো লাগে না। বেশ তো ছিল দ্বিধার পাড়ে নীল বক হয়ে। বলে, কোনো কাজ নেই—হয় বাপ-মা করে যাচ্ছেতাই গালি-গালাজ করবে, নয় তোতলানি নকল করে ভ্যাডাবে, অবশ্যভাবে হাসবে। একএক-সময় তোতার তীব্র কামনা হয়। বকটাকে আচমকা লুটে নিয়ে সে চার রিজারভার্ড বার্মা সেল ওয়েল ভিপোর আরপাটার চলে যেতে। টাঙ্গাওয়ালার ধুরা ঘর ও আতা-বলেয় পেছনে ঘোড়ার নাশা-মুতে উৎকর্ষ নরকের পাশেও স্থানটি তুতুদুধা জনশ্রুতি। লোহার গোট উপড়ানো, তালাবন্ধ টিনের শুদাম ও আনালা দরজা কাচভাঙা অকিস ঘর। মাছপাতা, ভাঙা অংলার সিমেন্টের মোটা পাথরতে শোয়ানো এবং মাটিতে গার ভাইনোসর আকৃতি রূপালি ছোটো তেলের রিজারভার। তার রৌদ্র ঝলসানো চওড়া পায়ে লেখা : হাইলি ইনস্কেমবেল বই বেয়ে উপরেও বাওয়া যায়।

আঠালি-ভাবনাটা ছাড়তে আর চক্ৰিশ পরশা রেটে আরো কয়টিন বাঁমা ভাঙতে, বিড়ি ধরিয়ে অন্তমনক হয়ে তোতা মেখে অনেকেই আমাই-বাজারে যাচ্ছে। তোতা খুশি হয় ‘তালে বেলাও তেমন না।’ এইসব এলাকার ব্যাগারগুলো এরকমের।

আর যখন কোনো কাজ জোটে না? বছরের কোনো কোনো সময় কাজের আকাল দেখা দেয়। সে-অবস্থায় তোতাকে কাপে-হাঙচি হয়ে,

পলার গামছা জড়িয়ে, বাবুপাড়ার যেতে হয়। সে আর রাত্তা দিবে চলতে পারে না, নালার কিনার ঘেঁষে হেঁট হয়ে হাঁটে। প্রজাবৎসল মংগারাজ্যর গন্ত রাক্ষসানীতে মেজাজের বাড়ি এখনও আছে। বাড়ি বেছে নিয়ে তোতা হাঁক ছাড়ে—হরিবোউল। বউল হরি। হরি। চাল খাও মাউগো। কখনো এরকম চিংকারে তোতার পলার নীল রঙে বেন টান লাগে বা গামছাপলাও চিরে যায়। সে কাশ টেনে খুৎকার করে।

বলাজ্যঠা বাড়ি, পাড়ার বাচ্চাকাচ্চাকে জড় করতে থাকে ‘এ্যাই মানতু রাঙ্কু। এ্যাই রোজি, ফুল, ঝিকি। ছাখ হরিবোল এসেছে হরিবোল।’

তোতাকে পেলেই বাচ্চাবড়দের হৈ চৈ ছল্লোড় লেগে যায়। পার্শ্ব আর রোজি একসাথে বলে ওঠে—‘হরিবোল দা, হরিবোল বিয়া করবি, বিয়া?’

‘খইত্ৰা ডুফং’! এই-কথাতেই বাচ্চারা আমোদ পেয়ে খেলনার পিয়ানোর মতো বাজে।

কুরুশ কাঁটা, উলবুনতে-বুনতে বা কোলের বাচ্চাকে কুধ-চাটা ভোলাতে মেয়েরউরা বারান্দায় এসে দাঁবং হাসে। ছোট শালীর গোলাপি হাত চেপে ধরে টেনে এনে আমাইবাবু বলেন—‘এই তোমার অমিতান্ত বচ্চন।’

তোতা অন্ত না-বুঝে দাঁত বের করে চাইতেই চিট বেন চোখে লাগে। তাড়াতাড়ি সে তোড়লাং-‘মাউগো, রানীমাঘো, চাউল দাওহ। খাটার নাই, খাম নাই।’ কথা বলার সময় তার সারা দেহে কেমন বেন কম্পন হয়, চোয়াল-ভাঙা কর্কশ মুখটা বেকে যায় বেন পক্ষাঘাতে। বলাজ্যঠা চোখ নাড়িয়ে বলে—‘অভিনয়! ছাখ রোজি, হরিবোল কেমন করে ভিক্ষে চায়। ওয় পলার আছে হোলা বিলাই।

‘ঝিকি কি চাল দিবি নাকিরে?’

‘হাঁগা দেব’ ঝিকির বেন অপমান লাগে।

‘ঝিকি তুমি ভারি অসম্মত হচ্ছে। আহুক আজ তোমার বাগি, বাজার থেকে।’

কুরুশকাঁটা না ধামিয়েই ঝিকির মা মেয়েকে ধমকায়। ঝিকির চোখ ছলছলায়।

‘মাউগো বোঝে না। বাচ্চা! বাচ্চা!’ চিরুনিহীন চুল আউলাং কাউলাং করে নিয়ে এম্পারার সার্কালের ক্লাউনের মতো নিজেরই গালে বেশ ছোরে চড় মেয়ে তোতা বলে,—‘এ এ এই যে মিহলি মিহলি। আমি কইহু মাছ খিনলাম, কইদের পেটং এত বড়হ বড়হ ডিম। আ আ আর তোমার বাসাতো আনবেনে পুঁউটি মাছ, তো তো থাকে টিপটিপির ডিম।’

ঝিকি মেয়েটি সব ভুলে এখন আহ্লাদে হেসে দিতেই তোতা চালট।
‘আমায় করে নিয়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু তার কথা অতুলের অন্তরে তো
এত সব, নইলে কাঙালিপনা কে আর উপভোগ করে ?

‘হরিবোল কিছু পালালো।’ ধলাজ্যাঠা এই কথায় রাজাগিদি এইবাব
বিছানা থেকে নেমে এসে একগাছা জর্দা মুখে ধেলে না-রাগ না-হাসিতে
জানতেই যেন চায়—‘ভিক্ষেই করো ? কাজ কাম করতে পারো না ?’

—পরি তো।

—‘কি পর শুনি ?’

বেড়হা দেই, ঘর গহড়ি, বড় লাঘাই। তরগারি বাধান পারি, বেঘুন,
‘তুল ককি, লাউৎ!’ বকবক করতে তোতার যেন কাঠচেরাইয়ের চাইতে
বেশি ডাকত লাগে। আর তাই হাত কাঁধ মাথা অত নড়ে।

এ-রহস্য নাকি সকলেই জানে; বিয়ের কথা তুললে হরিবোলকে আর
ভাগানো যায় না ? তাই কেউ-না-কেউ বারোমাসা আমের মতো মজাতে
বলবেই—‘হরিবোল বউ নাই, বউ ?’

স্বিক্সার কাণ্টিনাতা গনা মামার মত ভীষণ বিবরী আর ক্যাবলা
লোক হতে পারেন, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর অফিসারের ওয়াইফের মত রুচিশীলা
মহিলা, প্রাইউন্ডের মিসিবাবা; তিনি বা লেবচারারও হবেন, যিনি শব্দ
ব্যবহারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর আর ধীর গবেষণার অংশ পলিটিকস উইদাউট
লিটারেচার এ্যাণ্ড লিটারেচার উইদাউট পলিটিকস, প্রবলেমস অব কমিউনিজম
ধরনের সূচ্যবান করেন জার্নালে চমৎকার প্রকাশিত হয়।

অগত্যা তোতা হাত কপালে সানাইয়ে জবাব দেয়—‘জামরা নাই, জমিন
নাই, ঘর বামা কাকর কোনই নাই। দিবেন একঠা ? বউহো নাই।
‘রামা গরি ভাল ভাত, মাংস-মাছ খাইব না। ভিক্ষাই মাগি। হামরা বাবু
হত ভাচ্চা।’ তারপর সে ষাওয়ার হাতে পায়খানা লেগেছে এমন ভাবে
নাক কুঁচকিয়ে বলে—‘বিহা ভাল না। তোমরাই পর বাবা, তোমরাই
বিদ্যা গয়। বারাম্মার চেয়ারে নির্ধিকার বসে থাকে ছেলটাকে দেখিয়ে—
‘বউই নাই ? বউ ? কার্তিক কান্তি যুবক গম্ভীর ভাবে উঠে গিয়ে নারিকায়
মত রুশসী বউয়ের ঘোমটা ধেলে দেয়। বউ বাগের ভানে বলে—‘বেলাজ।’
ছোটশালী ছুটে গিয়ে রেকর্ড মেয়ারে, ‘আমি বউ তুমি বয়। তুমি কি আমার
পর ?’ গানটা ছেড়ে দিয়ে আসে। জামাইবাবুব শালির কান মলে দেয়।
লেবচারার ভাবতে পারে, প্রবলেমটা হল ব্যাটা আসলে ম্যাসোচিজমেরই

ভূগছে। অবশ্য কয়েকটা ড্রাগেই আড়িষ্ট করে তোলা যায়। নামকরা নেতা গ্রাম ভ্রমণে কিভাবে লোকটাকে ভবিষ্যতে ইলেকশনে ও দেশের কাজে ইউটাইলিজ করা বাবে। আর রাস্তা তোতা মাটিতে উবু হয়ে বলে দানা মুখের ভেতর কেনানো লালাকাশ ভ্রুনে কেলে। আড় চোখে সে মাখন-মোলায়েম মেয়েদের দেখে। তালোই লাগে। চাকরটা হঠাৎ কোচ ডাবার গালিগালাজ দিয়ে একটা কাক ডাড়ায়। কোনো দিন অধিকতর রগড় করতে পারলে একটু বেশি করেই পার সে চাল-লবন।

রাস্তার কাছ আমাই-বাজার হয়ে জাশেনাল হাইরোডের দিকে চলে যেতে থাকবে। চেলাকাঠের চুলাতে বেলচা মাচার লাই-মামানো তৎপরতা। পামবুট পায়ে বেন এক নালি পিচ ভরা-ঝারি ছলিয়ে-ছলিয়ে ফুলবাগানে জল ছড়ায়। কাটা-ড্রামের স্টে চার বা মাচার পরমপাথর ও ভাঙ্গাবালি চারজন করে হাতে-কাঁধে বসে নিয়ে যায়। টারারের আশাল নারকোল দড়িতে বেঁধে করজন সাকাকরা ডাড়ায় পিচ-পাথরের মশলা বসার বা হাত নাড়লায় ঠেলে-ঠেলে বাহামি বালি বেন লেগে। এরা কেত কামলার মতো আলকাটা কোদালি ও চা বাগানের লেবরদের দক্ষতার ফরয়ার মতোই হাত নাড়লাগুলো চালায়।

‘—কেবল মাল্যদানটা হয় গেইসে।’ কাজে ব্যস্ত তোতার কানে কথাটা এলো। সে কেবল চোখ মোড়া ভুলে দেখে, হাতনাড়লা হাতে লমামাহুখটা সভ গ্রাম থেকে এসে ঘটনাটা বলছে। কেউ কোনো রাও না দিয়ে কাজ করতে-করতে সুনতে থাকায় বেচারি বেন পাত্তা না পেয়ে ধেমে যায়। পিচের অসংখ্য ছিটায় ভরানো কাপড়ে স্থখ্যাতি-লাগা বা ছেলেটাকে গছালি বোল-আসা আরগাছটার এক কানি ছায়ারায় বসিয়ে রেখে বেলচা করে মোটা চিনির দানা মতো হাঁকা বালি সাগানো জায়গায় ছিটায়। আবার বালিভূপে পাঁধা উন্টো রাইফেল বেন বেলচা গুলো। চৈত্র-বাতালে আলকাতরা বোয়া ঘুরে ঘুরে সরে গেলে আউৎসরদের রঙই পাণ্টে যায় ‘আগাম ফাগুয়ার।’ অতদিকে রোলারটার মাটি দালান ধরধরানো যাতায়াত। এই রাস্তাই চলে বাবে সম্ভবত। রাজগড় ছাড়িয়ে।

ধরাপড়া রোদে তোতা বড়াল বানিয়ার দালানের ডাল ভিৎ-গড়ার অস্ত্র-আমাই ভেঙে যায়। রাস্তার ধারে কেলা বালি, ছড়ি পাথর আর এখানে আমাই-ইটের পাঁজা। অহেতুক সম্ভেহ হতেই পায়ে যে রাস্তার বাড়তি মালেই বানিয়ার তেতলা তোলা হবে। আর বড়ালের ভায়রা ভাই বখন ঠিকারায়।

তোতা আরো-একটিন আন্দাজ ইঁট টেনে নেয়। জিলাপি গাছগুলোর বউ-কথা-কও ডাকছে। তোতা আজ যেমন গাখালিকুটা কাঁজ করে যেতে পারে, তাতে মনে হয় বেন দোলে ডাঙের সববৎ গিলেছে এক বালতি। কিন্তু বেচারার নেণাখোর ঘুচে যায়। পাড়ার পাঠশালা ফেরত হাভাতে চেংরাপেংরা আবাস্তি জিলাপি কল খেতে এসে তোতাকে দেখতেই চোঁচিয়ে ছড়া কাটে। আতা গাছে তোতা পাজি।

কাঠোল আঠার কেউ।

এতো বলি তবু ব্যাটা।

আনো না কেন বউ?

তোতা বামাখও-হাতে কপট রাগে তেড়ে যায়। কেউ পালায় না। তারা জানে, তোতা ভয়ই দেখায়—দাঁড়ায় কি বোলতাকেও মারে না। তাই তারা হে-হে করে হাসে আর উল্লাসে কান্নিল ছড়া ছেড়েই বাব। জামাই-বাজারের দিক থেকে আগতে থাকা, লাকি কাউন্টারের রাশেস্তাম মণ্ডল কাণ্ড দেখে দূর থেকেই গলা কাটিয়ে বলে, 'তোতা মার, মাখায় মার, লাগলেই জ্যান্টাবে।'।

রাশেস্তামকে দেখেই চেংরা-লেংরা দৌড়ে ভাগে ওর মুখ দাকন ধারাপ। বাজারের মধ্যে লটারিয় টিকিটের কারচুপি নিয়ে লটারির দৈনিক খরিকার নোভালজিন ভাস্তারের সাথে ঝগড়া লেগেছিল। ভাস্তার বলল—'বতই বল, আছে তোমার এতে গুণগোল। 'ভাম অতলোকের সামনেই সহসা বলে কেলল—'নীরোখ পোদার। আপনার বিজনেস বাচাই করা সারা। সব রোগেই আপনার নোভালজিন। বল বেয়ারিং-এর খেলায় গুণগোল? আর আমি যদি বলি আপনার বাবার তিনটা...। হবে?' ভাম মণ্ডল নাকের মাঝে বড়াই করে নিজেই বলে—'তেমন হলে বিত্তি দিয়েই শরীর ধারাপ করে দিতে পারি। আব তখন তো ভাঃ নোভালজিন আছেই।'।

ভাম এসে তোতার কাছে দাঁড়ায়।

দেখিল, একদিন ঠিক ছিপনি মাস্টারনিকে বিলাতি আওয়াজ হবে। ঐ তো ফুটা পয়সার গুটিকে এই সব শেখার। শালী আর লোক পায় না।'।

তোতা করুণ অসহায়ভাবে রাশেস্তামের দিকে ডাকায়।

'শোন তুই এবার টিকিটকাটা লটারি হল এক ভ্রাম্যমাণ অভিনয় ভাগ্য। তবে কর্ম না করলে ভাগ্য ফেরে না। তোমার কর্মটা হল বামা-ভাঙা পয়সায় লটারি কাটা।'।

তোতা আপত্তি জানাতে সন্তর্পণে মাথা নাড়ে।

না কি রে তোতুয়া। এখন পরসা দিতে লাগবে না। বাকি।' মণ্ডল টিকিট ছিঁড়ে ফেলে—না। 'আরে নে নে ধর; লটারি চায় না ধনী, চায় না গরিব, চায় না গ্রাম বা চায় না শহর। লটারি চায় শুধু ভাগ্য। কে জানে তোর কপালেই বাম্পারটা ঝুলবে কিনা। তখন তোর আর কি কই? বড়াল বানিয়াকে কি কেউ ক্যাপার? বরং মাস্ত করে।'।

'তা বটে। বলি পরসার জন্ত মাস্ত গণ্য। পরসা নাই ধার মরণ ভালো এ সংসারেতে। এই কথা আর বাউলিয়া গানটা মনে আসে তোতার আর শোনে, 'ধনীর দালাল হবে রে বাবা।

ভাড়ার ভরা ধান।

মাছের মধ্যে পাটকিলা কই।

আর লা জবাব বউ।

তোতা যেন রাধের শ্রামের গলায় বেপরোয়া সরলতা নয় খালি ছাবলামো গেল। তাই সে আবার পাথরে আরো-একটা ইট বসাতে পারে।

কি হল? বিনামূল্যে হবে না কাহারও বিয়া। আতর গোলাপ কেহ করিবে না মাধামাধি। আর ভাত ছড়ালে কাকের অভাব? আজ বেঙ্গপতিবার, মনে মনে বখন আশাটা করেইছিলি।

তোতা বিরক্তিতে গোড়ালি ঠেলে দিতেই বামাধও গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে। রাধেশ্রাম কেপে গিয়ে বলে, 'শালা হিজরা নাকি। উহ। মেয়ে দেখলে তো নোলা দিয়ে লালা গিরাও। হয় টিকিট কাট নয় বিয়া কর। আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই। আমাইবাআরের প্রেক্ষি।'

তোতা যেনে গিয়ে বড়তোতলার গলায় যেন গামছার ঠগীকাণ বা শিরদাঁড়ার হাড়। হাতুড়ির আঘাতে এক চিলতা কামা কাচের টুকরোর মত ছিটকে যায়। রাধেশ্রাম সরেই দাঁড়ালো। তারপর একসময় যেন বামায় লোচীনো গা গতর, চোখাড়ে বিকৃত মুখ থেকে বেরতে চায়—বড়িবাড়। অমিন আয়গা জামা নাই। গমের দাম ছই আড়াই টাকা। ভালোবাসার বউকে কি পাওয়াতো রাজভোগ?

হতভাগার উচ্চারণ যেন গোঙড়ায়।

মানুষ বেঁচে থাকে

(বিজয়, হঠাৎ)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুর আগের রাতে তুমি গান গেয়ে গেল,

আমরা বাঁচবই ।

আমরা মানে মানুষ ; আমরা মানে মৃত্যুর ওপারে তুমি,

মৃত্যুর এপারে

কান্নার সমুদ্র সীতরে, অশ্রুর আকাশ ছুঁয়ে

হাজার হাজার

মানুষ, তোমার মতো গান গায়, তোমার মতো গান গাইতে

চায় তারা :

আমরা বাঁচবই : জয়-জয়ান্তরে, মৃত্যুর ওপার থেকে

মৃত্যুর এপারে...

মৃত্যুর সঙ্গে লড়বে কে

অসীম রায়

সবাইয়ের ভয় ভয় করছে

এবারে এবারে কে ?

মৃত্যু আছে ধাধা পেতে ।

বটুকরা হাবুলাদা বিজনদা

চোখ খুলতে না খুলতেই কল ।

মৃত্যুর সঙ্গে লড়বে কে ?

আমরা যখন ব্যস্ত রিপোর্ট লিখতে

ভাবতে কে ক্যানিস্ট কে ক্যানিস্ট না

বা ক ইফি কে বন্ধু না শত্রু

বইটা কাটবে কি কাটবে না

মৃত্যু আছে ধাধা পেতে

মৃত্যুর সঙ্গে লড়বে কে ?

এমন একটা পার্টি করা যায় না

যেখানে এই একাত্ত সনাতা

সর্বসম্মত প্রত্যাবে :

পিকেট বসাব শ্রমানে মশানে

পিকেট বসাব গোরস্থানে

আমরা সবাই বলব সবাইকে—

মৃত্যুর সঙ্গে লড়বে কে ?

নিয়তি-নাটকে কণ

(বিদ্বান ভট্টাচার্য-স্বয়ং)

অমিতাভ দাশগুপ্ত

এই রত্নকুমি হা হা বব্যকুমি
 শবচক্র মহাবেলা
 কচিমুণ্ডে বুলে আছে বামিনীর নথরে ও দাঁতে—
 এর অস্ত্র বসেছিলে ?
 মৃত্যুর অধিক তৃষ্ণা বুকে এর অস্ত্র বসেছিলে ?

তোমার পিঠের ঢালে পূৰ্ব ছিল, বুকে অঙ্ককার ।
 মহিব-মরম রক্ত দেহখানি তৃষ্ণা পেলে জলের নিকট
 পৌছতে পারে নি, তাই বাহুমূল বিকৃত হ'লনে,
 এভাবে শোণিত ঠেলে জেপে ওঠে ক্রুদ্ধ নাতা হাড়,
 কটিভটে কেটে বসা শূন্যল জানায়ে দেয়
 অ-সময় মুছের ইতিহাস,
 স্রোতের বিরুদ্ধে চণ্ড আক্রোশে দাঁড়ালো—
 ভেসে বাওয়া ।

নাভিমূলে গজায় অঙ্কুর
 পদতলে মহল শিকড় ।
 শাকল্যের অসংখ্য নজির
 কালস্রোতে অকুলিমের
 হয়ে আসে । মহাত্মারতীর
 প্রয়াসের সূচির ব্যর্থতা
 তপ্ত লৌহ শলাকায় তুলে
 কে নাচায় চোখের ওপর,
 অরতপ্ত ধনেশ পাখির
 চক্ষুগুণ অপ্রান্ত অমোঘ
 উড়ে বলে বাসনার কবে ;

২৫

মস্তপানরত সূর্যদেব
চুবে নেয় তল্ল, মল্ল, বল,
বুকে পোড়ালির ধাবা হেনে
কে জানাল লক্ষবার ঝিক,
অহুভবহীন, সহ্য করো—
এ অস্তিত্ব লাশের অধিক।

আগুন জ্বালাতে এসে হয়ে গেছ নিজেই অরণি !
মধু পেঁজা ওঠে বিধে—

গোড়জন ? কারা গোড়জন ?

পান থেকে চুন
খসে গেলে বার। ছোট্টে ক্ষত ধর্মাবতারের কাছে
তারাই ঘোমাকে বেঁধে

ডেকে আনে নগর কোটাল,

কিসের সংহতি ?

কবরখননকারী শোকবদ
এ তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উদ্ভবের পাচ পরিণতি।
তুমি সম্রাটের স্ফূর্তি নিয়ে
এলেছ বৌমাছিত্ত্রে। নিয়তি-নাটকে
ছিনাল চণ্ডালী তার নীবিবদ্ব খুলে
বারবার চোখে মারে—
উপবীত ছুঁড়ে ফেলে চলে বাণ্ড বিচ্ছেদে, ব্রাহ্মণ।

এত কাতরতা, এত বেহনাগ্রহণ অস্তিম্যান,
পৃথিবীর বাণী-রূপে এত লল সঙ্কল তরল,
পাহাড় পাহাড়

কলুষ-হারক শুভ্র,

অ্যোৎসারিতে ধরতর মৃদভের বোলে
অজুন-শিখরে আজও টায়,
নদীর স্তূর পায়ে বাহুবের সাগরে মেশায়
স্ত্রানক সাধ নিয়ে তৃষ্ণা নিয়ে

বড় দীর্ঘকাল

অপেক্ষা করছে—তাই এত বেশি শান্তি পেতে হল।

চোখের কোমল আলো বাষ্প হয়ে উড়ে যায়,

একবার—একবার বাঁধে তাকে অশ্রুর রক্ততে।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

বিপ্লব মাজী

সাক্ষাৎকারের সেই সমস্ত দিন

সাক্ষাৎকারের সেই সমস্ত রাত্রি

মনে পড়ে গানের ভেতর ঢুকছি আমরা

কবিতার ভেতর ভরতর ছুটে যাচ্ছি

কাদের বোলায় লুকানো সমস্রদ্বন্দ্ব

এই নক্ষত্র পৃথিবী সময়, হে সময়

এই সময় শু অগ্নি পার হয়ে আমরা ছুটে যাচ্ছি

জীবন-রকেটে বতকণ আলানি ঠাসা,

উড়ছি আমরা, ছুটছি যেন বেগুয়ালি যিনের

উৎসব মাতোয়ারা সবুজ কাচপোকা

মাস্কের সঙ্গে মাস্কের

সাক্ষাৎকার কেন ঘটে ?

বহুবার এ প্রশ্নের ফিংগের ভেতর দিয়ে

ডানা চট্টো ছেঁটে কলে দিয়ে বেবদুত

অননী গর্তের উপত্যকার মধ্য দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে

হঠাৎ এই আশিও

ছিটকে পড়লাম এ গ্রহে।

না যেবতা না শ্রুতান
 আমরা মাহুব মাহবের স্তের থেকে বেরিয়ে আসছি
 শব্দের স্তের থেকে হ্রের স্তের থেকে আনন্দ ও হঃ
 বেরিয়ে আসছি আমরা মাহুব
 পরস্পরকে অভিনন্দন জানাতে জানাতে...

তুমিও বেরিয়ে এলে
 মধুবংশীয় গলির স্তের থেকে নবজীবনের গানের স্তের থেকে
 বাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল তোমার
 বাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেনি তোমার
 প্রত্যেকে বলাবলি করত

এ পথ দিয়েই
 একটা রকেট ছুটে যাবে
 কবিতা ও গানে গানে ভরে উঠবে আকাশ বাতাস

করমণ্ডল এক্সপ্রেসের গতি
 তার গতির আশেপাশে অড়পদার্থ, স্থির
 ছিটকে সে তাই বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে
 কবি ও গায়ক
 এসব অভিশাপ বা পরিচয়ে
 এ গ্রহে বতকণ আছি ততক্ষণ হয়ত
 কিছু যায় আসে

তারপর ?
 আমরা কিছু না নিয়ে যেমন আসি স্বর্গ থেকে
 আমরা কিছু না নিয়ে তেমনি চলে যাই স্বর্গে

এমনকি এ দেহটা, হাড়
 এসবই এখানে রেখে হঠাৎ একদিন

কাউকে কিছু না জানিয়ে চূপচাপ রওনা হয়ে বাই...

এরপর পৃথিবীতে

আমার থাকার না থাকার

আমার অরণ্যতা, শতাব্দী উৎসব

আমার গানের তেতর অয় নিয়ে দৌড়ে বাওয়া

আমার গানের মশাল মহাকালে আলিয়ে রাখা

এ সবই অস্ত্রদের ব্যাপার

বধন আমিই নেই

আমার কিছু যায় আসে না।

ছোটগল্পের শিল্পরূপ

পার্শ্বপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

The short story writer is not soldier in the field, but a guerilla fighter, fighting the obscure duels of a great campaign. He stands always somewhere on the outskirts of society.

উপন্যাস ও ছোট গল্প দুটি সম্পূর্ণ, ভিন্ন শিল্পরূপ, যদিও গল্প ছোট রূপেরই অনিবার্ণ উপাদান। আধুনিকতম পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও, একথা বলতেই হবে এই ছোট শিল্পরূপ থেকে গল্পকে বাদ দেওয়া যায় না। হয়তো গল্প বলার ধরন পাণ্টেছে, আদি-মধ্য-অন্ত্য নিয়ে নিটোল গল্প বেহেতু জীবনেরই ছলভ, সেহেতু উপন্যাস-ছোট গল্পেও আর তারা আসে না : আসে না সময়ের পরিচিত বারাবাহিক ক্রম। কিন্তু গল্প থেকেই যায় : একটি ঘটনার আভাসে, একটি বাক্যের গঠনে গল্প আসে ক্রমে ক্রমে। ছেলেরা খেলার ছলে ঢিল মারল ব্যাডমেন, কিন্তু ব্যাডমেন মারা গেল খেলার ছলে নয় বাস্তব বস্তুর—এই একটি বাক্য প্রচলিত অর্থে গল্প নয়, কিন্তু এম সুকূরে গল্পেরই আকাশ। “চর্যাপদের হরিশী” বা “নিরঙ্গীকরণ কেন”* প্রচলিত প্রভাত মুখোপাধ্যায় ছোটগল্প নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু আরও গল্পের ইঙ্গিত তাদের বাক্যে, ঘটনায় : স্থিতিতে, প্রতিক্রিয়ায়। প্রথম গল্পের যুবকটির কথা তার প্রতিবেশী বললে গল্পের মতই বলবে, দ্বিতীয় গল্পটির ট্রেনের বাজী তার অভিন্নতা বর্ণনাকালে গল্পের কাঠামোই গড়ে তুলবে—অবশ্য ছোটগল্প দুটির শিল্পরূপ নির্মাণ করা হয়েছে সার্বভূমিক গল্পের হাত থেকে তাদের থিমকে বাঁচাতে, জীবনেরই প্রতীক-

* বলাই বাহুল্য, বীলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেবল রায়ের বিখ্যাত দুটি ছোটগল্প। তাঁদের অন্ত গল্প জটিল বা অস্বাভাবিক হোড়। কিংবা উদ্ভাস বা রহস্য রচনার দামও করা চলত।

রূপক গড়ে তুলতে—কিন্তু বড় স্রোতের মত মনুষ্য কবালের মত গল্প থেকেই গেছে। অয়েসের ইউনিসিস কিংবা প্রেতের স্বতির দেশ-কাল-হীনতাও গল্পের কীণ শব্দ ছাড়া নয় : রোবটীয়েরা বড়ই চ্যাচামেচি করুন, তা করা সম্ভব নয়। উপভ্রাস ও ছোটগল্প উভয়ের ক্ষেত্রেই এটা সত্য : এদিকে উভয়ের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু শিল্পরূপ হিসাবে ছোট সম্পূর্ণ পৃথক : ছোট-গল্পকে বড় করলে উপভ্রাস হয় না।

সময়ের ব্যবহার, সময়ের প্রতিদৃষ্টিভঙ্গী থেকেই উভয় শিল্পরূপের পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সব উপভ্রাসেই অশ্রুতম প্রধান চরিত্র সময় : যে ছন্দে উপভ্রাস এগোর বা দোলে তা জীবনেরই ছন্দ : ঘটনার কালাহুজ্জমিক বা আপাত এলোমেলো স্বতির টানে যে শৃঙ্খলা (মূলগতভাবে এলোমেলো উপভ্রাস হতে পারে না, কারণ উপভ্রাস আর জীবন এক নয়, উপভ্রাস জীবনেরই মত, কিন্তু ঔপন্যাসিকদের চেতনার দ্বারা সংগঠিত) উপভ্রাসে গড়ে ওঠে, তার ভিত্তি সময়চেতনা। সময়ের এই ছন্দ ঔপন্যাসিকের হাতিয়ার আর ছোটগল্পকারের কাছে এই সময়ই এক চ্যালেঞ্জ—তাকে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয় সময়ের ছন্দ যেন বড় না হয়ে ওঠে, গল্পের গঠনে। তাকে পৌছাতে হবে ক্ষুদ্র এমন এক বিন্দুতে, কর্ণের কেন্দ্রে যেখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ সমপরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। তাকে মনে রাখতে হয় তিনি গল্প লিখছেন না, লিখছেন “ছোটগল্প”—সময়ের মুক্ত পাখা-মেলে দিলে চলবে না এখানে। এ শিল্পরূপে একটি সংকট বা সিদ্ধান্ত বা নির্বাচনের কেন্দ্রবিন্দু সব ব্যক্তি ও তাদের ভবিষ্যৎকে বেঁধে রাখে—উপভ্রাসের ব্যক্তি-প্রকৃতি-সমাজের সম্পর্কের জালবিতার এখানে সম্ভব নয়, প্রধান কথা ব্যক্তির নিজের সঙ্গে সম্পর্ক—যেহেতু ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নয়, মানুষ-সমাজ-প্রকৃতি মিলিয়েই তার হয়ে ওঠা সেহেতু নিত্য আত্মকথনেও এরা ছায়া ফেলেই, তবে ছোটগল্পে মূলকথা একজন ব্যক্তি, একটি সংকট বা সিদ্ধান্ত। এরই চৌহদ্দির মধ্যে, সীমার মধ্যে ঘটনাগুলোকে ছোটগল্পকার রেখে দেন, কিন্তু উপভ্রাস জীবনের মতই ছড়িয়ে পড়ে, খুলে দেয় অভিজ্ঞতার নানা স্তরকে, নানা সংকটকে। প্রায় উঠতে পারে যদি ব্যক্তির কেবল নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্কই ছোটগল্পের গঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে ‘নিরঙ্গী-করণ কেন’ কি ছোটগল্প নয় : এখানে, বা এই ধরনের অত্যন্ত গল্পে বিশেষ এক ব্যক্তির কথা তো গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে না—কিন্তু এখানে লেখক সময়কে এমনভাবে ব্যবহার করেন যাতে উপভ্রাসের ছন্দ আসে না,

সময়ই প্রাধান্যবিশ্বাসী হয়ে ওঠে না, সংকট এখানে একটিই; সব কিছু দেখানে মিলেছে। বস্তুতঃ একটি সংকট, একটি নির্বাচন, একটি সিদ্ধান্ত, একটি ব্যক্তিত্ব—সময়ের সত্যিকার ব্যবহার বা বলা যায় সময়ের প্রাধান্য বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছোটগল্পের শিল্পরূপ গঠন করার প্রধান উপাদান। সব ছোটগল্প নিশ্চয়ই একই ভাবে শুরু ও শেষ হয় না: আর কোনো বিশেষ সংজ্ঞাও অন্তর্গত শিল্পকর্মের মতো ছোটগল্পেরও দেওয়া সমীচীন নয়, কারণ গল্পকারের নব নব অভিজ্ঞানে স্বেচ্ছা যায় সংজ্ঞার দেয়াল, নির্মিত হয় নতুন দিগন্ত। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ আদর—সূচনা, ছোটগল্পটির সীমার মধ্যে প্রায় স্থাপত্যশিল্পগত ভারসাম্য গঠন, দৃষ্টাবলী, কর্মের—ক্রিয়ার মোটিভ স্পষ্ট করা, সময় ও বিষয়ের পরিবৃদ্ধি—সূচনা থেকে মধ্যপর্ব পেরিয়ে উপসংহারে বাওয়া—এসব একরকমভাবে নিশ্চয়ই সব যুগের সব লেখকের গল্পে থাকে না। শরৎচন্দ্র বা প্রভাতকুমারের গল্পে যেভাবে থাকে, নিশ্চয়ই দেবেন্দ্র রায় বা দীপেন্দ্রনাথের গল্পে সেভাবে থাকবে না। কিন্তু উপাদানগুলি থাকেই, ভেদেচূরে, অনেক সময় চেনা যায়না, এমন ভাবে। ছোটগল্প কিভাবে লিখতে হবে তারও কোনো নিশ্চয়ই ফর্মুলা দেখা যায় না: প্রথমে উপাদানগুলি মাথায় আসবে, না, রূপটি নির্ধারিত হবে, তা নির্ভর করে বিশেষ গল্প বিশেষ গল্পকারের ওপর। তবে, যে কোন শিল্পের মতই, সংযোগ ছোটগল্পের অনিবার্ণ উপাদান: সংযোগের রূপ কি হবে তা নিশ্চয়ই স্থান-কাল-পাত্রের ওপর নির্ভরশীল, সেটি আগতে পারে বিমূর্তের ঘুর পথে বা মূর্তির প্রত্যক্ষতার, প্রতীক-রূপকের প্রচ্ছন্নতায় বা সরাসরি উপস্থাপনের যৌগাযোগে। কিন্তু এই সময়ের হৃদয়কে প্রধান হতে না দেওয়া, একটি ব্যক্তি, সংকট বা সিদ্ধান্ত ছোটগল্পের শিল্পরূপের কেন্দ্রে থাকবেই—তার আকার বা সময়কাল যাই হোক না কেন। নচেৎ তাকে ছোটগল্প বলা যাবে না: হয় সে হবে উপভাসে, নয় অল্প কোন জেনর, যার শিল্পগত তাত্পর্য গভীর হতেই পারে। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক।

ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পটি। পাঁচ-সাত্বে পাঁচ পৃষ্ঠার এই গল্পটির সময়কাল দীর্ঘ: 'আমি' চরিত্রটির জীবনের অনেকখানি। আরম্ভ হয়েছে 'আমি'র বাল্যকাল কি শৈশবে, শেষ হচ্ছে যখন সে ফুলমাস্টারির দৈনন্দিনতার অভ্যস্ত তখন। কিন্তু সময়কালের এই দীর্ঘতা গল্পটিকে ছোটগল্প হতে বাধা দেয় নি। তার অন্ততম কারণ, এই দীর্ঘ সময়কে লেখক কোন সময়েই নিঃস্বচ্ছন্দে প্রস্তাব বিস্তার করতে যেন নি তোরা বা ঘরে বাইরের কথা স্মরণ করলেই

ব্যাপারটা বোঝা যায়—এই ছুটি উপস্থানের প্রত্যেক সময়কাল ছমাস-একবছর। কিন্তু সময় সেখানে ঘীর ছন্দে খুলে ধরেছে ব্যক্তি-সমাজ, ব্যক্তি-ব্যক্তি, ব্যক্তি-প্রকৃতির সম্পর্কের অটল বুননটিকে। একরাজিতে “আমি” চরিত্রটির জীবনগত নানা পর্বান্তরের কথা বলা আছে—স্বয়ংবার সঙ্গে তার ব্যাঙ্গসম্পর্ক, তারপর আদর্শবাদী পর্ষাব ও তার করুণ পরিণতির হাতোজল, কিছুটা হাতা ব্যঙ্গপূর্ণ বর্ণনা গল্পটিতে দেওয়া আছে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে গল্প কিছু কি আছে? চর্যাপদের হরিণী বা নিরঞ্জীকরণ কেন’র মতই আছে সংবাদ, বুদ্ধি, পরিবেশ। বাংলা উপস্থান-ছোটগল্পের দুজন আরি পুরুষই অসামান্য প্রতিভাবিশিষ্ট ছিলেন: বাংলা উপস্থানে এখনও পর্যন্ত এমন কোনো আঙ্গিকরীতি ব্যবহার করা হয় নি, যা অন্তত আংশিকভাবেও বহিঃচর্য ব্যবহার করেন নি, তেমনি বাংলা ছোটগল্পও, তার অসাধারণ প্রশংসনীয় সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নি, এমন আঙ্গিক এখনও পর্যন্ত ব্যবহার করেছে খুবই কম। তথাকথিত গল্পহীন ছোটগল্পের একাধিক নজির তাঁর গল্পগুলোতে আছে। একরাজির গল্পাংশটি ক্লশ, পৃথকভাবে বললে নিতান্ত সাধারণ, কিন্তু ছোটগল্পটির সঠানে অপার তাৎপর্যময়। এ গল্পের “আমি” সাধারণ মানুষ: তার জীবনেতিহাসে একটি যুগের উন্মাদনা আদর্শবাদের যেমন প্রতিকলিত, তেমনি তার সাধারণত্বে সে সর্বজনীন। অথচ রবীন্দ্রনাথ যেখান, এই সাধারণত্বব মধ্যেও আসে অসীমের স্পর্শ, সব ব্যর্থতাবোধও ঘুরে সরে যেতে পারে কোনো স্বপ্নের দ্বারে, ছয়ারগুলি ভেঙে, ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরে-স্তারারও হই নাই, পারিবলজিও হই নাই, আমি এক ভাঙা ফুলের সেকেন্ড মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল জগৎকালের মত একটি অনন্তরাজির উদয় হইরাছিল—আমার পরমাত্মার সমস্ত দিনরাজির মধ্যে সেই একটি রাজ্য রাজিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।” এই একটি বাক্যই একরাজির বিষয়—তার আগে ক্রতলরে সংবাদ পরিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সময়কে চেপে রেখেছেন, ‘আমি’র মানস-পরিমণ্ডল গড়ায় পটভূমি নির্মাণ করেছেন।

একরাজি ছোটগল্প আমার নিজের সঙ্গে সম্পর্কের গল্প—ছোট গল্প হিসাবে গল্পটি এত বিস্তৃত যে ষষ্ঠীয় কোনো চরিত্রের সঙ্গে, এখানে স্বয়ংবার হতে পারত, “আমি”র সম্পর্কের কোনো প্রত্যক্ষচিহ্ন নেই: নিজের সঙ্গে আলাপ, আত্মবিশ্লেষণ। এর সব কিছু, শেষে মিশে গেছে অসীম নৈশেখ্যে: “তখন প্রায়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী নিবিয়া গেছে—

তখন একটা কথা বলিলেও কতি ছিল না—কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না। কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বহিলাম। পদতলে পাচ কক্ষবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুশ্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল। জীবনের সব শব্দ এখানে অনন্ত নৈঃশব্দ্যে মৃত্যুর মতো নীরবতায় নূতন দিগন্তে উদ্ভাসিত অন্ধকারের উৎস থেকে আলোর মতোই, সব শব্দের শেষের নৈঃশব্দ্যে জীবনের পরমসার্থকতা এল। এই সাধারণ “আমি”র জীবনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে গানে যে কথা অনেকবার বলেছেন, একরাজি গলে সে কথাই জানালেন : নীরবতায়, অন্ধকারেই জীবন উদ্ভাসিত হল। একটি সংকট বা সিদ্ধান্ত কেন্দ্রে থাকার দরুন, দীর্ঘ সময়কাল সবেও একরাজি ছাড়িয়ে গেল না : একটি লিরিকের মতোই ঘনবদ্ধ কিন্তু জীবনের বিশালপটে বিঘূত হয়ে রইল।

বিকৃতিকূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ভুলমামার বাড়ী” নিশ্চয়ই একরাজির সমার্থক নয়। কিন্তু ছোটগল্প হিসাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সব গল্প-উপন্যাসই এক অর্থে অতীতকালের ঘটনা : না হলে গল্প বা উপন্যাসটি লেখা হয় না, নানাবিধ মূলগত পার্থক্য সত্ত্বেও ইতিহাসের সঙ্গে এদের এখানে গভীর সাদৃশ্য। ছবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বোধহয় বেলা বালাজই বলেছিলেন, “পিকচারস ছাড নো টেনসেস”। তেমনি ছোটগল্প-উপন্যাস সবই অতীতের ঘটনা, তাকে লেখক কৃত্রিম বর্তমান-ভবিষ্যতের সৃষ্টি করেন—অতীত সর্বকণ বর্তমান হিসাবেই উপস্থিত হয়। একরাজি গলে সময়ের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ধারাবাহিক। অতীত থেকে বর্তমানে আসা, কিন্তু ঠিক গল্প বলার মতো নয়—“আমি” চরিত্রটির অতীতকে ক্ষুদ্র বলে, তার বর্তমানকে স্থাপন করা গল্পটির গঠন কৌশলের অন্তর্গত। বিকৃতিকূষণের ছোটগল্পটিতে প্রত্যক্ষ সময়ের ব্যবহার অন্তরকম : প্রথমতঃ বর্তমান থেকে অতীতে যাওয়া। দ্বিতীয়তঃ গল্পটি আমরা শুনিছি লেখকের অবনীতে, অন্তের মুখে অর্থাৎ সময় এখানে দুহরের। লেখকের সময়বিন্দু, হেডমাষ্টার অবিনাশবাবুর সময়বিন্দুর সঙ্গে এক নয়। বডিও পাঠকের তাতে অস্থিবিধা বিশেষ ঘটে না, অনাদ্ব্যালেই সে লেখকের সময়বিন্দু থেকে অবিনাশবাবুর সময়বিন্দুতে চলে যায়। এই জটিলতাসৃষ্টির কারণ বিকৃতিকূষণ প্রাথমিকভাবে একটা প্রচলিত গল্পের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কথক-শ্রোতার যে একাত্মতা তাই তিনি আনতে চান এই গল্পে। এই পরোক্ষ পথ ছাড়া গল্পটি হয়ত দাঁড়াত না—গল্পের প্রায় প্রায়ভেই অবিনাশবাবুর জীবনের বর্তমান অচরিতার্থতায় ষোণটি

জ্ঞানান লেখক। ভণ্ডুলমামার বাড়ী যে প্রতীকের স্বার্থা শেষে পার, তা এই ভূমিকাটুকু ছাড়া সম্ভব নয় অথচ “একরাত্রির” গঠনকৌশল অবলম্বন করলে এ গল্প স্টেটিস্টিকাল হতে পারত, কারণ একরাত্রির মতো চূড়ান্তকর্তৃক বলে এ গল্পে কিছু নেই। পাঠক-লেখকের বিচ্ছিন্ন সংযোগের ভাবালুতা ভেঙে যায় তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে—মনে হয় গল্প শুনিছি কোনো তৃতীয় পক্ষের।

“ভণ্ডুলমামার বাড়ী”—গল্পেরও সময়কাল দীর্ঘ : কিন্তু বিভূতিভূষণ শার্খক ছোটগল্পকারের মতই সময়কে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ভণ্ডুলমামার বাড়ীর ইতিহাস ও ভণ্ডুলমামার ইতিহাস একই—এর মধ্যে একটা জালাল্যমান গ্রামের করুণ ঐতিহাসিক পরিণতি আভানিত : ভণ্ডুল মামার গ্রীণুকের কথার বেটি প্রকট হয়। ভণ্ডুলমামার বাড়ী এক অর্থে আমাদের গ্রামের উৎসর্গে বাণ্ডার গল্প আবার আর এক অর্থে অবিনাশবাবুর গল্প। অবিনাশবাবু বলেছেন, “আমার সে ছেলেবেলাকার মনের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, বয়স হয়েছে, কলেজে পড়ি ; নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশেছি, স্থরেন বাঁজুঘো ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছি, স্বদেশী মিটিঙে ভাষণদায়ী করেছি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীই পেয়ে বহলে—তখন মনের কোন্‌ গভীর তলদেশে আরও পাঁচটা পুরানো দিনের আদর্শের ও কৌতূহলের বস্তুর ভূপের সঙ্গে ভণ্ডুলমামা ও তাঁর বাড়িও চাপা পড়ে গিয়েছে। তাই ঐক্য অবজ্ঞা মিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুম মাত্র—ভণ্ডুলমামার বয়স পকাশের ওপর হবে, টিকিতে মাহুলী বাঁবা, গলায় কিসের মালা, কাঁচাপাকা একমুখ ঝাঁড়ি। এই সেই ছেলেবেলাকার ভণ্ডুলমামা।” এই বাক্যটির মধ্যে গভীর ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে—বপ্পের গ্রামের উবাও হয়ে বাণ্ডা এবং গ্রামবিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্তের ইতিহাস। অবিনাশবাবুই বাল্যকালে দিদিমার বাড়ি এসে ভণ্ডুলমামা, সম্পর্কে বপ্প দেখতেন : “রূপকথার রাজপুত্রের মতই এই ভণ্ডুলমামা হয়ে রইলেন অবাতব, স্পর্শের অতীত, দর্শনের অতীত, এক মানসমাজের অধিবাসী, তাঁর চাকরির স্থান লালমণির হাট, মায় তাঁর ছেলেমেয়ে শুদ্ধ।” দুটি অংশ পাশাপাশি পড়লেই উত্তরোল কলকাতা, ক্রমবিস্তারিত গ্রামের পাশাপাশি চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে—বিভূতিভূষণের চোখে যেটি অব্যর্থভাবে বরা পড়ে। অথচ জীবনের এমনই আরওনি অবিনাশবাবুকে সেই ভণ্ডুলমামার কাছে অর্থাৎ গ্রামেই আসতে হয়েছে। আদর্শবাদী যুবকের অচরিতার্থতা ও বপ্পভক্ত ভাড়াবাড়ীর ইমেজে এসে মিলে যায় গ্রামের ঐতিহাসিক স্বভাব

সঙ্গে, বধন অবিনাশবাবু বলেন, “মামার জীবনের সঙ্গে ভণ্ডুলমামার বাড়িটার এমন বোগ, কি করে ঘটল সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে বাই—মামার গল্পের আসল কথাই তাই। এমন একটা সাধারণ জিনিস কেন আমার মন এমন জুড়ে বসে রইল, অথচ কত বড় বড় ঘটনা তো বেমানাম মন থেকে মুছেই গিয়েছে। ছোট গল্পটির ছত্তরের, অটিলতাই গল্পটির গঠনকৌশলে প্রতিকলিত : কিন্তু গল্পটি একমুখী : এর থিম একটিই, সময়ের ছন্দ কোন সময়ই বীরভাবে প্রস্তাব সকারী নয় : ভণ্ডুলমামার বাড়ীর সঙ্গে অবিনাশবাবুর সম্পর্ক অর্থাৎ এক অর্ধে নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক,—প্রায়ের পরিণতির প্রচ্ছন্ন ইতিহাস এর মধ্যেই বলা আছে। ভণ্ডুলমামার বাড়ীর ভয়স্বূপে অবিনাশবাবু যে নিজেরই পরিণতি দেখেন—সেটি একটি “সংকট” এরই উন্মোচন।

এক রাজি বা ভণ্ডুলমামার বাড়ীর দীর্ঘ সময়কাল সময়ের বহুর “কুয়াশার বেলা” গল্পে নেই—এর সময়কাল মাত্র কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু এতে সময়ের ক্ষমকে মোকাবেলা করার সমস্ত লেখকের বায় না : কারণ সময়ের ধীর লয়ে এই কয়েক ঘণ্টাই উপভাসের বিষয় হতে পারে। সময়ের বহু সময়কে ব্যবহার করেছেন ছোট ছোট বাক্যের ক্ষুদ্র বাক্য—একটি চূড়ান্ত সংকটে তিনি প্রায় ঘটনাবিহীনভাবে শৌহান রুম্বাস আবহাওয়া নির্মল করে। গল্পটিতে ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নেই—আছে তিনটি পক্ষ। এক, সামগ্রিকভাবে অমানবিক নিষ্ঠুর ব্যবস্থা—এঁদের লেখক চিহ্নিত করেছেন এন, বি, ইত্যাদি নামহীনতার। রিভলভার বেন্ট, হুনিফর্ম ইত্যাদি খুঁটিনাটি উল্লেখ্য তাদের অমানবিক বাস্তবিকতা পরিষ্কৃত—তাদের ছত্তনের চোখ টকটকে লাল,—চোখের তারা ভারী যে কারণে দৃষ্টি এখন প্রায় বন্ধ আর স্থির, তকলতা নেই। “একটিই মাত্র একশো পাওয়ারের আলো জলছে ঘরের মধ্যে। বাইরের বারান্দার আলোর জোর কম, সেখানে একজন রাইফেলধারী পাহারা। তারপরে বেশ কিছুটা জায়গা অন্ধকার, ছ একটা জীপ বা অস্ত্র পাড়ি অস্পষ্ট দেখা যায়। আলো রাস্তার ভেতন উজ্জল না।” রাইফেল, রিভলভার ইত্যাদির বারংবার উল্লেখ লেখক ধরিয়ে দিচ্ছেন এই সামগ্রিক ব্যবস্থার শাসনকৃত হুতাপ্রাপ্ততা। এখানে ব্যক্তি নেই, আছে এন, জে, বি, ইত্যাদি অক্ষর। নিঃসন্দেহে কাককার স্থিতিবাহী : কিন্তু সময়ের বহু উন্টে দিয়ে নিজস্ব করে লিখেছেন। দ্বিতীয় পক্ষ, লোকটা—একমাত্র এরই নাম জানা যায়—বীয়েশ। সময়ের বহু একেই তাঁর গল্পে পূর্ণ মাহু্য হিসাবে দেখেছেন :

ছির, চরম অভ্যাচারেও শাস্ত, ঐ নাটকীয় ব্যবহার বিকল্পে, তাদের কাছে ভীতিপ্রদ—জেল বলে, “ওর চোখ দুটো মাছবের চোখ না।” বীরেশ স্বপ্নোক্তি করে : সময়টাকে, আলো নিবিয়ে অন্ধকার করে দাও, তারপরে আবার আলো জ্বালাও, মনে করো অনেক সময় গায় হয়ে গেছে, তখন তুমি, বা সত্যি, তা দেখতে পাবে। সময় খুব মূল্যবান, এই যে সময়টা যাচ্ছে এই সময়টাও।...তারপরে লোকটা হঠাৎ একবার নিজের দাঁত দেখিয়ে বললো, কী দেখলে? দাঁত, না? আমি তোমাদের গোসাপের কামড় দেখালাম। এ কামড় খোলবার না। আমার জানা সব কথাই আমি কামড়ে ধরে রেখেছি।’ তৃতীয় পক্ষ, যুবকটি—যায় ভাইকে ধীরেশের নির্দেশে খুন করা হয়েছে, এরও কোন নাম নেই। প্রথম ও দ্বিতীয়পক্ষের মাঝখানে সে—ছুটি পক্ষের চূড়ান্ত পাক্ষা ধরায় অসংখ্য সাধারণের মতো সেও বিলাস—প্রথমপক্ষের হাতে ক্রীড়নক। বীরেশকে নেবে যেতে বলে, তাকে দিয়েই খুন করান হয়। যুবকটিও ছাড়া পায় না : এন এর গুলিতে লুটিয়ে পড়ে। বীরেশ ছাড়া এ গল্পে সবাই সমস্ত—কিন্তু বীরেশের ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত কারণ “হলগুলো অদ্ভুত। কার কী ইন্ডিগলজি বুঝতে পারি না। আর আমরা যে কী...। বস্তুত এই তিনটি পক্ষ মিলিয়ে বর্তমান সময় ধরা পড়ে কুরানার বেলায়—একটি চূড়ান্ত মুহূর্ত গড়ে তোলার অল্পই দক্ষ শিল্পীর মতই গল্পটিকে নির্মাণ করে তুলেছেন লেখক। সংকট একটিই। সময়কে ব্যবহার করা হয়েছে কৌশলে—সময়কে লেখকও আলো নিবিয়ে অন্ধকার করে দিয়েছেন।

অসীম রায়ের ‘রাড়পৌছ’ গল্পটি ছোট গল্পের শিল্পত্বের আলোচনার খুবই কোতূহলোদ্দীপক। কারণ এ গল্পে “অনীল ভেবে দেখেছে, গত ছ’ আড়াই দশকে কাল-ই তার জীবনের একমাত্র নায়ক। তারক সেন কমিউনিস্ট পার্টি রাডু এরা পার্শ্চরিত্র। কাল তাকে নাচাচ্ছে খেলাচ্ছে কাঁদাচ্ছে—হাসাচ্ছে কোনো কিছুই অবিচ্ছিন্নতা না রেখে।” সময়ই এ গল্পের প্রধান চরিত্র : অনীলের স্মৃতিতে এই সময়ই জাগে। “অবশ্য প্রাণদায়িনী শ্রোতাবিনী—রূপে কাল তার কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে নি যদিও তার প্রথম বোঁবনে কালের ধ্যানে করেছিল অনীল এইভাবেই যে ধারায় সে বারবার অবগাহন করে সজীবিত হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতার কালের চেহারা আলাদা। তা ঠিক গীতার্ণিভ-জংটাকরাল নয় বটে, তবে যেন এক কোঁতুকপ্রিয় নট অথবা খেলুড়ে।” কিন্তু সময়ের প্রধান ভূমিকা সম্বন্ধে অসীম রায় সময়কে দীর্ঘ

ছন্দে প্রভাবসঞ্চারী হতে দেন না দক্ষ গল্পকারের মতোই। তাকে সংক্ষিপ্ত করেন, লাকাত্তে লাকাত্তে চলে গেছে উনিশ শো পঞ্চাশ, লাকাত্তে লাকাত্তে চলে গেছে উনিশশো বাট, লাকাত্তে লাকাত্তে চলে যাচ্ছে উনিশশো সত্তরের বছরগুলো আট দশ কিলো স্বতি কেলে দিয়ে।” হুণীল এই সময়ের হাত থেকে মুক্তি চায়, স্বতির দৌরাশ্রয় থেকে। ছোট গল্পের মতই তাকে মোকাবেলা করতে হয় সময়ের সঙ্গেই। “হুণীল কল্পনা করে কালকে সকালবেলায় পান্নায় চাপিয়ে দিয়েছে তার স্বতি”—কিন্তু মুক্তি পায় না, তাকে বাব্বার কিরতে হয় তাব অতীতের কাছে, রাত জেগে। আপাতভাবে হুণীলের বর্তমানের কাছে এই অতীত অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু তার সম্ভার গভীরে এরাই জলছে। সে এদের ফেলতে পারে না। হুণীলের জী রমা বধন তাকে আশ্রয় করে, কিছু ভেবো না। একটা কাগজও এদিক ওদিক হবে না।” তখন কোন আশ্বাসবাণীই বাজে না, হাহাকারও বেজে ওঠে। এ কেবল বিশেষ ব্যক্তির নিজ অতীত বোঝনের প্রতি মমত্ব নয়, এ একটি প্রজন্মের, একটি শ্রেণীর ব্যর্থতার হাহাকারও বটে। হুণীল তার নিজের সঙ্গে সম্পর্কেই নতুন করে মেলে ধরে সময়ের গুঞ্জে : ঝাড়পোছ করতে গিয়ে, সেলফ পরীক্ষার করতে গিয়ে নিঃশব্দেই আবিষ্কার করে।

বলাই বাহুল্য, ওপরের এই চারটি গল্পই বাংলা ছোটগল্পের প্রতিনিধি-স্থানীয়, এমন ভাবার কোন কারণ নেই। ভালো বাংলা ছোটগল্পের সংখ্যা, আমাদের ধারণা, বেশ কিছু, অসামান্য মহৎ ছোটগল্পও বহুই আছে। শুধু তাই নয়, বিশেষ লেখকের প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পও হয়তো বাছা হয় নি—সময় বহুর অনেক বিখ্যাত গল্পের নাম মনে পড়বে, অসামান্য গল্প ‘পাড়ি’র কথা তো স্বভাবতই মনে আসবে—পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এই গল্পটির মূল্য অসাধারণ। এ আলোচনায় ছোটগল্পের শিল্পরূপ বোঝাতে বিভিন্ন আদের “বিষয়ে”র চারটি গল্প নেয়া হয়েছে।

আমরা দেখেছি, সময়কাল দীর্ঘ না হ্রস্ব, এর ওপর ছোটগল্পের সার্থকতা নির্ভর করে না, নির্ভর করে সময়ের নিয়ন্ত্রণের ওপর। ঠিক সেই রকম, আকারের সঙ্গেও ছোটগল্পের কোন সম্পর্ক সাধারণভাবে নেই। ‘ছোট উপভাস’ বা ‘বড় ছোট গল্প’ কথাস্থলির শেষ বিচারে কোন অর্থ নেই—প্রথমটি উপভাসই : ওয়ব অ্যাণ্ড পীসও যেমন উপভাস, দি আউটসাইডার বা দি

ফল-ও তেমনি, বহিও আকারে আসমান-অমিন ফারাক। পোরাও উপভাস, চতুরও উপভাস*। তেমনি বড় ছোটগল্প ছোটগল্পই—যেমন বিমল করের ‘অলস ভ্রমণ’। কিন্তু ‘গল্পগুচ্ছে’র অন্তর্গত হলো ‘নষ্টনীড়’ নয়। কেউ কেউ বলবেন এটি নভেলেট—কিন্তু এই শব্দটি বড় ধোঁয়াটে, ছোট উপভাসের মতই। নষ্টনীড় উপভাসই—সামগ্রিকভাবে উপভাসের লক্ষণাক্রান্ত। একটি ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নয়, সংকটও একটি নয়, সময়ের ব্যবহারেও কণ্টার কথিত, সেই উপভাসের ছন্দ আমরা পাই—ভূপতি, চাক, অমল, এমন কি মন্মাও নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ নিয়ে উপস্থিত। চাক-ভূপতির জীবনের ইতোজড়ি যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাতে ছোট গল্পের সীমা ভাঙতে বাধ্য। উপভাসের মতই নষ্টনীড়ের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চরিত্রদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন—ধীরে ধীরে বিভিন্ন সম্পর্কের সূত্রগুলিকে বিতারিত করেছেন : চাক-অমল, চাক-অমল-মন্মা, ভূপতি-চাক, চাক নিজে, ভূপতি নিজে—এতগুলি সম্পর্কের দ্বয়ের ওপর, স্তরের দাঁড় করিয়েই লোক নষ্টনীড়ের স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন। সময়কাল এখানে এক রাজির থেকে অনেক কম : কিন্তু পাঠান্তে মনে হবে দীর্ঘ পথ, অভিজ্ঞতা পেরিয়ে এলাম। প্রাথমিকভাবে দুটি সংবাদ পাওয়া যায় : “এই রূপে সে বতরিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়া ছিল তত দিনে তাহার বালিকাবৎ চাকলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পরিপূর্ণ করিল।” “এবং বনীগৃহে চাকলতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্কৃত হইয়া ওঠাই তাহার চেষ্টান্ত দীর্ঘ দিন রাজির একমাত্র কাজ ছিল। **এই দুটি অল্পসী বাক্য ও ফলপরিণামহীন ফুলের উপমা পর বিষয়টি হয়ে উঠেছে ধীরগতিতে : সময়কে, সম্পর্কগুলির স্বন্দ-মিলন স্পষ্ট করার অন্ত, ক্রমশ : ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নষ্টনীড়ের ঘটনাস্থলও এক রাজির অপেক্ষা সীমাবদ্ধ : কিন্তু উপভাসের গঠনচিহ্নিত হওয়াই স্পেস ও সীমারিত টাইপের মত বৃহৎ হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে। অথচ আকারে

*উপভাসের ভেদনের অন্তর্গত কয়েই এর কটিকে এসিক নভেল, কাটিকে অন্ত অভিধা দেওয়া হয়।

** ‘একরাজির’ ও নষ্টনীড়ের ভাব্য ভূসনাস্থলক আলোচনা করলে বেশা বাবে, নষ্টনীড়ের ভাব্য চাল অনেক বিলম্বিত, স্বন্দ—সময়কে এই ছন্দে বীর্ণারিত করে প্রতিভাত করা হয়েছে।

বড় হলেও ল্যাংগুয়েটরী গল্প উপভাস নয়—আবার অনেক “গল্প” থাকা সত্ত্বেও, ৩টি ছোটগল্পও হতে পারেনি। ছোটগল্প হিসাবে ব্যর্থ, উপভাস হিসাবে বিবেচ্যই নয়। আপাত ভাবে আধুনিক স্বকল্পকে ল্যাংগুয়েটরী কথোপকথনের চাপে একটি শিথিল প্রচলিত গল্প—একরাজির আধুনিকতা সেখানে নেই, নেই গোরা বা চতুরঙ্গের, ঘরে-বাইরে বা নটনীড়ের আধুনিক বিশ্বদর্শনের ঔপন্যাসিক নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য। আকারে-প্রকারে ল্যাংগুয়েটরী ব্যর্থ: নতুন কোন শিল্প জেনরও নয়। ছোটগল্পের শিল্পরূপের আলোচনার এই ব্যর্থতাও অস্বাভাবিক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৭০তম জন্মবার্ষিকীতে

রণেশ দাশগুপ্ত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে তিন দশকে আমাদের উপমহাদেশের দিনবদলের পালায় নিপীড়িত মানুষের অভ্যুত্থান ও শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির দরুন বিপ্লবজনকভাবে বাঁচার সঙ্গে বিপ্লবজনকভাবে লেখার কাজকে বিপ্লবী দায়িত্ববোধ এবং নিকট ও হৃদয়গ্রসারী লক্ষ্যে একত্রিত ও বিস্তৃত করার তাগিদ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান তাগিদকে সামনে রাখলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধনা ও শ্রেণীর প্রাণের বর্নার জন্তে জনগণের আগ্রহ ও করণীয়ের বিস্তারণ বাংলাকাব্য ও উপন্যাসের এবং সাধারণভাবে সাহিত্য ও শিল্পকলার আভ্যন্তরীণ ও আপাতমুখের প্রগতিক কাজকর্মের অপরিহার্য,— উপাদান হতে বাধ্য। এর কারণ, ‘পদ্মানদীর মাঝি’ এবং ‘চিহ্ন’ উপন্যাসের লেখক একাদিক্রমে খেটে খাওয়া মানুষের মহাজাগরণ ও তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের জন্তেই ভেবেছিলেন এবং লিখেছিলেন। ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ই হোক কিংবা ‘দিবায়াত্রির কাব্য’ হোক, এই গরনের লেখাতে মনের মানুষকে জানবার এবং জানানোর মধ্য দিয়েও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই তৈরি করেছিলেন নিচতলার গতব ষাটানো নরনারীর জ্বালা জ্বালা তৈরি করার জন্তে। এই বিদ্রোহী লেখকের জন্মবার্ষিকীতে এই সাধনা ও শৈলী ও ব্যক্তিত্বকে হাজার অভিযান।

বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে প্রগতি ও স্বজনশীলতার ধারায় রবীন্দ্র শব্দ নজরুল কমল জুকারের সঙ্গে কারিগর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রগতি লেখক সংঘের পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত হয়েছিলেন, সাম্প্রদায়িক দ্বাধার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধের আহ্বান

করেছিলেন, উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের অস্ত্রে কাজ করেছিলেন। কর্মে ও কথায় এক এই আপোষহীন লেখককে আমরা যে অকালে হারিয়েছি সেই দুঃখের কথা জানাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আগামীতেও সঙ্গী হিসেবে পাবার নিশ্চয়তা ঘোষণা করতে পারছি। এ অস্ত্রেও হাজার অভিযান। এই লেখককে কোন ভাবেই বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই। অন্তরে এবং বাইরে বহর সঙ্গে অড়িত তাঁর সত্তা। জনগণের জাগরণ ও অভ্যুত্থান ও কর্মকাণ্ডের যে অপ্রতিরোধ্য প্রাণের স্বর্ণায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণশক্তি ও সত্যতা এবং একাগ্রভাবে আহরণ করেছিলেন, তার মধ্যে থেকেই প্রগতিবাদী ও কমিউনিস্ট লেখক লেখিকারা নতুনতর সাধনা ও শৈলী নিয়ে জনগণচিন্তকে আশ্বাসে আনন্দে সংগ্রামী চিন্তায় এবং বিজ্রোহ ও দায়িত্ববোধের ঐকান্তিকতায় ভরপুর করে দেবেন। এটা লেখক লেখিকাদের বড় দায়িত্ব। যেকোন উত্তরণে শৌছবার সময় যে অন্তর্বর্তী সাময়িক বিপর্যয় ও বিভ্রান্তি আসে, তাকে কাটিয়ে তোলার কাতটাও প্রগতিবাদী ও কমিউনিস্ট লেখকের একটা কাজ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে রয়েছে এই কাজের এগিয়ে চলা জ্যোতি রেখা। স্বকান্তের সহযোগী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'চারিদিকের বিজ্রোহ'কে জনচিন্তের চাপাপড়া ভয়ের পাতালেও দেখতে পেয়েছিলেন বিজ্রোহ। সেই বিজ্রোহ গত তিরিশ বছরে কিছু বাইরে বেরিয়েছে, অনেকটা ভিতরে রয়ে গিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই নতুন বিজ্রোহী লেখক ও লেখিকাদের অস্ত্রে কাজ দিয়ে গিয়েছেন। বিজ্রোহীরা বিজ্রোহীদের জয়গা দখল করে বসে থাকলে তারা আর বিজ্রোহী থাকেন না। বিজ্রোহীদের কাজ হচ্ছে নতুন নতুন বিজ্রোহীদের অস্ত্রে জয়গা করে দেয়া। সুতরাং সাক্ষা বিজ্রোহী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার যে অসম্পূর্ণতা, তারও একটা সম্ভাব্য সার্থকতা এই নব নব বিজ্রোহের নব নব শৈলী ও সাধনায়। বিজ্রোহী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্ত্বতম অঙ্গব্যর্থিকীতে এ বিষয়ে আমাদের আশ্রয়জিহ্বাসা,—এদিকটাতে আমরা কতখানি এগিয়েছি ?

অবশ্য বিপ্লবী জনগণের বিজ্রোহী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এইভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়ার প্রয়োজনবোধের সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র আশঙ্কাও আছে, কারণ জনগণ-মনের ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলোকে সেতারের তারের মতো বৃত্ত করার প্রয়োজনবোধটাকে বাংলায় বারো আনিয়েছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই

অন্ততম অগ্রণী। এই আশঙ্কাটা হচ্ছে, আমরা জনগণ যে ঘর মতো করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব ও শৈলী ও সাধনাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নির্দিষ্ট করে নিছি না তো? শিল্পীর কাজকে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে হামেশাই তাঁর কাজের ঐকান্তিকতাকে আমরা নষ্ট করে কেলি। স্বর্ণার জল যেমন নিজের নিজের পেলাসে ঢেলে বলি, এ জন একান্তই আমার, আমার, আমার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কতখানি শ্রমিক, কতখানি চাবী, কতখানি নিয়মব্যবস্থা, সেইভাবে চালাচালি করলে বর্ণা নিশ্চয় বর্ণা থাকতে পারে না। স্ততরাং তাঁকেও নির্দিষ্ট করতে বাওয়ার একটা বিপর আছে। তবু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনকেও তো অস্বীকার করা যায় না।

অন্ততপক্ষে ছয় আধুনিকতা যে মায়াজাল পাতছে এখনও, তাকে ছিঁড়ে কেলে যেবার অন্তেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্দিষ্ট করা সৌন্দর্যের আশ্বাসনের বিচারের দিক থেকেও আবশ্যিক। অব্যবহী ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার মোহ আমাদের উপমহাদেশে এবং বিশেষ করে বাংলার গাঁজনায় গাঁজনায় পরিবেশিত হচ্ছে। বিপ্লবকে ঠেকাতে চেষ্টা করছে প্রতি বিপ্লবীরা এই গাঁজনায় দিয়ে। একারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কতখানি চাবী, কতখানি শ্রমিকের এবং কতখানি নিয়মব্যবস্থার কথা লিখেছিলেন, সে-কথা হবে অমৃত সমান। চাবী, শ্রমিক ও নিয়মবস্তুরা ক্রমেই বেশি বেশি করে একত্রিত হচ্ছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগ হওয়ার ভয় নেই।

৩

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনক্রমেই উপেক্ষিত লেখক বলা যায় না। অব্যবহী পাশ কাটিয়ে গেলেও, তাঁকে বিশাল অন্ধনে টেনে নিচ্ছে জনগণের অন্ধরজ্ঞান সম্পন্নরা। একটা আক্ষেপ, এই বিদ্রোহী লেখকের ছোট গল্প 'নেড়ি' কিংবা 'সমুদ্রের স্বাদ' বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ওই কারণেই অন্ধরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যাপক তরুণ তরুণীদের রুচি পড়ে তাঁদের ব্যাপারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাকে কাজে লাগানো হয়নি। তবু, এই আক্ষেপের জালাকে প্রশমিত করে এমন ঘটনা আমাদের সামনে রয়েছে। মার্কিন গ্রন্থাবলীর প্রচার কম নয়। মানিক বিচারের গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে যে একটা অবিভাজ্য মূল্যবোধ পড়ে উঠেছে, তার জোরেই এই মুহূর্তে চারটি বিষয়কে নির্দেশক করা যেতে পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুঝে নেবার জন্যে :

(১) নতুন পৃথিবী, নতুন দেশ, নতুন সমাজ ও নতুন মাহুস গড়ার চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের নায়ক-নায়িকা খেটে-খাওয়া মাহুস।

(২) সমষ্টি ও ব্যক্তির মুক্তক সম্পর্কের বিজ্ঞান সম্ভব পরাধীনতা থেকে মুক্ত এবং শোষণ থেকে মুক্ত জীবনে। কমিউনিজম বা মার্কসবাদ লেনিনবাদ এই মুক্তি সংগ্রামের চালিকাশক্তি।

(৩) আধুনিক মনোবিজ্ঞান জনগণের মুক্তিসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই অবক্ষয়ী, আবার মুক্তিসংগ্রামে ব্যাপৃত হলেই বিপুল প্রাণশক্তির ভাণ্ডার।

(৪) ছুই বাংলার বিপ্লবের অবিদ্যায় শেতু খেটে-খাওয়া মাহুসেরা। এই সেতুই সারা বিশ্ব প্রসারিত।

স্ববর্ণরেখার ধাতে যেমন বালি ভাঙলেই অঙ্গ হাতে উঠে আসে, রানীগঞ্জের মাটি খুঁড়লেই যেমন কয়লার স্তর, মেঘনা যেমন মেঘ দেখলেই ছলে ওঠে, তেমনি উপরোক্ত নির্দেশকগুলোকে পাওয়া যাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে, ছোটগল্পে, কবিতায়।

কবিতাতে এই সমস্ত উপাদান একসঙ্গে হীরার মতো জমাট বাঁধানো। হয়তো কবিতার শিল্পরূপগত বৈশিষ্ট্যের জন্যেই ঘটেছে। উপন্যাসে সব কিছু ছড়িয়ে থাকে। ছোটগল্প কণা কণা আলো। কবিতাব্য অবিধা তার লতানো কিংবা হীরক-আধারে ধরা যায়—সারা জগৎকে একমুঠায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই অবিধাটাকে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর কবিতায়।

তাছাড়া, অতি আধুনিক কবিতা লিখেছেন এই বিদ্রোহী। অতি আধুনিকতা যদি কবিতাকে চূর্বোদ্য, মস্তিষ্ক নিবদ্ধ ও অতিশীলিত না-হয় তাহলে তার আধুনিকত্ব থাকে না বলে যে ধারণা প্রচারিত হয়, তাকে অবাস্তব বলে প্রমাণিত করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর লেখা বই-এর মধ্যে উপন্যাসে ছোটগল্পে কিংবা কবিতাতেই শুধু খুঁজিনি আমরা। সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে এবং বিশেষ করে খেটে-খাওয়া নরনারীদের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে তাঁকে পুরোপুরি পাওয়া যায় না। তাঁর লেখাকেও পুরোপুরি বুঝতে পারা যায় না তাঁর সমসাময়িক নিচতলায় মাহুসগুলির সঙ্গে যোগাযোগ না করলে।

আবাসীতে তাঁর লেখার সর্মকে খুঁজতে হবে বিস্তৃত জীবনে।

অতীতটাকে খুঁড়ে খুঁড়ে বার করে ইতিহাসবিদ এবং বিপ্লবী উভয়েই। আলানি পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা কয়লাই তার প্রমাণ। শিল্পীদের সুবিধা, তারা এই আলানিকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অস্ত্রে মজুত করে যেতে পারেন খোলা আয়গায়। বই খুললেই এরা বেরিয়ে আসে, প্রাণের বর্না হয়ে আসে। শিল্পকলা স্বয়ং-জীবন কাঠি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ছোটগল্পে কবিতায় বিশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের একেবারে নিচতলার নায়ক-নায়িকারা আয়গা পেয়েছে। এ ব্যাপারে অত্যন্ত পথিকৃতদের তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছেন একটা ব্যাপারে। সেটা হচ্ছে, মুখের পড়নের উপর নির্ভর করেনি চারিভাষাশক্তি। অর্থাৎ সংগ্রামী নরনারী মাজেই চারিভাষাশক্তির অধিকারী বা অধিকারিণী হয়েছে তাঁর লেখায়।

বে বিপ্লবী প্রজন্মায় সারা বিশ্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অতি নিকটস্থ সুমিথগে কোটি কোটি নরনারী শরিক, তাদের প্রত্যেককে শিল্পরূপে আয়গা দেবার অস্ত্রে চরিত্র এবং রূপের সংজ্ঞাটাকেই নতুন করে সাজিয়ে নিতে হয়েছে। দৃষ্টান্তরূপ, বলা যায়, বাটোঁক ব্রেথট কিংবা আইডমাতড তাঁদের লেখায় এটা দেখিয়েছেন।

উপন্যাস ও ছোটগল্প শত শত বছর আগেও যখন সাধারণ নরনারীকে নায়ক-নায়িকা করেছে, তখন থেকেই গভীরতরে ভিতরে চারিভাষিকতার দৃঢ়রেখা আশ্রয় করেছিল সাধারণ নরনারীর সামান্য সত্তাগুলিকেই। কিন্তু এতে ফুলোদনি শেষ পর্যন্ত। চারিভাষিকতাকে মুখাবয়বের বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকেও মুক্ত করতে হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবিষয়ে পথিকৃত বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়। জীবনদর্শনকে এরিকে সুরিয়েছেন কিংবা স্থাপন করেছে বলেই এ ব্যাপার সটেছে।

রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্র ঠিক এই ব্যাপারটাতে মধ্যপথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এবিষয়ে অবিরোধিতা ছিল তাঁদের। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পকে এই অবিরোধিতা থেকে মুক্ত করেছেন। কিন্তু সামনে যারা আসছেন, সেইসব প্রগতি ও বিপ্লব ও মানবতার লেখক-লেখিকাদের কাজের মাত্রা হবে আরও অনেক বেশি।

এছাড়া কি তাঁরা নিম্নের তৈরি করছেন ?

সমসাময়িক জীবনকে তাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখ দিয়ে কোটি নরনারীর জীবন হিসেব দেখেছেন?

এটা আশ্চর্যকথা।

কারা স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছে, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রাথমিক লড়াইগুলো লড়েছে, কারা তারা? নিচতলার নিজে দাঁড়িয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা দেখেছেন এবং তাদের নিয়ে লিখেছেন। 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসটিতে এর একটা প্রামাণ্য ছবি রয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাকে অথবা সমসাময়িক বিশ্বব্যাপী বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা ধরকার আরও আরও এই ধরনের বিদ্রোহী কাজের প্রসারের। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়িয়ে গেলে তাঁকে ছোট করা হবে না। বরং তাঁকে বড় করে বৃহত্তর অবিস্তার প্রসারিত জীবনের মধ্যে রেখে এগিয়ে চলা হবে।

একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। বে কলকাতাকে আজকাল নোংরা বলে বিচার দেয়া হয়, সেখানেই যখন দেখি পাতাল রেলের কাজ করছে মেহনতী মাহুয, বিশাল শ্রোতকে ঢুকতে বেরতে দেখি, যখন এই কলকাতার পথে আদিবাসী নরনারীকে সদর্পে মিছিল করতে দেখি, যখন চায়ী নরনারী নানা পতাকা নিয়ে ময়দানে জড়ো হয়, এবং এই রকমের বিশাল আরও কত ব্যাপার যখন ঘটতে থাকে, যখন শিয়ালদহ কিংবা হাওড়া স্টেশনে নরনারী নিত্যবাজারী শ্রোতধারায় মিলি, তখন মনে হয়, আরও অসংখ্য মাহুয একটা প্রত্যাশা লালন করেন মনের মধ্যে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার কিরে চাই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পরূপদর্শনকে প্রযোজিত করার সাম্যবাদী লেখক-লেখিকা চাই। সমসাময়িক এই জীবনকে তার কোটি নরনারীর চারিত্রিকতা সম্ভাবে ধরে না রাখলে সত্যের মধ্যে ফাঁক থেকে যাবে। ফাঁক থেকে যাবে হৃদয়ের মধ্যেও। একটি কোন তরুণ কিংবা তরুণীও যদি বলে, 'আমাকে কাকুর নেশায় পেলাম ন', তাহলে ব্যর্থ হবে সমস্ত আন্দোলন। একজন প্রৌঢ় কিংবা প্রৌঢ়া, চায়ী কিংবা মজুর যদি বলে, আমার ছবি নেই এসব লেখার, তাহলে বুঝা এত কথা সাজানো।

বহুরঙ্গী-র জিশ বছর

অবশেষে পুলিশ পৰ্ব্বত গড়াল ব্যাপারটা। পুরোপুরি ল আও অর্ডারের প্রায়। একটিমাত্র টিকিটের মত সারারাত্রি সারিবদ্ধ লাইনে দাঁড়িয়ে অনিচ্ছা-
তিতিক্ষা, প্রান খোলা হলে সেই একই দৃশ্য—হৈ হট্টগোল ধত্বাধস্তির গোলক-
ধাধা। থবরের কাগজে চিঠি লেখালেখি, থবরের কাগজে সংবাদ শিরোনাম।
একটিমাত্র টিকিটের কাভালপনা। থিয়েটারের টিকিট—বহুরঙ্গী প্রযোজিত
‘দশচক্র’ বা ‘রাজা অম্বদিপাউন্স’। ঘটনার সময়কাল, জুন ১৯৭৮।

পরলা মে ১৯৭৮ জিশ বছর পূর্ণ হলো বহুরঙ্গীর প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে। দু-
একটি হুঃখজনক জীবনাবসান এবং গোটা কয়েক দল বদল বসতি বদলের
ঘটনা ছাড়া দলের প্রায় সব প্রধান ও কৃতী শিল্পীরা আজও সংস্থার স্বেচ্ছা-
ছাড়িয়ে আছেন এবং বলা বাহুল্য, তাদের অনেকেই আজ অধুনা বাংলা রঙ্গ-
মঞ্চের জনবরণ্য শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধেয়া। ইতিমধ্যে নতুনরা এসেছেন, বহুরঙ্গীর
চেয়েও বারা অনেকেই বয়সে ছোট, নানীভাবে বিকলিত হচ্ছেন প্রধানদেহ
সমিহিত ছায়া এক আশ্রয়িত আশ্রয়ে। জিশ বছর অতিক্রান্তির পর,
নিঃসন্দেহে বহুরঙ্গীর ভবিষ্যৎ ঝরাই।

এই ছরছাড়া সময়ে, চাবিদিকে প্রায় সবই বধন এলোমেলো, কিছুই ধরে
রাখা যাচ্ছে না ঠিকমতো, সেখানে একটি নাট্যবলের পথে, আটচল্লিশ থেকে
আটাত্তর, নিজের সর্গোব অস্তিত্ব রক্ষা নিঃসন্দেহে এক বিরাট ঘটনা। শিশু
মিজের নেতৃত্ব বা একসঙ্গে অনেক অনেক ব্যক্তিপ্রতিভার সম্মিলন, দলগত
সংহতি বা সাংগঠনিক দৃঢ়তা—এ সবই হয়তো বহুরঙ্গীর প্রাণবৈভবের মৌলশক্তি,
কিন্তু অবশ্যই সব নয়। এতে শুধুমাত্র নিজেদের অস্তিত্বরক্ষাই সম্ভব, চার
দশক ছুঁয়ে বেঁচে থেকে বহুরঙ্গী তার শিল্পপ্রয়াসে এমন অনেক কিছুই করেছে,
যেখানে সে ইতিহাস। ঐতিহ্যের মধ্যে থেকেই ঐতিহ্যে বৃদ্ধোন্মুখি ষাড়া
পায়ে দাঁড়ানো, ঐতিহ্যধারায় ‘আধুনিকতার’ হৃদ্রপাত, সে আধুনিকতা অবশ্যই

অভিনবশ্বেষের সিমিক নয়, দার্শনিক মননলব্ধ একটি ছিন্ন অধিষ্টকেই খুঁজে পেতে দেখার নিরন্তর ব্যান। প্রেসেনিয়মে বড়ো মাপের নাট্য প্রযোজনায় প্রথম নজির চ্যামর 'রক্তকরবী' আজও আমাদের স্মৃতিতে শিরূপ। 'গণনাট্য' থেকে 'নবনাট্যের' বিবর্তনে, সামগ্রিক থিয়েটারের বিবিধ পরীক্ষানিরীক্ষার চৌধটে 'রাজা' এবং 'রাজা অরেদিপাউন' প্রত্যক্ষ দর্শনে বেন আমাদের মহাকাব্য পাঠেই অভিজ্ঞতা। অঙ্ককারের যে এত আলো, নৈশম্য এত কনিময়—নতুন অভিজ্ঞতা। সর্বোপরি বাঙালি দর্শকের কাছে প্রায় অজ্ঞাত এক রবীন্দ্রনাথেরই পুনরাবিষ্কার। পিরিশচন্দ্র-বিজ্ঞেশলাল-কীর্নোদপ্রসাদ যে সময়ে বাংলা রক্তমণ্ডলের অধিপতি, মনস্বী রবীন্দ্রনাথ হয়তো জানতেন, মূল পাঠান রাতপুত্রে তরবারির প্যাচ নিঃশেষ হবে একদিন। বাংলা নাটক সেদিন নিঃশেষই মুক্তি খুঁজবে। কিন্তু বাংলা নাটকের বাক ঘোরাতে সেদিন তিনি নিঃশেষে যে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন, সমকালে তার বধাবধ মূল্যায়ন হলো না। হয়তো সমকাল থেকে বেশ কিছুটা এসিয়েই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনা থেকে তাকে টেনে এনে ব্যাপক জনতার মাঝখানে দাঁড় করালেন বহুদূরী। শুধু বাংলা নাটক নয়, বাংলা থিয়েটারের মুক্তি।

ত্রিশ বছর পুঁতি উপলক্ষে বহুদূরী তাদের নাট্য অভিজ্ঞতার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর কক্ষে, যে মাসের প্রথম সপ্তাহে। বিভিন্ন প্রযোজনায় অসংখ্য আলোকচিত্র ছাড়াও কতোগুলি বিখ্যাত নাটকের মঞ্চসজ্জার মডেল এবং ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত অনেক তথ্য এই সুপরিচালিত প্রদর্শনীর বিষয়। থিয়েটার মুদ্রিত গ্রন্থ নয়, সেলুলয়েডের চলচ্চিত্র নয়, চাককলা-ভাঙ্কণ্ড নয়, অভিনয় শেষে দর্শকের স্মৃতি ছাড়া কোথাও তার আশ্রয় নেই। আমাদের জাতীয় নাট্যশালা নেই যেখানে এ স্মৃতি রক্ষিত হবে জাতীয় সম্পদের সর্বাঙ্গায়, 'মানার কারেজের' মতো বিখ্যাত প্রযোজনাগুলি সেলুলয়েডে ধরে রাখার মতো কোনো আয়োজন নেই আমাদের, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কোনো তাগিদ অহতব করে না 'রক্তকরবী' বা 'রাজা'কে লং প্রেজিং-এ ধরে রাখার—যাতে শুধু বহুদূরী নয়, রবীন্দ্রনাথও বেঁচে থাকেন উত্তর পুরুষের কাছে। বহুদূরী আয়োজিত এই প্রদর্শনী আমাদের অসংখ্য 'নেই'—এর মধ্যে কিছুটা সাব্বনা।

বহুদূরীর বেঁচে-থাকা শেষ পর্বত আমাদের অনেকেই বেঁচে-থাকা,

গুস্তাফ কেরামতুল্লা খাঁ

গুস্তাফ কেরামতুল্লা খাঁ-র প্রয়াণ ভারতীয় সঙ্গীত জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি নিঃসন্দেহে। তাঁকে আর সঙ্গত করতে দেখা যাবে না। ভাবলে মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। কারণ, খাঁ সারোব তো কোল ঠেকা দিড়েন না, তিনি গাইয়ে-বাজিয়েদের রাগ রূপায়ণে তাঁদের শূন্য আয়গা সব ভরাট করে দিড়েন। বিস্তার আছে তাঁর কাজ ছিল শোনার মতো। যে রাগের প্রকৃতি যেমন, গাইয়ের বা বাজিয়ের মেজাজ যেমন—তা সঠিক ধরতে পারতেন তিনি লহমায়, সেজন্য সকল শিল্পীই তাঁকে সঙ্গতকারী হিসেবে বিশেষ পছন্দ করতেন। আসলে তিনি কেবল তবলা বাদক ছিলেন না, উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীতের এক উঁচুয়ের শিল্পী ছিলেন। তাঁর কাছে কণ্ঠসঙ্গীতে অনেক ছাত্র-ছাত্রী তালিম পেয়েছেন, এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আকাশবাণীর প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন।

স্বযোগ্য পিতার পুত্র হিসেবে কেবল নয়, তিনি নিজ ঘরানায় সঙ্গে অল্প নানা ঘরানার 'চিহ্ন' সম্পৃক্ত করে তাঁর নিজস্ব বাহনশৈলী সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। তাঁর বাজনা রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ ছিল। বস্তুত সঙ্গত কোল ঠেকা দেওয়া নয়, মূল শিল্পীর রাগ-রূপায়ণে সাহায্য করা, সেই রাগ রূপ সমৃদ্ধ করে তোলা—এ বোধ তাঁর যেন রক্তের ভিতরে কাজ করে চলে, তাই, তিনি সঙ্গতভাবে আখ্যাত হইছিলেন 'সঙ্গত-সম্রাট' রূপে। তাঁর আগে বহুগুণী তবলা শিল্পী বাজিয়ে গেছেন, কিন্তু বর্তমানে তবলা-বাদনের যে নতুন শৈলী দেখা দিয়েছে, তার প্রবর্তনায় গুস্তাফ কেরামতুল্লা খাঁ-র দান নগণ্য নয়।

পঙ্কজকুমার মল্লিক

পঙ্কজকুমার মল্লিক এক সময় গিনেমার অভিনয় করতেন—একথা আর কে মনে রেখেছে? তাঁর কথা মনে হলোই তো প্রথমে মনে পড়ে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সঙ্গীত শিকার আসরের কথা, মহালয়ের তান খুব ভোরে “মহিষাসুরমর্দিনী”র কথা।

১৯২৯ সাল থেকে বোধহয় তিনি সঙ্গীত শিকার আসরে গান শেখাতে শুরু করেন, অবশ্য প্রথমে তিনি বিভিন্ন গীতিকারের গান-ই শেখাতেন, পরে অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখান। গান শেখাবার আগে তিনি গানের কথাগুলো বার বার পড়ে দিতেন, কারণ ঐ পড়ার মধ্যে গানের মর্মার্থ ধরা যায়। আর কেমন করে গান লিখতে হয় ও লেখাতে হয় তাঁর স্বীকৃতিতে জানা যায় যে—সে পদ্ধতি তিনি দিলুঠাকুরের কাছ থেকে শিখেছিলেন। প্রথম জীবনে গান শিখেছিলেন পণ্ডিত বিশ্বনাথ রাও—এর শিষ্য দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, পরে, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। দিলু ঠাকুরের প্রভাব তাঁর সঙ্গীত জীবনে কতখানি সক্রিয় ছিল তা রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন বা বলবেন। আমরা সামান্য জানে এই পর্যন্ত বুঝেছি রবীন্দ্রসঙ্গীত বেটুকু তিনি শিখেছিলেন তার প্রভাব তাঁর সঙ্গীত জীবনে ঘণ্টে কার্যকরী হয়েছিল, তার প্রমাণ মেলে পঙ্কজকুমারের সুবারোপিত অনেক গানে। ‘মুক্তি’, ‘ভাস্কর্য’ প্রভৃতি চলচ্চিত্রে অল্প গীতিকারের রচনায় যে স্বর তিনি দেন, তার ভঙ্গি রাবীন্দ্রিকই ছিল; অনেক সময় আমাদের মতো আনাড়ীরা সেই সব গানকে রবীন্দ্রনাথের গান বলেই মনে করেছি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে বিকৃতির কথা ওঠে বোধহয় প্রথম তাঁকেই ঘিরে, কিন্তু আজ কে হালক করে বলবে কোন স্বর আসল স্বর, যখন অরলিপিতেই অনেক হের ফের করা হয় কোনও নিষর অম্লসরণ না করে (এ-বিষয়ে কিরণ-শর্মা দে-র আলোচনা দ্রষ্টব্য)। আর কে কার কাছে কতদিন বা বছর গান শিখেছেন, তার হিসেব দিয়ে কি তাঁর গায়কীয় গুণত্ব পরিমাপ করা যায়।

তিনি একনিষ্ঠ রবীন্দ্রসঙ্গীত অমুরাগী ছিলেন—একথা তাঁর দুর্গাঙ্গ বিরোধী সমালোচকও স্বীকার করবেন। বাংলা চলচ্চিত্রে পঙ্কজকুমার প্রথম রবীন্দ্র-সঙ্গীত উপস্থাপিত করেন, এবং তিনিই বোধহয় প্রথম রবীন্দ্র-কবিতায় সুবারোপ করেন—“দিনের শেষে ঘুমের দেশে” গানটি এক সময় অগণিত শ্রোতার হৃদয়ধ্বংস করেছিল তা ভোলা যায় না, এমনকি তা যখন নতুন

গায়কের কাছে রেকর্ডে পুনরায় প্রকাশিত হয়, তখনও তার অনগ্রসরতার কথা কে অস্বীকার করবে?

আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে তাঁর 'শীতল' বিদ্যায়ের আগে পর্বত যে জীবন তাকে কি অতিথায় ভূষিত করবে? মাত্র সাতাশ বছর বয়সেই তিনি সারস্বত মহা সম্মেলনের "স্বর সাগর" সম্মান লাভ করেন, ১৯৭০ সালে ভারত সরকার তাঁকে "পদ্মশ্রী" উপাধিতে সম্মানিত করেন, ১৯৭২ সালে তিনি লাভ করেন "বাদা-সাহেব-কালকে" পুরস্কার। এছাড়া তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসঙ্গীত শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার প্রতিষ্ঠায় দিন থেকে বারো বছর।

তাঁর শেখার আগ্রহ ছিল প্রবল। তিনি একনিষ্ঠ মনোযোগী ছাত্রের মতো তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট সুবিনয় রায়ের কাছে গান শেখেন, শাস্ত্রদেব ঘোষের কাছে সিনেমার জন্ত যে গান শেখেন, সেখানেও তিনি ছিলেন ছাত্রেরই মতো সজ্ঞিত পরিচালকের অঙ্গুপত।

একসময় রবীন্দ্রসঙ্গীত বাদে তাঁর "ও কেন গেল চলে", "আমাদের ভালোবেসে আমরা লাগিয়া", "চৈতন্যবিনের বরা পাতার পথে", "পিয়া মিলন কো বানা" বা "অঙ্গনগড় ছবির গান সংসার কে আধার" কিংবা "মহা-প্রস্থানের পথে" ছবির গানগুলো আমাদের স্মরণমন হরণ করে নিয়েছিল। তাঁর গাইবার ধরনটি ছিল একান্ত নিজস্ব, আনি না এই নিজস্বতার দ্বিচ্ছাভাবের সঙ্গার কোনও প্রভাব ছিল কিনা। কিন্তু পঙ্কজকুমার মল্লিক যে বড় শিল্পী ছিলেন সে-কথা প্রমাণিত হয় তাঁকে ঘিরে নানা আলোচনা সমালোচনার বহরে। কারণ যিনি প্রকৃত শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম নিয়েই তো চলে নানা আলোচনা—পক্ষে, বিপক্ষে, আর সেই সব আলোচনা যুক্তিসহ হলেই তবে একজন শিল্পীর সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়ে ওঠে।

এক সময় খুবই সীমাবদ্ধ শ্রোতা ও গায়কের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চলন ছিল, পঙ্কজকুমার সেই মঞ্চটিকে সাধারণ্যে প্রচারে একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন, তাঁর সে কর্মপ্রচেষ্টা আমাদের অজস্র সাধুবাদের বোণ্য, যদিও তিনি খ্যাতি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়ে ছিলেন কিনা—তা নিয়ে আরও বহুদিন তর্ক-বিতর্ক চলবে সম্ভব নেই।

কনুস্তান্‌তিন আলেকসান্দ্রোভিচ্‌ ফেদিন (১৮৯২—১৯৭৭)

“আমরা একটি জিনিস চাই—সৃষ্টি হবে অথবা ও অকৃত্রিম, তার নিজস্ব ধারায় গঠিত হবে তার জীবন”—অক্টোবর বিপ্লব-বিরোধী নন অথচ ব্যক্তিস্বাধীনতার অহুসারী, স্বয়ং গৌর্কি ছিলেন বাদে উৎসাহদাতা; ও ইয়েভগেনি আনিস্যাতিন শুরু, সেই দুঃসাহসিক ‘সেরাপিওন ব্রাত্‌স্কলী’র (বাদে মধ্যে ছিলেন কথা-সাহিত্যিক নিকিতিন, জোশচেকো, কাতারেভ, তিখোনোভ্‌ প্রভৃতি ; বারা প্রত্যেকেই অয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর নস্রুইয়ের দশকে) অত্যন্ত লেখক ছিলেন কনুস্তান্‌তিন ফেদিন । বিপ্লবের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও স্বদানন্ত আমলের কমিউনিস্ট শাসনে বাধাধরা সাহিত্যগতীর বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন সোচ্চার । সাহিত্যের সাধনাই ছিল তাঁদের একমাত্র ব্রত এবং নিষেধের তাঁরা মনে করতেন সাহিত্যের তপস্বী । লেখার ক্ষেত্রে নানাধরনের কর্ম ও বিস্তারিত অহুসারী ছিলেন তাঁরা । ১৯২৮ পর্যন্ত এই প্রাণীকর্ষক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ।

বেদিন ভোলগা অঞ্চলের এক বুদ্ধিজীবী পরিবারে ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন । প্রথম মহাব্যুৎসবের সময় জন্ম নিতে ছিলেন । বেশে কেরার সুযোগ পাওয়া মাত্র কিরে এসে লালকোজে যোগ দেন । তারপর যোগ দেন ‘সেরাপিওন ব্রাত্‌স্কলী’ সাহিত্যগ্রুপে । গ্রহবৃত্ত ও বিদেশি আশ্রাসনের সেই ভয়াবহ ও দুঃসহ দিনগুলিতেও, পেজোপলসের (বর্তমান লেনিনগ্রাদ) হাড কীপানো ক্ষিতে কীপতে কীপতে শহরের দূরদূরান্ত থেকে এসে আড্ডাও জড়ো হতেন ।

সমগ্র গ্রহবৃত্ত সমাপ্ত বিপ্লব রক্ষার সেই দিনগুলোতে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লব ও গ্রহবৃত্ত নিয়ে বা কিছু লেখা হচ্ছিল, তার উৎকর্ষ বাই হোক না কেন অনিবার্যভাবেই তা স্বীকৃতি পাচ্ছিল । ফেদিন ওপথে গেলেন না, অপরিকল্পনার সঙ্গে তাঁর বৃহনিতে উপভাসের কাহিনীকে বেঁধে তিনি লিখতে শুরু করলেন চিরায়ত রূপ ভাবায় । তাঁর উপভাসের নায়ক-নায়িকারা হয়ে উঠল প্রধানত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর—বিপ্লবের প্রতি তারা সংবেদনশীল ; বিপ্লবীর সহমর্মী, সমর্থক, আবার নিজস্ব ধরনে বিবেকবান, বিপ্লব-পরবর্তী সোভিয়েত সমাজের অনেক ঘটনা তাদের চোখে কদর্ষ নির্ভরতা, যুদ্ধ ও বিপ্লবের চেয়েও তাদের কাছে বড় মানবতা । লেখক জীবনের সেই অচনাপর্ব থেকে ফেদিন গৌর্কির মানবতা—

বাদী ধারার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধক ছিলেন। গোর্কির সঙ্গে বন্ধুত্বও তাঁর লেখকজীবন বহু পরিবর্তন এনেছিল।

স্বদীর্ঘ পঁচাশি বছরের জীবনে কেদিন প্রচুর লিখেছেন। তার মধ্যে ‘শহরগুলি ও বহরগুলি’ (১৯২৪), ‘ভ্রাতৃগণ’ (১৯২৮) ও ‘ইউরোপার অপহরণ’ উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস তিনটির মধ্যে আমরা একইসঙ্গে রুশবিপ্লবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আমলের মানুষের জীবনযাত্রা, ভাবনাচিন্তা, যুদ্ধের মধ্যে কি কর্মবৃত্তা ও বিপ্লবের মধ্যে কি সার্বকজ্ঞা আছে তার সমস্ত চিত্র পাই, পাই বিপ্লব-পরবর্তী সোভিয়েত সমাজের অগ্রগতির ধারাটি। পরবর্তীকালে তাঁর আরো পরিণত ও দৃঢ়তর পরক্ষেপ দেখতে পাই তাঁর টেলজি বা জিপাদিক উপন্যাস ‘প্রাক-আনন্দ’ (১৯৪৫), ‘অসাধারণ গ্রীষ্ম’ (১৯৪৮) ও ‘দাবানল’-এর মধ্যে। উপন্যাসজন্মের মধ্যে কেদিন ধরতে চেয়েছেন ১৯১০ থেকে ১৯৪১-এর রুশজীবনচিত্র—বা নিষিদ্ধ বলা যায় মহাকাব্যধর্মী। কিন্তু হুঃখ এই ‘দাবানল’ উপন্যাসটি শেষ করে বাবার আগেই কেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন—এ বেন সেই বিশ্বকর্ষার পুরী অগ্নিগর্ভ মন্দিরের মূর্তিজন্মের কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে বাবার মতো ঘটনা। কেদিনের উপন্যাসে আমরা শুধুমাত্র রুশজীবনের জীবন্ত চিত্রই পাই না, সেই সঙ্গে পাই পাশ্চাত্য জীবনযাত্রারও নিখুঁত পরিচয়। লেখার ব্যাপারে কেদিন ছিলেন বরাবরই আধুনিক, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য-ভাবে তিনি বদলে গেছেন; বদলে গেছে তাঁর লেখার ধারা। উপন্যাস ছাড়াও তিনি নাটক, দার্শনিক রচনাবলী ও সাহিত্যের নানা পবেষণাধর্মী লেখা লিখে গেছেন। এ সবই চিরায়ত সোভিয়েত সাহিত্যের-মূল্যবান সম্পদ। ছুবার তিনি স্টালিন পুরস্কার (বর্তমান লেনিন পুরস্কার) পান। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি যে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই শুশ্কেল আমলে, ‘বরক গলার যুগ’ আসার সঙ্গে সঙ্গে কেদিনই ১৯৫২ সালে সোভিয়েত লেখকসঙ্ঘের সম্পাদক হন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দীর্ঘরোগভোগে বিছানায় শয্যাশায়ী থাকার অবস্থাতেও তিনি ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের স্রষ্ট্রীয় সোভিয়েতের একজন ডেপুটি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর, অ্যাকাডেমিশিয়ান ও সোভিয়েত লেখক ইউনিয়নের সভাপতি।

কেদিন ছিলেন বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী আন্দোলনের একজন সক্রিয় বোদ্ধা। সোভিয়েত বহুভাবিক সাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞ। বিদেশি বহুভাবার তাঁর সাহিত্য অনুদিত হয়েছে এবং আমৃত্যু তিনি ছিলেন জনপ্রিয় লেখক।

কনস্তানতিন আলেকসান্দ্রোভিচ কেদিন মারা গেলেন। কিন্তু আমরা তো

আনিই লেখকের মৃত্যু নেই। এ শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দী প্রবাহিত হবে তাঁর অনিবার্য জীবনশিখা—আপন সাহিত্যে বা তিনি নিজের হাতে জেলে রেখে গেলেন।

মির্জা তুরগুন আদা (১৯১১—১৯৭৭) -

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের তাজিকিস্তান সৌন্দর্যে কবিতা ও স্বপ্নের দেশ। তুবার ষোঁত পামীর, গরমোতা পাহাড়ী নদী, তুলোর ক্ষেত, উপত্যকা জুড়ে উপচে পড়া কলের বাগান, নীলিম আকাশ, চাঁদনি রাত, সোরাব, নর্তকী আর ঈগলের হেশ তাজিকিস্তান। মির্জা তাই পৃথিবীর সমস্ত বাহুকে আহ্বান করে বলেন, “সত্যিই যদি আপনি কোনো কবিকে গভীর ভাবে জানতে চান আপনার উচিত তাঁর অন্তর্ভুক্তি পরিদর্শন করা।” কিন্তু মির্জা ভালোই জানেন, তা সবার পক্ষে সম্ভব না। সুতরাং, তাজিকিস্তানের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হবে বলে আপনাকে পড়তে হবে মির্জার ‘আমার দিন ও যুগ’ বইটির কবিতাগুলি।

‘মির্জা’ শব্দের অর্থ ‘লেখক’ বা ‘ধর্মগুরু’। তাজিকিস্তানে শিক্ষিতদের এই সম্মানীয় অভিধা বেন জনসাধারণ। দক্ষিণ তাজিকিস্তানের পাহাড়-ঘেরা গ্রাম কারাতাগে ১৯১১ সালে এক ছুতোয় বাড়িতে জন্ম হয় মির্জার। স্বরপাতীতকাল থেকে গ্রামের বাহুবেরা কারিগর, শিল্পী বা মিস্ত্রী, সিকের পোশাক বোনা, রঙকরা, যুগ্ম পায়ে ছবি ও নকশা আঁকা, মুচি ও ছুতোয়ের কাজ করাই গ্রামের বাহুবের প্রধান জীবিকা।

বাবা ছিলেন নিয়মকর। অথচ স্বপ্ন দেখলেন মির্জা একটু লেখাপড়া শিখুক। নিজে এলেন মৌলভীর কাছে, বললেন, “আমার ছেলের মস্তমাস রইল আপনার আর হাড়টা রইল আমার।” ছ-বছরের মির্জা একবার অর্থ ভালোই জানতেন। যেমন খুশি শান্তি দেবার আধীনতা থাকল মৌলভীর। তাছাড়া বাবার কষ্টার্জিত রোজগারের অর্ধেকটাও সেদিন তুলে দিতে হয়েছিল মৌলভীর হাতে। বাবার দারিদ্র্য ও শৈশবে মা-কে হারানোর ফলে মির্জাকে অতিবাহিত করতে হয়েছিল দুঃখকষ্টের জীবন। রোজগারের ধান্দার বাবাকে প্রায়ই গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হত দুশানবে শহরে।

তারপর এল অক্টোবর বিপ্লব—তার চেউ আছড়ে পড়ল স্বদ্র তাজিকিস্তানেও। বুধারার আমীরকে সিংহাসনচ্যুত করে সোভিয়েত কমতা প্রতিষ্ঠিত করল জনগণ। প্রাচীনের দল সহজে ঐ পরাজয় মেনে নিল না। বিদেশি আগ্রাসকদের সাহায্যে ‘বাসমাচি’-রা পাহাড়ে পাহাড়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল যেভাবেই হোক সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাতরগুলো থেকে মধ্য এশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

১৯২০। লালকোজ এল ঐ অঞ্চলে। মেটুন কমান্ডারের জী-র ছাউনি পড়ল কারাতাপ গ্রামে। নেহময়ী সেই রমণীর কাছেই মির্জো প্রথম কল শব্দ ‘ধ্লেব’ অর্থাৎ ‘কুটি’ শেখেন। জীবনে সেই প্রথম কুটি (পাঁটুকুটি) দেখলেন ও খেলেন। লাভুক দশ বছরের সন্ত বালক মির্জোকে সেই রমণী কলভাবা শেখাতে শুরু করলেন। একসময় মির্জো জানতে চাইলেন কোথা থেকে তিনি এসেছেন? রমণী বললেন, “মক্কো থেকে...লেনিন আমাদের পাঠিয়েছেন।” মির্জোর ইচ্ছে হল সেই মুহূর্তে মক্কো গিয়ে লেনিনকে দেখে। রমণী বললেন, আগে ‘বাসমাচি’রা ধতম হোক, তারপর পড়াশুনার জন্ত তাঁকে মক্কো নিয়ে যাওয়া হবে। স্বদ্র শৈশবে মির্জোর সেই মক্কো ও লেনিনকে দেখার স্বপ্ন পরবর্তীকালে তাঁর ‘গকা থেকে ক্রেমলিন’ কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

খুব শিগ্গির মির্জো বুঝতে পারলেন আসল জিনিস—শিক্ষা। হুশান্বে শহরের নাসারি স্কুলেই তাঁর আসল শিক্ষা শুরু হয়। দৌভাপ্যবশত সেই ছাত্রজীবনের শুরুতেই শিক্ষকদের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী কবি আবুল কাশেম লাখুতিকে। তাঁর আরো একজন প্রেরণাদাতা, তাজিক সোভিয়েত সাহিত্যের স্থপতি, সাহসিকি আইনীর সঙ্গে মির্জোর পরিচয় হয় পরে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে তিনি তাজিক ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনে পড়াশুনা করতে যান।

হুচাকার গরু টানা পাড়িতে তেরমেজ শহরে পৌছতেই তাঁর দু-সপ্তাহ লেগে যায়। সেখান থেকে ট্রেনে পদ্মব্যহুল। রেলগাড়ি দেখার সেই প্রথম অভিজ্ঞতা পরে তিনি তাঁর ‘বাসান—আরবাকেল’ দীর্ঘ কবিতায় বর্ণনা করেছেন। তাজিক ইনস্টিটিউটে পড়ার সময়ই তাঁর জীবনের প্রধান ছটি ঘটনার সূত্রপাত হয়—মির্জো কমসোমলে যোগ দেন ও কবিতা লিখতে শুরু করেন।

প্রথম কবিতা সংকলন ‘বিজয় পতাকা’ প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। সেই থেকে আশুতোষ কবিতাই ছিল তাঁর জীবনের সব। তাজিক চিরায়ত সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমসাময়িক কালের সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন শুরু করেন। রুশভাবায় ডালো দখল থাকার কালে রুশসাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ভাল ধারণা জন্মায়।

১৯৪০-এ একদল লেখকের সঙ্গে দুর্গানবে-খরোগ সড়কের ধারে একটি নির্মাণ প্রকল্প দেখে নির্মাণ কর্মীদের নিয়ে বেশ কয়েকটি কবিতা লেখেন। তাঁর বিখ্যাত ‘হিসার উপত্যকা’ কবিতা আশুজীবনীমূলক—বার মধ্য দিয়ে তাজিকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে অক্টোবরের আলোয় কীভাবে নতুন জীবন এল তা তিনি বর্ণনা করেছেন। ঐ বছরই তরুণ লেখকদের এক সেমিনারে বোগ দিতে যান আসেন। পরিচয় হয় বিখ্যাত রুশ লেখক আলেকসেই তলস্তয়, আলেকসান্দ্র কাদায়েভ, নিকোলাই তিখোনভ, ভসেস্তলভ ভিশনেভস্কি ও অন্যান্যদের সঙ্গে—ঐ সাক্ষাৎকার থেকেই তিখোনভের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ফেসব কবিতা লেখেন তার মধ্যে ‘দেশের ছেলে’ ও পালাগান ‘তাখির ও পুখরা’ বিখ্যাত।

শৈশব থেকেই তিনি ভারত প্রেমিক। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে সঙ্গীত, স্বপ্ন আর রূপকথার দেশ। ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষে আসেন প্রথম আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে বোগ দিতে। ভারতবর্ষ যুরে বাবার সেই অভিজ্ঞতা তিনি কবিতার রূপান্তরিত করেন তাঁর বিখ্যাত ‘ভারতীয় গাথা’ কাব্যগ্রন্থে এবং বইটির জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পান।

ভারতবর্ষ ভ্রমণেব পূর্ব থেকে প্রাচ্যের মুক্তি-সংগ্রামই তাঁর কবিতা ও কর্মজীবনের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। দিল্লী, দামাস্কাস, কাইরো, তেহেরান, প্যারিস, স্টকহোম ভ্রমণ করেন। মির্জোর মতে তিনি বহি প্রাচ্যের মুক্তি-সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের সক্রিয় সহযোগী না হতেন তাহলে ‘ভারতীয় গাথা’, ‘এশিয়ার কণ্ঠস্বর’, ‘অনির্বাপ শিখা’, ‘প্রিয়তমাসহ’, ‘গঙ্গা থেকে জেমলিন’, ‘আফ্রিকা আমার বোন’-এর মতো কবিতা ও কাব্যগ্রন্থগুলি তাঁর পক্ষে লেখা হত কিনা সন্দেহ।

লেনিন পুরস্কার জয়ী মির্জা ছিলেন অ্যাকাডেমিশিয়ান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর, তাজিকিস্তান লেখক ইউনিয়নের প্রধান ও আফ্রো-এশীয় সোভিয়েত কমিটির সভাপতি।

মির্জা কবিতা পড়তেন হৃদয়ের তালে তালে, উচ্চকণ্ঠে, যেন দূর বহুদূরের কোনোকিছুর উদ্দেশে; তিনি আবৃত্তি করতেন আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রবাহিত হত শ্রোতাবিনী; হঠাৎ বিরতি; মির্জা উচ্চারণ করলেন গুণ্ডারধ্বনির মতো একটি মাত্র শব্দ; দীর্ঘশ্বাস উঠে ভেঙে পড়ত শ্রোতাদের মধ্যে...

১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তাজিকিস্তানের হুসর কালো রঙের পাহাড় আর রূপালী নদী মর্মরিত তাঁর প্রিয় কারাতাগ গ্রামে আজও শোনা যাবে মির্জার উদাত্ত কণ্ঠের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে বলছে: অস্তিনন্দন! স্বাগতম্!

বিপ্লব মাজী

সুমিত্রানন্দন পদ্ম

জন্ম ২০.৫.১৯০০ মৃত্যু ২২.১২.১৯৭৭

হিমালয়ের পাদদেশে (কৌশানী জেলা, আলমোড়া) তাঁর জন্ম। ৭৭ বছর বয়সে প্রয়াগ-সড়মে তিনি দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন। হঠাৎ তাঁর সম্মানন বন্ধ হয়ে যায়।

মুঘল সাম্রাজ্যের তৃতীয় পর্বে ছত্রপতি শিবাজীর অভ্যুদয়-কালের উত্তাল প্রাথমিক দিনগুলিতে মহারাষ্ট্রের কুলীন ও পণ্ডিত-বরানায় অমৃতম পরিবার উত্তরাধিকার কুমারদের অন্তর্গত একলে এসে স্থায়ী বসতি করলেন। মহাকবি সুমিত্রানন্দন পদ্ম ঐ ব্রাহ্মণ পরিবারের বংশধর। বাল্যকালে তাঁর নাম রাখা হয় গৌসাই দত্ত। পরে তা পাণ্ডে সুমিত্রানন্দন করা হয়।

মহাকবির কাব্যজীবন প্রায় ষাট বছরের সুদীর্ঘকাল ধরে ব্যাপ্ত ছিল। তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও অনবরত সাধনার জোরে তিনি তাঁর অপূর্ব কবিকৃতি প্রতিষ্ঠা করে যান। 'পল্লব' 'শুভ্রন'-আদি কাব্যসংকলনগুলি ১৯২৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত প্রকাশক সংস্থা এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস এই সংকলনগুলি বিজ্ঞপ্তি-পূর্বক ছাপেন। ঐ সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র 'সরস্বতী'-তে পূর্ব থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকায় 'পল্লব' ও 'শুভ্রন'-এর কবিতাগুলি নতুন কাব্যরসিকদের মুখে মুখে ফিরছিল। কোমল অহঙ্কৃতির রসে ডুবিরে তোলা নতুন ও বর্ণীয়া সুবাসিত ও নবনব

ছন্দে রচিত কবিতাগুলির এতই সমাদর হল যে ঐ সময়ের পত্রিকা-সম্পাদক ও সমালোচকেরা তরুণ কবিকে সর্বাত্মকরূপে ভূয়সী প্রশংসা জানালেন। ঐ কবিতাগুলির প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার দীর্ঘিত হয়ে কিছু বৃহৎক ঐ কবিতাগুলিকে 'ছায়াবাদী' আখ্যা দিতে শুরু করল।

আজ থেকে বাট বছর আগে পরিহাস-উপহাস-দেবার অলুনিতে অলুতে অলুতে ঐ সময়ের কাব্যবিশেষজ্ঞ নামধের তথাকথিত পণ্ডিতমন্ত্বেরা যে 'ছায়াবাদ'-এর হুঁয়ো তোলেন, তার আদি কবি সুমিত্রানন্দন।

১৯৩২-৪০—এই কালখণ্ডে স্বাধীনতা সংগ্রাম, শ্রমিক ও কৃষকের লড়াই-জনিত পরিস্থিতিতে পছের কাব্যচেতনার বিপুল পরিবর্তন ঘটে। 'যুগান্ত' ও 'গ্রাম্য'-র মর্মভেদী রচনার এই পালাবদল সূচিত হয়েছে। এই সময়ে 'রূপান্ত' সাময়িকী মহাকবির সম্পাদনার বেড়-জুহুর চালু ছিল। পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সুসজ্জিত, সুসজ্জিত, সুসম্পাদিত 'রূপান্ত'র ঐ সংখ্যাগুলির গুরুত্ব এত বেশী ছিল, যা অব্যাবধি বিদ্বান ও সবেবকদের আকর্ষণের বিষয় হয়ে আছে। 'রূপান্ত'-র চরিত্রই এমন ছিল যার ফলে তার সঙ্গে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যোগ হয় নি, হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে কিছুকাল পর পত্রিকাটি বরাবরের অন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

বিশ্ববিখ্যাত নর্তক উদয়শংকর 'কল্লনা' নামে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করার সময়ে সুমিত্রানন্দনকে আলমোড়া থেকে আগ্রা ও মাদ্রাজে নিয়ে যান। 'কল্লনা'র সংলাপ ও গীত পছজী সেনে, অথবা তাঁরই তত্ত্বাবধানে তা রচিত ও পরিমার্জিত হয়। স্বাধীনতা আশ্রির পর আকাশবাণীর কলাগল্প ও শব্দশিল্প-র বিশিষ্ট নির্দেশকরূপে পছজী প্রায় দশ বছর যুক্ত ছিলেন।

উত্তরপ্রদেশ-সরকার মহাকবিকে ১৯৬৫-তে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেন। ঐ বছরে 'লোকায়তন' মহাকাব্য রচনার অন্ত তিনি সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের পুরস্কার পান। ১৯৭১-তে তিনি 'চিদাম্বর্য' কাব্যের অন্ত এক লক্ষ অর্বনুল্যের আনপীঠ পুরস্কার লাভ করেন। 'চিদাম্বর্য' পছজীর নির্বাচিত কবিতাগুলোর বৃহৎ সংকলন। আনপীঠ প্রকাশন গ্রন্থটিকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত করে প্রকাশ করেন। এর পূর্বে, পনের বছরের মধ্যে পছজী উজ্জয়িনী, গোরক্ষপুরে, অরপুরে, কলকাতা, কানপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানশ্রুচক উপাধি পান।

অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির এই মানুষটি প্রথম বয়েস থেকেই ভীড় এড়িয়ে চলতেন, তাই এহেন নির্জনতাবোধ তাঁর চরিত্রে বসে গিয়েছিল। কোনে

৫- ঝড়টি-ঝামেলা তাঁর বরদাস্ত হত না। সারা জীবন অবিবাহিত থেকে বাগদার মুখ্য কারণ ছিল বোধহয় এটাই। বাইরের দেশগুলি থেকে আগত বহু আমন্ত্রণ তিনি এই কারণেই প্রত্যাখ্যান করতেন। দ্বিধার প্রসিক প্রকাশক রাধাকৃষ্ণ প্রকাশনের সর্বস্ব স্বীকৃত প্রকাশ সপরিবারে যখন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সফরে যান তখন স্বয়ং আগ্রহপূর্বক কবিকে সেখানে নিয়ে যান ও ভালোভাবে কিরিয়ে আনেন।

অনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে উঠে বাগীর এই জ্যোতির্ময় সন্তান অলঙ্ঘ্যে চলে যান।

স্বমিত্রানন্দনের ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক মনীষীর অবদান লক্ষ্যীয়। যেমন—লোকমাগ্ন তিলক, গান্ধী, সর্বহারা-দর্শনের আদি রবি কালমার্কস, যোগীরাজ অরবিন্দ, আমী বিবেকানন্দ, শ্রীমাকৃষ্ণ ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত আলোচনার সময় তাঁর মুখ থেকে আমি বারবার শ্রীমাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ শুনেছি। আহার-বিহার, আচার-বিচার, পরিধান ইত্যাদি বিষয়ে পছন্দী ছিলেন খুবই উদার। বৈষ্ণবদের পৌড়ামি নিয়ে তিনি রসিকতা করতেন।

তাঁর রচনাবলীর বিপুল রয়্যালটি তাঁর রচনার উত্তরাধিকারী বা উত্তর-প্রদেশ সরকার উপযুক্ত কাজে লাগাবেন, এই আশা করি।

নাগার্জুন

চাঁদ বণিকের পালা

শম্ভু মিজ পালা বেঁধেছেন—‘চাঁদ বণিকের পালা’। আর একবার টের পেলাম পশ্চিমের দিকে আনালা বার ঘটা ইচ্ছে খুলুন—জমিটুক নিজের হওয়া চাই, ভিটেখানি তুলতে হবে নিজে হাতে—কেননা সেখানে বাস করব আমি এবং আমার। এ পালায় অক্ষ নেই, দৃষ্ট নেই—আছে ‘পর্ব’। এ পালার চরিত্র-গুলি আমাদের মুগ্ধ করে না, ভাবায়, বিচার করায়। মূল চরিত্র আমাদের বা-খাওয়া হাড়-আলগা, টিলে-ঢালা, হেরো-ভাব ছুঁড়ে কেলে দিতে বলে। একটা ‘দ্বৈতবাদিক সংকল্প’—তার বা grandeur তা সবই আছে চাঁদ বেনের মধ্যে। কিন্তু মিজ মহাশয়ের বাহ্যিক এইখানে যে, তিনি সব কিছুকে একটা ভারতীয় মাত্রা দিতে পেরেছেন। বলতে কী, বাঙলা নাটকের স্বরাস্ত্র সাধনার নতুন পালা শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের হাতেই। ‘রাজা’ ‘ভাক্ষর’ ‘মুক্তধারা’ ‘রক্তকরবী’ সেই সাধনার পথের এক-একটা নিশানা। বিশেষকে নির্বিশেষ করে তোলা এবং নির্বিশেষকে বিশেষের ক্ষেত্রে জীবন্ত করে তোলার তুরায়ন্ত সমস্তা রবীন্দ্রনাথের হাতে চ্যালেঞ্জ পেল এইসব পালায়। স্বপ্নের বিষয় উত্তরাধিকারেও সে চ্যালেঞ্জ উপেক্ষিত হয়নি।

বাংলা নাটকে নতুন পালা-বাঁধার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কতখানি, সে বিষয়ে শম্ভু মিজের মতো সরেজমিনে ওয়াকিবহাল আর কে আছেন? ইতিহাস তাব ডেউয়ের মাথাব মাথার যে-কটা রবীন্দ্রনাটকে শিরোমণি করে রেখে দেবে—সে-কটা নাটকই তো শ্রীমুগ্ধ মিজের মঞ্চভাস্ত্রে কালান্তরের আলো ছড়াল। আর কেউ কেউ (শক্তিমান প্রযোজক-অভিনেতাদের কয়েকজনের কথা ভেবেই বলছি) নবতর ভাস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন না বলে শম্ভু মিজকে একেজে থেকে যেতে হল ‘অতুলনীর’। সে বাই হোক,

এ অভিজ্ঞতার তাঁর লাভ হল অল্প দিক থেকে। সব বড়ো শিল্পকাজের উপাদানের মতো রবীন্দ্রপালাব কাজ করতে করতে তিনি জেনে নিলেন কোথায় এ প্রতিহত করে, আর সেখানেই কেমন করে এ আশ্রয় আনা। এ-সালের 'বেশ' সাহিত্য সংখ্যায় শঙ্কুবাবুর সঙ্গে চিত্তবঞ্জন ঘোষের প্রশ্ন-উত্তর এ-বিষয়ে উল্লেখ করি। রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষাকে লক্ষ্য করে সে আত্মান-প্রত্যয়ানের স্বল্প মেটাতে মেটাতেই হয়তো তিনি একদিন ভেবে থাকবেন 'চাঁদ বশিকের পালার ভাষার বনে'। কেননা, কোনো লক্ষ্য করেছেন, এ ভাষা কাব্যের ভাষা। সেই কাব্যের ভাষা—বে-কাব্য বাস্তবের উপরিভল মাত্র নয়, একেবারে গহীনে গহনে চলে যেতে চায়, যেতে চায় সত্যকে খুঁজতে। পালার নায়কের মতো সেও এক লহমার অল্প বিমিয়ে পড়ে না। মুদ্রণ-বিস্তারসে এর পঙ্খের আদল সংলাপের বেলায় একবারও টোল খায়নি। অথচ কান পাতলেই শোনা যায়, ঠাণ্ড করলেই বোঝা যায় এর পঙ্খের ডেউ। তখনই ছাপাখানার পঙ্কে ছাপিবে ওঠে:

“তুমি জানো

জানের পুজার ঘরে

অজানের পুজা দেওয়া যায় না কখনো

তাই তুমি গোপনতা করো।”

অথবা সনকা বধন বলে—“তুমি আমি / তুমি জানী / কিছু বলে এ পুজুহীনারে / মহাজান / কী করো হারালে তার / কিছু যুক্তি দিবে নাক”—তখন এ বারণ করলেও সে-বারেই এর স্বর-স্বর কান পাতবে না—এ ডেউ তুলতে চাইবে কবিতারই তুল্য। তা হলেও গভীর এ মুদ্রণ-বিস্তারের দরকার ছিল। পরলা কারণ, চম্পক নগরীয় কক্ষতা, অটপাকানো কচতা আর চন্দ্রবরের সমুদ্রের সাথ—এই জল স্থল, এই গভপভ এখানে একে অল্পকে জড়িয়ে রয়েছে। দোঁসরা কারণ—শঙ্কুবাবু খুব ভালোই জানেন যে, বর্তমান লেখক যে চালে “তুমি জানো”...অংশটি তুলেছেন ঐভাবে গৈরিশ ঢঙে আউয়ে গেলে সব মাটি। এমন কি, রাবীন্দ্রিক ঢঙেও এ অচল। এ বলতে হবে কেমন ভাবে তা শঙ্কুবাবু অসং বাঙলাবেন—তবে একথা ঠিক, তাতে কথা শ্রোত বাদ যাবে না। যেমন যাবে না বিজ্ঞনবাবুর ‘ইঁসখালির ইঁস’ নাটকে কথাস্রোতে কাব্যের ডেউকে চাপা দেওয়া। আরো দেখা যায় শঙ্কুবাবু এ-পালার সংলাপে যে-বিশেষ স্বাদ এনেছেন তাতে ভাষাভঙ্গির আকস্মিকতা প্রাধান ব্যাপার নয়। আকস্মিক লক্ষণ অপেক্ষা তাঁর ব্যবহৃত লোকপুবাণের

আবহাওয়ার তাগিদে দরকার ছিল ভাবার মধ্যযুগীয় লক্ষণটি ফুটিয়ে তোলা। সেটাই তিনি করেছেন অসমাপিকা ক্রিয়ার পুরনো চাল বজায় রেখে। শুধু ক্রিয়াপদের পুরনো চাল বজায় রেখেই যে তিনি মধ্যযুগীয় পরিবেশের নাট্য বাস্তবতা রক্ষা করেছেন তা নয়—বাক্যের অর্থ, শাস্ত্রিক উপাদানেও তিনি বধাসম্ভব 'মনসামল'—এর চরিত্রের মধ্যযুগ রক্ষা করেছেন। ক্রিয়াপদগুলি অবশ্য সময়ের, প্রতিনিবিশ্ব করে সব থেকে বেশি। বিজ্ঞান ভট্টাচার্যের 'জীবন কহা'তেও শুনেছি, শঙ্কু মিঞ্জের চাঁদ বেনের পালায় দেখলাম এর জোরাল ব্যক্তনামের ব্যবহার মধ্যযুগে পিতৃ 'বস' ধাতুর সাহায্যে বৌগিক ক্রিয়ার নানা প্রয়োগ বাংলায় চালু ছিল। 'ভালবাসি' 'মন্দবাসি' জুইই হতে পারত। এ পালায় শঙ্কুবাবু 'বিশ্বাস বাসি' ক্রিয়াটি স্মৃতির ব্যবহার করেছেন। আর 'বিশ্বাস' এবং বিশ্বাসের সঠিক বধন তাঁর নায়কের একটি প্রধান ব্যাপার—তখন ঐ বৌগিক ক্রিয়াটি এক নতুন তাৎপর্য পায়।

কিন্তু এতো গেল এই পালায় সংলাপ-ভাবার সারকেন্দ্র-স্ট্রীকচারের বৎসামাত্র নমুনা। এ স্ট্রীকচারের কথা কখনোই পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না এর গভীরের গঠনের কথা বলছি। সেখানে কিন্তু একটা বিদ্যুত আততি। এবং সেটার মূলে রয়েছে পালাকারের বেশকাল পাঞ্জা বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান। কথাটা হল, মৌলিকতায় অল্প চেষ্টা আরেকটা সখের নাট্যরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে মাঝ—বহি না এর উৎসে থাকে কোনো অনিবার্য তাগিদ। ষ্ট্রিক এই কারণের অভাবেই হয়ে যেতে পারে পশ্চিমের জানালা খোলা একটা বাতায়ন-বিলাস। জুটোকৈই আসতে হবে জীবনকে সরেজমিনে বুঝে নেবার, জেনে নেবার বাসনা থেকে। মৌলিক নাটক লেখার ব্যাপারে বিজ্ঞান ভট্টাচার্যের অনলস প্রচেষ্টার ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য। 'দেবীপর্জন' বা 'হাসখালির হাস' মৌলিকত্বের খাতিরে মৌলিক নয়। যানে আর কী, এ ছুটি নাটকে মৌলিকতা একটা ক্যান্ডিন নয়—অবশ্য ও স্বকালের যন্ত্রণার রূপক গড়ে তুলতে গিয়ে লেখক বুঝেছেন—যুগে কিরে এই মাটিতে ঘর তুলতে হবে। মালমশলাও এখানকার, ঘর বসত সাজাতেও হবে। এখানকার উপাধানে। আসল কথা জীবনের রূপকের খোঁজে শুধু নয়, জীবনের রূপ-রূপান্তরের সংকল্পের কথা বুঝে নিতে গিয়েই এ নাটক লেখা হয়েছে। শঙ্কু মিঞ্জের পালা এই ব্যাঘাতে এমন একটা সংবোধন বা আঘাতের অবাক করে দেয়। নাটকে লোকায়িত বিশ্বাস ও 'মিশ্র'—এর প্রয়োগে জীবনার্থকে জোরাল আর ধারাল করে তোলার ব্যাপারেও বিজ্ঞান ভট্টাচার্যের ইতিহাস আমাদের মনে থাকে। 'দেবীপর্জন'—এ মহিষাসুর

মর্দিনীর চিত্রাঙ্কন নাটক শেষ হবার সময়ে জুজ দেবীর পূর্ণনের এক বাস্তব
মূর্তিকল্প রচনা করে। এর থেকেও শক্তিশালী নাটক 'হাঁসখালির হাঁস'-এ
লোকায়ত বিশ্বাসের ব্যবহার আরো বেশি নাট্যসম্মত। জুজদেবীতেই হাঁস
হচ্ছে যে, ভূমিকাম্পের লোকায়ত বিশ্বাসকে লেখক হালের ডামাডোলের পট
পরিবেশ কাহিনীর ভিতর দিয়ে আরেকটা ত্বরে নিয়ে গিয়েছেন। শজুবাবু
কথাটি এই অর্থাৎই আসে বটে, তবু তাঁর কথা একটু আলাদা। তাঁর বেনের
পালায় দেখি, লোক পুরাণের দয়্যাট গুলে তিনি একেবারে তার ভিতরেই
চুকে পড়েছেন। আজকের জুজ বেদনা সংশয় উদ্ভ্রান্তি এবং সংকল্প ছাড়া হয়ে
তারই পিছু পিছু গিয়ে হাজির হয়েছে। অস্ত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাঁরা
তাঁদের সামনের ও চারপাশের উচ্চারিত সঙ্কট ও লড়াইয়ের ভিতরে চুকেছেন,
পুরাণটা আসছে তার পিছু পিছু। শেষোক্ত ক্ষেত্রে জোদের লাল আভাটা
একটু বেশি ঘোরালো। 'চাঁদ বণিকের পালা'র রঙটা নীল। চাঁদের অহুসকে
সেটা হয়ে ওঠে সমুদ্রনীলিমা। বেদনা, ব্যর্থতা, সংকল্প ও জুসাহস মিলিয়ে
তৈরি হয়েছে সেই রঙ।

পুরাণের প্রক্স-প্রতিমা যুগ যুগ ধরে নানা অজ্ঞে, নানা চরিত্রের মারকৎ
আমাদের জানাচ্ছে হুটো কথা—নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মাহুষ
আপন অসহায়তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবেই। চরিত্রও তাই দিয়েছে।
এবং, শজু মিজের পালায় এটা পেয়েছে একটা যুগায়ত তাৎপর্য। অভিনে
'মিথ' সত্ত্বে বলতে গিয়ে ইয়েটস-এর কথা পেড়েছেন—টিকই বলেছেন,
মিথ'-এর দৌলতেই ইয়েটস ব্যক্তিগত তীব্র অভিজ্ঞতাকে সর্বজনীন-
রূপান্তরিত করেছেন, এবং রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ঘটনা বিষয়ক গভীর বোধকে
ব্যক্তিগত করে তুলেছেন। এ-কাজ সহজসাধ্য নয়। শজুবাবু চাঁদ বণিকের
পালায় সে কাজ পেয়েছেন—একথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই।
তিনি এক 'মহতী স্মৃতি'কে ব্যবহার করেছেন।

'মনসাহসল'-এর প্রক্স-প্রতিমা ব্যবহার করে হালের অটল তালি গুলে
ফেলার চেষ্টা আরো কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু সময়ের তালি গুলতে হলে
তালি আর চাবির যে-সম্বন্ধ জান দয়কার, চাঁদ বেনের পালায় রচিত্যতার
বিষয়বোধের কারণে তা আরেকটা রাজ্য শেল। বলতে কী, চাঁদ
বণিকের পালা'র পালাকায় সময়ের রূপক খুঁজেছেন একথা যেমন সত্য, তিনি
নিজের চতুর্দিকের অভিজ্ঞতা থেকে সকলের জন্য একটা 'পার্সোনাল মিথ'
খুঁজেছেন এটাও তেমনি সত্য। এই উদ্ভ্রান্ত বর্তমানে, যখন জুল বোঝা-

বুঝির ঘোলাটে পথলে প্রকৃত অবস্থা পথ হারিয়ে মরে, অথচ আদর্শের লড়াই, শিল্পের লড়াই, সহস্র প্রলোভনেও আপোষ প্রস্তুত নয়—তখন খোপাধারিত সত্যের অতিজ্ঞানকে বাঁচিয়ে রাখার সত্যত প্রয়াস নানা বিশ্বব্ধের

- মধ্যেও রূপক খুঁজে পাব চাঁদ বেনের মধ্যে—“জানেরও পূজা করো—ফির আবার অজ্ঞানে ডুবে না”—এই পাটোয়ারী প্রবন্ধনাকে যে স্থপা করে। অথচ সনকা ধরিয়ে দেয় অসঙ্গতি চাঁদেরও কম নয়।

পালার প্রথম পর্বে চাঁদের বেপরোয়া সংকল্পের ছবি ফুটে ওঠে তার সমুদ্র বাজার ভিতর দিয়ে। “চরতর বাধা”-র পাহাড় তার চারদিকে। কিন্তু এই সমুদ্রাভিমান মূলত জ্ঞান এবং সত্যের অস্ত্র লড়াই। উন্মোচনের ঘোরালো সময়ে চাঁদ দেখে, শিক্ষাপ্রসূ প্রতিকূল। দেখে সহস্রাব্দীদের মধ্যে বিজ্ঞোহ। ঘরে সনকা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অস্ত্র মনসার—এ পালার ভাবার “মজ্ঞানের”—পূজা করে। চাঁদের উপাস্ত শিব—এ পালার সে জ্ঞান আর সত্যের নামান্তর। চাঁদের বাজা পও করার অস্ত্র শাসক শক্তি তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু চাঁদ কোনো বাধা মানল না। চলিছু বৌবনই বলুন, আর তরুণ বিপ্লবী শক্তিই বলুন, এগিয়ে চলার স্ব-আবেগ তার রক্তে—তার গর্জন শোনা গেল চাঁদের কণ্ঠে—“কলার ভেতর বাঁধ, তারি পরে ছয়পুড়ে খুস। না, আমি নিজে বায়্য বস্ব করো খোব, তারে পর গাজুড়ের জলে তাদের ভাসায়্য দিব। তারেপর ? মহাদেব, তুমি জানো তারেপর—। চলো, চলো, পাড়ি দিতে হবে।” পিছনে পুজুদের শব, ভিন্ন প্রোতে ভেসে গেল কত কমরেড ! ডুবে গেল কতই বা !

পরের পর্বে বেশি ব্যর্থ নিঃসঙ্গ চাঁদ ফিরে এল। ইতিমধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছে লবিন্দর। শুরু হল আরেক পরীক্ষা। বার্ষিক্য তাকে গ্রাস করতে আসছে, সকলে কৈফিয়ৎ দাবি করে। “যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব।” এদিকে প্রলোভন পিছু নেয়। লবিন্দর তাকে দিল নতুন জোয়ার। সে সাগরে পাড়ি দেবে। নতুন উন্মোচন শুরু হল। তৃতীয় পর্বে সত্য প্রতিষ্ঠায় বারা বাধা দেবে তারা সে উন্মোচকে সাবোডেজ করে। এই সাবোডেজের কলেই লবিন্দর বাসর ঘরে সর্পাঘাতে প্রাণ হারায়। উপাধাত্তর বিহীন বেহুলা মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে লবিন্দরকে বাঁচিয়ে তোলে। চাঁদকেও বলে, সে বেন আদর্শ বিসর্জন দেয়, মনসার পূজো করে। লবিন্দর আত্মহত্যা করে—সঙ্গে নেয় বেহুলাকে। লবিন্দরের এই মৃত্যুবরণ চাঁদকে মুক্তি দেয় ঐতিহাসিক ভাইমেনশনে। সর্বৈব রিক্ততার মধ্যে অপরাধের

সংকল্পের আশ্রয় জলতে থাকে—আবাত, শোকে বিপর্যয় চাঁদের কণিকের
 ছর্ব্বলতায় মনসার পূজো দেওয়া হয়ে গেলেও সকল পিতৃটান-ছোঁড়া চাঁদ
 আবার শিবময় তুলে নেয়—“দাঁড়গুলো হাতে তুলে নে রে, পুনরায় পাড়ি
 দিতে হবে”—সব নোঙর না কাটলে বুঝি পাড়ি দেওয়া যায় না।

এ নাটকে রচয়িতার শিল্পদৃষ্টির স্থিরতার কারণে রূপ আর রূপকের পায়ে
 ঠোকাঠুকি লাগে নি। রূপকার্য উপচে পড়ে রূপকে মাটি করে নি।
 শব্দবাবু দর্পণটাকে ধীর হাতে ধরে রাখতে পারলেন বলে গত পাঁচ দশকের
 কত কিছুই আঁকাবাঁকা ছায়া পড়েছে এতে। অস্ত্রদের থেকে এখানে
 তাঁর পার্থক্য যে, তিনি ঠিকই বোঝেন, দর্পণ কাঁপতে থাকলে ছবিও হয়ে
 যায় অবাস্তব। আমাদের মত পাঁচ দশকের বড় অমে ওঠা ভাঙা-স্বপ্নের
 জুগ, বড় ব্যস্তিত ভাবমূর্তির কাল্য এবং হান্তকরতা এই পালায় মহাকাব্যিক
 নাটকের ক্রমকে স্তব্ধ না-করে হাজির হয়েছে। চাঁদের মতোই কতজন
 দেখেছে মাননীয় আচার্য বাণিজ্যিক সাকল্য-স্বপ্নায়র পথগুলো আদর্শকে “খুঁইয়া
 ফেলায়”। আমরা কি বেগীনন্দনের মতোই কারো পলায় হালে শুনি নি-
 “কোচালের আধিপত্য দিয়া, নির্বিচারে কারারুদ্ধ কর্যা, নির্বিচারে হত্যা
 কর্যা, তবে পুনরায় সমাজে শৃংখলাবোধ কিরে আনা যায়। তাই আজ
 আমি অসী, আর তুমি পরাজিত”।? বিপ্লবের তত্ত্ব প্রসঙ্গে আমাদের
 অভিজ্ঞতাতে এমনটাই হয়েছে যে, অন্ধ কবে তত্ত্ব খুঁজতে গিয়ে দেখেছি
 তত্ত্ব আশ্রয় মিলছে না, কেননা, অন্ধ ভুল। আবার তত্ত্বের লঠন ধরে
 জীবনের সত্যে পৌছতে গিয়ে দেখি জীবন তত্ত্বকে ছেড়ে এগিয়ে গেছে।
 চাঁদের বুককাটা স্বীকারোক্তিতে তারই প্রতিধ্বনি—“জীবনের থিক্যা অন্ধ
 কত্যা কত্যা শিবাইয়ে পৌছাতে চাই, সেধা শিবাই মেলে না। আর শিবাইয়ের
 থিক্যা অন্ধ কত্যা কত্যা জীবনে পৌছাতে চাই, দেখি জীবন মেলে না।”

অন্ধকার বুক এক একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে। কখনোই তাদের বিচ্ছিন্ন
 মনে হয় না। চাঁদ ও বরষা আচার্য, চাঁদ এবং সনকা, চাঁদ ও বেগী নন্দন,
 চাঁদ ও লখিম্বর, বহুতল এই ইমারত, কিছু মূল এবং শাখা প্রশাখা এক
 প্রাণীনতায় গাঁথা। গ্রীক নাটকের সম্বন্ধ-সম্পাত, রবীন্দ্র নাটকের চিত্রময়
 কম্পোজিশন—সবই শব্দবাবুর অভিজ্ঞতার সামগ্রী। যদি বলি—এতদিনের
 সেই বিপর্যয় বড় অভিজ্ঞতা সংহত হল, বুঝিবা পরিণতি পেল শিল্পিত
 নিজস্বতায়, তা হলে ভুল হবে না। লোকপূরণটা বড় কথা নয়, বড় কথা
 হল সময় এবং সময়ের অতিথিকে গৌরবদানের অদম্য অভিজ্ঞতার একটা

বস্তুনিষ্ঠ বহিরাধার পড়ে তোলা। চাঁদ বেনে তাঁকে সে স্বযোগ দিয়েছে। সাময়িক সাক্ষ্য এবং ব্যর্থতার থেকে বড় কথা হল “বেয়ে চলা”। চাঁদ এই সময়ের মুখপাত্রদের মুখচ্ছবি। তার অভ্যন্তরীণ সমুদ্র মাহুকের “মহতী স্থিতি”তে দ্রুত জ্ঞানের বিপদসঙ্কুল দিগন্ত। চাঁদও এক “মহানদী প্রতিটি মুহূর্ত তার বার বার সমুদ্রের নিত্য অভিযান।” বিয়েটারের কথা বলছি না—রবীন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্র-নিরপেক্ষ ভাবে, শুধু পড়ে আনন্দ পাওয়া যায়, এমন নাটকের সংখ্যা ক-টি?—যে কয়টিই হোক, ‘চাঁদ বণিকের পালা’ তাদের অজুলি গণনীর আলিকায় সবার আগে থাকবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

শঙ্কুবাবু চাঁদ হবেন তো ?

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবারও বিদ্যালোগের শিরচ্ছেদ

গত ৮ জুন কলকাতায় গোলদীঘিতে আবারও একটি উদ্যোগ বুদ্ধিহীন কাজ সংঘটিত হল। ঐদিন প্রাতঃসম্রণকারীরা দেখতে পেলেন যে প্রাতঃসম্রণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালোগের পাথরের মূর্তির মস্তকটি খণ্ডিত। কে বা কারা প্রস্তর মূর্তির শিরচ্ছেদ ঘটিয়ে পাথরের বেদীতে নানা ধরনের শ্লোগান সের্টে দিয়ে চলে গেছে। খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না। পুলিশ এসে দীঘির জল থেকে ডাকা মাথাটিকে উদ্ধার কবল। জমা করল ধানায়।

বিদ্যালোগের মশাই-এর এই একই মূর্তির উপরে 'গঙ্গার ঘরকেই' ছবার আক্রমণ ঘটল। গত ১৯৭১-এর ২৭ ডিসেম্বর একই কার্যদার রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এই কে বা কারাই মূর্তির শিরটি কেটে মৃণু কাটার অভিযানের উদ্যোগ ঘটবেছিল। আশ্চর্য হলও সত্যি যে সেবার এঁটে দেওয়া পোস্টারের শ্লোগানের ভাষা এবং এবারকার ভাষা অনেকাংশেই সদৃশ। সেদিন মনোবীর ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এবারের মতো ব্যাপক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা সে প্রতিবাদের ভাষা। এমনকি বিদ্যালোগের খণ্ডিত মস্তকটিও অবহেলায় অনাদরের পাকে মুখ খুঁড়ে পড়েছিল। যদি না পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি সেটি উদ্ধার করে দীর্ঘ তিনমাস নিজেদের অফিস ঘরে রেখে দিতেন, যদি না তিন মাস বাধে কর্মীদের রক্ত বেচা চাকর্য তাকে পুনঃস্থাপিত না করতেন তবে এই যে পাথরের মূর্তি চিরদিনই কবচ থাকত কিনা তাও বলা যায় না।

এবার কিন্তু এই ঘটনার দুঃখ-জনক দিকটি সকল দলের, সকল তরয়ের মানুষের মনেই আঘাত হেনেছে। আন্তরিক ক্ষোভে নির্ধিৰ বিক্ষার আনিয়েছেন সকলে। বিভিন্ন সংস্থা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ, কাটুনিস্টের কলম সবাই এই আঘাতকে নিজের সঙ্গে টেনে নিয়েছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিবাচক ধারার পরিমার উপর যে আঘাত তা বথার্থই প্রতিফলিত হয়েছে। ছাত্রপরিষদের ছেলেরা প্রতিবাদে মূর্তির পায়ের তলায় অবস্থান করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির ডাকে ঐ স্থানেই হয়েছে প্রতিবাদ সভা : এই দৃশ্য আক্রমণের প্রতিবাদ করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও রাজনৈতিক কর্মীরা।

আর একটি সভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীও নিন্দা করেছেন এ কাজের। আনন্দের কথা এবার রাজ্য সরকার বথাবোগ্য তৎপরতার মূর্তি সংস্থার করে পনের দিনের মধ্যেই সংস্কৃত মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন। এই উপলক্ষে অল্পাধিক এক সভায়ও রাজ্য মন্ত্রীরা এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা এই কুর্কর্মের নিন্দা করেন।

বিদ্যাগঙ্গারের মূর্তি ভাঙার এই চক্রান্তি নিছক বালহুলভ চাপলের বিবর নয়। এ দেশে গত এক দশকে যে অদ্ভুত অন্ধত্ব তত্ত্বের শোষাক পরে দেশীয় ঐতিহ্যকে আঘাত হানার নৈরাশ্রবাদী উৎকল্লনার জন্ম দিয়েছে তারই বারবার প্রতিফলন এই আক্রমণ। সেই কবছ রাজনীতি বিষয়ে বিশদ আলোচনার স্থান এ নয়, তবু একটি কথা মনে রাখতেই হবে যে নৈরাশ্র্য অতি ও প্রতি এই দুই উপলগ্ন বাহী ‘বিপ্লবেরই পোষক। কে যে কখন কার মুণ্ডচ্ছেদের হাতিয়ার যোগাড় করে বোঝাই ধার না। আর বিদ্যাগঙ্গার মশাইয়ের জীবন, মনন ও কর্ম উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙালী সমাজ জীবনের প্রেক্ষিতে যে কী অপরিণীত স্কন্ধবাহী তা ধারা না বোঝেন তাঁরা ইতিহাস বোঝেন না, বিজ্ঞানসিদ্ধ বিশ্লেষণ জানেন না, বুদ্ধি যুক্তিকে নির্বাসন দেন। এই অন্ধ তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বদ্বারা চক্রান্তির বিরুদ্ধে আমরাও বিক্ষার আনাই। আর এদেশের জনগণের অগ্রগমনে শতাব্দী সকাবি যে ধারা নানা বাত প্রতিবাত্তে ভবিষ্যৎ স্বপ্নপ্রস্থ দিনের দিকে এগিয়ে চলেছে সেই ধারার ইতিহাস ও অস্তিত্বকে নৈরাশ্র্যের ঘোলা জলে নিমজ্জনের সকল প্রয়াসেরই নিন্দা করি।

রবীন্দ্র রচনাবলি : নতুন সংস্করণ

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার রবীন্দ্ররচনাবলি নতুন করে ছাপাঘেন—এ-রকম একটি খবর আমাদের সকলেরই ত ভাল লাগে। সেই প্রায় বছর পনের আগে রবীন্দ্রশতবর্ষের সংস্করণটি বাঙালি—মধ্যবিত্তের পারিবারিক উপকরণ হয়ে উঠেছে। এই সময়ের ফাঁকে আরো কত নতুন পরিবার তৈরি, পাঠক ত বটেই। পরে জন্মাবার মূল্য হিশেবেই তাদের পারিবারিক গড়ন রয়ে যায় অসম্পূর্ণ—শুধু এক-সেট রবীন্দ্র রচনাবলি-র অভাবে। রবীন্দ্র রচনাবলি পাওয়ার সুযোগ দেয়া যেন তাঁদের বাঙালি মধ্যবিত্তের সমাজে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিরই প্রতীক হবে উঠবে।

এবারও নিশ্চয়ই কিস্তিতে কেনবার সুবিধে থাকবে। ছাপার সংখ্যাও নিশ্চয়ই এত বেশি হবে এখনকার ক্রেতাদের দিতেই ফুরবে না, আগামী পাঁচ-সাত বছরের নতুন পাঠকরাও এই সুবিধে পেয়ে যেতে পারবেন। এমন-কি কোনো সরকারের পক্ষেও ত বছর-বছর রবীন্দ্র রচনাবলি ছাপা হয়ে ওঠে না।

শুধুই পড়বার সরকার ছাড়াও, রচনাবলির সরকারি সংস্করণ লেখক-গবেষকদের কাজে লেগেছে। গত বছর পনের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে-বইগুলি বেরিয়েছে তাদের বেশির ভাগে এই সংস্করণেরই পাঠ। হাতের কাছে মজুত থাকার এই সুবিধে। ফলে আলোচনা-গ্রন্থের সংখ্যাও বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যত বেশি বই বেরায় তাঁকে তত বেশি করে পড়া হয়ে যায়। খুব হিশেবপত্র না করেও এ-মন্তব্য সম্পূর্ণই নিরাপদ যে রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পূর্তি ও এই সংস্করণ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখার আত্মপাতিক পরিমাণ, তার আগের একশ বছরের তুলনাতেও বেশি।

সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সামাজিক মাহুবেক মন-মজি মেজাজ-পছন্দের খই পাওয়ার চেষ্টার চাইতে অনেক-কণ বেশি কার্যকর ত এই একটি উপায়—আমাদের শিল্পসাহিত্যের সমৃদ্ধিতে নতুন পাঠকের হাতের নাগালের মধ্যে এনে দেয়া, রেখে দেয়া।

কিন্তু রচনাবলি-র এই নতুন সংস্করণের সম্পাদনায় আমরা কয়েকটি পরামর্শ দিতে চাই।

১. গত কয়েক বছরে রবীন্দ্রনাথের একাধিক বই-এর পাঠান্তর সম্বন্ধিত-সংস্করণ ‘বিশ্ভারতী’ প্রকাশ করেছেন। রচনাবলিতে সেই সংস্করণকেই সম্পূর্ণত নেয়া উচিত—শুধুমাত্র প্রচলিত পরিণত সংস্করণ নয়।

২. রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র', 'বিষভারতী'-ও 'রচনাবলি'-র অন্তর্গত করেন না। সরকার করুন।

৩. রবীন্দ্রনাথের মৌলিক ইংরেজি রচনাগুলি (ইংরেজিতে চিঠিপত্র-সহ) রচনাবলিরই অংশ। 'বিষভারতী' সেগুলো কেন 'রচনাবলি' থেকে বাইরে রাখেন জানি না। 'চিঠিপত্র'-এর যতগুলি খণ্ড বেহিয়েছে, সেগুলো সরকারি রচনাবলিতেও আত্মক।

৪. রবীন্দ্রনাথের বইগুলির নতুন-নতুন সংস্করণের 'গ্রন্থ-পরিচয়'-এ অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো ছাড়াও, আরো অনেক লেখক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য খুঁজে বের করেছেন। কিছু-কিছু কণিক এখানে আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য একত্রিত হওয়া উচিত—সম্মানকারী বধাবোধ্য স্বীকৃতি-সহ। রবীন্দ্র রচনাবলি-র নতুন সংস্করণ ত এমন একটি তথ্যপঞ্জি-সংগঠনের খুবই বোধ্য উপলক্ষ্য। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীকিশোর রায়—এঁদের সমবেত অভিজ্ঞতা ও নূতনতর গবেষণার আহরণকে একত্রিত করার এ-সুযোগ ও দিনেদিনেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের বোধ্য বিনয় ও তৎপরতায় হয়ত 'রবীন্দ্র তথ্যপঞ্জী' সংগঠিত হতে পারে।

৫. বিশেষত 'ভারতী'-তে ও তা-ছাড়াও তাঁর বাল্য-যৌবনের অনেক পত্র-পত্রিকার রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরহীন কিছু রচনা আছে। কোনগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা তা নিশ্চিত প্রমাণিত না-হলেও, কিছু রচনা সম্পর্কে প্রায়-নিশ্চিত অসম্মান করা যায়। সে-গুলোকে রচনাবলির একটি বিশেষ অংশে সংকলিত করে রাখা ভালো। নইলে, এই পত্র-পত্রিকার কোনো কপি হয়ত ভবিষ্যতে আর পাওয়া যাবে না।

দেবেশ রায়

হ্যালহেড-এর ব্যাকরণের দুশো বছর

একটি ব্যাকরণের বইয়ের দুশো বছর পূর্তি উপলক্ষে এতো বৈ চৈ এতো উদ্বেজনা যে কোনো ভাষাতেই বিরল ঘটনা। তার ওপর বাঙলা হ্যালহেড-এর মাতৃভাষা ছিলো না এবং ব্যাকরণটি বাঙলাভাষীদের অন্তর্গত লেখা হয় নি। প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ রচনার কৃতিত্বও হ্যালহেড-এর প্রাপ্য নয়। তাছাড়া

আমাদের আধুনিক বাঙলা ব্যাকরণগুলির সঙ্গে হালহেড-এর যোগও অদূর। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে সঙ্গত কারণেই মনে করেন যে ব্রিটিশ-ভারত সাংস্কৃতিক যিনিময়ের একটি স্থায়ী সৌধ হ'লো নাথানিয়েল ব্র্যাণ্ডি হালহেড (১৭২১-১৮৩০ খ্রী) প্রণীত 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। (১৭৭৮)।

ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয়দের ভারতচর্চার ছোটো দিক আছে। প্রথম দিকে তাঁরা প্রাচীন অথবা মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে উৎসাহী ছিলেন। এই সংস্কৃতি চর্চার বাজক এবং শালক উভয় সম্প্রদায়কেই দেখতে পাই। বলা বাহুল্য এঁদের উদ্দেশ্য সব সময়ে নিঃস্বার্থ ছিলো না। দ্বিতীয় পর্যায়ে লক্ষ্য করি তাঁদের মনোযোগ শুধু অতীত নয়, সমকালীন ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞানের গুপ্তরেণু স্তম্ভ হয়েছে। যেমন ধরা যাক, কর্নেল হেনরি ইউল এবং এ. সি. বারনেল সংকলিত 'হবসন-অবসন' (১৮০৬) শব্দসংগ্রহটি—ইংরেজি ভাষার বিকৃত উচ্চারণে যেসব ভারতীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করেছে, তার তালিকা। হবসন-অবসন যে মহররের হাসান-হোসেনের সাহেবি রূপ সেকথা চট করে কোনো ভারতীয়ের মনে হবে না। যেমন আইকম-বাইকম যে মূলত ইংরেজি কথা তা কোনো ইংরেজিভাষীর পক্ষে ভাবা কঠিন। বাই হোক, হালহেড যে সময়ে তাঁর বাঙলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন তখন পারম্পরিক জানাজানি এতো ঘনিষ্ঠ হয়নি। তখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিচয় ছাড়া তার ভাষা-সংস্কৃতি বিষয়ে অধিকাংশ ইউরোপীয়দের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ ছিলো।

হালহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন যে, তাঁর দেশবাসীর অনেকেই বাঙলা ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা পর্যন্ত জানতেন না। তাঁদের ধারণা মুরহের (অর্থাৎ হিন্দুস্থানি) ভাষাই বুরি তামাম ভারতে ব্যবহৃত হ'তো। সেজন্য হালহেডকে তাঁর ব্যাকরণের বইতে এমন অনেক প্রাথমিক বিবরণ দিতে হয়েছে যা কোনো নিরক্ষর বাঙলাভাষীকেও ব'লে দিতে হয় না। যেমন তিনি বলেছেন যে, অনেকে মনে করেন সব প্রাচ্যভাষাতেই অক্ষরগুলি ডান দিক থেকে বাঁয়ে পড়তে হয়, কিন্তু তা নয়। তেমনি তিনি বাঙলা লিপির বৈচিত্র্য, যুক্তাক্ষরের অটলতা বিষয়েও মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে বাঙলা হরকের ভিন্ন ভিন্ন আকারের অল্প দ্বায়ী বিভিন্ন লিপিকরণের হাতের লেখার সম্মিতির অভাব। বাঙলা যুক্তব্যঞ্জনের 'স্টাণ্ডার্ডাইজেশনে'র সমস্যাটি কিন্তু এখনও আছে, তবে লাইনো ছাপার যুগে তার ধরনটা একটু ভিন্ন।

হালহেড-এর ব্যাকরণ বইটি বাঙলা-শিক্ষার্থীর পক্ষে তেঁরাটা উপযোগী নয়, যেতোটা একজন ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে। আমরা সবাই জানি যে কলকাতায়

এশিয়াটিক সোসাইটির (১৭৮৪) গোড়াপত্তনের পর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা একটি সংঘবদ্ধ চেহারা নেয়। কিন্তু তারও আগে যে দুটি বই এই নতুন শাখার সূচনা করে তার একটি হ'লো হ্যালহেড-এর ব্যাকরণ। অন্যটি হ'লো স্তর উইলিয়াম জোনস্ (১৭৪৬-২৩) প্রণীত ফারশি ব্যাকরণ (১৭৭১)। জোনস্-এর সঙ্গে হ্যালহেড-এর প্রথম আলাপ হয় ছাত্রাবস্থায়, অক্সফোর্ডে। বস্তুত জোনস্-ই তাঁকে প্রাচ্যভাষা শিক্ষায় উৎসাহ করেন। জোনস্ যে রকম আরবি-ফারশি ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করেছিলেন, অহরুপভাবে হ্যালহেড সংস্কৃত-বাঙলার যোগসূত্রের কথাও স্পষ্টভাবে বলেন। শুধু তাই নয় আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা যাকে বলেন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী তার অন্ততম আধিক্য যে সংস্কৃত তার ইজিতও হ্যালহেডে পাই। সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে বিশ্বের চেয়ে ভারতের দাবি প্রবলতর হ্যালহেড অহমান করেছিলেন।

বাঙলা ভাষা সংস্কৃত থেকে বিবর্তিত হ'লেও রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণে এর ওপর অন্ত্যস্ত ভাষার প্রভাবও হ্যালহেড-এর দৃষ্টি এড়ায় নি। সেজন্য তিনি ভূমিকায় একথা জানাতে ভোলেন নি যে, 'সুদূর বাঙলা'র ব্যাকরণের মধ্যে সমকালীন বাঙলা বাগ্‌ধারা ও-রীতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। এর ওপর আরবি-ফারশি-পতুগীজের ভাষার প্রভাবও বিস্তর। এই ঐতিহাসিক নিয়মে ইংরেজিও বাঙলাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে এবং পূর্ববর্তী অন্ত্যস্ত ভাষার চেয়ে এ প্রভাব অনেক ব্যাপক।

সেযুগে হ্যালহেড বাঙলা মুহূর্তে তিনশতাব্দের ভাষার প্রচলন দেখেছিলেন : ফারশি, হিন্দুস্থানি আর বাঙলা। বিশেষ বিশেষ কর্মক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ভাষার অধিকতর প্রচলন ছিলো। কিন্তু ফারশি বহল আইন-কাহ্নের ভাষা সবসময়ে সাধারণের কাছে সহজবোধ্য ছিলো কিনা সে-বিষয়ে হ্যালহেড সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, 'জেক্টু অমিদার', চাষী এবং অন্ত্যস্ত বহু ভোগীদের এক তৃতীয়াংশও মুনশিদের অমিজমা এবং হিশেবপত্তর সংক্রান্ত পরিভাষাগুলি বুঝতে পারেন কিনা সন্দেহ। বাই হোক, আঞ্চলিক ভাষা যিণেবে বাঙলার আভ্যন্তরীণ বীকৃতির অন্তও তাঁর মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে।

হ্যালহেড বহু ভাষাবিদ ছিলেন বলে বিভিন্ন ভাষার রূপ ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যগুলির আলোচনা তাঁর ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য। তিনি শুধু সংস্কৃত-বাঙলার তুলনা করেননি, গ্রীক ভাষার সঙ্গেও মিল-অমিল খুঁজেছেন। এবং এই কারণে বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ।

বাঙলা ভাষার রূপটি সূত্রাকারে বিস্তৃত করবার জন্য তিনি প্রচেষ্টা পরিলক্ষ করেছিলেন। বাঙলা লিপির বৈচিত্র্য ও বিবর্তন থেকে শুরু করে বাঙলা ছন্দ সব বিষয়েই তাঁর আগ্রহ। তাঁর সামনে কোনো বাঙলা ব্যাকরণের আদর্শ ছিলো না—নিয়ম রীতিগুলি তিনি সাব্যস্ততো সাজিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য এ-ব্যাপারে তিনিই পথিকৃত। ম্যানোএল-দ্য-আসম্প্লুসেস-এর পত্নীসিদ্ধ ভাষায় লেখা বাঙলা ব্যাকরণ (রচনাকাল ১৭৩৪; প্রকাশ ১৭৪০)-এর সঙ্গে তাঁর পদ্ধতি একেবারে আলাদা এবং বিষয়ের পরিধিও অনেক বিস্তৃত।

হালহেড বাঙলা উচ্চারণেরও নিয়মরীতি খোঁজাব চেয়ে করেছিলেন। যেমন তাঁর মতে, বিশেষ্যাদির বেলার পাশাপাশি দুটো ব্যঞ্জন থাকলে তারা বাঙলায় কন্ডল হ'য়ে যায়, যদিও সংস্কৃতে সেগুলি মুক্তদলই থাকে। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বীর্ষ, জন, তপ্ ইত্যাদি তাঁর ধারণা শেষেরটি যুক্তব্যঞ্জন হ'লেও একই নিয়ম অর্থাৎ দন্ত, পূজ-র উচ্চারণ হবে দন্ত, পূত্ৰ।

হালহেড-এর বাঙলা ব্যাকরণ ইংরেজি ব্যাকরণের আদর্শে রচিত ব'লে অনেক এর বিশেষ মর্যাদা দিতে সক্ষম। কিন্তু খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণ রচনার আদর্শ কী হবে তা নিয়ে বিবাদ-বিতর্ক এখনও চলছে। অত্যাং হালহেড-এর ব্যাকরণে সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি প্রত্যাশা করা অসৌজন্যিক। হুশীলকুমার দে কোতুহলী হ'য়ে প্রশ্ন করেছেন যে হালহেড প্রদত্ত ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকার 'ক' স্থান পেলো কী ক'রে? বস্তুত, বিভাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' (১৮৫৫)-এর আগে পর্যন্ত 'ক' ব্যঞ্জন বর্ণেরই অভুত্ব ছিলো। মৃত্যুঞ্জয় বিভালঙ্কার, রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ তার প্রমাণ। বিভাসাগরের পরেও রবীন্দ্রনাথ 'ক'-কে ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় স্থান দিয়েছেন। অতএব হালহেড-এর ক্ষেত্রে বিদেশীয় প্রমাণ বলা চলে না।

জীবন্ত ভাষা যে সবসময়ে লিখিত ব্যাকরণের পরোয়া ক'রে চলে না—সে-স্বীকৃতিও হালহেডে পাই। হুশীলকুমার দে অবশ্য বলেছেন যে বিদেশী ব'লে তিনি অনেক সময়ে কথ্য এবং লেখ্য ভাষার সীমারেখা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু সেযুগে কথ্য এবং লেখ্য ভাষার রূপ নির্দিষ্ট হয়েছিল কিনা সংশয় আগে। বাই হোক, হালহেড বাঙলা কী রকম বলতেন জানা যায় না। তবে তাঁর প্রাক্তনুজ নাথানিয়েল অন হালহেড (১৭৮৭-১৮৩৮) নাকি বাঙলাভাষা এমন রপ্ত করেছিলেন যে বাজারলে অভিনয় করতেন এবং বাঙালি ব'লে তাঁকে সবাই ভুল করতো।

আমাদের কাছে হালহেড-এর ব্যাকরণের সবচেয়ে প্রসিদ্ধি সম্ভবত প্রথম

মুক্তি বাঙলার নিদর্শনের স্তম্ভ। এ-বিষয়ে বাঙালিদের প্রথম প্রতিক্রিয়া খুব তীব্র না হ'লেও কয়েক বছরের মধ্যেই বিরাট 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' ঘটে গেলো। কিন্তু সে তো অল্প প্রসঙ্গ।

সুবীর রায়চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ নবম যুব উৎসব ও আন্তর্জাতিকতা

চৌঠা জুনে রণজি স্টেডিয়ামের বিশাল ব্লকের পাটা ছ' ক'ক করে, হাজার হাজার তেজি কণ্ঠে মহাশব্দ বাক্য, বায়ুমণ্ডল কেড়েফুড়ে কিপ্রভম-কীলকের মত বিঁধে গেল কলকাতার ঐশ্বর্যবান প্রতিটি বিপ্লবী সন্তান,— 'যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ নিপাত বাক, ক্যাসিত শক্তি শুড়িবে দাও, এবাংল বিশ্ব যুব উৎসব জিম্মাবাদ।' 'তরুণ রক্তে বিজ বিজ করে উঠল এক ফুঁসে-ওঠা আত্মবিশ্বাস, চোখের মণিতে ঠিকরোল আঙুন, চোয়ালের পেশীতে দাগ কেটে বসল সংগ্রামী কঠোরতা, আর চিণা টোটেয় জ্যামিতি জুড়ে হুর্জম সংকল্প। কলকাতা শহীদ মিনারের উঁচু চোখ দিয়ে দেখল হাজার হাজার তরুণ-তরুণী কিরছে শহর গ্রামগঞ্জে অশিক্ষিত দৈনিকের যতো-স্পোর্টাকান উচ্চতায়, রানার ছুটেছে রানার, ঘরে ঘরে পৌঁছে বাবে খবর। এমনি করেই মাঠ ভাঙে কালপুরুষ এবং প্রয়োজনীয় পর্যটন সেরে ঠিক-ঠাক সামনে এসে দাঁড়ায়। শুধু চিনে নিতে হয়। যেমন চিনেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, মালয়, মিশর, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালী চেকোস্লোভাকিয়ার যুব সমাজ উনিশশো সাতচল্লিশ সালে প্রাগ্ শহরে। তাদের অভিজ্ঞতায় ছিল বিত্তীয় বিশ্বযুদ্ধের নরক। এই নরকের আবর্তে প্রাণ হারিয়েছিল ইওরোপ ও এশিয়ার লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতী। মহৎ যুত্ম লক্ষ্যভেদে অমোঘ। তাদের উষ্ণ পাড় লাল রক্তশ্রোতের তোড়ে ক্যাসিত হিটলার এবং জাপানী ক্যাসিবারের পাখের জম্বি ধসে গিয়েছিল চার মাস সময়ের ব্যবধানে, সালটা ছিল উনিশশো পঁয়তাল্লিশ। যুগ খুবড়ে পড়ল ক্যাসিশক্তি। তার পিঠে যুগা আর ক্রোধের শূল বিঁধে গেল, শূলের অস্ত্র প্রান্তে উড়তে লাগল শান্তি ও স্বাধীনতার পতাকা। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হল প্রতিজ্ঞায় অনড়-মন বিশ্ব যুবশক্তি—যার

যুদ্ধ নয়। হঠাৎ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। যুবশক্তির অপচয় ঘোষণা কর।
 যৌবনের বুকভরা স্বপ্ন নীল আকাশ বা সমুদ্রের মত ব্যাপ্ত হোক।
 যুবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মোহ বৃত্তের মতো পূর্ণতা পাক। যুব উৎসবের
 তপ্ত বাতাস ছড়িয়ে দাও পৃথিবীর পরিধি বরাবর। এভাবেই শুরু হল
 বিশ্ব যুব উৎসব।

সোনালী চিল সমুদ্র পাছাড়ে পেরিয়ে উড়ে এলো ভারতের মাটিতে।
 সাতচল্লিশের আগস্টে ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে সবে। দেশজুড়ে
 গৌরবোজ্জ্বল প্রথম। সামনে হাজারো সমস্যা, অসংখ্য কাজকর্মের তাগিদ।
 যুদ্ধে জুতো বহুরের শোষণের ক্রোধ, অবসর জীবনের অনিবার্য ক্লান্তি।
 তা কাটিয়ে উঠে বিপুল কর্মবজ্রে সানিল হবার ডাক। স্বরাজ প্রাপ্তির
 উল্লাস গণমানসে লোফালুফি হয়ে চলেছে, দেশের শির-উপশিরায় তার
 প্রবাহ। দীর্ঘ অন্ধত্বের পর হঠাৎ চক্ষুদান হলে যে বিশ্বয়, সেই বিশ্বয়ের
 ঘোর কার্টেনি তখনো। এমন সময় পাক ধেরে ধেরে নেমে আসে
 সোনালী চিল, তার ডানায় বিশ্ব যুব উৎসবের গন্ধ। তার রক্তাক্ত উজ্জল
 চোখের ভাবার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্লোগান, চোখের মণিতে শান্তি ও
 স্বাধীনতা রক্ষার অনন্ত প্রত্যয়। সালটা উনিশশো একাদশ। বার্লিনে
 তৃতীয় বিশ্বযুব উৎসব হতে চলেছে। তার প্রস্তুতি ছড়িয়ে পড়েছে
 পৃথিবীময়। পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজ নাড়ি স্পন্দনে অহুতব করল বিশ্ব
 নাড়ি স্পন্দনের জলতরঙ্গ। তাই পার্ক সার্কাস ময়দানে যুবউৎসবের পতাকা
 উড়ল। সামান্য আয়োজন, কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষায় হুঁকার, স্বপ্নময়তার
 সমুদ্রগভীর, অকীকারে চূর্নিত হুঁগ। 'রক্ত আংলার মধে মাতাল ভোরে
 ...ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে / অটহাস্তে আকাশখানা ফেড়ে'
 যৌবনের দৃষ্ট মিছিল পথ পরিক্রমা করল, জানিয়ে দিল—'সমগ্র লেগেছে টান',
 তৈরি হচ্ছি, আমরাও ভীষণভাবে তৈরি হচ্ছি, 'ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক
 আজ বসন্ত', 'লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সঁচায়।' তেপান সাল জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের
 অকলে অকলে, মহানগর-মহানগর সংগঠিত হল যুবউৎসব। টুকরো টুকরো
 উদ্ভোগ এবং প্রোডাক্টলো একত্রিত করে চুম্বন গঠিত হল যুবসংঘ।
 পঞ্চায়ত ওয়ারশ শহরে পঞ্চম বিশ্বযুব উৎসব। তার সমর্থনে যুবসংঘ পালন
 করল বিশাল উৎসব। স্থান রণজি স্টেডিয়াম। অস্তিত্বাত রণজি স্টেডিয়ামের
 দখল নিল যুবশক্তি সেই প্রথম। একই দখল কল্যাণ রেখে নবম পশ্চিমবঙ্গ
 যুবউৎসব সম্পন্ন করল পশ্চিমবঙ্গ যুবসংঘ আটাত্তয়ের চৌঠা জুন।

তার শুরু আটাত্তরের মে, সাতাশ। কলকাতার শরীরের মেস টেটে-ছুলে তাকে তরুণী বানানোর বিষয় জোড়জোড় চলেছে ইদানীং, তাই সে যুগ বুজে হয়ে আছে অলস। অবশ্য কলকাতাও সাতাশে 'মে'র অপরাহ্নে রক্তশ্রোতে অহুত্বব করেছিল নাইরোবি প্রাপ্তোত্তেব বিদ্যায়, বাড্ডা উঁচু করে দেখেছিল বোবনের মহামিছিল, গড়ে পেয়েছিল বাকদের জাগ, দীর্ঘকাল পর কলকাতা 'কমোলিনী তিলোত্তমা' হয়ে উঠেছিল অকস্মাৎ। কলকাতা জিজ্ঞেস করেছিল : তোমাদের চিনি চিনি মনে হচ্ছে, তোমরা কারা?—আমরা যুব। আটবট্ট থেকে একাত্তরের যুব?—না, আমরা দীর্ঘকালের অতীত দীর্ঘকালের ভবিষ্যৎ। আমরা সময়ের খুঁটি উপড়ে চলি, তবু ঐতিহ্যের নাড়ি ছিঁড়ে দিই না। আমরা তার সঙ্গে জুড়ে দিই সমরোপযোগী উপকরণ।—মিছিলের সামনে ওরা কারা? মহান সোভিয়েত দেশ, ফিদেল কাস্ত্রো চে গুয়ে ভারার দেশের যুবক-যুবতীরা।—আর ওরা? আদিবাসী তরুণ-তরুণীরা।—কারা গাইছে অমন মন-মাতানো গান? ওরা মায়া সেন, কমা গুহঠাকুরতা, সবিতাত্ত তদন্ত আর তাদের গোপ্তির যুবক-যুবতীরা। তোমরা কোথায় ছিলে এ্যাদিন?—আসব বলে তৈরি হচ্ছিলাম। এত দেবি হল কেন?—কোনো ফুল করতে চাইনে, তাই। খুশি কলকাতা বুক পেতে দিল টান টান। মিছিল চলল। হাজার তিরিশেক যুবক-যুবতীর লাল-নীল-সবুজ মিছিল। দৃষ্ট প্রাণের বাতাস জটিল 'চিতা-ভস্ম' উড়িয়ে দিল। ঝোঁগানে ঝোঁগানে, পানে, উচ্ছল উদ্গারনাথ এগিয়ে চলল মিছিল, খুরল ঝাঁকল সোজা হল, মিছিল ঝাঁপে তরল তুলে সৈন্তবাহিনীর মত মার্চ করতে লাগল, ফ্যানি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শান্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্নের সৈন্তবাহিনী মিছিল হয়ে গেল, মিছিল সৈন্তবাহিনীর শৃঙ্খলায় কেটে পড়ল রণজি স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাসে।

উৎসব নাগাড়ে চলল ন'দিন। ছ'টা মঞ্চে টুকরো টুকরো হয়ে গেল মূল উৎসব। মকমলোর নাম ছিল এরকম : কাজী নজরুল ইসলাম, পঙ্কজকুমার বস্তুক, বিজয় ভট্টাচার্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শবিক ঘটক, এবং চার্লি চ্যাপলিন মক, আর ববি ব্রুডিয়াস স্পোর্টস কর্নার। দিন ন'টা চিহ্নিত হল এই নামে : উষোধনী দিবস, আলেন্দে দিবস, লুম্বা দিবস, ইকবাল দিবস, শ্রমিক দিবস, শিশু দিবস, তরুণী দিবস, গ্রামীণ যুব দিবস, হো-চি-মিন দিবস। অসংখ্য রক্তের অহুতান হল। নাচ, গান, নাটক, মুকান্তিনয়, পুতুল নাচ, ব্যায়াম ও ব্রতচারী, খেলাধুলা, সিনেমা, চিত্রপ্রদর্শনী, আলোচনা, কবি সম্মেলন, ম্যাজিক, আগলিং—কি নেই অহুতানে। খেলাধুলা, নাচ, গানের সবরকম শাণ্ডার

অহুষ্ঠান দেখা বা শোনা গেল যুবউৎসবে। প্রতিষ্ঠিত-খ্যাতি শিল্পী-শেলোরাড় থেকে শুরু করে আনকোরা নতুনরা পর্যন্ত সমান অধিকারে অহুষ্ঠান করলেন। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠার প্রকাশ ঘটে যুবমঞ্চে, আশ্রকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাঁদের অনেকেই একদিন যুব উৎসবের মঞ্চে প্রথম স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। এবারও অনেক নতুন মুখ দেখা গেল, যাদের অনেকেই আগামী দিনে আমাদের পৌরষ হবেন। মন ভরানো অহুষ্ঠান করলেন সোজিরেত দেশের যুব প্রতিিনিবিদল দু'দিন—একদিন কাজী নজরুল ইসলাম মঞ্চে, অশ্বত্থাশ্রিত নেতাজী ইন্ডোর টেডিরামে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাতভর অহুষ্ঠান শ্রোতাদের উপহার দিয়েছিল এক প্রেমিক রাত। অহুষ্ঠান হুটীর বিশালতায় ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি উঠে এসেছিল রণজি টেডিরামে, চারপাঁচ লক্ষ লোক তার বুনাট আবহাওয়ায় অসুরমুখ হুখ পেয়েছে, পর্ববোধ করেছে দেশীয় ঐশ্বর্যের উজ্জলতায়, অবাক হয়ে দেখেছে তার বৈচিত্র্য। সমস্ত অহুষ্ঠান একটা নিরিখে অর্জুন ছিল। কোথাও হুচিবিকার নেই, অপসংস্কৃতির প্রলয় নেই। পরিচ্ছন্ন রুচি পঠন, প্রগতিশীল চৈতন্তের উৎসার, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চিন্তার, তীক্ষ্ণ করা এই জিশূল ভাবনায় গাঁথা ছিল বরাবরের মত এবারকার যুবউৎসবও।

খোলা আকাশের নিচে জমে উঠেছিল কবি সম্মেলন। অংশ নিয়েছিলেন বাংলার প্রবীণ এবং নবীন কবিকুল। সভাপতি ছিলেন অরুণ মিত্র। মনীষ রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, অমিতাভ দাশগুপ্ত, কবিতা সিংহ, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সাত্তাল, সুনীলকুমার নন্দী, চিত্ত ঘোষ, সুজীতনাথ মৈত্র এবং আরো বহু কবি কবিতা পাঠ করে হাজার হাজার কবিতাপ্রিয় শ্রোতাদের অভিভূত করলেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও শিবশঙ্কু পাল এসেছিলেন ঘেরীতে।

এবারকার যুব উৎসবের প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল আলোচনা প্রসঙ্গ। তার জন্মে নির্দিষ্ট ছিল সুনীতিকুমার মঞ্চ। প্রতিদিন চলেছে এই আলোচনা সভা। আলোচনার বিষয়বস্তুগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংকট বা জীবনব্যাপনের সঙ্গে তার গভীর যোগ। আশ্রকের যুবসমাজ সেই আলোচনা শুনে নিজেদের শিক্ষিত করেছেন, বহু সমাধান খুঁজে পেয়েছেন এবং অট খোলায় অনেক সংকেত দেখেছেন। চল্লিশ দশকের গণসংস্কৃতি, আন্দোলন ও তার উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা হল মের আটশ তারিখে। চিম্বোহন সেহানবীশের সভাপতিত্বে আলোচনা সভার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন সুনী প্রধান, হুগেশ দাশগুপ্ত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিম্বোহন সেহানবীশ। সেই আলোচনা কত কিছু স্পষ্ট করে দিল, কত কিছু জানা হল সেদিন।

উনত্রিশ থেকে একত্রিশ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সাতধারার ওপর স্লাইড সহযোগে বক্তৃতা করলেন চিয়োহান শেহানবীশ। জানা গেল কত কি। গ্রুপ থিয়েটারের সংকট নিয়ে, আলোচনা হল। তার থেকে বেরিয়ে এলো সমাধানের পথ। সেই পথে এগোলে হয়ত অনেক কিছুই করা সম্ভব। দোসরা জুন ভারতবর্ষের বর্তমান সংকটের সমাধান কোন পথে এসেছে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করলেন ইম্রজিৎ গুপ্ত, জ্যোতি ভট্টাচার্য, হরিপদ ভারতী, নিত্যানন্দ দে, বিমান মিত্র, আন্তোভ ব্যানার্জি বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। সাম্রাজ্যবাদের নয়া কৌশল, সি. আই. এ. এবং বহুজাতিক সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা হল চৌঠা জুনের রিকলে। এরকম ব্যাপ্ত বিষয়সূচীর আলোচনা যুব উৎসবের প্রাঙ্গণে অস্থিতি হওয়ায়, উৎসবের গান্ধীর্ষ এবং উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক তাৎপর্য পেয়ে গিয়েছিল।

উৎসবের আরেকটি আকর্ষণ ছিল উন্নতমানের চিত্রপ্রদর্শনী। তার আয়োজন হয়েছিল অতুল বোস মণ্ডপে। উৎসবের প্রাচুর্যের মধ্যে হয়ত অনেকেরই নজর ফসকে গেছে সেটা। এই প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন খ্যাতিমান শিল্পী গোপাল ঘোষ। এত বড় চিত্রপ্রদর্শনী ইদানীংকালে দেখা যায়নি। বিখ্যাত শিল্পীদের আলোড়নকারী বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবিগুলি স্থান পেয়েছে এখানে। ষাট প্রদর্শনীর ছবিগুলো সংগ্রহ করেছেন, তাঁরা মেধাবী এবং পরিশ্রমী—সন্দেহ থাকে না। রামকিঙ্কর বেইজ, গোপাল ঘোষ এবং নিখিল বিশ্বাসের বাট, পঞ্চাশ, পঞ্চাশ সংখ্যক ছবি, স্কেচ, গ্রাফিকস, অলরঙ চিত্রপ্রদর্শনীর অসামান্যতা বাড়িয়েছে এবং উল্লিখিত শিল্পীদের সামগ্রিক শিল্পচেতনার পরিচয় তুলে ধরেছে। আগে অনেক শিল্পীদের ছবি দেখা গেল, যেমন—রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, অতুল বোস, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ ভট্টাচার্য, পরিতোষ সেন, জগদীশ রায়, মহু রায়ের, পনেশ হালুই, সোমনাথ হোড়। তাছাড়া প্রায় শতাব্যেক বিখ্যাত বিখ্যাত ছবির প্রিন্ট ছিল। ছবিগুলোর চিত্রকর ছিলেন পিকাসো, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, ত্যান গগ গগা, রেয়ার্স প্রমুখ। এক সঙ্গে এত বড় শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী দেখা ভাগ্যের কথা।

আরেকটি বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা অনিবার্য এখানে। তা হল চলচ্চিত্র প্রদর্শন। চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর অন্তে স্বাধিক বটক ও চার্লি চ্যাপলিনের নামে দুটো মঞ্চ উৎসর্গীকৃত হয়েছিল উৎসব প্রাঙ্গণে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দেশী-বিদেশী ছবি দেখানো হয়েছে এই মঞ্চদ্বিটিতে, আটশ মে থেকে চৌঠা জুন পর্যন্ত। সোভিয়েত দেশ, ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া, আফ্রিকা, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া,

ভিয়েতনাম, জি. জি. আর, হাঙ্গেরী, বেলজিয়াম, ইতালীর নামকরা কাহিনী চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে এখানে। উল্লেখযোগ্য ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী তো হয়েছেই। যুব উৎসবের আয়োজকরা কেবল চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেই থেমে থাকেন নি। তাঁরা বাড়ী চালাচ্ছিলেন সমস্তাবলী বিষয়ক এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন পূর্ণেন্দু পণ্ডী, শরীক বন্দোপাধ্যায়, রামানন্দ সেনগুপ্ত, যুগাক্ষেপের রায় প্রমুখ।

ডুবু বলায় কিছু থেকে গেল। হাভানায় একাদশ বিশ্বযুব উৎসবের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব ঘটে গেল কিছুদিন আগে। তার শেষ কি ওখানেই? একাদশ বিশ্বযুব উৎসবের সঙ্গে সংহতি এবং সৌভ্রাতৃত্ব জানিয়েই কি তার প্রয়োজন জুরিয়ে যায়? নিশ্চিতভাবে নয়। আত্মকের যুব সমাজ দায়িত্বমুক্ত, শোষণহীন, স্বল্পর জীবন গড়ান দায়িত্বে আছেন। মারশাজের ভয়ঙ্কর খেলা এবং মহাযুদ্ধ বাড়ে আর না ঘটে তার সত্যক প্রহরী তাঁরা। শান্তি, স্বাধীনতা এবং স্বয়ং সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখার কমাহীন সৈনিকও তাঁরাই। এসব ঠিকঠাক মনে রাখার মধ্যেই যুব উৎসবের আসল উৎসব।

অমল আচার্য

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে আফগানিস্তান

যে আফগানিস্তানে যুগ যুগান্তর ধরে রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এবার সে আধুনিক গণতন্ত্রের পথে পা বাড়ালো। গত ২৭-এপ্রিল সামরিক বাহিনী, বিশেষভাবে বিমান বাহিনীর আকস্মিক অভ্যুত্থানের ফলে কার্ভলে প্রেসিডেন্টের প্রাণের আক্রান্ত দখলীকৃত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট দায়ুদ, তাঁর স্রাতা ও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় বিদ্রোহী সৈন্যদের হাতে নিহত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নিহত প্রেসিডেন্ট দায়ুদ ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে রাজা জাহির শাহ'র বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহ করে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও জাহির শাহ'কে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যে দেশশ্রেমিক সৈন্যদল ও জনগণের সহযোগিতায় তিনি রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিলেন, তাঁরা কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে প্রেসিডেন্ট দায়ুদ ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিলেন। কেননা,

রাজা বিতাড়িত হলেও কার্যত ব্রজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের দাপট আগের মতই বজায় ছিল। বহিঃ দেশটি কৃষি প্রধান এবং কর্মে নিযুক্ত ৭৬ শতাংশই কৃষি-শ্রীবী, তথাপি দেশটি গরীব, অহরত এবং ভূস্বামীদের আধিপত্যের দ্বারা শোষিত। কেননা, উর্বর কৃষি ভূমির সিংহভাগও ছিল ভূস্বামীদের কবলিত এবং তারাই ছিল দেশের 'মালিক' এবং রাজকীয় প্রকৃষকের সহযোগী। আর জন-গণের ৫০ শতাংশই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতো। প্রেসিডেন্ট দায়ুদও ছিলেন রাজার একান্ত আশ্রয় এবং অতিজাত। স্বতরাং রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়েও তিনি অতিজাততন্ত্র ও ভূস্বামীদের গায়ে কোন হাত দিলেন না। ফলে, ঈদের সাহায্যে তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

আকগানিত্তান কেবল দরিদ্র ও অহরতই নয়, পৌনে দু'কোটি জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ২০ জনই নিরক্ষর। কিন্তু বিংশ শতকের শেষে পাছে পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যে চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছে আকগানিত্তানেও সেই চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। ১৯৬৫ সালে নূরমহম্মদ তারাকির (প্রকাশ যে, তিনি একজন কবি ও সাহিত্যিক) নেতৃত্বে পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে যে নতুন দল আত্মপ্রকাশ করলো, তাঁরা ছিলেন সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট মতাবলম্বী। শীঘ্রই এদের নেতৃত্বে শক্তিশালী ট্রেন্ড ইউনিয়ন আন্দোলন গঠিত হোল এবং আকগানিত্তানের নতুন বুদ্ধিজীবীরা এই পার্টির পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। হঠাৎ আধুনিক গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধ্যান ধারণা প্রচারিত হতে লাগলো এবং কিছু কিছু আন্দোলনও সংগঠিত হলো। ফলে, প্রেসিডেন্ট দায়ুদ ও তাঁর সহকর্মীরা বিপদে পড়লেন এবং পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র ধমনী নীতি শুরু করলেন। গত ১৬ই এপ্রিল প্রবীণ ও জনপ্রিয় ট্রেন্ড ইউনিয়ন নেতা ওস্তাদ মির সকেজর খাইবার শাসকবর্গের হাতে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন। পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির কয়েকজন নেতাকেও গ্রেপ্তার করা হলো এবং কাবুলের এক পার্কে তাঁরা এই সমস্ত অনাচারিক ঘটনার প্রতিবাদ সভায় জমায়েত হয়েছিলেন। তাঁদের উপরেও গুলী চালাবার হুকুম জারি হোল। এর ফলেই সৈন্তবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ কেপে গেল এবং বন্ধুকের নল রাজপ্রাসাদের নাকে ঘুরিয়ে দিল। ফলে, প্রেসিডেন্ট দায়ুদ ও তাঁর সহকর্মীরা ধৃত হলেন এবং আকগানিত্তানে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘোষিত হল।

বহিঃ 'বিত্রোহী' সৈন্তদলের একাংশ রাশিয়াতে হেঁনিংপ্রাপ্ত ছিল, তবু

সোভিয়েতের কোন উদ্ধানি বা প্ররোচনা এর পিছনে ছিল না। পিপলস্-ডেমোক্রাটিক পার্টি তারদ্বারা সাম্রাজ্যবাদীদের এই সমস্ত নানা মিথ্যা রটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা আরোও ঘোষণা করেছেন যে, সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের পর বর্তমান আকগানিত্তানে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হওয়া হবে। সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কোনো প্রসঙ্গ এখন নেই। কেননা, দেশ ও সমাজ এখনও তার উপযোগী নয়। তাঁরা মরেও ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা ইসলামের ভক্ত এবং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মর্যাদা তাঁরা রক্ষা করবেন। মরে জনসাধারণের সামাজিক ও সর্ব-নৈতিক উন্নতির এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের ব্যবস্থা তাঁরা করবেন।

সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারত কাবুলের এই নতুন গণতান্ত্রিক সরকারকে সর্বাঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বন্ধুতার বাণী পাঠিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইরান, সৌদি আরব এবং পাকিস্তানে গোড়ার দিকে সোভিয়েত কমিউনিজমের কল্পিত আতঙ্কে এই নতুন সরকারকে মেনে নিতে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু এক্ষেপে প্রেসিডেন্ট তারাকির নতুন সরকার ছোট বড় অনেক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তবে এই সরকারের বিপদ এখনও কাটেনি। কেননা, আকগানিত্তানে বিদেশী এবং ট্রাইকাথের চক্রান্ত থেকে মুক্ত নয়।

চীন-ভিয়েতনাম-কাম্বোডিয়া *

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের ঐতিহাসিক বিপ্লবী যুদ্ধের সময় এ দেশের চীনা ভক্তেরা ক্রমাগত প্রচার করেছিলেন যে, চীন হচ্ছে ভিয়েতনামের প্রকৃত বন্ধু এবং এই বন্ধুকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চীন চু'হাতে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছেন। অপর পক্ষে 'পোপনবাদী' সোভিয়েত রাশিয়া সেই তুলনায় তেমন কোনো সাহায্য দিচ্ছে না। আজ কিন্তু বিপরীত ও ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনামের দিকে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে 'মিঞ' চীন সম্পূর্ণ বিগড়ে গেছে, সেই বিপ্লবী যুদ্ধের এবং তার পরবর্তীকালের চীনা সাহায্য ভিয়েতনাম থেকে কপূরের মত উবে গেছে। অধিকন্তু চীন ভিয়েতনামের বোরতর বিরোধী হয়ে উঠেছে—যদিও সোভিয়েত রাশিয়া আগের মতই মিঞ ও সাতাষাকারীর ভূমিকাতে অটল থাকে। চীনের ভিয়েতনাম বিরোধিতা

এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভিয়েতনামকে সমস্ত সাহায্যদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ক্যাকিন, নানকিং ও কুনমিং এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে ভিয়েতনামের যে তিনটি কনজুলেট ফ্রান্সের অধিন ছিল, ১২শে জুনের (১৯৭০) এক হুকুমনামার দ্বারা সেগুলি গুলিয়ে নিতে বলা হয়েছে। ভিয়েতনামের পররাষ্ট্র দপ্তর দক্ষিণ চীন থেকে তাঁদের এই দূতাবাসগুলি তুলে দেওয়ার নির্দেশের বিরুদ্ধে পিকিংয়ের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আসলে চীনের এই হুকুমনামার কারণ নাকি এই যে, ভিয়েতনামের হয়েষ্ট, দানিং এবং হো চি মিন—এই তিনটি শহরে চীনা দূতাবাস স্থাপনে ভিয়েতনাম অস্বীকার করেনি। সে জন্যই এই অল্পে প্রতিশোধ। কিন্তু ভিয়েতনাম এই যুক্তি স্বীকার করেন নি।

পিকিং ও হানয়ের মধ্যে এই বিরোধের অন্ততম মূল কারণ হচ্ছে অব্যাহিত কার্যকলাপের জন্য ভিয়েতনাম থেকে চীনা বাসিন্দের বহিষ্করণ। প্রকাশ যে, ৭৫ হাজার চীনা ইতিমধ্যে সীমানা পথ দিয়ে পাহাড় অঞ্চল পেরিয়ে চীনে গিয়ে পৌঁছেবে। আরও কয়েক হাজার চীনা বাসিন্দা নাকি উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে চলে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। তাদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য পিকিং সরকার ভিয়েতনামের কয়েক-খানা জাহাজ পাঠিয়েছেন। ২০শে জুনের পর এই সমস্ত চীনার জাহাজ ঘোপে স্বদেশ বাজায় কথা।

চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে প্রাচীনকালেও খুব সদ্ভাব ছিল না। কারণ, চীনা সম্রাটের সর্বত্র প্রভুত্ব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। ইদানীং কয়েক বছর ধরেও চীনের সঙ্গে ভিয়েতনামের মন কষাকষি চলছিল প্রধানত প্যারসেপ বীপপুঞ্জের অধিকার নিয়ে। চীন এই বীপগুলি বলপূর্বক অধিকার করে রেখেছে, কিন্তু ভিয়েতনামের দাবী এই যে, এই বীপগুলির মালিকানা তাদের।

অধিকন্তু এই পরিস্থিতির সঙ্গে আবায় যুক্ত হয়েছে ভিয়েতনাম কাছোভিয়া সীমান্তে সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং পিকিং মস্কো বিরোধ। পিকিংয়ের সন্দেহ এই যে, সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্ভাবনীতে পড়েই ভিয়েতনাম চীনের সঙ্গে এই বগড়া বাধিয়েছে এবং চীনের ভিয়েতনাম থেকে বহিষ্কার করছে।

যদিও ভিয়েতনাম, কাছোভিয়া ও লাওক এবং ইন্দোচীনের অন্তর্গত ছিল এবং এই তিনটে দেশই কমিউনিস্ট আদর্শে উৎসাহিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তির জন্য বীরের মত লড়াই করেছে। তবু আজ ঘটনা বশে

ভিয়েতনাম ও কাম্বোডিয়ায় মধ্যে দক্ষিণ অংশে সীমান্ত সংঘর্ষ চলছে। সেই সংঘর্ষ সময় সময় অত্যন্ত হিংস্র আকারও ধারণ করেছে এবং উভয় পক্ষ থেকেই ধ্বংস, নৃশংসতা ও নারী ধর্ষণের অভিযোগ করা হয়েছে। গত দু'বছর ধবে এই সমস্ত সংঘর্ষ চলে এসেছে। যদিও সোসিয়েলিস্ট রিপাব্লিক অব ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়া ও চীনের সাথে এই সমস্ত বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার জন্য বার বার আবেদন জানাচ্ছেন, তবু নানা কারণে সেই আবেদন ফলপ্রসূ হচ্ছে না। বিশেষত চীন এই সমস্ত সংঘর্ষে ও হাঙ্গামায় কাম্বোডিয়ার প্রতিই সমর্থন জানাচ্ছেন এবং চীন-ভিয়েতনাম সম্পর্কটা এই উপলক্ষে আরও বিবিধে উঠেছে। অপর পক্ষে কাম্বোডিয়ার ধর্মের ও ভিয়েতনামের ভিয়েতদের মধ্যে কিছুটা আতিগত বিরোধ বরাবরই ছিল। এমন কি, ভিয়েতনামী মুক্তি যুদ্ধের উদ্যাবহ দিনগুলিতেও দুই দলে সংঘর্ষ হয়েছে। সুতরাং অতীত ইতিহাসের দিক থেকে চীন-ভিয়েতনাম যেমন, তেমনি কাম্বোডিয়া-ভিয়েতনামের মধ্যেও সম্পর্কটা খুব জটিল। এই সমস্তের পিছনে রয়েছে আবার চীন-আমেরিকা-রাশিয়ার সম্পর্ক। অর্থাৎ ভিয়েতনাম ও ইন্দোচীন থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের পর পিকিংয়ের সোভিয়েত বিদ্বেষীরা জান না যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মার্কিন সামরিক প্রভাব সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যাক এবং সেই শূন্যস্থানে "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী" রাশিয়া পূর্ণ করুক। চীন আফ্রিকাতে যেমন রাশিয়ার তীব্র বিরোধিতা করছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও তেমনি শক্ততা করছে। মোট কথা সমগ্র পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। ধার্মা শান্তি, সাম্যবাদ এবং সমস্ত আতির সার্কস্টোম স্বাধীনতার বিশ্বাসী তাঁদের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অবস্থা অত্যন্ত রেশকর ও ট্রিগ্গারজনক। বিশেষতঃ ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, চীন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিহাসে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দিক থেকে অত্যন্ত উজ্জল এবং ভারত ও অন্যান্য দেশের পক্ষে শিক্ষণীয়। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক রিপাব্লিকের সঙ্গে একমত হয়ে যে কোন বিবেকবান ব্যক্তি প্রার্থনা করবেন চীন ও ইন্দোচীনের মধ্যে এই সমস্ত তিক্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হোক।

শুণীর সমাদর

এ বছর শ্রীনেপাল মজুমদারের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্তিতে আমরা বিশেষ আনন্দিত। প্রকৃত শুণীর সমাদর সব সময়েই আনন্দের কারণ—এবার আরো বেশী এ-কৃত্ত যে এবারকার সম্মাননার পাত্র বয়সে তরুণ।

প্রায় চু' শতক হতে চলল নেপালবাবু প্রকৃত পরিপ্রম্নে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করে ধেও ধেও প্রকাশ করছিলেন তাঁর 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি। তার সম্প্রতি প্রকাশিত পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত এই পুরস্কার।

অল্প আয়াসে আহরিত সামান্য তথ্যের উপরে কোনমতে মত একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করে সবার আগে বাজার দখল করার অথবা গোড়ার থেকেই একটা সিদ্ধান্ত আঁচ করে নিয়ে তার পরিপোষক কিছু তথ্য সমাবেশ করার প্রলোভনে নেপালবাবু ভোলেন নি। তিনি দস্তুরমতো পরিপ্রম্ন করেছেন বছরের পর বছর এবং পরস্পরবিরোধী তথ্য উপস্থিত করতে তদ্ব পান নি সহজ সিদ্ধান্ত টানার লোভে।

ব্যাপক প্রমকুঠতা এবং সহজসাধনের যুগে এ-ধরনের পরিপ্রম্নপটুতাই কিন্তু নেপালবাবুর রচনার একমাত্র গুণ নয়। তারই সঙ্গে লক্ষ্যীয় তাঁর বিচারশক্তি একদিক দ্বার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ নিয়েই যিয়ে গেছেন এইভাবে :

যে মাহুৎ হুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সম্ভব।... রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো ঝিঁঝিঁ মত একেবারে হুস্পূর্ণভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তন-পরস্পার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন অংশ মুখ্য, কোন অংশ গৌণ, কোনটা তৎসাময়িক, কোনটা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটি বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অহুভব করে তবে তাকে পাই।

—‘রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত’, কালাভর, পৃ: ৩৩৮

এতো বড়ো বইয়ের প্রতিটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে সব পাঠক একমত হবেন, এমন আশা করা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। যেটা মন্ত কথ্য— নেপালবাবু রবীন্দ্রনাথের এই বইটার আলোচনাক্ষেত্রে এমন একটি বিচারের কাঠামো খাড়া করতে পেরেছেন বা ধরে নিয়েই এগোতে হবে পরবর্তী আলোচকদের।

চিন্মোহন সেহানবীশ

আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ

দক্ষিণ আফ্রিকার মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যায় কালো আফ্রিকায় সে অবস্থিত। কালো মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সে টিকে আছে বনুকের জোরে। তার আরেক দোশর রোডেশিয়া। সংখ্যালঘু যেতাল্লারা সেখানেও ক্ষমতা দখল করে রেখেছে। তবে রোডেশিয়ার অবস্থা ভাল নয়। সলস্বেরিয়ার সর্দার ইরান স্মিথ নরমপন্থী কয়েকজন কালো ঐতনিনিদের ডেকে এনেছেন ক্ষমতার ভোজসভায়। স্মিথের এই বৌকা-বাজিতে অবশ্য রোডেশিয়ার সংগ্রামী গেরিলারা বিস্মস্ত হয়নি। তাঁদের মুক্তি-সংগ্রাম চলছে। রোডেশিয়ার (আফ্রিকান নাম জিম্বাবুই) পূর্ণ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত গেরিলাদের এই সংগ্রাম থামবে না।

এই দুই যেতাৎশাসিত রাজ্যকে কেন্দ্র করে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নষ্টামি পুরোহমেই চালিয়ে যাচ্ছে। নামে রাজ্য তারা আফ্রিকা থেকে উৎখাত হয়েছে। এখনও আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যে তাদের বার্ষ রয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতছাড়া হলেও অর্থনৈতিক বার্ষ বাতে অটুট থাকে সেদিকে তাদের পুরো নজর। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিষেবী যেতাৎ সরকারের ওপর তাদের জরসা সবচেয়ে বেশি। মালটিম্রাশনাল বণিক সংস্থার হাঁকাও সেখানে খাটছে

অবর। তাই বন্দুকবাজিতে বাতে দক্ষিণ আফ্রিকা কমজোরি হয়ে না পড়ে তার জন্ত বা কিছু করার সবই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের দোসর আমেরিকা ঠিকঠাক করে আছে।

এ না হলে রাষ্ট্রপত্বের শাসানি ও নিবেদনাক প্রত্যাব সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার এত রহস্যমা কীসের জোরে? দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার (আফ্রিকান নাম নাথিরিয়া) ওপর ইম্পিউশিয় প্রত্যাহারের জন্ত রাষ্ট্রসংঘ নির্দেশ দিলেও দক্ষিণ আফ্রিকারই ফাসিত সরকার গারের জোরে তা বহল কবে রেখেছে। সেখানেও চলছে আফ্রিকানদের মুক্তি সংগ্রাম। ভিয়েতনামের লড়াইয়ের কথা আমরা জানি। আফ্রিকার এই উপনিবেশগুলির স্বাধীনতাকামী কালোমাহুষের সংগ্রামের পুরো ইতিহাস যেদিন প্রকাশিত হবে সেদিন পৃথিবীর মানুষ জানবে কী অসাধারণ আত্মত্যাগের বিনিময়ে তারা মুক্তি অর্জন করতে চেয়েছিল। সেদিন আর বেশি দূরে নয়।

আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই সাহসী লড়াইয়ে সিংহের মতো পরম বিক্রমে শোভিত মাহুষের পক্ষে সংগ্রাম করছে নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অ্যাঙ্গোলা। অ্যাঙ্গোলার সমাজবাদী সরকার আফ্রিকার নতুন যুগের অগ্রদূত। ইজ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত চক্রান্ত ও হতকোশ ব্যর্থ করে অগাস্টিন নেটোর নেতৃত্বে অ্যাঙ্গোলার গণযুক্তি ফ্রন্ট পত্নীজদের শাসনের অবসান ঘটায়। আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের এটি একটি ত্যাগপূর্ণ জয়। কিন্তু এতে সাম্রাজ্যবাদীরা বেসামাল হয়ে পড়ে। তারা নানাতাবে অ্যাঙ্গোলার সমাজতন্ত্রী সরকারকে বিব্রত ও বিভ্রান্ত করার জন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা, তাদের প্রভৃতি ঊবেদায় রাষ্ট্রের মাধ্যমে অনবরত চেষ্টা করে আছে। কিন্তু অ্যাঙ্গোলার অনসাধারণ অসীম দৃঢ়তায় তাদের কটাজিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করছে। সমগ্র আফ্রিকার কাছে তা একটা মহৎ দৃষ্টান্ত।

আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদী হতকোশের এক নিলম্ব দৃষ্টান্ত সম্প্রতি বটেছে জায়েরের সাবা প্রদেশে। এই অঞ্চলটি আগে পরিচিত ছিল কাতাঙ্গা নামে। জায়েরের আগেকার নাম কঙ্গো। তার প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুম্বা সাম্রাজ্যবাদী ও সি, আই-এর চক্রান্তে স্বাধীনতার অন্নদিনের মধ্যেই নির্মম-ভাবে নিহত হন। সেই চক্রান্তকারীদের অতন্তম যোবুটুই এখন জায়েরের প্রেসিডেন্ট। তাঁর অপশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা আক্রমণ চালিয়ে গত মে

মাসে সাবা প্রদেশের প্রধান শহর কোলগুয়েজি দখল করে। এই প্রদেশটি
আমেরিকার বনি সম্রাজ্ঞ। এই সব বনির ইজারাধার বেলজিয়ান, ফরাসী ও পশ্চিমী
পুঞ্জিপতিরা। মোবুটু সরকারের অতিশয় বিপদ ছিল। তাঁদেরও যে লাভের অর্থ
কখনো নদীর জলে ভেসে যাবে, এই তাঁদের ভয়।

মোবুটুর তাঁবোয়ার কাহিনী এই বিপদবীচের আক্রমণের মধ্যে ঝড়ো ঝড়োতে না
গেয়ে বুদ্ধিমানের মতো নিজেদের পিঠি বাঁচায় রণে তত্ব দিয়ে। মোবুটু সরকার
তখন তাঁর প্রাক্তন প্রাক্ত বেলজিয়ান ও প্রাক্তপ্রতিম ক্রাভের কাছে দরবার করে
সৈন্য পাঠিয়ে এই আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য।

ভক্তবাহ্যকল্পত এই দুই প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্যারাম্বুটবাহী সৈন্য
নারিয়ে দেয় কোলগুয়েজিতে গত ১২ বে। অসহ্য হত হল কোলগুয়েজির
বেতাজ অববাসীদের উদ্ধার। এরা হল স্রাটো বা উত্তর অতলাভিক চুক্তি
সংস্থার সম্রাজ্ঞ—আমেরিকার বশবশ। আমেরিকা নিজে না গিয়ে এদের দিয়ে
হস্তক্ষেপ করে আফ্রিকার অনপণের বিপদী সংগ্রামকে প্রতিহত করল। এটা
নাকি নিতান্তই মানবিক মিলন। ফরাসি সরকার বিরোধীদের তুণোড়
সমালোচনার সামনে বলেছেন, বর্তমান কোলগুয়েজিতে আয়েরের বৈধ
পরকারের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততক্ষণেই তাদের ছত্রীকোণ ওখানে
থাকবে। এদিকে ভীত সম্রাজ্ঞ মোবুটু ফরাসি সরকারকে অস্বস্তি করেছেন
অনিদিষ্টকাল পর্যন্ত কোলগুয়েজিতে সৈন্য মোতায়েন রাখতে।

এ থেকে কি মনে হয় না বেতাজদের প্রাণ রক্ষা আসলে একটা ভীষণতা।
ছিলেবলে এবং কোণলে আফ্রিকার আবার সাম্রাজ্যবাদীদের বক্ষা জোরদার
করাই হল এই উদ্ভট কৌজী অভিযানের আসল উদ্দেশ্য। দক্ষিণ আফ্রিকা ও
রোডেশিয়া তো আছেই, মোবুটুর মতো কালো তাঁবোয়ারেরও অভাব নেই
আফ্রিকায়। তাহেরই মারকতে চলছে আফ্রিকার অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা।
পৃথিবীব্যাপী নতুন যুদ্ধঝোঁট তৈরির এটা একটা অঙ্গ। আফ্রিকার সংগ্রামী
সাম্রাজ্ঞ ও অঙ্গের বিনিময়ে সে অঙ্গচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে কৃতসংকল্প।
পশ্চিমীরা নিজেদের নিলক্ষ হস্তক্ষেপের সাফাই পাইতে গিয়ে বলেছে যে,
কোলগুয়েজিতে বিরোধীদের নেতৃত্ব দিয়েছে কিউবান সৈন্য। তার কোনো
প্রমাণ তারা দাখিল করতে পারেনি। কিউবার প্রধান মন্ত্রী কিউবান কান্সো
বলেছেন এ অভিযোগে ভাড়া মিথ্যা। আয়েরের এই লড়াইয়ে কিউবানরা
নেই। ছরাস্মার ছলের অভাব হয় না। ফরাসি বেলজিয়ানরা আফ্রিকাকে

বহু শতাব্দী শোষণ করেছে। সেই লোভ কি এত সহজে যায়? কিন্তু আফ্রিকার মানুষ এ হতক্ষেপ বরদাত্ত করবে না। তার প্রমাণ অ্যাডোলায়, তার প্রমাণ বোজাঘিকে। ইথিওপিয়ায় রণাঙ্গনেও বিপ্লবী শক্তি এই দাহস, দূচতা ও অতীকারের পরিচয় দিয়েছে।

কৃষ্ণ ধর্ম

SHR. BISWANATH BHOWMIK

Quality Binders & Co. Pvt. Ltd.

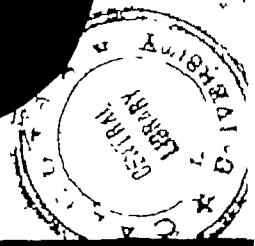
2992, Raja Ram Mohan Sarani

Calcutta-700015

7563 017/3

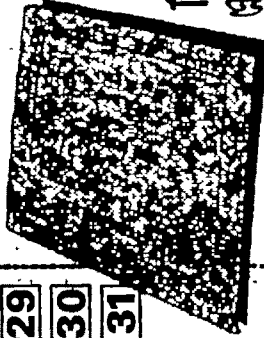


27



মাস কয়েকদিনের ভাড়া দিয়ে সারা মাসের টিকিট গেতে পারেন

SUN	7	14	21	28	
MON	1	8	15	22	29
TUE	2	9	16	23	30
WED	3	10	17	24	31
THU	4	11	18	25	
FRI	5	12	19	26	
SAT	6	13	20	27	



বিনা টিকিটে
প্রকট চড়ার খেসারৎ
কয়েক মাসের ভাড়া

■ সুবর্ধন মাসিক টিকিট আপনি কত সূত্রে পান—জানেন কি ? কোন কোন ক্ষেত্রে
ওটি একপিঠের টিকিটের ভাড়া মাত্র ।

■ আপনি একথা নিশ্চয়ই জানেন যে বিনা টিকিটে ধরা পড়লে ভাড়ার উপরে
মুনতম অধিমাত্রার পরিমাণ হল ১০ টাকা । এছাড়াও তিন মাসের স্বেচ্ছ
ও ৫০০ টকা পর্যন্ত অধিমাত্রা হতে পারে ।

কাজেই টিকিট কেটে
ট্রেন চড়াই ভালো । নয় কি ?



পূর্ব রেলওয়ে

বেনিটোর চাওয়া পাওয়া ও আনা সেগাস

আর্য্যম পণতাত্ত্বিক ত্রিশাব্দিকের বিশ্ববিখ্যাত লেখিকা আনা সেগাস'র
অন্ততম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মেক্সিকোর প্রটেক্টরিয়েটের রচিত উপন্যাসটিতে
দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কাল বিপ্লবের নায়ক স্ত্রেণ্ডে না পড়ে
কিভাবে অসম-সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন।
অনুবাদ করেছেন বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য। ৪ টাকা

নিবেদিতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

জীবন মুখোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ-শিষ্য মহীয়সী নারী ভরী নিবেদিতার অমর জীবন
কাহিনী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এর অবদানের কথা লেখক
হৃদয় করে তুলে ধরেছেন। ৩ টাকা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রগতিশীল জাতিবীর সহযোগিতা

ভারতের মুক্তি সংগ্রামীদের বিদেশে অত্যন্ত প্রধান কেন্দ্র ছিল
জার্মানী। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রামী
মাত্রকে প্রগতিশীল জার্মানরা কতভাবে সাহায্য ও সহায়তা দিয়েছেন
তারই ইতিহাস। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কার বহু ছদ্মাপা ধলিলের
সঙ্গে বইটি পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেবে। লিখেছেন ডঃ পলানন
সাহা। ৩ টাকা

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪১৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

২১শে ফেব্রুয়ারি বে-বই-এর আকস্মিক প্রকাশনা ঢাকা শহরকে আলোড়িত
ও সাময়িক শাসকচক্রকে সন্ত্রস্ত করেছিল—বাংলাদেশে নিষিদ্ধ

এ লাল আমরা রাখবো কোথায়

হার্ট-স্ট্রেট সহ দামি কাগজে ছাপা। মূল্য ২ টাকা

755.3

017/3

বাংলা ভাষার অবদানই বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ সংকলন

সংস্কৃত সাহিত্য সংগ্রহ

প্রথম খণ্ডে থাকছে : মহাকবি ভাস রচিত স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিমা নাটক, চায়দত্তম, উর ভঙ্গম, মধ্যমধ্যায়োগ, পঞ্চরাত্রম্ ও কর্ণভারম্ নাটকের মূলসহ বলাহুবাধ ; পারিভাষিক শব্দের শূচী ; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধ—সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব ও ডঃ রমা চৌধুরী লিখিত প্রথম খণ্ডের ভূমিকা।

আটখণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক মূল্য ১০ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তিকালে ও প্রতিখণ্ড সংগ্রহকালে ১০ টাকা দিতে হবে। একজুে অমা দিলে মূল্য ৭৫ টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে

বিবেকানন্দ রচনাসংগ্রহ

ছয় খণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক মূল্য ৭০ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তি ও প্রতি খণ্ড সংগ্রহকালে ১০ টাকা অমা দিতে হবে। একজুে অমা দিলে ৬০ টাকা।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত

নিবেদিতা

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য। গ্রাহক মূল্য ৫০ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তিকালে ৫ টাকা ও প্রতিখণ্ড সংগ্রহকালে ২ টাকা অমা দিতে হবে।

বইপত্র ৮।৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

মানুষের গল্প

মুদ্রিত জামা ও সোয়ি বটক সম্পাদিত

১৫ টাকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতল্লাহ লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ মুহিরাম দাস বলেন,
“এই গল্পসমষ্টি যুগের ইতিহাসের স্বাক্ষর”

বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগে বাংলাদেশে ভাগ্য-
বিবর্তনের মধ্যে এই দেশের সংগ্রামী সাহিত্যিকদের হাতে যে-কসল কলেছে
তাই এই একটি তুলন্ত সংকলন। প্রগতিমুখী সমাজ জীবনের প্রয়োজন ও উন্নত
সাহিত্যিকতার দাবি—এই দুইকে মিলিয়ে এই সংকলন।

ভারত রুশ কথা : বাঙালীর রুশ চর্চা

কেশব চক্রবর্তী

২০ টাকা

ভারত ও রাশিয়া দুই বিশাল প্রাচীন দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক যে পলানীর
যুদ্ধের সময় থেকেই গড়ে উঠেছে তাই তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস। বইটি নতুন
করে চিত্তাকর্ষক খোঁজ বোঝাবে। অমৃতেন্দু রূপক চক্রবর্তী ও অন্তর্যমিত্র লিখেছেন,
“বাঙালী চিন্তের রূপ রূপশ্রীতি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, রূশরাষ্ট্রজ্যোতীর
প্রতি সহানুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।...বইটি পড়লে মনে হয়, ভারত-রুশ
মৈত্রীর উজ্জ্বল অব্যাহত-উনবিংশ শতাব্দী”।

মনীষা গ্রন্থালয়

৪-৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

পরিচয়

বর্ষ ৪৭

সংখ্যা ১২

জুলাই ১৯৭৮

আবাক ১৩৮৫

প্রথম

কলকাতা কর্পোরেশন

বিদ্যবী আন্দোলন ও লবণ সত্যগ্রহ (১৯৭৮-৭৯)

দেবব্রত মজুমদার ১

মহৎ-প্রাণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতিচারণ

আবুল ফজল ২৩

কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বামগণতান্ত্রিক মোর্চা

আশীষ বর্মণ ৩১

যুদ্ধ : স্মৃতি ও সন্তায়

অম্বাবাদ : অমল আচার্য ১২০

আদেশ্য

কাজের মেয়েরা

বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭

কবিতাঙক

আনন্দ ঘোষ হাজরা, মুকুল চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিতকুমার সরকার,

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অশোককুমার মহান্তি, বিশ্বনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিম মিত্র, মধুসূদন সান্তাল, রুদ্র মুহুদ

শাহিচ্ছন্দা, অপরূপ মুখোপাধ্যায় ৫৪—৬৫

গল্প

“মামুষ ! মামুষ ! আমরা মামুষ ।”

রঞ্জিতকুমার ৬৬

চলচ্চিত্র-প্রদর্শন

সুতপা ভট্টাচার্য ৭৪

পুস্তক-পরিচয়

অম্ব বোধ, হুনীল সেন, অচ্যুত গোস্বামী, কবিচর্য মুখোপাধ্যায়, ভাস্করশিল্প
গোস্বামী, অসিত গুপ্ত, বোধায়ন চট্টোপাধ্যায় ৭৮—১১২

মিটিং-এস

অমিতান্ত দাশগুপ্ত ১১৫

গাঠিকসংগী

শিবদাস চট্টোপাধ্যায় ১১৭

বিবিধ এস

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১২

এস

অম্ব বোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপদেষ্টকসংলগ্ন

পরিচয় প্রদান পিটিং-এর পক্ষে অচ্যুত সেনগুপ্ত কর্তৃক দাশ বাসার প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোপাল হালাদার। বিষ্ণু দে। চিত্রোহন সেহানবীশ
মুদ্রা মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুম্ভুস •

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচ্যুত সেনগুপ্ত কর্তৃক দাশ বাসার প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
• চাণ্ডাবাসী সেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ১০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
থেকে প্রকাশিত।

কলকাতা কর্পোরেশন

বিপ্লবী আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহ (১৯২৮-৩২)

দেবব্রত মজুমদার

১৯২৮-২৯ এ ভারতে সর্বত্র স্বরাজ্যদল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং বাঙলাদেশে দেশবন্ধু নেতৃত্বে তারা বিপুলভাবে জয়লাভ করে। ১৯২৬ এর আইনের ফলে কলকাতা কর্পোরেশনের জয়। ১৯২৯ এর পৌরসভা নির্বাচনে স্বরাজ্যদলের জয় জয়াকার। দেশবন্ধু হলেন পৌরসভার প্রথম মেয়র, নূতন কর্মকর্তা নিযুক্ত হলেন তরুণ জননায়ক স্ভাবচক্র বহু। এই সময় থেকেই শুরু হলো বাঙলার বিপ্লবীদের কর্পোরেশনে যোগদান।^১ ইতিমধ্যে দেশবন্ধু ও তাঁর দক্ষিণে স্ভাব বহুর সহায়তায় বিপ্লবীরা কংগ্রেস সংগঠনের বড় বড় পর দখল করে নিয়েছে এবং এদের চাপেই দেশবন্ধুকে ১৯২৯ এ সিরাজগঞ্জে কংগ্রেস প্রাদেশিক সম্মেলনে গোপীমোহন সাহা প্রজ্ঞাবে সায় দিতে হল।^২

স্বরাজ্যদলের কলকাতা কর্পোরেশন দখলের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে সরকারী গোপন রিপোর্ট লিখল :

কংগ্রেস দলের কর্পোরেশন দখলের অন্ততম কারণ হল নিম্নেদের সমর্থকদের চাকুরীর বন্দোবস্ত করা। বহুসংখ্যক বিনা বেতনে প্রাথমিক স্কুলে এরা এদের কর্মীদের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করেছে।...স্কুলের কাজের বাইরে শিক্ষকেরা অধিকাংশ সময় ব্যয় করে পার্টি সংগঠন মজবুত করতে, দলের কর্মী সংগ্রহে, পরস্পরের সঙ্গে মত বিনিময়ে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক নেতৃবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে।^৩

১. Home Political File 4/21 1932.

২. Ibid.

৩. Note by Baker, Special Officer, Political Department, 19 January 1932. Home Pol. File 126, 1932.

ঐ একই রিপোর্টে লেখা হল, ১৯২০-২১ এ কর্পোরেশনের অধীনে বিনা বেতনে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৯। ১৯৩০-৩১ এ ২২০ এবং ১৯৩১ এ ডিসেম্বরে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২২৫ এ।^৮ এইসব স্কুলগুলিতে একমাত্র বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িত ব্যক্তিদেরই নিয়োগ করা হত। এ ব্যাপারে হুস্তাব বহু মেম্বর থাকা কালে তৎকালীন কর্পোরেশনের শিক্ষা সচিব ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক সাক্ষাৎকারে (১৯৩০-এ) স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছিল যে “any candidate who was not a political sufferer and who could not contribute a portion of his salary to help the distressed families of political sufferers, would not be appointed in the corporation free primary school.”^৯ এ সম্পর্কে হুস্তাব বহুর বন্ধু ও বিপ্লবী আন্দোলনের বোদ্ধা হুয়েশ দাস বলেন : “আমরা বিপ্লবীরা তখন মলে মলে কর্পোরেশনের বিভিন্ন মণ্ডরে কাজ পাই। আমাদের অন্ত ওবেয় দার ছিল খোলা। কর্পোরেশনে কাজ করতে করতে আমরা বিপ্লবী ও কংগ্রেস আন্দোলনেও যোগ দিতাম। আর এ ব্যাপারটা স্মৃক হয়েছিল দাস মশাই এর সময় থেকেই।”^{১০} কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষকরা ১৯৩০ এর লবণ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আন্দোলনের বথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি করে এবং ‘সরকার বিরোধী আক্রমণ’ সংগঠিত করে। এরফলে পৌরসভার তরফে যোগদানকারীদের বথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা দেখান হত।^{১১} কতগুলি সূত্রান্ত দ্বিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

(১) লিবার্টিতে খবর বেরল, আনন্দ পালিত হোডের কর্পোরেশন স্কুলের প্রধান শ্রীমতী ছায়াময়ী দেবী সত্যগ্রহ আন্দোলনে অংশ নিয়ে ৪ মাস সশ্রুতিত হয়ে, ছাড়া পেয়ে বাইরে এলে ঐ স্কুলের শিক্ষিকাদের তরফ থেকে তাঁকে বিপুলভাবে সন্মান দেওয়া হয়। মেম্বর হুস্তাব বহুর এক অভিনন্দন বার্তা পাঠ করেন পৌর বিদ্যালয়ে ইন্সপেক্টর শ্রীমতী অরুনা সেন।^{১২}

৪. Ibid.

৫. ‘A note on showing financial assistance rendered to revolutionary movement by corporation employees.’ এর থেকে উদ্ধৃতি। Ibid.

৬. হুয়েশ দাস : লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলি : মে ১৯৭৬।

৭. op cit.

৮. লিবার্টি, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৩০।

(২) আগস্ট, ১৯৩০ এ চট্টগ্রাম অজ্ঞাগার লুণ্ঠনের আসামী লোকনাথ বল ও অনন্ত সিংদের আশ্রয়দানের অপরাধে শ্রীমতী হুহাসিনী দেবী দণ্ডিত হন। মুক্তিলাভের পর তাঁকে ইটালীস্থিত কর্পোরেশন ফুলে চাকুরী দেওয়া হয়।^{১৮}

(৩) ৪ঠা আগস্ট, ১৯৩১, ১৫৩নং আপার সাকুলার রোডের কর্পোরেশন ফুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অজ্ঞাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীর প্রতিবাদে ধর্মঘট করে। ঐদিন ১১-৪৫ মিনিটে ঐ ফুল বন্ধ করে দেওয়া হয়।^{১৯}

(৪) ৮ই আগস্ট, ১৯৩০, ১২/২ গৌর লাহা স্ট্রিটের ফুলের প্রধান শিক্ষক অবিকেশ সিংকে “উত্তেজনাযুক্ত” ইত্যাহার বিলির অপরাধে ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৫৭ ধারায় ৬ মাস সশ্রম দণ্ড দেওয়া হয়। ইনি জোড়াবাগান কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক।^{২০}

(৫) ১৩ই আগস্ট ১৯৩০, কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার আইন ভাঙার জন্য যে ১৪ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হয় এদের মধ্যে ১২ জনই কর্পোরেশনের শিক্ষক। ঐ ১২ জনকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।^{২১}

(৬) কর্পোরেশন ফুলের শিক্ষিকা ইন্দুবালা বিশ্বাসকে গ্রাণ্ট স্ট্রিটে পিকেটিং করার অপরাধে ৪ মাস জেল দেওয়া হয়।^{২২}

(৭) ১৯৩০ এর ৮ই আগস্ট পুলিশ ১১৪নং জেস স্ট্রিটের কর্পোরেশন ফুল সার্চ করে ৪ জন নেপালীসহ মোট ১৮ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে। নেপালী যুবকেরা স্বীকার করে যে ঐ ফুলের প্রধান শিক্ষক হরেন্দ্র ঠাকুরের অহম্মতি নিয়েই তাঁরা ফুল গৃহে আত্মনা পেড়েছে।^{২৩}

(৮) ২২শে আগস্ট, ১৯৩০ বড়বাজারে পিকেটিং করার সময় জীবন চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইনি সাহানগর, কালীঘাট প্রাথমিক ফুলের শিক্ষক। ঐ একই দিনে ১৩নং ভুবন ক্যানার্স লেনের পৌর বিদ্যালয়ের শিক্ষক

১৮. গনেশ ঘোষ : লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, জুন ১৯৭৫।

১৯. Home pol file 126, 1932.

২০. Ibid.

২১. Ibid.

২২. Ibid.

২৩. Ibid.

রাজনারায়ণ পাণ্ডেকে “নাগতিকর ও উদ্বেজক” বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের উভয়কে কঠোর সাজা দেওয়া হয়।^{১৫}

(২) ২৮শে আগস্ট, ১৯৩০ গোয়েন্দা দপ্তরে খবর এল যে বেআইনী সর্বভারতীয় কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভাপতি মৌলভী মহম্মদ কাসেমকে পাটওয়ার বাগান কর্পোরেশন জুলে শিক্ষকতায় নিয়োগ করা হয়েছে।^{১৬}

(১০) ১৯৩১-এর ১লা ফেব্রুয়ারী কর্পোরেশন শিক্ষক ইউনিয়নের উদ্ভোগে এলবার্ট হলে এক সভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় ২৬শে ফেব্রুয়ারী জুলাই বন্ধ ও অসন্তোষের উপর পুলিশের লাঠি চালনা এবং লালবাজার লক-আপে তাঁদের উপর অত্যাচারের নিন্দা করে প্রস্তাব নেওয়া হয়। আইনঅমান্ত আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে কর্পোরেশনের সভাপতি শিক্ষকদের কাছে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আবেদন জানান হয়।^{১৭}

(১১) হিজলী বন্দীশিবিরের বন্দী কুম্ভ সেন, হিমাংগ বসু এবং বিপ্লবী মজুমদার—এরা সকলেই গ্রেপ্তারের প্রাকালে কর্পোরেশন জুলের শিক্ষক ছিলেন।^{১৮}

সরকারী গোপন দলিল থেকে জানা যায়, লবণ সত্যাগ্রহে, আইন অমান্ত আন্দোলনে এবং বিপ্লবী কাজকর্মে লিপ্ত অবস্থায় যে সব শিক্ষক গ্রেপ্তার বা দণ্ডিত হয়েছেন, কর্পোরেশন তাঁদের সম্পর্কে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তো গ্রহণ করেনই নি, তদুপরি তাঁদের শাস্তিভোগ কালে বাজে খাদ্য লোক নেওয়া না হয়, তার চেষ্টা করেছেন।^{১৯}

কর্পোরেশন কতদূর পর্যন্ত এসব ব্যক্তিদের নিরাপত্তা দিয়েছেন তার নজিরও মিলবে সরকারী গোপন দলিলে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা জে. সি. মুখার্জিকে এক চিঠিতে (১৪ই আগস্ট, ১৯৩০) জানানেন যে কর্পোরেশনের ১২ জন শিক্ষক বেআইনী সত্যাগ্রহে গ্রেপ্তার হয়েছেন—মি: মুখার্জী এ ব্যাপারে সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার প্রতি দৃষ্টি দেন।^{২০}

১৫. Ibid

১৬. Ibid

১৭. Ibid

১৮. Ibid

১৯. File 126/1932

২০. Ibid.

মিঃ মুখার্জী এই পত্রের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি।
৪. বরঞ্চ ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ টেনাণ্টের কাছে অভিযোগ করলেন, কোন এজিয়ারে কলকাতা পুলিশ কর্পোরেশনের ছুল সার্চ করল। কাজের সময়ের বাইরে যদি কোন কর্মী রাজনৈতিক কাজকর্মে অধিত থাকেন, তার জন্য কর্পোরেশন কোনমতেই দায়ী থাকতে পারে না।^{২১} পরের এক চিঠিতে (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) মিঃ মুখার্জী পুলিশ কমিশনারকে জানানেন যে, কর্পোরেশনের কোন কর্মীই সরকার বিরোধী কাজে লিপ্ত নয়। ১৪ জন শিক্ষককে পুলিশ অন্ত্রায়ভাবে গ্রেপ্তার করেছে এবং পুলিশ লকআপে এদের উপর শারীরিক নির্যাতন চলেছে।^{২২}

৭. কলকাতা কর্পোরেশন কিভাবে কংগ্রেসী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে কেলেছিল তার খবর মিলবে সরকারের গোপন নথি থেকে। সরকারী রিপোর্ট লিখেছে : কলেজ স্ট্রিটে কর্পোরেশন মার্কেট ছিল সরকার বিরোধী কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু।

"The Corporation of Calcutta directly assisted the civil Disobedience by making College Street market one of the centres of its activity, contrary to the purpose for which the market was built and corporation established."^{২৩}

এ মার্কেটের সি/১২, বি/৭৩, ই/৭৬নং ঘরগুলি অন্তর্য আপ্রমকে ভাড়া দেওয়া হয় এবং এই ঘরগুলোতে সত্যাগ্রহীদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩০ এর ১৫ই জুন, পুলিশ এই ঘরগুলো সার্চ করে ৩৮ জন সত্যাগ্রহী লোক একটি ডুমিকিটে মেরিন, বহু বেআইনী বুলেটিন 'অন্তর্যাপী' বাজেয়াপ্ত করে। সত্যাগ্রহীদের অন্তর্য আপ্রমের বারান্দা থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়। যে ঘরে মেরিন ব্যবহার হতো তা মার্কেট স্থপারের ঘরের সংলগ্ন এবং যে স্থান থেকে সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করা হয় তা স্থপারের অফিস থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। এ থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে স্থপার এই বেআইনী মেরিন ও সত্যাগ্রহীদের অবস্থান জানতেন।^{২৪}

২১. Administrative Report of Bengal, 1931—32

২২. Ibid

২৩. Op cit.

২৪. File 126/1932

কর্পোরেশনের কর্মীদের পোষাকের জোগান দেবার ভার পেত অত্যন্ত আশ্রম। অত্যন্ত আশ্রম সার্চকালে পুলিশ যে সমস্ত খাতা বাজেয়াপ্ত করে তা থেকে জানা যায় যে পোষাক বিক্রি টাকার একটা বড় অংশ ব্যয় হতো সত্যগ্রহ আন্দোলন চালাতে।

গোয়েন্দা দপ্তরের আরও খবরে প্রকাশ, কলকাতা স্ট্রিট মার্কেটের ১৩নং ঘর সারা বাড়ি যুব সংগঠন এবং ১৩নং ঘর কলকাতা ছাত্র সংগঠনকে ভাড়া দেওয়া হয়। ১৯৩০ এর আন্দোলনে ঐ ঘর দুটি সত্যগ্রহীদের আত্মনা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ৩৩নং ঘর ছিল সত্যগ্রহ আন্দোলনের অফিস। এই ঘরটিতে নাকি বেআইনি কাজকর্ম চলত। ১৯৩০ এর ১লা আগস্ট পুলিশ ঐ ঘর তাল্লাবদ্ধ করে দেয়। পুলিশের এই কাজের প্রতিবাদে কর্পোরেশনের সভায় প্রচণ্ড বাগবিড়ণ্ডা চলে। ১৫ই আগস্ট ১৯৩০ কর্পোরেশনের সভার প্রস্তাব অনুযায়ী মার্কেট স্থপার তৎকালীন সত্যগ্রহ আন্দোলনের নেতা অনাদিভূষণ মুখার্জীকে ঐ ঘর পূর্ণদখলের নির্দেশ দেন।^{২৫}

কর্পোরেশনের সেন্ট্রাল অফিসটি ও আইন অমান্তকারীদের অন্ততম অফিসে পরিণত হয়। ১৯৩০ এর ২রা নভেম্বর মধ্য কলকাতা কংগ্রেস কমিটি সম্পাদক সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্যকে পিকেটিং এর জন্য গ্রেপ্তার করা হলে তিনি পুলিশের কাছে স্বীকার করেন যে তিনি প্রায়শই কর্পোরেশনের অনেক কর্মকর্তা শৈলেন ঘোষালের কাছ থেকে আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পেতেন। শৈলেনবাবুও কংগ্রেসরই একজন পাণ্ডা। স্মরণ রাখা ভাল, ১৯৩১এর ২৬শে জানুয়ারি নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করে কংগ্রেস পতাকা সহ মুম্বইসেয়ের যে মিছিল মহুমেন্টের দিকে নিয়ে বাবাব চেঠা হয়েছিল—তারও স্বয়ং কর্পোরেশনের বাড়ি থেকেই।^{২৬}

১৯৩০ এ আগস্ট মাসের শেষাংশে 'বঙ্গীয় কৃষক ও রায়ত সভা'র আবেদনে কর্পোরেশন ২৭শে আগস্ট ঐ দলকে এলবার্ট হলে দলের সভা করার অনুমতি দেয়। কিন্তু কাগজে খবর বেরুল যে ঐ দিনই এলবার্ট হলে কলকাতার ছাত্রদের এক সভা হবে। বথাসময়ে দেখা গেল ছাত্ররা হল দখল করে রেখেছে এবং কৃষক সভার সভ্যদের ডাড়িয়ে দিয়ে ছাত্রদের সভা অনুষ্ঠিত হল। ছাত্রদের সভায় সেদিনে সভাপতিত্ব করলেন কর্পোরেশনের

২৫. Ibid

২৬. Ibid

শিকাসচিব ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এই ঘটনার থেকে বোঝা যায় কর্পোরেশনের ষাঁকটা ছিল কোন দিকে।

শিক্ষা সচিবের অফিসেও চলতো বেআইনী রাষ্ট্রনৈতিক কাজকর্ম। পুলিশের খবর: ৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০ শিক্ষা সচিবের উপস্থিতিতেই তাঁর ঘরে বি. পি. সি. সি. এবং বেআইনী বুলেটিন সাইক্লো হচ্ছে। পুলিশ লিখেছে “এই ভুললোক কেঁষি জে ছিলেন এবং বার্মিংহাম এম. এন. রায়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন”।^{২৭}

কর্পোরেশন প্রায় অধিকাংশ সদস্যই কোন কোনভাবে আন্দোলনে সহায়তা করেছেন। কাউন্সিলর মদন বর্মন এবং সন্তোষকুমার বসু ছিলেন উগ্র ইংরেজ বিরোধী। আনন্দজী হরিদাস ছিলেন অর্থের জোগানদার। আর মেয়র বিধান রায় তো তাঁর সমুদয় অর্থই চেলেছেন আন্দোলনের পেছনে। ১৯৩০ জুলাইতে দমকল বাহিনীর প্রধানকে তিনি আনাগোনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের লড়াই হতে পারে—দমকল ঘেন তৈরী থাকে। দমকল প্রধান মেয়রের নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে, ট্যাণ্ডিং কমিটির প্রস্তাবে কর্পোরেশনের দেয় ১৫০ টাকা ভাতা কেটে দেওয়া হয়।^{২৮}

কর্পোরেশনে বিপ্লবীদের অগ্রপ্রবেশ সরকারকে বেশ বিচলিত করেছিল। ভারত সরকারের প্রধান সচিব গৌশন চিঠিতে বাঙালী সরকারের কাছে জানতে চান কি ভাবে কর্পোরেশন বিপ্লবী আন্দোলনকে মদত জুগিয়ে চলেছে। এই চিঠি ভারত সরকার আরও জানতে চান (ক) কতজন কর্মীর বিরুদ্ধে Bengal Criminal Law Amendment Act প্রয়োগ করা হয়েছে? (খ) কতজনের বিরুদ্ধে এই প্রয়োগ করার মত সুযোগ রয়েছে? (গ) কর্পোরেশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কতজন বিপ্লবী রয়েছেন এবং এদের সম্পর্কে বাঙালী সরকার কি ধরনের ব্যবস্থা নিতে চান?^{২৯}

এর পরের এক চিঠিতে দ্বিতীয় খরাষ্ট্র দপ্তর থেকে বাঙালী সরকারকে জানান হয় যে তাদের কাছে সম্পূর্ণ খবর রয়েছে যে “সম্প্রতি কর্পোরেশনে

২৭. Ibid

২৮. Ibid

২৯. Letter from H. W. Emerson, Chief Secretary, Govt. of India to the Chief Secretary, Govt. of Bengal, Letter No. D 9086/631 poll dt. 16.1. 1932.

একজন কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে বার কাজ ফুলের ছেলেমেয়েদের লাঠি ও ছুরি বেলা শেখান।^{৩০}

ভারত সরকারের জিজ্ঞাসার উত্তরে বাঙলা সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর এক বিরাট নোট তৈয়ারী করে। এর মধ্যে ছিল (ক) কাউন্সিলর, অস্ত্র-ম্যানদের নাম (খ) কর্পোরেশনে শিক্ষা বিভাগে কর্মরত বিপ্লবীদের তালিকা (গ) কর্পোরেশন কর্তৃক বিপ্লবী আন্দোলনে অর্থ সাহায্যের বিবরণ এবং (ঘ) কর্পোরেশনের শিক্ষক সংস্থা, কর্মচারী ইউনিয়ন এবং কর্পোরেশনের সভায় বিপ্লবী বা কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি সমর্থন সূচক প্রতাবলী।^{৩১}

ঐ নোটে স্পষ্ট করে লেখা হল যে, কর্পোরেশনের শিক্ষা সচিব ক্রিষ্ণীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবীদের গৌড়া সমর্থক। তাঁর নির্দেশে মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড় বলাই চ্যাটার্জীকে মাসিক ১২৫ টাকা বেতনে ফুলের ছেলে-মেয়েদের জুজুং ও লাঠি বেলা শেখাবার কাজ নিয়োগ করা হয়েছে। ক্রিষ্ণীশপ্রসাদই উদ্যোগ নিয়ে কর্পোরেশনের সব ফুলেই ঐ ধরনে খেলাধুলার আয়োজন করেছেন। এ ব্যাপারে আর বারা উৎসাহী তারা হলেন বিন্ অর সেন ও বিস্ সুপ্রভা দাস। তাঁরা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন ও বাসন্তী শক্তি মন্দিরের শরীর শিক্ষক দ্বিজেন্দ্র দেবকে নিযুক্ত করার চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে খুবই উৎসাহী কাউন্সিলর মনন বর্মন ও নলিন গাল এবং শিক্ষক সংস্থার ছাত্রা দেবী, গিরীশ শীল ও ভবানী ঘোষ।^{৩২}

বিপ্লবী আন্দোলনে কর্পোরেশন কি ভাবে অর্থ সাহায্য করত তার বিবরণ ও সরকারী গোপন দলিল থেকে পাওয়া যায়। হুভাব বহু মেয়র থাকাকালে বেছে বেছে ছাত্র-যুবকদের কর্পোরেশনে ঢোকাতেন এবং এদের সঙ্গে চুক্তি থাকত যে মাসের বেতনের কিয়দংশ তাঁকে দিতে হবে। সেই অর্থ থেকেই হুভাব বহু বিপ্লবীদের সাহায্য

৩০. Ibid ; Letter No. D/271/32 poll. dt. 16.3. 1932.

৩১. Memo No 0816 C, Calcutta, dt. 5th-7th May 1932. Memo from Deputy Commissioner of police, Special Branch to the Chief Secretary, Govt. of Bengal, File 126/1932

৩২. Letter from Deputy Commissioner of Police to the under Secretary, Govt. of Bengal Do No F/5422c dt. Cal. 9th July 1932.

করতেন।^{৩৩} সরকারী রিপোর্টে লেখা হল, অত্যাব বহু মেয়র থাকাকালে
 বিপ্লবী অতুলকৃষ্ণ ঘোষ এবং তাঁর ঠিকারারী সংস্থা মেসার্স কে. সি.
 ঘোষ অ্যান্ড কোং-এর কাছ থেকে মাসে ২ হাজার টাকা পেতেন। অতুল
 কৃষ্ণের ছোটভাই অমরকৃষ্ণ ১৯৩১-এ বন্দী থাকাকালে পুলিশের কাছে
 স্বীকারোক্তিতে বলেন যে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সমস্তের
 পথকে ব্যবহার করে তিনি কর্পোরেশনের কাছ থেকে কাজের ব্যয় পেতেন
 এবং প্রদেশ কংগ্রেসকে মাসে ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ খরচা করতেন।
 এই টাকা দানের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট : কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, অফিসিয়াল বা
 মেয়র পদের অস্ত্র নিয়ে লোককে মনোনিয়ন দেওয়া এবং কন্ট্রোল
 পাওয়া। এ ছাড়াও বছরে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা প্রদেশ কংগ্রেসকে
 অর্থদান দিতেন।^{৩৪}

শিক্ষাসচিব ক্রিডীশপ্রসাদ নিয়মিতভাবে যুগান্তর দলের কর্মী, পৌর
 শিক্ষক মতি সিং ও বিপ্লবী অরেন দাশকে অর্থ সাহায্য করতেন।^{৩৫}
 তাছাড়া ডাকার যে সব বিপ্লবীরা কলকাতায় বিপ্লবী কাজে আসতেন
 তাদের অনেকের অস্ত্র অর্থ ও বাসস্থানের ব্যবস্থার ভার থাকত ক্রিডীশ-
 প্রসাদের উপর।^{৩৬}

মধ্য কলকাতার সম্ভাব্য মিল্লের দলের কর্মী রেবেন দে-কে মশা
 মারা ত্রিগেডে মাসে ১০০ টাকার নিয়োগ করা হয়। তিনি বেতনের
 বেশী অর্ধেক ব্যয় করতেন আন্দোলনে। ময়মনসিংহের যুগান্তর নেতা অরেন
 ঘোষের শিষ্য সিং জাহানকে কর্পোরেশনে ডেপুটি কর্মকর্তার পদে নিয়োগ
 করা হয়। পুলিশ রিপোর্টে জানা যায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ার ট্রেনিং
 লাভের অস্ত্র অরেন ঘোষ তাঁকে ইউরোপে পাঠান এবং তাঁর যাবতীয়
 খরচ তিনিই বহন করেন। জাহান সাহেবের নিয়োগও একটাই সূত্রে :
 তার বেতনের অর্ধেক দিতে হবে বিপ্লবীদের অস্ত্র।^{৩৭}

৩৩. A note showing financial assistance rendered to revolutionary movement by corporation employees." File 126/1932.

৩৪. Ibid, File 136/1932

৩৫. মতি সিং-এর আসল নাম মতি সরকার। বাড়ী বরিশাল। বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার কলি: ডিসেম্বর-১৯৭৭।

৩৬. Ibid

৩৭. Ibid

ঐ একই রিপোর্টে লেখা হল : মদনসিংহের যুগান্তর হল মেয়র বিধান
স্বায়, কাউন্সিলর নলিনীরঞ্জন সরকার এবং ডেপুটি লাইসেন্স অফিসার
শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষালের কাছ থেকে নিষমিত ভাবে অর্থ সাহায্য পেয়ে
থাকে।^{৩৮}

১৯৩০—৩৩ এই ক' বছরে কর্পোরেশনে বিপ্লবী ও কংগ্রেসীরা বেশ
জীকিয়ে বসেছিল এবং বহু ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের দপ্তর আন্দোলনে
ব্যবহৃত হয়েছে। অন্ততঃ ৬১টি ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের কর্মীদের B. C. L. A.
Act-এ আটক করা হয়েছে ; কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে
কর্মী ইউনিয়ন ১৫টি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, ২৯ জন শিক্ষক আইন অমান্ত্র
অংশ নিয়েছেন।^{৩৯} এ পর্যন্ত ২৫ জন কর্পোরেশন শিক্ষক আটক
আইনে বন্দী ; একজন ঠিকার ছাড়াও ২ জন অজ্ঞারমান ও একজন
প্রাক্তন অজ্ঞারমানকে ৩ আইনে বন্দী করা হয়েছে।^{৪০}

কর্পোরেশনের কাজকর্ম যে ভাবে চলেছে তাতে সরকার গভীরভাবে
উদ্বেগ ছিলেন। ভারত সরকারের সচিব তাঁর নোটে লিখেছেন,
The corporation was in a bad ardour, the rows organised
by the followers of Mr. Sengupta and Subhas Bose in the
council chamber of the corporation have disgusted all
decent opinions...^{৪১} এ বাগারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের সংকল্প
নিরে তিনি এক চিঠিতে বাঙলা সরকারকে জানান যে কর্পোরেশনকে বাতিল
করতে উদ্যোগ নিচ্ছেন। বাংলা সরকার এর উত্তরে জানান যে তাঁরা ১৯২৩-এর
আইনের সংশোধনের ব্যবস্থা করে বিল উত্থাপন করবেন এবং আপাততঃ
একটি কমিটি গঠন করে কর্পোরেশনের উপর সরকারী তদারকি করার
অঙ্গ এক জর্দারেল অফিসারকে বসাতে চাইছেন।^{৪২} স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী

৩৮. Ibid

৩৯. Terrorism, Civil Disobedience and the Calcutta
corporation. B. G. Press 1013-34.

৪০. Letter no 409 P. S. D. dt. 3 June 1932. from
Chief Secretary to the Govt. of Bengal to the Chief
Secretary, Govt. of India, File No 136/1932.

৪১. File No. 672/1930.

৪২. Ibid

বি. পি. সিংহকে কাউন্সিলে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন।^{৪৩}

তিনি তাঁর গোপন নোটে লেখেন :

“The most unfortunate thing was the election of Subhas Bose as Mayor of Calcutta. It was he who started the game of appointing anarchists or ex-anarchists in the corporation...”^{৪৪}

কর্পোরেশন তদারকির জন্য কমিটি গঠনের ব্যাপারেও আমলাদের মধ্যে ভিন্নতর মতামত থাকায়, অবশেষে ১৯৩০-এর এপ্রিলে এক বিল পাশ করে স্বায়ত্ব শাসনের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের আর খুঁলে দেওয়া হল। এই আইনে স্পষ্ট করেই বলা হয়, যে সব ব্যক্তি রাষ্ট্রভ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত বা কোনরূপ রাষ্ট্রভ্রোহিতার লিপ্ত আছেন বা ছিলেন, তারা কর্পোরেশনে চাকুরী থেকে বঞ্চিত হলেন। এমন কেউ যদি চাকুরী পাওয়ার পর অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হন, তাকে বরখাস্ত করা হবে।^{৪৫}

কলকাতা কর্পোরেশনে কর্মরত যে সমস্ত বিপ্লবী বা তাঁদের সমর্থক অন্ডারম্যান, কাউন্সিলর অথবা কর্মী ছিলেন তাঁদের তালিকা (১৯২৮-৩১)।

অন্ডারম্যান

- (১) শরৎচন্দ্র বোস—রাজবন্দী
- (২) সত্যচন্দ্র বোস—ঐ, ইনি ভারতীয় দণ্ডবিধি ১২৪-এ দ্বারা ১৯৩০ এ দণ্ডিত হন।

কাউন্সিলর

- (১) বিপিন গাঙ্গুলী—প্রাক্তন আটক বন্দী; ১৯১৫ তে আগরপাড়া ডাকাতি মামলার দণ্ডিত।
- (২) ইন্দির বিদ্য—১৯১৬ তে ভারতবর্ষ বিধি অধুনায়ে দণ্ডিত, ইনি বিপ্লবীদের অর্থ বোজান দিচ্ছেন।
- (৩) প্রভুদয়াল হিংসিংকা—বড়ো অস্ত্র মামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে ১৯১৬ বাংলা থেকে বহিষ্কৃত।

৪৩. Statesman 15 March 1932

৪৪. Op cit.

৪৫. Terrorism, Civil Disobedience and the Cal. corporation.

(৪) ডাঃ নারায়ণ রায়—১৯৩০ এ জোড়াবাগান বোমার মামলার দণ্ডিত আসামী।

কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মী

(১) মনোমোহন শুট্টাচার্য—প্রাক্তন আর্টকবন্দী; আলীপুর বোমার মামলার (১৯০৮) দণ্ডিত আসামী।

(২) সতীশ চক্রবর্তী, ময়মনসিংহ—প্রাক্তন আর্টকবন্দী; কর্পোরেশনের তহশীলদার; বি. পি. সি. সি. ভলটিয়ারদের অস্ত্র অর্থ যোগাড়ের কাজে হস্তাক্ষর বহু কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত।

(৩) অধীর চক্রবর্তী—আর্টক বন্দী।

(৪) অশীল কুমার ঘোষ—ঐ

(৫) সতীশচন্দ্র সরকার—কর্পোরেশনের এ্যাসেসমেন্ট - ইন্সপেক্টর; বিপ্লবী হলের বন্ধু।

(৬) দেবেন্দ্র দে গুপ্তা—আর্টক বন্দী; ইন্সপেক্টর, মশা মারা বিভাগ।

(৭) আনান্দ নিয়োগী—প্রচণ্ড ইংরেজ বিরোধী বক্তা ("a rabid anti-British agitator"), লন্ডন সহযোগে বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে একাধিকবার দণ্ডিত। প্রচার সচিব।

(৮) পুলিন দাস—প্রাক্তন রাজবন্দী; ১৯১০ ঢাকা বড়বাজার মামলার অন্ততম আসামী, কর্পোরেশনে লাঠি খেলা শেখাবার অস্ত্র নিযুক্ত কর্মী।

(৯) ব্রজেননাথ দত্ত—৩০শে আগস্ট; ১৯১০ এ নাজিলা বড়বাজার মামলার ভারতীয় হওবিধির ১২১-এ ধারায় ৩ বৎসর দণ্ডিত আসামী।

(১০) ডাঃ হারাধন দাস—বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থক; ১৯৩০-এ আইন অমান্তকারীদের আশ্রয়দাতা।

(১১) বিনোদ চক্রবর্তী—আর্টক বন্দী; কর্পোরেশনে ওয়াটার ওয়ার্কসের কর্মী।

(১২) কেশব কুণ্ডু—পূর্ণ দাস-এর দলের একনিষ্ঠ কর্মী।

(১৩) শচীন্দ্র সরকার—বিল সংগ্রাহক; অরেশ দাসের সহকর্মী ও কর্মসংস্থের সভ্য।

(১৪) নৃপেন্দ্রলাল সরকার—কর্পোরেশন সেন্ট্রাল অফিসের কর্মী; জোড়াবাগান মামলার আসামী সতীশ দাসের সঙ্গে যুক্ত।

(১৬) চুনী মুখার্জী—প্রাক্তন আসামী ; ১৯৩১-এর অন্নমামলার বণ্ডিত।

(১৭) সতীশ চক্রবর্তী, খুলনা—আটক বন্দী।

(১৮) শৈলেন্দ্র ঘোষাল—ডেপুটি লাইসেন্স অফিসার ; গোয়েন্দা রিপোর্টে প্রকাশ : উনি সূতায় বহুর বিবর্ত, এবং পলাতক ও আটকবন্দীদের সাহায্যের জন্য শৌর্যকর্মীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতেন এবং বহু বে-আইনী পুস্তিকার প্রকাশক।

ঠিকাদার (contractor)

(১) অতুল ঘোষ—প্রাঃ রান্নাবন্দী ; ইনি নিয়মিত ভাবে সূতায় বহুকে মাসে ১০০০ টাকা বিতেন। এছাড়া ঢাকার পলাতক বন্দীদের সাহায্য করার জন্য সুরেশ দাস ও মতি সিংকে অর্থ সাহায্য করতেন।

(২) অমর ঘোষ—আটক বন্দী (এরা উত্তরেই ভাই এবং কে, সি. ঘোষ এ্যাণ্ড কোং-এর মালিক)।

কর্পোরেশনে শিক্ষা বিভাগে কর্মরত বিদ্রোহী বা তাঁদের সমর্থকদের তালিকা :—

(১) দ্বিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—শিক্ষাসচিব ; ইনি পলাতক বিদ্রোহী মনোজ্ঞান গুপ্তকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন এবং ‘কুখ্যাত’ কমিউনিস্ট এম. এন. রায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

(২) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—প্রাঃ বন্দী

(৩) অমূল্য অধিকারী—বন্দী

(৪) দুর্গাচরণ বহু—বন্দী

(৫) হিমাংগ বহু—বন্দী

(৬) মাধনলাল বহু—ঐ

(৭) নরেন্দ্র চন্দ্র ভট্ট—ঐ

(৮) প্রমথনাথ ভট্ট—ঐ

(৯) বাদবেশ্বর ভট্টাচার্য—ঐ

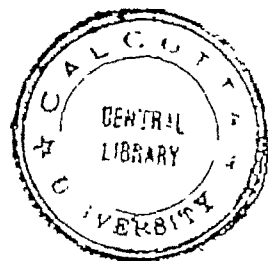
(১০) হরিদাস গুরুকে ভূষণ চক্রবর্তী—ঐ

(১১) জনার্দন চক্রবর্তী—ঐ

(১২) বতীন ভট্টাচার্য—ঐ

(১৩) নবদীপ দাস—প্রাঃ বন্দী

(১৪) প্যারীমোহন দাস—বন্দী



- (১৫) অমূল্য দাশগুপ্ত—বন্দী
 (১৬) অতুল হস্ত—ঐ
 (১৭) বীরেন হস্ত—ঐ
 (১৮) রতিকান্ত হস্ত—ঐ
 (১৯) কালীশংকর গাঙ্গুলী—প্রাঃ বন্দী
 (২০) প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী—ঐ
 (২১) ডিনকড়ি গাঙ্গুলী—ঐ
 (২২) বীরেন কুতু—ঐ
 (২৩) বিধুভূষণ মজুমদার—ঐ ; পূর্ণ দাসের দলের সভ্য
 (২৪) কলীন্দ্রনাথ মুখার্জী—বন্দী
 (২৫) মুখশেদ উদ্দীন খান—ঐ ; অস্ত্রচোরাই চালানকারী, কলী মুখার্জী ও দ্বিতীয় রায়েদ দলের সঙ্গে যুক্ত।

- (২৬) কুমুদচন্দ্র সেন—বন্দী
 (২৭) ক্ষেত্র সিংহ—প্রাঃ বন্দী
 (২৮) মতিলাল সিং—বন্দী
 (২৯) জীবন ঠাকুরতা—ঐ
 (৩০) ব্রজনাথ দাস—ঐ
 (৩১) গোপাল ঘোষ গুরুকে কালিধন—ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ দলের সদস্য
 (৩২) শান্তি সোম—ঐ
 (৩৩) বোদ্ধেশ্বরনাথ বসু—বন্দী স্বরেশ দাসের শিষ্য
 (৩৪) বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার—পূর্ণ দাসের দলের সদস্য
 (৩৫) অচ্যুৎ ঘটক—বন্দী
 (৩৬) বনী ব্যানার্জী—ঐ
 (৩৭) হিমাংশু সেন—মুন্সীগঞ্জ দলের সভ্য ; দণ্ডিত
 (৩৮) সারদা ব্যানার্জী—ঐ ; পিকেটিং করার দ্বারা দণ্ডিত
 (৩৯) ভূপেন সোম গুরুকে আকাশী—মুন্সীগঞ্জ দলের সভ্য
 (৪০) বোগেশচন্দ্র মিত্র—প্রাঃ বন্দী বিনোদবিহারী সিংহের সঙ্গে বোমা তৈয়ারির কাজে যুক্ত ছিলেন

- (৪১) হিমাংশু করবাব—পলাতক আসামী প্রবীর গোস্বামীর আশ্রয়দাতা
 (৪২) বলাই চ্যাটার্জী—ঢাকা লোহাজং দলের সভ্য ; অস্ত্রচোরাচালানকার

(৪৩) বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত—সভ্য, কর্মীসংঘ; স্বরেশ দাশ ও সত্যীশ সেনের সঙ্গে যুক্ত।

(৪৪) মহঃ আব্দুল হামিদ—প্রাঃ বন্দী।

(৪৫) হেমলাল চ্যাটার্জী—খুলনার বিপ্লবীদের আত্মনা দৌলতপুর আশ্রমের সভ্য।

(৪৬) রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ—অস্ত্রচোরাই চালান কাজে যুক্ত বলে সম্মেলনোদ্যম এবং বিহারের বিপ্লবীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

(৪৭) শচীনন্দন দাস—চট্টগ্রাম যুগান্তর দলের গুরুত্বপূর্ণ কর্মী।

(৪৮) রাম শুকুল সিংহ—পিকেটিং ও মারামারি করার জন্য ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০ ৬ মাসের জন্য সশ্রম দণ্ডদেশ প্রাপ্ত।

(৪৯) রাজনারায়ণ পাণ্ডে—২২শে আগস্ট ১৯৩০ রাজশ্রোহমুক বক্তৃতার জন্য গৃহত্যাগ এবং ব্যক্তিগত মূল্যে ক্ষতি পান।

(৫০) জীবন চক্রবর্তী—১৯৩০ আন্দোলনে গৃহত্যাগ; বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত।

(৫১) রাধারমণ মিত্র—মীরট-বড়বস্ত্র মামলার আসামী।

(৫২) সিদ্ধেশ্বর চ্যাটার্জী—বিখ্যাত বিপ্লবী; বোম্বাই-অবস্থান কালে অস্ত্রচোরাই-এ সংশ্লিষ্ট।

(৫৩) নরেন্দ্র পর্বত—পূর্ণদাসের দলের সভ্য।

(৫৪) বীরেন্দ্রমোহন সাহা—মনোহরপুকুর আশ্রমে বন্দী ঘটনায় সড়চাচারের সঙ্গে যুক্ত।

(৫৫) বক্রিচন্দ্র গুহ—মুন্সীগঞ্জের হিমাংগ বহুর দলের সঙ্গে যুক্ত।

(৫৬) অজিতকুমার বসু—বন্দী

(৫৭) নিখিলরঞ্জন বসু—ঐ

(৫৮) জ্যোতিষ গুপ্ত—ভবানীপুর কর্মীসংঘের সহঃ সম্পাদক।

(৫৯) স্বধীর ঘোষ—প্রাঃ বন্দী মহিম গুহের সহকর্মী।

(৬০) সত্যীন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত—কর্মীসংঘের কর্মকর্তা বীরেন সেনের সহকর্মী।

(৬১) নিবারণচন্দ্র ঘোষ—কর্মীসংঘের সভ্য ও বরিশালের সত্যীন্দ্র সেনের সহকর্মী।

(৬২) ব্রজলাল দাস—কর্মীসংঘের সঙ্গে যুক্ত।

(৬৩) হরীকেশ সিংহ—জোড়াবাগান কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক; ১৯৩২-এর আন্দোলনে দণ্ডিত।

(৬৪) হীরালাল সেন—বিপ্লবী কুম্ভ সেনের ভ্রাতা ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত।

(৬৫) কুলদা মৈত্র—বিপ্লবী ও বিখ্যাত শ্রমিক নেতা।

(৬৬) অরেন দাস—বিপ্লবী শৈলেশ্বর বসুর দলের সভ্য এবং মাদারীপুর দলের সঙ্গে যুক্ত।

(৬৭) রবীন্দ্রনাথ দাস—তরুণ সংঘের সভ্য এবং বীরেন সেনের সঙ্গে একত্রে দণ্ডপ্রাপ্ত।

(৬৮) উপেন দত্ত—বন্দী

(৬৯) সত্যেন্দ্র মোহন সেন—চাক, মুল্লীগঞ্জের বিপ্লবী দলের সভ্য।

(৭০) গিরীশচন্দ্র শীল—বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজনে অস্ত্র চোরালান ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট।

(৭১) রূপেন্দ্র পাল—কুমিল্লা গ্রামের সভ্য, পলাতক আসামীদের আশ্রয়দাতা।

(৭২) অনন্ত চক্রবর্তী—রায় বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জী হত্যার মামলায় বাবাজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী।

(৭৩) মোহিনী গাঙ্গুলী—দক্ষিণ কলকাতা শশত্রু বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত।

(৭৪) অনিল বিশ্বাস—আইন অমান্ত দলের কর্মী।

মহিলা কর্মী

১। সরলাবালা হালদার—ভালহোসী বোমার মামলার দণ্ডিত আসামী।

২। কমলা দাশগুপ্তা—বন্দী

৩। প্রেমলতা বসু—যুগান্তর দলের কর্মী।

৪। শৈলবালা দেবী—বন্দী কুমুদ সেনের সহকর্মী।

৫। কমলা দাস—জোড়াবাগান মামলার আসামী রসিক দাসের সহকর্মী।

৬। আশা দাশগুপ্তা—স্বর্ষ সেনের দলের অন্যতম কর্মী বনোরঞ্জন রায় (ওরফে কেবলা) রায়ের সঙ্গে যুক্ত।

৭। সুহাসিনী দেবী—বন্দী

৮। প্রীতি দাশগুপ্তা—চট্টগ্রাম যুগান্তরের কর্মী; কথিত, তিনি অন্ত্রাশ্রয় লুণ্ঠনের ব্যাপারে বহু সাহায্য দিয়েছিলেন।

৯। পাবল সেন—বরিশালের বিপ্লবী দলের কর্মী। শান্তি সেনের ঘনিষ্ঠ এবং নিজেও একটি দলের নেত্রী। ইনি কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষিকা।

১০। প্রমীলা গুপ্তা—বন্দী।

১১। ছায়ামণ্ডী চ্যাটার্জী—বিপ্লবী দলের সমর্থক; ১৯৩০-এর আইন অমান্ত আন্দোলনে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

১২। প্রভাতনলিনী মিত্র—১৯৩২-এ লাট-হত্যার আসামী বীণা দাসের সহকর্মী।

বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থনে কর্পোরেশন কর্তৃক গ্রহীত প্রস্তাব :

১৯২৯

১৩ই সেপ্টেম্বর : ৬৩ দিন অনাহারে লাহোর জেলে বতীন দাসের মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে :

“বীর বিপ্লবী বতীন দাসের অকাল মৃত্যুতে কর্পোরেশন গভীর দুঃখ জ্ঞাপন করছে এবং তাঁর পরিবার পবিত্রজন্মের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে...”।”

যেহেতু নির্দেশে কর্পোরেশনের স্কুলসহ সমস্ত দপ্তর একদিন বন্ধ রাখা হয়।”

১৮ই ডিসেম্বর : এক সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয় যে শহীদ বতীন দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য স্কুল মালা কেনা বাবদ ২২ টাকা মঞ্জুর করা হল।”

১৯৩০

৩১শে মার্চ : সভায় স্থির হয় যে সাহানপুর শ্রমশান ঘাটের ১৫'x২০' ফুট স্থান বিনামূল্যে বতীন দাসের স্মৃতি-সৌধ নির্মাণের জন্য বতীন দাস স্মৃতি কমিটিকে হস্তান্তর করা হল।”

১৩ই সেপ্টেম্বর : কর্পোরেশনের সভায় প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ দিন ১০১ নং হরিশ মুখার্জী রোডে কর্পোরেশন স্কুল প্রাঙ্গণে ‘বতীন দাস দিবস’ পালন করা হয় এবং অনসাধারণকৈ বিনামূল্যে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।”

৪৬. কালকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, সংখ্যা ১০, নং ১৯, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৯।

৪৭. Ibid ; সংখ্যা ১১, নং ৫, ২১ ডিসেম্বর, ১৯২৯।

৪৮. Ibid ; সংখ্যা ১১, নং ১৯, ৫ই এপ্রিল, ১৯৩০।

৪৯. Ibid ; সংখ্যা ১২, নং ১৯, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।

১৯৩১

১১ই ফেব্রুয়ারি এক বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী ডালহৌসী বোয়ার মামলার আসামী, কাউন্সিলর নারায়ণ রায়কে “স্বায়ত্বত কারণে” ৬ মাস ছুটি এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৩০ পর্যন্ত আরও ছুটি মজুর করা হয়।^{৫০}

৮ই জুলাই : রাইটার্স’ বিল্ডিং গুলি চালানর আসামী দীনেশ গুপ্তের কাঁসির প্রতিবাদে কর্পোরেশন এক প্রস্তাব পাশ করে শহিদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা আপন করে।

মেয়র বিধানচন্দ্র রায় শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও সাহসের ফুসলী প্রশংসা করেন।^{৫১}

২৮শে জুলাই : কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় মেয়রের অধ্যক্ষেরা কাউন্সিলর শরণচন্দ্র বসুর আনা প্রস্তাবে হিজলি জেলে বন্দীদের প্রতি বর্ধনোচিত আক্রমণ ও হত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়। ঐ সভা সরকারের কাছে দাবি করে অনতিবিলম্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষীদের শাস্তি বিধান করুন এবং ভবিষ্যতে বাতে অসহরূপ ঘটনা না ঘটে তার প্রতিশ্রুতি দেন। ঐ সভায় অপর এক প্রস্তাবে বলা হয়, যে সরকার বন্দীদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম সেই সরকারের বন্দীদের জেলে রাখার কোন অধিকার নেই। অবিলম্বে বন্দীদের মুক্তি দাবি করা হয়।^{৫২}

কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রস্তাব :—

১৯২৮

২৬শে নভেম্বর : লাল লাজপৎ রায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে কর্পোরেশনে এক প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রস্তাবের উদ্বোধক কাউন্সিলর শচীন্দ্রনাথ মুখার্জী।^{৫৩}

২২ই ডিসেম্বর : কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক ডাইনরয়কে চা-চক্রে আপ্যায়নের বিরোধিতা করে এক প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রস্তাব বসুর

৫০. File 126/1932

৫১. Ibid ; সংখ্যা ১৬, নং ৭ ; ১১ জুলাই, ১৯৩১।

৫২. Ibid ; সংখ্যা ১৬, নং ১২, ৩রা অক্টোবর, ১৯৩১।

৫৩. Ibid ; সংখ্যা ২, নং ৩, ১লা ডিসেম্বর, ১৯২৮।

নেতৃত্বে এই ঘটনার নিষ্পত্তি করা হয় এবং জে. এম. সেনগুপ্ত নিষ্পত্তিচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।^{৫০}

১৯৩০

২৬শে জানুয়ারি : কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় প্রস্তাব অম্বুয়ারী কর্পোরেশনের সমস্ত দপ্তর ও স্কুল গৃহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ডেপুটি মেয়র এম. এ. রেজাক (মেয়র সেনগুপ্ত অস্থায়ী ছিলেন) ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনির মধ্যে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পতাকা উত্তোলন করেন।^{৫১}

১০ই মার্চ : বার্ষিক এক জনসভায় “উদ্বেগনামূলক” বক্তৃতা দেবার অপরাধে মেয়র সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হলে কর্পোরেশনের এক সভায় নিষ্পত্তিচক প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, যে সরকার স্বাধীন মতপ্রকাশের ও ব্যক্তি স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছেন এবং সেনগুপ্তের গ্রেপ্তার জাতীয় আন্দোলনের উপর সরকারি দমন পীড়নের অন্ততম নজির।^{৫২}

৬ই মে : মহাস্বা পাক্ষীয় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কর্পোরেশনের সভায় এক প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং ঐ ঘটনার প্রতিবাদে ঐদিন কর্পোরেশনের সমস্ত অফিস ও স্কুল বন্ধ রাখা হয়।^{৫৩}

২১শে মে : সরোজিনী নাইডুর গ্রেপ্তারে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কর্পোরেশনের সভা মূলতবি রাখা হয়। ঐ একই সভা শ্রীমতী ইন্সুমতী গোয়েন্ধার গ্রেপ্তারেও নিষ্পত্তিচক প্রস্তাব গ্রহণ করে।^{৫৪}

২৭শে জুন : উর্মিলা দেবী, বিমলপ্রতিভা দেবী, মোহিনী দেবী এবং জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর গ্রেপ্তারে সভা স্থগিত রাখা হয়।^{৫৫}

২৯শে জুন : পণ্ডিত মজিলাল নেহেরু, ডাঃ সৈয়দ মোহাম্মদ ও শের-ওদাউল গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তাঁদের সম্মানার্থে ২৯শে জুন থেকে ১লা জুলাই কর্পোরেশনের সভা মূলতবি ঘোষণা করা হয়।^{৫৬}

৫৪. Ibid ; সংখ্যা ৯, নং ৫, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৮।

৫৫. Ibid ; সংখ্যা ১১, নং ১০, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০।

৫৬. Ibid ; সংখ্যা ১১, নং ১৬, ১৫ই মার্চ ১৯৩০।

৫৭. Ibid ; সংখ্যা ১১, নং ২৩, ১০ই মে ১৯৩০।

৫৮. Ibid ; সংখ্যা ১২, নং ৬, ২৮শে জুন ১৯৩০।

৫৯. Ibid ; সংখ্যা ১২, নং ৭, ৫ই জুলাই ১৯৩০।

৬০. Ibid . সংখ্যা ১২, নং ৭, ৫ই জুলাই ১৯৩০।

২৭শে আগস্ট : কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বেআইনি ঘোষণা এবং আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ আব্দারী, মদনমোহন মালব্য, ডি জে প্যাটেল সহ অন্যান্যদের গ্রেপ্তার ইত্যাদির প্রতিবাদে কর্পোরেশনের সভা মূলতঃবি করা হয়।^{৫৬}

২৯শে অক্টোবর : কর্পোরেশনের সভার এক প্রস্তাবে জগদহরলাল নেহেরুর গ্রেপ্তারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ঐদিনের মতো সভা বন্ধ করে দেওয়া হয়।^{৫৭}

৩রা নভেম্বরের সভায় জে. এম. সেনগুপ্তের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এই নভেম্বর পর্যন্ত সভা মূলতঃবি ঘোষণা করা হয়।^{৫৮}

১৯৩১

২ই জানুয়ারির সভায় গান্ধোয়ান ধর্মঘটের নেতৃব্ব দেবার অপরাধে কাউন্সিলার মদনমোহন বর্মনের গ্রেপ্তারের নিষ্পা করে সভা ১০ মিনিটের জন্য স্থগিত রাখা হয়।^{৫৯}

২৬শে, ২৭শে, ২৮শে জানুয়ারি—মেয়র হুভার বহুর নেতৃব্ব এক বর্ণাঢ্য মিছিল পুলিশ লাঠি চালিয়ে মেয়র সহ বহু নাগরিককে আঘাত হানার প্রতিবাদে কর্পোরেশন নিষ্পা প্রস্তাব গ্রহণ করে। পুলিশী নৃশংসতার ও হুভার বহুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ২৭ মে ছুলসহ কর্পোরেশনের সমস্ত দপ্তর বন্ধ রাখা হয়। ডেপুটি মেয়র সন্তোষ বহুর গ্রেপ্তারে তদন্ত কমিটি গঠন ও মোবীদেয় শাস্তি দাবি করেন। ২৬ মে থেকে ২৮ মে সভার কাজ স্থগিত রাখা হয়।^{৬০}

২৬শে ফেব্রুয়ারি কর্পোরেশনের কর্মীরা শহরে বিভিন্ন কর্পোরেশন দপ্তর জাতীয় পতাকায় সজ্জিত করে মেয়র দিবস পালন করে।

৫৬. Ibid ; সংখ্যা ১২, নং ১৫, ৩০শে আগস্ট ১৯৩০।

৫৭. Ibid ; সংখ্যা ১২, নং ২২, ১লা নভেম্বর ১৯৩০।

৫৮. Ibid ; সংখ্যা ১২, নং ২৩, ৮ই নভেম্বর ১৯৩০।

৫৯. Ibid ; সংখ্যা ১৩, নং ৬, ১০ই জুলাই ১৯৩১।

৬০. Ibid ; সংখ্যা ১৩, নং ৯ ও ১০, ৩১শে জানুয়ারি ও ৭ই ফেব্রুয়ারি

ঐদিন বিকালে কিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কর্মীদের সভায় মেয়রের প্রতি প্রজ্ঞা জানান হয়।^{৬১}

৩রা ও ২৮শে সেপ্টেম্বর—কর্পোরেশনের দুটি সভায় চট্টগ্রামে লুণ্ঠরাজ ও গুণামির প্রতিবাদ জানান হয়। এবং অনতিবিলম্বে বেসরকারি তদন্ত কমিটি স্থাপন করে দোষীদের শাস্তির দাবী জানান হয়।^{৬২}

৩০শে সেপ্টেম্বর—এর সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে ২৮ অক্টোবর সাড়িঘরে গান্ধীজীর ৬৩তম জন্মদিন পালন করা হবে এবং কর্পোরেশনের ফুল দুটি থাকবে। আনুগত্য সিদ্ধান্ত হয় যে গান্ধীজীর ছবিসহ এক স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁর বাণী সম্বলিত ঐ গ্রন্থ ছাত্রদের উপহার দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে বাবতীয় খরচ-খরচার অন্ত যোট ৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়।^{৬৩}

১৯৩২

২০শে জানুয়ারির সভায় জে. এম. সেনগুপ্তের প্রস্তাবে প্রতিবাদ জানান হয়।^{৬৪}

২৬শে জানুয়ারির সভায় জাতীয় স্বাধীনতা উৎসব পালনে পুলিশ কমিশনারের নিবেদনায় প্রতিবাদে নিন্দা প্রস্তাব নেওয়া হয়।^{৬৫}

কাউন্সিলর শরৎচন্দ্র বসুকে ৩ আইনে প্রেস্তার করা হলে প্রতিবাদে ১০ই ফেব্রুয়ারি কর্পোরেশনের সভা স্থগিত রাখা হয়।^{৬৬}

২৭শে মার্চের কর্পোরেশনের সভা সরোজিনী নাইডু ও মননমোহন মালব্যের প্রেস্তারের প্রতিবাদে ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।^{৬৭}

১৯২৮

কর্পোরেশনের শিক্ষক ইউনিয়ন কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব :

কলকাতায় ছাত্রদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিছিলে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে শিক্ষক সংস্থা ১১ই ফেব্রুয়ারি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে।^{৬৮}

৬১. Ibid , সংখ্যা ১৩, নং ১৩, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩১।

৬২. Ibid ; সংখ্যা ১৪, নং ১৫ ও ১২ এই সেপ্টেম্বর ও ৩রা অক্টোবর ১৯৩১।

৬৩. Ibid , সংখ্যা ১৪, নং ১২, ৩রা অক্টোবর, ১৯৩১।

৬৪. Ibid ; সংখ্যা ১৫, নং ৮, ২৩শে জানুয়ারি, ১৯৩২।

৬৫. Ibid ; সংখ্যা ১৫, নং ৯, ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৩২।

৬৬. Ibid ; সংখ্যা ১৫, নং ১১, ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২।

৬৭. Ibid ; সংখ্যা ১৫, নং ২১, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩২।

৬৮. File 126/1932, Note by Baker...

২৬শে ফেব্রুয়ারি শিক্ষক সংস্থার কার্যকরী সমিতির প্রত্যাখ্যানকারী সভা-সমিতি করার ব্যাপারে বি. পি. সি. সি.-কে সর্বপ্রকারে সাহায্যের প্রস্তাব নেওয়া হয়।^{১০}

১৯২৯

২৪শে মার্চের সভায় জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে শ্রমিক নেতা ও শিক্ষক রাধারমণ মিত্র ও কিশোরীলাল ঘোষের প্রেরণারের নিম্না করা হয়। এবং সভায় সিদ্ধান্ত হয় মামলা চলাকালীন ওদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।^{১১}

১৪ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা সচিব দ্বিতীয় চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শিক্ষক ইউনিয়ন প্রত্যাখ্যান গ্রহণ করে শহীদ বতীন দাসের প্রতি প্রত্যাখ্যান।^{১২}

৮ই ডিসেম্বর ৩০নং ওয়েলিংটন স্ট্রিটে শিক্ষকদের এক সভায় রাধারমণ মিত্রের মামলা চালাবার জন্য এক তহবিল খোলার সিদ্ধান্ত হয়। সভায় শিক্ষক ইউনিয়নের সম্পাদক জানান যে ইতিমধ্যেই ৮০ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।^{১৩}

১৯৩০

২৭শে জুলাই ইউনিয়নের এক বিশেষ সভায় বি. পি. সি. সি.-র নেতৃত্বে আইন অমান্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রস্তাব নেওয়া হয়। ঐ প্রস্তাবের অপর অংশে পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয় যেন তাঁদের দণ্ডাধেশকালে তাঁদের পরিবার পরিজনদের কষ্ট-লাঘবের জন্য তাদের কোন মনোনীত ব্যক্তিকে চাকুরিতে বহাল করা হয়।^{১৪}

২৮শে জুলাই প্রায় ২০শে শিক্ষকের উপস্থিতিতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে পৌরশিক্ষকরা দলবদ্ধভাবে আইন অমান্তে যোগ দেবেন।^{১৫}

৬৯. Ibid.

৭০. Ibid.

৭১. Ibid.

৭২. Ibid.

৭৩. Ibid.

৭৪. Ibid.

মহৎ-প্রাণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ

আবুল কজল

সুনীতিকুমারের মহাপ্রয়াণের খবর বখন কাগজে পড়েছিলাম তখন মধুসূদনের বহুল উচ্চারিত পঙ্ক্তিটিই মনে পড়েছিল ‘একে একে নিবিছে দেউটি’। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সহরের সংযোগ খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। আমাদের এ বাড়িলায় ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মধ্যে সে সংযোগ কিছুটা দেখতে পেয়েছিলাম। সুনীতিকুমারের অন্তর্ধানের পর পশ্চিমবাংলায়ও তেমন মাহুকের সংখ্যা কমে গেছে বলে মনে হয়।

আমার কর্মক্ষেত্র কলকাতায় ছিল না বলে সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার দীর্ঘ সংযোগ ও মেলা-মেশার তেমন সুযোগ ঘটেনি। কলে তাঁকে আমি খুব কাছে থেকে জানতে পারিনি।

১৯৪০-এ প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এম-এ পরীক্ষা দিতে আমি কলকাতা গিয়েছিলাম। যদিও আমি ঢাকার প্রাজুরেট—ঢাকা ও কলকাতা উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ-র পাঠ্যসূচি তুলনা করে আমি বুঝতে পেরে-ছিলাম, কলকাতার সিলেবাসই আমার পক্ষে অধিকতর অনুকূল হবে। তাই কলকাতার পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে সেভাবে প্রস্তুতি নিতে লাগলাম।

তখন আমি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার রত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িলা বিভাগের অধ্যাপকদের কারো সঙ্গে আমার আন-শোনা কিংবা পরিচয় ছিল না। ক্লাসের পড়াশোনা, ছাত্র কিংবা অধ্যাপক-দের সঙ্গে দেখা শোনা করে কিছু যে পরামর্শ বা নির্দেশাদি নেব তারও

উপায় ছিল না। প্রয়োজনীয় বইপত্র, ক্লাস-নোট ইত্যাদিও নাগালের বাইরে। সে সব পুঁথিতে নেওয়ার অল্প আমি কিছুদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম সঙ্গে এলেন পরীক্ষার মাসখানেক আগে আমার পরলোকগত বন্ধু আশুতোষ চৌধুরী। তিনি তখন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-সংগ্রাহক। ডক্টর বীনেশচন্দ্র সেনের অন্ততম প্রিয়পাত্র। আশুবাবু সঘণ্টে বীনেশ সেনের মন্তব্য : “সম্প্রতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এই ক্ষেত্রে বেকশ পরিচয় করিতেছেন, তাহা অতুলনীয়।...তিনি পন্নীতীর উদ্ধারকরে জীবনপণ করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত বহু পালাগান বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি ছাপাইতেছেন। এইসকল পন্নীতীতিকা সঘণ্টে বিশিষ্ট যুরোপীয় পণ্ডিতগণ যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন তাহা এছাড়া শেবে প্রাপ্ত ‘মত’ স্বীকৃত নিবন্ধে প্রাপ্ত।” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃ ৬১৪)।

আশুবাবুকে আমরা আশুদা ডাকতাম। আশুদার এবার আমার সঙ্গে কলকাতা আসার এক কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বলাবাহুল্য বাংলা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব অধ্যাপকই তাঁর পরিচিত আর সবাইর বাসস্থানের ঠিকানাও তাঁর জানা। বিশেষ করে বিশ্বপতি চৌধুরী ছিলেন তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিশ্বপতি বাবু বাড়ির সাক্ষ্য বৈঠকে তাঁর সঙ্গে আমাদেরও কয়েকবার হাজির হতে হয়েছে। তবে তাস-পাশা কিছুই আমি জানিনা বলে প্রেক্ষা নীরব দর্শক হয়েই বসে থাকতাম। তবে মাঝে মাঝে যে চা আসত তার অংশ নিতে ভুল করতাম না।

অনীতিবাবুর পেপারটা সঘণ্টেই আমার আতঙ্ক সবচেয়ে বেশি ছিল। কারণ ভাষাতত্ত্ব ব্যাপারটির সঙ্গে আমার কখন কালেও কোনো পরিচয় ছিল না। তবে কোনো শিক্ষক বা বিশেষজ্ঞের সহায়তা ছাড়া এ সম্পর্কে কিছু বইপত্র যে আমি পড়িনি তা নয়। অনীতিবাবুর বড় বইটা (Origin & Development...) চট্টগ্রাম কলেজ লাইব্রেরিতে পেয়েছিলাম, ওটার আমি চোখ বুলিয়েছি। ভাষাতত্ত্ব সঘণ্টে আমার বিচার লোক ঐ পর্বতই।

একদিন আশুদা আমাকে অনীতিবাবুর হিন্দুস্থান পার্কের ‘সুধর্মী’ নামক বাসায় নিয়ে গেলেন, উদ্দেশ্য তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া আর ভাষাতত্ত্ব সঘণ্টে তাঁর কাছ থেকে কিছু সলা-পরামর্শ নেওয়া। এ পণ্ডিত

ব্যক্তিটির সঙ্গে প্রথম আলাপেই আমার মন খুশিতে ভরে উঠল। পাণ্ডিত্য তাঁর কাছে শ্রেয় খোলস হয়ে থাকেনি, তাঁর মর্মমূলেও যেন তা বাসা বেঁধেছিল, তাঁর গোটা ব্যক্তিত্ব আর চরিত্র হয়ে উঠেছিল তাতে হীন্দিমান। ব্যক্তিগত জীবনে পাণ্ডিত্য আর বিস্তার প্রতিফলন খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সুনীতিকুমারে আমি তা দেখেছি।

সেদিন সুনীতিবাবুর বৈঠকখানায় ঢুকে দেখতে পেলাম নানা ভাবার বইপত্র যেমন এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে তেমনি নানা ধর্মের নানা বাণী, যার কোরান হারিশের উদ্ধৃতিও রাখা হয়েছে বাঁধাই করে টাঙিয়ে। কোন কোনটা রাখা হয়েছে মার্বেল পাথরে ধোঁয়াই করে।

এর কিছুদিন আগে আমার একটি ছোট উপস্থাপন, একটি গল্পসংগ্রহ ও একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, নাম বথাকমে চৌচির, মাটির পৃথিবী ও বিচিত্র কথা। এ সব বইর এক প্রস্থ উপহার দিলাম তাঁকে। এ তিনটি বই আমি রবীন্দ্রনাথকেও পাঠিয়ে ছিলাম। তিনি তখন চোখের অস্ত্রখে ভুগছিলেন। তবুও ‘চৌচির’ বইটি পড়েছিলেন এবং নিজের হাতে স্বস্বীয় এক চিঠি লিখেছিলেন আমাকে। পাছে এ চুলভ চিঠিটি হারিয়ে যায় কিংবা নষ্ট হয়ে যায় এ আশঙ্কা করে ঐ চিঠিটি আমি ঢাকা মিউজিয়ামকে পরে দিয়ে দিয়েছি। এখন তা ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

ধান ভানতে শিবের স্নাত হয়ে যাচ্ছে। বাই হোক আমি পরীক্ষা দিতে এসেছি শুনে কি কি বই পড়ব সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার পর বললেন: দেখুন আপনি মাস্টার মাস্টার, কোনো প্রকারে একটা সেকেন্ড ক্লাস পান কিনা দেখেন। এখানে নাইন্থ পেপার না কবলে ফার্স্ট ক্লাস মেলে না। আপনি ত আর তা করতে পারবেন না।

শুনে আমিও অবাক। নাইন্থ পেপার আবার কি। এম, এ-তে মোটমোট পেপারের সংখ্যা তেঁ আট। তিনিই বুঝিয়ে বলেন—নাইন্থ পেপার মানে অধ্যাপক আর বিভাগীয় অধ্যক্ষদের বাসায় বাসার ঘর দেওয়া, তোয়াজ করা, ফাই করমাস খাটা।

আমার আগের বছর ইব্রিস আলী নামে এক মুসলমান ছেলেও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। তখন বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন রায় বাহাদুর ঋণেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি কীর্তন-ভক্ত, কীর্তন-প্রিয় ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাসায় কীর্তনের আড্ডা বসত। কীর্তনের প্রতি আকর্ষণ থাক না-থাক অনেক ছাত্রও

তীয় এ কীর্তনের মজলিসে হাজির হতেন এবং ভাবে গদগদ হয়ে মাথা দোলাতেন। তখনই আমার পরলোকগত বন্ধু ইব্রাহিম আলীও ঐ সাক্ষ্য-মজলিসে হাজির থাকতেন।

আমরা থাকতে থাকতেই এক সাধারণ মুসলমান—মুখে অল্প দাড়ি, মাথায় সাধা কিত্তি টুপি, পরনে তলবন্ধ—তীয় সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সুনীতিবাবু বাইরে গিয়ে সামান্য ছ একটা কথা বলে লোকটাকে বিদায় করে দিলেন। ভিতরে এসে আমাদের বললেন : আমার বাবার আমল থেকেই এ লোকটা আর তার বাবা আমাদের বাড়িতে কয়লা সাপ্লাই করে আসছে। এখন হিন্দু দোকান-দারেরা এসে আমাদের অনবরত চাপ দিচ্ছে। বলছে ও মুসলমান, এবার আমাদের থেকে কয়লা নিন, ওকে ছাড়িয়ে দিন। দেখুন দেখি কাণ্ড। দেখলাম বিরক্তিতে তীয় চোখ মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। এর আগে কলকাতায় কয়েক দশা দালাদালায়া হয়ে গেছে। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ হয়ে উঠেছে তীব্রতর। আর সুনীতিকুমার তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি। অবশ্য এ বোধ করি ভ্রাম্যপ্রসাদ মুখার্জির চাপ এড়াতে না পারারই ফল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রাম্যপ্রসাদের অপ্রতিহত কমতা। আসলে সুনীতিবাবু ছিলেন পণ্ডিত মানুষ—রাজনীতি করতে গিয়েও পণ্ডিতের স্বভাব, স্বয়ংের মাহাত্ম্য ও মনের ঔর্ধ্ব ছাড়তে পারেননি কখনো।

চল্লিশে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করলাম। একচল্লিশে সরকারি কলেজে লেকচারার পদের অস্ত্র দরখাস্ত আবেদন করা হয়। পদটি মুসলমান প্রার্থীদের জন্য রাখা ছিল। তেঁকেজিটা ছিল তৎকালীন ইসলামিয়া কলেজে। আমিও দরখাস্ত করলাম। বধাসময় ইন্টারভিউর ডাক পড়ল। ইন্টারভিউ হবে রাইটার্স্ বিল্ডিংয়ে ডি. পি. আই অফিসে। ডি. পি. আই-এর সভাপতিত্বে। বিশেষজ্ঞ এক্সপার্ট হিসেবে থাকছেন ভক্তির সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর কাজী আবদুল ওহুদ। ওহুদ সাহেব ঢুকলেন বগলে একগাদা বই নিয়ে। ইন্টারভিউতে দু-একটা মৌলিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে এ ছিল আমাদের ধারণা—ওহুদ সাহেবের বগলে বইয়ের গাঁদা দেখে আমরা প্রায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কোন্ বই থেকে কি জিজ্ঞাসা করে বলেন কে জানে। কাজেই বৃকের নুকনুকানি বেড়ে গেল সবাই-এর। বধাসময় আমার ডাক পড়তেই কশ্মিরি আশামীর মতো গিয়ে ঢুকলাম। সামনে রক্ষিত শূন্য চেয়ারখানির উপর বসতেই আমি ফিরে পেলাম আমার আত্মবিক আঙ্গুপ্রত্যয়। পকেট থেকে রবীন্দ্রনাথের বহুত্রে লেখা চিঠিখানি বের করে বাড়িয়ে দিলাম বিশেষজ্ঞদের দিকে। একরকম হেঁ

যেহেতু সুনীতিবাবু চিঠিখানি তুলে নিয়ে চেয়ারে ভালো করে গা এলিয়ে দিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

ওহুদ সাহেব ‘সেধনাদ বধ’-এর একটা স্থান নির্দেশ করে বললেন : পড়ুন। পড়ার পর এবার রবীন্দ্রনাথের ‘সকরিতা’ খুলে ‘কর্ণকৃতী সংবাদ’ নির্দেশ করে আবারও বললেন : পড়ুন। পড়লাম।

উপস্থিত ছিলেন মুসলিম শিক্ষার এ. ডি. পি. আই খান বাহাদুর আবদুল রহমান—তিনি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি কালতু প্রশ্ন করলেন। সে সব প্রশ্নেরও বখাষোগ্য উত্তর আমি দিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য এ সব ব্যাপারে খান বাহাদুরের আমাদের জব্ব করতে পারার কথা নয়। ডি. পি. আই (খুব সম্ভব বনমলী সাহেব) এবার সুনীতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন : আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করবেন? সুনীতিবাবু জানালেন : না। আমি ঠর বই পড়েছি, আমার প্রশ্ন করার দরকার নেই। স্বস্তির নিশ্বাস কেলে বেরিয়ে এলাম। পরে ওহুদ সাহেবের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম আমার ইন্টারভিউ সব চেয়ে ভালো হয়েছিল, তবে যেহেতু একজন ফার্স্ট ক্লাস রয়েছেন আর যে কলেজের অন্ত্র লোক নিয়োগ করা হবে সে কলেজে তিনি সে পদেই কাজ করছেন এবং কলেজের অধ্যক্ষও তাঁর সপক্ষে মত দিয়েছেন—কাজেই সরাসরি এবার আপনাকে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। যদিও বিশেষজ্ঞদের অন্ততম ডক্টর সুনীতিকুমার মত দিয়েছেন : কলেজীয় অধ্যাপনার অন্ত্র ক্লাস থেকে পাণ্ডিত্য আর অবদানকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এর মধ্যে আমার তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে এ কারণেই বোধ করি সুনীতিকুমার এ মন্তব্য করেছিলেন আমার অল্পকালে।

পণ্ডিতপ্রশস্ত সুনীতিকুমারের সঙ্গে এ আমার শেষ দেখা। এবার আমার চাকুরি না হলেও, নির্বাচনী কমিটি আমার অল্পকালে যে সুপারিশ বেঞ্চে গেছেন তাঁর দ্বারা কয়েক মাস পরে কলকাতার কলেজে বধন ভেঙেছি হয় আমাদের সেখানে নিয়োগ করা হয় আর কোনোরকম ইন্টারভিউ ছাড়াই। আমার পরম সৌভাগ্য সুনীতিকুমার দীর্ঘকাল আমাকে মনে রেখেছিলেন। এর মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে গেছে, আমি চট্টগ্রাম কলেজে বদলি হয়ে এসেছি। দেশ ভাগ হয়েছে। দেশভাগ তথা পাকিস্তান হওয়ার বেশ কয়েক বছর পরে তাঁর পুত্রের বিয়ে—এ খবর আমার জানার কি রাখার কথা নয়। হঠাৎ দেখি চট্টগ্রাম কলেজের ঠিকানায় আমার নামে এক নিমন্ত্রণপত্র এসে হাজির।

সাহিত্য বিষায়ন আবহুল করিম সাহেবের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে তাঁকে আমি একখানা চিঠি লিখেছিলাম। সে চিঠিখানা পেয়ে ১৯৫৩র ১৮ই নভেম্বর তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা এখনো আমার কাছে আছে। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সভাপতি। সে চিঠিখানি উদ্ধৃত করেই তাঁর স্মৃতিচারণ করছি।

চিঠিখানি তাঁর মূল্যিত প্যাডেই লেখা—বার এক পাশে তাঁর নাম ও পরিচিতি অন্য পাশে ঠিকানা আর তাবিখ রয়েছে। দুই ই ইংরেজিতে।

১৮ই নভেম্বর, ১৯৫৩

অধ্যাপক জনাব আবুল ফকর এম-এ সমীপে,

চট্টগ্রাম

প্রিয়বরেষু,

আপনার ২০।১০।৫৩ তারিখের পত্র বধাসময়ে পছঁ ছিযাছে, কিন্তু আমার পাইতে দেয়ী হইযাছে। উত্তর দিতেও দেয়ী হইল। আমি ২০শে তারিখে কলিকাতা হইতে দিল্লী যাত্রা করি, দিল্লী হইতে গোয়ালিয়র (বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার পবিচালকদিগের এক সম্মেলন উপলক্ষ্যে) গোয়ালিয়র হইতে দিল্লী হইয়া আমেদাবাদ-শুজরাট (১৭শ নিখিল ভারতীয় প্রাচ্যবিজ্ঞা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে যাইতে হয়), পরে আবার দিল্লী হইয়া ৭ই নভেম্বর কলিকাতা ফিরি। ১০ই হইতে আমার একমাত্র পুত্রের streptococcal infection হইয়া আশঙ্কাজনক পীড়া হয়। তাহাতে ৩৪ দিন আমাদের বিশেষ চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। উপস্থিত দৈববের কৃপায় সে এখন ভাল আছে। অন্নপণ্য করিযাছে। এ ছাড়া আমাদের বিধান পরিষদের অধিবেশনও শুরু হইয়া গিয়াছে। এই সব কারণে প্রায় ২০।৬০ খানি পত্র জমিয়া গিয়াছে। আপনার পত্র পাইয়া পুরাতন বন্ধুর নিকট হইতে বহুদিন পরে সংবাদ পাইয়া যেমন একদিকে খুশী হইলাম অন্যদিকে তেমনি আমার এক পরম প্রহ্লাস্পদ মিত্রের তিবোধানের সংবাদে মন বড়ই বিফ্র হইয়া পড়িল। প্রক্বে আবহুল করিম সাহেবকে আমি আমার ছাত্রাবস্থা হইতে জানি। তিনি যে কেবল মাতৃভাষার একজন অক্লান্ত সেবক ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার মত একপ সংস্কৃতিপূর্ণ মানুষ সব সমায়েই তুলভ। আমার গৃহে তাঁহাকে বার দুই পাইবার সৌভাগ্য আমার হইযাছিল। তখন তাঁহার বয়স সত্তরেরও উপর। আমার বাড়ীতে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির লেখ দেখিয়া ঐ প্রাচীন বয়সেও উক্ত লিপি

আয়ত্ত করিবার দিকে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখিলাম, সমগ্র লিপি আমি তাঁহার অন্ত লিখিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত লিপিতে তাঁহার নাম “আবুল করীম সাহিত্য বিশারদ” (এখানে ত্রেকোটে ‘ঐ’ নাম ব্রাহ্মী লিপিতে লিখে দিবেছিলেন) লিখিয়া দেওয়ারও তিনি বড়ই খুশী হইলেন। পরে কতকগুলি পুঁথির পাতার পাঠোদ্ধারের অন্ত তিনি আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহা জীবনের আদর্শ ছিল এই—অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিভ্রামক্ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেন মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ—প্রাজ্ঞজন যখন বিভ্রা অর্জন বা অর্থোপার্জনে নিযুক্ত হইবেন, তখন মৃত্যুর কথা ভাবিবেন না—এমনভাবে তিনি বিভ্রা ও অর্থের সাধনা করিবেন যেন তাঁহার অরা ও মৃত্যু কখনো হইবে না; কিন্তু ধর্ম আচরণের বেলায় অতি ক্রুত তাঁহাকে কার্য করিয়া বাইতে হইবে—যেন মৃত্যু আসিয়া তাঁহার মাথার চুল ধরিয়া টান দিতেছে আর সময় নাই।” হারিসের ছুইটা বড় বড় উক্তিও তিনি নিজের জীবনে সার্বজন্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—“উতম্ব্ অল্ ইল্ম, ব্ লব্ কান বি-ব্ খীন”—‘জ্ঞানের অন্বেষণ কর, এমন কি চীন দেশ পর্যন্ত পিয়াস্তা ও “আল্লালুমা, জিদনী ইল্মন”—হে ঈশ্বর, আমাদেয় জ্ঞান বাড়াও।’

আমাদের বড় ছঃখ হয়, আমরা পক্ষীরাজ ঘোড়াকে দিয়া মালগাড়ী টানাইয়া তাহার চূর্ণণা করিলাম। অবিভক্ত বঙ্গরাজ্যে বোধ হয় আবুল করীম সাহেবকে সামান্য একটি সাহিত্যিক বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই সম্পর্কে বলাশাধ্য আমার বাহা করিবার তাহা করিয়াছিলাম। সারাজীবন আকিসের কেরাণীপিরি ছাড়িয়া যদি ইঁহার মন ও প্রাণ বাহা আকাজ্ঞা করিত, সেই সাহিত্য সেবার যদি ইনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কতকগুলি পুস্তক সম্পাদনা করা ও প্রাচীন পুঁথির বর্ণনা লেখা ছাড়া সার্থক ভাবনা ও চিন্তার প্রকাশক উচ্চকোটির স্রজনীশক্তির পরিচায়ক সংসাহিত্য দ্বারা তিনি বাঙালা সাহিত্যোন্মোচনের আরও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া বাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তো হইল না। তাঁহার জ্ঞানলিপা ও পাণ্ডিত্য তাঁহার উদারতা ও অমায়িকতা, তাঁহার সারল্য ও সৌজন্য—এই সকল গুণ তাঁহার পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়াছে। আশাকরি চট্টগ্রামের অধিবাসীবর্গ তাঁহার স্মৃতির উপযুক্ত সন্মান করিবেন। এখানে অনেকে তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ পান নাই বা রাখেন নাই। আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়কে জানাইয়া দিয়াছি।

কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বামগণতান্ত্রিক মোর্চা

আশীষ বর্মন

ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুর্ভাগ্য যে তাঁদের পারম্পরিক আদান-প্রদানের স্বয়ং প্রায়শ আক্রমণাত্মক। যে স্বরে শত্রুর সঙ্গে লোকে কথা কয়, অনেকটা সেই চড়া গলার বেহেতু অনেক সময় কমিউনিস্টদের বিতর্ক ঘটে, তাই সাধারণ শ্রোতারা প্রায়ই বোঝেন না যে ঘটনাচক্রে আজ, সি-পি-আই—সি-পি-আই-এম-এম মধ্যেই শুধু নয়, এমন-কি ভূতপূর্ব নকশালগ্নীদের বৃহৎ অংশও, পারম্পরিক ভেদাভেদের চাইতে, ঐক্যের মৌলিক নুজই বেশি ভারি।

এই ঘটনাটা স্পষ্ট হচ্ছে দু-দিক থেকে। প্রথমত ক্ষত-বিক্ষিত সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং দ্বিতীয়ত দুই কমিউনিস্ট পার্টির সম্প্রতি অচলিত কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলিতে। এবং যেহেতু তৎপন্ন দিগদর্শন ভিন্ন কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তি অথবা দুর্বলতা কোনোটাই শেষ পর্যন্ত বোঝা দুকর, তাই সম্পটভাবে হলেও আপামর জনসাধারণ কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কংগ্রেসের গুরুত্ব বুঝতে আরম্ভ করেছেন।

এবারের সি-পি-আই কংগ্রেসের কৌশলগত আভির বীকৃতির গুরুত্ব এই নুজই সমধিক। তাঁরা আজ নির্দিষ্ট মানে যে, গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির বিকাশ ও শিকড় শক্তিশালী করার দায়িত্বেই, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পর, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পথত্যাগ দাবি করা পার্টির অবশ্য কর্তব্য ছিল। অধিকন্তু অকুরি অবস্থার সুযোগে, সে মুহূর্ত থেকে শ্রীমতী গান্ধী ব্যক্তিত্বের দিকে ঝুঁকছিলেন এবং অন্তর্দিকে

জনবিরোধী ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হন, তখন থেকেই পার্টির উপর সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার নীতিগত দায়িত্ব বর্তায়। সে দায়িত্বের ফুঁকি সি-পি-আই জরুরি অবস্থার শেষের দিকে মাত্র নেন। এই ফুঁকি নেওয়ার একটি প্রধান শর্ত ছিল নিজস্ব প্রতিরোধের প্রস্তুতিতে অগ্রান্ত বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিকে সামিল করা, জন-বিরোধী এবং ধৈর্যতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিপক্ষে।

অন্তর্গত, সি-পি-আই-এম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রত্যাব আজ এক নতুন ও স্পষ্ট দিগন্তের সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। এ-সম্ভাবনার দ্বার, ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিস্তারিত পর, ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা দেয় নি। কেননা এ-পার্টি বাম-গণতান্ত্রিক মোর্চার কথা অস্বীকারে উচ্চারণ করলেও, সে-উচ্চারণ কখনো ইদানিংকার প্রত্যক্ষ স্পষ্টতা অর্জন করে নি। অর্থাৎ অতীতে এই আলোচ্য বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির অবস্থান অগ্রান্ত কোথায় মেলে, কোন্-কোন্ রাজনৈতিক-সামাজিক দল ও সংস্থার তা সি-পি-আই-এম অপরিষ্কার রেখে দেন। এতই অপরিষ্কার যে, কাছক্ষেত্রে, গণ-সংগঠনে, আন্দোলনে বা রাজনৈতিক পদক্ষেপে শত্রু-মিত্রের অবস্থান বোঝা মুশকিল হত। প্রায়শই ঘটনাচক্রে, সাময়িক বন্দোবস্তে, ঘেঁষল ও সংস্থান্তলি সি-পি-আই-এম-এর সঙ্গে কোনো-না-কোনো সমঝোতার আসত, যেমন পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭-৬৯ সালে, অথবা বিভিন্ন কালে কেরালায়, তামিলনাড়ুতে বাম কিংবা গণতান্ত্রিক মনে হত তাঁদের নিজস্ব সম্পষ্ট সংজ্ঞায়। অগ্রসরের বিপরীত পক্ষ।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির হালের কংগ্রেসের যে বিশাল অবদান, তা হল আলোচ্য সম্পষ্টতা পরিহার। এ-পার্টির সাম্প্রতিকতম রাজনৈতিক প্রত্যাব, যা দশম কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছে, তা কেবল বাম-গণতান্ত্রিক মোর্চার উদ্বোধনেই অঙ্গীকৃত নয়, উপরন্তু এই শক্তিসমূহের অবস্থান সম্বন্ধে পরিষ্কার আলোকপাত করেছে। বলেছে “জনতা পার্টির ভিত্তিকার বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে রয়েছে তরুণ তুর্কিরা, র্যাডিক্যাল কংগ্রেসিরা, সোভিয়েট পার্টির সদস্যবৃন্দ, একক ও দলহীন ব্যক্তিরা...” (ইংরিজি প্রত্যাব থেকে অনূদিত)

তার অর্থ এ নয় যে এ-পার্টির রাজনৈতিক দৃষ্টিতে কেবলমাত্র জনতা পার্টির মধ্যেই এই মিত্রপক্ষ আবদ্ধ। এ শক্তির অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেন্ড ইউনিয়ন, কিশাণ সভা, সি-পি-আই, ক্ষেত্রেজুর সংগঠন, অগ্রান্ত বামপন্থী

দল ও সংস্থা এবং কংগ্রেস দলেরও প্রগতিশীল অংশ। সি-পি-আই-এম-এর রাজনৈতিক প্রত্যাবের বয়ানে, শেখোক্ত শক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে “কিন্তু (কংগ্রেস পার্টিতে) এমন শক্তি বর্তমান যাঁরা কেবল ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারের বিপক্ষে নয়, পরন্তু সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল অবস্থানও গ্রহণ করেন। এই সমস্ত শক্তিকে বন্ধুত্বের মাধ্যমে বাম ও গণতান্ত্রিক কার্যক্রমে সাশিল করা প্রয়োজন” (ইংরিজি থেকে অনূদিত)।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এই নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বেশেয় হালের ঘটনাবলিতে সম্পূর্ণ সমর্থন পায়। কংগ্রেসের বিভাগ, শাসক দলের আদর্শগত, তীব্র বিরোধ, এবং আজ না হোক কাল জনতা দলের দু-খণ্ড হয়ে যাওয়ার আশু সম্ভাবনাতেই শুধু এ সমর্থন মেলে না। উপরন্তু এ, কে অ্যান্টোনিয় নেতৃত্বে কেরালার কংগ্রেস দলের স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী প্রগতিশীল ভূমিকাও, বাম গণতান্ত্রিক মোর্চার পবিত্র্য। এবং বলাই বাহুল্য যে, সি-পি-আই-এম-এর এই সাম্প্রতিক রাজনৈতিক দৃষ্টি-কোণের সঙ্গে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ভাবেরও মৌল মিল বর্তমান।

তবু কেন এই দুই কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বাম গণতান্ত্রিক শক্তি-আজো কেরালার এক অতিম মোর্চার অন্তর্গত নয়, তার কারণ মূলত দুটি। প্রথমত গত চৌদ্দ বছরের ঐতিহ্য, অর্থাৎ দুটি পার্টির মধ্যে বন্ধুত্বের থেকে বৈরিত্যের আধিক্য এবং দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্কে সম্ভবত সে-পার্টির কিছু অংশের অনভ্যস্ত সংশয়। অতীতের পরিশ্রেক্ষিতে এ-সংশয় স্বাভাবিক; কিন্তু তথাপি ক্রমেই যে উভয় পার্টি ও তাদের গণ-সংস্থাদের মধ্যে আদান-প্রদানের ক্ষত সেতুবন্ধন ঘটছে তা স্পষ্ট। এবং যেটা আজো উৎসাহ-ব্যঞ্জক তা হল বে-আলোচ্য সেতুবন্ধন প্রক্রিয়া, অন্তত ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে। গণসংস্থার ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র কমিউনিস্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, পরন্তু অন্যান্য দলের গণ-সংগঠনগুলিকে জড়িয়ে-নিচ্ছে। সিটু, এ. আই. টি. ইউ. সি. আই. এন. টি. ইউ. সি প্রভৃতি গণ-সংগঠনগুলি একত্রে মিলিত হয়ে ভারতবর্ষের নানা স্থানে হালে কিছুকাল সংগ্রামে লিপ্ত এবং ক্রমশই সে-মৈত্রী বৃহত্তর আকার নিচ্ছে।

এমন-কি কেরালা রাজ্যেও সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং জনতা

পার্টির ভাষাভোলের সূত্রে, নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সেই সূত্রেই কেহলা বিধানসভায়, গত ৭ই জুলাই তারিখে মার্কসবাদী পার্টির সম্মত-সভা, শ্রী পি. করুণাকরণ জনসংঘ আর-এস-এলের ক্রমবর্ধমান বিপদ ও নষ্টাবির প্রতিবাদে এক প্রস্তাব আনেন। এবং সে-প্রস্তাব সরকারি ও বিরোধী পক্ষের অন্তর্গত সমস্ত বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির বিপুল সমর্থনে গৃহীত হয়। সংসদের বাইরে ভূতপূর্ব নকশালপহীরাও এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।

নকশালপহীরের অনেক অংশই আজ বিহার পশ্চিমবঙ্গ পঞ্জাব ও অন্ধ্র, একদিকে গণ-সংগঠন তৈরির কর্মে মগ্ন এবং অন্যদিকে সবরকম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির সম্প্রসারণেও। তাঁরা অনেকেই সংসদীয় দলের নির্বাচন ও পঞ্চায়েতি নির্বাচনেও নেমেছেন, গণতন্ত্র সম্প্রসারণের ভিত্তিতেই। অবশ্য এঁদের মধ্যে এখনো বিভিন্ন বিতর্ক ও মতান্তর আছে, এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ছুটির মতো প্রাক্কল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ এখনো এঁদের অস্থপস্থিত।

কিন্তু কংগ্রেসের ছু-টুকরো হওয়ার পর, আজ জনতা পার্টির অন্তর্বিরোধও যখন অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরুদ্ধে সেই পার্টিরই গণতন্ত্রী ও প্রগতিশীলদের লড়াইয়ে পরিণত, তখন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংকীর্ণতা কাটিয়ে ওঠা কষ্টসাধ্য নয়। এবং ইহানিং এক্ষেত্রে বিকাশের বিপুল সুবিধে এখানেই যে ছই বহু কমিউনিস্ট পার্টিই আজ তাঁদের বাইরের বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার উপনীত, যে ধারণার পিছনে তাঁদের পার্টিগত তাত্ত্বিক সমর্থন বর্তমান।

এই পরিস্থিতিতে বতাই একাধারে চন্দ্রশেখর, বহুগণা, অগজীবন রায়, মোহন ধাড়িয়া ও সোশ্যালিস্টদের কেন্দ্র করে জনতা দলে একটি শিবির তৈরি হবে, ও অন্যপাশে থাকবে চরণ সিং-জনসংঘ আঁতাত, ততই জনতার বাইরের অসাম্প্রদায়িক বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিও একটি বৃহৎ মোর্চার আসতে বাধ্য। সে-মোর্চার সহযোগী শক্তি হিসেবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবদান ততোটাই গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সম্ভব বতটা কমিউনিস্টরা ছোটখাটো বিতর্ক ফুলে একটি সংহত, পরাক্রান্ত রূপ নেবে।

এই সংহত ও শক্তিশালী বামপন্থী রূপের ছুটি স্তর প্রত্যেক হওয়ার সম্ভাবনা। রাজনৈতিক স্তরে সেটা এক বৃহৎ বাম-গণতান্ত্রিক মোর্চার চেহারা

পেতে পারে, এবং জনগণের মধ্যে গৃহসংগঠনগুলির কর্ম এবং লড়াইয়ের মাধ্যমে পেটাকে আরো সুসংস্থিত আকারে আনা সম্ভব।

এ-ছাড়া কর্তব্যেই মুখ্য ভূমিকা অতঃপর ঐক্যবদ্ধ কমিউনিষ্ট আন্দোলনের উপর বেশি-বেশি বর্তানোর সম্ভাবনা। কেননা, আমাদের বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, সংকীর্ণতাবাদ পরিহার করতে পারলে, এক বৃহৎ বাম-গণতান্ত্রিক মোর্চার সংজ্ঞা নির্ণয় থেকে আরম্ভ করে সে-মোর্চার বিপ্লবশ্রমের দৃষ্টিকোণও; মুক্তমন কমিউনিষ্ট আন্দোলন থেকেই উৎসারিত হওয়া আবশ্যিক। এবং যেহেতু সাময়িকভাবে কেন্দ্রীয় শাসক দলগুলির বিভিন্ন পৌত্তালিক ও সমঝোতার বেশজ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সর্বব্যাপী সংকট মেটার নয়, বরং ক্রমে আরো ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা, তাই ভারতীয় বামগণী শক্তি একমাত্র সংকীর্ণতাবাদ ও অর্থহীন আত্মহননেই নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ব্যর্থ হতে পারেন।

এ-কথা আরো স্পষ্ট হয় বাম-গণতান্ত্রীদের আন্তর্জাতিক কর্তব্যের সম্ভাবনাই-কি-ভাবেই। অর্থাৎ অবিলম্বে, দুই কমিউনিষ্ট পার্টির মৌল তত্ত্বের সম্পূর্ণ সমর্থনে, ত্রায়সঙ্গত সমঝোতার ভিত্তিতে এক বৃহৎ বাম-গণতান্ত্রিক মোর্চার গঠন সম্ভব। এ-সম্ভাবনা শুধু যে কেরালা পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার ভবিষ্যতই উজ্জ্বল করবে তা নয়, উপরন্তু কালবিলম্ব বিনা, কংগ্রেস ও অন্তরায় বর্তমান অস্ত্রবিরোধের সঙ্গে সঙ্গে, দ্রুত অস্ত্রান্ত রাজ্যেও, বেমন আসাম, বিহার, অন্ধ্র-প্রদেশ প্রভৃতিতেও, এক সর্বভারতীয় বাম-গণতান্ত্রিক মোর্চার প্রবল সাক্ষ্য দেবে। এমনিতেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বর্তমান অর্নেকোয় মধ্যেও, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বাম-গণতান্ত্রী শক্তি, কি কংগ্রেসে কি অন্তরায়, জনসংঘ-আর-এস-এস ও চরণ সিং আঁতাতের বিপক্ষে বিভিন্ন রাজ্যে তো বটেই এমন-কি কেন্দ্রেও দ্রুত সংহতি পাচ্ছে। এ-সংহতির ছাড়া লক্ষ্য অভিন্ন প্রয়াসে সংযুক্ত; এক প্রাণীণ ধনী ও অগণতান্ত্রী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ঠেকানো এবং দুই শ্রীমতী গান্ধীর বৈরতান্ত্রিক পুনরুত্থান-অবরোধ।

অন্যদিকে আলাদা ছাড়া কর্মই কেবল শ্রীমতী গান্ধীকে আইনি-শান্তিতে আবদ্ধ রেখে সম্ভব নয়। এ-শান্তির ইহানিংকার সবচেয়ে সরল, হোতা, চৌধুরী চরণ সিং, অকস্মিক অবস্থা লাভ হওয়ার মাত্র দশ দিন আগেও, শ্রীমতী গান্ধীকে আত্মপত্যের লিপি পাঠিয়ে ছিলেন, এবং আবার শোনা যাচ্ছে তাঁর দৃঢ়তা, শ্রীমতীর ভৃত্য-সদৃশ চেলাচামুণ্ডা দারফৎ, আবাদ-প্রদানের পথ খুলেছেন।

সুতরাং চরণ সিং-অনসংঘ ও শ্রীমতী গান্ধীর পুনরুত্থান ঠেকানো কেবল কোর্ট-কাছারির কর্ম নয়, তার অস্ত্রে প্রয়োজন যুগপৎ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমাবেশ ও সংগ্রাম। এবং এই সমাবেশ ও সংগ্রামকে কার্যকর করতে হলে হাত-পা গুটিয়ে শুধু অন্তা ও কংগ্রেসের বাহ্য-গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের কাছাকাছি আসার প্রক্রিয়া, অবলোকনই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের কর্তব্য নয়, বরং সে-মোর্চার অন্ন ও সঠিক বিবর্তন, কমিউনিষ্টদের নিহুল পথ নির্দেশের মূখ্যপেশী। অস্ত্রধার্য যেটা অচিরে ঘটায় সম্ভাবনা তা আর-এক ধরনের বিক্লিষ্ট, এলোমেলো সমঝোতা, যা বাহ্য-গণতান্ত্রিক মোর্চা থেকে পৃথক, হয়তো তার বৈরিণ।

কাজের মেয়েরা

বেলা বন্দোপাধ্যায়

কাজের লাইম থেকে লাইমের কাজে

গত আত্মসমীক্ষার 'পরিচয়'-এ 'কাজের মেয়েরা' সিরিজে দেহজীবিনী মেয়েদের যে-কাহিনী শুরু করেছিলাম, সেই পর্ব বর্তমান সংখ্যায় শেষ করব আরও তিন চারটি মেয়ের কথা বলে। এদের প্রত্যেকেরই এই পেশাতে আসার কারণগুলি ভিন্ন ভিন্ন।

বীণা ('পরিচয়', আত্মসমীক্ষা ১২৮ সংখ্যা) তার পরিবারকে বাঁচাতে রোজগারের আশার কলকাতা এসেছিল, উদ্দেশ্য বাড়ির কাজটান করা। দালালের ধসে পড়ে সে এসে ওঠে নিবিড় পরীতে। তার কল্প কাহিনী আপেই বলা হয়েছে। বাকি চারজনের মধ্যে মিনতি চক্রবর্তী বেচ্ছার এসেছে লাইমের কাজে (বেড়াবৃত্তি) পরিবার ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লেহাদ বোষণা করে। আনোয়ারা খাতুনের আসার কারণ দারিদ্র্য এবং মায়ের প্ররোচনা। অমরপুর্ণা গোড়া থেকেই খেটে খাওয়া মেয়ে—সে এসেছে নিয়োগ-কর্তার আচরণের শিকার হয়ে। হুদামা এসেছে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করে।

মিনতি

"হ্যাঁ, লাইমের কাজে বেচ্ছার এসেছি। আমাকে কেউ তুলিয়ে নিয়ে আসেনি।" বেশ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে মিনতি চক্রবর্তী। বয়স পঁচিশ। ছুস ফাইন্ডাল পাশ। পাঁচ বছর ধরে এই পেশায় যুক্ত আছেন। শৈশবে মাকে হারিয়ে সৎমায়ের সংসারের দানি ঘোরাচ্ছিল। সৎমা কি-বছর একটি করে সন্তান প্রসব

করেই সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পন্ন করত। তার পক্ষে সংসারের আর কোনো দায়িত্ব বহন করা সম্ভব ছিল না। মিনতি শৈশব থেকেই সংসারের পঙ্কনা সহ করে আসছে। সে দেখতে ভালো না—তাই প্রায়ই সংসার কটুক্তি সহ করতে হয়। “এই তো রূপের ছিঁড়ি। এমন কুচ্ছিন্ন মেয়েকে কোন রাজপুত্র বিয়ে করবে তুমি? খেটেই বখন খেতে হবে তখন পরের বাড়ি বি-গিরি না করে নিজের বাড়িতে কাজ করা কি এতই অসম্মানের? পেটের ভাত আসবে কোথেকে? আমি কি পারি এতগুলো কচি-কাঁচা নিয়ে সংসারের হাল ধরতে?”

“কুচ্ছিন্ন, কুচ্ছিন্ন” এই এক কথা বার বার শুনে মিনতির নিজের ওপরে ঘেঁষা ধরে যায়। বাবা সরকারি আশিনে ছা-পোষা কেরাশি। ব্যক্তিস্বের অভাবে বাড়িতে দ্বিতীয় পক্ষের জ্বর কাছের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। মহিলার হাজিরো অত্যাচারের প্রতিবাদ করার সাহস পর্বত নেই। বুকভরা অভিমান ও ক্ষোভ নিয়ে মিনতি মুখ বুজে সংসারের সন্ধান মাছুর করে, করে সংসারের দাবতীয় কাজ। মিনতি পড়াশুনা করতে ভালোবাসে—সেই পড়াশুনাও ছাড়তে হয়েছে “ভুলের মাইনে আসবে কোথেকে” এমনতর সব ধোঁটার। কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও মিনতি গোপনে পড়াশুনা চালিয়ে যায়। এই দুঃসহ পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার আশায় সারাদিন হাড়ভাঙা ষাটুনির পর সকলে ঘুমিয়ে পড়লে মিনতি বেশি রাত পর্বত পড়াশুনা করে। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে গোপনে সাহায্য নেয়। অবশেষে সত্যিই একদিন মিনতি সকলকে চমকে দিয়ে তৃতীয় বিভাগে স্কুল কাইনাল পরীক্ষা পাশ করে। সংসা জানতে পেয়ে তেলে-বেগুনে জলে গুঠে। এমনই অদৃষ্ট বাচ্চা বিদ্রোহে সে বখন হাসপাতালে, ছুঁড়ির পরীক্ষাটাও তখনই পড়ে যায়। কলে বাড়িতে বাধা দেবারও কেউ থাকে না। ভাবনা হয়—লেখাপড়া জানা সংসারে চাকরি নিয়ে বহি চলে যায়, তার ছ-সাতটি সন্তানের লালন-পালনের তার নেবে কে? রাগে উন্মাদ সংসা ছুতো খুঁজে নিজের কচি ছেলেমেয়েদের মারধোর শুরু করে। মিনতি ছুটে গিয়ে বাধা দিলে অঘোষ পেয়ে মহিলা মিনতিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। মেয়েদে রাধা কঁাসার থালার ওপর সে ছিটকে পড়ে। কপাল কেটে ময়ময় করে রক্ত পড়তে থাকে। জান হতে বুঝতে পারে সে তার নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে। কপালে অসহ বয়স। অসহ্য করে মাথার ওপরে একটু স্নেহের স্পর্শ। অবাধ হয়ে চেয়ে দেখে সজল নদনে বাবা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে, মাথার হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মিনতি ভাবে বাচ্চা

এত সাহস এলো কি করে ? চা চা করে বাড়িতে ছুটো বাজে । মিনতি বোঝে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে বাবা অন্ধকার রাতে লুকিয়ে মেয়ের কাছে এসেছে । না-এসে থাকতে পারে নি । মিনতির শুকিয়ে বাওয়া বুকের ভেতরে কঙ্কর রাখা বইতে থাকে । চোখে নেমে আসে অল । মিনতির বাবা মেয়ের কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলে—“বিহু তুই কলোজে ভর্তি হ । আমি যেভাবেই পারি মাইনে দেব । কেবল ঘেণিল তোর মা যেন টের না পায় । তাহলে আর রক্ষে থাকবে না ।” অকস্মাৎ মিনতির বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কঠিন হয়ে যায় । চোখে অল । প্রায় আত্মনাশ করে ওঠে—“না বাবা, মেয়ে হয়ে নিজের বাবার কাছ থেকে চোরের মতো সাহায্য নিতে পারব না । আমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই ।” মিনতি বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে । বুঝতে পারে বাবা মাথা হেঁট করে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । সেই রাতেই মিনতি সিঁদান্ত নেয় এ বাড়িতে আর একদিনও না । সকাল হতেই মিনতি সোজা চলে যায় পাড়ার প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে । ঐ স্কুলেই একটা কাজের অভ্য হাতে পায়ে ধরে প্রার্থনা জানায় । বছর দুই আগে প্রধান শিক্ষকের পত্নী বিয়োগ হয় । পাড়ায় তার চরিত্র সম্বন্ধে একটু জর্নাম আছে কেনেও মিনতি পরোয়া করে না । প্রধান শিক্ষক কাজের আশ্বাস দেয় । কিন্তু শর্ত—তাকে বিয়ে করতে হবে । মিনতির কাছে মনে হয় যেবা চাইতেই অল । “কুছিত্ত বেয়ে, কে বিয়ে করবে” দিনরাত শুনে শুনে নিজের ওপরে ধোয়া ধরে গিয়েছিল । কোনো পুরুষ মানুষ তাকে যেচে বিয়ে করতে চাইছে শুনে অসবর্ণ বিয়েতে বাড়ির লোকদের প্রচণ্ড আপত্তির কথা কেনেও মিনতি এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় । প্রধান শিক্ষক সম্বন্ধে বাজারে যে জর্নাম চালু আছে—মিনতি সেসবকেও গ্রাহ্য করে না । বাড়িতে বাবাকে এই বিয়ের প্রস্তাব জানালে তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যায় । অসম্মতি থাকলেও আপন অক্ষমতার কথা ভেবে বাবা মেয়েকে বাবা দিতে সাহস পায় না । সংমতি চিন্তার করে বাড়ি মাথায় করে তোলে । “কখনো না, এ বাড়ি থেকে এরকম বিয়ে করা চলবে না ।” বাবাকে নীরব দেখে মিনতির মনটা বিতৃষ্ণার তরে যায় । নিজের ভাগ্য মিনতি নিজের হাতেই তুলে নেয় । সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে ।

তারপর শৈবমতে মিনতিরা বিয়ে করে বেড়খানা ঘর ভাড়া করে নতুন সংসার পাতে । কয়েকমাস মিনতিদের হুখেই কাটে । কিন্তু মিনতির ভাগ্য

সেই স্থখ বেশিদিন নয় না। কোচিং ক্লাসের নামে বাড়িতেই স্বামীদেবতার
স্থায়ী জীবন বাপনের ঘটনা মিনতি টের পায়। সে প্রতিবার জানায়। স্বামী
অবাব—“তোমার মতন কুঙ্গা মেয়েকে বিয়ে করে কি স্থখ বলো তো?
তোমার একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল, তা পেয়েছ—সেটাই কি যথেষ্ট নয়?
আর বেশি কি চাও? বেশ তো থাকে থাকে সুমোছে। ইচ্ছে করলে ঝামেলা
না করে সারা জীবনই এভাবে কাটাতে পারো। আমি তোমার খাওয়া-
পরা ঠিকই চালিয়ে যাব। কিন্তু শর্ত হচ্ছে আমার কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে
সাক-পলাবে না।”

মিনতি চমক আবার পায়। আবার নিভাস নেয় নতুন করে।

“এ জীবন আর নয়—সাম্প্রতিকভাবে সম্মানজনক উপায়ে বাঁচতে চেয়ে-
ছিলাম। কেউ যখন আমাকে সেভাবে বাঁচতে দেবেনা—আমিও সমাজের মুখে
কাটা মেয়ে বেরিয়ে এলাম। ই্যা, লাইনের কাছে আমি খেছার এসেছি।
কোনো একজন পুরুষমাহুবকে আর বিশ্বাস নয়—শত শত পুরুষ মাহুবকে
এই কুংসিং চেহারা নিয়েই সম্মান, ঠকাব—এই হল আমার প্রতিজ্ঞা।”

বন্ধুদের কাছে মিনতি লাইনের কাজের মেয়েদের গল্প শুনেছে। পক্ষে
চলাকেরা করার সময়ে এমন একটা পাড়া তার নজরেও পড়েছিল। মিনতির
পথ চিনে আসতে অসুবিধা হয় না। সোজা চলে আসে বাড়িউলির কাছে।
সেখানে আশ্রয় ও কাজ চায়। বাড়িউলি প্রথমে মিনতির বয়সটা মেনে
নিলেও রূপ হেঁপে উৎসাহ পায় না। অবশেষে ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে এবং স্কুল
কাইনাল পাশ জেনে পরীক্ষামূলকভাবে তাকে পনের দিনের জন্য এই বাড়ির
একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। শর্ত—পনের দিনের মধ্যে যদি মিনতি
নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে, তবেই তার ভেরা স্থায়ী হবে। সেই পনের
দিনের ঘরভাড়া ছাড় পায়। লাইনের কাছে যোগ্য প্রমাণ হলে মিনতিকে
প্রতিদিন ঘরভাড়া আট টাকা, চৌকি ভাড়া ও ইলেকট্রিকের খরচা বাবদ মাসে
বারো টাকা দিতে হবে। তাছাড়া প্রতিদিন পাঁচজনের বেশি পুরুষমাহুবকে
ঘরে নিলে বাড়তি আয়ের একটা অংশও দিতে হবে। মিনতি বাড়িউলির সব
শর্ত মেনে নিয়ে লাইনের কাছে নিযুক্ত হয়।

“প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা হত যিদি। আমি অন্য মেয়েদের মতন রং চং
মেখে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম না। ওদের স্নাকামিশুলোও আমার
আসত না। সাধারণ স্কুল কলেজের পোষাকেই এককোণে দাঁড়িয়ে থাকতাম।
অন্তরের দেহতায় একজন আর-একজনের পুরুষমাহুবকে নিয়ে টানাটানি

করছে। আমার ভীষণ ঘোরা করত। আমি তখন সেখান থেকে সরে যেতাম। সেই ঘুরে সরে থাকা ছাংলামি না করাটাই বোধহয় আমার প্রতি পুরুষমানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রধান কারণ। পনেরদিন কেন, সাতদিনের মধ্যেই আমি আমার যোগ্যতা প্রমাণ করলাম। ডেরা ছায়া হল।”

লাইনের কাজ কেমন লাগছে—আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম।

“প্রথম কিছুদিন গেল বিধা কাটাতে। তারপর ছ-বছর নেশাগ্রস্তের মতন রোজগার করেছি। দিনে রাতে ফুড়ি-পঁচিশ জনকে পর্বত আমন্ত্রণ জানিয়েছি। যে কোনোদিন আমার কপাল পুড়তে পারে ভেবে ভবিস্ত্রের ভক্ত বেপয়োয়া রোজগার করেছি, কিছু কিছু সফলও। এখন আর সেই শক্তি সেই উদ্ভম নেই। নেহাতই দুটি বাচ্চা আছে, তাদের মানুষ করার ভক্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে একজ চালিয়ে যেতে হবে।”

কথা বলার সময় মিনতি ছ-চারটে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছিল। বুঝলাম এই ইংরেজি শব্দও মিনতির ব্যবসারের কাজে সাহায্য করেছে। ঘরের মেঝেতে শোরানো তিন বছরের অল্প ছেলে, আর কোলে সন্ত জন্মেছে শিশু। এই সন্তানদের পিতৃপরিচয় জানা নেই। সে তাদের পর্জ্যারিণী—সেটুহুই তার কাছে বধেই।

“ভাগ্যিস মেয়ে অম্মায়নি বিদি। মেয়ে হলে তো তার ভবিস্ত্র আমারই মতন হত। ছেলেরা বড় হয়ে বাহোক একটা কিছু করতে পারবে। আমার মত হীন কাজ তাদের করতে হবে না।” মিনতির এই কথার মধ্যে সোয়ান্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। লাইনের কাজে বার্তা এসেছে তাদের অনেকেরই উণ্টো মনোভাব। বড়ো হলে মেয়েকে লাইনের কাজে লাগিয়ে তার রোজগারে খাওয়া-পরা চলবে ভেবে মেয়ের অম্মকে তারা আশীর্বাদ মনে করে।

“প্রথম প্রথম খুব ইচ্ছে করত আমার সংমা আর স্বামীদেবতাটিকে এনে দেখাই পুরুষমানুষের কাছে আমার কথর কত। এখন সেই ইচ্ছাও চলে গেছে। বজ্রের মতন দিন কাটছে” বলতে বলতে মিনতির মুখখানা বিবাহে স্তরে ধাঁধ।

পাঁচ বছর লাইনের কাজ থেকে মিনতির কত সফল হয়েছে জানতে চাইলাম।

আমার রেট প্রতিদিন মাথা গিছু দশ থেকে ফুড়ি টাকা। দিনে একশ

থেকে চুপো টাকা পৰ্ব্বন্ত রোজগার করেছে। যে কোনো উৎসব, পূজা পার্বণ উপলক্ষে বেশি রোজগার হয়। তার থেকে একটা বড় অংশ বাড়িউলিকে না দিতে হলে সক্ষম আর একটু বেশি হত। এমনিতে তো সবদিন সমান রোজগার হয় না। জুর্গা পূজো কালী পূজো উপলক্ষে পাঁচ-সাতদিন বে বেশি আর হয় সেটা আমাদের বোনাসের মতন। বছরে কোনো মাসে এক-দেড়হাজার টাকাও আসে, আবার চুপো টাকাও রোজগার হয় না। যেসব দিনগুলোতে কোনো রোজগার হয় না, বাড়িউলির পাওনা কিন্তু তখনও মিটিয়ে বেতে হয়। অনেক সময়ে চড়া ঋদে ধার পৰ্ব্বন্ত করতে হয়। সেই ধার আর শোধ হয় না। ঋদের টাকা গুনতে গুনতেই সারা জীবন কেটে যায়।”

দিনে কুড়ি-পঁচিশজন লোককে আমন্ত্রণ আনাতে হলে সময়ের সংকুলান হয় কি করে আনতে চাইলাম।

“সকলের চাহিরা তো সময় নয়। চাহিয়ার গুরুত্ব অতুসারে রেট ও সময়ের হেরফের হয়। অনেক সময়ে এক ঘণ্টার চেয়ে কুড়ি মিনিটে আর বেশি হয়। বললাম তো—চাহিয়ার গুরুত্ব বুঝে রেট ও সময় ঠিক হয়।”

“এত লোককে আপ্যায়ন করতে”—আমার প্রশ্ন শেষ করতে না দিয়ে মিনতি বলে উঠল : “সে যে কী বয়না দিদি বলে বোঝানো সম্ভব না। তাছাড়া আরও নানা রকমের কষ্ট আছে। কত ধরনের লোক আসে। তাদের মধ্যে মোছো-মাতাল থেকে শুরু করে হিংস্র আনোয়ারও থাকে। তাদের মজি মতন না চললে খুব অত্যাচার করে। এই যেখান না, আমার সারা অঙ্গে তাদের মজির চিহ্ন” বলে পিঠের ও পেটের কাপড় সরিয়ে দেখায়। সারা পাত্রে কালো ছোপ ছোপ দাগ। অলস সিগারেট চেপে ধরলে এ-রকম দাগ হয়।

“একদিন একজন লোক মত্ত অবস্থায় এসে বায়না ধরে আমাকে তলুনি খুঁড় পরে নাচতে হবে। আমি নাচতে আনি না, আমার খুঁড়ও নেই বলায় লোকটার মাথায় জেদ চেপে যায়। অবশেষে আমাকে প্রচণ্ড মারধোর করতে থাকে। আশেপাশের ঘর থেকে সকলে ছুটে আসায় লোকটার টনক নড়ে। তখন মেঝেতে একশ টাকার একটা নোট কেলে দিয়ে বেরিয়ে যায়। নানা রকমের বয়না আমাদের ভোগ করতে হয় দিদি। কত আর বলব। অবশ্য ছু-চার জন এমন লোকও আসে যারা ছ-এক ঘণ্টা গালগল্প ও আমোদ আহলাদ করে চলে যায়, ভালো পয়লাও দেয়। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম।”

মাসে মেডুশ হুশ টাকার কোনো কাজ পেলে করতে ইচ্ছুক কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। অত্যন্ত আগ্রহভরা চোখে আমার হাত দুটো চেপে ধরে মিনতি বলে উঠল—

“পারবেন দিদি—আমাকে এরকম কোনো কাজ দিতে? তাহলে আমি এত্নি পালিয়ে বাব এ জীবন থেকে। সারাদিন হাড়ভাঙা বাটুনি খাটতেও রাগি—দেবেন আমার যে-কোনো একটা কাজ?”

আমি খুব বে-কায়দায় পড়ে পেলাম প্রশ্নটা করে। “চেষ্টা করব”—এই ছোট্ট উত্তর দিয়ে হেলেনার হাতে মিষ্টি খাবার ভর্তি দুটো টাকা গুজে দিচ্ছে চলে আসি মিনতির পাশের ঘরে।

আনোয়ারা

ঘরের সামনে এক চিলতে দাঁড়ায় হাতুয়ের ওপর কাঁধা পেতে শোয়ানো লম্বা ছয়েছে এমন একটি শিশুকে তেল মাখাচ্ছে বয়স্ক একজন মহিলা। পালে হাত রেখে পাশেই বলে আছে বোল-সতের বছরের আনোয়ারা খাতুন। মুখ-খানার মধ্যে মায়া ভরা চলচলে ছুটি চোখ। গায়ের রং শ্রামবর্ণ। হিন্দু বস্তিতে মুসলমান মেয়ে যেখে একটু অবাক হলাম। ওদের পাশের ঘরের দাঁড়ায় বসে তরকারি কাটছে আর-একজন বয়স্ক মহিলা। গায়ের রঙ ধরধবে ফরসা। খালি পা, পরনে কতাপাড়ের ধনেখালি শাড়ি। ঘেহের বিভিন্ন অংশে মেদের বাহুল্য। পা ভরতি ভারি ভারি সোনার গয়না। মুখে পান হোক্তা, লিখিতে মোটা করে সিঁচুর, কপালে মৃত্যু টিপ। কালে যে ডাকসাইটে রূপসী ছিল বোকা বার। আমাকে দেখে মিসিখাওয়া দাঁত বার করে একপাল হেসে বলল “যেখুন না আমার অপেই। বস্তিটার ভাড়া আদায়ের ভ্রত এই নরকে পড়ে থাকতে হচ্ছে। আত নেই, বে-আত নেই...সব এসে জুটেছে। আমার আবার মায়ায় শরীর কিনা—বিপদে পড়ে কেউ এসে আশ্রয়ের ভ্রত কেঁদে পড়লে ঠেসতে পারি নাক। আনোয়ারা মোহলমান, গুকেও পারলুম নি। মেয়েটা হুবহুরের ভ্রত ধর লিয়েছে। রোজগারপাতি করে আবার চলে যাবে। বান ঘরে বহুন গিয়ে” বলে মহিলা ভেতরে চলে যেতেই আদ্রি আনোয়ারার হার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম।

আনোয়ারার বাপ নিষেধাজ্ঞা হয়েছে আজ মশ বছর। বিহারের হারভাড়া

জেলায় কোনো এক গ্রামে এদের বাড়ি। দারিদ্র্যের চাপে চাষযোগ্য জমির সবটুকুই মহাজনের হাতে চলে যায়। টিকে আছে মাথা গোঁজার মতো বলত বাড়িটুকু। সেখানে আনোয়ারার বুচ্চা ঠাকুমা আর ছ-টি ছোট-ছোট ভাই-বোন। আনোয়ারার মা বাধ্য হয়ে আনোয়ারাকে লাইনের কাছে নামিয়েছে। নিজেও মেয়ের সঙ্গে থাকে। এখানে আসতে সাহায্য করেছে কলকাতার পার্টকলে কাজ করে আনোয়ারাদের এক হিন্দু প্রতিবেশী। ইচ্ছে আছে একটু সময় হলেই ছ-বছর বাধে মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে যাবে। বন্ধকী জমি উদ্ধার করে লোক লাগিয়ে চাষবাস শুরু করবে।

দেশ ছেড়ে কলকাতায় এত দূরে চলে না এসে ঐ এলাকাতেই বিকল্প কোনো কাজ বা বর্তমান পেশার কাজ পাওয়ার চেষ্টা করেনি কেন জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলাম অল্প কোনো কাজ পাওয়া যায় নি, আর ওখানে থেকে এই পেশা নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ জানাজানি হলে গোটা পরিবারকেই সমাজে অচ্ছন্ন হতে হবে—সামাজিক জীবনে আর ফিরে যেতে পারবে না। হিন্দু ব্যক্তিতে আশ্রয় নেবার কারণও তাই, দেশোদ্ভালি কেউ সহজে এখানে ঘেঁষবে না, তাদের খোঁজও পাবে না। আনোয়ারার মা বাড়িটুলিকে অল্প অল্পের তুলনায় বেশি রেটে ঘরভাড়া দেয়। দৈনিক বারো টাকা। দেশের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কিনা জানতে চাইলে আনোয়ারার মা বলল মাঝে মাঝে সে দেশে গিয়ে শাক্তড়ী ও মহাজনকে টাকা দিয়ে আর বাচ্চাদের দেখভাল করে আসে। ওধানকার লোক জানে কলকাতায় মা এবং মেয়ে দুজনেই বড়লোকের বাড়িতে রাঁধুনি ও আদার কাজ করে। আনোয়ারার সঙ্গে কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করলাম—একটি কথাও তার মুখ থেকে বার করতে পারলাম না। আগাগোড়া আনোয়ারা মাথা নিচু করে পায়ে নখ খুঁটতে লাগল। ওর মাকে জিজ্ঞাসা করলাম “সত্যিই কি আপনি ছ-বছর বাধে মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারবেন? বাচ্চাটির কথা কি বলবেন?” আনোয়ারার মা আমার এই প্রশ্নে একটু থমকে গেল। ধানিকলণ রূপ করে থেকে বলল মেয়েকে নিয়ে সে দেশে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু বাচ্চাটার কথা এখনও কিছু ভাবে নি। উত্তর দেওয়ার সময় তার চোখে মুখে একটা অনিশ্চয়তার ছাপ। আনোয়ারার দিকে তাকাতেই হেথলাম ওর মাথাটা আরও নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে—আরও মনোবোগ সহকারে পায়ের নখ খুঁটছে। আমি বেরিয়ে চলে এলাম আর একটি মনে।

অন্নপূর্ণা

ফুটফুটে কুড়ি-একুশ বছরের যেয়ে অন্নপূর্ণা। ছ-মাস হল এখানে এসেছে।
 আদি বাসস্থান বাঙলাদেশ। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়ে প্রতিবেশীদের
 সঙ্গে কলসাতার পালিয়ে আসে। বাবা-মা আত্মায়-অন্নন থেকে বিচ্ছিন্ন
 হয়ে আইবুড়ো মেয়ে ইচ্ছাকৃত বাঁচাতে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল। কিছু
 দিন রেল স্টেশনে বিভিন্ন ক্যাম্প কাটিয়ে অবশেষে মানিকতলা অঞ্চলের
 কোনো এক বাড়িতে ঋণ-পরা ও পনের টাকা মাস-মাইনেতে বহাল
 হয়। পাঁচ বছর সেখানে কাজ করার পর হাটাই হয়। এতদিন কাজ-
 করে কেন হাটাই হল জিজ্ঞাসা করলে অন্নপূর্ণা সহসা কোনো উত্তর
 দিতে পারে না। নানা কথাও ওর সংকোচ কাটাবার পর আনা গেল
 যে বাড়িতে কাজ করত সে বাড়ির গিন্নিমা সমস্ত সংসারের দায়িত্ব
 অন্নপূর্ণার ঘাড়ের চাপিয়ে নিজে এখানে সেখানে বেড়িয়ে বেড়াত।
 বাড়ির কুঁচকাটি তখন গিন্নিয়ার অল্পপস্থিতির স্বযোগ নিত। প্রথম প্রথম
 অন্নপূর্ণা লজ্জা পেত, ভয় পেত। কিন্তু কর্তার মনভোলানো কথা গাঁয়ের
 অসহায় সরল মেয়েকে সহজেই অভিকৃত করল। তার ওপর ছিল অব্যাহা
 হলে চাকরি ধোঁয়াবার ভয়। লোকটি মাসে মাসে তাকে বাড়তি দশ-
 পনের টাকাও দিত, অবশ্য লুকিয়ে। সেই সঙ্গে সৌখিন টুকিটাকি
 জিনিস। লোকটি ভান করত বেন বাড়ির গিন্নির হাতে সে অত্যাচারিত,
 অন্নপূর্ণাই তার আশ্রয়। ক্রমে সব মিলিয়ে ভালো লাগার ব্যাপারটা
 অন্নপূর্ণার সঙ্গে বাড়ির কর্তার অঁবধ সম্পর্ক গড়ে উঠতে সাহায্য করে।
 অবশেষে একসময়ে অন্নপূর্ণা সম্মানমন্ডবা হলে কর্তা গোপনে টোটকা ওষুধ
 প্রয়োগ করে। সেই ওষুধে হিতে বিপরীত হয়। পেটের অসহ্য বদ্বন্দ্য
 অন্নপূর্ণা জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফিরে আসে হাসপাতালে। দশ-বায়েদিন
 অন্নপূর্ণাকে হাসপাতালে কাটাতে হয়। সেই সময়ে কেউ তার খোঁজ
 নেয় না। নাসকে জিজ্ঞেস করে জ্ঞানতে পারে গর্ভপাত করানোর চেষ্টায়
 তার এই জ্বাল হয়েছে। অপারেশন করতে হয়েছে—অন্নপূর্ণা কোনোদিন
 আর মা হতে পারবে না। সব শুনে অন্নপূর্ণা নাসের দিকে ক্যাল ক্যাল
 করে তাকিয়ে থাকে দাদাবাবু বা গিন্নিমা এসেছিল কিনা জিজ্ঞাসা করে
 জ্ঞানতে পারে প্রথম দিন এক ডক্সলোক এসে তাকে ভর্তি করে টাকা-পয়সা
 জমা দিয়ে গেছে। হাসপাতাল থেকে ছাড় পেলো অন্নপূর্ণা বেন নিজের

পথ নিয়েই বেধে নের। গুনের বাড়িতে বেন ফিরে না আসে। অন্নপূর্ণা
প্রায় আতঁনায় করে ওঠে—“কে বলেছে, দাদাবাবু না গিম্মিমা?” বোধহয়
দাদাবাবু এমন কথা বলতে পারে বলে বিশ্বাস হয় নি। এত আদর, এত
সোহাগ; এত ভালোলাগা—সবই কি মিথ্যে? নার্স বিরক্ত হয়ে কক্ষ করে
বলে—“হ্যাঁ হ্যাঁ—দাদাবাবুই বলেছে একথা। লজ্জা করে না দাদাবাবুর নাম
মুখে আনতে? হুখে থাকতে ভুতে কিললো। পেছেন পাড়ার মস্তানদের
সঙ্গে চলাচল করতে। এখন ঠাণ্ডা বোঝো।” বলে খট খট করে হিল
তোলা ছুতোয় আঙুর তুলে অন্নপূর্ণার কাছে চলে গেল।

হঠাৎ অন্নপূর্ণার মাথাটা ঘুরতে থাকে। চারদিকে সে অন্ধকার দেখে।
কী কান্ডি। কী অবলাদ। চোখে ঘুম নেমে আসে। শৈশবের সেই মেঘনা।
সকাল হতেই ছুটে যায় নাসিমাঘের বাড়ি। আগের দিন বেধে এসেছে
নাসিমাঘের উঠোনের নারকেল গাছটা হেলে রয়েছে। বাড়ির সামনের
অমিতে রয়েছে বিশাল কাটল। অন্নপূর্ণা ছুটছে। পেছনে মেঘনার লকলকে
কালো ভিত্ত তাড়ী করে আসছে। প্রাণপণে ছুটছে অন্নপূর্ণা। ছুটছে—
অবশ পা আর বয় না, ডানা ভাঙা পাখির মতো অবশেষে মুখ খুঁড়ে পড়ে
মাটিতে। মেঘনার চেউ মুহুর্তে তাকে কোলে টেনে নেয়। তারপর বিশ্ব
হাওয়া, অপার শান্তি। চোখ মেলে দেখতে পার হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে
আছে—চারপাশে ডাক্তার নার্স। একজন চোখে মুখে অলের কাপটা দিচ্ছে।
আর একজন হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করছে।

ঠিক এই ভাবায় না হলেও এই অভিজ্ঞতার কথাই বলেছিল অন্নপূর্ণা।
ক্রম বিপদের মুহুর্তে তার মনে পড়েছিল শৈশবের কথা, মেঘনার কথা, পাড়
জাড়ার কথা।

দুশুটী বেন এখনও বেধতে পাচ্ছে। পরর মতো বড় বড় বাছর ছুটো চোখ
মেলে আমাকেই প্রশ্ন করে বসল—“কেন এমন বেধলুম দিদি? আপনি তো
অনেক জানেন। বলুন না।” সাইকোলজির অটল তত্ত্ব কি বোঝাব এই
অভাগিনীকে? হেসে বলল—“তারপর কি হল?” “তারপর?” খতমত
খেয়ে অন্ন বলতে শুরু করল।

স্টাক নার্স পরের দিন অন্নপূর্ণাকে ছুটির কাগজ পরিয়ে দিয়ে গেল।
হাসপাতালের বেড ছেড়ে দিতে হবে। সেই দিনই। কোথায় যাবে অন্নপূর্ণা?
হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাইরের সিঁড়ির ওপরে বসে পড়ে। দুর্বল শরীর,
মাথা ঘুরছে। মেঝেতে মাথা রেখে চোখ বুজে বসে থাকে। সন্ধ্যা কিয়ে

পায় একটি স্নেহের স্পর্শে। তাকিয়ে দেখে একজন বয়স্ক দুলালী মহিলা। কোথায় যেন দেখেছে তাকে—মুখটা খুব চেনা চেনা। হ্যাঁ, মনে পড়েছে—এই হাসপাতালেরই একজন আয়া। সে মহিলা সম্মুখে অন্নপূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করে “এখন একটু ভালো বোধ করছ কি? দেখে তো মনে হচ্ছে। সাতকূলে কেউ নেই। কোথায় যেতে চাও বলো। আমার এখন ডিউটি নেই। তোমাকে রিক্সায় করে পৌঁছে দিয়ে আসি।” অন্নপূর্ণার হাতে একটিও পয়সা নেই। সামান্য বা জরিয়েছিল সব মনিবের বাড়িতে রয়েছে। সেখানে বাওয়া নিবেশ। কি করবে ভেবে পায় না অন্নপূর্ণা। মহিলাকে সব কিছু খুলে বলে। শুনে মহিলা অন্নপূর্ণাকে নিয়ে রিক্সায় চেপে সোজা চলে যায় অন্নপূর্ণার মনিবের বাড়ি। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে দেখা করে যায় সিঁড়িয়ার সঙ্গে। অন্নপূর্ণাকে দেখেই সিঁড়িয়ার চিংকার করে গালাগাল করতে থাকে—“নিমকহারাম, বেইমান কোথাকার! ছদ্মকলা দিয়ে অ্যান্ডিন কালসাপ পুবেছি। লজ্জা করে না ঐ পোড়া মুখ দেখাতে? তাকে বিশ্বাস করে ঘরঘোর সব ছেড়ে নিশ্চিন্তে বেরোতাম বলে এভাবে তার ছবোগ নিলি? শুণ্ডা বহমানরা যে সর্বস্ব লুটে নেয়নি এই আমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি। বেরো আমার স্বমুখ থেকে।”

অন্নপূর্ণার সঙ্গে মহিলাটি এতক্ষণ চুপ করে গুনছিল। এবারে সে খনখনে গলায় বলে উঠল—“আ ময়ল! কেমন দারী ভদ্রলোক পা তোমরা? এত বছর কাজ করেছে তোমাদের বাড়িতে, রোগা মেয়েটা হাসপাতাল থেকে ফিরে বাড়িতে পা দিতে না দিতেই এমন ব্যাভার করে? তোমরা কি মাছ না জড়? আমি সব কথা শুনেছি ওর কাছে। ভালো চাও তো অন্নপূর্ণার পাওনাগুণা মিটিয়ে দাও—না হলে হাতে তোমাদের কেলকারির হাড়ি ভেঙে দেব।” সিঁড়িয়ার কি একটা বলতে বাচ্ছিল, এমন সময়ে ভেতরের ঘর থেকে একটা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল—“ওর বা বা জিনিশপজ আছে তার সাথে আরও বাড়তি পকাশ টাকা দিয়ে মিটিয়ে দাও। কথা বাড়িও না।” সিঁড়ি আর কিছু না বলে টাকা ও আমাকাপড়সহ অন্নপূর্ণার টিনের হুটকেশটা ঠকাল করে ওদের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে ভেতরে চলে গেল। মহিলাটি সব কিছু শুনে শুধিরে ফের রিক্সায় চেপে য়ওনা হল। অন্নপূর্ণার আত্মীয় স্বজন বহু বাছব বলতে কেউ নেই জেনে মহিলাটি তাকে এই বস্ত্রপাট্টিতে এনে হাজির

করে। অন্নপূর্ণা কান্ডে থাকলে মহিলাটি তাকে বুঝিয়ে বলে—“তুমি এখন নষ্ট হয়ে গেছ বাছা। তোমাকে কেউ আশ্রয় দেবে না। লাইনের কাজে নেমে পড়া ছাড়া তোমার কোনো গতি নেই।” সেইদিন থেকে অন্নপূর্ণা এই বক্তিতে আছে।

জানতে পারলাম একজন মধ্যবয়সী উকিল এখন তার কাছে আসছে। অন্নপূর্ণার ব্যবসায়ী বরচা সে বহন করে। উকিলবাবু ছাড়া আর কোনো বাবুকে অন্নপূর্ণা আমন্ত্রণ জানায় না। উকিলবাবু কথা দিয়েছে অল্প একখানা ঘর ভাড়া করে ওকে রাখবে। উকিলবাবু বিবাহিত স্ত্রীরাং তাকে বিয়ে করার প্রস্তাবওঠে না। অন্নপূর্ণা বলে—“বিয়ে আমি করব না। কিসের ঘৃণা বিয়ে করব? আমি তো মা হতে পারব না। উকিলবাবুর রক্ষিতা হয়েই থাকব।”

সুখমা

অন্নপূর্ণার পাশের ঘরে থাকে সুখমা। কালো ছিপছিপে শরীর। মুখখানটা সুন্দর, সর্বদাই হাসি লেগে আছে। দুটি সন্ধান হবার পর স্বামী মারা গেলে পারিবারিক সংকট দেখা দেয়। স্বস্তর অন্ধ, শান্ত্তী কম। সুখমা লেখাপড়া জানে না। স্বামী ছিল ক্ষেতমজুর। স্বস্তর বসন্ত রোগে দুটি হারাবার পর স্বামীর রোজগারেই সংসার চলত। স্বামী মারা যেতে পাঁচটি মুখের অন্ন-বোগাবার দায় এসে পড়ে সুখমার ঘাড়ে। স্বস্তর-শান্ত্তীর সঙ্গে পরামর্শ করেই সে এ-কাজে বহাল হয়েছে। হালালদের সাহায্য অবশ্য নিতে হয়েছে। আজ পাঁচবছর হল এখানে এসেছে। প্রথম প্রথম বাচ্চাদের ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হত। বিশেষ করে কোলেরটির অল্প, সে তখনও বুকের দুধ ছাড়ে নি। ক্রমে সবই হয়ে গেছে। ঘেশের বাড়ির সঙ্গে বোগাযোগ আছে। মাঝে মাঝে বাচ্চাদের দেখে আসে। মাসে দুবার শান্ত্তী আসে টাকা নিতে। রোজগার সোটাছুটি ভালোই। স্বাস্থ্য এখনও অটুট আছে। স্খা আর অভাবে ছয়লাপ নিজের অতীতের কথা ভেবে শিউরে ওঠে। নিজের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভাবতে চায় না।

“ছেলেমেয়েরা তো মাছ হোক, ততদিন যেন শরীর ঠিক থাকে— এইটুকুই চাই। তারপর আমার বা হয় হবে।” হাসতে হাসতে বলে সুখমা।

অনেক বেলা হয়ে গেছে—আমার জন্ত কেউ রান্না-খাওয়ার আয়োজন করতে পারছে না ভেবে অসহ্যে উঠে দাঁড়ানাম। চলে আসছি—
 - দেখে যাদের সঙ্গে দেখা করেছি সকলেই একে-একে এসে আমার ঘিরে দাঁড়াল। এদের মধ্যে বীণাও ছিল। সকলের হয়ে বীণাই আমাকে বলল—“আপনার তো কাজ হয়ে গেছে, আর আসবেন না। আমাদের চুখের কথা সব শুনে গেলেন। আমাদের বা হবার ছিল হয়ে গেছে। আমাদের ছেলেমেয়েদের বাতে আমাদের মতন সর্বনাশ না হয় তার জন্য কিছু একটা বিহিত করুন। এদের পড়াশুনার একটু সুযোগ করে দিন। সেটুকু সাহায্য যদি আপনারা করতে পারেন তাহলে আমরা কিছুটা অস্বস্তি পাব।

কোনোরকমে মাথা নেড়ে বেরিয়ে এলাম।

উপসংহার

এই হল চারজন ‘নষ্ট’-মেয়ের কাহিনী।

কলকাতা সহরে দেহজীবিনীদের সংখ্যা কত সঠিক বলা মুশ্কিল। বিভিন্ন এলাকার ঘুরে বে-চুকু খবর সংগ্রহ করা গেছে তাতে মনে হয় আনুমানিক দশ হাজার মেয়ে এই ব্যবসায় লিপ্ত আছে। এরা যে সব এলাকায় স্থায়ীভাবে বাস করে সে সব অঞ্চল নিম্নোক্ত পল্লী বা বেঙ্গা পট্ট হিসেবে পরিচিত। বলা বাহুল্য যে ‘কলগাল’ বলতে যাদের বোঝায়—অর্থীং তারা পরিবারের সঙ্গে থেকে এবং সামাজিকতা বজায় রেখে—নানা কারণে আংশিকভাবে দেহজীবিনীদের মতন জীবিকা অর্জন করে—তাদের উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে গণ্য করা হয়নি। এই সব মেয়েদের একটা বড় অংশ আসে গ্রাম গঞ্জ থেকে। আসার মূল কারণ দারিদ্র্য। তাছাড়া অত্যন্ত কারণগুলো হচ্ছে নানা অঘটন, সম্মানহানি, ভাঙা পরিবার, বৈধব্য ও নানাবিধ সামাজিক বৈষম্য। এদের মধ্যে সব রাক্ষস এবং সব জাতির মেয়েরাই আছে।

সাধারণভাবে এদের মাসিক আয়ের অল্প দেখে অনেকের মনে হতে পারে এদের সকলের আর্থিক স্বচ্ছন্দ্য আছে। আসল চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। মুষ্টিমেয় দেহজীবিনী ছাড়া বেশির ভাগেরই বতরটা আর্থিক তত্তটাই ব্যয়। উপরন্তু ঋণের বেড়াআলে চিরদিন আবদ্ধ থাকে। কিস্তাবে এরা শোষিত হয়, ঋণের কবলে আমরণ জড়িয়ে পড়ে এবং এদের চরম পরিণতি কি হয় সেই

কথা নিচে উল্লেখ করার আগে একটি মেয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়ে দিচ্ছি।

ধরা যাক উক্ত কলকাতাব কোনো এক সাধারণ বারবনিতা। তার দৈনিক আয় গড়পড়তা হিসেবে চল্লিশ টাকা। (মাস হিসেবে ধরলে দু-হাজার চারশ টাকা)। তার দৈনিক ব্যয়ের তালিকা—

খরভাড়া	১০'০০
আলো পাখা	২'০০
দালাল বাবদ	১০'০০
চাকর	২'০০
নিজের ও চাকরের খোরাক	১০'০০
অস্বাস্থ্য খরচ	২'০০

মোট ৩৬'০০

তাহলে দেখা যাচ্ছে হাতে থাকে দৈনিক চার টাকা। এই চার টাকায় জামা কাপড়, প্রসাধনের জিনিস, নেশার খোরাক, অস্থবের চিকিৎসা (একটা বড় খরচ), নানারকম চাঁদা (না দিলে পাড়ায় ঢেঁকা দায়), ঠাকুরপুজো ইত্যাদি ব্যবসায়ী খরচ চালান সম্ভব নয় (তাছাড়া সব দিন সমান যোজপারও হয় না)। বাধ্য হয়ে তাদের গণহত্যার স্বাস্থ্য হতে হয়। এ জীবনে যা বড় একটা শোধ হয় না।

শ্রমিকের বিভিন্ন রূপ

(ক) বেশির ভাগ মেয়েদেরই চড়া হুদে (দৈনিক টাকা প্রতি ১০ পয়সা) টাকা ধার নিতে হয় এবং জিনিসপত্র বন্ধক রাখতে হয় (কোনো কোনো সময় দেহসম্মত) বাড়িউলি, খাবারের হোটেল, শাড়ি-কাপড়ের দোকান, ডাক্তার-খানা, এমনকি কাবুলিওয়ালার কাছে। বেশির ভাগ মেয়েরা অশিক্ষিত হওয়ায় নামটুকুও সই করতে পারে না বলে ধার ও বন্ধকের দলিলে টিপসই দিয়ে টাকা ধার নেয়। একশ টাকা ধার নিয়ে দুশ টাকার দলিলে এরা হামেশাই টিপসই দিয়ে থাকে।

(খ) নিয়মিত মজুর পাবার আশায় দালালদের কাছে বঁধা পড়ে। দালালরা প্রতি টাকার পঁচিশ পয়সা করে আদায় করে। সময় সময় দালালদের হাতে দ্রাঘার অল্প বিনা খরচায় তাদেরও আপ্যায়ন করতে হয়।

এদের নানা ধরনের অস্থ-বিস্থ লেগে থাকে। পাড়ার বা বে-পাড়ার ডাক্তাররা (সকলে নয়) এদের অবস্থার সুযোগ নেয়। ডাক্তাররা এদের আরোমাস তিরিশ দিনই চিকিৎসার অধীনে রেখে দেয়। খারাপ রোগ না-হলেও সাদা জল ফুঁড়ে পেনিসিলিনের দাম নেয়। এসব মেয়েদের মনে এমন একটা স্থায়ী ভয় আগিয়ে রাখে যাতে তারা ডাক্তার ও তার তথাকথিত চিকিৎসার কাছে স্থায়ীভাবে বাঁধা পড়ে যায়। তাছাড়া সত্যিকারের অস্থ-বিস্থ তো থাকেই। টাকা বত যায় হয় চিকিৎসা তত হয় না। তবু চিকিৎসার নামে এই গ্রহসন চলতেই থাকে। এর ওপর আছে মারাত্মক টোটকা আর সেই সঙ্গে সন্নিহিত ককির।

(ঘ) বিভিন্ন হোটেলওয়ালা ও ব্যবসায়ীরা তাদের অর্ডার ও লভ্যাংশ বৃদ্ধির কাজে এই সব মেয়েদের সস্তার ভাড়া করে মোটা টাকা আদায় করে।

(ঙ) যে-সব ধর্মের এদের ভোগ করে তারাও অনেক সময়ে নির্ধারিত চুক্তি ভঙ্গ করে।

(চ) এরা হীন কাজ করছে মনে করে সর্বদাই পাপবোধ করে থাকে। ফলে এরা খুব ধর্মভীরু হয়। প্রায় প্রতিদিনই নানা পুজো-আর্চায় এবং মন্দিরে আয়ের একটা অংশ ব্যয় করে পাপ-অলনের জন্ত।

(ছ) বিভিন্ন সার্বজনীন উৎসব উপলক্ষে মতানুগা এদের কাছ থেকে বলপূর্বক মোটা টাকা আদায় করে।

শেষ পরিণতি

মুঠিমেষ দেহজীবিনী-ছাড়া বাকি সকলেরই শেষ পরিণতি অত্যন্ত ক্লেশ। চল্লিশ বছর হতে না-হতেই বাস্তু যায় ভেঙে, নানারকম ছুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। জীবিকা হিসেবে কেউ গ্রহণ করে লোকের বাড়ি ও পাইস হোটেলে রি ও রাঁধুনীগিরি। কিছু যায় নব্বীপ ও বৃন্দাবনে—সেখানে সারাদিন হরিনাম করলে দু-বেলা খেতে পায়। আর কিছু হয় ভিখারী। আত্মহত্যা আর একটি প্রবণতা যা এদের অনেকের মধ্যেই থাকে।

সংবাদপত্র থেকে শুধু করে সরকার, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ,

সমাজসংস্কারক ও বুদ্ধিজীবীরা সকলেই দেশের ও সমাজের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে বহরকষ আলোচনা ও বিতর্ক করে থাকেন তাদের লেখা, বক্তৃতা, নানারকম সেমিনারের মাধ্যমে। দেশ স্বাধীন হবার পর বিভিন্ন সরকার পাঁচ-পাঁচটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে। কয়েক বছর বাবত সকলের মুখেই নারীজাতির মুক্তির কথাও শোনা যাচ্ছে। খুব ঘটা করে নারীবর্ষ পালন করা হয়েছে নানারকম উৎসবের আয়োজন করে। অথচ এই কলকাতা শহরে—যেখানে জাতীয় আন্দোলন থেকে শুরু করে বহু প্রগতিশীল আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে—সেখানে দেহজীবিনীদের সংখ্যা যেভাবে ভয়ঙ্কর পতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে বারংবার এই ব্যবসায় লিপ্ত আছে কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ছে বহু নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে—সে বিষয়ে রাস্তার ঘাটে চলাফেরা করার সময়ে একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই টের পাওয়া যায়। এত বড় একটা ছুট ক্ষতকে এভাবে বাড়তে দিয়ে গ্রিন রেসলিউশন, শিল্প বিস্তার বা অন্য কোনো রকম প্রগতিশীল পরিকল্পনা কার্যকরী—হতে পারে না। সরকার এবং দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্তৃপক্ষের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ তাঁরা যেন এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে মোকাবিলায় দ্রুত সচেষ্ট হন। মাঝে-মাঝে ধবরের কাগজের মাধ্যমে সেনসেশনাল তথ্যসহ প্রবন্ধ লিখেই নিশ্চিত না হন। বিভিন্ন নারী সংগঠন-গুলিরও একেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। নারীজাতির মুক্তির পথে অন্ততম প্রতিবন্ধক হচ্ছে বৈজ্ঞানিকতা। নারী সমাজেরও এগিয়ে আসা উচিত যে ছুট ক্ষত ক্যালারের রূপ নিয়ে সমগ্র সমাজকে গ্রাস করতে চলেছে—তাকে প্রতিরোধ করার কাজে এগিয়ে আসা। সরকারের কাছে ইতিবাচক (positive) কর্ম-সূচি পেশ করে এদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করা, নিরঙ্করতা দূরীকরণ করা এবং বারংবার এই ক্ষত সৃষ্টির কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে তাদের শান্তি দেওয়ার দাবি সোচ্চার করা। তথাকথিত পরিবার-পরিকল্পনা ও সমাজ-কল্যাণের নামে যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে তার একটা বড় অংশ এই দেহজীবিনীদের পুনর্বাসনের কাজে ব্যয় করলে সমাজের অনেকখানি মজল করা হবে। দেহজীবিনীদের যে সকল সম্মান-সম্মতি আছে তাঁদের কোনো সামাজিক পরিচিতি নেই। তারা মজান। চোর ডাকাত হিসেবে অভিযুক্ত। তাদের অনেক ঘোব। কিন্তু তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে—এই ঘটনাকে চোখ

৯ ঠেঁরে থাকলে দেশের সামনে সমূহ বিপদ। দেশের যৌবন-শক্তির পচন ধরলে কোনো পরিকল্পনাই স্থকল আনবে না।

একথা আমরা সকলেই জানি যে সমাজ ব্যবস্থার আবুল পরিবর্তন ছাড়া এ-সব সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না। কিন্তু সেই অহিলায় এই সামাজিক ব্যাধিগুলো সম্পর্কে আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না। “না আগিলে আঅ ভারত ললনা, এ ভারত বুঝি আগে না আগে না” এ কথা শুধু আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কেই সত্য না। আমাদের অসম্পূর্ণ বিপ্লবের পক্ষেও তা প্রথম সত্য।

ছ-টি কবিতা

অনিন্দ ঘোষহাজরা

অভ্যাসবশত

তোমার তর্জনী নড়লেই আমার পৌত্তলিক মূতুটু
ক্রমাগত নড়ে যায় ;
হ্যাঁথো আমি আতীবন আত্মবিস্মত...

যাবে যাবে জোর হাওয়া দিলেই
জ্বতো ছিঁড়ে যায় ;
কিন্তু কি আশ্চর্য হ্যাঁথো
অভ্যাসবশত আমার বিনয়বতার মূতুটি
ক্রমাগত নড়ে যাচ্ছে ।

চতুস্রী

গাছের নিচে তিনটে বাঘের বিরাট ধাবা
সারাটা দিন খেলছি খেলা—চতুস্রী—
হাত ছুটি পা, পা ছুটিও অর্ধভর
জিভ বেরিয়ে বরছে লাল সারাটা দিন
এমন সময় লক্ষ্যাবেলা বিরাট ধাবা
গাছের নিচে ঠত পেতেছে তিনটে বাঘের ।

সেটুকু খাবার সেটুকু খাবেই সেটুকু খেলো
 হাড়গুলো সব নড়বড়ালো রইল পড়ে
 তারও পরে গল্প আছে সমস্ত দিন
 চৌপর দিন হারান রকম অমলো খেলা
 হাড়গুলো সব ঝটখটালো করলো খেলা
 চতুষ্পদী ;—পাছের নিচে পান গাইলো :
 'কোথায় গেলো তিনটে বাঘের তিনটে খাবা ?'

আছে

মুকুল চট্টোপাধ্যায়

মাছের বুকে যদি অল্প পাখর থাকতো, পাখরে ঘুমতো, আবার
 পাখরে জাপতো

পাখর আবার কেটে বসি করতো পাখরের চাল, শজি-আনাড় ;

মাছের সব আছে, তাই মাছের ঘুমিয়ে আছে

মাছের একটা প্রিয় দ্রব্য আছে

ঘর-সংসার, দাবা, পাশা, লোটা কয়ল আছে ;

শ্রীতের অতিথি পাখির মত অল্প মাছের কাছে বাওয়া আছে

অল্প কথা আছে, স্বপ্ন আছে, মাছের কী ছাইটা নেই !

সব আছে, তাই মাছের ঘুমিয়ে আছে

জিকের চাল-বাছা আছে, লুকনো অল্পশয় আছে—

মাছের আর-একটা হাত আছে, লুকনো জ্ঞান আছে

তেজী আছে, কবরে মাটি দেয়া আছে

মাছের ডের আছে, তাই মাছের স্বপ্নে আছে, স্বপ্নে আছে ।

উজ্জয়িনী

রঞ্জিতকুমার সরকার

হৃৎকণ্ঠে কাছে প্রত্যাশা নেই	দুঃখ আমার
রক্তজলের ছোপ-লাগানো	হলুদ আমার
পকেটবিহীন বেহিসেবির	ছয়ছাড়া
ধূলোবালির সাক্ষীসাব্দ	নেইকো সাড়া
তোমার হাসি-শব্দ-স্বপ্না	অভিमानে
দীঘল দুপুর শুকুই বহে	সেই উজানে
হৃৎকণ্ঠে কাছে প্রত্যাশা নেই	দুঃখ আমার
মঞ্চ ঘেঁষে বুঝলো পরজ	একটু ধামার

সম্পূর্ণ পাকা ফল হাতে নিয়ে

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পূর্ণ পাকা ফল হাতে নিয়ে বীজগুলোকে কেউ মনেও রাখে না...

সামনের দিকে চলতে চলতে কে আর পিছনে ফিরে তাকায় ?
 নদী কি তার উৎস কেন্দ্রে ফিরে যায় ?
 নাকি অন্য নক্ষত্রের দৃষ্টি শ্রবণ করে ?
 সম্পূর্ণ পাকা ফল হাতে নিয়ে বীজগুলোকে তাকিয়ে দেখি না ।
 বীজের মধ্যে উজ্জল ভবিষ্যৎ বৃহৎ বনস্পতির সম্ভাবনা
 মাটিতে অড়িয়ে পড়ে, মাটিই অন্য দেশ একটা জীবন্ত ইতিহাসের
 যে ইতিহাস বীজের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়, জল-আলো-হাওয়াতে
 পল্লবিত হয় তুলতে তুলতে অসম্পর্ক বনস্পতির ফুল থেকে ফুলে
 ফল থেকে বীজে মৃত্যুঞ্জয়ী গান গেয়ে যায়, মাটির ভেতরে আলোর ভেতরে
 এবং অবিচ্ছিন্ন অঙ্কুরে জেলে রাখে মশাল ।

সম্পূর্ণ পাকাফল হাতে নিয়ে পরিপূর্ণতার কথা মনে রাখতে হয়
 পিছনের দিকে তাকিয়ে আর একবার সামনে পদক্ষেপ এঁকে
 রক্তে পুষে রাখতে হয় বনস্পতির শিশু ।

কবি সম্মেলন থেকে ফিরে

অশোককুমার মহান্তি

তোমাদের বিপুল নিঃশ্বাস এসে গারে লাগলো

অগণিত তোমরা ঘিরে রেখেছো বাম ও দক্ষিণ তান এবং উত্তর

আলকের এই প্রফুল্ল ফুলের সন্নিকটে তোমাদের অব্যক্ত অনেক আশা

অনেক গভীর করে তোমরা পেতে চাও জীবনকে এবং তার অর্থকে

তোমাদের প্রসারিত দৃষ্টির সামনে, তাই

হর্গীষ অসহায়তা আমাকে গ্রাস করে

বেগতেই পাচ্ছো আমার শিরোপা কেমন অলঙ্কার করে উদ্ভাসিত করছে বুক

আমার ভয়-ভীতি নেই, ঈশ্বর আমাকে কবির ছাড়পত্র দিয়েছেন

আর স্বীকৃতি দিয়েছেন মাহুঘরপী অন্ততর রত্নিন ঈশ্বর এবং ঈশ্বরীরা

তবু আমার কাছে সাধনার কোনো বাণী নেই আজ

তোমাদের ঐ বিপুল নিঃশ্বাস ক্রমশ ভেজা ভেজা

ক্রমশ ঈষৎ উষ্ণ এবং কিঞ্চিং শীতল

ছত্রখান আমার অভিজ্ঞ তরবারি

আমার শাণিত বিবেক, আমার বৈরাগ্য

আমি পাতাল চাই-না, তবু

মাহুঘের হাজার সর্কটের সুখোমুখি হয়ে

এক অন্ধকার নরক আমার সামনে হা হা হাসতে থাকে।

চক্রবুহে

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাহলে কি বাকি থাকে, যদি তার বুক নিই, চোখ নিই

দেহ থেকে আভরণ খুলে নিয়ে, নিজস্ব স্বীকৃতি দিয়ে

সামাই বতনে

অতঃপর বেহ নিই, বেহের ভিতর থেকে মুখ নিই
মুখের ভেতর থেকে আর কি কি পাওয়া যেতে পারে ?

পারি নাকি ? অশ্রুবিম্ব...তার প্রিয় গোপনতা, আত্মনারগুলি
নিতে আমি পারি না কি তার স্নেহ মালিন্য ও উন্মত্ত

সাধের শরীর

শিউরে ওঠার মতো ক্ষত গতি অভিমান, হিংসা ও রক্তের

ভয়াবহ বিশাল মিশ্রণ...

অন্তঃপ্রাণের ঐ-অটলতা নিতে তো পারি না বুঝি আজও !

তাহলে কি বাকি থাকে ?

ভেঙে যাওয়া রেখাগুলি ছাড়া ?

ঐ সব নিতে গেলে আমাদের প্রেম নিজে স্বাক্ষর করে চেয়েছে নির্বাণ !

তারাজ্যোতি বুঝেছিল তার বেহ, প্রবলব বুঝেছিল

অবচ সে স্বাভাবিক মালিন্য বোঝেনি...

আজ ও বিলাসী অগ্নি বাহুবল...পশ্চিম সম্পূর্ণ করে জলে ওঠে

উজ্জ্বল প্রেম !

সে আজও চেনেনি সেই মরুমারী...সে জানে নি চক্রবাহ মৃত্যুশয্যা আছে !

অন্ধরতন

মজুমদার মিত্র

রৌদ্রের উজ্জল আলোয় ওই নেকড়েটিকে দেখ

প্রসারিত আলোয় খেলা করছে যেন বোকারের ছুঁড়ে দেখা

একশটি বর্ষার ফলা

তুবারদেশে হাসফুরির ভিতর জ্যোৎস্নারাতে তার নীলচোখ

বিকশিত করে

বোকার চড়ে বেতে-বেতে তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল

চন্দ্রালোকিত প্রান্তবে এক নগ্নরমণীকে দেখেছিলে
 বসন্ত আক্রান্ত বনফুলীর অপাণবিহ্ন ফুলের গল্প
 সূর্যদেবের স্পর্শপবিজ্ঞ স্বামশ ফল অন্ধানভাবে কেটে যায়
 ওই নেকড়ে মধ্য সেই পরম স্তম্ভর স্থিতি ও স্থ
 বসন্ত আক্রান্ত বনফুলীর স্বাধীনতার গল্প সে উপভোগ করে
 অস্বারোহী ও তরুমানবীর প্রেমবার্তার নীরবসাকী
 সূর্যের হেশে ঘাসের ভিতর তার প্রহর-বাসা
 বরফের ভিতর রেখেছে পায়ের গোলছাপ
 মনে হয় সে বেন একশ বছর ধরে স্বাধীন ছিল
 একশ বছর ধরে স্বাধীন থাকবে
 যুগের ভিতর তার মদম্বলিত ক্রীড়ান্তর্জি দেখে
 খিলখিল করে হেসে উঠবে ক্রীতদাসেরা
 তখন 'মাহুবেরা একদিন স্বাধীন হবে' এই কথা
 যিনি লিপিবদ্ধ করবেন তিনি কবি : মাহুবেদের মধ্যে স্তম্ভরতম ।

আড্ডা পেরিয়ে

মধুসূদন সান্দ্রাল

চলো একটা নিঃসময় আড্ডা দেওয়া থাক
 কাণিশের তলা থেকে জলের ভারি ফোঁটা হেলেছলে পড়বে আনন্দের ওপাশে
 চাইলে ধরপোশ চিকচিক রোদের মতো খেলা করে যাবে
 পায়ের আনাচে কানাচে
 নিরীহ ভীরু প্রাণীকে হুঃখ দিতে নেই
 শুক-বক কাউকেও নয়
 গলায় মুহূর্ত চা-ককি-বিয়ারের শুমোর
 অন্তরীকে অর্ধাং মাথার গাঁটের মধ্যে মাঝবয়েসীর 'হান'

বিচিত্র ভঙ্গিতে সাময়িক ও চিরন্তন নাস্থনিক প্রসঙ্গ সব ওঠে আর পড়ে
 ভাতের ক্যানের মতো ককি গলায় ভেতরে ক্রমে আঁট হতে থাকে

পৃথক জলের নিচে ডুবে ধাড়ি মাছ ধাবি ধায়
 কতো আর দীঘার হাজিরা দেওয়া চলে
 প্রেমজ বাউবন আর তটের ক্ষর
 বুদ্ধি পায় তলপেট যোনি থেকে বালি
 'টিয়ারলেস'-এর বাচ্চারা সর্বত্র নোংরামি ছড়াচ্ছে
 টাটকা পোবর মজুদ প্রচুর
 পরস্পরের মাথা ফাঁক করে তরে আবার বন্ধ করে দিচ্ছে
 রসিকতাহীন দুর্দান্ত প্রহসনে
 ঝঞ্ঝে ঝাড়িয়ে বা ঠাসা ঘরে অল্লীল উদ্ধত বলছে
 বেকার অবস্থা থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে
 বাড়ি করেছে পাড়ি করেছে চব্বিশ ঘণ্টা ওকে নিয়ে
 বছরে স্থিতির লাখ লাখ টাকা উপার্জন দ্যাখো
 বৌ এর সঙ্গে মিশি না ও-ই আমার বৌ ছেনে গেছে
 পৃথিবীর ইতিহাস অর্ধশত্ৰু রাজনীতি অনটনের বাঙালি সংস্কৃতি
 সব কিছুকে ধাধা মেয়ে প্রকান্তে ধর্ষণের অস্ত্রে হাত বাড়িয়েছে
 বেকার কি আধা-আয়ের ছেলে বুড়ো সারা মন গোছা করে নিয়ে
 গিলছে বেপয়রা দেয়ানা পবেটের অস্তিত্ব তা উপদেশ কৌশল
 করুণ ভিয়ারের আলোয় মুখ তাদের জরণ হলমে হয়
 শহরের প্রান্তে বিবক্ষণীড়ার মতো বিভ্রাময় অট্টালিকার বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়
 মালিকের তল্লি কমোডবাহী সুউচ্চ শিক্ষক
 উকিল ডকিল অফিসারের কাছে দৌড়োদৌড়ি করে
 খাজনা দেয় গ্রীবার কালো বৃত্ত
 সহকর্মী-মাড়ানো শিক্ষক-নিড়োনো তেল
 পিপে স্তরতি মজুদ থাকে বিভ্রালয়ের শুগাম ঘরে
 শিক্ষকের জাল-করা পরত্যাগপত্র হাবিল করে
 মা-বৌ-পায়েব-করা মালিক পক্ষ

চালাও অবসর তীক্ষ্ণ হলো

ব্যবহৃত চুষক মহিলারা সন্দেশ চিংকার করে ওঠে

পলায় সজ্জল মাছের কাঁটা আটকানোর প্রিয়মাদী সংকটে

নরম মুঠোর ধরে শরীর ভাঙের কর্কশ ডেলা সে-রাস্তায় পাঠিয়ে দিয়ে
তারপরে শরীর-কাঁপানো নিজে-ভারি-জুখে-রাখা ঝিলঝিল হাসির কলকলানি-
আকারে প্রকারে শীংকার

এইবার বলো

তুমি যাবে কোন্ নিজস্ব রণাঙ্গন-পরের আড্ডায়

মাটি-উপড়ে-ফেলা হুটি

ফুটো-ঢেকে-ফেলা জল খর।

এ গুর কঁখে ভর দিয়ে চমকাচ্ছে বখন ?

ফুলিছের রমরমায়

প্রকৃতি এবং মালিক সমাজ আমোদ করে

আড্ডায় বসলে অনেক কথা কানে আসে

আবার কিছু কথা জানাই যায় না

ওই দ্যাখো

কোথাও রসকর অশ্রু নিজেই ভিজছে

জ্যাত কাটা পোড়েছে

গুটিয়ে নিচ্ছে নিজে-কৈ গভীর

নাড়িভুঁড়ি পাকিয়ে উঠছে একটা জন্তর ব্যাধা

যে লঙ্কের দিকে দৌড়ে বেতে চায়

আর ফুলকির খেলা নয়

এবার প্রকৃত জলাশয়

অর্থাৎ মহুয়াবসতি

অর্থাৎ বিষম বিচারশীল আগুন

অর্থাৎ নিহিত চূষন

গহিন গাঙের জল

•রুম মুহম্মদ শাহিচ্ছমাহ

গহিন গাঙের ঘোলা নোনাজল উথালি পাথালি নাচে,

কনা তুলে আসে তুফানের সাপ কাকনের মতো শাদা

পরানের পরে পড়ে আছড়ায়ে বিশাল জলের ক্রোধ—
বেন উপকূল-ভিটে-মাটি-ঘর ঠেলে দিয়ে বাবে ছিঁড়ে

বাঘের পায়ে চিহ্নের মাঝে জমে আছে রূপো-জল,
মরা হরিণের চোখের মতন ঘোর নিরঞ্জন রাতে
নায়ে গলুয়ে তামাটে কিশোর
বাঁশিতে বাজার কথা,
বিজ্ঞান রাজি ভেঙে পড়ে সেই ব্যাবুল বাঁশির টানে
ফুলে ফুলে ওঠে শোমস্ত জলে জ্যোৎস্নায় যৌবন ।

রোদ্ধুরে পোড়া, জ্যোৎস্নায় ভেজা, প্রাবনে ভাশালো মাটি,
চারিপাশে তার রক্ত হা-মুখো হাতাতে হাঙর-জল ।
উজানি মাঝির পাখায় তবু বিছাৎ জলে ওঠে
জলে ওঠে তাজা বাকদ-বহি পরিহার সজোগ—
উপকূল এ-উপকূলে তবু জীবনের বাঁশি বাজে ।

তেজি কজার আমি চক্কর আমি ঘরে তুলে নিই ব্যথা,
ঘরে তুলে নিই হাহাকারে ভরা অনাহারী দিনমান ।
বে-ফসল ক্ষেতে করেছি লালন কটে-রক্তে-দামে
আমার আঙনে গে-ধান ওঠে না
ওঠে শস্তের ধান ।

বুকের রক্ত কটের দামে আমি নিই শোক
আমি কিনে নিই ক্ষুধার্ত বেশ, নিরন্ন লোকালয় ।

বুকের মধ্যে খেমে আসে গান, চিংকার জমে ওঠে,
ভেঙে ফেলি বাঁশি, ফুলের বাগান, তছনছ করি নারী
গহন রক্তে জেগে ওঠে জল গহিন পাণ্ডের কনা—
বুনো শুয়োবের বস্ত্রতা নাচে বগছে শেনীতে বেছে
গজরায় বেন অজগর-রোবে পাঁজরের তাজা হাড় ।

এ-ধান আমার,
 আমার অস্থি মজার তার গন্ধ রয়েছে মিশে।
 আমার লাঙল বে-নাগীকে চবে তরুরে বুনছে বীজ
 ভাতার না হই আমি তবু তার শিল্পর অনক হবো।

পহিন পাণ্ডের নোনামল কোটে
 টপবগ কোরে বৃকে
 ভেঙে পড়ে পাড়, বিশাল বৃক্ষ
 প্রপিতামহের ভিটে—
 আসে জল, আসে বারুদ-প্রাবন, দরিদ্রার বিক্ষোভ।

বিজন রাজি তখনছ ছোট্ট ভীত হরিণের বঁক
 খুয়ের শেষে কাঁপে বর্মর বুনো বৃক্ষের তল্ল,
 চরের মাটিতে স্বপ্নের হাড়ে
 দূরের বাতাস কাঁদে
 জনপথে জলে শোকের মলিন চিতা।

সারা রাজির নিষূঁষ শত্বনেরা
 সকালের লাল সূর্যকে ছেঁড়ে বেদনার বাকা ঠোঁটে।

অধিকারহীন পরাধীন স্তোর
 উঠোনে বিমোহ পড়ে,
 দরিদ্রার জল তবুও ধোয়ায় দুঃখের ক্ষত।
 তবুও কিশোর, তামাটে কিশোর বানিতে রাজার কথা
 জনপদ ভুড়ে সেই স্বপ্ন লেখে বেদনার নীরবতা।

বৃক্ষের পরে রাখো ওই ছুটি মেহেদি খচিত হাত,
 নকশি কাঁথাটি বৃক্ষের উপরে
 আলতো অড়িয়ে রাখো।

যুকের মধ্যে দামাল দরিদ্র নেচে ওঠে আজ

কি জানি কিসের টানে—

ফেটে পড়ে পাকা পেয়ারার মতো চাঁদের হলুদ কনা।

ডাকে চয় আর

আর আর আর ডাকে দরিদ্র উতলানো নোনাজল।

মৃত হরিণের মতন ঘোর নিরজন রাত,

কে জানি বাজায় বাঁশিটি আকে ভিন্ন আরেক সুরে—

তাকে জল আর, ডাকে বাঁশি আর প্রাণের প্রাণ্ডরে।

ভূসুর্গ চিত্রাবলী

অপূর্ব মুখোপাধায়

১

সমস্ত প্রাণের জুড়ে

কে পেতেছে বেগুনি কার্পেট

ডালপালা পাতা নেই

চরাচর নক্ষা-কুসুম

দ্বিপঙ্ক্তে আকাশ তার মাথা নত করে হেঁট

সুঁই ওপরে শুঁই স্থির

বেগুনি ক্ষেতের থেকে একদিন সে-ই ঘেবে তুলে

কুবকের ঘাষে-ভেজা হাতে

মুঠো ভরা আকর্ষণি ভেট।

২

সকল বাগান শূত্র, মরুভূমে ফসল তোলা ঘরে

এক একটি পাছে শুঁই রক্তাভ স্থিতি হয়ে

তুলে আছে দু-একটি ফল

এই কি আগেল, কিংবা ফুলে আলোড়ন
 সন্ধানক এবং প্রোজল
 নেব কি আবার আর,
 পাব কি আবার কিরে
 প্রথম মাহুবে, তার
 পৃথিবীর নতুন আদল ?

৩

আমাদের এই নৌকা কোথাও বাবে না
 এইখানে বসতি এখন
 পাহাড়ের তূবারে চীর-চিনারের গাছে
 হৃদয়ের মাহুবে ফুলে
 এইখানে প্রকৃত হৃদয়ের
 গভীর উদার হয়ে আছে
 বিরুদ্ধ নৌকা তাই কোথাও বাবে না
 অস্ত কোথাও চলে গেলে
 এই ছবি সে হারায় পাছে !

“মানুষ! মানুষ! আমরা মানুষ!”

রঞ্জু ভট্টাচার্য

“এ হো রামপিরিত অব পুর্বাছিয়া চালু হো গেইল।” দড়ির খাটে আধশোওয়া অবস্থায় তাকিয়ার হেলান দিয়ে বললেন দ্বিগবিজয় শর্মা। আজ সকালেই নৌকের ছেপে এসেছেন এই চরে। চরে তাঁর জমি দেখাশোনা করে রামপিরিত। জাতে গোরাল। রামপিরিত তার প্রভুর সামনে একটা বাঁশের খুঁটোর হেলান দিয়ে বলেছিল, বলল, “হা বাবু, আজই গরমোবগুলো পায় করতে হবে ছপুয় নাপাঘ।”

“অগুয়া আর বিয়ন জেলের নৌকো ছুটো ঠিক করে একেলাই পাঠিয়ে দে। কাগজে দিয়েছে গন্ধার জল বাড়ছে। বহ্না, বুড়িগণ্ডক, বাঘরা, কোশি, শেল, শুনপুন, গণ্ডকের জল এসে পড়ছে।”

“সে ত দেখতেই পাচ্ছি। আজ মাধো সিং এর খানিকটা জমি ডুবে গেছে। জল এগিয়ে আসছে। ওরা গরু মোষ পায় করে দিয়েছে। জেলেরাও বলাবলি করছে আজ কিংবা কালই চরা বদলে হোকায়া চলে যাবে। আমার মনে হয় বাবু আরও চার পাঁচ দিন চরাটা ডুবে না।”

“দূর গায়া। ঐ দেখ। মেঘ। বর্ষাতি মেঘ।”

পূব দিগন্তে সত্যিই একটুকরো কাল মেঘ এই সকালবেলাই। “আজ রাতে যদি বৃষ্টি নামে তাহলে চরার অর্ধেক ডুবে যাবে। তুই বরং চট করে গিয়ে নৌকো ছুটো ঠিক করে গরু মোষগুলো মোকামার টালে পাঠিয়ে দে।”

আজ দ্বিগবিজয়বাবুর গরু মোষের পাল খুঁটোতেই বাঁধ আছে সকাল থেকে। ওদিকে তাকান দ্বিগবিজয়বাবু তারপর একটু অস্ত্রবনক হয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চরার চারিপাশটা বতদূর চোখ বার দেখেন। গমের কসল উঠে গেছে। সেখানে নতুন বাস জন্মেছে। চারিপাশে অজস্র গটল লতা। দূরে

শেখাওয়ারতের কুপড়ি। বিদেশি গোপের গরমোষগুলো চরছে তাঁর পরিত্যক্ত গম্বুজেতে। বিদেশি, হরগোবিন্দ, শেখাওত, বিল্টু আহির চরা ছাফেনি এখনও। এ চরার আসল মালিকানা মাত্র আটজনের, ওরা চারজন আর দ্বিগবিজয় বাবু ছাড়াও আছে মাধো সিং, রামানন্দ আর মহন্তজি। শেষ তিনজনের গরমোষ চলে গেছে মোকামা—এখন শুধু পটল চালান যাচ্ছে। আর সন্ধ্যা নাগাদ আরও কয়েকজনের ডেরা ডাঙা উঠে যাবে। পক্ষার জল শুষ্ঠা আরম্ভ হলে দেখতে দেখতে চরা ডুবিয়ে দেবে। তার আগেই আত্মনা শুটোতে হবে। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরগুলো ভেসে যাবে স্রোতে। চরার চিহ্ন থাকবে না।

সেই বর্ষা শেষে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে আবার সবাই ফিরে আসবে। নতুন বাঁশ আর লাগে ঘাস দিয়ে গোটা পঞ্চাশ বাট কুঁড়ে ঘর তৈরি হবে। আটজন মালিক, তাদের মজুর ছাড়াও অন্য কুড়ি জেলে ঘর বাঁধে প্রতিবছর এ চরায়। মাছ ধরে মোকামার আড়তে বিক্রি করে দেয়। সেখান থেকে মাছ চালান যায় কলকাতায়। ওদের নৌকোগুলো সময়-অসময়ে এই আটজন মালিকের কাজ দেয়। অবশ্য আটজনেরই নিজস্ব নৌকো আছে। শেখাওত আর বিদেশি গোপের ত ছুটো করে নৌকো।

রামপিরিত ইতিমধ্যে চলে গেছে নৌকো ঠিক করতে। দ্বিগবিজয় বাবু আরও দু-জন চাষী বুধন আর রামু তাদের পরিবার ছেলেমেয়ে নিয়ে পটল তোলায় ব্যস্ত। রামপিরিতের বৌ-ছেলেমেয়েও ভিড়ে গেছে। কুড়িভর্তি পটল নিয়ে এনে ফেলছে দাঁড়াদ। বুধন মাঝে মাঝে এসে ভরছে বোরায়। বিকেলের আগেই এক নৌকো পটল চালান করতে হবে মোকামা হাটে।

আটজন মালিকের ভেতর শেখাওত, বিল্টু আর বিদেশি ছাড়া বাকি সবাই থাকে মোকামাতেই। মাঝে মাঝে চরায় এসে তদারকি করে যায়। মজুররা চাষবাস করে। ফসল উঠলে নৌকো করে মালিকের বাড়ি পৌঁছে দেয়। মাটি ত নর সোনা। লক্ষ টাকা উপার্জন হয় ঘরে বসে বসেই। আগে তাম সর্ষের ফসল হত। কিন্তু কয়েক বছর থেকে সবজির চাষ বাড়িয়েছে সবাই। এতে অনেক লাভ, তরকারির বাজার এখন আকাশ ছোঁওয়া। বাকিও কম। বড় বড় মহাজনরা অগ্রিম টাকা ঘরিয়ে দেয়। ধানবাদ, টাটা রীচী, বোথারো। এতে কার লাভ হয়। রামপিরিত বিখ্যাত লোক। ওর বাবাই আগে তাঁর জমি দেখানো

করত। সেই ছোটবেলা থেকে বাবার সাথে চরায় এসে থাকত রামশিরিত। চার বছর আগে একটা দুর্ঘটনায় ওর বাবা মারা বাওয়ার এখানকার দায়িত্ব নিতে অহুবিধে হয় নি রামশিরিতের। কর্মঠ ছেলে। অবশ্য দিগবিজয় বাবুও কম করেননি ওর ক্ষমতা। বিয়ে দিয়েছেন মোকামায় একটা সুপড়ি করে দিয়েছেন বর্ষার ক'মাস থাকার জন্য। এমনকি একটা ছোট ট্রানজিস্টারও কিনে দিয়েছেন।

বুধন পাজার ছিলিম সাক্ষিয়ে ধরিয়ে দেয় বাবুর হাতে। কয়েকটা টান মেন দিগবিজয় শর্মা। পাশে টোটা ভর্তি একটা ডবল ব্যারেল পান। চরায় আসার সময় নিয়ে আসতে হয়। এখানে একমাত্র সাপ ছাড়া অন্য কোনাে হিংস প্রাণী নেই তবু বন্ধুক আনতে হয়। রামশিরিতের কাছেও একটা হিশি বন্ধুক আছে। চূপকা—আনঅথরাইজড। একমাত্র ঐ জেলেশুলো ছাড়া অরণ্যের হিংস প্রাণীর চেয়েও নিষ্ঠুর এখানকার অন্য লোকগুলো। এখানে কোন আইন শৃঙ্খলাই নেই। কসল লুটপাট হয়ে যায়। চরার দখল নিয়ে প্রতিবছরই দু'একটা খুন হয়। মোতাত আসে দিগবিজয় বাবুর। মনে করতে চান আজ অবধি কজনকে হত্যা করেছেন এই চরায় মাটিতে। ছ জন। কাম্ব, তোলা, লিল্‌হার, রসিদ, মোতাহেদ, ললন সিং। দিগবিজয় বাবুরও পাঁচজন মারা গেছে গত দু'টি বছরের ভেতর। বারো মরে সবাই ভাড়া করা গুণ্ডা। লাশ পাচার হয়ে যায়। ছটার ভেতর চারটে লাশ পাচার করেছেন উনি। শুধু ছ জন রসিদ আর ললন সিং—এর লাশ ছুটো পাবেন নি। রসিদ ছিল শেখাওত—এর গুণ্ডা আর ললন সিং রামানন্দ—এর। সেবার ওরা বলে ভাবি ছিল বলে দিগবিজয় বাবুকে পিছু হটতে হয়েছিল। ওরা লাশ বিয়ে রাখে। পরদিন মোকামা থেকে দারোগা সাহেব এসেছিলেন। দিগবিজয় বাবুকে এ্যারেস্টও করা হয়েছিল। ও কিছুই নয়। সামান্য ঘটনা। মাজ দু'হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়েছিল দারোগাকে। পনের দিন পর বেলা হয়েছিল। পুলিশ চার্জশিট দেবার সময় দু'চারটে পরেষ্ট তিলে রেখে দিয়েছিল। কয়েক বছর কেস চলার পর খারিজ হয়ে গিয়েছিলেন দিগবিজয়বাবু। কেস খুন অথব হলও এই আট মালিকের মৌখিক বন্ধুকে কোনো ক্ষেদ পড়েনা। দেখা হলেই শেখাওত আদায় করে কুশল প্রদান করে। আর রামানন্দ ত দেখা হওয়া মাত্রই তাঁর পা ছুঁয়ে প্রশাম করে। দিগবিজয়বাবুর জাতি রামানন্দ। বিয়ে কিংবা পুজো পার্বণে ওবাড়ির মেয়েরা এবাড়ি আসে। এ বাড়ীর মেয়েরা ও বাড়ি যায়।

দিগবিজয়বাবু বয়স্ক। রামানন্দের বাড়ীর কোন উৎসবে অভিভাবকের
জুমিকা নেন।

অথচ এই আটজন ছাড়া প্রতিবছরই চরায় কেউ না কেউ নিহত হয়।
যারা নিহত হয় তাদের বেশির ভাগই ভাড়ার গুণ্ডা কিংবা চাষী। প্রাণ
দেবার জন্য তৈরি হয়েই ত ওরা চরায় আসে। বছরের এই শেষ মুহূর্তে
আটজন মালিকই চরায় আসেন। গরু মোষ পাচার করেন। চাষীদের
মেয়ে ছেলেদের পাঠিয়ে দেন আর বত সন্তব পটল তুলে চালান করেন। আর
ক'দিন সময় পাওয়া গেলে হাজার দশকের পটল উঠে বেত। কিছু কাগজে,
রেডিওতে ক্রমাগত বলছে বনজুন এগিয়ে আসছে। পূর্বকোণের সেই ছোট
কাল মেঘটার পেছন পেছন আরও কয়েকটা মেঘের ঝাঁক উঁকি দিচ্ছে।
পূর্ব দিক থেকে জোলা হাওয়ার বেগও তীব্র।

ফটা খানেকের ভেতরই রামপিরিত গরুমোষগুলো নৌকায় চাপিয়ে পাব
করে দিল মোকামার দিকে তারপর ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাথায়
করে পটলের বস্তাগুলো চরায় ঘাটে নিজের নৌকায় সাজাতে আসে।
বিকেলের আগেই এক নৌকো পটল বোঝাই হয়ে যায়। প্রায় আর এক
নৌকো পটল তখনও হাওয়ার। গোটা আকাশটা মেঘে ভরে এসেছে।
রাতে বৃষ্টি হবেই। বিদেশি গোপের গরুমোষগুলো হাওয়ার অদৃশ্য হয়ে
গেছে। হস্ত জেলেদের নৌকায় সওয়ার হয়ে ওরাও এখন মোকামার দিকে
রওযানা দিয়েছে। একটু আলোচনা করে ঠিক হয় আর নয়, মেয়ে
ছেলেদের এই পটল বোঝাই নৌকো ওপার পৌঁছে দিয়ে বারটা নাগাদ
কিরে আসবে বুধনরা। যদি চরায় জল চুকতে থাকে তাহলে দিগবিজয়বাবু
অত রাতেই রওযানা হয়ে যাবেন আর জানা হলে কাল। মেয়ে ছেলে
সবাইকে নৌকায় বসিয়ে একা ফিরে আসে রামপিরিত। “জল বাড়ছে বাবু।
শেখাওতের জমির কিছুটা নদীতে গেছে।”-

“কি মনে হয়? আজ রাতেই ঢুকবে নাকি। কোনো এক জেলের নৌকো
ফবে আন। বলা ত যায় না গলা মাইয়ের মজি।” “ও ব্যাটারা সবাই পালিয়েছে
বাবু। আমরা ছাড়া চরায় লোকজন আছে বলে মনে হয় না। হস্ত রাতেই
জল ঢুকবে চরায়।”

খেতে দেখতে সন্ধে ঘনিবে আনে। আর সেই সময় বৃষ্টি পড়া আরম্ভ
হয়। বছরের প্রথম বৃষ্টি। প্রথমে টিপ টিপ করে তারপর অব্যাহত বারে।
হাওয়ার তীব্র ঝাপট। হাতের পাশে টর্চ আর গুলি ভর্তি বন্দুক রেখেও

পাটা শির শির করে ওঠে দিগবিজয়বাবু। বুধনরা নৌকো নিয়ে কেরার আগেই যদি চরার গঙ্গার জল ঢুকে পড়ে। প্রতি বছরের মত এসব চালা ঘর তেলে থাকবে। রামপিরিত চরার মানুষ ও সাতার আনে। কিন্তু দিগবিজয়বাবু আনেন না। বড় অসহায় মনে হয়। প্রায়, এক নৌকো পটল এখনও দাওয়ায় বসে বন্দী হয়ে পড়ে আছে। এখন ওস্তোর দিকে তাকাবার ইচ্ছেও হয় না। বিকেলবেলা বেরিয়ে গেলেই হত। যদি বুধনরা ফিরে না আসে। না-না আসবে ঠিকই। ওরা তাঁর জীতদাস। সাদা কাগজে আঙুলের টিপসই দেওয়া কাগজ আছে তাঁর মোকামার বাড়ীর সিন্দুক। টর্চের বোতাম টিপে কজিতে বাঁধা রিকো ঘড়িতে সময় দেখেন। সাতটা। কমপক্ষে আরও পাঁচঘণ্টা প্রতীক্ষা করতে হবে।

ঘড়িটা তাঁর আমাই নেপাল থেকে এনে দিয়েছে। হাজারিবাগে মাইনর ইরিগেশনের ইঞ্জিনিয়ার। চল্লিশ হাজার টাকা মৌরি দিতে হয়েছে। ছেলেটা ভাল। এরই মাঝে পাটনার দোতলা বাড়ী ফিরেই পাড়ী কিনে কেলেছে। লিফ্ট আর সেরখানেক জুখ খেয়ে সুমোবার চেঁচা করেন দিগবিজয় বাবু। রাজে এ বুড়ি খামবে মনে হয় না। না। জব্ব মনকে শক্ত করেন। আজ ওরা ডুববে না। কিছুতেই ডুববে না। চোখে তম্বা নামে। ঘুমিয়ে পড়েন দিগবিজয় বাবু।

একসময় রামপিরিতের ডাকে ঘুম ভাঙে। “বাবু চরটা ডুবছে।” সেই মুহূর্তে বাজ পড়ার মতই একটা শব্দ কানে আসে। বাজ নয়, চরার মাটি গঙ্গার তাঁর কোলে টেনে নিচ্ছেন। টর্চ আলিয়ে রিকোট ঘড়িটা দেখেন। সাড়ে এগারটা।

একটু জন্ত গলায় বলেন “বুধনরা ফিরেছে?”

“না বাবু, উজান ঠেলে আসতে হবে, তাছাড়া এই বুগড়িটা ঠিক ঠাণ্ড করতে পারবে কিনা অঙ্কাবে জানি না। দেখুন না জল দাওয়ার কিনারা অবশি পৌঁছে গেছে।”

টর্চের আলো পড়ে দাওয়ার নিচটা চিক্‌চিক্‌ করে ওঠে। দিগবিজয় বাবু বলেন লঠনটা দাওয়ার ঐ সামনে খুঁটোটার ঝুলিয়ে রাখ। দু'বেলা বুধনরা দেখতে পাবে।”

লঠন ঝুলিয়ে রামপিরিত গাঁজা সাজে। কয়েক টান দিয়ে হিলিমটা ওর হাতে দিয়ে দেন দিগবিজয় সিং। “বুধনদের না পাঠালেই ভাল হত। এত তাড়াহাড়া জল ঢুকবে ভাবতে পারি নি।”

রামপিরিতের নেশা ধরেছে মনে হয়।

আচমকা প্রশ্ন করে, “বাবু আপনি আর ইলেকশান লড়বেন না?”
পরপর দু-বার কংগ্রেসের এম-এল-এ হয়েছেন উনি। কিন্তু এবার জনতা
হাওয়ায় হেরে গেছেন। ওর মনে হল রামপিরিত বেন বিজ্ঞপ করল
ওকে। মাথায় রক্ত চেপে গেল। অল্প সময় হলে বন্দুক এনে গুলি
করে গুলি উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু সে মুহূর্তে বড় অসহায় মনে হয়
নিজেকে। একমাত্র রামপিরিতই তাঁর একমাত্র সহায়। বাঁচার অবলম্বন।

নিজেকে সংযত করে বলেন, “দু-বার কংগ্রেসের এম-এল-এ হয়েছি।
এবার জনতা হাওয়ায় হেরে গেলাম, দিনকাল বদলে গেছে, বুঝতে
পারছি না জনতা কতদিন থাকবে। কংগ্রেস আবার আসবে কিনা।
কিন্তু বাই বল রামপিরিত কংগ্রেসই হোক, আর জনতাই হোক রাজস্ব
আমাদেরই। তোরা শালা রাজ্য চালাতে পারবি না। তোরা রাজস্ব চালালে
কি আমরা কুলি বন্ধুর হয়ে চাষবাস করব ভাবছিস” একটু হাঙ্কা হাসির
চেষ্টা করেন।

রামপিরিত বলে “ঠিক বলেছেন বাবু। আর একছিলিম চড়াই?”
“চড়া, জল কি বাড়ছে রামপিরিত, একটা লাঠি দিয়ে মেপে দেখত।”
টর্চের আলোর সামনে ইতিউত্তি গেলেন দিগবিজয় বাবু।

আর তখন একটা ছপাং ছপাং শব্দ কানে এসে। সেই সাথে বুধনের
ডাক, “এ রামপিরিত। এ হো রামপিরিত।”

গাঁজার ছিলিমে টান দিয়ে একটা মৃত্তির বাদ পেলেন দিগবিজয়
বাবু। ভাগ্যিস সাদাকাগজে স্ট্যাম্পের উপর টিপসই দেওয়া আছে, তা
না হলে এত রাতে ওরা কি কিরত। টর্চের আলো ওদের দিকে ফেলেন
দিগবিজয় বাবু। চারিপাশে ঘন অন্ধকার। প্রথমে দেখতে পেলেন
বুধনকে তারপর রামুয়া। এক হাঁটু জল ঠেলে ঠেলে আসছে ছুঁতনে।

জলে ভিজে অবুধবু হয়ে গেছে ছুঁতনে।

দিগবিজয় বাবু প্রশ্ন করে, “চরাটা ডুবছে নাকি রে।”

“হাঁ বাবু। একুনি পালাই চলুন। আর কিছুক্ষণের ভেতর এসব
চালটিলা কিছুই থাকবে না। লঠনের আলো দেখে দেখে আমরা এলাম।
এই ত বিশ হাত দূরে নৌকোটা বেঁধে এসেছি।”

মুহূর্তে বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়েন দিগবিজয় বাবু। সঙ্গে ওরা তিন

জনে। হাঁটু জল ক্রমে কোমর অবধি উঠে আসে। বন্ধুকটা মাথার উপর তুলে ধরেন। কিছুদূর এসে বৃন আঁতকে উঠে আতর্জনাদ করে।

“সেকি নৌকোটা কোথায়। এখানেই ত একটা খুঁটোর বেধে রেখেছিলাম।”

অলের শ্রোত তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। উল্লাসের মত চারিপাশে চর্চের আলো ফেলেন দিগবিজয়বাবু। নৌকোর কোনো চিহ্ন নেই। বৃন পাললের মত মত বিড় বিড় করে ক্রমাগত বলতে থাকে, “এইখানে। ঠিক এইখানেই ত বেধে রেখেছিলাম। পক্ষা মাই নিয়ে গেছেন।” জল ক্রমে কোমরের উপরে উঠছে সবার।

“রামপিরিত এবার কি হবে।” বেন একটা মৃত কথা বলতে চাইছে।

“তাইত বাবু। সঁাতার কাটতে হবে। সঁাতার কেটে ওপারে যেতে হবে” আঁতকে ওঠেন দিগবিজয় বাবু। এরা পক্ষার চরায় বড় হয়েছে, পক্ষা এদের মা। কিন্তু দিগবিজয় বাবু সঁাতার আনেন না। “আমার বাঁচা রামপিরিত, বৃন, রামু।”

একটা ভিড়ুক। কুঠে গা-হাড়-পা ধসে গেছে। তাকাতে ইচ্ছে করে না। ঘুশা হয়। ইচ্ছে হয় পাঁচটা পয়সা ছুঁড়ে দেবার।

বৃন ঠিক সেই মুহূর্তে বলে, “বাবু আমার টিপসই দেওয়া কাগজটা ফেরৎ দে।”

সাথে সাথে রামু বলে, “বাবু আমার টিপসই দেওয়া কাগজটা ফেরৎ দে।” “দেব। দেব। নিশ্চয়ই দেব। মোকামার পৌছলেই দিবে দেব বিশ্বাস কর।”

বৃন বলে, “শালা মিথ্যাক।” মাজ তিনশ টাকা দিয়ে আজীবন খাটাইল। সেই কোমর পার হওয়া জলে দাঁড়িয়ে দিগবিজয় বাবু বন্ধুক তাক করে ধরেন ওদের দিকে। “হারামজাদা। তোরাও মর তাহলে।” বগাং বগাং ছুটো শব্দ হয় সাথে সাথে ছুটো গুলির শব্দ। অঙ্কার। গুলি লাগে নি। দিগবিজয় বাবুর ধন্দের পাঞ্জাবীর পকেটে আরও কয়েকটা এল-জি আছে। সেগুলো এখন জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। বন্ধুকটা অর্ধহীন এখন। “রামপিরিত”

“জি হুয়”

“আমার বাঁচা। আমি যে সঁাতার শিখিনি।”

এক মুহূর্ত কি বেন ভাবে রামপিরিত। তারপর বলে, “আমার বাবা মরার আগে ঠিক এই কথাই বলেছিল বাবু আপনাকে। আমার বাঁচান

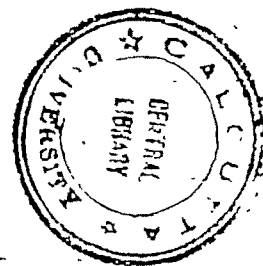
মোকামা হাসপাতালে নিয়ে বান। তখন নৌকাটা চরায় বাধা ছিল।
 ১- মাধো সিংএর ভাড়াওয়া গুলি লেগেছিল ওর পেটে। আপনি
 বলেছিলেন তা হয় না রে। মোকামা যেতে যেতে মারা বাবি তুই।
 “ওকে মোকামায় নিয়ে গেলে হয়ত বেঁচে যেত।”

“না-না বাঁচত না।”

গর্জন করে ওঠে রামপিরিত। “বাঁচত। কিছু পুলিশ কেস এড়াবার
 অল্প ওকে মোকামা হাসপাতালে নিয়ে বান নি।”

“এসব কথা এখন বলিস না রামপিরিত। তোকে আমি অনেক টাকা
 দেব। একলক্ষ—দু-লক্ষ। তুই বা চাইবি তাই দেব।”

৬- সেই অঙ্ককারে হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ করে অট্টহাসি হাসে রামপিরিত,
 “আপনার পকেটের গুলিগুলো ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে বাবু, তা না
 হলে আমাকেও গুলি করতেন এতক্ষণে। আর কোন উপায় নেই বাবু।
 চরায় একটা গাছও নেই বার ডালে উঠে বসবেন। একটা কাঠের টুকরো
 নেই বা ভয়সা করে ভেসে যাবেন। আপনি এখন এখানেই থাকুন।
 বর্ষাকালটা জমির পাহারা দিন একা একা। অল নেমে গেলেই আমরা
 আবার ফিরে আসব।” বর্ণনা করে গভীর জলে ঝাঁপ দিল রামপিরিত।
 প্রাণবন্ত মাছের মত সাতার কেটে এগিয়ে গেল অঙ্ককারের ভেতর
 দিয়ে।



বিষয় সময়ের ভার

১৯২০ সালে সোভিয়েত অভিনেতাদের উদ্দেশ্যে আলেকজান্ডার ব্লক যে কথামূলি বলেছিলেন লিয়ার বিষয়ে তা খুবই মনে পড়ে কজিন্ত্শেভ-এর ‘কিং লিয়ার’ ছবিটি দেখতে দেখতে। “All’s cheearless, dark and deadly”—কেট-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করে ব্লক বলেছিলেন—‘এই ট্রাজেডীর সবকিছুই অন্ধকার আর বিষাদে আচ্ছন্ন’—কজিন্ত্শেভ-এর সমস্ত ছবি জুড়েও হুলতে থাকে বিষাদ ভারাক্রান্ত এক ক্ষীণালোক অম্পটতা। ‘কিং লিয়ার’ বিষয়ে তাঁর নিজের লেখাতে কজিন্ত্শেভ উল্লেখ করেছেন—এ নাটকের প্রকৃতিচিহ্নগুলি যেন অচ্ছন্ন পতিবান, পরিবর্তনশীল। আর মঞ্চে থাকে দেখানো যায় না সেই বড়ের দৃষ্টই, ব্লকের কবিতা উদ্ধৃত করে বলেন কজিন্ত্শেভ—‘একক সঙ্গীতের টান’, যাতে বাঁধা পড়ে আছে নাটকের সমস্ত ঘটনা। তাই তাঁর ছবিতে আকাশ জুড়ে সঙ্করমান মেঘ—কখনো পটভূমি, কখনো নিজেই বিষয়। ‘নিবিড় নীল’ নয় সে মেঘ, নিছক কালো, অমঙ্গলের দূত; শুধু একবার মেঘের কিনারে খচিত হয় তীব্র আলো, যেন কালোকে আরো কালো করতে—সেই চরম বড়ের দৃষ্টের সূচনায়, যেখানে ফুরোয় ছবির প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয় বড় দিয়ে। আর শুধু সেই দৃষ্টটি দেখার ইচ্ছাতেই এ ছবি বারবার দেখেও ফুরোবে না—হায়না আর নেকড়েব সম্ভ্রান্ততার পরেই আকস্মিক কোথা থেকে ছুটে আসে বস্ত্র ছোড়ার দল, সত্যাকৃতিচ্-এর অসাধারণ সঙ্গীতের তালে তালে নাচতে থাকে তারা, তারপর বড় আর বৃষ্টির বিশাল পটভূমিতে দেখা দেয় খেলনা দুই বাছ—লিয়ার আর তার ভাঁড়।

অথচ ক্লোজ-আপ-এ দেখা যায় না এদের আঁর্ত মুখ, পুরো ছবিতেই ক্লোজ-আপ বিরল, স্রষ্টা তুলে ধরতে চান পুরো পরিপ্রেক্ষিত। কী তার বৈশিষ্ট্য? আবার মনে পড়ে ব্লক-এর কথা—এ নাটকের সব চরিত্রই যেন ক্লক আর তিক্ত

—সেই রক্ততাই ফুট ওঠে ছবির পুচনায় মরা-পাথরের টাই সাজানো বহ্যু-
 ৬ প্রকৃতির পটভূমিতে—বার ভিতর দিয়ে ক্লাস্তি-ভাঙা শরীর টেনে নিয়ে
 চলেছে নিঃশব্দ—তাদের চাবের জরি কেড়ে নিয়েছে পশম-লোভী বণিকের
 দল। ঘুলোর নতজাছ হয়ে এইসব মানুষ বাকে বেধে সেই লিয়ার এসে
 দাঁড়ান জর্গ-প্রাসাদের চূড়ায়। এই বিরাট অসমতার বৈপরীত্যে হতভো-
 রাধতে চান পরিচালক ভবিষ্যতের ঘটনাবলী—অসমতার অবসান ঘটবে
 একদিন, বানানো অগ্ন থেকে সত্যি অগ্নিতে এসে দাঁড়াবেন লিয়ার—উদ্বাহ
 হয়ে জানবান হবেন।

এইভাবে, অন্ধকার আর রক্ততায় জমাট ছবির শেষে দেখা যায় সর্ব-ব্যাপী
 ৭ বিশাল এক অস্বিকৃতি, বাইরের দিক থেকে বার কোনো প্রয়োজন ছিল না, শুধু
 “I am bound / upon a wheel of fire”—লিয়ারের এই উক্তির পুরো
 রূপটি তুলে ধরা ছাড়া। ‘কিং লিয়ার’ এমনই এক ট্রাজেডী, বার মধ্যে কোনো
 কমিক রিলিফ নেই, এমনকি তাঁড়ের মুখের কথাও নিষ্ঠুর বিজ্ঞপমাাত্র।
 কজিন্ত্বেষে বেন তাতে যুক্ত করেছেন আমাদের নিজস্ব সময়ের
 ভার। কলকাতার হর্ষক সহিতে পারেন নি এ ছবি, হল ফাঁকা
 পড়ে থেকেছে, ধারা এসেছেন, তাঁরাও অনেকে উঠে গেছেন মাঝপথে।
 তবু, যে হর্ষক কোনো-না-কোনো ভাবে নিজের চেতনায় অহুতব করেন এই
 সময়ের ভার, তিনি একান্ত হয়ে উঠবেনই এ ছবির সঙ্গে। এ ছবির গুণ
 পরিচালকের দক্ষতায় নয়, পরিচালকের উপলব্ধিতে।

অবশ্য তাই বলে দক্ষতার কোনো অভাবও নেই এ শিল্পকাজে। কি-
 ঘটনা-বিত্তাসে, কি তার অভিনয়ে, কি আলোছায়ার কারিগরিতে, কি সংগীতে,
 দীর্ঘ ও গভীর চিন্তার ছাপ সর্বত্র। ৪১ সালে ‘কিং লিয়ার’ মকে প্রযোজনা
 করেন কজিন্ত্বেষ, আর ‘কিং লিয়ার’ বিষয়ে নিবন্ধটি প্রকাশ পায় ৬২
 সালে তাঁর লেখা ‘আমাদের সমকালে শেক্সপীয়র’ নামে বইটিতে (তারও
 অনেক পরে এই চিত্র-রচনা)। এই বইতেই ‘হামলেট’ পরিচালনার সময়ে
 ভারেরিতে লেখা ভাবনা-কথামূলি পাই আমরা—যাতে বিবৃত আছে তাঁর
 চলচ্চিত্র শিল্পের ধারণা। সেখানেই তিনি লক্ষ্য করেছেন শেক্সপীয়রের
 নাটকের রূপায়ণে প্রটেক অহুতব করাই প্রধান নয়, চলতে হবে তার ভাবনা,
 তার কবিতার পথ ধরে। এইজন্মে ‘কিং লিয়ার’-এ ঘটনার দিকের অনেক
 কাঁটকাঁট নজরেই আসে না, দেখ বা বড়ের দৃষ্টের বাহ্যচুহু অত্যন্তকৌত
 বনে হয়।

একটিমাত্র প্রশ্ন তোলা যায়—তঁাড়টিকে আবার কিরিয়ে নিয়ে আসার সত্যিই কোনো যুক্তি আছে কি না। কামা তুলে নিয়ে তঁাড় তার হাতের বাঁশি জীবনের ছন্দে বাজিয়ে দেয়—হৃদতো পরিচালকের চোখে তঁাড়ই এ নাটকের প্রাজ্ঞতম মাহুয। অভিনয় প্রসঙ্গে কজিন্ত্শেভ শেকভ উদ্ভূত করে বলেন—‘যন্ত্রণাবিহীন মাহুয গোমরায় না, পাখর হয়ে যায়—কিংবা ঠাট্টা করে, শিব দেয়’—লিয়ারের শাস্তমুখ শাস্ত স্বর তাই তীরের মতো বেঁধে সেইসব সময়, যখন সে বলে—‘কে আমি, আমিই কি লিয়ার?’ কিংবা ‘কাদব না আমি, যতই কামার কারণ থাক।’ কিন্তু বড়ের দৃষ্টে কিংবা শেষ দৃষ্টে, ঝড়ের সঙ্গে লিয়ারের স্বরকে সঙ্গত করেছেন পরিচালক—‘কামা তাব বিদ্যুৎ বা আন্তনজালা চিংকার’—বিজু দে’র এই চরণই যেন মুক্ত এখানে। শিল্পীদেব অন্তর্মুখী অভিনয়কে অনেকখানি সাহায্য করেছে তাদের বাছাই করা মুখ—গনোরিল, রিগ্যান আর কর্ডেলিয়া—তিনটি মুখেই যেন লেখা আছে তাদের মন। গনোরিল আর রিগ্যান দুজনেই পাষণ্ড-হৃদয়, কিন্তু রিগ্যান সেইসঙ্গে আবার সংকীর্ণমনা—কজিন্ত্শেভ-এর চোখে তাদের এই পার্থক্য তাদের মুখসম্মাই বলে দেয়। আর লিয়ার—তার প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালন জানিয়ে দেয় যে সে রাজা—‘Every inch a king’। অথচ লিয়ার বা তার কস্তাদের সাজ-পোশাকে অলঙ্কার নেই তেমন। হুবহু যুগোপযোগী সাজ পোশাক, তার ঐতিহাসিক কিংবা ভৌগোলিক পুঙ্খানুপুঙ্খের প্রয়োজন স্বীকার করেন না কজিন্ত্শেভ, শুধুমাত্র বহিঃ-রেখায় ঐতিহাসিকতাই সাজের পক্ষে যথেষ্ট তাঁর মতে। তবু, সাধা-কালোতেও গনোরিল বা রিগ্যানের পোশাকের মহার্ঘতা দর্শকের কাছে স্পষ্ট।

পোশাকের কথা উল্লেখ করছি এইজন্য, যে, ‘কিং লিয়ার’-এ পোশাকের চিত্রকল্প যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে—কজিন্ত্শেভ তা লক্ষ্য করেছেন। ‘উল্লেখের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে তোলা কাপড়ের কেউ বা রাজা কেউ বা ভিখিরী’ বলেছিল রক্তকববীর অধ্যাপক, আর সে কথা এসেছিল ‘বানিয়ে-তোলা কথা’-রই প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের ‘কিং লিয়ার’ মনে পড়েছিল ‘কি না জানি না, কিন্তু ‘কিং লিয়ার’-এর ট্রাজেডিও বানিয়ে-তোলাই ট্রাজেডি, ‘বানিয়ে-তোলা কথা’ থেকে ‘বানিয়ে-তোলা কাপড়’ পর্যন্ত। সেই বানিয়ে-তোলা অগৎ থেকে নিষ্করণ ঘটল, তিনি যেখানে পেলেন পোশাকহীন মাহুয, খোলা আকাশের তলায় বিরাট পৃথিবীতে সব মাহুযের দুঃখে সামিল হলেন লিয়ার। কিন্তু পথ সহজ নয়, তাঁকে সামগ্রণ্ডে কিরিয়ে আনতে প্রাণ দিল

কর্ডেলিয়া, ভালোবাসার শহীদ। কজিন্ত্বেশেভ মতে, শেক্সপীরার
 ভালোবাসা সব সময়েই শহীদ—কেন না এই ইম্পাতের যুগের না-ভালোবাসাকে
 সে জীবন-পণ চ্যালেঞ্জ করে। তাই ইংরেজ পরিচালক ঝক বে কেট—এর
 “Oh, let him pass! He hates him...”—এই সংলাপেই প্রাণান্ত
 দেন শেষে, কজিন্ত্বেশেভ তা সমর্থন করতে পারেন না। তাঁর ছবি লিয়ায়ে-
 কান্নাতেই ফেটে পড়ে, যেন চতুর্দিক চিরে চিরে ধ্বনিত হয়—নিরেত নিরেত
 নিরেত...। “That things might change or cease”—পংক্তিটি স্মৃতিত
 হয় তাতে। নিছক একজন মানুষের ভুল নয়—পাপ রয়েছে সময়ের পটে।
 শেষে মেধা যায়—সাধারণ মানুষ জল ঢেলে অগ্নি নির্বাপন করছে—আবার
 বাঁচবার আয়োজন—আর মেধা যায় এড়গাঁরের শাস্ত মুখ, কোনো শব্দ নয়,
 কথা নয়—যেন তার দৃষ্টিই বলে দেয়—

“The weight of this sad time we must obey,

Speak what we feel, not what we ought to say.”

সুতপা শুট্টাচার্য

Renaissance in Bengal : Search by Identity / অরবিন্দ গোস্বামী / ইন্ডিয়ান ইন-
স্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড্‌ স্টাডিজ, সিবলা / ১৯৭৭

“আমাদের এখন বথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী
সৃষ্টি করতে—যারা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে
শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানকারী। এই
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে ও রক্তে ভারতীয়, আর রুচিতে,
মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।” (ঐযুক্ত নয়রহি কবিরাজকৃত
অনুবাদ)। ঔপনিবেশিক শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য যে একদল
শিক্ষিত ‘নেটিভ’-এর প্রয়োজন তা বুঝেছিলেন মেকলে সাহেব আর
সেদেই ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পক্ষে তাঁর বক্তব্য ছিল খুব পরিষ্কার।
তবু মেকলেই নয় সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর অনেকেই ক্রমে বুঝে-
ছিলেন এই প্রয়োজনের কথা আর তাই ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থাও
গড়ে উঠল ধীরে ধীরে এই বাংলাদেশে। শাসক গোষ্ঠীর প্রয়োজন হরত
মিটল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে এক জাগরণের স্ফুটও তৈরী হয়ে
গেল। বস্তুত, কুসংস্কার আর নোংরা বাবু-কালচারের ঘেঁষে ইংরেজী
শিক্ষার অভ্যাস যে এক আলোকবর্তিকার কাজ করেছে সে-সম্পর্কে উনিশ
শতকের বাংলাদেশ বিষয়ে আগ্রহী কোনো গবেষকই বোধহয় দ্বিমত
পোষণ করেন না। ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য বাঙালী সমাজ যে সে-সময়ে
সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক বিষয়সমূহে এক যুগান্তর
ঘটাবার আয়োজন করেছিলেন তা বতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন
ঐতিহাসিকভাবে এর অপরিণাম গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একদল অশিক্ষিত
নেটিভ কেরানীর প্রয়োজন ছিল বিদেশী শাসকবর্গের আর সেই কেরানীদল

ঐতরীয় জন্ম সংস্কৃত-কাসীর সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ঘটল বাংলাদেশে। আর তারই ফলে পাশ্চাত্য ভাবধারার বহু ছয়ার খুলে গেল এদেশের মধ্যবিত্ত বেনীয়ান, মুংহুদী, মুল্লী, সেয়েতাদার আর চিরস্থায়ী বন্সোবত-জাত জমিদারদের বংশধরদের সামনে। সৃষ্টি হল নতুন এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর, বারার রঙে-রঙে ভারতীয় হলেও ইংরেজী শিক্ষার দৌলতে ‘কচিতে, মতে, নীতিতে, বুদ্ধিতে’ হয়ে উঠলেন ইংরেজের সমগোত্রীয়। দেশ-বিদেশের সংগ্রামের ইতিহাস, সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রীর মন্ত্র, বিজ্ঞানের অগ্র-গতির কথা জেনে গেলেন এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আর বীরে বীরে বিকশিত হল এদেশের মাটিতে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার।

দুই যুগেরও বেশী অতিক্রান্ত হয়েছে ‘বঙ্কিম মানস’-এ উনিশ শতকের বাংলাদেশে এই আগরণের (আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণে বঙ্কিম ভঃ পোন্ধর ‘রেনেসাঁস’ কথাটা ব্যবহার করেছেন এবং সেটা নিশ্চয়ই অসতর্ক ব্যবহার নয়।) যে মনোজ্ঞ বস্তুভিত্তিক আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন ভঃ পোন্ধর, আলোচ্য বইটিতে সে-বিষয়ের আরও দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌল কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। উনিশ শতকে ইংরেজী-চর্চার যুগে অগ্রসর শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে যে ইংরেজ প্রেম, ইংরেজ শাসনের প্রতি যে মুগ্ধ মনোভাব আর বিদেশী প্রভুদের সম্পর্কে যে অবিমিশ্র প্রচার ভাব দেখা যায়, ভঃ পোন্ধর তার নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং আহুগত্যের এই ধারার পরিণতিতে ক্রমশঃ যে জাত্যাভিমান, ঐতিহ্যাহুগাগ এবং সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি অহুগাগ সঙ্গে ওঠে তার বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ‘রেনেসাঁস’ বিষয়ে ভঃ পোন্ধরের বর্তমান গবেষণা কর্মের দ্বিতীয় বই এটি, এর আগে প্রকাশিত হয়েছে *Renaissance in Bengal: Quests and confrontations* [1800—1860]।

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে বাঙ্গালী বিষংসমাজ গড়ে ওঠে উনিশ শতকের একেবারে গোড়াতেই। রামমোহন থেকেই স্পষ্টতঃ এই বাজ্রা স্তম্ভ, অন্তত আমাদের দেশের আগরণের কাল নির্ণয়ে এ মতটাই এখন স্বীকৃত। পশ্চিম মনোবীরা ইংরেজী আবহাওয়ায় মাহুত, ইংরেজদের সংস্পর্শে এসেই তাঁদের বুদ্ধিশার মুক্তি ঘটেছে। পাশ্চাত্য জ্ঞানের ছোঁয়াতেই তাঁদের দেশ-কাল সযত্নে বোঝা জম্মাল। অর্থহীন লোকাচার আর অনাচারের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ সংস্কারমুখী আন্দোলনও গড়ে উঠতে

শুরু করল। বাঙালী বুদ্ধিবীরা সকলেই ব্রিটিশ-শাসনের গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে উঠলেন, ইংরেজী আদব-কায়দাকে বুঝলেন সভ্যতার নিদর্শন রূপে। চিন্তায়, ভাবনায়, মননে, বচনে এঁরা হয়ে উঠলেন খাঁটি সাহেব। ঐষ্টধর্মও মুক্তির নতুন পথ দেখাল। ডঃ পোন্ধার এই ব্যাপারটাকে বলেছেন অ্যাংলো-ফিলিজম্। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রতি এই প্রেমের জোয়ারেও ক্রমশঃ ভাঁটার টান দেখা দিল। ইংরেজ-গুণমুগ্ধ ভক্ত-সম্প্রদায়ে সংশয় আর বিরাগের ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। কারণ ছিল পরিচয়। ইংরেজী শিক্ষিত বিহঙ্গসমাজের আচরণ ক্রমে বিদ্রোহের আকার ধারণ করবে, এদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন আর শোষণ নিশ্চিত পতিতে অব্যাহত থাকবে না—এই আশঙ্কা ঔপনিবেশিক শোষণ-দের বরাবরই ছিল। আর সে-কারণেই ব্রিটিশ শাসকেরা এমন কতগুলি বিভেদমূলক শাসনের রীতিনীতি ও বৈষম্যমূলক প্রথার বেড়া জাল তৈরী করে রেখেছিল বা অচিরেই নব্য বিহঙ্গসমাজে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিরাগ সৃষ্টি করল। ডঃ পোন্ধার আলোচ্য বইএর প্রথম অধ্যায়েই (Withering Horizon) অ্যাংলো-ফিলিজমের দ্বারা এই অবক্ষয়ের কয়েকটি কারণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। লেখক বলেছেন ইংরেজ শাসকদের আতিগত বৈয়তিকতা, সরকারী চাকুরি ও অন্যান্য নানা প্রতিষ্ঠানে দেশীয় লোকদের প্রতি অসম্মানজনক ও বৈষম্যমূলক ব্যবহার এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিক শোষণের ক্রমবর্ধমান মাত্রা ইংরেজী শিক্ষিত দেশীয় নেতাদের কাছে বরা পড়ে বাগুয়ায় ক্রমে তাঁরা বিমুগ্ধ হতে শুরু করেন। কোম্পানীর রাজত্বের অবসানের পর ব্রিটিশ শিল্প-পুঞ্জির আর্থে ভারতবর্ষকে একটি কুবিজাত কাঁচামালের বেশ হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারেও নেটিভ বিদ্বজ্জনদের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতি বিষয়ে ক্রমবর্ধমান মনোবোগ দেখা দিল। এইভাবে স্বদেশের ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতির সঙ্গে স্বদেশকে চিনবার, স্বদেশের মানুষকে জানাবার আকাঙ্ক্ষা বরা পড়ল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর চিন্তায়, দর্শনে, ব্যবহারিক রাজনীতি বা সমাজচেতনায়। দেশীয় নেতাদের এই ‘আইডেনটিটি’ খুঁজবার ব্যাপারটাই মূল উপজীব্য বিষয় করেছেন ডঃ পোন্ধার এই বইতে। এবং অ্যাংলো-ফিলিজম-এর দ্বারাতে মূলতঃ ছেদ ঘটলেও স্বদেশাভিমানী মনসী-দের চরিত্রে পেে অন্তরীকরণ আর সীমাবদ্ধতা দেখা যায় লেখক তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন।

খাটি বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও কেশবচন্দ্র সেন চিন্তার-বুদ্ধিতে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারায় নিজেকে দীক্ষিত করে তুলেছিলেন এবং সনাতন হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নৈতিক-সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁর খ্রীষ্টচিন্তার কথাও আমাদের সবার জানা। সর্বোপরি মহর্ষি অবেশ্বনাথের একনিষ্ঠ শিষ্য হয়েও তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালন সংক্রান্ত ব্যাপারে যে স্বৈরাচারের অভিযোগ তুলেছিলেন এবং কালক্রমে যে নতুন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করলেন ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ইতিহাসে তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এতসব যুগান্তকারী ক্রিয়া-কাণ্ড সত্ত্বেও জীবনের বিভিন্ন সময়ে কেশবচন্দ্রের চরিত্রে যে অন্তর্বিরোধ লক্ষ করা যায়, যে স্ববিরোধ তাঁর সামাজিক বিচ্ছিন্নতার হেতু হিসেবে কাজ করে, তাকে ডঃ পোন্ডার খুব সংগত কারণেই পাশ্চাত্যাহরণ ও সনাতন ধর্মজিজ্ঞাসার মধ্যে বন্দ্ববশে চিহ্নিত করেছেন। খ্রীষ্টচিন্তার সঙ্গে চৈতন্যপ্রেম, নিরাকার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে রাসকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি তাঁর অমুরাগ, কিংবা নেতিষ্ঠ ম্যারেজ অ্যাক্ট পাশের অসামান্য সাকল্যের পর কুচবিহার রাজ পরিবারে নিজের অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহের আয়োজন, ইত্যাদি ব্যাপারে এই বন্দ্ব স্পষ্ট।

'অ্যাংলো-কিলিজম'-এর এক স্পষ্ট উদাহরণ অবেশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজি শিক্ষিত 'পাড়া লাহেব' আই. সি. এস. অবেশ্বনাথ স্বদেশের উন্নতি-চিন্তায় তৎপর হলেন সিভিল সার্ভিস থেকে পদচ্যুত হবার পর। চাকুরি কিরে পাবার বহু চেষ্টাও করেছিলেন তিনি বহিঃ সফল হন নি। আমরা জানি না চাকুরি কিরে গেলে অবেশ্বনাথের পরবর্তী রূপ কেমন হ'ত। মাংসিনি-গ্যারিবন্দির জাতীয়তাবাদের তীক্ষ্ণ আদর্শ তাঁর স্বদেশ চেতনার বহিঃ খুব সোচ্চার মূলত তা ছিল বহুতায় সীমাবদ্ধ। বাস্তবে তোষামোদ আর আবেদন-নিবেদনের পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। ইংরেজ শাসকদের অমুগ্রহ আদায় করেই দেশীয় জনগনের মুক্তির পথ প্রশস্ত করা বাবে—এরকম এক বিশ্বাস এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দাবীদাওয়ার ব্যাপারে সংগঠিত গণ-আন্দোলনের প্রতি বিমুগ্ধতা তাঁর ইংরেজ শাসনামুরাগের চেহারাটা আরও স্পষ্ট করে তোলে। নরমপন্থী আন্দোলনের নেতা অবেশ্বনাথ তাঁর চরিত্রের সীমাবদ্ধতা ও বন্দ্ব আরও স্পষ্ট করে প্রকাশ করলেন বহুভঙ্গ আন্দোলনে। সে-সময়ে বিপিনচন্দ্র প্রমুখেরা যখন আবেদন-নিবেদনের পথ ছেড়ে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার চরমপন্থা অবলম্বনের প্রতিজ্ঞার কথা জানানো

অধৈশবানীকে, সাম্রাজ্যবাদীদের বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে বিরোধোদ্ভূত আলিয়ে তুললেন, আপোষপন্থী স্বরেজ্ঞানাথেরা এর বিরোধিতা করলেন। বিক্রপ করলেন চরমপন্থীদের উদ্দেশ্যে ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ ও ‘মিঃকল্ মন্ডার’ ইত্যাদি মন্তব্য ছুঁড়ে দিলে। রাষ্ট্রের সম্পর্কে ডঃ পোন্ধারের মন্তব্য তাই খুব অকপট মনে হয় যখন তিনি বলেন—“It is a queer fun of recent history that the man who had very often been hailed as the Father of Indian Nationalism could, for all intents and purposes, hardly be called a nationalist at all” (পৃ ৮০)।

চরমপন্থী আন্দোলনের নেতা বিপিনচন্দ্র পালের রাজনৈতিক জীবনে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর্যায়েই অর্থাৎ ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালে। এই সময়ে তাঁর ওজস্বিতার সপ্রশংস উল্লেখ করেই ডঃ পোন্ধার বিপিনচন্দ্রের মতাদর্শে ও জীবনে অন্তর্ভুক্ত অবিরোধ লক্ষ করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে স্বরেজ্ঞানাথের ভাবমত্রে উদ্ভূত হয়ে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা শুরু করেন বিপিনচন্দ্র এবং সেটা ছিল তাঁর অবসর বিনোদনের উপায়। ১৯০২-৩ সালে দেখা গেল তাঁর ঘনিষ্ঠ ঘোণাবোণ রাজনীতির সঙ্গে এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই বিদেশী অপশাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণায় তিনি বর্জন করলেন আপোষপন্থী তোষামোদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা। ঝাঁপিয়ে পড়লেন বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। কিন্তু এ-আন্দোলনের পরই বিপিনচন্দ্র গেলেন ইংল্যান্ডে, কিংবে যখন এলেন দেখা গেল অস্ত্র এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সেই ‘Fire-spitter’ বিপিনচন্দ্র আর নেই, তিনি এখন ব্রিটিশ ক্যেভারাল আর এম্পায়ারের স্বার্থক্ষেত্রের বিরোধের। স্বরাষ্ট্রের স্লোগান আর তুলেও উচ্চারণ করেন না কখনও। এই পরিণতি যথেষ্ট পীড়াদায়ক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এবং বৈশ্বব্রত্যাগ নেতৃবর্গের চরিত্রের এই অবিরোধ প্রসঙ্গে ডঃ পোন্ধারের বিশ্লেষণই বিশেষ যুক্তিসঙ্গত—“It, however, spotted once again the kind of split personality and psychological dualism most of the Bengali stalwarts of the nineteenth century developed, with their identity blurred and loyalty shifting from England to India, and back again from India to England, from subservient patriotism to militancy and back from militancy to subservience” (পৃ: ১৪৫)।

- পাশ্চাত্যভাবের পরিবেশে প্রতিপালিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
- ৬ প্রথম স্নাতক বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য ও সমাজভাবনায়ও এই অন্তর্বিরোধ ছিল অতি প্রবল। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হবার বিপুল বাসনা এবং স্বদেশবাসীর হুঃখ-হর্দশার প্রতি তাঁর একান্ত সৃষ্টি যেমন বুঝতে পারা যায় তাঁর অন্তর প্রবন্ধ-নিবন্ধের চিত্তায়, ঠিক তেমনই ইংরেজ শাসনের অপরিহার্যতার কথা বাববার ঘুরেফিরে আসে বন্ধিমমানসে। ডঃ পোন্ধার যথার্থই ধরেছেন সে স্ববিরোধ, 'অ্যাংলো-ফিলিস্তিন' এর রেশ যে বরাবরই থেকে গেছে বন্ধিমচন্দ্রের সে-সিদ্ধান্তও নিতুল। তবে এ-আলোচনা প্রসঙ্গে লেখকের একটি মত আমাদের কিছুটা ভাবিয়ে তোলে।
- ৭ সাম্প্রদায়িকতার যে-অভিযোগ বন্ধিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে অতি প্রচলিত, ডঃ পোন্ধার তাঁর একান্ত বিরোধিতা করেছেন। লেখক বলেছেন, হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারে আপাতভাবে বন্ধিমচন্দ্রকে মুসলমানবিরোধী মনে হলেও সেটাই শেষ কথা নয়, ব্যাপারটার বিশ্লেষণে আরও সতর্ক হওয়া উচিত। কেননা। একালে বাঙালী বলতে এইসব যুগন্ধর পুরুষেরা প্রায় প্রত্যেকেই হিন্দুদের কথাই ভাবতেন, হিন্দুদের সমস্তাৎকেই প্রাধান্য দিতেন, মুসলমানেরা তেমন গুরুত্ব পেত না। এমন কি রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের চিন্তাতেও ওই একই ধারা লক্ষ করা যায়। এবং ডঃ পোন্ধারের বক্তব্য, এতে মুসলমানদের প্রতি কোনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব কাজ করেছে এমন ধরে নেওয়া ঠিক নয়। ডঃ পোন্ধার তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে আরও কিছু গুঁচরো প্রমাণ দিয়েছেন। যেমন, আনন্দমঠ উপজ্ঞানের তৃতীয় পরিচ্ছেদে যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে বন্ধিমচন্দ্র যখন 'ধবন', 'নেড়ে' শব্দগুলি ব্যবহার করেন তখন তা যে ঔপন্যাসিকের আসল মানসিকতা নয়, তা বর্তমান গবেষক প্রমাণ করেছেন উক্ত উপজ্ঞানের প্রথম সংস্করণের পর্বেচ্ছার করে। ডঃ পোন্ধার বলেছেন যে, প্রথম সংস্করণে 'ধবন', 'নেড়ে' শব্দগুলি ছিল না, এইসব শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছিল 'ইংরেজ' শব্দটি এবং সম্ভবত রাজরোষ এড়াবার অন্তর্গত ঔপন্যাসিককে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দগুলি ব্যবহার করতে হয়েছে। লেখকের এই যুক্তি যে খুব সবল নয় তা প্রমাণসেই বোধহয় প্রমাণ করা যায়। প্রথমত, যুদ্ধের বর্ণনাতে 'ইংরেজ' শব্দটির ব্যবহারই রাজরোষের একমাত্র কারণ হবে তা মনে করার কোনো হেতু নেই। ডঃ পোন্ধার যখন নিজেই স্বীকার করেছেন অন্তর যে,
- “Anandamath was definitely and entirely an anti-British

novel" এবং নিশ্চয়ই শুধুমাত্র ওই 'ইংরেজ' শব্দের ব্যবহারেই আনন্দময় নিশ্চিত ও সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ-বিরোধী উপস্থানে পর্যবসিত হয় নি। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার এবং হিন্দুস্বাধীনতার স্বপ্নের ঔপন্যাসিককে যে 'অন্তঃ' 'বন', 'নেড়ে', 'নেড়ে' শব্দগুলি ব্যবহারে উৎসাহিত করেছিল তা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? তৃতীয়ত, 'ইংরেজ' শব্দটির ব্যবহার শাসকবর্গের কাছে আপত্তিকর হবে এরকম ভেবে ঔপন্যাসিক বিকল্প শব্দ হিসেবে 'বন' 'বন' আত্মীয় শব্দগুলি বেছে নেন তা যে মুসলমানদের ক্ষুব্ধ করতে পারে— সে চেতনা কি বিচক্ষণ চিন্তানায়ক বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি? এবং সেই ক্ষেত্রে এই অজ্ঞান কি নিতান্তই অসঙ্গত হবে যে 'বন' বা 'নেড়ে' শব্দের প্রয়োগ বুদ্ধিমত্তার সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ?

'সীতারাম' উপন্যাসের আদি সংস্করণ থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন ডঃ পোদ্দার এবং জানিয়েছেন যে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তা পরিহার করেছেন বুদ্ধিমত্তা। উল্লিখিত অংশে হিন্দু-মুসলমানের সমানধিকারের কথা এবং মুসলমানদের সমান দৃষ্টিতে না দেখলে হিন্দু সাম্রাজ্যকে যে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। এরকম এক বক্তব্য বলান হয়েছে খুব স্পষ্টভাবে বুদ্ধিমত্তার মুখ দিয়ে। কিন্তু কেন ঔপন্যাসিক পরবর্তীকালে এ-মংশটুকু বর্জন করলেন। সে-প্রশ্ন কি খুব অবাস্তব হবে আধুনিক পাঠকের জিজ্ঞাসায়? শুধুমাত্র শিল্পগত প্রয়োজনে উক্ত অংশ বাদ দিতে হয়েছে—এ-বক্তব্যও তো নিতান্ত অজ্ঞানমাত্র।

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার মধ্যে যে পরস্পরবিরোধী মানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায় তা বিচার করে ডঃ পোদ্দারের সঙ্গে আমরাও সম্পূর্ণ একমত যে, এ বিষয়ের বিশ্লেষণে আমাদের খুব সতর্ক হওয়া দরকার। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপসংহারে যে কথাগুলি বুদ্ধিমত্তা বলেছেন, ".....কোনো পাঠক মনে না করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের কোনো প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য..." ইত্যাদি, বার উদ্ধৃত ডঃ পোদ্দারও করেছেন, সে-ধরনের বক্তব্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও আছে বুদ্ধিমত্তার অজ্ঞান নানা রচনায়। যেমন, 'ভারত কলঙ্ক' 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'বঙ্গদেশের কলঙ্ক' 'বাঙ্গালার ইতিহাস' 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' ইত্যাদি নানা প্রবন্ধে বুদ্ধিমত্তার অসাম্প্রদায়িক বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু সেসব সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তার হিন্দু আত্মীয়তাবাদের প্রতি তীব্র আসক্তি, যা মূলতঃ

তঁার কাল ও পরিবেশচেতনার প্রত্যক্ষ ফল, কি মান হয়ে যায় ?
 ৫ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘাত ঘটুক—তা না চাইলেও বহুমুখের
 চিন্তার স্বার্থে যে হিন্দুভাষণ, হিন্দুধর্ম, হিন্দু শিল্প-সংস্কৃতি ও হিন্দু সমাজ-
 বোধের দিকে বেশ প্রবল সমগ্র বহুমুখপাঠে তা কি অস্বীকার করা
 যায় ? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডঃ পোদ্দারের আলোচিত যত্নের সঙ্গে সম্প্রতি
 প্রকাশিত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের একটি প্রবন্ধে (‘হিন্দু-মুসলমান
 সমাজ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ’, পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৯৭৮) বিশ্লেষিত
 যত্নযত্নের বিশেষ মিল লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক সেনও মন্তব্য করেছেন,
 “ইতিহাসপ্রজ্ঞার দৃষ্টিতে তঁার (বহুমুখের) কাছে হিন্দু-মুসলমানের
 ৬ ধর্মগত পার্থক্যটা কখনও প্রাধান্য পায়নি, প্রাধান্য পেয়েছে সামগ্রিকভাবে দেশের
 জনকল্যাণের প্রসঙ্গটা”।

জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বেশ অগ্রসর অবস্থা পরিলক্ষিত হয় একদা
 সংগ্রহবাদী ইংরেজী শিক্ষিত যুগক নরেন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালের পাশ্চাত্য-
 স্তাবমন্ত্রে দীক্ষিত ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ শিষ্য বিবেকানন্দের
 মধ্যে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষ ও গরিমার কথা সমগ্র বিশ্ব-
 বাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েই এই ধর্মীয় নেতা দ্বন্দ্ব ছিলেন না। তঁার সমগ্র
 জীবনে দেশের যুবসমাজকে যে কর্মপ্রেরণা ও জাতীয়তাবোধে উদ্বীপিত
 করেছেন তা রীতিমত উল্লেখযোগ্য। ডঃ পোদ্দার খুব সংগতভাবেই
 বিবেকানন্দের এই অবদানের ব্যাখ্যা করেছেন এবং তঁার জাতীয়তাবাদী
 আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ
 করেছেন। গ্রন্থকার বলেছেন, স্বদেশের পরিমা প্রচার করে ও স্বদেশ-
 বাসীকে কর্মমুখী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে বিবেকানন্দ সে-যুগের ইতিহাসে
 এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন তা অস্বীকার না
 করলেও, তঁার স্বদেশের দায়িত্বমোচনের চিন্তা ব্যবহারিক রাজনীতির
 প্রতি ব্যাপক অনাস্থা, বা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক বোধপ্রসূত, যেমোটেই
 বাস্তবসম্মত চিন্তাধারা ছিল না তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বন্দেমাতরম মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পরিবেশে বর্ষিত অরবিন্দ
 বোস স্বাভাবিকভাবেই আর এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। অরবিন্দের পিতার
 কড়া নির্দেশ ছিল যাতে তঁার পুত্রের চরিত্রে কোনো ভারতীয় প্রভাব না
 পড়ে, খাঁটি ইংরেজ বানাতে হবে ছেলেকে এই ছিল তঁার ইচ্ছা।
 অতীতই অরবিন্দ প্রতিপালিত হয়েছেন ইংল্যান্ডের লন্ডনহাওয়েতে সম্পূর্ণ

বিশেষী যাঁচে। কিন্তু অদেশে প্রত্যাবর্তনের আগে থেকেই, সম্ভবতঃ
 হুয়েজনাথের 'বেঙ্গলী'-এর প্রভাবে, তাঁর ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বা
 আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার ব্যাপারে প্রবল আশঙ্কি অন্বেষার, ডঃ পোন্ধার
 বাক্যে বলেছেন 'রী-স্ট্রাশনালাইজেশন'-এর প্রক্রিয়া। এবং ক্রমে অরবিন্দ
 স্বাভাৱ্য-প্রীতি বর্ধিত হয় ও ভারতসংস্কৃতি বনাম ইংরেজ-সংস্কৃতির বিরোধ
 দানা বেধে ওঠে তাঁর মনেব গভীরে। রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে অরবিন্দ
 ওষু যে সম্ভ্রাসবাদের চরমপন্থা গ্রহণ করেছিলেন তানয়, ভারত ভারতবাসীর
 ক্ষমতা এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ বরহাতি করা হবে না—এ-
 জাতীয় স্লোগানও তুললেন তিনি। বিপিনচন্দ্রের মত তিনি মনে করতেন
 না যে চীন বা জাপানের আগরণ ভারতবর্ষের ভীতির কারণ, বরং এশিয়ার
 দেশগুলির শক্তিবৃদ্ধি হোক আর পাশ্চাত্যের প্রভুত্ব ধ্বংস হোক, এই ছিল
 তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। অরাজ আর বয়কট আন্দোলন ছাড়াও অরবিন্দ
 যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ব্যাপারে। এবং সমগ্র
 জাতীয় আন্দোলনটিকে মূলতঃ আধ্যাত্মিক স্তরে নিয়ে বাওড়াটাই ছিল তাঁর
 একান্ত লক্ষ্য। পাশ্চাত্যাহরণ থেকে প্রাচ্যসম্মানে উত্তীর্ণ হবার যে প্রক্রিয়ার
 কথা বারবার বলেছেন ডঃ পোন্ধার, অরবিন্দ ঘোষ তার বিশিষ্ট উদাহরণ।

আত্মশক্তির উদ্বোধনই হল গোড়ার কথা, দেশের মানুষের ব্যক্তিত্বের
 সত্যক ক্ষুণ্ণ ঘটানোতেই অদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য নিহিত—এই
 ভাবনার পথিক ছিলেন বাংলার নবযুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। এবং সে-
 কারণেই বারবার বিরোধ ঘটেছে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসী নেতৃবর্গের বয়কট
 বা অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপারে। রবীন্দ্রনাথ চাইতেন ব্যক্তিত্বের
 গঠনমূলক ও ইতিবাচক শক্তিগুলির বিকাশ ঘটাতে, কোনোরকম
 নেতিবাচী আন্দোলন সমর্থনে তাই তাঁর ছিল অপরিণীত দৃষ্টি।
 জাতিবোধের চেতনাতেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাধারণ জাতীয়তাবাদী
 উদ্দেশ্য। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল বহু ও স্পষ্ট।
 কিন্তু কখনই তিনি অন্ধ জাতীয়তাবোধের দাসত্ব করেন নি। জাতির মুক্তি
 ঘটবে বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে—সে-দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।
 আর তাই জাতীয়তাবাদ রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা ছিল না, সেটা বৃহত্তর
 পথের সন্ধানে রাজাসুখ মাত্র। ডঃ পোন্ধার রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ-
 আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং আত্মশক্তি বিকাশের নানা চিন্তার হৃদয় বিলম্বিত
 করেছেন এই অধ্যায়ে।

প্রথম আটটি পরিচ্ছেদে স্বতন্ত্রভাবে উনিশ-বিশ শতকের বাঙ্গালী চিন্তানায়কদের পাশ্চাত্যাহরণ ও স্বদেশজিজ্ঞাসার স্বপ্নের বিশদ আলোচনার পর ডঃ পোদ্দার সেয়ুগের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রেরণাব যে প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় তার নাস্তির্ঘী এক আলোচনা করেছেন। পরবর্তী আরেক পরিচ্ছেদে সেকালের কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর চিন্তাবারার বান্ধিক বিকাশও আলোচিত হয়েছে যেমন, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, রাত্তনলাল বিজ়, ফুদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী। তবে এই ক্ষেত্রে ডঃ পোদ্দার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্ততম শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রসঙ্গ আলোচনার কোনো প্রয়াস পান নি। পৌড়া হিন্দুদের কুসংস্কারের - বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ, নতুন ধর্মালোকনের প্রচেষ্টা ছাড়াও তীব্র স্বদেশাভিমান ও জাতীয় শিক্ষাপ্রসারের চিন্তা ও কর্মে শিবনাথ শাস্ত্রীর ভূমিকা যদিও বথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, বিবেকানন্দের চিন্তাবারার দীর্ঘ বিশ্লেষণের পরিসরে নিবেদিতার ভাবনার কিছু পরিচিতি পাওয়া গেলেও, তা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। বাংলাদেশের তৎকালীন আগরশের ইতিহাসে বিদেশিনী এই রাজনীতি-সচেতন মহীয়সীর বাংলাদেশের মাটিতে নিজেকে খুঁজে নেবার তাপিদের বিষয়টি আলোচনা করলে বোধহয় প্রসঙ্গ-বিহীন হত না। উপসংহারের পূর্বে বাংলাদেশের তৎকালীন চিত্রকলা-আন্দোলনে পাশ্চাত্যপ্রীতির বিরুদ্ধে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের যে-বারা বীরে ধীবে গড়ে ওঠে হাডেল, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীর প্রচেষ্টাতে তারও এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ডঃ পোদ্দার স্বদেশ চেতনা ও ঐতিহ্য-অধেষণের আলোচনার সম্পূর্ণতা আনতে পেরেছেন।

... বইটির প্রচ্ছদ-বীথাই সুন্দর হলেও, মুদ্রণপ্রমাদ এড়ানো সম্ভব হয় নি।

অম্র বোব

বাংলার কৃষি

Development of Capitalist Relations in Agriculture. By Ambika Ghosh and Kalyan Dutt. (People's Publishing House, Rs. 30.)

রমেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে আধুনিক গবেষকের লেখার জরিদার এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক শুরু পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরাণ মণ্ডল

রায়ত চাষী, যে শেষ পর্বত জমিদারের অভ্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য গ্রামান্তরে পালিয়ে বেতে বাধ্য হয়েছিল। ইতিমধ্যে একদল নতুন পরাণের স্রষ্টা হয়েছিল। তারা রায়ত নয়, বর্গীদার। তারা খাজনা হিসাবে অর্ধেক ফসল ভূস্বামীকে দিতে বাধ্য; জমিতে তাদের কোনো স্বত্ব নেই। ১২৪৬-৪৭-এর তে-ভাগা সংগ্রামে এই বর্গীদারের বিকোভ প্রতিকলিত। তে-ভাগা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল যে ভূস্বামী-দের বিরুদ্ধে তারা জোতদার। আন্দোলনের বিষয় রমেশচন্দ্র থেকে শুরু করে আধুনিক পন্থাবাদের লেখায় জোতদারের উল্লেখ নেই। অথচ সেই ১৮০৬—১৮০৮ সালে ইংরেজ পণ্ডিত বুকানন হামিলটনের চোখে দিনাজপুর ও রংপুরে জোতদার ধরা পড়েছিল। প্রশ্ন হলো ঠিক কি ভাবে জোতদারি প্রথার বিকাশ ও প্রসার ঘটে? মনে হয় জোতদারি প্রথার বিবরণটি বাদ দিয়ে আধুনিক বাংলার কৃষি সম্পর্ক বোঝা দুঃসাধ্য। জমিদারি প্রথা সম্পর্কে লেখা বিস্তার, কিন্তু জোতদারি প্রথার আলোচনা সবে শুরু হয়েছে।

ডঃ বোমের লেখায় জোতদার ও বর্গীদারের সম্পর্ক আলোচিত। ১৮৫২-এর খাজনা আইন এবং ১৮৮৫-এর প্রজাপত্র আইনের প্রধান সুবিধাভোগী অবস্থাপন্ন রায়ত, আর এদের একটি অংশ জোতদার। দুটো আইনেই বর্গীদার স্বত্বহীন প্রজাই থাকে; উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাকে খাজনা হিসাবে দিতে হয়। মহাজনের কাছে জমি বাঁধা রেখে কৃষক গুলি সংগ্রহ করে; বাই-খালসি ব্যবস্থায় সেই জমিতে সে বর্গীদারে নিযুক্ত নয়। উনিশ শতকে বনজঙ্গল সাফ করে জমি পুনরুদ্ধারের কাজ অগ্রসর হতে থাকে; জমি কর্ষণযোগ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকারী কৃষক (যে প্রধানত আদিবাসী, মুসলমান, ডোয়, বাগদী ইত্যাদি) পরিশ্রিত হয় বর্গীদারে। ১২২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাপত্র বিলের আলোচনা প্রবন্ধে বর্গীদারকে “প্রজা” বলে গণ্য করার বিবরণটি আলোচিত হয়, কিন্তু শেষ পর্বত কারেমী স্বার্থের প্রবল বিরোধিতার মুখে বর্গীদার স্বত্বহীন প্রজাই থেকে যায়; তার খাজনা আগের মতো ফসলের পঞ্চাশ শতাংশই থাকে। ফকরুল হক কর্তৃক নিযুক্ত জমি রাজস্ব কমিশন (১৯৩১—৪০) বর্গীদারকে প্রজা হিসাবে গণ্য করা এবং তার খাজনা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক থেকে কমিয়ে এক তৃতীয়াংশ করার সুপারিশ করে। ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্বে এই সুপারিশ অগ্রসরণ করে কোনো আইন রচিত হয় না।

উনিশ শতক থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বিশেষত মহা বন্দা (১৯২১—১৯৩০) থেকে পঞ্চাশের মধ্যস্তর পর্বে অমি হত্যার ছিল অব্যাহত। ক্ষুদ্র কৃষক অমিচ্যুত হয়। আর তার অমি চলে যায় অকৃষক জোতদারের হাতে, যে অনেক সময় মহাজন বণিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সরকারি বিবরণীতে অকৃষক ভূস্বামীদের মধ্যে সাহা সম্প্রদায়, মারোয়াড়ি, শহরে ভ্রমলোক (উকিল-মোক্তার) বারবার উল্লিখিত। ডঃ ঘোষ দেখিয়েছেন যে ১৯৩৮ সালে বর্গা অমি ছিল বিশ শতাংশ; ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গে তার পরিমাণ ৩৫ শতাংশ। বর্গা অমির চল্লিশ শতাংশ চাষ করে অমিহীন বর্গাদার, ছাপ্পান্ন শতাংশ চাষ করে তারা বাহের অমি এক একরের কম। যে পরিমাণে বর্গা প্রথা প্রসারিত হয় সেই পরিমাণে ক্ষেতমজুর নিয়োগ হ্রাস পায়। বর্গা অমিতে উৎপাদনের হার নিরক্ষরী। তাতে জোতদারের বিশেষ লোকসান হয় নি, কেননা ধান-চালের বাজার-দর ছিল ঊর্ধ্বমুখী; চড়া দরে ধান-চাল বেচে বিস্তারিত হবার তার অক্ষুন্ন সুযোগ।

বাংলার কৃষি-সম্পর্কের নতুন বিকাশমান প্রবণতা ধনী কৃষকের উত্থানে প্রতিষ্ঠিত। ইতিপূর্বে বিষয়টি সম্বন্ধে আরো অনেকে (বেমন অশোক মিত্র ও ডঃ বিনয় চৌধুরী) আলোচনা করেছেন। অনেক সময় এই ধনী কৃষক একাধারে কৃষক, মহাজন এবং ধান, পাট, শুড়ের ব্যবসায়ী। ডঃ ঘোষ ধনী কৃষক ও জোতদারের আলোচনা এক সঙ্গে করেছেন বলে তাদের মধ্যে ব্যবধান ঠিক বোঝা গেল না। বিষয়টি বোঝা শক্ত। অনেক সময় “দ্বায়ত মহাজন” ধনী কৃষক আবার জোতদারও বটে। “দ্বায়ত মহাজন” এক সূচিহ্নিত সামাজিক বর্গ হিসাবে বিকাশমান। তার দৃষ্টি সর্বদা চাষীর ফসলের দিকে; দান প্রদান সাহায্যে বাজার-দরের চাইতে অনেক কম দরে চাষীর ফসল হস্তগত করে সে তা চড়া দরে বিক্রী করতে অভ্যস্ত। বাংলায় পাট চাষের বিস্তার হলেও তার প্রধান সুবিধাভোগী ধনী কৃষক। ক্ষুদ্র চাষী আখের চাষ করে বে শুড় উৎপন্ন করে তাও চলে যায় ধনী কৃষক ও ব্যবসায়ীর হাতে। ১৯১৫ সালে বাংলায় চাল কলের সংখ্যা ছিল ৩০০। ডঃ ঘোষের মতে চাল কলের মালিক অনেক সময় ধনী কৃষক। এই বিষয়ে তিনি কোনো তথ্য দেন নি। বর্তমান লেখকের দ্বারা চাল কলের মালিক প্রধানত জোতদার এবং মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী। ডঃ ঘোষের মতে বাংলায় কৃষি-বাসিজ্যিক কৃষির স্তর পায় হয়ে ধনতান্ত্রিক কৃষির স্তরে পৌঁছুতে পারে নি। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্বে কৃষি সম্পর্কের বিকাশ সম্বন্ধে লিখেছেন শ্রীকল্যাণ হস্ত। প্রধানত পরিসংখ্যানের উপর তার

বস্তু প্রতিষ্ঠিত। তাঁর অনেক বস্তু নিঃসন্দেহে অভিনব। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে নতুন প্রবণতা চিহ্নিত করতে তিনি আগ্রহী। তাঁর মৌল বস্তু এই যে কৃষিতে ধনতাত্ত্বিক সম্পর্ক বিকাশমান, বর্গা প্রথা বিসর্জনমান।

ক্ষুদ্রায়তন কৃষি অতিশয় ভয়ঙ্কর। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যাই সর্বাধিক। কিন্তু ক্ষুদ্র চাষীর আজ কী অবস্থা? শ্রী দত্তের মতে ক্ষুদ্র চাষী (যার জমি এক বিঘা মাত্র) নিজে চাষ না করে জমি দিয়ে দিচ্ছে অন্য ভূস্বামীর কাছে, আর সে নিজে ক্ষেতমজুর হয়ে শ্রম বেঁচে ছুবেলা দু মূঠো অন্ন গ্রহণ-গ্রাহ্যত্বের লাম্যমান। ক্ষুদ্র চাষীর পক্ষে জমি রাখা এবং চাষবাস করে বেঁচে থাকা হুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার জমি কিনছে কে? যে ধনী কৃষকের সঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে পরিচিত হয়েছি সে। অধুনা ধনী কৃষক গ্রামের মাতব্বর। বিগত কয়েক বছরে “কৃষক মহাজনের” সংখ্যা বেড়েছে। ধনী কৃষকের উত্থান এবং “কৃষক মহাজনের” সংখ্যা বৃদ্ধি এক প্রক্রিয়ার অঙ্গ। যাদের ক্ষুদ্র চাষী ধনী কৃষকের উপর নির্ভরশীল।

শ্রী দত্তের মতে ভাগচাষ হ্রাস পেয়েছে এবং পাচ্ছে, নিজ চাষ বাড়ছে। এর পেছনে আছে প্রয়োগ বিস্তার (টেকনোলজি) থাকে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্য, উন্নত বীজের বোগান নিজ চাষকে লাভজনক করেছে। সেচ ব্যবস্থা এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। বীরভূমে সেচযুক্ত অঞ্চলে “কৃষাধার” স্থান গ্রহণ করেছে “মাহিম্বর”। সেচের উন্নতির ফলে রবিশস্তের (আলু সরিষা, গম) চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারের উপর নির্ভরশীল মাছের চাষ, হাঁস মুংগী ও পশু পালন প্রসারিত হয়েছে। আগে জমিতে মাত্র একটি ফসল উৎপন্ন হত, এখন কিন্তু সেচাধীন এলাকায় একাধিক ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব। শ্রী দত্ত বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন ষাটশস্ত্রের জন্মবর্ধমান বাজার-দরের উপর। এই দরবৃদ্ধির সুবিধাভোগী নিঃসন্দেহে ধনী কৃষক। নবায়নের পরে ক্ষুদ্র চাষী জলের দরে ফসল বেচে দেয়, আর ধনী কৃষক ফসল গোলাজাত রেখে চড়া দরে তা বেচে। ধান কাটার আগে যে মাঠের সন্ধানি, চৈত্র মাস থেকে সে বাজারে ক্রেতা।

শ্রী দত্তের মৌল বস্তু সঠিক। তবে দু একটি মন্তব্য করার লোভ সাময়িকানো পেল না। মনে হয় যে শুধু সেচের প্রসার ঘটছে যে সব অঞ্চলে তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গোটা পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-সম্পর্কের পরিমাপ হুঃসাধ্য। উত্তর বঙ্গ পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। পশ্চিমবঙ্গে সেচ ব্যবস্থার প্রসার হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো তা পাজাব, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ,

তামিলনাড়ু তুলনায় অনেক অল্পমত। নিজ চাষ বাড়লেও বর্গা প্রথা বিদায়মান বলে মনে হয় না। 'concealed tenancy' অতি বাস্তব। ভক্তলোক জোতদারের দল (উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, দোকানদার) সত্যিই কি মূলধন নিয়োগ করে- নিজ চাষের কুঁকি নিতে খুব উৎসাহী? লোকে বলে স্বভাব বদলায় না। ভক্তলোক জোতদারের শতাব্দীর পুরনো স্বভাব এত ক্ষত বদলে বাবে বলে মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গে ধনতান্ত্রিক কৃষি বিকশিত হলেও তার প্রসার পাঞ্জাব বা পশ্চিম উত্তর প্রদেশের তুলনায় এখনো মধুর। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য ঋণব্যবস্থা, সমবায় প্রথা, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের ভূমিকা। পশ্চিমবঙ্গে ঋণের সমস্তা এখনো হুস্তর। এখানে কৃষি উৎপাদনের হার যে অত্যন্ত নীচু তা বৈবাৎ ঘটনা নয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলার কৃষির এমন তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা ইতিপূর্বে আর কেউ করেছেন বলে বর্তমান লেখকের আনা নেই। ডঃ ঘোষ এবং শ্রী দত্তের বই পাঠক মহলে সমাদর পাবে বলে আশা রাখি।

সুনীল সেন

রজনীকান্তের স্মরণে

রজনীকান্ত গুপ্ত : ব্যক্তি ও মনোবা : লেখক—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এবং আরো।
অন্যক : প্রকাশক—রজনীকান্ত গুপ্ত ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতি, ৩১১, শাকুলী-বাগান, কলিকাতা-৩৭। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থায়নকৃত হস্তমূল্য ৩০০ টাকা।

বাংলাদেশের উনিশ শতাব্দীর আকাশটি নক্ষত্র-খচিত। যে বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল তার পরিণতিতে শিল্প-সাহিত্যের বিরাট জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে এবং অবশেষে দেশের আধীনতা এসেছে। এই নক্ষত্রগুলোর মধ্যে রজনীকান্ত গুপ্ত অন্যতম। আমাদের স্বাতিশক্তির বলতার অন্যতম প্রমাণ এই যে রজনীকান্তের মৃত্যুর পর একশ বছর যদিও অতিক্রান্ত হয়নি, কিন্তু এরই মধ্যে তিনি আর বঞ্চেট আলোচিত চিন্তানায়ক নন। এমন-কি যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বহুমুখী বিস্তারের পিছনে রজনীকান্তের নাম সর্বত্রো স্মরণীয় সেই পরিবর্তে তাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন করার কথা

অনায়াসে বিস্মৃত হয়েছিল। এই ধরনের অমনোযোগ আমাদের জাতির পক্ষে গৌরবের কথা নয়। সম্ভ্রান্ত রজনীকান্তের জন্মের ১২৫ বছর পূর্তি বোধোচিত শোভনভাবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমি স্বরণ না করে পারছি না যে এই গ্রন্থ প্রকাশের পিছনে যদি রজনীকান্তের বৌদ্ধি স্বনামধন্য কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের অক্লান্ত চেষ্টা ব্যতীত এবং পরিশ্রম না থাকত তবে গ্রন্থখানি এমন একটি স্বরণযোগ্য সঞ্চলন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করত কিনা সন্দেহ। কিরণবাবু না হয়ে যদি রজনীকান্তের বংশধারার বাইরের কেউ প্রধান উদ্যোক্তা হতেন তা হলে সেটা জাতির পক্ষে অধিকতর গৌরবের হতো।

স্বপ্নের বিষয় আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়বার মতো এবং পড়াবার মতো। বর্তমান বাঙালার কয়েকজন প্রথম সারির লেখক এবং পবেষক তাঁদের সৃষ্টিভিত্তি রচনার দ্বারা বইখানিকে সমৃদ্ধ করেছেন। রজনীকান্তের ব্যক্তিত্ব, তাঁর বিভিন্নমুখী সাহিত্যকর্ম, এবং সাহিত্য ও জাতির অগ্রগতির অন্তর্গত তাঁর নানাবিধ প্রয়াস এই বইতে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ কর্তৃক আলোচিত হয়েছে। যিনি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, তিনি সে-বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। স্তত্রার্য তাঁদের বক্তব্য প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। বইখানি পড়ে রজনীকান্ত সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা জন্মায় এবং সে-ধারণা নির্ভরযোগ্য। বইখানিতে তাঁদের রচনা স্থান পেয়েছে তাঁদের নামগুলো উল্লেখ করলেই পাঠকমানসে বইখানির মূল্য সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। ড. নীহার-রঞ্জন গুপ্ত, ড. অরবিন্দ পোদ্দার, ড. ভবতোষ দত্ত, ড. শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, ড. শশিকৃষ্ণ চৌধুরী, ড. নিমাইসাহন বসু, পৌরাজগোপাল সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিনয় ঘোষ এবং পূর্বতন লেখকদের মধ্যে রাধেন্দ্র সূন্দর ত্রিবেদী তাঁদের সৃষ্টিভিত্তি এবং প্রমসাদ্য রচনা দিয়ে বইখানিকে সমৃদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু রজনীকান্তের নিজের তিনটি প্রতিনিধিস্থূলক অথচ অধুনা ছাপা রচনা সন্নিবিষ্ট হওয়ায় বইখানির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বইয়ের শেষে রজনীকান্তের কিছু পত্র এবং গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হয়েছে।

প্রবন্ধগুলি পড়লে সহজেই চোখে পড়বে যে রজনীকান্তের ইতিহাস চর্চাই সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। তিনিই প্রথম বাঙালী যিনি পাঠকগণে সম্পূর্ণ বিশালাকার সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের মতো একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই বইখানি ছাড়াও 'স্বার্থ-কীর্তি'-(৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ), 'ভারত কাহিনী', 'ভারত প্রসঙ্গ' প্রভৃতি বইগুলি

ধারাবাহিক পবেষণামূলক ইতিহাস রচনার নিদর্শন না হলেও নিঃসন্দেহে ইতিহাসাপ্রিত বই। বইগুলি তাঁর ইতিহাস প্রীতির সাক্ষ্য বহন করছে। এই বইগুলি এবং অন্যান্য বইয়ের আলোচনা করে ড. অরবিন্দ পোদার দেখিয়েছেন যে “জাতীয়তাবাদের উন্মেষকালীন যে সব বৈশিষ্ট্য একে বিশিষ্টতা দান করে রজনীকান্তের মধ্যে তার অনায়াসলব্ধ অভিব্যক্তি”। বসন্ত, বঙ্কিম, ফুবেব, মাইকেল, রমেশচন্দ্র প্রমুখ লেখকদের মধ্যে জাতীয় চেতনার প্রথম সোচ্চার অভিব্যক্তি ঘটে থাকলেও তা প্রবল ভাবাবেগের আকারে আত্মপ্রকাশ করে আরও কিছুকাল পরে—জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর উনিশ শতকের শেষ লগ্নে। এই প্রবলতার ভাবাবেগ রজনীকান্তের মধ্যে প্রকাশলাভ করেছে। আরও কয়েক বছর পর এই ভাবাবেগ সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য উদ্ভাস হয়ে ওঠে এবং বেধা বার, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।

রজনীকান্ত বঙ্কিমের কিছু পরবর্তী। জাতীয় ভাব এবং আত্মিকার অর্জনের প্রথম বঙ্কিমের সময় ছিল আলোচনার পর্যায়ে, রজনীকান্তের সময় তা সক্রিয়তার আঁসি-আঁসি করছে। বঙ্কিমের রচনায় তাই যুক্তি-বুদ্ধি বিচার-বিতর্কের প্রাধান্য বেশি। রজনীকান্তের লক্ষ্য অল্পপ্রেরণা সৃষ্টি করা, প্রবল ভাবাবেগ সৃষ্টি করা। অতিরিক্তে তাঁর আপত্তি নেই। ইতিহাসের বিবরণে আমাদের পূর্বপুরুষদের দোষ-ত্রুটি তিনি সহজেই উপেক্ষা করেন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নিয়ে উপভাস সৃষ্টি করতে গিয়ে বঙ্কিম সন্ন্যাসীদের আভ্যন্তরীণ গলদ প্রাঙ্গণ উপর আলোকপাত করতে ইতস্তত করেন না। কিন্তু রজনীকান্ত খুব সন্তুষ্ট এ কাজ করতেন না : নির্বল ভাবাবেগ সৃষ্টির জন্য বেহুয়ো কথাগুলি তিনি এড়িয়ে যেতেন। ‘ইতিহাস-সাহিত্যিক-রজনীকান্ত’ নামক প্রবন্ধে ড. ভবতোষ দত্ত ঠিকই লিখেছেন যে রজনীকান্তের ইতিহাস-চর্চা ছিল উদ্বেগমূলক। সে উদ্বেগ হলো জাতীয় ভাবের সম্প্রসারণ। ‘বাঙ্গালী আত্মবিশ্বস্ত জাতি’ এই স্বতঃসিদ্ধ থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি সেই আত্মবিশ্বস্ত জাতিকে আত্মসচেতন করার জন্য কোমর বেঁধেছিলেন। ভবতোষ বাবু রজনীকান্তের ভাবা-রীতি সম্পর্কে খুব মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, রজনীকান্তের ভাবা ক্লাসিক্যাল পন্থী। যথার্থতা, পরিমিতি বোধ, ভারসাম্য, কেন্দ্রাহীনতা, প্রভৃতি এ ভাবার বিশেষত্ব। অবশ্য ভবতোষবাবু একটি উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে কোথাও কোথাও তাঁর ভাবা উদ্দীপনাময়ী। আমরা

মনে হয় ভবতোষবাবু রজনীকান্তের ভাষায় এই দিকটার উপর আর একটু বেশী গুরুত্ব দিলে সুবিচার করতেন। রজনীকান্তের হাতে ক্লাসিক্যাল রীতি পত্তী ছাড়িয়ে যাওয়ার অস্ত্র আকুর্গীকৃত হয়েছে। তাঁর সময়ে জাতীয় ভাব প্রাণ প্রাচুর্যে এবং জাতিশয্যে ক্ষত রোমাটিক পর্যায়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে ভাল রেখে রজনীকান্তের ভাষাও প্রাণপ্রাচুর্য প্রাপ্ততা এবং জাতিশয্যের দিকে ঝুঁক পড়েছে। তাঁর ভাষায় রোমাটিক যুগের আবিস্কারের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ইতিহাস বিষয়বস্তু বলে তথ্য সরবরাহের অস্ত্র তাঁকে সংবত হতে হয়েছে, কিন্তু ঐতিহাসিক কাহিনী যেখানে সুযোগ দিয়েছে সেখানে তিনি তার সম্ভাবহার করতে ইতস্তত করেন নি।

‘রজনীকান্ত গুপ্ত ও বঙ্গবাসী’ প্রবন্ধে হারাধন দত্ত-বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে রজনীকান্তের সম্পর্কের উল্লেখ করে বঙ্গবাসী পত্রিকার সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে হারাধন দত্ত দেখিয়েছেন যে হিন্দুধর্ম এবং সামাজিক চিন্তায় ‘বঙ্গবাসী’ ছিল উগ্র রক্ষণশীল; এবং এখিক থেকে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রজনীকান্তের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল ছিল। “সনাতন হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ হলে মোহাম্মদ জাতি আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে—অনেকের মতো রজনীকান্তও এই মতের সমর্থক ছিলেনও”—হারাধনবাবু এই উক্তির সত্যতায় সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ‘রক্ষণশীল’ কথাটির প্রতি আমরা সাধারণতঃ ধ্বংস বিরূপ মনোভাব পোষণ করি এক্ষেত্রে তা অসুচিত। বস্তুত সেই সময়কার রোমাটিক জাতীয়তাবোধ ক্ষত ২। কিছু বৈদেশী তাই ভাল এবং বা-কিছু বিদেশী তাই বর্জনীয় এই মনোভাবের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গী রূপায়িত হলে রবীন্দ্রনাথের গোরা চরিত্রে। এটাকে এক ধরনের ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা বলে গণ্য করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী বিদেশীয় অন্ধ অনুকরণ থেকে প্রতি-নিবৃত্ত হতে এবং বিদেশী পণ্য বর্জন করাও শিখিয়েছিল। আজ ঐতিহাসিক কালান্তর থেকে আমরা এইটুকুই লক্ষ্য করব যে তখন যাঁরা রক্ষণশীল ছিলেন তাঁরা আসলে মানসিক দিক থেকে সাংঘাতিক সক্রিয় ছিলেন, সমাজের তখনকার সবচেয়ে অগ্রসর অংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাই তাঁদের রক্ষণশীলতা আমাদের পিছন দিকে টেনে নেয় নি, বরং সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

‘রক্তশীল’ রজনীকান্ত যে চিন্তার জগতে নতুন পথ কেটে অগ্রসর হইছিলেন তা দেখিয়েছেন বিনয় ঘোষ তাঁর ‘রজনীকান্তের ইতিহাস বোধ’ নামক প্রবন্ধে। তিনি দেখিয়েছেন যে আগের যুগের ইতিহাস ছিল নিছক রাজা-রাজড়াদের কাহিনী ও সন-তারিখের ব্যাপার। কিন্তু উনিশ শতকে কোথ-এর চিন্তাবাদকে অঙ্গসরণ করে এই বোধ জন্মায় যে ইতিহাস আসলে সমাজের অগ্রগতির দ্বারা লিপিকার এবং এই দ্বারা পর্যবেক্ষণ করলে এমন কতকগুলি সূত্র পাওয়া সম্ভব বা ইতিহাসের পতিদ্বারা নির্বাহে সহায়ক হতে পারে। এককথায় তখন ইতিহাস এক ধরনের বিজ্ঞান বলে স্বীকৃত হয়েছিল। রজনীকান্ত হয়তো পুরোপুরি এই ইতিহাস-বিজ্ঞানকে রূপায়িত করতে পারেন নি; কিন্তু জিনিষটা যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ছিল এটা কম কথা নয়। সুতরাং বিনয়বাবুর প্রবন্ধ রজনীকান্তের ইতিহাস-চর্চায় বিশিষ্ট মূল্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে।

শশিভূষণ চৌধুরীর রচিত ‘সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রসঙ্গে’ প্রবন্ধটি খুবই তথ্যসমৃদ্ধ। লেখক সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ববর্তী ইতিহাসকারদের বিদ্রুত তথ্য দিয়েছেন। এঁরা সবাই অবশ্য বিদেশী ঐতিহাসিক। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য রজনীকান্ত প্রধানত যে-সব লেখকদের উপর নির্ভর করেছেন তাঁদের পরিচয় দিয়েছেন। অনেক ঐতিহাসিক বিষয়ের মধ্যে রজনীকান্ত কেন সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাকে আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছিলেন তা উদ্ঘাটন করেছেন। কারণ অবশ্য এই যে রজনীকান্ত এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে গণ্য করেছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের ব্যাপারটা যে নিছক সিপাহীদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব এবং কিছু কিছু রাজস্ববর্গের সুবিধাগ্রহণের অভিসন্ধি-জাত নয়, তার পিছনে যে ব্যাপক জাতীয় চেতনা কাজ করেছিল রজনীকান্তের প্রতিপাদ্য ছিল তাই। কোথাও কোথাও যে এ বিদ্রোহ ব্যাপক গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল রজনীকান্ত তাও দেখিয়েছেন। বস্তুত এই প্রবন্ধটি রজনীকান্তের মূল গ্রন্থটি পাঠের আকাঙ্ক্ষা জাগায়। কিন্তু মূল বইটি এখন সংগ্রহ করা সহজ নয়।

‘অমরদেব চরিত’ রজনীকান্তের প্রথম জীবনের রচনা। তাই বলে বইখানি দুর্বল জাতের রচনা নয়। শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন ‘ইতিহাস আর সাহিত্য সমালোচনা’ তাঁর (রজনীকান্তের) রচনায় এক হয়ে

গিয়েছে।” জয়দেব সম্পর্কে আধুনিক সমালোচকদের অনেক সিদ্ধান্ত রজনীকান্তের মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি ঠিকই বলেছিলেন, ‘জয়দেবের রচনা সংস্কৃত ও বাংলায় মধ্যবর্তিনী।’ শঙ্করানন্দ আরও প্রমাণ করেছেন যে রজনীকান্তের পদ্যবর্তী কালের ইতিহাসে ঐতিহ্য এবং জাতীয়তা-বোধ বীজাকারে এই গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া সম্ভব।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের রচনা ‘রজনীকান্ত গুপ্ত : সাহিত্যচিন্তা ও ব্যক্তিত্ব’ অনেক অজানা তথ্যের উপরে আলোকপাত করে। একটি বিতর্ক মাহুদ নানা শারীরিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কী করে সারাটা জীবন স্বদেশ ও সাহিত্য-মূলক চিন্তা-ভাবনা ও কর্মে অতিবাহিত করেছিলেন কিরণবাবু তার মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন। নিমাইসাহন বহুর ‘মনীষী রজনীকান্ত’ গ্রন্থে রজনীকান্তের বিভিন্নমুখী সাহিত্য প্রতিভার উপর আলোকপাত করেছেন। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত রচিত ‘রজনীকান্ত : গুপ্ত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ গ্রন্থে রজনীকান্তের ব্যক্তিত্বের একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এখানে তিনি কর্মী ও সংগঠক। পরিষদের নানাবিধ কর্মসূচির প্রথম প্রেরণা যে রজনীকান্তের নিকট থেকে এসেছিল তা জানতে পেরে আমরা বিস্মিত এবং পুলকিত হই। পরিশেষে রজনীকান্তের সমকালীন লেখক রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদীর রচনাটি উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক পরিচয়ের ভিত্তিতে রামেন্দ্রচন্দ্র রজনীকান্তের জীবনের উপর কে আলোকপাত করেছেন তার গভীর মূল্য অনুসীকার্য। এই সংকলন-গ্রন্থটি আমার ভাল লেগেছে বিশেষভাবে এইজন্য যে এর অন্তর্ভুক্ত এতগুলি গ্রন্থের কোনটিই ভাষা-ভাষা দায়-সারা রচনা নয়। প্রত্যেক গ্রন্থই সৃষ্টিশীল, তথ্যসমৃদ্ধ এবং মতামতের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য।

অচ্যুত গোস্বামী

পুস্তক-পর্যালোচনা

“Silhouettes of Russian Literature”; লেখিকা অলোমৌলিক। মূল্য ২০/-
একশতক, বহীশ্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘গ্রন্থাগার’ সংগ্রহ।

অত্যন্ত পরিচয় ও নিষ্ঠার সঙ্গে লেখা রুশ সাহিত্যের উপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ। রুশ সাহিত্যের এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত আলোচনা কোনও ভারতীয় লেখক বা লেখিকা পূর্বে করেছেন কিনা তা ঠিক জানা নেই।

লেখিকা ক্লাসিক ও আধুনিক সাহিত্যের জেথকরের মানসিকতা, তাক পেছনে সে যুগের ও এ যুগের রূপ সমাজ ও ইতিহাসের গৃহস্থির প্রভাব কত গভীরে প্রতিক্রিয়া করেছে তারই এক সূচিভিৎ আলোচনা রেখেছেন।

পুшкиন (Pushkin) থেকে ইয়েভুশেনকো (Yevtushenko) পর্যন্ত সমস্ত বিশিষ্ট লেখক-কবি ও তাদের প্রধান সাহিত্যকর্মের বিস্তৃত আলোচনার বেধিয়েছেন যে কবি বা ঔপন্যাসিক প্রত্যেকেরই স্বত্বভূমি ও তার সম্মানদের প্রতি অল্পাংশ সকলের সাহিত্যকে এক সূত্রে প্রযুক্ত করেছে। যদিও প্রত্যেকের জীবন বর্ণন, রচনার আঙ্গিক বিজ্ঞান ও শৈলীর বিভিন্নতা প্রত্যেককে স্বতন্ত্র করে দিচ্ছে তবুও সকলের রচনার মধ্যে রয়েছে একটি ঐক্যতান যে জানে ধনিত হচ্ছে বদেশ ও বদেশবাসীর প্রতি আনন্ডপূর্ণ মনোবোধ। লেখিকার সত্য সত্য অভিমত এই যে এখানেই রূপ সাহিত্যের অনন্ততা।

রাশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক গটপরিবর্তন, বিভিন্ন বিদ্রোহ, আন্দোলন, সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক সামাজিক নিপীড়ন, হারিল, আমলাতন্ত্রের শাসনশোষণ ও নিগ্রহ রূপ সাহিত্যকে কীভাবে উজ্জীবিত, অল্পপ্রাপিত করেছে এবং সম্মান আন্তরিকতা ও উদাসীন তিস্ততার সমাবেশ সাহিত্যের গল্লাকে বিচিত্র সজ্জার সজ্জিত করে তুলেছে। ইতিহাসের তথ্য, উৎকট স্বাদেশিকতা সাহিত্যের রস-ভাণ্ডারকে আবিল করতে পারে নি এই কারণেই যে রূপ সাহিত্যিক জীবনকে ভালবাসতে পেরেছেন। জীবনের আর্তি, অসম্মান ও জালা রূপ সাহিত্য বা সাহিত্যিককে তিস্ত ও পরাজিত করতে পারে নি। অবমাননাকে ব্যঙ্গ করে, কটকে উপেক্ষা করে, অটহাস্ত ও করতে পেরেছেন রুশী সাহিত্যের মহান শ্রষ্টা। গোপলের সাহিত্য কর্মের মধ্যে আমরা সেই হাসি পাই। পাই আমলাতন্ত্রের ও আমলা শ্রেণীর উদাসীন নির্মমতা, কথতার দস্ত, তথাকথিত উচ্চ সমাজের আভিজাত্য পৌরব, কমতালী ব্যক্তির প্রতি অধস্তন জনগণের হাস্যকর খোসামোদর সার্থক চিত্রের রূপায়ণ পাই। শেখতের লেখার মধ্যে আছে বক্ষিত, পীড়িত মাছবের প্রতি নির্মোহ সহানুভূতি ও সজ্জতার নিপুণ আলোচ্য। গোপলের জীব ব্যঙ্গ ও কিস্ত সরস ও নির্মল হাস্তের মধ্যে দিয়ে অন্তর্নিহিত তিস্ততাকে সহজ, কোমলরূপ ও কৌতুকরস দান করেছে। লেখিকার অভিমত, অজ্ঞাত পূর্বসূরী পাশ্চাত্য ব্যঙ্গ-শিল্পীর সঙ্গে এইখানেই গোপলের প্রস্তেয়।

লেখিকার অত্যন্ত স্বকীয় মন্তব্য এই যে ইউরোপীয় সমালোচকদের কাছে গোপাল প্রায় ধাঁধার মতো হয়ে রয়ে গেছেন।

শ্রীমতী মৌলিকের এই গ্রন্থে আরও একটা দিক বিশেষ লক্ষণীয় ও প্রশংসার্হ। রূপ প্রত্যেক লেখকের জীবনের সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যের যে যে একটা সম্বন্ধন আছে তা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন ও দেখিয়েছেন যে প্রত্যেককেই নিজ জীবন থেকে সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ করেছেন এবং সেদ্বারা রাশিয়ার সাহিত্য জীবন-নিংড়ানো অতি বাস্তবতার সজীব, বিশ্বাস ও আন্তরিকতাপূর্ণ হতে পেরেছে।

এই সমালোচনা গ্রন্থটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু হল এর সাবলীল ভাষা ও বিশ্লেষণের রস। তবু যা এই গ্রন্থটিকে কেবল নীরস আলোচনা-গ্রন্থ মাত্র করে তোলে নি। এই গ্রন্থটি পড়ে নতুন করে রূপ সাহিত্য পাঠে আগ্রহ জন্মায়।

গোর্কী, দস্তয়েভস্কি, টলস্টয় এই মহান শ্রষ্টাদের মহৎ সৃষ্টির পেছনে কোন সামাজিক পটভূমি, ঘটনা প্রতিক্রিয়া করেছে তার বিস্তারিত আলোচনা লেখিকা করেছেন। বস্তুত, লেখিকার অভিমত, রূপ সাহিত্যের প্রকৃত রস গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই রূপ ইতিহাস এবং তার পটভূমিতে প্রত্যেক লেখকের বিচিত্র, নিপীড়িত জটিল জীবন ও চরিত্রকে জানতে হবে।

সমাজের অন্ধকার গুহের ঘাঘর বাস সেইসব চোর স্ফোচ্চর বারাকন্দাদের নিয়ে সাহিত্যকর্ম করেছেন গোর্কী। তাঁর রচনার বিশ্বাসযোগ্যতার প্রধান কারণ, তাঁর নিজের অনেকটা সময় কেটেছে সেই অন্ধকার কালিমালিপ্ত সমাজে। জীবন থেকে নিংড়ানো যে অভিজ্ঞতা তার আবেদন অবশ্যই প্রথর।

দস্তয়েভস্কি বহিঃ তাঁর জটিল ও বিচিত্র জীবন থেকে সাহিত্যের রসদ পেয়েছেন কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। মাহুভের মন যুদ্ধক্ষেত্রের মত—সেখানে শুভ-অশুভের অবিরাম সংঘর্ষ চলেছে।

মাহুভের অবচেতন মনের প্রাধান্য তার চরিত্র ও আচরণকে কতখানি প্রভাবিত করে তা পরবর্তীকালে, উনবিংশ শতাব্দীর পর উপভ্রমশে পাওয়া যায় কিন্তু দস্তয়েভস্কি তার বহু পূর্বে এমন এক অন্তর্ভ্রমগতের মর্মভেদ করেছিলেন যা এই দৃষ্ট বহির্ভ্রমগতের চেয়ে অনেক বেশী সত্য, প্রচণ্ড ও চরম তাৎপর্যপূর্ণ।

লেখিকার ইচ্ছিত মন্তব্য—“Dostoevsky anticipated both

Freud and Nietzsche. "In 'White Night' he showed how individuals were influenced by dreams and in 'Poor Folk' by delusions." লেখিকার এ ধরনের বিশ্লেষণ বশেষ্ট অগভীর চিন্তার ফসল।

দত্তরত্নের রচনা প্রথ্যাত 'The Idiot' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেখিকা বলেছেন যে এই রচনার মহান ঔপন্যাসিক হেথিয়েছেন যে অবিকাংশ সময়ে মানুষের আচরণ বীধাধরা নিয়মের মধ্যে থাকে, কিন্তু মানুষ যখন প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়ে তখন তার আচরণ বীধন-ছাড়া জিঘাংসা, তীব্র বাসনা, উন্নত প্রশর, ঘৃণা বেহনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাকে করে তোলে অত্যন্ত বাস্তব।

বৈরত্নের নিষ্ঠুরতা, নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল এই মহান লেখককে। মৃত্যুর মুখোমুখি প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়াতে হয়েছে একাধিকবার তাঁকে। বীণাতন্ত্রের শুক একাকীত্বের চুঃসহ বয়সের কেটেছে বীর জীবন বহু বছর, তাঁর লেখনী তো সাধারণ চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে না।

জীবনের কঠিন বাস্তব-প্রতিঘাত, বুকের ভয়াবহতা টলস্টয়ের জীবন ও সাহিত্যকর্মকে মহিমাযিত করে তুলতে পেরেছে। তাঁর মহাকাব্য তুল্য রচনাগুলিতে জীবনের সমগ্র রূপের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কোনো নীতিকথার গুরুত্বের তাঁর মহান সৃষ্টি (War and Peace প্রকৃতি) কে ভাবগ্রস্ত করে নি। শুধু জীবন-তুফান বা জীবনের প্রতি অহুসার ঔপন্যাসিকের লেখনীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হয়েছে।

'ওয়ার এণ্ড পিস'-এর বিচিত্র চরিত্রের উপাদান তার জীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া। এই চরিত্রগুলির মধ্যে তাঁর নিজের ও প্রিয়জনের প্রতিচ্ছবি প্রতিকলিত হয়েছে। টলস্টয়ের রচনার বৈশিষ্ট্য, শুধুমাত্র এক ছোড়া নায়ক-নায়িকা এবং বীধাধরা কোনো শৈলী বা বিশেষ আদিক নেই তাঁর রচনায়।

জারের বৈরত্নের বিকল্পে এল বলশেভিক বিপ্লব। সেভন্ত পয়বর্তী কবি ও লেখকদের রচনা বিপ্লবের অয়গানে ও বিপ্লবাত্মক ঘটনার সমুদ্র। কবি আলেক্সান্ডার ব্লক (Aleksander Blok ও ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি (Vladimir Mayakovsky) এই দুই শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে মূলতঃ বিপ্লবের স্পিরিট থাকলেও উভয়ের দর্শন, রচনার বিষয় ও শৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর কারণ উভয়ের জীবনের গটফুটি। ব্লক নিজে বিদ্রোহী নন কিন্তু অত্যন্ত

জন নিজেই বিপ্লবী, তাই তিনি প্রত্যক্ষভাবে জেনেছেন বিপ্লবীর মানসিকতা, অন্তর্দর্শন, হৃৎসহ বঙ্গলা কি !

জারের স্বৈরতন্ত্রের আমলের লেখকদের রচনার আছে শোষিত জন-পণের দারিদ্র, অত্যাচার ও নিপীড়নের হৃৎসহ কষ্ট-অপমান, নিরবলম্বন অসহায়তা ও নিরাশার দুঃস্বপ্নের শোচনীয় পরাভব। অল্পপক্ষে, বলশেভিক আন্দোলনের লেখকদের রচনার মূল স্বরূপ শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চারতা, বিদ্রোহী আত্মায় ওজস্বিতা।

লেখিকা অত্যন্ত মূল্যবান ও সচেতন বিচক্ষণতার সঙ্গে বিপ্লবের এই দুই ভিন্ন মানসিকতার্থী কবির কাব্যের মূল্যায়ন তুলনামূলকভাবে করেছেন। দুকের অমর কাব্য “The Twelve” হল বলশেভিক বিপ্লবের উপর রচিত দ্বিবিষয়ী মহাকাব্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এই রচনায় তিনি প্রধানত প্রতীকের উপর নির্ভর করে বিপ্লবের বর্ণনা করেছেন এবং যুগ-বঙ্গলায় কবির আত্মদর্শনই এই কাব্যের বীজ রপন করেছে। অপরপক্ষে, ত্রাদিমির মায়াকভস্কি বিদ্রোহী-কবি বলে তাঁর রচনা বিপ্লবরস সিক্ত। বিপ্লবই তাঁর জীবন ও রচনার উপজীব্য। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনের স্ফূর্তপাত, বিপ্লবই তাঁর আদর্শ, আত্মজীবনের একমাত্র কামনার বস্তু।

রাষ্ট্রতন্ত্রের অবসান, বিপ্লব, প্রথম মহাযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতির প্রচণ্ড ঠাকুরা রাশিয়ার জন-জীবনের উপর এক চরম প্রতিক্রিয়া হানল। সে দেশের লেখক ও কবিরা সম্পূর্ণভাবে এর দ্বারা আলোড়িত হলেন। রাজনৈতিক মহান নেতারা পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিলেন যে, আধুনিক সোভিয়েত সাহিত্যে শ্রেণীহীন, সংগ্রামহীন, বা শুধু সমগ্র মানব সংস্কৃতির উপস্থান বহন করবে, সে রকম কিছু থাকবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল আধুনিক সোভিয়েত সাহিত্য আরও গভীরভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ও ঘটনার সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে পড়েছে।

বলশেভিক বিদ্রোহের পরবর্তী প্রথম যুগের লেখক ও কবিদের রচনার বিষয়বস্তু প্রধানত সামাজিক বিপ্লব এবং সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা। লেখিকার অভিমত, এদের রচনার মধ্যে প্রধানত গৃহযুদ্ধের তৃত্যচিত্র পরিষ্ফুট হলেও এমন অনেক রোমান্টিক উপস্থানের কাহিনী পাওয়া যায় বা বিশৃঙ্খলা ও উত্থানের স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ দূরে।

কারমানভ, অস্ট্রাভস্কি (Dmitry Furmanov এবং Nikolai Ostro-

tsky) রচনা থেকে বোঝা যায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদিতাও কী রকম পরিণত বৌদ্ধিক ও শিল্পপ্রসাদগুণ-পূর্ণ সং সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে।

বিস্ত্রোহ-উত্তর কোর্নো কোনো লেখকের (যেমন Romanov) উপজাতি রাজনৈতিক উত্থানের উপাদানের চেয়ে বিশ্ববের সংঘাত মাহুকের ব্যক্তিক জীবনের উপর কতখানি আঘাত হানে তারই চিত্র পাওয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক জীবনের গুণগত মাহুকে কতখানি আবেগহীন কঠিন করে তোলে তারও ইঙ্গিত এর রচনার পাওয়া যায়।

গ্লাদকভের (Fyodor Gladkov) রচনায় পাওয়া যায় বিপ্লব ও পৃথিব্যুত্তর পর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিপর্যয়ের তথ্যচিত্র।

নূতন যুগের বিপ্লব, উত্থান, সামাজিক ও পারিবারিক অস্থিরতা, পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া থেকে কোনো লেখক অথবা কবি মুক্ত নন।

আ জিভাগোর লেখক বরিস প্যাস্টার্নক (Boris Pasternak); এবং শোলোকভ (Mikhail Sholokhov) ইারা দুজনেই নবল পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁদের রচনার উপাদানও প্রত্যক্ষভাবে জীবন থেকে প্রাপ্ত। লেখিকার মন্তব্য, ব্যক্তি মাহুকের বর্ণনা, দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এই লেখকেরা এঁদের রচনায় স্থান দিলেও কণহারী মাহুকের জীবনের চেয়ে শাশ্বত মাহুত্বটির প্রতি প্রেম ও সততাই বেশী তাঁরা ও তাঁর রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

শোলোকভ ব্যক্তিগত জীবনে 'কসাক' সম্প্রদায় ভুক্ত, এজন্য একমাত্র তিনিই কসাক জীবনের সত্যকার রূপটি তাঁর রচনা (Quiet Flows the Don)তে পরিস্ফুট করতে পেয়েছেন।

এই দুই মহান স্রষ্টার রাজনৈতিক আদর্শ বিভিন্ন হলেও এক বিষয়ে তাঁদের ঐক্য আছে। তাঁরা দুজনেই বিশ্বাস করেন যে কোনো মহৎ সৃষ্টি হয় বিপ্লবিত অবস্থার মধ্যে থেকে। দু'জনেই দেখিয়েছেন ইতিহাসের প্রচণ্ডতার সামনে মাহুকের ব্যক্তিক জীবনের ইচ্ছা কত তুচ্ছ। লেখিকার এ ধরনের তুলনামূলক বিশ্লেষণের ভঙ্গি বেশ আকর্ষক।

এ যুগের সবচেয়ে বিতর্কিত লেখক সলজেনিৎসিন (Solzhenitsyn) মাহুকের কষ্ট ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। মাহুকের মর্মান্বন্য প্রতি তাঁর আবেগ একে পূর্ববর্তী লেখকদের থেকে ভিন্ন করেছে। ইতিহাসের পাওনা গুণ থেকে মাহুকের মহত্ত্বের মূল্য এঁর কাছে

বৈশিষ্ট্যসম্পূর্ণ। যেখানে মানবাত্মা অবহেলিত, নিপীড়িত অবহেলিত সেখানে এই লেখকের প্রতিবাদ সহজ অথচ দৃষ্টকর্মে সোচ্চার হয়েছে। এঁর চরিত্রেরা যে অমার্জিত ভাষায় কথা বলেছে—এঁর ভাষা-শৈলী সেই ভাষাতেই রূপ পেয়েছে। এঁর রচনাও আত্মজীবনীমূলক। তাঁর বিখ্যাত 'ক্যানসার গার্ড' উপন্যাস তাঁরই জীবন-আলেখ্য।

নব্যযুগের দুই জীবিত কবির কাব্যের মেজাজ পূর্ববর্তীদের থেকে ভিন্ন হয়ে গেল এই কারণেই যে এঁরা যুদ্ধ, উত্থান পতনের প্রত্যক্ষদর্শী নন বা সে সময়ের উত্তেজনা ও প্রগাঢ় মানসিক অবস্থার দ্বারা অস্থির নন। এঁদের কাব্যের মেজাজ সমসাময়িকতার দ্বারা প্রভাবান্বিত। ভোশনেসেনস্কি (voznensky) ও ইয়েভুশেনকো (yevtushenko) এঁরাও অত্যন্ত পূর্ব-স্বয়ীদের মতো অদেশকে সবচেয়ে উপরে স্থান দিয়েছেন। বস্তুত লেখিকার অভিমত, রূশ সাহিত্যের পটভূমির বুনট তৈরি হয়েছে বহুদেশ, সমাজ ও ইতিহাসের মানসিকতা ও ঘটনাবলীর দ্বারা। রূশ সাহিত্যে রয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সামাজিক অভিব্যক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মিক যোগ। এটাই রূশ সাহিত্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

লেখিকা শ্রীমতী মৌলিকের রূশ সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অমুরাগ গবেষকস্বলভ নিষ্ঠা অথচ শুধু মাত্র তথ্য-ঠালা পাণ্ডিত্য প্রকাশের প্রচেষ্টা নয়—এই বৈশিষ্ট্য গ্রন্থটিকে আলোচনা-পুস্তকের কাঠিন্দ থেকে মুক্তি দিতে পেয়েছে।

এই আলোচনা পুস্তকটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে অত্যন্ত সমাজতাত্ত্বিক দেশের সাহিত্য, তার পটভূমি ও লেখকদের মানসিকতার সঙ্গে রূশ সাহিত্যের ইতিহাসের কোথায় মিল বা প্রভেদ যদি শ্রীমতী মৌলিক সামান্যভাবে ছুঁতে যেতেন তাহলে গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধিপূর্ণ হতে পারত। এবং ভারতীয় হিসেবে যদি তিনি ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গেও কিছু তুলনামূলক আলোচনা করতেন তাহলে ভারতীয় হিসেবে পুস্তকটিকে আরও মূল্যবান করে তুলতেন। তাঁর গ্রন্থে শুধুমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকের (বেমন, দান্ডে) সঙ্গে কিছু তুলনামূলক আলোচনা পাই।

বাই হোক, বইটি যে স্বাধীন সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। লেখিকা রূশ-সাহিত্য অমুরাগী সকল পাঠকের ধন্যবাদার্থ।

রুচিরা মুখোপাধ্যায়

কবিতা পরমেশ্বরী / কবিতা সিংহ / দৈনিক কবিতা / পাঠ টাকা

কবিতা সচরাচর পাঠকের হৃ-হাত ভরে না। কখনও কখনও ভরে। কবিতা তখন পাঠকের কাছে হয়ে ওঠে এক অন্তিমার অভিজ্ঞতা। আর সেই হৃ-হাত ভরেই কবিকে অর্পণ করতে হয় কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি। কারণ পাঠক তখন কবিতার বিস্তার প্রদীপ্ত, কবির অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি তখন তাঁর হৃদয় ও মননের মাটিতে শিকড় চারিয়ে দেয়। পাঠকের চিন্তার জগতে কবি যদি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুবিহারী হন তাতেও ক্ষতি নেই। কবিতা তো শেষপর্যন্ত কবিতাই। তাই কোনো কবির কাছে কেবল মানসিকতার সামুদ্রাই পাঠকের অধিষ্ট নয়। কবিতা যদি কবিতাহিণ্যে প্রত্যাহার না হয়, যদি তা জীবনবিরোধী না হয়, তবে জীবনবোধের পৃথকতা সত্ত্বেও এক ধরনের নান্দনিক তৃপ্তি আন্বাদনে বাধা নেই পাঠকের। কবিতা সিংহেব সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা পরমেশ্বরী' পাঠে আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া এইরকম।

কবিতা সিংহ কবি হিসেবে ভালো না বন্দ, প্রথম সারির না দ্বিতীয় সারির এসমস্ত আলোচনা বাহ্যিক মনে করি। কারণ তিনি পঞ্চাশের প্রতিক্রিত কবিদের একজন। কবিতা লিখছেন তিন দশক ধরে। অবশ্য আমি তাঁর কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই বাটের গোড়ায়। তখন কবি দুহাতে কবিতা এবং গল্প লিখছেন। পরবর্তীকালে বেধেছি তাঁর সঞ্চিত লেখনীর বিস্তার বহুদূর। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, আলোচনা, কীচাচ, সর্বত্রই তিনি অবাধগতি। কিন্তু কবিতা সিংহ যে মূলত কবি সেটা তাঁর যে কোনো লেখা পড়লেই টের পাওয়া যায়। সর্বত্রই এক কবির অলঙ্কার উপস্থিতি অস্বত্ব হয়।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সহজ হৃদয়ী'-র এগার বছর পরে এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। তার অর্ধ তাঁর রচনার অগ্রতুল্যতা নয়। কারণ কবি জানিয়েছেন : 'এই দীর্ঘ এগার বছরে আমার পড়ের সঞ্চয় কম ছিল না এবং এই গ্রন্থেও আমার কবিতাবলীর একটা বিপুল অংশের স্থান সংকুলান করা যায়নি'। এই দীর্ঘ এগার বছরের অভিজ্ঞতার কবিতা কবির কাছে সহজহৃদয়ী থেকে পরমেশ্বরীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। অবশ্য কবিতা মাত্রই কবির কাছে পরমেশ্বরী নয়। কবির বক্তব্য : 'হুলেল কবিতা অন্তত এই গ্রন্থে আমার কাছে পরমেশ্বরীকপে বিবেচিত হয়নি।'

'কবিতা পরমেশ্বরী'-র প্রথম কবিতাটি ('একা') ভারি বিষয়।

কবিতাটিতে এক নিঃসঙ্গ মানুষকে ক্রমাগত অপরাহ্নের সন্নিহিত হতে দেখি। এই গ্রন্থের আরও কিছু কিছু কবিতার ধন বিকলের ছায়া নেমেছে। 'তাহলে কি পাগে কের বিবর্ণ সময় / তোমাকে এভাবে বাকের মতন খেয়ে গেল ? / জিনে ও রেকাবে তুমি বলে রইলে, বোড়া / বৌবনের বোড়া ছুটে গেল হুপারের মধ্য থেকে / ঘুরে' (বৌবন, অথবা 'হুপারের মধ্যে থেকে / বোড়াটি ছুটে গিয়েছে। / বোড়াটি গলে গিয়েছে' / (প্রথম অথবা প্রত্যয়) অথবা 'সওয়ারী রয়ে গিয়েছে' (বুড়ো বুড়ো)—এসব পংক্তি তাবই ভোতক। কবি আনিয়েছেন যে সাধারণত তাঁর কবিতার উৎস ক্রোধ। ক্রোধের নিম্নপরিণাম যদি কবিতা হয় তবে আমাদের আশস্তির কিছুই নেই। কারণ ক্রোধ এমনই এক মারাত্মক ব্যাপার বা কবিতার কঠোরোধ করার ক্ষমতা ওত্ পেতে থাকে। যখন বিবর কবির নিমিত্ত ক্রোধকে আত্মসাৎ করতে পেরেছে। আমরা এসব ক্ষমতায় ভ্রমেনি আশোচ্য কবি 'মহিলা-কবি' অভিধায় চিহ্নিত হতে চান না। আমরাও এরকম শ্রেণীভেদে বিশ্বাসী নই। কিছু একজন নারী তাঁর শারীরবৃত্তীয় ভিন্নতা এবং প্রাত্যহিক জীবনচর্যাতে কিছু স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে হাঁটেন এটা তিনি মানবেন নিশ্চয়ই। সেই স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা কখনও কখনও কবিতায় অভিব্যক্ত রাজীবোধনে সহায়ক হয়ে ওঠে। কবিতা সিংহের কবিতারও বটেছে অল্পরূপ ব্যাপার। তাই তাঁর কাছে পাওয়া গিয়েছে কিছু ভালো কবিতা, কিছু মৌলিক চিত্রকর্ম, যেমন—'ঈশ্বরকে ঈশ', 'ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা হলে' এবং 'পুরুষকে' কবিতাধরী এবং 'হুঃখ কি লেগাইক্রমে অন্ধর কাককাজ শুধু ? / হুঃখ কি ব্যঞ্জে জন'; 'তুমি কি আমার আহ ? ছল কিষা নাকচাবি বিধানো গহনা ?', 'নিজের কান্নাকে চিং / কলে দিয়ে সাহায্য মতন—', 'এখন পরশে পাছাপেড়ে / কুমারী শব্দগুলি বেরিয়ে গিয়েছে গর্ভে', 'শীত এক কতৃবতী নারী', 'কার ঠিক ব্রেসিয়ারে রেখে দিল তোর ফুল গুন ?', 'ক্রমশ গায়ের ছাল ছাড়াই যেভাবে খোলে / কলার বৃকের খোড়' ইত্যাদি চিত্রাকল্পাবলী।

ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবির এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। অস্থিরতা সর্বধে অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট ছন্দের পৌনপুনিকতা ব্যবহারে তিনি পাঠককে ক্লান্ত করতে চাননি, কিংবা যে কোনো সং কবির মতো তাতে কৃপ্ত থাকেননি। কবিতাশরীর নিয়ে নানারকম পরীকার কৌতূহলী হয়েছেন। এমন কি কখনও কখনও কোনো কোনো কবিতা নেহাৎ ছান্দসিক

কৌতূহল থেকেই রচনা করতে চেয়েছেন (অন্ততঃ আমার 'তাই-ই' মনে হয়েছে), যেমন 'আমরি কি রজ খেলে' কবিতাটি। কবি যখন প্রতিদিন 'কবিতার অলস প্রহার' সহ করেন তখন যাবতীয় এই কারিগরিই কবির কাছে হয়তো প্রহারের ক্ষতের উপশমের মতো হয়ে ওঠে। ছন্দের প্রতিটি বুতেই যদিও তাঁর আনাগোনা তবুও তাঁর কলম যাত্রা-বুতেই খেলে ভালো।

'কবিতা পরমেশ্বরী' আমার মতো পাঠকের হৃ-হাত ভরে যা দিয়েছে তা এই-ই। কিন্তু হৃ-হাত সত্যি ভরেছে কি? কোথাও কি শূন্যতা রয়ে যায়নি? যখন দেখি তাঁর কবিতা ব্যক্তিগত অহঙ্কৃতির গুর থেকে নৈব্যক্তিকতার উত্তীর্ণ হয়েছে কচিং, যখন দেখি এই দীর্ঘ এগার বছরে কবি যে রক্তাক্ত হৃ:স্পন্দন দিনগুলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসেছেন তার পাচ ছায়া পড়েনি তাঁর কবিতায়, যখন দেখি তিনি কোনো অর্থেই 'কমিটেড' নন, তখন তাঁর উদ্দেশ্যে সেই বহুব্যবহৃত কবিতাপংক্তি উদ্ধৃত করে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে: 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়াই?' শুধু আমার নালিশ কিছুটা বৃহৎ হয়ে যায় প্রশ্নের বেঁক কবিতা 'কোনো এক কুপম্বুকের উজ্জি' পাঠ করে', যে কবিতায় কবি লেখেন, 'আমার বিষয় শুধু নিজ বাসভূমে / শিরে ঘোর সংক্রান্তির তত্ত্বিত সংবাহ— / এই ঘোর গুরুদশা, গৃহদাহ, রক্তে মহাশায়ী / সন্তানের, বন্ধুর, পিতার স্বত্ববোহে টালমাটাল— / ঘর, গলি, বড় রাস্তা, কাশীপুর বরাহনগর / এর বেশি দৃষ্টি নেই, অদৃষ্ট বধির— / আমার বিষয় আজ নিজ কুপ— ছুঃখিনী অবেশ'। কবির উদ্দেশ্যে আমার নিবেদন আমাকে এই নালিশ কিরিয়ে নিতে দিন। কবির চেতনায় আমরা 'ছুঃখিনী অবেশ'কে আরো বেশি বিবর্তিত দেখতে চাই। তাঁর কবিতার পার্শ্বে লাগত আরও রক্তের ছিটে। পোড়া বাংলার ভাঙাচোরা মাহুঘের দিকে কবির করতল প্রসারিত হোক।

রাত বার পূবে। শুভ বহু। অসুখ প্রকাশনী। মূল্য—চার টাকা।

‘রাত বার পূবে’ শুভ বহুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। শুভ বহুকে বাটের কবি বা সস্তরের কবি—কি বলার ঠিক আনি। (অবশ্য দশক-বিস্তারনে আমার বিশ্বাস নেই), তবে বহুর মনে পড়ে তিনি বাটের শেষাশেষি কবিতা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তাঁর কবিতা পত্রপত্রিকার বিচ্ছিন্নভাবে পড়েছি। ঠিক কোনো স্পষ্ট ধারণা তখন পড়ে ওঠেনি তাঁর সম্বন্ধে। কিন্তু তাঁর কবিতার বইটি পড়তে গিয়ে বেটা স্পষ্ট হল তা হচ্ছে তাঁর সমকালীন অত্যন্ত কবিরের সঙ্গে তাঁর লক্ষণীয় পার্থক্য। তিনি যে সময়টার কবিতা লিখতে শুরু করেছেন সেই সময়টার, কিংবা তার কিছু আগে-পরে, আর যাদের কবিতা চর্চার সূত্রপাত, তাঁদের অনেকেই বাংলা কবিতার সেই অবসরী শ্রোতে অনিবার্যভাবে প্রাবিত হয়েছেন, বাটের মাঝামাঝি বঙ্গ সংস্কৃতির ‘মুক্ত চরণের বা মুক্তমেলার বহু জলাভূমিতে যার সশব্দ উৎসার। বলায়কার শুভ বহুর সত্যক পদক্ষেপ সম্পূর্ণ বিপরীত পথে। তার কারণ আলোচ্য কবির অধিষ্ট নয় নিছক নান্দনিক তৃষ্ণা বিতরণ অথবা নিছক অশৈলীনির্ভর কারিগরিপ্রবণ বিস্তৃত কবিতাবিলাস। শুভ-র কবিতা পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে জীবনধাপন আর কবিতাচর্চা তাঁর কাছে সমার্থক। যে জীবন তাঁকে জ্বালাচ্ছে, পোড়াজ্বালাচ্ছে, ঝড়ি দিচ্ছে, সাধনা দিচ্ছে, উত্তেজিত করছে, অল্পপ্রাপিত করছে তারই সংগত ছায়াপাত ঘটে তার কবিতায়। আর তাই সংগতভাবেই তাঁর কবিতার মূল কথা অসহ—ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অসহ, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের অসহ। তিনি উৎকর্ষিত প্রায় রাখেন আমাদের সামনে, ‘—অসহ—সে কি অনন্ত-বহুর?’ / চন্দ্রান কবির বুকে নিতে অসুবিধে হয় না ‘অসহকার / আমাদের মাস্থ্যখানে অনসহ তীব্রতর করে’, ‘বেলা / অসহব্যতীত যার, অত্যাচলপানে যার / অনিবার্য, পরস্পরাহীন’। কিন্তু এই তো শেষ কথা নয়। কবির কাছে তাই ‘বা-কিছু জ্বালা তাই ভালোবাসা চার / অসহমুখর হর্ষে প্রাণের উচ্চতা চার’। তাঁর দৃষ্টিতে তাই ধরা পড়ে ‘হঠাৎ মিছিল আনে আনিখিল অসহ, বিতার;’ তাই তাঁর শেষ কথা—‘তবু অসহের অগ্নি / বুকে নিয়ে প্রাত্যহিকতার গুণে রান / আমরা ছুয়েক ঘণ্টা কাছাকাছি বসি, ... / এরকমভাবে বেঁচে থাকি’।

কবি যে এই প্রবহমান সময় ও তাঁর চারপাশে আবর্তিত মাহুত-অনেক তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করেন সেটা টের পাওয়া যায় যখন তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয় ‘কফি হাউস’ এবং তিনি ঈষদ বতুতা নিয়ে

অমিরে -তুললেন; / জনকর উঠতি কবি সম্পাদকের অন্ত উৎখল দরজার
 দিকে, সাতজন কড়ে / তব্বর আবেগে চুলকে দিচ্ছে এ-ওর পিঠ, / একদক
 সিলিং অফি জমে আছে 'ধোঁরা ও ধোঁরাটে'। পেটি-বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত
 অস্তঃসারশূন্যতাকে তিনি এইভাবে আঁচ করেন। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার
 অবক্ষয়ের নানামুখী আক্ষালনে কবি স্বভাবতঃই বিচলিত। যে 'টান-
 বেহলার দেশে / নির্বিকারে হেঁকে যায় শুটিকর বেহেড শবুন', সে দেশে
 প্রতিক্রিয়ার ক্লোরোকর্ম যে মানুষকে তার শৈশব থেকেই অচেতন করে
 রাখার ফাঁদ পাতে সেই ছঃসমাচার কবির অজ্ঞাত নয়: 'কী প্রচণ্ড
 রাঙ্কুসে দাপটে / টাটকা বকুলের মতো নিম্পাণ শিল্পকে / টানে, নিকৃশায়।'
 এ্যাংলোইণ্ডিয়ানমুখী কিশোরগার্টেনে'। উপযুক্ত আক্ষালনেরই আর এক-
 দিক রাস্তানৈতিক স্বাধীনতার আড়ালে অর্থনৈতিক শোষণের চত্বর
 কৌশল। এপার বাংলার ভৌগোলিক কাঠামোকে কবি আকর্ষ স্বপ্নের
 চিত্রকল্পে ঘরে রাখেন (: 'দক্ষিণতটে উত্তাল জীবন চুলগুলি ঝড় ছুঁয়ে
 ছুঁয়ে যায় / কেন্দ্রবিন্দু বোলপুরে রাচে বেন বা শুনের শান্তি / বরেন্দ্র জুড়ে
 গুরু নিতম্ব, বহু জম্বা কাক্কনজম্বায় / তরাই জড়িয়ে বেন বা আহিম সে
 অঙ্ককার, কাক্তি'। আর 'এমন মোহন শরীর' 'সুটতে আসে রাজা
 দালাল কড়ে'।) সেই শোষণের কারণকে স্পষ্ট করে তোলার অস্তেই।
 কিন্তু 'নিচেব মচল' এই অর্থনৈতিক শোষণকে হজম করে ভেতরে ভেতরে
 যে প্রতিরোধের তুর্গ তৈরী করে বাস্তব সত্যের দিকে কবি আমাদের দৃষ্টি
 আকর্ষণ করতে ভোলেন না, 'শেরালদা টেঞ্চেনে হেথি একজন মধ্যবরসিনী /
 লড়াই-এর মস্ত্রে স্থির, ফেরি / করেন মাজন, মুহুর্তের এক ছবি
 আসে; / বড়বস্ত্রা এবং বিদ্যতে / জনকর মানুষের প্রাণ / একজন
 প্রচণ্ড জেদে আগলে রয়েছেন।' বাহুরের এই প্রাণদ মহিমার
 দিকে কবির একটি চোখ জেগে থাকে বলেই তিনি সিনিক
 হয়ে ওঠেন না। হেবস্ত্রত বিশ্বাসের পান কবিকে মনে করিয়ে দেয়
 'আমাদের ঐশ্বর্য অনেক / আমাদের ঘরে ঘরে রাজার মানিক / রাখা আছে',
 বিঠোচ্ছেনে কবি 'তীত্র কালপুরুষ জয়ের বিক্রম' স্তনতে পান, বামিনী
 রায় কিংবা-হায়কিররের রঙে রেখায় তিনি খুঁজে করেন 'মূর্ত স্পন্দমান
 বেথানে জীবন / জয় করে সময়ের পরাক্রান্ত আক্ষালনগুলি, কিংবা লেনিনের
 বহুতীক উদারইন্ডিতে /—সময় বেগানে ঘোড়া, জীবন সওয়ার' সেই
 দিকেই কবির পন্থাজ্ঞা। আর এই পন্থাজ্ঞায় তিনি একলা নন, তাঁর মস্ত্রে

আরও অনেকে আছেন কবি তা বিশ্বাস করেন, কারণ অপরই তাঁর কবিতার মূল কথা এবং শেষ কথা, 'প্রাণের প্রথম টানে সৃষ্টির মহিমা গায় / কলকাতার হঠাৎ মিছিলে, কিবা / পঞ্চচারী মাছুবের দিনশেষে ঘরপথে, পাড় পার্কে, রেল্তরার, কান্টারিয়ার / আচমকাই পেয়ে যায় অঘরের—অস্পষ্ট অর্ধেক'।

'রাত পূবে বার' প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও কবি যে প্রজন্ম-নিরপেক্ষ হয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেননি তা নির্বিবাদ বলা যায়। আঙ্গিক নিয়ে কোনো চালাকি নেই, ছন্দোবোধ সম্পর্কে কটাক্ষপাত করার তেমন সুযোগ তিনি যেননি বললেই চলে, শুধু গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আমাকে' দে'-র তৃতীয় স্তবকটি আগাগোড়া চোদে যাত্রার লেখা হলেও 'টহল দিত, শহর জুড়ে বন এবং উজ্জস্বতা' এই বোল যাত্রার লাইনটিতে ছন্দেই স্থান এসে গেছে। অবশ্য কবিতার স্বার্থেই কখনও-সখনও ছন্দে স্থান উপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি, নচেৎ ছন্দেই আসনে কবিতার অপমৃত্যু ঘটতেও পারে। কবি সচেতন অথবা অচেতনভাবে এই পংক্তিটি নির্মাণ করেছেন জানি না। কিছু কিছু বহু প্রচলিত অশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল, যেমন সখ্যতা, উষ্মিত, শুশুভাজ। কবিকে তাঁর সমকালের আর কোনো কবি প্রভাবিত করেননি, তবে তিরিশ দশকের কোনো কোনো প্রবীণ কবির কাছে তিনি ছাড়াহীনত পাঠ নিয়েছেন। সেটা দোষের নয়, বরং সেটাই বাঞ্ছিত। কিন্তু 'কতদিন আমি পাইনি তোমাকে' কবিতাটির নির্মাণ-পদ্ধতি ও শব্দব্যবহারের মধ্যে সুবীজনাথ দত্তের 'দশমী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'প্রতীক্ষা'র প্রভাব ভীষণভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য; বা তাঁর মতো শক্তিশালী কবির কাছে অভিপ্রেত নয়। কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় তবুও আমাদের থাকতেই হয়, কারণ শুধু বহু বাংলা কবিতার অল্প জীবনব্যবী ধারাটিকেই গুছ করার মানসে কাব্যচর্চার ব্রতী হয়েছেন। তাই তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা পরবর্তী ত্তরে তাঁর কবিতার আমরা নিশ্চয়ই খুঁজে পাব বাঞ্ছিত প্রাতিষিকতা, বা তিনি এ গ্রন্থে এখনও অর্জন করতে সমর্থ হন নি।

শুভাশিস গোস্বামী

Dark Poetry : Madhusudan Sanyal : United Writers : Rs. 20'00

মধুসূদন সান্যালের 'ডার্ক পোএট্রি' গল্পতে গল্পতে একটি প্রাসঙ্গিক তুলনার কথা মনে পড়তে পারে। সেটি হল, মানুষ সম্পর্কিত স্তূপকটায় বিকার বিশ্লেষণ। পকেটমার, মহামাত্র লর্ড, আহাঙ্গক, বিশ্বাসঘাতক, গুরুত্বর রাজনীতিক পাণ্ডা ইত্যাকার মানুষের বিবিধ অবস্থাপ্তি সমবাহী এবং পরিণামী, বহুলাংশে প্রকৃতিপ্রসক্ত অতএব সহনীয়। তাতে বিচলিত না হলেও চলে। কিন্তু শরীর ও মন যদি একতাল ব্যাধি ও বিকৃতির আশ্রয়স্থল হয়, আত্মসার অহংকার বধন সত্যকে ভারি কবলের মতো আচ্ছন্ন করে কেলে তখনই মানুষ হয় ইয়াহ। তখন আর বৈধের বাধ থাকে না। সম্ভবত, এই কুৎসিত পরিস্থিতিতেই বিদ্রোহের স্বাভাবিক প্রবণতা জাগে। কী বিদ্রোহ, কেমন বিদ্রোহ বা আক্রান্ত ব্যক্তিরে স্থির করে নেয়।

মধুসূদন সান্যাল এক্ষেত্রে কবিতার অধীনে থেকে বিদ্রোহ করতে চান। আর কোনো হাতিয়ার তাঁর নেই। সেদিক থেকে তাঁকে ঝানকটা সুবিধাজোশীও করেছে। সাধারণ মানুষের হাতে কবিতা থাকে না কিংবা আর-কোনো শিল্প-প্রকরণ। অথচ সামাজিক-স্থলে পাওয়া ছুরি ছুরি অস্ত্রায়, অগমানের শিকার তাকে প্রতিনিরত হতে হয়। অবশ্য 'ডার্ক পোএট্রি'র কবি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন নি যে, তিনি বিদ্রোহই করতে চান বরঞ্চ তাঁর আরম্ভের ভাষ্যে একটি সন্দর্ভক সংশয়কে সূচিত করেছে : 'এই কি বিদ্রোহ, এই কি কবিতা ?'

এই সংশয় থাকার দরুন তাঁকে বিশ্বাস কবতে ইচ্ছা করে। ছুটি কনোটেশনকে পাশাপাশি রাখার তাহের গূঢ় বদ্বপ প্রকাশ পায় অথচ এরা কে সহজাবী এমন নির্বচন নির্ণয়ের চেষ্টা নেই। বস্তুত, সব বিদ্রোহের লেখাই বিদ্রোহ নয়, তা পরিশীলিত কৌশল কিংবা ছদ্ম-নির্মোহ হতে পারে। যে-বিদ্রোহ ফলপ্রসূ ও উত্তরণসাধ্য তা সংকল্পপ্রধান ও অস্ত্রায় আচরণ-নির্ভর।

আটত্রিশ পাতার একটানা এই কাব্যগ্রন্থটিতে একটি মূখ্য বীম রয়েছে, সেটি মালিক ও মালিকানা সংক্রান্ত। সেই মালিক কে ? প্রথম ও শেষ দিনের সূর্যের মতো তার উত্তর নেই। সে নিরাকার ও নৈব্যক্তিক, সেদিক থেকে প্রায়শঃ ঈশ্বরতুল্য। তার নাম নেই, মুখ নেই তবু অমোঘ তার অ্যালোট্রপি, বিচরণশীল চূর্মর এক বহুত্বপতা।

আদিতে এই মালিকের হয়তো একটি জৈব পরিচয় এবং লব্ধ চরিত্র ছিল, উপস্থিত সে এক বিস্তীর্ণ সম্প্রদায়ের অংশীদার, বিশ্ববলীন এক অ্যাণ্ড কোং-এর অন্ততম প্রতিনিধি ; নিম্ন বৈশিষ্ট্যে সেই মালিক অধুনা প্রকল্পপ্রতিমায় উত্তীর্ণ।

কখনো সে পঃ জর্মনীর উনিশটি কাগজের মালিক আন্ড্রেল জিৎগার; বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার শুঁটার গ্রাগকে ঘাঁর বিরুদ্ধে একাই বিপ্লবজনক এক লড়াই চালাতে হয়; কখনো সেই মালিক এই পঃ বহু নিবাসী অমুকবাবু। কবি ও কর্মচারী মধুসূদনবাবুর বক্তব্য অমুসারী, স্টুপিড ও সন্ধ্যাপ। আরও অনেক কিছুর সঙ্গে কোমল হিংস্রতা কিংবা টাটকা, ঘরে-তৈরি রোধ তার আরসাদাধীন; স্বকায়জাত পাঁজা-পাঁজা অকৃত 'রেভোঁ' 'বেত্‌র'-এর খাস মালিক, উপেক্ষান্তরে সামনে দিখে সে বধন হেঁটে চলে যায়, কর্মচারীরা সার সার দাঁড়িয়ে থাকে গোবুলিবেলার নিত্যন্ত বাঁড়ের মতো; কবিরূপী কর্মচারী কিংবা কর্মচারীরূপী কবি মধুসূদন সান্তালও ততক্ষণে এক সার্থক বলহ হয়ে উঠতে পারেন। তিনি বাহুব, তাঁর এই ধর্মবাঁড় হওয়ার আপত্তি।

হুতরাং, উদ্ভিদ ও সৌর শক্তির সমগ্রবাহ থেকে আনৃতিক তেজ তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়। তাঁর শরীরে জন্মশঃ প্রাফাইট হয়ে ওঠে, তিনি নীরবে পেনসিল শানান। কারণ, এখনও তাঁর আশা আছে; তিনি গোবুলিবেলার বাঁড় কিংবা মালিকের ইয়াহ হলের তুচ্ছভোগী হতে চান না। তাই এই কবিতা, তাই এই বিজ্ঞোহের প্রয়াস।

অভিশয় সাধু প্রভাব, যুক্তিতে ফাঁক নেই। কিছু কার্যক্ষেত্রে এই সহজ বিজ্ঞোহের অত্র বিপত্তি আছে, কারণ বিবরণটি অত্র সরল নয়। আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথমেই একটি অপ্রাধিকার পান; অবরোধী বিচার অমুসারে নিজের তরফে মালিকের তিনি কিছু সারাস্থ রচনা করেছেন; স্টুপিড, মূল ও অমু রকমে কুংসিত ইত্যাদি। তাঁর এই বিচার প্রবণতা অপরপক্ষে নিজের প্রতি চমৎকৃত হবারও আশংকাজনক লক্ষণ। শব্দভেদী বাণে তথাকথিত সেই মালিককে স্টুপিড বলে বিদ্ধ করলেও সে প্রচণ্ডরকমে মালিকই থেকে যায়, অবাধে যায় বিকিরণ শক্তি, বহু লোকের কাছে একাধারে যে আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ, রকফেলার ও হামকক, প্রিল আলী খাঁ ও ক্রাজ কাককা কিংবা তদতিরিক্ত। মধুসূদনবাবু বতই বাজ করুন—সার্কাস, পরিবহন সমিতি, সেন্সর বোর্ড কিংবা সাহিত্যশাখার শাখার সে অধ্যায়িত সন্তাপতি, কারণ তার নিখিল পরিচয় সে মালিক। তার মাহুদী শরীরের উপর পাথর মুখ বসিয়ে দিলেও ত্রায় কর্ণট প্রিন্সিপ্ল-এর রকমকের হয় না, এক বলিষ্ঠ গোষ্ঠীর কাছে সে মূলও নয়, কুংসিতও নয়—সুদর্শন নিত্যস্বরূপ। কান ও ক্রলিকর এই সমাজে মধুসূদন সান্তালের এই কাব্যপ্রদাশ অতএব ইনকেনটাইল ডিসঅর্ডার বলে পরিহাস্ত

হবার সজাবনা থেকে যায়। মালিকের কিছুছার সাম্রাজ্যে গাছের একটি পাতাও নাড়ানো যায় না। সমাজে ক্রমবর্ধমান গোষ্ঠির বাঁড়ের সংখ্যাই তার নিশ্চিত প্রমাণ।

এই কথা মনে রেখে মধুসূদন সাম্রাজ্যে যেন ভবিষ্যতে তাঁর পেনসিল শানাতে শুরু করেন।

‘তার্ক পোএট্রি’-তে এক তীব্র ঘৃণা সঞ্চারিত এর সত্যের বিবরণ। মুইকট জাতীয় অকৃত্রিম কোভ ও স্নেহ তাঁর লক্ষ। কিন্তু ঘৃণা বা কোভের অব্যবহিত ধারকত্ব থাকলেও স্থিতিশীল ব্যাপিতা নেই। কাব্য বা শিল্পরূপে তার অসুভববেশ এক বৃহৎ উদ্গতি থাকা চাই। মধুসূদন সাম্রাজ্যের কোভ, ঘৃণা ও নিজের অস্বস্তি পরাবীনতাবোধে সম্ভবত ভেজাল নেই, তার কারণ মালিক-সংক্রান্ত ঘটনাবলীকে তিনি শুধুমাত্র ব্যক্তিকতার পর্যায়ে আবদ্ধ রাখেন নি। সাম্প্রতিক অস্তিত্বতার পুরোছুরিতে দাঁড়িয়েও তিনি ভিন্ন এক পরিবাহকেত রচনা করতে চেয়েছেন। তাঁর মৌল সমস্তা, তিনি ‘বাইরের’ লোক, পাকাপাকি আউটসাইডার; মালিক এবং তার সম্প্রদায়ের একমালি বর্গ তাঁর কাঙ্ক্ষিত নয়। বসিচ, এই বাইরের লোকটির কশেককা নেই, মেকদও নেই, কোনো এক তুহার যুগে বর্জ্য পদার্থে পরিণত হয়েছে, তবু গোপনে নিজের নিয়ন্ত্রণ চেতনাকে সে তীক্ষ্ণ করতে পারে। ঘুরে আকাশের তলার মুখে পেরেক এঁটে দাঁড়িয়ে থাকে মালিক এবং সত্যের কেনা তাঁর শিতপালের হল, কেবলি দ্বারা স্রাভির বর্গ বানায়, বস অল্প আর হাতিয়ারের কথা বলে চলে, বসন্ত স্রুপিণ্ডের শব্দ শোনে অভ্যাগবণ্ড ‘ধ মেয়ার ব্রোকন মাদায়স, ইনসালটেড ওয়াইভস অ্যাণ্ড আইসি সেলভস।’—এই বিবৃতি পাবার পর মালিককে আর ব্যক্তিবিশেষ বলে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয় না, মধুসূদন সাম্রাজ্যের লাহিনা, কোভ, উদ্বেগ, অপমানও তাঁকে ছাড়িয়ে দ্রুত অভ্যন্ত ঠিকানার পৌঁছে যায়। বুঝতে বিলম্ব হয় না, এ-ব্যাপি সামাজিক ও সর্বমাত্রিক। এবং এর পিছনে এক বলশালী শক্তি কাজ করছে।

ইংরেজি শব্দাবলির স্ননিপুণ ব্যবহারে মধুসূদন সাম্রাজ্যের বেশ দখল আছে। তাঁর চিত্রকল্পগুলি সাময়িক নয়, আয়তনিক। তিনি যখন বলেন, ‘মৃত্যু ধনক আমার ভিতরে এবং চতুর্পার্শ্ব অনিত্য এক ব্রত কিংবা আবীনতার টানা বোরাধা ধানক্ষেতের মতো এঁকে-বঁেকে যায়, তখন মনে হয়, লাহিত; অপমানিত-কর্মচারীর পরাবীন সস্তা তাঁকে কাবু করে নি, তিনি কবিই থেকে যান। অতএব, তাঁর বিচূর্ণিত হওয়া ও রক্তে অদ্বারক প্রবাহের

অন্যভাবে সম্ভবতঃ অতি-প্রাতিভিকৃত্যাক্রান্ত, তাঁর প্রত্যেক প্রমাণ এই যে, বাজারে মাছি না হয়ে তিনি কাব্যে তাঁর বিকৃত হৃদয়ের প্রতিফলন খুঁজেছেন। সেইজন্য, ‘ডার্ক পোয়েট্রি’ নাম হওয়া সত্ত্বেও এই কাব্যগ্রন্থটি কৃষ্ণপঙ্কজ নৈরাজ্য হয়ে ওঠে নি।

অসিত গুপ্ত

এই মৈত্রী। এই বলাচর। অরুণ সেন। আশা প্রকাশনী

উনিশ শতাব্দী পরিসেপেন-শরীরজলা জ্বালো থো নিভেছে বহুকাল আগেই ; এ কোণে ও কোণে লুকানো-ছু-একটি বালুবে জীয়ানো তিরিশের /-চল্লিশের উৎসবও আজ প্রায় শেষ। এক আজুলেইগোনা বায়, তিন/চারটি ১০ বছর বা ততোধিক বয়সের বৃদ্ধ প্রদীপশিখা কেবল সেই “বিপুল ভবিষ্যতের” প্রতিশ্রুতির সাক্ষীরূপে ঝিকিঝিকি জ্বলছে আজো—অটকশোর স্বতি কি আজ আমাদেরও প্রৌঢ় বয়সেই মুখর বড় জোর? বোধকরি সেই স্বতিটুকুই ভয়সা করে বসে আছি বাহির পথের দিকে চেয়ে—কোথায় সে, উড়িয়ে ধরজা অশ্রুভেদী রখে যার আসার কথা ছিল, কোথায় সেই বোড়সওয়ার? সেই স্বতিরই এক বলক আলো এসে পড়ল মনের মুকুরে এই পত্রগুচ্ছ হাতে পেয়ে। মনে পড়ল, বিশ-বাইশ বছর আগে অর্গত অধীক্ষনাথ দত্তর সঙ্গে সামান্ত কিছু কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল।

কালের সঙ্গে অজ্ঞাত হতো নির্ধাৎ অন্নবিস্তর, সেই অত্যন্ত সদালাপী মানুষটিরই সঙ্গে। বর্ষাৰ্থ সম্রাস্ত রুচির নিপাট সহস্রর ভক্তলোকটি কখনো অসন্তর্কতাবশেও, নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তির সঙ্গেও, সমানে-সমানে ছাড়া-অন্ত কোনরকম মেজাজে কথা বলতেন না। তর্ক করলে, প্রতিবাদ করলে, সতীর্থের মতো স্নেহে প্রীতিপূর্ণ বাদামুবাদে প্রবৃত্ত হতেন ; ঠোঁটেব কোণে সঙ্কোচক হাসিটি ছাড়া অস্ত কোনো কৃকন মেধিনি কখনো বিজ্ঞানের স্নেহবস্ত্র কিঞ্চিৎ অকালপক ও অসহিষ্ণু যুবক হিসেবে ঠাট্টার সময়েও না। যতদূর মনে পড়ে, তখন “দিউগালিভুলি” নামক “বনস্পতির” পাতা সব বরে পিয়েছে প্রায়, আকাশের দিকে প্রসারিত শুকনো ভাল-পালাগুলো এক একটি বিশীর্ণ জিজ্ঞাসা চিহ্ন যেন।

“বিউপালিগুলি” উপমান, আর “বনস্পতি” উপমা, এরকম কবিকল্পনা বিষয়ে সুখীনবাবু তো বরাবরই অসহিষ্ণু ছিলেন—ও ব্যাপারটা বিকুদে’র মতো সজ্ঞান কবির পক্ষেও বড়জোর ‘প্যাথোটিক ক্যালানি’,—অরুণ সেন সংকলিত পত্রের সাক্ষ্য অর্হুসারে। অতএব বিতণ্ডা অবজ্ঞাবী। সে বিতণ্ডায় তাঁর নিতান্তই বাস্তবিক সহজ পাণ্ডিত্যের চ্যুতিতে পরাজিত বোধ করা ছাড়া প্তাত্তর থেকেতো না অনেক সময়ই। কিন্তু, সে পরাজয়ে কোনো মানিবোধ হতো না। একবার যেমন সহস্র মন্তব্যর বলেছিলেন: সাহিত্যপত্রে আপনার করা গর্ভন চাইন্ডের প্রবন্ধ, sociology of knowledge-এর অহুবাধ বেখলুম; আমার চেয়েও শক্ত, সমাজবদ্ধ গভ লেখেন! সহজাত ঠোঁটকাটা উত্তরে বলেছিলুম: অকালে বারবার যুগত পড়ার কুসল। উচ্চঃস্বরে হাসিশেষে, রাতেঘরী মেবীকে ভেকে ধবরটা তুলিয়ে, সেকালের অভিজাত মিশরী সিগ্রেট, চ্যাপটা গড়নের “মুদ্রা” একটি উপহার। “আপনি” সন্ধানটা ছাড়াতে পারিনি, আকশোব থেকে গেল।

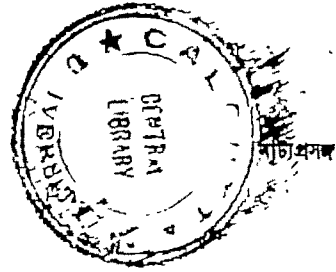
অরুণ সেন সম্পাদিত সুখীন্দ্রনাথ-বিকুদে-র এই পত্রালাপ (এক-তরফা, কারণ সুখীনবাবুকে লেখা বিকুদে-র চিঠিগুলি নিরুদ্দেশ) আচমকা নিয়ে কেললো বিশ-বাইশ বছর আগের সেই দিনগুলিতে। মনে পড়ে মৃত্যুতে শয়ান সেই দীর্ঘ বেহাট—যাকে নাকি অনায়াসেই grace নামক ইংরিজি শব্দের মর্ত্যপ্রতিমা বলা যেতো—দেখতে দেখতে দৃষ্টি গিয়ে ঈর্ষিরে পড়ল মুখে। সেখানে বেন তখনো সেই সর্কোতুক হাসির কীণ রেখা-টুকু মিলিয়ে যায়নি। অরুণ সেন সম্পাদিত চিঠিগুলির ছজে ছজেও বেন আড়ালের সেই সর্কোতুক, সম্ভব, বর্ধা সন্ধান-কৃতি ও মননের প্রাজ হাসির আলো দেখা যায়। বনান্তর-মতান্তরে দীর্ঘ হলেও কবিবন্ধুর কীর্তির প্রতি অপ্রতিহত মনোবোগী সে সহাস মনীষা চিঠিগুলিতে সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলবে।

কালক্ষেপে ভাবাবশেষের দুই মেরুতে স্থাপিত হলেও, বাংলা সাহিত্যে আধুনিক আত্মসচেতনতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রতিষ্ঠা এই দুই পথিকৃদের অধিষ্ট ছিল। বিশ / তিরিশের যুগে সেই যুগ প্রয়াসের সহকর্মীসুলভ পারস্পরিক প্রীতির উদ্ভূত বাটতি পড়েনি কখনো। ব্যাপারটা ইমানীংকালের এমনকি স্বজাতীয়দেরও পারস্পরিক সম্পর্কের মানিময় পটভূমিতে খুবই চমকপ্রব। সেই চমকপ্রব ব্যাপারটাই প্রতীকা করায় সুবোধ করে দিয়েছেন অরুণ সেন। একান্তই ধন্তবাদাহ তাঁর এই ঐকান্তিক প্রয়াস।

কিন্তু চমকপ্রদ ব্যাপার আরো রয়েছে। অরুণ সেনের লেখা দীর্ঘ ভূমিকাটি বাংলা সাহিত্যের প্রায় ৩০ বছরের মনোভিত্তিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের প্রামাণ্য দলিল। সতর্ক মনোবোলে তিনি চিঠি, লেখা ও শোনাকথা মিলিয়ে দুই প্রবল মনীষার ঘাতপ্রতিঘাতের আবহ রচনা করে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন আমাদেরই মনোভিত্তিক ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের এরকম পরিপ্রেক্ষি, তথ্যানুষ্ঠান ব্যবহার বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বিরল; এমনকি intellectual history-র সাম্প্রতিক বাঙালী ক্যাশনজীবীদের লেখাতেও আশ্চর্য নজরে পড়ে না। সার্বিকভাবে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কী ভাবে “চোরাবালি”-র ভূমিকাকারের সঙ্গ, পরিপ্রেক্ষি উচ্চাঙ্গ পরিণত হল “নাম রেখেছি কোমল গাছার” সম্পর্কে প্রকরণগত ও ভাবগত নানা তুচ্ছ-বাহুগ্রস্ত আপত্তিতে, বার তাকানায় স্বীকৃতি লেখেন: “আমার শিক্ষা-দীক্ষার দৈর্ঘ্যে শুচলেও, আমি “নাম রেখেছি কোমল গাছার”-এর প্রত্যেক ‘তুমি’-কে চিনতে পারতুম কিনা সন্দেহ”। প্রায় সোহাবাধী মুহূর্ত-তন্ময়ের নান্দনিক শাসনে তিনি বুঝতে অপারগ হলেন কোন স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ইয়ু-এর সমষ্টিনির্ভর অবচেতনায় রূপান্তরিত হল মার্কসীয় ব্যক্তি-সমষ্টির সামুদ্রিকনির্ভর প্রকৃতি ও প্রমত্তজীবী মানুষের পার্বত্য-পরমেশ্বর অস্ত্রোত্তরায়, যেখানে রাবীন্দ্রিক “তুমি”, ব্যক্তিগত প্রত্যাহার “তুমি” স্বদেশ বা দূরাদয়স্বপ্ননিভস্যতরী, বামিনী রায়ের নর্তকী বা বিধবা, দিঘারিয়া পাহাড়ের জোল আর ইতিহাসের ঐতিহাসিক উল্লাসে বিগত “তুমি” একাকার।

তবু কবিকীর্তির প্রতি অপ্রতিহত মনোবোলে “সিগনেট”-কর্তৃপক্ষ প্রেরিত “নাম রেখেছি কোমল গাছার” পেয়েই সাত তাকাতাড়ি লিখে ফেলেন (৩৮ নং চিঠি): “আপনার স্বজনীশক্তি সত্যিই বিস্ময়কর, এবং আমার পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। এখিক থেকে আপনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়...”। এই সহিষ্ণু, সঙ্গত মনোভাবও আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্রতার অগতে ঈর্ষার বস্তু; অরুণ সেনের পরিপ্রেক্ষি নিষ্ঠাও।

বৌদ্ধায়ন চট্টোপাধ্যায়



অমিতাকর। শ্রবক। ২১ জুলাই ১৯৭৮। অ্যাকাডেমি অব কাইন আর্টস। নাটক-বেবাশিস
সম্মুখার। একজন—ফিল্মে ফলোপাখ্যার ও বেবাশিস সম্মুখার। মিয়র—ফিল্মে
ফলোপাখ্যার।

বাংলা নাটক-রচনার দীনতাকে ঢেকে দেয়ার জন্য গত দশ-পনেরো বছর
অকের ওপর যে কারখাকান দেখনো হয়েছো, তার আড়ম্বর 'খুব কম
নয়। বেশ কিছু তথাকথিত জনপ্রিয় নাট্য-প্রযোজনা এত ঠাইলাইজুত'
যে খোশা ছাড়িয়ে দেখতে হয়, ভেতরে সত্যিকারের শাঁস আছে কিনা।
খুব একটা আশা না নিয়েই নতুন নাট্যদল শ্রবক-এর 'অমিতাকর' দেখতে
গিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে। বলতে দ্বিধা নেই, পুরো নাটকটাই আমাকে
সোজা হয়ে বসে দেখতে হয়েছে।

এই দশকের একজন অত্যন্ত তরুণ কবি ও নাট্যকার বেবাশিস সম্মুখার
নাটকটি লিখেছেন। আমি এই যুবকের রচনা-কর্মতায় বিম্বিত হয়েছি।
কি সংলাপ, কি বিষয়বস্তু, কি নাটকের নেপথ্যাচারী অশ্বর্নিহিত আবেগ,
কি সংহতি—সব দিক থেকেই 'অমিতাকর' বহু। একজন অভাবী, ছা-পোষা
মাল্লব নেহাৎ সরকারী ভাতা পাবেন বলে মেকি বিপ্লবীর মুখোশ পরেছেন।
সেই মুখোশ কি ভাবে মুখে রূপান্তরিত হচ্ছে—তারই টালমাটাল নাটকীয়তার
নাম 'অমিতাকর'। যে এম. পি তাঁকে বিপ্লবী সাজিয়েছেন, যে-সব লুচ্চা
মান্তানের কালো হাত এম. পি, এম. এল. এ ভাঙে গড়ে, স্বাধীনতার তিন
দশক পরেও যে কাটকাবাজ চোরাকারবারী রাষ্ট্রকর্মতার বেনামি ইজারাদার—
সবার প্রতিই ঐ সাজা-বিপ্লবীটির নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাবোধ তীব্রের মত
নিষ্টিপ্ত হয়েছে। এক সার্বিক সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাল্লবটি কেহ
জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি বিপ্লবী নন।

খুব অত্যাধিক ভাবায় লেখা নাটক, খুব অত্যাধিক অভিনয়। আলোর
চোখ-বাঁধানো রোশনাই নেই, নেই সাংকেতিকতা বা কিমিতিবাদের নামে
হাঁসজাক বানানো, দালি বা পিকাসো-র আঙ্গিকের সত্তা নকল কিছুই নেই
সেই-এ, নেই অকের আড়াল থেকে স্বয়ং বা সুর নিষ্পেদের হাজার রকম

কারিকুরি। একান্ত কম বাজেটের নাটক, যা একটি নতুন বা প্রবীণ দলের পক্ষে অনিবার্হভাবে মানিয়ে যায়। অনেক কিছু না বুঝেও বিজ্ঞতার ভান করার ভণ্ডামি থেকে অন্ততঃ শূন্যক-এর ‘অমিতাকর’-এ আমি মুক্তি পেয়েছি।

প্রথমার্ধে নাটকটির গতি বেশ হুসম। দ্বিতীয়ার্ধের কোথাও কোথাও একটু ভাবী বোধ হতে পারে। আনি না, আজকাল বড় বেশি রোমান্সিত হতে অন্যান্য বলেই এই মুহূর্তসম্ভাব চোখে ঠেকেছে কিনা। তবে অভাবী মাহুদ স্বিভাম্পতির তথাকথিত হঠকারিতা যে বিপন্ন ভবিষ্যতের সামনে তাঁর পরিবারকে এনে দাঁড় করিয়েছে, সেই রম্যস্তিক সম্ভাবনাকে কাহিনীর সামান্য বিস্তারে হয়তো আরো ভয়াবহ করে তোলা যেত।

একজন ছুঃখী ও একান্ত সাধারণ মাহুদ, যিনি সময় এলে সময়ের মত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন, এ-হেন স্বিভাম্পতি চরিত্রে নিরুদ্বিগ্ন, শান্তভাবে আশ্চর্য অভিনয় করে গেছেন যিভেন বন্ডোপাধ্যায়। এক মুঠো দ্বাঃ ছাড়া বারাবাহিক দ্বিঃ হাঁর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই সেই নীহার বা স্বিভাম্পতিক্ত্রিঃ-র ভূমিকায় যিভেনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েছেন ইদ্রাবী মৈত্রী। চমৎকার অভিনয় করেছেন যোঃ ঠাকুরার ভূমিকায় গৌরী চৌধুরী, ভালো করেছে রিঃ ভূমিকায় টুপুঃ যোঃ নামে ছোট্ট মেয়েটি। অন্তঃের অভিনয় বধ্যবধ, তবে চন্দ্রকান্ত-র ভূমিকায় চন্দন সেনগুপ্তর অভিনয়ের উন্নতির অবকাশ আছে।

শেষে একটি ছোট্ট কথা বলি। শূন্যকের ‘অমিতাকর’ আমার নাটক দেখার ইচ্ছে বাড়িয়ে দিয়েছে।

অমিতান্ত দাশগুপ্ত

74/65, W.E.A.,
New Delhi 5
29.6.78

সম্পাদক, 'পরিচয়'

বন্ধুস্বরে

আপনাদের জ্যোতিরাত্র মৈত্র অরণ সংখ্যাটি পড়ে এত অভিভূত হয়েছি কি বলব। বটুকদা আমার অতিপ্রিয় বন্ধু ছিলেন। খুবই ভালোবাসতেন আমাকে। তিনি, বিনয়দা আর আমি নিত্য আড্ডা দিতাম। মাঝে মাঝে সূতীয়া* আসত। সে সব দিন আর ফিরবে না। বটুকদা দিল্লী থেকে চলে যাবার পর আমিও প্রায়ই বাইরে থাকতাম। ওনার শেষ চিঠি পেয়েছিলাম ইরান দেশ থেকে ফিরে। এইসব ভাবতে ভাবতেই আপনাদের এই অমূল্য সংখ্যাটি পড়ে ফেললাম।

পড়ে ফেলাটা অত সহজ নয় ভাই। পড়তে পড়তে গলা বুজে আসছিল বারংবার। আপনাদের এই সংখ্যাটি আমার কাছে অমূল্য সম্পদের মত থাকবে। কতই না খেটে আপনাদা এমন একটি স্মৃতি সংখ্যা বের করতে পেয়েছেন। এইটুকু লিখতে গিয়ে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। খুব ভালোবাসা না থাকলে এত সব মূল্যবান রচনা একই সংখ্যায় দেওয়া সম্ভব হত না—ইতিহাসে থাকবে এই সংখ্যাটি।

ইরান থেকে মাঝে মাঝে বটুকদাকে চিঠি দিতাম। ওঁর অনেক চিঠি আমার কাঁছে ছিল—দেশ পত্রিকায় ওঁর কবিতা 'দয়বেশকে', মৃত্যুর পর কোন একটা সংখ্যায় বেরিয়েছিল। তখনো আমি যুয়ছি। এই যুয়তে যুয়তেই "পরিচয়" পেলাম। কালো বিচ্ছিন্নি মলার্টের ভেতরে কত অল্প ফুল ফুটে রয়েছে বর্গীর রঙে—

আপনি এবং আপনারা আমার খ্রীতি শুভেচ্ছা ও নমস্কার জ্ঞান।
 জ্ঞাতবের সঙ্গে দেখা হলে আমার কথা বলবেন। আমার যে উপন্যাসটি
 বটুকনাকে উৎসর্গ করেছিলাম, সেই উপন্যাসে ওরও বিস্তর খাটাখাটুনি
 ছিল।

ইতি

শিবদাস চট্টোপাধ্যায়

* কবি জ্ঞাতব মুখোপাধ্যায়।

অন্য সংখ্যা পড়ে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হারোথর সির, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, লোকনাথ
 ভট্টাচার্য, বর্ণপ্রিয়কুমার সেন প্রমুখ অনেকে আমাদের চিঠি দিয়েছেন। সাধারণ পাঠকদেরও
 অসংখ্য চিঠি এসেছে। আমরা এই সুযোগে সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সম্পাদক

বিষ্ণু দে-র সন্তরতম জন্মদিনে

বোসরা শ্রাবণ শ্রীমুখ বিষ্ণু দে সন্তর বর্ষে পদার্পণ করছেন। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ জীবিত কবি। তাঁর অপার মনীষার কাছে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের রূপ বড় কম নয়।

প্রায় অর্ধশতক ধরে তিনি ‘পরিচয়’-এর আপনজন। তাঁর রচনার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়, এর এক বৃহৎ অংশ প্রথম ‘পরিচয়’-এই প্রকাশিত হয়েছে। সব্যসাচীর মতো হু-হাতে তিনি কলম ধরেছেন—একদিকে মৌলিক রচনা, অন্যদিকে তর্জমা; যেমন কবিতা, তেমনই গদ্য।

‘পরিচয়’-এর প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা করা হয়েছিল (শ্রাবণ ১৩৪৮) :

...“বাংলা দেশে ‘পরিচয়’ আজ এই ভারই লইতে চাহে। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাবগন্ধার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ভিতর দিয়া বহাষ্টিয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রাজীচ্যের বিভিন্ন ভাবার বিশিষ্ট দ্বানগুলিকে ‘পরিচয়’ বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী, কখনো মূল ভাষা আলোচনা করিয়া, কখনো বা ভাবান্তরের সাহায্য লইয়া, কখনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া, কখনো বা মূলগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া। এই সঙ্গে স্বাভাবিক সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও ‘পরিচয়’ তাহার দৃষ্টি সদাঙ্গাগ্রত করিয়া রাখিবে। কবিতা, কথাসিঙ্গ, নাটক, কলাছন্দন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব—পরিশীলনের সকল বিভাগগুলিই বাহাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে, এ বিষয়ে ‘পরিচয়’ সাধ্যমত চেষ্টা করিবে।”...

এই চেষ্টায় ‘পরিচয়’-এর কিছু সাফল্য যদি থেকে থাকে, তবে তাঁদের গুণগণায় সন্তব হয়েছে—বিষ্ণুবাবু তাঁদের প্রধান একজন। বরং আজ স্বীকার করাই ভালো—‘পরিচয়’ পোষ্ট্রির দৃষ্টি কখনো বা বাপসা হয়েছে, কিন্তু বিষ্ণু দে কখনোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। অর্জুনের মতোই তিনি দেখেছেন শুধু পাখির চোখ। তারপর লক্ষ্যভেদ করেছেন। তাই তিনি আমাদের ‘কবির্মনীষী’।

এই হওয়া না-হওয়া সময়ে আমাদের সংস্কৃতিজগতও বিকাশ আর বিনাশের মধ্যে অস্থির। তাই এখনই তো তিনি আবার ‘স্বতি-সঙ্গ-ভবিষ্যৎ’-এর পরবর্তী অংশ লিখবেন।

আমরা বিষ্ণুবাবুর স্বস্থ স্বজনশীল দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ‘পরিচয়’ তার লক্ষ্যে পৌছতে চায়। আজও তিনি ‘পরিচয়’-এর অন্ততম উপদেশক ও লেখক। আমাদের ছত্তর পঞ্চাব্দায় আজও তিনি প্রেরণা। সঙ্গী।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধ, স্মৃতি ও সত্তার

অনুবাদ : অমল আচার্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে লেখক কনস্টানটিন সিমোনভ সময় সংবাদদাতা ছিলেন। যুদ্ধকে তিনি যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং অভিজ্ঞতায় লাভ করেছেন, তার একটা দিনলিপি রেখে বান। সেই দিনলিপি সম্প্রতি দুঃখে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ হবার পর ভাসিলি পেসকভ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন, সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল প্রকাশিত দিনলিপি সম্পর্কে সিমোনভের অভিমত সংগ্রহ। এছাড়া পেসকভ নানারকম প্রশ্ন করেন সিমোনভকে, এবং সিমোনভও প্রশ্নগুলোর যথাসম্ভব উত্তর দেন। নিচে সাক্ষাৎকারের বক্তাবাদ।

প্রশ্ন : ১৯৪১, অর্থাৎ কেবলমাত্র যুদ্ধের প্রথম বছর নিয়ে আপনার দিনলিপির প্রথম খণ্ড, অথচ বাকি দীর্ঘ চার বছরের ঘটনা দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, বার আকৃতি প্রথম খণ্ডের মতই। এটা কেন হল?

উত্তর : হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। যুদ্ধের প্রথম বছর আমার অস্থিভূতি এবং প্রতিক্রিয়া তীব্র ছিল, তাই বেশি করে লিখেছি। সাধারণত যুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধ নিয়েই বেশি লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত ছবিটা পেতে হলে ১৯৪১কে ভুললে চলবে না।

প্রশ্ন : সেই দুঃখের দিনগুলোর, যখন জার্মানরা দিনে পঞ্চাশ ঘাট কিলোমিটার এগিয়ে আসছে, একজন সাংবাদিক দেশবাসীর উৎসাহ ও মনোবল দৃঢ় করার অস্ত্রে কতটুকু লিখতে পারতেন?

উত্তর : বতরুপ না দেখেছি অন্তত একটা সৈন্তবাহিনীও না পিছিয়ে শত্রুদের সঙ্গে সমানে মোকাবিলা করে যাচ্ছে এবং তাদের ক্ষয়ক্ষতি করতে পারছে, আমি তো লিখতে পারিনি কিছু। বাইলোরশিয়ার মজিলেভ্-এ প্রথম দেখলাম, শত্রুরা প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। যে সৈন্তবাহিনী ষাট কামড়ে এই

লড়াই চালিয়ে বাচ্ছিল তার দলপতি ছিলেন কর্ণেল সিমেন কুটপভ। তা বেধে আমার মধ্যে আশার সঞ্চার হল। এই প্রথম জানলাম, হুদাভ শত্রুকেও ক্রমে হেরা যায়। কর্ণেল কুটপভের সৈন্যদল সম্পর্কেই আমি প্রথম লিখি এবং লিখে আমার কাগজে পাঠাই। মোটেরপর যুদ্ধের প্রথম দিন-গুলো নিয়ে সেই সময় কাগজে লেখা খুব ছুন্নহ ব্যাপার ছিল। কিন্তু তালিনের তেসরা জুলাইয়ের বক্তৃতা শুনে অন্তত আমি সংশয়মুক্ত হতে পেরেছিলাম।’

প্রশ্ন : যুদ্ধের প্রথমদিককার কথা বলতে গেলে অনেকেই ওই বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেন, কেন ?

উত্তর : সময়টা ছিল বহুপাক্ষিক বিশ্লগতা এবং বিপর্যয়ের। সেই অবস্থাটা তালিন বক্তৃতার সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেন। কাগজে যুদ্ধসংক্রান্ত যে রিপোর্ট ছাপা হত, তা ছিল অস্বস্তিকর এবং দুঃখজনক। অফিসিয়াল রিপোর্ট আর প্রকৃত ঘটনার মধ্যে বিস্তর অমিল থাকত। জার্মানরা ক্রমাধ্বয়েই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দখল কায়েম করছিল। তবু তালিনের বক্তৃতা দেশবাসীকে উৎসাহিত এবং উদ্বীষ্ট করে তুলল। এর ফলে দেশবাসী চরম পরিণতিটা বুঝে নিতে পারল। আসল ব্যাপারটা তুলে ধরায় কোনো কিছু পোপন বা বাধ থাকল না। চরম বিপর্যয়ের মুখে সত্য কথা স্পষ্ট করে বলা সঠিক কাজ বলে মনে হয় আমার কাছে। এতে সব কিছু বোঝা যায়। ওইদিন বুঝতে পারলাম আমাদের দেশ কতখানি মারাত্মক অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এই উপলক্ষি আমাদের প্রবল-ভাবে চাড়া করে তুলল। তালিনের বক্তৃতার কথা বলতে গেলে এক অন্তত ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। পরে জানা যায়, সেই একই দিনে অর্থাৎ তেসরা জুলাই, জার্মান সৈন্যদল হুদাভ তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন, “এটা বাস্তবিক বলা হবে না যে, রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে সমস্ত অপপ্রচার ব্যর্থ হয়ে গেছে।” তালিন পরিষ্কার বুঝেছিলেন, অন্তত তাঁর ভাষণ শুনে মনে হয়েছিল, যে মরণ-বাচন লড়াই সচ শুরু হয়েছে।

১. স্টেট ডিফেন্স কমিটির চেয়ারম্যান বোশেক তালিন ১৯৪১-এর ৩ জুলাই রেডিওর মাধ্যমে আন্তির উদ্দেশে এক ভাষণ দেন। শত্রুর বিপক্ষে সর্বশক্তি নিয়োগ করার অন্তিমপ্রায়ে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, এই ভাষণে তার বিশ্লেষণ ছিল।

প্রঃ : কোন্ জার্মানকে আপনি প্রথম দেখেন ?

উত্তর : একজন বিমানচালক সার্জেণ্ট। তার বিমান নামিয়ে আনা হয়েছিল :

একজন জার্মান বন্দী ঘটনার বিষয় তখন, তাই তাকে ঘিরে ঝাড়িয়েছিল কোতুল্লী জনতা। সে ছিল নাৎসীদের রণকৌশলে শিক্ষিত সাহসী সৈনিক এবং চূড়ান্ত উদ্ভূত। নিজেই বন্দী দেখে সে বোকা বনে যায়। তাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল যে, রাশিয়ান ক্রান্তে নিহত হবার কোনো আশঙ্কা নেই। অবশ্য পরে তাদের মৃত্যুর অস্ত্রে তৈরী থাকতে বলা হয়, এবং তারও পরে বলা হয় যেসব অস্ত্রে তাদের অবশ্যই মরা উচিত। তাকে গুলি করে নামানো হয়েছে তরুণ সার্জেণ্টের কাছে এটা অবিখ্যাত ঘটনা ছিল।

প্রঃ : ‘শেব জার্মানদের’ সঙ্গে আপনার কোনো সাক্ষাৎকারের কথা মনে আছে ?

উত্তর : ১৯৪৫-এ বন্দীদের প্রতি কেউ খুব একটা মনোযোগী ছিল না। আমার মনে আছে, সেই প্রথম বন্দী বিমানচালককে চারজন সশস্ত্র প্রহরীর প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অথচ যুদ্ধের শেষ দিকে মাত্র একজন সাবমেশিন বন্দুকধারী প্রায় একশজন বন্দীকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেত। অবশ্যই আমি জার্মানদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি, এরকম কথাবার্তা বলতেই চেয়েছিলাম এবং একটা ঘটনা আমার মনে আছে এখনো। একজন বয়স্ক ক্যাথলিক ধর্মব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলছিলাম। নানা বিষয়ে আমাদের কথাবার্তা হয়েছিল : নাজিবাদের উৎস, জার্মানদের ওপর হিটলারের প্রাধান্য, জার্মানদের আত্মীয় চরিত্র, তাদের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি প্রসঙ্গ। তিনি বললেন, আমার গীর্জা এলাকাফুল্ল পল্লীবাসী রমণীরা এখন বিলীভাবে কান্নাকাটি করছে, কারণ তাদের স্বামীরা, যারা নাৎসীবাহিনীর সশস্ত্র, ধরা পড়েছে। তাদের ধর্মীয় পিতাহিসেবে আমার করুণা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বতখানি সহ্যকৃতি তাদের প্রতি দেখানো আমার উচিত ছিল, তা আমি দেখাচ্ছি না। তারা বড় বেদী করে কাঁদছে। স্বামীরা যখন নাৎসীবাহিনীতে ঢুকছিল তখন তাদের কাঁদা উচিত ছিল। তখন তারা তা করে নি, উপরন্তু গভীর আত্মগত্যা এবং হীনতা দেখিয়েছে। জার্মানদের যে-জিনিস একজন জার্মান হয়েও আমি তরানক ঘৃণা করি।

প্রশ্ন : শত্রুদের কাছ থেকে আমাদের কি শেখার ছিল, এবং যুদ্ধের প্রথম পর্বে আমরা কি শিখেছিলাম ?

উত্তর : অনেক কিছু শিখেছি। আমরা শিখেছি যে সায়নাসামনি শত্রুকে আক্রমণ করতে নেই, বরং শত্রুপক্ষকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে, সীড়ানী আক্রমণে তাদের একটা জায়গায় ঘিরে ফেলতে হয়। আমরা শিখেছি কিভাবে সৈন্য পরিচালনা করতে হয়। ট্যাংক যে ক্ষয় পাবার বস্তু নয়, তাও শিখেছি, আরো জেনেছি কিভাবে বাহু ভেদ করে, শত্রুপক্ষ গুঁড়িয়ে দিতে হয়, তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয় বা ভাইনে-বীয়ে রক্ষণভাগ ক্ষত-সাজিয়ে নিতে হয়। আমরা সাহসী হতে শিখেছি এবং সামান্য ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে শত্রুকে পরাজিত করার বিদ্যাও অর্জন করেছি। জটিল কৌশল-গত সমস্যা কার্যকরভাবে সমাধান করার শিক্ষাও আয়ত্ত্ব করেছি। সৈন্যবাহিনীর সব রকম শাখার সঙ্গে যে সঠিক বোগাবোগ বজায় রাখতে হয়, তার কার্যদক্ষতায়ও জেনে নিখেছি। পদাতিক বাহিনীর রাত্তা তৈরি করে কামানবাহিনীর এগোনো উচিত, আর তাকে ক্রমাগত সাহায্য করে চলা উচিত বিমানবাহিনীর—এটাও জেনে ফেললাম আমরা। এ-প্রসঙ্গে কিছু পরিসংখ্যান দেয়া যেতে পারে এখানে। মিনসিগিতে আমি ১০৭ সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর কথা লিখেছি। ১৯৪১ সালে জেলুনিয়া* যুদ্ধে এই সৈন্যবাহিনী ২৮টা ট্যাংক, ৬৫টা বন্দুক এবং মর্টার ধ্বংস করেছিল, আর হত্যা করেছিল ৭৫০ জন সাধারণ সৈন্য অফিসার সহ। কিন্তু তা করতে গিয়ে নিজের দলের ৪,২০০ জন লোক হত বা নিহত হয়েছিল। বুঝতেই পারছেন কত চড়া দামে অর্থ কিনতে হয়েছিল। কিন্তু এই একই সৈন্যবাহিনী ১৯৪৫ সালে কোনিগসবার্গ (এখন কলিনিগ্রাদ) যুদ্ধে অস্ত্র ফল দেখিয়েছিল। তারা ৫৫টা সিটি ব্লক অধিকার করেছিল এবং বন্দী করেছিল ১৫,১০০ জন অফিসার সহ জার্মান সৈন্য, বিনিময়ে দলের মাত্র ১৮৬ জনকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, যুদ্ধ করতে আমরা ভালই শিখেছিলাম।

প্রশ্ন : এবার দৃষ্টান্ত বরূপ কিছু শারীরিক ক্ষমতা ও সহনশক্তির কথা বলুন। যুদ্ধ প্রসঙ্গে লোকে প্রথমেই বোমা, কামান এবং মিসাইলগানের আক্রমণের কথা ভেবে থাকে। কিন্তু তার পেছনে অসামান্য শ্রম, বরফ বা অত্যধিক ঠাণ্ডার বনে-জঙ্গলে বিনীত রাত জাগা, কনকনে জলে গলা পর্বত ডুবিয়ে

নদী পারাপার, সম্ভবমত খাবার না পাওয়ার ঘটনা থাকে, অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তবু তাদের ঠাণ্ডা লাগে না, নিউমোনিয়া বা অস্টিয়া রোগভোগ হয় না। এরকম হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর : ইয়া, এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। আমার মনে আছে, আমি যখন উত্তরাঞ্চলীয় রণপোত বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, পর্বতবন্ধক দলের সঙ্গে আমি বাই এবং সমুদ্রতীরে নামি। অলপ কষ্ট অবশিষ্ট ভূমিতে আমাদের বারো কিলোমিটার ঘেঁষে হয়েছিল, আমার জামা-কাপড় বরফের মত জমে গিয়েছিল এবং ঝড় ঝড় শব্দ হচ্ছিল তাতে, যেন টিনের তৈরি। অথচ আমার অস্থির করেনি। শরীরের সঞ্চিত শক্তির সমাবেশ ঘটেছিল নিশ্চিত বা অন্ত কিছু। শারীরিক এই প্রকৃতির সঙ্গে চিকিৎসকরা ভালভাবেই পরিচিত।

প্রশ্ন : নৈতিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে কিছু বলুন। কার্যের দায়িত্বপালনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আপনার মনে পড়ে কি ?

উত্তর : পড়ে। যুদ্ধের প্রথমদিককার কথা। সৈন্তবাহিনী পিছু হটছে। রাস্তাপথ বাস্তুহারা পূর্ণ। তারা পূর্বদিকে পালাচ্ছিল। তাদের সন্নিবেশ অসামরিক পোশাক পরে তরুণরা গোলাবর্ষণের মধ্যে ক্ষত পশ্চিমদিকে হাঁটছিল। ভিড় কাটিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তারা, যদিও তাদের কপালে কি অপেক্ষা করছে বা শত্রু কোথায়, সে বিষয়ে তারা ছিল অজ্ঞ। প্রবল কর্তব্যনিষ্ঠা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের।

প্রশ্ন : এমন কি চরম তুর্ধোগের মিনেও যুদ্ধে অবশ্যই জয় হবে এ বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আমাদের জয় করেছে। এ সম্পর্কে কিছু বলুন, সুনী।

উত্তর : দৃষ্টান্ত খুঁজতে গেলে ১৯৪১-এর দিকে তাকাতে হয়। বরং সে সময়ই যুদ্ধে জয় হবেই এ বিশ্বাস না থাকার সম্ভব কারণ ছিল। কেননা, সেটা ছিল আমাদের বিপর্যয়ের কাল। কিন্তু তবুও যুদ্ধে জয়ী হবার বিশ্বাস বিলম্ব ছিল আমাদের মধ্যে। সেই প্রথম জার্মান-বন্দীর সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদের প্রশ্নটা ধরা থাক। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, “রেড আর্মি যখন জার্মান অকলে চুকে পড়বে, তুমিরা কিভাবে তাঁর মোকাবিলা করবে ?” ওই প্রশ্ন তেতাল্লিশ বা ত্রিশ্লিশে করা হয় নি, করা হয়েছিল একচল্লিশে। বা মনে করুন একচল্লিশের সাতই নভেম্বর রেডকোয়ারে সেই ঐতিহাসিক কুচকাওয়াজের কথা, যখন নাৎসীবাহিনী ক্রেমলিন থেকে মাজ ঘাট কিলোমিটার দূরে।

১৭। প্রকল্পের আওতাধীন অঞ্চলে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

[illegible][illegible]

উত্তর : অধিকাংশ দিনগুলো যেমন আমাদের পক্ষে অধিকার, অধিকারের পক্ষেও অধিকার ছিল। কিন্তু কিছু কিছু মুহুর্ত ছিল যা একান্তই আমার। মসকোর কাছে মিখাইলভ ছোটো একটা শহর। ১৯৪১-এ কোনো এক শীতের সন্ধ্যায় মিখাইলভ শহরে ঢুকেছিলার অল্পত আনন্দ হয়েছিল। জুলাই না কোনোদিন। শহরটা ছিল আর্মিনদের পরিত্যক্ত লরি, ট্যাংক, অস্ত্রবোঝাই গাড়ি, স্টাক কার, আর মোটর সাইকেলে পূর্ণ। এটাই প্রমাণ করে আমরা আর্মিনদের হারাতে পারি এবং পেরেওছিলাম।

কিন্তু আমাকে যদি বলতে বলা হয়, কোনদিনটা ছিল সবচেয়ে আনন্দের, আমি বলব সেই দিনটার কথা, যেদিন আমরা লিপজিগ-এর নিকটবর্তী রাশিয়ান যুদ্ধবন্দীদের শিবিরে গেলাম। হলফুল পড়ে গেল বন্দীদের মধ্যে। হাজার হাজার বন্দী আমাদের শিবিরে এসে উঠল, "আমাদের, আমাদের।" - দীর্ঘশ্বাসে গাভুর ও বিবর্ণ, সে মুখ আমি জুলাইয়ের দিনের, কিছু বলতে চেষ্টা করতাম।

কিটেল, সামনের টেবিলে তাঁর হির চোখ, কখনো সামান্য বাড়ি কাত করে বুকভকে দেখছিলেন। বেশ কয়েকবার তাকালেন একই ভাবে। আমি শুধু ভাবছিলাম, কিটেল কি অস্বস্তিতেই না পড়বেন যখন তিনি দেখবেন সেই ব্যক্তিকে, যার ব্যক্তির দীর্ঘকাল ধরে কিটেলকে টেনে রেখেছে। আশ্চর্যবাসীসম্পন্ন বুকভের জন্মের মুখের দিকে ব্যতিক্রম সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম আমি।

প্রশ্ন : বুককে আপনি কি চোখে দেখেছেন এবং অস্বস্তি করেছেন, খোলাখুলি লিখেছেন আপনার হিনলিপিতে এবং তা প্রকাশ করে আপনি পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন। আপনার হিনলিপি সম্পর্কে কিছু বলার আছে কি ?

উত্তর : আমার জন্ম হিনলিপির কিছু বহলাবহলি করে বসব। আমি মূল হিসাবে লেখা করে, তাই করে-